~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তরসমগ্র

ভাষান্তরিত গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার

শাহাদুজ্জামান

Pathak Shamabesh
Since 1987

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Bangladesh Taka ১২৭৫.০০
US $: ৪০.০০ UK £: ২০.০০

কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামানের লেখালেখির শুরু আশির দশকের মাঝামাঝি অনুবাদের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ কথাসাহিত্যের নানা শাখায় মৌলিক রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি লেখা বাংলায় ভাষান্তর অব্যাহত রেখেছেন তিনি। ভাষান্তরিত লেখাগুলোতেও রয়েছে শাহাদুজ্জামানের নিজস্ব রচনাশৈলীর স্বাক্ষর। তাঁর ভাষান্তরিত প্রবন্ধগুলো সংকলিত হয়েছে 'ভাবনা ভাষান্তর', গল্পগুলো 'ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন' এবং বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকারগুলো 'কথা পরম্পরা' বইয়ে। এছাড়া তাঁর অগ্রন্থিত বিভিন্ন ভাষান্তরিত রচনাও রয়েছে। 'ভাষান্তরসমগ্র' শাহাদুজ্জামানের এ যাবৎ ভাষান্তরিত সকল গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত রচনার সংকলন। এ বই বিশ্বসাহিত্য, রাজনীতিসহ, আন্তর্জাতিক ভাবনাজগতের এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি করবে পাঠকপাঠিকাকে।

ISBN ৭৭৮-৯৮৪-৯১২৭২-৩-৭

~ www.amarboi.com ~

শাহাদুজ্জামান

ব্যতিক্রমী এবং নিরীক্ষাধর্মী গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে শাহাদুজ্জামান মননশীল বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অনিবার্য অবস্থানটি ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছেন। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ, গবেষণা, ভ্রমণ এবং অনুবাদ সাহিত্যেও রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শাহাদুজ্জামান পড়াশোনা করেছেন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। পরবর্তীকালে তিনি নেদারল্যান্ডস-এর আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে। পেশাগতভাবে তিনি ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক-এর গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে, পরে অধ্যাপনা করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অব পাবলিক হেলথ'এ। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা এবং অধ্যাপনায় যুক্ত আছেন।
শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়।
(Email: zaman567@yahoo.com)

শাহাদুজ্জামানের কিছু উল্লেখযোগ্য বই

ছোটগল্প : 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প', 'পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ', 'কেশের আড়ে পাহাড়', 'অন্য এক গল্পকারের গল্প নিয়ে গল্প'
উপন্যাস/ডকু ফিকশন : 'ক্রাচের কর্নেল', 'বিসর্গতে দুঃখ', 'খাকি চত্বরের খোয়ারী', 'আধো ঘুমে ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে'
প্রবন্ধ : 'কাগজের নৌকায় আগুনের নদী : কলাম, নিবন্ধ, বক্তৃতা সংকলন', 'শাহবাগ ২০১৩', 'লেখালেখি', 'চিরকুট', 'টুকরো ভাবনা', 'চ্যাপলিন আজো চমৎকার', 'চলচ্চিত্র, বায়োস্কোপ প্রভৃতি', 'আমস্টার্ডাম ডায়েরী এবং অন্যান্য'
গবেষণা : 'একটি হাসপাতাল, একজন নৃবিজ্ঞানী, কয়েকটি ভাঙ্গা হাড়'
সাক্ষাৎকার : 'কথা পরম্পরা'
অনুবাদ : 'ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন এবং অন্যান্য অনুবাদ গল্প', 'ভাবনা ভাষান্তর'
সম্পাদনা : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডায়েরী'

আমার বই

প্রচ্ছদ : সেলিম আহমেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভা ষা ন্ত র স ম গ্র

ভাষান্তরিত গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Pathak Shamabesh
Since 1987

পাঠক সমাবেশ-এর বই

দেশ ও বিদেশে[illegible] উন্নয়ন, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, নারীর সমাজ-ইতিহাস, চলচ্চিত্র, থিয়েটার, সঙ্গীত, গণ-মাধ্যম, স্বাস্থ্য, সমকালীন বাংলাদেশ ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশনা ও পরিবেশনা।

~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তর সমগ্র

ভাষান্তরিত গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার

শাহাদুজ্জামান

Pathak Shamabesh
Since 1987

পাঠক সমাবেশ

[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

A PATHAK SHAMABESH BOOK

ভাষান্তরসমগ্র
শাহাদুজ্জামান

স্বত্ব ২০১৬ © শাহাদুজ্জামান
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
সাহিদুল ইসলাম বিজু
পা ঠ ক স মা বে শ
১৭ আজিজ মার্কেট (নীচতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০; ১/আই পরিবাগ (নীচতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৪৫৫৫, ই-মেইল pathak@bol-online.com

প্রচ্ছদ : সেলিম আহমেদ

বানান-সমন্বয়ক সেলিম আলফাজ

ডিজাইন ও অক্ষরবিন্যাস : পাঠক সমাবেশ ডিজাইন স্টুডিও
মুদ্রণ ও বাঁধাই কালচার প্রেস, ঢাকা

এই বইয়ের কোনো অংশ স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না; আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং ইত্যাদি এই আইনানুগ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

এই গ্রন্থে বিধৃত মতামত একান্তভাবে লেখকের নিজের, প্রকাশকের নয়।

BHASHANTARSAMAGRA
Shahaduz Zaman

Copyright 2016 © Shahaduzaman
First Published: January 2016
All Rights Reserved

Published in Bangladesh by
Shahidul Islam Bizu
PATHAK SHAMABESH
17 Aziz Market (G. F.), Shahbag, Dhaka 1000; 1/i Paribag (G. F.) Shahbag, Dhaka 1000
Tel: 88-02-9662766, 9664555, E-mail: pathak@bol-online.com
Website www.pathakshamabesh.com
Cover: Selim Ahmed
Spelling Coordinator : Selim Alfaz

Layout Design & Typesetting: Pathak Shamabesh Design Studio
Printed & Bound in Bangladesh by Culture Press, Dhaka

No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced in any form without the written consent of the author and the publisher.

The views expressed in this book are of the author alone and not of the publisher.

ISBN 978-984-91272-3-9

Outlet 1: PATHAK SHAMABESH, 17 Aziz Market, Ground Floor, Shahbag, Dhaka 1000 Tel: 9662766
Outlet 2: PATHAK SHAMABESH, 204/B Tejgaon Link Road, Gulshan, Dhaka 1209 Tel: 9861003
Outlet 3: PATHAK SHAMABESH, 1/i Paribag, Ground Floor, Shahbag, Dhaka 1000 Tel: 9664555
Outlet 4: PATHAK SHAMABESH Centre, Building-4, Bangladesh National Museum, 1st Floor, Shahbag, Dhaka 1000 Tel: 9669555

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

সাজ্জাদ শরীফ
প্রিয়জন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

ভাষান্তরিত গল্প ১৩-১১০

এডোয়ার্ড এবং ঈশ্বর ১৫
মিলান কুন্ডেরা

জানালা দিয়ে দেখা ৪৮
ওরহান পামুক

আর্নেস্টোর মা ৭৩
আবেলারদো কাস্তিলো

ঢেউয়ের সাথে আমার জীবন ৮১
অক্টাভিও পাজ

অন্ধ উইলো আর ঘুমিয়ে পড়া মেয়ে ৮৭
হারুকি মুরাকামি

ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন ১০৪
হারুকি মুরাকামি

ভাষান্তরিত প্রবন্ধ ১১১-৩৩২

আড়চোখে আমেরিকা ১১১
ভিনদেশি লেখকদের স্মৃতিতে আমেরিকা

নোবেল-বক্তৃতা ১৩৭
ভিস্লাভা শিমবোর্স্কা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নোবেল-বক্তৃতা ১৪৩
কেনজাবুরো ওয়ে

নয় এগারো ২০০১: আমেরিকার জন্য এক 'ডোজ' বাস্তবতা ১৫২
ডেরিক জেড জ্যাকসন

ইরাক আক্রমণ ২০০৩ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব বুশ ১৫৫
পাওলো কোয়েলহো

আক্রান্ত ইরাক আমাদের তেল ওদের বালুর নিচে কেন? ১৫৮
এদোয়ার্দো গালিয়ানো

ডায়েরি ১৬২
আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি

কলম্বাস অন্য চোখে ১৮৪
হাওয়ার্ড জিন

রাশিয়া ১৯২৭ ২০৪
কাজান জাকিস

যৌথ অবচেতনা ২২৮
কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং

লেখক-সমাজ সম্পর্ক ২৩৬
চিনুয়া আচেবে

চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ২৪৭
আর্নস্ট লিন্ডগ্রেন

সংগীতে সমাজচেতনা ২৫৯
আর্নস্ট ফিশার

শিল্পসাহিত্য এবং পুঁজিবাদ ২৭০
আর্নস্ট ফিশার

ভাষান্তরিত সাক্ষাৎকার ৩৩৩-৫৬০

হেনরিক ইবসেন ৩৩৫
একাকী, বিষণ্ণ; নীতিহীন খ্রিশ্চিয়ানা; 'নারী' প্রশ্ন;
সিফিলিস, মাতলামো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ৩৪২
অবচেতন বিশ্বের কলম্বাস অমরত্ব, মনঃসমীক্ষণ; যৌনতা, প্রেম; সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণ; স্ফিংসের ধাঁধা

পাবলো পিকাসো ৩৫৩
প্রহেলিকাময়; গোয়ের্নিকা, অন্যান্য; চিত্রকলা, রাজনীতি; আমেরিকান এবং ফরাসি চিত্রকলা

মিলান কুন্ডেরা ৩৬৩
অপসৃয়মাণ ব্যক্তিমানুষ; পৃথিবীর ফাঁদ; অস্তিত্বের সংকট; উপন্যাসের চরিত্র; উপন্যাস, রাজনীতি, ইতিহাস; অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অভিযাত্রী

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি ৩৮০
'বিখ্যাত শব'; প্রথম পরিচয়; চলচ্চিত্রে শব্দ; ভালো ছবি; মনের 'আলকেমি'; স্বপ্নের চলচ্চিত্রকার; অভিনেতাদের সঙ্গে; চলচ্চিত্র, রত্নদ্বীপ

জেমস ন্যাক্টওয়ে ৩৯৯
নরকে ভ্রমণ; আলোকচিত্রের নান্দনিকতা, সাংবাদিকতা না শিল্পকলা

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৪১১

প্রথম পর্ব
ছেলেবেলা, নানা রঙের দিন; যৌবন, দিনবদলের প্রস্তুতি; প্রথম আক্রমণ; বিপ্লব এবং তারপর; ধর্ম, অধ্যাত্মিকতা; জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্র; কিউবায় গণতন্ত্র; বিপ্লব রফতানি; বিদেশি ঋণ; চে গুয়েভারা

দ্বিতীয় পর্ব
ইতিহাস, অমরত্ব; সমাজতন্ত্রের পতন; স্ট্যালিন; পুনরায় চে; আমেরিকা; গণতন্ত্র; সাম্প্রতিক কিউবা; অস্তিত্বের সংগ্রাম; মানবাধিকার; পঠন-পাঠন; স্বপ্নজয়ের সংগ্রাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূ মি কা

আমার লেখালেখির শুরু অনুবাদের মাধ্যমে। আরও খানিকটা নিংড়ে পড়ার আশায় নানা বিষয়ের ইংরেজি লেখাপত্র একসময় ভাষান্তর করেছি বাংলায়। হয়তো অনুবাদের মাধ্যমে জগৎখ্যাত কোনো লেখকের আড়াল নেয়ায় নবীন লেখক হিসেবে একটা নিরাপত্তাবোধও কাজ করেছে তখন। পরবর্তীকালে নিজের মৌলিক লেখার তাগাদায় অনুবাদের প্রাথমিক সেই উৎসাহে ভাটা পড়েছে। তারপরও কথাসাহিত্যের নানা কাজের ফাঁকে অনুবাদও করেছি। কোনো পরিকল্পনামাফিক অনুবাদ করিনি, বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কোনো ইংরেজি লেখা দিয়ে তাড়িত হলে তা ভাষান্তর করেছি। কখনো প্রবন্ধ, কখনো গল্প, কখনো কারও সাক্ষাৎকার। ভাষান্তর করতে গিয়ে বরাবর চেষ্টা করেছি লেখাটাকে আমার নিজস্ব রচনাশৈলীর ছাঁচে নিয়ে আসতে আমার ভাষান্তরিত প্রবন্ধগুলো সংকলিত হয়েছে *ভাবনা ভাষান্তর* বইটাতে, গল্পগুলো *ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন* বইয়ে এবং সাক্ষাৎকারগুলো *কথা পরম্পরা* বইটাতে। এছাড়া অগ্রন্থিত কিছু ভাষান্তরিত লেখাও রয়েছে। অনুবাদের কাজগুলো করেছি ১৯৮২ থেকে ২০১০ সালের ভেতর

অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠানো একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, 'অনুবাদ মরা বাছুরের মূর্তি, তাতে আহ্বান নেই, ছলনা আছে।' এই বইয়ে বিভিন্ন সময় আমার সেইসব ছলনাপ্রয়াস একত্রিত করা হলো। অনুবাদ এবং ভাষান্তর শব্দ দুটা অদলবদল করে ব্যবহার করলেও ভাষান্তর শব্দটার প্রতি খানিকটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে আমার, ফলে বইটার নাম রইল *ভাষান্তরসমগ্র*। এই সমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পাঠক সমাবেশের স্বত্বাধিকারী সাহিদুল ইসলাম বিজুকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই ওয়াহিদুল হককে এ বইয়ের মুদ্রণের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য।

শাহাদুজ্জামান
জানুয়ারি ২০১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তরিত গল্প

এডোয়ার্ড এবং ঈশ্বর — ১৫
মিলান কুন্ডেরা

জানালা দিয়ে দেখা — ৪৮
ওরহান পামুক

আর্নেস্টোর মা — ৭৩
আবেলারদো কাস্তিলো

ঢেউয়ের সাথে আমার জীবন — ৮১
ওক্টাভিও পাজ

অন্ধ উইলো আর ঘুমিয়ে পড়া মেয়ে — ৮৭
হারুকি মুরাকামি

ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন — ১০৪
হারুকি মুরাকামি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এডোয়ার্ড এবং ঈশ্বর

▼

মিলান কুন্ডেরা

গল্পটা এডোয়ার্ডের বড়ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি থেকে শুরু করা যাক। বড়ভাই বিছানায় শুয়ে এডোয়ার্ডকে বলে—'বুড়ি ডাইনিটার সাথে গিয়ে একবার দেখা কর্। দ্যাখ্ কী বলে। ও তো একটা শুয়োর, অবশ্য শুয়োরের মাথাতেও কিছু ঘিলু থাকে। যে ব্যবহারটা সেসময় আমার সাথে সে করেছিল তার কথা ভেবে এখন কিছুটা অনুশোচনা হতেও পারে। তোকে উপকার করার সুযোগ পেলে হয়তো খুশিই হবে।'

এডোয়ার্ডের ভাইটি আছে আগের মতোই, সহজ, সরল আর অলস। বহু বছর আগে (এডোয়ার্ড তখন ছোট) তার এই ভাই ঠিক এভাবেই বিছানায় শুয়ে আর নাক ডেকে ঘুমিয়ে ইউনিভার্সিটির হলে কাটিয়ে দিয়েছিল সেই দিনটি যেদিন স্ট্যালিন মারা গেলেন। খবরটি জানতেই পারেনি সে। পরদিন যথারীতি ইউনিভার্সিটি গিয়ে দেখে তার সহপাঠিনী চেহাচকোভা হলরুমের ঠিক মাঝখানে স্থির মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ানক বিষণ্ণ মুখ তার। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে এডোয়ার্ডের ভাই চেহাচকোভার চারদিকে তিনবার চক্কর দিয়ে গলা ফাটিয়ে হাসতে শুরু করে। এডোয়ার্ডের ভাইয়ের হাসিটাকে একটি রাজনৈতিক উসকানি মনে করে তার সহপাঠিনী। কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখে এই মর্মে অভিযোগ করে অপমানিত মেয়েটি। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে। ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয় এডোয়ার্ডের ভাইকে এবং পাঠিয়ে দেয়া হয় গ্রামে। সেই থেকে এডোয়ার্ডের ভাই এই গ্রামেই দিন কাটাচ্ছে। অবশ্য ইতিমধ্যে সে এখানে একটা বাড়ি, একটা কুকুর, একজন স্ত্রী, দুটো সন্তান এমনকি নদীর ধারে একটা কটেজেরও মালিক হয়েছে।

~ www.amarboi.com ~

সেই গ্রামের বাড়িটিতেই বিছানায় শুয়ে সে কথা বলছে এডোয়ার্ডের সঙ্গে—'আমরা ওকে বলতাম চাবুক। লেবার পেটানোর চাবুক থাকে না সেই চাবুক আর কি! থাক ওসব শুনে তোর কাজ নাই। তুই শুধু ওর সাথে গিয়ে দেখা কর্। ওর তো এখন অনেক বয়সটয়স হয়েছে, তাতে অসুবিধা নাই। ওর আবার অল্পবয়সী ছেলেদের সাথে খাতির জমানোর একটা অভ্যাস আছে। তোর সুবিধাই হবে।'

তরুণ এডোয়ার্ড টিচার্স কলেজ থেকে সদ্য পাস করে বেরিয়েছে (যে ডিগ্রি তার ভাই শেষ করতে পারেনি)। একটা চাকরি খুঁজছে সে। ভাইয়ের কথামতো পরদিন সে সোজা চলে যায় ডিরেক্টরের অফিসে। দরজায় টোকা দেয়। ঘরে ঢুকে লম্বাটে, শুকনো একজন মহিলাকে দেখতে পায় সে। জিপসিদের মতো ঘন কালো তেল-চিকচিকে চুল, কালো চোখ আর নাকের নিচে একটি কালো আভা। ডিরেক্টারের কুৎসিত চেহারা নিমেষে এডোয়ার্ডের সব জড়তা কাটিয়ে দেয়, যে জড়তা কোনো সুন্দরী মহিলার সাথে আলাপ করতে গেলে বরাবর ভর করে তার উপর। এডোয়ার্ড বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে মহিলা ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ শুরু করে। এডোয়ার্ডের ব্যবহারে ডিরেক্টরও বেশ খুশি হয়েছেন বলে মনে হয়। তিনি বেশ কয়বার বলেন—'আমাদের এখানে তো আসলে আপনার মতো তরুণদেরই দরকার।' এডোয়ার্ডের জন্য তিনি একটা পোস্ট খুঁজে বের করবেন বলে কথা দেন।

২

এভাবেই ছোট এক চেক শহরে শিক্ষক হিসেবে শুরু হয় এডোয়ার্ডের চাকরিজীবন। তাতে সে যে খুব খুশি হয় তা বলা যাবে না আবার খুব যে অখুশি তাও নয়। আসলে এডোয়ার্ড তার জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারকে সবসময় সচেতনভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে থাকে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ অন্যটি গুরুত্বহীন। শিক্ষকতা ব্যাপারটিকে সে ফেলেছে গুরুত্বহীন ভাগে। আসলে শিক্ষকতা বিষয়টি যে সে গুরুত্বহীন মনে করে তা নয় (সে ভালো করেই জানে যে আর কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়)। কিন্তু তার স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে সে যখন ব্যাপারটিকে দেখে তখন শিক্ষকতাকে তার গুরুত্বহীনই মনে হয়। তার সবসময় মনে হয় সে আসলে স্বেচ্ছায় এ পেশা নির্বাচন করেনি। বরং নানা সামাজিক চাপ, পার্টি রেকর্ড, হাইস্কুলের সার্টিফিকেট এগুলোই যেন তার জন্য এ পেশা নির্বাচন করে দিয়েছে। বাইরের এসব শক্তিই একটির সঙ্গে আরেকটি মিলে সাঁড়াশির মতো তাকে তুলে এনে ফেলেছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (ক্রেনের সাঁড়াশি যেমন বস্তাগুলো ট্রাকের উপর ফেলে)। টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যাবার তেমন কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না (উপরন্তু বড়ভাইয়ের ব্যর্থতা তা'র মধ্যে একটি সংস্কারেরও জন্ম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল।) এডোয়ার্ড মনে মনে স্থির করে নিয়েছে যে এই পেশাটি তার জীবনে ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার হয়েই থাকবে। ধরে নিয়েছে অপটু অভিনেতার নকল দাড়ির মতোই হাস্যকরভাবে এই পেশাটি লেপ্টে থাকবে তার জীবনের সঙ্গে।

ফলে পেশাগত বিভিন্ন কাজকে এডোয়ার্ডের কাছে নেহাত গুরুত্বহীন (এবং হাস্যকর) মনে হতে থাকে। অচিরেই দেখা যায় এডোয়ার্ড বরং স্বেচ্ছায় পেশার বাইরের একটি কাজে বেশ মনোযোগী হয়ে উঠেছে। চাকরি শুরু করবার কিছুদিনের মধ্যেই ঐ শহরের একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এডোয়ার্ডের। মেয়েটিকে মনে ধরে তার এবং পরিচয়ের পর থেকে তাকে জয় করবার জন্য বেশ তৎপর হয়ে ওঠে সে। মেয়েটির নাম এলিস। আলাপ পরিচয়ের ক'দিনের মধ্যেই এডোয়ার্ড বেশ দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করে যে মেয়েটি একটু গম্ভীর আর ধার্মিক টাইপের।

বিকেলে পাশাপাশি হাঁটবার সময় এডোয়ার্ড চেষ্টা করে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরতে এবং পেছন থেকে ওর ডান স্তনের আশপাশটুকু একটু-আধটু স্পর্শ করতে। কিন্তু প্রতিবারই মেয়েটি ওর হাত সরিয়ে দেয়। একদিন মেয়েটির সঙ্গে হাঁটবার সময় এডোয়ার্ড তার ঐ বিশেষ নিরীক্ষাটি চালাবার চেষ্টা করছিল। যথারীতি সেদিনও মেয়েটি ওর হাত সরিয়ে দেয় এবং হঠাৎ এডোয়ার্ডের মুখোমুখি হয়ে তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

মুহূর্তে স্তনের কথা মন থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায় এডোয়ার্ডের। সচকিত হয়ে প্রশ্নটির তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করে এডোয়ার্ড। 'বিশ্বাস করো?' আবার প্রশ্ন করে এলিস। এডোয়ার্ড ভেবে পায় না কী উত্তর দেবে। এই নতুন শহরের নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে এখন বেচারা এডোয়ার্ডের একমাত্র অবলম্বন এই এলিস। এডোয়ার্ড বোঝে এই ছোট্ট প্রশ্নের উত্তরের ঝুঁকির উপর নির্ভর করছে এলিসকে পাওয়া-না-পাওয়ার ভবিষ্যৎ।

'তুমি করো?' এডোয়ার্ড বরং এলিসকে পাল্টা প্রশ্ন করে কৌশলে কিছুটা সময় নেয়। 'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি'—এলিস সরাসরি উত্তর দিয়ে আবার এডোয়ার্ডের কাছে তার প্রশ্নের উত্তর চায়।

সত্যি বলতে ঠিক এই মুহূর্তটির আগে এডোয়ার্ডের জীবনে আর কখনোই এভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবার প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু সেকথা তো আর এলিসকে বলা চলে না। এডোয়ার্ড ভাবে এ প্রসঙ্গটিকে তার এখন বরং একটি সুযোগ হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। ঈশ্বরবিশ্বাসকে তার এখন বরং ট্রোজান ঘোড়া ভেবে নেয়া উচিত যাতে সওয়ার হয়ে সে সোজা পৌঁছে যেতে পারে মেয়েটির হৃদয়ে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এডোয়ার্ডের পক্ষে আমি 'ঈশ্বর বিশ্বাস করি' একথা বলা খুবই দুরূহ একটা ব্যাপার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিথ্যা বলাটা এডোয়ার্ডের ঠিক আসে না। তবে তাকে যদি কখনো মিথ্যা বলতেই হয় তাহলে সে চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব সত্যের কাছাকাছি থাকতে। ফলে ভেবেচিন্তে শেষে এডোয়ার্ড এলিসের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বলে—'দ্যাখো এলিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী উত্তর তোমাকে দেব। নিশ্চয় আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি কিন্তু...' এডোয়ার্ড একটু থামে। এলিস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। এডোয়ার্ড বলে—' আচ্ছা, আমি কি তোমার কাছে সম্পূর্ণ খোলামেলা হতে পারি এলিস?'

'খোলামেলা তো তোমাকে হতেই হবে এডোয়ার্ড, নইলে আমাদের এই বন্ধুত্বের কোনো মানেই হয় না'—বলে এলিস।

'সত্যি বলছ?'

'অবশ্যই।'

এডোয়ার্ড গলার স্বর নামিয়ে বলে—'আসলে মাঝে মাঝে আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কি তিনি আছেন?'

এলিস প্রায় আঁতকে ওঠে—'কিন্তু কেন, কেন তোমার সন্দেহ বলো তো?'

এডোয়ার্ড নীরব থাকে কিছুক্ষণ। পরক্ষণেই একটা বেশ যুৎসই ভাবনা মাথায় আসে তার। সে বলে—'আসলে কি জানো? আমি যখন আমার চারপাশে এতসব অন্যায়, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা দেখি তখন ভাবি ঈশ্বর থাকলে কী করে এসব সম্ভব হয়? কী করে তিনি এসব অনুমোদন করেন?'

তার কণ্ঠে একটি করুণ ভাব। এলিস মমতার সঙ্গে এডোয়ার্ডের হাত চেপে ধরে বলে—'ঠিকই বলেছ এডোয়ার্ড, দুনিয়াজুড়ে শুধু অত্যাচার, অবিচার। আর সেজন্যই তো আমাদের আরো বেশি করে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা দরকার। তিনি আছেন বলেই তো আমাদের এই দুঃখ-যন্ত্রণার একটা অর্থ আছে।'

'হয়তো তুমিই ঠিক'—বিষণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয় এডোয়ার্ড।

এবং পরের রোববার সে এলিসের সঙ্গে চার্চে যায়। বুকে ক্রস আঁকে। সবার সঙ্গে মিলে চার্চ সংগীত গায়। গানের সুর একটু আধটু জানলেও কথা কোনোটিরই জানা নেই তার। ফলে নিজের মতো কিছু কথা জুড়ে দিয়ে প্রতি লাইনে সবার কয়েক সেকেন্ড পরে গাইতে শুরু করে এডোয়ার্ড। শুরুর দিকে অস্পষ্টভাবে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুরটির ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়ার পর এডোয়ার্ড গলা ছেড়ে গাইতে থাকে। এবং এই প্রথমবারের মতো সে আবিষ্কার করে যে তার বেশ ভালোই একটি গান গাইবার গলা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা শুরু হলে কয়েকজন বৃদ্ধা হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়েন। এডোয়ার্ডেরও ইচ্ছা হয় ঐ মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতে। হাতের চমৎকার ভঙ্গিতে সে আবার বুকে ক্রুস আঁকে। যে কাজ কোনোদিন করেনি তেমন একটি কাজ করলে যে অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়, এডোয়ার্ডের ঠিক তেমন একটি অনুভূতি হতে থাকে। নিজেকে বেশ মুক্ত লাগে তার।

চার্চ থেকে বেরিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে এলিস জিজ্ঞাসা করে—'এখনও কি তোমার মনে ঈশ্বরকে নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।'

এলিস বলে—'দেখে নিয়ো আমি তোমাকে আমার মতো করে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখাব।'

চার্চের প্রশস্ত সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। মনে মনে এডোয়ার্ডের হাসি পাচ্ছে খুব। দুর্ভাগ্য ঠিক সেসময় চার্চের সামনে দিয়ে হেঁটে যান এডোয়ার্ডের ইন্সটিটিউটের সেই পরিচালিকা। তিনি ওদের দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

৩

ব্যাপারটি খুব খারাপ হয়ে গেল। আমাদের মনে রাখা দরকার (বিশেষ করে যারা এই গল্পের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির দিকে লক্ষ রাখেননি) সেসময় চেক রাষ্ট্রে চার্চে যাওয়া ঠিক নিষেধ না হলেও চার্চে যাওয়াকে মোটেও ভালো চোখে দেখা হতো না। বিপদের ঝুঁকিও ছিল যথেষ্ট।

কারণটি খুব দুর্বোধ্য নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষালম্বনকারীরা বিপ্লবের শুরুর দিকে বুক চিতিয়ে বলতেন—'আমরাই সঠিক অবস্থানে আছি'। এরপর দশ-বারো বছর পেরিয়ে গেছে (এ গল্প শুরু হয়েছে যে সময়), ততদিনে বিপ্লবের ব্যাপারটিও বেশ ধোঁয়াটে হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে কোন্‌টা যে 'সঠিক অবস্থান' সেটাও হয়ে গেছে ধোঁয়াটে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবের পুরনো অগ্রযাত্রীরা মনে মনে প্রতারিত বোধ করছেন আর লড়াইয়ের একটি নতুন ক্ষেত্র খুঁজছেন। ভাগ্য ভালো যে ধর্ম-ব্যাপারটিকে পাওয়া গেছে। (শুরু হয়েছে নাস্তিক আর আস্তিকের লড়াই)। এবার ধর্মকে কেন্দ্র করে তারা আবার 'সঠিক অবস্থানে' দাঁড়িয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটি সুযোগ পেয়েছেন।

তবে সত্যি বলতে বিপ্লবীরা এই নতুন লড়াই শুরু করাতে কারো কারো উপকারও হয়েছে। বলে দিলে ক্ষতি নেই যে আমাদের গল্পের এলিস তেমনি একজন। ইন্সটিটিউটের পরিচালিকা যেমন সঠিক অবস্থানে দাঁড়াবার জন্য মরিয়া, এলিস তেমনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মরিয়া ঐ কথিত সঠিক অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়াবার জন্য। বিপ্লবের সময় এলিসের বাবা তার ব্যবসার মালিকানা হারিয়েছিলেন, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল। সেই থেকে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত সবার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এলিসের। কিন্তু এই ঘৃণাকে কীভাবে প্রকাশ করবে এলিস? প্রতিশোধ নেবার জন্য সে তো আর রাস্তায় একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না! এলিস তাই ঘৃণা প্রকাশের একটা বিকল্প পথ খুঁজে বের করেছে। মূলত বিপ্লবীদের উপর জেদ করেই সে খুব কঠোরভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

পরদিন স্টাফরুমে পরিচালিকার সঙ্গে দেখা হয় এডোয়ার্ডের। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সে। তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় এডোয়ার্ডের ভেতর যে সপ্রতিভ ভাব ছিল সে ভাব সে কিছুতেই আনতে পারে না। পরিচালিকা ঠোঁটে অস্বাভাবিক শীতল একটি হাসি নিয়ে এডোয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেন—'গতকাল বোধকরি আমাদের দেখা হলো, তাই না?'

'জি।'

পরিচালিকা বলেন—'আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম, ভাবছিলাম এ প্রজন্মের একজন তরুণ কী করে চার্চে যেতে পারে?'

এডোয়ার্ড অপ্রতিভভাবে তার কাঁধ ঝাঁকায়। পরিচালিকা ঝাঁকান তার মাথা—'আশ্চর্য, একজন তরুণ হয়ে!'

'আমি আসলে ক্যাথিড্রালের ভেতরের বারোক ডিজাইনগুলো দেখতে গিয়েছিলাম'—ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বলে এডোয়ার্ড।

'ও তাই নাকি!'—পরিচালিকার কণ্ঠে ব্যঙ্গ—'শিল্পকলার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ আছে তা তো জানতাম না।'

এডোয়ার্ড টের পায় আলাপটি তার জন্য সুখকর হচ্ছে না। সেই পুরনো দৃশ্যটি মনে পড়ে এডোয়ার্ডের, বড়ভাই সহপাঠিনীর চারিদিকে চক্কর দিচ্ছে আর হাসছে। তবে কি পারিবারিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে? ভয় লাগে এডোয়ার্ডের।

শনিবার এডোয়ার্ড এলিসকে ফোন করে ক্ষমা চেয়ে বলে তার ঠাণ্ডা লেগেছে ফলে রোববার তার পক্ষে চার্চে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রোববারের পর এলিসের সঙ্গে দেখা হলে সে এডোয়ার্ডকে বলে—'তুমি স্রেফ একটা ছিচকাঁদুনে, ঠাণ্ডা লাগল বলে...।' এডোয়ার্ড তখন তার নানা সমস্যার কথা, মেজাজি ডিরেক্টরের কথা গল্প করতে থাকে এলিসের কাছে (অবশ্য সবই বলে অস্পষ্টভাবে যাতে তার চার্চে না-যাবার আসল কারণ প্রকাশ হয়ে না পড়ে)।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এডোয়ার্ড চাইছিল এলিস ওকে একটু সান্ত্বনা দিক। কিন্তু এলিস জুড়ে দেয় অন্য গল্প— 'আমার মহিলা বসটা কিন্তু অতটা খারাপ না'। এডোয়ার্ড এলিসের উৎফুল্ল কণ্ঠ শুনতে শুনতে আরো বিষণ্ন হয়ে পড়ে।

৪

প্রিয় পাঠক, এডোয়ার্ডের জন্য সেসব বড় কষ্টের দিন। এলিসের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হচ্ছে, এলিসের দেহের কথা ভেবে উষ্ণ হয়ে উঠছে তার মন কিন্তু সেই দেহ যেন এডোয়ার্ডের স্পর্শাতীত। তাদের মিলিত হবার জায়গাগুলোও খুব সীমিত। হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা নয়তো সিনেমায় ঢোকা। জায়গা দুটো শাদামাটা, তাছাড়া এসব জায়গায় যৌনবিষয়ক কিছু ঘটাবার সুযোগও খুব সামান্য। এডোয়ার্ড ভাবে তাদের মিলিত হবার এই জায়গাগুলো বদলালে হয়তো এ ব্যাপারে তার সাফল্য আসতে পারে। একদিন বেশ একটা নতুন চিন্তা মাথায় এসেছে এমন ভাব করে এডোয়ার্ড বলে— 'চলো এক কাজ করি, আগামী উইকএন্ডে বড়ভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে ঘুরে আসি, সেখানে চমৎকার নদী, নদীর ধারে বন...' এডোয়ার্ড বেশ মগ্ন হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করতে থাকে। কিন্তু এলিস (অন্য ব্যাপারে খুব শাদাসিধা এবং অল্পে বিশ্বাসী হলেও) চট করে এডোয়ার্ডের আসল উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলে এবং সরাসরি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এডোয়ার্ডের মনে হয় যেন শুধু এলিস নয় এলিসের ঈশ্বর নিজহাতে বিতাড়িত করছে তাকে।

এলিসের এই ঈশ্বর বিয়ের বাইরে কোনোপ্রকার যৌনতা বরদাস্ত করেন না। বড় মজার এই ঈশ্বর। মূসার টেন কমান্ডমেন্টের নয়টির ব্যাপারে এলিসের কোনো সমস্যা নেই। না, তার পিতাকে হত্যা করবার কোনো ইচ্ছা এলিসের নেই, প্রতিবেশীর স্ত্রীকেও সে কামনা করে না। শুধু একটি কমান্ডমেন্ট নিয়ে তার মনের ভেতর ভয়। সেই বিখ্যাত সপ্তম কমান্ডমেন্ট— 'তোমরা ব্যভিচার করিয়ো না।' এলিস তাই সংকল্প করেছে সে যদি তার ধর্মীয় বিশ্বাসকে কঠোরভাবে পালন করতে চায় তাহলে এই বিশেষ বিধানটির ব্যাপারে তাকে খুব সজাগ থাকতে হবে। ফলে ঈশ্বর যথেষ্ট বোধগম্য এবং সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এলিস নিজের মতো করে একজন অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ঈশ্বর তৈরি করে নিয়েছে। একজন ব্যভিচার-বিরোধী ঈশ্বর।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কোন্ সীমানা থেকে ব্যভিচার শুরু হয়? দেখা যাচ্ছে সব মেয়েই নানারকম রহস্যময় শর্ত দিয়ে এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব একটি সীমানা তৈরি করে নেয়। এলিস তাকে চুমু খাবার অনুমোদন দিয়েছে এডোয়ার্ডকে, বেশ অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর এডোয়ার্ড তার স্তনে হাত রাখলে শেষপর্যন্ত এ ব্যাপারেও আপত্তি করেনি এলিস। কিন্তু

~ www.amarboi.com ~

ঠিক তার শরীরের মাঝ বরাবর, ধরা যাক তার নাভির নিচ থেকে এলিস একটা কড়া আপসহীন রেখা টেনে দিয়েছে। এই রেখার নিচ থেকেই তার নিষিদ্ধ এলাকা। ঈশ্বর সবসময় চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছেন শরীরের ঐ বিশেষ এলাকাটির দিকে।

এদিকে বেচারা এডোয়ার্ড খুব মনোযোগ দিয়ে বাইবেলসহ নানারকম ধর্মীয় বইপত্র পড়া শুরু করে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয় এলিসের অস্ত্র দিয়েই সে এলিসকে ঘায়েল করবে। এডোয়ার্ড বলে—'দ্যাখো এলিস, আমরা যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি তাহলে তো আর কিছুই নিষিদ্ধ থাকে না। যিশু তো চেয়েছিলেন আমরা সবাই শুধু ভালোবাসার শাসনে থাকি।'

'তা ঠিক'—এলিস বলে—'কিন্তু তুমি যে ভালোবাসার কথা ভাবছ এটা সে ভালোবাসা না।'

'ভালোবাসা তো একরকমই।'

'কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন এবং সেগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত।'

'তুমি যে ঈশ্বরের কথা বলছ সেটা ওল্ড টেস্টামেনের ঈশ্বর, ক্রিশ্চিয়ান ঈশ্বর না'—বেশ পণ্ডিতের মতো বলে এডোয়ার্ড।

'সেটা আবার কীরকম কথা, ঈশ্বর একজনই'—প্রতিবাদ করে বলে এলিস।

'তা ঠিক কিন্তু ওল্ড টেস্টামেনে ইহুদিরা ঈশ্বরকে আমাদের চেয়ে খানিকটা ভিন্নভাবে বুঝত এলিস। তাদের কাছে মানুষ ছিল ঈশ্বরের তৈরি করা কিছু নিয়মের দাস মাত্র। কিন্তু যিশু এসে মানুষের অন্তরকে গুরুত্ব দিলেন। তার কাছে এই নিয়মকানুনগুলোই শুধু বড় ব্যাপার ছিল না, তিনি বলেছিলেন—অন্তরে ভালোবাসা নিয়ে মানুষ যা করবে সেটাই ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল বলে বিবেচিত হবে। তাইতো সেন্ট পল বলেছিলেন—যার মন পবিত্র তার জন্য সবই পবিত্র।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন তো ওখানেই। আদৌ তোমার মন কি পবিত্র?'

'আরো দ্যাখো'—এডোয়ার্ড বলে চলে—'সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং যে কাজে তোমার আনন্দ হয় সেটা করো। কথাটা কি তুমি লক্ষ করেছ এলিস, এই যে বলা হচ্ছে ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং যে কাজে তোমার আনন্দ হয় সেটা করো?'

'কিন্তু কথা হচ্ছে যে কাজে তোমার আনন্দ হয় সে কাজে আমার আনন্দ নাও হতে পারে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এডোয়ার্ড টের পায় যে তার আধ্যাত্মিক সব যুক্তিতর্ক মাঠে মারা যাচ্ছে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আমি বুঝতে পাচ্ছি আসলে তুমি আমাকে মোটেও ভালোবাসো না।'

'খুব বাসি'—আদুরে গলায় বলে এলিস—'আর সেজন্যই তো এমন কিছু করতে চাই না যা আমাদের করা উচিত না।'

আগেই বলেছি এডোয়ার্ডের দুঃসময় চলছে তখন। এডোয়ার্ডের এই আকুতি শুধু দেহের জন্য আকুতি নয়। বরং এলিস যতই তার দেহকে এডোয়ার্ডের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, এডোয়ার্ড ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার হৃদয়ের জন্য। কিন্তু এলিসের দেহ এবং হৃদয় দুটোই বড় শীতল। দুটোই যেন স্বনির্ভর, পরিতৃপ্ত।

এলিসের এই শীতলতা ক্রমশই ক্ষুব্ধ করে তোলে এডোয়ার্ডকে। এলিসকে তার ঐ স্থবির বৃত্ত থেকে টেনে বের করে আনবার জন্য সুবোধ এডোয়ার্ড এবার চূড়ান্ত একটা কিছু করবার পরিকল্পনা আঁটতে থাকে। ঈশ্বরের বদনাম করে এলিসকে উত্তেজিত করা হবে ঝুঁকিপূর্ণ (যদিও ওতেই তার আকর্ষণ), এডোয়ার্ড বোঝে যে তাকে আসলে উল্টো কাজটিই করতে হবে (যা তার জন্য নিঃসন্দেহে হবে কঠিন)। তাকে এমন কিছু করতে হবে যা এলিসের পছন্দের। কিন্তু করতে হবে এত বেশি মাত্রায় যা এলিসকেই লজ্জায় ফেলে দেবে। ফলে এডোয়ার্ড সিদ্ধান্ত নেয় সে অতিমাত্রায় ধার্মিক হয়ে উঠবে। এরপর থেকে এডোয়ার্ড আর একদিনের জন্যও চার্চে যেতে ভুল করে না (কাজটা তার জন্য যতই অস্বস্তিকর হোক না কেন এলিসকে জয় করা তার জন্য এখন আরো বেশি জরুরি।) চার্চে গিয়ে সে খুবই ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে প্রার্থনা করে। মোজা ময়লা হবে ভেবে এলিস যখন দাঁড়িয়ে বুকে ক্রস আঁকে এডোয়ার্ড তখন অবলীলায় মেঝেতে হাঁটু মুড়ে ক্রস আঁকতে থাকে।

একদিন সুযোগ বুঝে এডোয়ার্ড এলিসকে বেশ একচোট কথা শোনায়—'বুঝলে এলিস, আমি লক্ষ করলাম আসলে তোমার ধর্মকর্মের মধ্যে তেমন কোনো আন্তরিকতা নাই। ভুলে যেয়ো না যিশু বলেছেন, শুধু প্রভু প্রভু বলে ডাকলেই স্বর্গে যাওয়া যায় না।' এডোয়ার্ড নানা কথায় বলবার চেষ্টা করে যে এলিসের ধর্মবিশ্বাস নেহাত আনুষ্ঠানিক, বাহ্যিক এবং সংকীর্ণ। আরো বলে—'সত্যি বলতে কি নিজেকে ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ নাই' (এলিস এধরনের কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটেও, সে মৃদু প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে)।

এলিসের সাথে তর্ক করবার একফাঁকে রাস্তার উল্টোদিকে এডোয়ার্ড একটি ক্রস দেখতে পায়। তাতে মরচে-ধরা একটি যিশুর মূর্তি। এডোয়ার্ড সেদিকে তাকিয়ে (এলিসের উদাসীনতার প্রতি প্রতিবাদস্বরূপ) কসরত করে এলিসের কোমর থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বেশ চোখে পড়ার মতো একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বুকে ক্রস আঁকে। এতে এলিসের কী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিক্রিয়া হলো সেটা দেখবার খুব লোভ হলেও এডোয়ার্ড সে সুযোগ পায় না। কারণ ঠিক তখনই দেখা যায় রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন এডোয়ার্ডের ইন্সটিটিউটের আরেকজন নারী ম্যানেজার। তিনি সরাসরি তাকিয়ে থাকেন এডোয়ার্ডের দিকে। এডোয়ার্ড ভাবে এবার বুঝি সব কুলই গেল।

৫

যে ভয় পাচ্ছিল এডোয়ার্ড তাই ঘটল শেষপর্যন্ত। দুদিন পর সেই ম্যানেজারটির সঙ্গে এডোয়ার্ডের দেখা হয় ইন্সটিটিউটের করিডোরে। তিনি গলার স্বর বেশ উঁচু করে এডোয়ার্ডকে জানান, আগামীকাল বেলা বারোটার সময় তাকে ডিরেক্টরের রুমে উপস্থিত থাকতে হবে। 'কমরেড, আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে।'

বেশ ভয় পায় এডোয়ার্ড। বিকেলে এলিসের সঙ্গে হাঁটবার সময় তার সাথে কোনো বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করবার আগ্রহ হয় না এডোয়ার্ডের। খুবই হতাশ লাগে তার। তার ভেতরের উদ্বিগ্নতার কথা এলিসকে খুলে বলবার ইচ্ছা হয় খুব কিন্তু সাহস হয় না। এডোয়ার্ড ভালো করেই জানে যে তার এই অপ্রিয় (যদিও অপরিহার্য) চাকরিটি ঠিক রাখবার জন্য কাল সকাল থেকেই অবলীলায় সে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারে। সুতরাং এডোয়ার্ড সিদ্ধান্ত নেয় তার নামে যে সমন জারি হয়েছে এব্যাপারে আপাতত চুপ থাকাই ভালো। এলিসের সাথে পুরো সময় তার অস্বস্তিতে কাটে। পরদিন সে ম্লান, উদ্বিগ্ন মুখে ঢোকে ডিরেক্টরের রুমে।

ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করছেন চারজন বিচারক। পরিচালিকা, সেই মহিলা ম্যানেজার, এডোয়ার্ডের একজন সহকর্মী শিক্ষক (চশমা চোখে, বেঁটে খাটো) এবং একজন অপরিচিত (পাকাচুল) ভদ্রলোক—বাকিরা যাকে কমরেড ইন্সপেক্টর বলে সম্বোধন করছেন। পরিচালিকা এডোয়ার্ডকে চেয়ারে বসতে বলেন। এরপর বলেন—'আমরা আপনাকে একটা ঘরোয়া বন্ধুত্বপুর্ণ আলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আসলে আমরা আপনার পেশাগত জীবনের বাইরের কিছু ব্যাপার নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।'

এইটুকু বলে তিনি ইন্সপেক্টরের দিকে তাকান। ইন্সপেক্টর সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন। তারপর পরিচালিকা তাকান চশমাধারী শিক্ষকটির দিকে। সেই শিক্ষক এতক্ষণ একাগ্রভাবে পরিচালিকার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলেন। পরিচালিকার দৃষ্টির সমর্থন পেয়ে এবার তিনি তার গলায় আটকে থাকা বক্তৃতাটি উগরে দিতে শুরু করেন—'আমাদের এই দেশ একটি সুস্থ সংস্কারমুক্ত তরুণ সমাজ গড়ে তুলবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সেখানে সকলের বোঝা উচিত যে আমাদের (অর্থাৎ শিক্ষকদের)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দায়িত্ব কতটা অপরিসীম। শিক্ষকরাই তো তরুণদের সঠিক পথ দেখাবেন। আমরা মনে করি ধর্মভীরু একজন শিক্ষকের পক্ষে কিছুতেই এই গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।' এভাবে একটি দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে তার গভীর চিন্তার কথা ব্যক্ত করেন সেই শিক্ষক এবং পরিশেষে ঘোষণা করেন যে এক্ষেত্রে এডোয়ার্ডের আচরণ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অপমানজনক।

পরিচালিকার ঘরে ঢুকবার আগে এডোয়ার্ড ভেবেছিল তার এই ধর্মচর্চার সাম্প্রতিক ব্যাপারটিকে সে পুরোপুরি অস্বীকার করবে। খোলাখুলিভাবে বলবে যে তার এই চার্চে যাওয়া, ক্রস আঁকা স্রেফ মজা করা ছাড়া কিছুই না। কিন্তু পরিচালিকার ঘরের পুরো পরিবেশটি দেখে এডোয়ার্ডের মনে হয় এখন তার পক্ষে কিছুতেই আর একথা বলা সম্ভব হবে না। পুরো ব্যাপারটিই যে খুব তুচ্ছ এবং হাস্যকর, এই গম্ভীর এবং উত্তেজিত চারজনের সামনে এখন একথা বলা অসম্ভব। এ পরিস্থিতির মধ্যে এডোয়ার্ড যদি সত্যি কথাটা বলে তাহলে মনে হবে সে মশকরা করছে। এডোয়ার্ড বোঝে যে এ চারজনই চাইছেন সে যেন তার ঈশ্বরবিশ্বাসের পক্ষে নানারকম যুক্তি দেখায়, যে যুক্তিগুলো খণ্ডন করবার জন্য তারা আগেভাগেই বেশ প্রস্তুত হয়ে আছেন। এডোয়ার্ড ভাবে (খুব দ্রুত, কারণ ভাববার জন্য খুব বেশি সময় তার হাতে নেই) এ মুহূর্তে তাকে সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে অর্থাৎ এই চারজন তার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছেন এডোয়ার্ডের উচিত হবে সেই ধারণার সাথে খাপ খাইয়ে কিছু একটা বলা। তার সম্পর্কে এই চারজনের ধারণাকে বদলাতে এদের বর্তমান ধারণার উপরেই আপাতত ভিত্তি করতে হবে। চারজনের বর্তমান ধারণাটিকে নিয়েই আরো কিছুক্ষণ খেলতে হবে এডোয়ার্ডকে। ফলে এডোয়ার্ড বলে—'কমরেড আমি কি আপনাদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই'—পরিচালিকা বলেন—'সেজন্যই তো আপনাকে এখানে ডাকা।'

'কিন্তু তাতে আপনারা মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন।'

'আপনার কী বলবার আছে সেটা বলুন'—বলেন পরিচালিকা।

'ধন্যবাদ, তাহলে আমি অকপটেই আপনাদের কাছে স্বীকার করতে চাই যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।'

এডোয়ার্ড লক্ষ করে তার এই উত্তরে উপস্থিত বিচারকরা বেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। শুধু সেই ম্যানেজারটি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন—'আজ এই যুগে কমরেড, আজ এই যুগে আপনি এমন কথা বলছেন?'

'আমি জানি সত্য বললে আপনারা মনঃক্ষুণ্ন হবেন। কিন্তু আমি তো মিথ্যা বলতে পারব না। আমাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করবেন না প্লিজ'—এডোয়ার্ড বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচালিকা তখন নম্রভাবে বলেন—'না, না, এডোয়ার্ড আপনি মিথ্যা বলুন সেটা আমরা কেউ চাই না। আপনি যে সত্য বললেন সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু দয়া করে বলবেন কি, এযুগের একজন তরুণ হয়ে কী করে, কী কারণে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?'

চশমাধারী শিক্ষকটি তার উত্তেজনা আর চেপে রাখতে না পেরে এর সাথে যোগ করেন—'এমন একটা যুগে যখন আমরা কিনা চাঁদে পৌঁছে গেছি।'

'কিন্তু আমি কী করব বলুন, আমি তো আসলে তাকে বিশ্বাস করতে চাই না'—বলে এডোয়ার্ড।

'তার মানেটা কি, আপনি বিশ্বাস করেন অথচ বলছেন বিশ্বাস করতে চান না।'—পাকাচুল ভদ্রলোক এবার কথোপকথনে যোগ দেন।

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করতে চাই না কিন্তু বিশ্বাস করি'—শান্তকণ্ঠে বলে এডোয়ার্ড।

চশমাধারী চারদিক তাকিয়ে হেসে বলে ওঠেন—'কিন্তু আপনি তো একটা চরম স্ববিরোধী কথা বলছেন।'

'দেখুন কমরেড ব্যাপারটা যা আমি তাই বলছি'—বলে এডোয়ার্ড—'আমি জানি ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদের বাস্তব থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। ঈশ্বরের হাতেই যদি সব নির্ভর করে তাহলে আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই বা কী দরকার ছিল। কোনো কাজ না করে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকলেই তো হতো।'

'খুবই ঠিক বলেছেন'—বলেন পরিচালিকা।

'তাছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজো কেউ প্রমাণ করতে পারেনি'—চশমাধারী শিক্ষক বলেন।

'এবং এও ঠিক যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে মানুষ যখন তার নিজের ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নিয়েছে তখন থেকেই শুরু হয়েছে সভ্যতার উত্তরণ'—তাদের কথার সাথে যোগ দিয়ে বলে এডোয়ার্ড।

'ঈশ্বরবিশ্বাস জন্ম দেয় নিয়তিবাদের'—বলেন পরিচালিকা।

'এবং ঈশ্বর বিশ্বাস একটা মধ্যযুগীয় ব্যাপার'—আবারো যোগ করে এডোয়ার্ড।

এরপর পরিচালিকা আবার কিছু একটা বলেন, পরিচালিকার পর চশমাধারী শিক্ষক কিছু বলেন, মাঝে এডোয়ার্ড কিছু যোগ করে, সেইসাথে ইন্সপেক্টরও কিছু বক্তব্য রাখেন। এভাবে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস যে কোনোভাবেই কাম্য নয় এবিষয়ে এডোয়ার্ডসহ তারা সবাই একমত প্রকাশ করতে থাকেন। এই যুক্তিমালা তখনই থামে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন চশমাধারী শিক্ষক সবাইকে সচকিত করে এডোয়ার্ডকে ধমক দিয়ে বলেন—'এত কিছুই যদি বোঝেন তাহলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুকে ক্রস আঁকছিলেন কেন?'

'কারণ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি'—বলে এডোয়ার্ড।

'আপনি কিন্তু আবার স্ববিরোধী কথা বলছেন'—বেশ মজা পেয়েছেন এমন ভঙ্গিতে বলেন চশমাধারী শিক্ষকটি।

'হ্যাঁ'—এডোয়ার্ড স্বীকার করে নিয়ে বলেন—"হ্যাঁ বলছি। কারণ জ্ঞান আর বিশ্বাসের মধ্যে একটা স্ববিরোধ আছে। আমি জানি ঈশ্বরবিশ্বাস আমাদের দুর্বল করে দেয়। আমি জানি ঈশ্বর যদি না থাকতেন তাহলে ভালো হতো। কিন্তু আমি যখন এখানে তাকাই (এডোয়ার্ড আঙুল দিয়ে নিজের বুকের দিকে দেখায়) আমি অনুভব করি যে তিনি আছেন। দেখুন কমরেড ব্যাপারটা ঠিক যেমন আমি সেভাবেই বলছি। আমি সত্য বলতে চাই। আমি ভণ্ডামি করতে চাই না। আমি চাই আমি ঠিক যেমন সেভাবেই আপনারা আমাকে জানুন, গ্রহণ করুন।"

বেঁটে শিক্ষকের মগজও বেঁটেই। সে জানে না একজন কঠোর বিপ্লবীও জোর করে কাউকে দলে ভেড়াবার পক্ষপাতী নয়। সে জানে না যে কারো চিন্তা শুধরাবার সুযোগ থাকলে বিপ্লবীরা বরং সে পথটাই বেছে নেয়। এ শিক্ষক রাতারাতি বিপ্লবী বনে যাওয়া দলেরই একজন। তাছাড়া পরিচালিকা বস্তুতপক্ষে তাকে তেমন পছন্দও করেন না। আর বিশেষ করে এ মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে না যে পরিচালিকার কাছে তার চাইতেও এডোয়ার্ডের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ এডোয়ার্ড নিজেকে বিচারকদের সামনে এমন একটি কেস হিসেবে উপস্থিত করেছে যা জটিল অথচ যাকে নতুন করে তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। আর যেহেতু ব্যাপারটা চশমাধারীর মাথায় ঢুকছে না ফলে সে ক্রমাগত আরো তীব্রভাবে এডোয়ার্ডকে আক্রমণ করতে থাকে। শেষে এই শিক্ষক ঘোষণা করেন, যে লোক তার মধ্যযুগীয় বিশ্বাস বদলাতে পারে না তার উচিত এই আধুনিক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া।

পরিচালিকা চশমাধারী শিক্ষককে তার বক্তৃতা শেষ করার সুযোগ দেন এবং তারপর তার দিকে খানিকটা উষ্মা নিয়ে বলেন—'দেখুন এই কমরেড আমাদের কাছে সবকিছু খোলামেলাভাবে বলেছেন সেজন্য তাকে আমাদের সম্মান জানানো উচিত।' এরপর তিনি এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন—'তবে উনি যা বলেছেন সেটাও সত্য। একজন ধর্মভীরু মানুষের পক্ষে আজকের তরুণ সমাজের শিক্ষক হওয়া মানায় না। আপনার কী ধারণা জ[illegible]'

'আমি আসলে জা[illegible]রেড[illegible]কিছু[illegible]উত্তর[illegible]র্ড।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাকাচুল ইন্সপেক্টর এবার বলে ওঠেন—'আসলে কি জানেন, ঠিক এভাবেই শুধু শ্রেণিতে শ্রেণিতে নয়, নতুন আর পুরাতনের দ্বন্দ্ব একজন ব্যক্তি-মানুষের ভেতরও ঘটে থাকে। যেমনটি ঘটছে আমাদের এই কমরেডের বেলায়। যুক্তি দিয়ে একটি ব্যাপার তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করছেন কিন্তু আবেগের কারণে তিনি সেখানে পৌঁছতে পারছেন না। আমাদের উচিত এই কমরেডকে সাহায্য করা যাতে তার যুক্তিবাদী মন আরো জোরদার হয়ে ওঠে।'

পরিচালিকা সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন এবং বলেন—'এখন থেকে আমি নিজে এই কমরেডের ব্যাপারটা দেখব।'

৬

সমূহ একটি বিপদ থেকে আপাতত রক্ষা পেয়ে যায় এডোয়ার্ড। তার চাকরির ভাগ্যটি এখন নির্ভর করছে পুরোপুরি পরিচালিকার উপর। মনে মনে এডোয়ার্ড অবশ্য এতে খুশিই হয়। তার মনে পড়ে বড়ভাই বলেছিলেন মাঝবয়সী এই পরিচালিকার তরুণদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে। মনে তারুণ্যের আত্মপ্রত্যয় জাগে এডোয়ার্ডের। সে ভাবে এ খেলায় তাকে জিততে হলে এবার তার এই বিচারকের মন জয় করতে হবে একজন পুরুষ হিসেবে।

কথামতো ক'দিন পর এডোয়ার্ড হাজির হয় পরিচালিকার অফিসে। আলাপে এডোয়ার্ড একটি হালকা মেজাজ বজায় রাখবার চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই কথার ফাঁকে সে দু'একটি অন্তরঙ্গ মন্তব্য করে বা কায়দা করে সূক্ষ্ম কোনো তোষামোদ জুড়ে দেয়। পাশাপাশি খুব সতর্কভাবে হেঁয়ালি করে, পুরুষ হয়ে এভাবে একজন মহিলার হাতে বন্দি হবার ব্যাপারটি নিয়ে মজা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু আলাপের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করেন পরিচালিকা। তিনি এডোয়ার্ডের সাথে খুব অমায়িক কিন্তু অত্যন্ত সংযতভাবে কথা বলেন। তিনি জানতে চান, কী ধরনের বই এডোয়ার্ডের পছন্দ। এরপর তিনি কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করে এডোয়ার্ডকে সেগুলো পড়তে বলেন। এভাবেই এডোয়ার্ডের চিন্তাশোধনের প্রাথমিক কাজটি শুরু করেন পরিচালিকা। আলাপ শেষে তিনি এডোয়ার্ডকে তার বাসায় আসবার আমন্ত্রণ জানান।

পরিচালিকার গাম্ভীর্যে এডোয়ার্ড বেশ ঘাবড়ে যায়। পরদিন এডোয়ার্ড নেহাত নিরীহ সুবোধ এক বালকের মতো হাজির হয় পরিচালিকার ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে। কোনোরকম পৌরুষের চমক দিয়ে পরিচালিকাকে বশ করবার চিন্তাভাবনা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচালিকা এডোয়ার্ডকে একটি চেয়ারে বসতে বলে খোশমেজাজে জিজ্ঞাসা করেন—'কফি চলবে?' এডোয়ার্ড 'না' বলে। 'তাহলে অন্য কোনো ড্রিঙ্কস?' এডোয়ার্ড খানিকটা বিব্রত হয়ে বলে—'আপনার কাছে যদি কোনিয়াক থাকে...' কিন্তু পরমুহূর্তেই ভয় হয় এডোয়ার্ডের। সে কি একটু বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠছে? পরিচালিকা অমায়িকভাবে বলেন—'দুঃখিত কোনিয়াক তো নেই, ওয়াইন আছে।' তিনি উঠে গিয়ে একটি ওয়াইনের বোতল নিয়ে আসেন। দুটো পেয়ালা ভরবার মতো যথেষ্ট পানীয় তাতে আছে।

শুরুতেই পরিচালিকা বলেন, এডোয়ার্ড যেন তাকে একজন তদন্তকারী ভেবে কথা না বলে। তিনি আরো বলেন—'শিক্ষক হিসেবে এডোয়ার্ড যোগ্য কি যোগ্য নয় সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, তিনি মনে করেন নিজের বিশ্বাস প্রকাশ্যে বলবার অধিকার সবার আছে।' বলেন—এ ব্যাপারে পরিষ্কার হবার জন্যই আসলে এই আলাপের ব্যবস্থা করেছেন তিনি (যদিও এভাবে সমন জারি করা তাদেরও বিশেষ পছন্দ হয়নি)। তারা (বিশেষ করে তিনি এবং ইন্সপেক্টর) এডোয়ার্ডের খোলামেলা স্বীকারোক্তিতে খুশিই হয়েছেন। পরিচালিকা আরো জানান, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এডোয়ার্ড প্রসঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এডোয়ার্ড যাতে তার চিন্তাকে আরো সুবিন্যস্ত করতে পারে এ ব্যাপারে এখন থেকে পরিচালিকা তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করবেন এবং ছ'মাস পর সবার সাথে আবার তার একটা মিটিং হবে। পরিচালিকা আবারো জোর দিয়ে বলেন, তিনি মোটেও কোনো তদন্তকারী নন, তিনি শুধু একজন বন্ধুর মতো এডোয়ার্ডের ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে সাহায্য করতে চান মাত্র। এরপর তিনি সেই চশমাধারী শিক্ষকের কথা টেনে আনেন। বলেন, 'ও আসলে একটা ধুরন্ধর লোক। ভিতরে একরকম, বাইরে আরেক। সবসময় ওত পেতে থাকে কীভাবে আরেকজনকে কাবু করা যায়।' আরো বলেন—'আর ঐ ম্যানেজারের কথা কী বলব, সে তো সবজায়গায় আপনার বদনাম করে বেড়িয়েছে। সবাইকে বলেছে, আপনি খুব উদ্ধত আর গোঁয়ার, নিজের মতামতের ব্যাপারে অবিবেচকের মতো একরোখা। তারা তো আপনাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিল। আমি অবশ্য এর বিরোধিতা করেছি। তবে সত্যি বলতে কি, যে লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রস আঁকে তাকে যদি দেখি আমার স্কুলের ছেলেদের পড়াচ্ছে, তাতে আমিও খুশি হব না মোটে।'

এভাবে একটানা বেশ কয়েকটি বাক্য বলে পরিচালিকা বুঝিয়ে দেন যে তিনি একাধারে যেমন এডোয়ার্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল তেমনি আদর্শের প্রশ্নেও কঠোর। তাদের এই আলাপ যে সত্যিই বন্ধুত্বপুর্ণ সেটি প্রমাণ করবার জন্য এবার পরিচালিকা কথার প্রসঙ্গ পাল্টান। তিনি এডোয়ার্ডকে তার বুকশেলফের কাছে নিয়ে যান। রোনাল্ডের 'মুগ্ধ হৃদয়' বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তিনি। এডোয়ার্ড যে বইটি পড়েনি এজন্য তাকে মৃদু বকুনিও দেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একপর্যায়ে তিনি এডোয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেন—'স্কুলে পড়াতে কেমন লাগছে আপনার।'

এডোয়ার্ড সংক্ষেপে বলে—'ভালোই।'

এরপর পরিচালিকা নিজের সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, পরিচালিকা তার আজকের এই অবস্থানের জন্য নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করেন। তার এই কাজটি তিনি ভালোবাসেন এবং তার মেধা যে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজে লাগছে এটি ভেবে তার আনন্দ হয়। তাছাড়া এই পেশার কারণেই তিনি বরাবর তরুণদের সংস্পর্শে থাকবার সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যতের সাথে একটি ধারাবাহিক এবং বাস্তব সংযোগ রক্ষা করতে পারছেন। তিনি বিশ্বাস করেন তার জীবনের নানা যন্ত্রণাময় সংগ্রামের মুল্যায়ন হবে ভবিষ্যতেই। পরিশেষে পরিচালিকা বলেন—'আমি যে শুধু আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করেই দিন কাটাচ্ছি না সেটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।'

কথাগুলো পরিচালিকার একান্ত মনের কথা নাকি দেশে প্রচলিত গৎবাঁধা আদর্শিক বুলি সেটা ঠিক বোঝা যায় না। ব্যাপারটি নিশ্চিত হবার জন্য এডোয়ার্ড প্রসঙ্গটিকে খানিকটা ব্যক্তিগত দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করে। সে বেশ নিচু এবং সতর্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—'তারপরও ধরুন সবার একটা ব্যক্তিগত জীবনও তো থাকে, ধারণা করছি আপনারও নিশ্চয় আছে।'

'আমার ব্যক্তিগত জীবন?'—এডোয়ার্ডের প্রশ্নটিকেই পুনরাবৃত্তি করেন পরিচালিকা।

'আপনার সেই ব্যক্তিগত জীবনটিও নিশ্চয় খুব আনন্দের?'—বলে এডোয়ার্ড।

পরিচালিকার মুখে একটি ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এডোয়ার্ডের কেমন যেন মায়া হয়। পরিচালিকা মহিলাটি দুঃখজনকভাবে অসুন্দর। তার লম্বাটে মুখের উপর কালো চুলের ছায়া পড়েছে, নাকের নিচে স্পষ্ট হয়ে আছে গোঁফের মতো একটি কালো রেখা। এডোয়ার্ডের মনে হয় সে যেন পরিচালিকার সারাজীবনের বেদনাটিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। এডোয়ার্ড উপলব্ধি করে পরিচালিকার জিপসি মুখের আড়ালে একটি গভীর আবেগ লুকিয়ে আছে। তার মনে হয় পরিচালিকার কুৎসিত রূপ বস্তুত সেই আবেগ প্রকাশের ব্যর্থতাকেই প্রকাশ করছে যেন বা। এডোয়ার্ডের চোখে ভাসে স্ট্যালিনের মৃত্যুতে কত আবেগেই না দুঃখের এক জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এই পরিচালিকা, কত আবেগে একসময় এসে বসতেন অগণিত রাজনৈতিক সভার শেষ সারিটিতে, কত আবেগে তিনি যুদ্ধ করেছেন বেচারা যিশুর সঙ্গে। এডোয়ার্ডের মনে হয় এসবই ছিল পরিচালিকার সেই আবেগ নির্গমনের করুণ এক-একটি পথ মাত্র, যে আবেগ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাশিত পথে প্রবাহিত হতে না পেরে বিপথগামী হয়েছে এইসব কর্মকাণ্ডে। এডোয়ার্ড নেহাতই তরুণ এবং তার সমবেদনার ঝুলিটি তখনও শূন্য হয়ে যায়নি। ফলে পরিচালিকার জন্য এডোয়ার্ডের মনে সহানুভূতি জাগে।

একপর্যায়ে সচকিত হয়ে ওঠেন পরিচালিকা। অনিচ্ছাকৃত এই দীর্ঘ নীরবতার জন্য খানিকটা লজ্জিত হন। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—'আসলে কি জানেন এডোয়ার্ড, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন খুব বড় কোনো ব্যাপার নয়। মানুষ পৃথিবীতে তো শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচে না, বাঁচে আরো অনেক কিছুর জন্য।'

তিনি এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে এবং জিজ্ঞাসা করেন—'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিসের জন্য? কিসের জন্য মানুষ বাঁচে? বাস্তব কিছুর জন্য না অলীক কিছুর জন্য। সত্যিকার অর্থে ঈশ্বর ব্যাপারটি একটা চমৎকার কল্পনা, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এদেশের মানুষের ভবিষ্যৎ। আমি বাস্তবতার জন্য বাঁচতে চাই। আমার জীবন আমি উৎসর্গ করেছি কল্পনা নয়, বাস্তবের জন্য।'

পরিচালিকার কথায় এমন একটি অঙ্গীকারের ভাব ফুটে ওঠে যে আবারও এডোয়ার্ডের মায়া হয় তার জন্য। এডোয়ার্ডের হঠাৎ মনে হয় এ মহিলাটির সঙ্গে এভাবে মিথ্যা বলাটা ঠিক হচ্ছে না। সে ভাবে ঘনিষ্ঠ আলাপের এই মোক্ষম সময়টিতে তার ঐ ফালতু (যদিও জটিল) ঈশ্বরবিশ্বাসের ভানটিকে ছুড়ে ফেলে দেয়া দরকার। ফলে সে বলে—'আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। আমিও সত্যি বলতে বাস্তবেরই পক্ষে। আমার এই ধর্মচর্চার ব্যাপারটাকে আসলে এত গুরুত্বের সাথে নেয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই এডোয়ার্ড বুঝতে পারে আবেগের বশে চট করে কিছু একটা বলে ফেলার পরিণতি ভালো নয়। এডোয়ার্ডের কথা শুনে পরিচালিকা বেশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকান এবং শীতল কণ্ঠে বলেন—'দেখুন ভান করবার চেষ্টা করবেন না। সত্য কথা বলার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই আপনাকে সেদিন ভালো লেগেছিল অথচ এখন আবার আপনি যা নন সেটা হবার ভান করছেন।'

বোঝা যাচ্ছে শুরুতেই এডোয়ার্ড নিজের গায়ে ধর্মের যে পোশাক পরিয়েছে এত সহজে তা সে খুলতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—'না, আমি কিন্তু মোটেও ভান করছি না। আমি যে ঈশ্বরবিশ্বাস করি সেকথা আমি অস্বীকার করছি না। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আমিও মানবতার ভবিষ্যৎ, প্রগতি এসবে বিশ্বাস করি। তাই যদি বিশ্বাস না করতাম তাহলে কীজন্যই বা এই শিক্ষকতার পেশায় আছি, কী অর্থ আমার এই জীবনের, যে শিশুদের জন্য হচ্ছে প্রতিদিন কী অর্থ এর। আমি ভেবে দেখেছি সমাজ আরো সভ্য আরো উন্নত হোক ঈশ্বরও তাই চান। আমার ধারণা একজন মানুষ একই সাথে ঈশ্বর এবং সমাজতন্ত্র দুটোতেই বিশ্বাস করতে পারে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'না'—পরিচালিকা মাতৃত্বসুলভ হাসি দিয়ে বলেন—'এদুটোকে কখনোই একসাথে বিশ্বাস করা যায় না।'

'আমি অবশ্য তা জানি। আমার কথায় রাগ করবেন না প্লিজ'—এডোয়ার্ড বলে।

'না, রাগ আমি করছি না। আপনার বয়স কম। আপনার বিশ্বাসের ব্যাপারে আপনি অনমনীয় থাকবেন এ বয়সে এটাই স্বাভাবিক। দেখুন আমি আপনাকে যেভাবে বুঝি অন্যরা সেভাবে আপনাকে বোঝে না। আমিও তো একদিন আপনার মতো তরুণ ছিলাম। তারুণ্যের স্বভাব আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে।'

অবশেষে ব্যাপারটি ঘটে। আগে নয়, পরেও নয়। ঠিক এই মুহূর্তে। এটা স্পষ্ট যে এখানে এডোয়ার্ডের কোনো প্ররোচনা নেই, সে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র মাত্র। পরিচালিকা যখন বললেন তিনি এডোয়ার্ডকে পছন্দ করেন এডোয়ার্ডও উত্তরে ভাবাবেগকে যথেষ্ট সংযত করে বলে—'আমারও কিন্তু আপনাকে ভালো লাগে।'

'তাই নাকি?'

'জি।'

'ও আচ্ছা, তা কখনো তো—তাছাড়া আমার বয়স টয়স হয়েছে'—আপত্তির সুরে বলেন পরিচালিকা।

'না, না সেটা ঠিক না'—বলে এডোয়ার্ড।

'ঠিক না মানে?'—বলেন পরিচালিকা।

'আপনার মোটেও তেমন কোনো বয়স হয়নি। ওটা আপনার একটা বাজে ধারণা'—এডোয়ার্ডকে বলতে হয়।

'আপনার কি তাই মনে হয়?'

'সত্যি বলতে কি, আপনাকে খুবই পছন্দ আমার।'

'মিথ্যা কথা বলবেন না কিন্তু। জানেন তো মিথ্যা বলা আপনার বারণ।'

'না, আমি মিথ্যা বলছি না। আপনি সত্যি সুন্দরী।'

'সুন্দরী?'—কথাটা মোটেও বিশ্বাস হলো না এমন একটি ভাব করলেন পরিচালিকা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই সুন্দরী'—এডোয়ার্ড বলে এবং তার এই অবিশ্বাস্য ঘোষণাকে বহাল রাখবার জন্য কষ্ট করে [illegible]—'কালো চুলের মেয়েদের দারুণ লাগে আমার, যেমন আপ[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কালো চুলের মেয়েদের আপনি পছন্দ করেন?'—জিজ্ঞাসা করেন পরিচালিকা।

'ভীষণ'—বলে এডোয়ার্ড।

'কিন্তু কই এতদিন স্কুলে আছেন, একদিনও তো কোনো প্রয়োজনে আসেননি আমার কাছে। আমি তো ভাবতাম আপনি বুঝি আমাকে এড়িয়েই চলেন।'

'আমি আসলে লজ্জা করেই আসিনি। আপনাকে ভালো লাগে বলেই যে আপনার কাছে আসছি সেটা কেউ বিশ্বাস করত না, ভাবত আপনাকে তোষামোদ করতে আসি'—এডোয়ার্ড বলে।

'না, এখন আর এ ব্যাপারে লজ্জা পাবার আপনার কিছু নেই। কারণ মাঝে মাঝে এখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা কলেজ থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে'—বলেন পরিচালিকা।

পরিচালিকা তার বড় বড় বাদামি চোখের পাতা কাঁপিয়ে তাকিয়ে থাকেন এডোয়ার্ডের দিকে (আলাদা করে তার চোখগুলো যে সুন্দর সেটা স্বীকার করে নেয়া ভালো)। ফিরে যাবার সময় পরিচালিকা এডোয়ার্ডের ঘাড়ে আলতো করে দুটো চাপড় দেন, যেন কোনো একটি খেলায় বোকা ছেলেটা বিজয়ী হয়েছে।

৭

এডোয়ার্ড ভাবে যাক এই অস্বস্তিকর ব্যাপারটির একটা সুবিধাজনক মিটমাট বোধ হয় হলো। মনে ফুর্তি নিয়ে পরের রোববার সে এলিসের সাথে চার্চে যায়। এখন তার আত্মবিশ্বাস আগের চাইতে বেশি। তার ধারণা হয় পরিচালিকার বাড়িতে ঘটে যাওয়া ব্যাপারটি আসলে তার পৌরুষেরই বিজয়।

তাছাড়া এ রোববার সে আরো একটি নতুন ব্যাপার লক্ষ করে। এলিসকে এবার তার অন্যরকম মনে হয়। দেখা হবার সাথে সাথে এলিস এবার তার হাত জড়িয়ে ধরে, চার্চেও সে তার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। আগে এলিস অধিকাংশ সময় শান্ত, চুপচাপ থাকত। কিন্তু আজ সে খুব চঞ্চল। যাবার পথে সে অন্তত দশজন পরিচিতকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। ব্যাপারটি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এডোয়ার্ড। সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

দিনকয়েক পর সন্ধ্যায় রাস্তায় হাঁটবার সময় এডোয়ার্ড লক্ষ করে আগে এলিসের যে চুমুগুলো ছিল নেহাতই দায়সারা এখন সেগুলো হয়ে উঠেছে অনেক আবেগঘন। হাঁটতে হাঁটতে একটি লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়ায় ওরা। এলিস তাকায় এডোয়ার্ডের দিকে। এডোয়ার্ড দেখে আলোয় ম্লান হয়ে আছে ওর চোখ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তোমাকে আমি ভালোবাসি এডোয়ার্ড'—ইতস্তত করে বলে এলিস। পরমুহূর্তেই এডোয়ার্ডের মুখ চেপে ধরে বলে—'না তুমি কোনো কথা বোলো না এখন, আমার লজ্জা করছে। আমি কিছু শুনতে চাই না।'

আবার হাঁটতে থাকে ওরা। এলিস বলে—'এখন আমার কাছে সব স্পষ্ট হচ্ছে। আমার বিশ্বাস নিয়ে কী বোকার মতো আত্মতৃপ্তি ছিল আমার। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি সমালোচনা করতে আমাকে।'

এলিস বুঝলেও এডোয়ার্ড বুঝতে পাচ্ছে না কিছুই। সে চুপচাপ এলিসের কথা শোনে। এলিস বলে—'অথচ তুমি আমাকে কিছুই বললে না।'

'কী বললাম না?'—এডোয়ার্ড জানতে চায়।

'তুমি তো বলবেই না। চারিদিকে সবাই বলাবলি করছে আর তুমি বসে আছ একেবারে মুখ বন্ধ করে। অবশ্য সেটাই ভালো। সেজন্যই তো ভালো লাগে তোমাকে'—মহা উৎসাহে বলতে থাকে এলিস।

এলিস কী বিষয়ে কথা বলছে কিছুটা আঁচ করে এডোয়ার্ড। তবু সে বলে—'তুমি কী বলছ আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।'

'তোমাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে আমি সেটার কথাই বলছি।'

'তোমাকে কে বলেছে এসব?'

'শহরের কে না জানে এ ঘটনা? ওরা তোমাকে তলব করেছে, ভয় দেখিয়েছে কিন্তু তুমি ওদের মুখের উপর জবাব দিয়ে এসেছ। এসব কথা শহরের সবাই জানে। শহরে তোমার সম্মান বেড়ে গেছে অনেক।'

'কিন্তু এসব কথা তো আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

'বোকার মতো কথা বোলো না। এসব কথা কি চাপা থাকে? এটা কি একটা ছোটখাটো ব্যাপার? আজকাল কোন্ মানুষটা সাহসের সাথে কথা বলতে পারে বলো?'

এডোয়ার্ড জানে এই ছোট শহরে যে-কোনো ঘটনাই একটা কল্পকাহিনীতে পরিণত হয়, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই সামান্য ব্যাপারটিও যে একটি কল্পকাহিনীর জন্ম দিতে পারে তা ধারণা করেনি। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি দেশবাসীর কাছে সে কতটা ব্যাতিক্রমী এবং গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। এ তো জানা যে দেশবাসী সাধারণত বীরদের (যারা সংগ্রাম করে জয়ী হয়) পছন্দ করে না, পছন্দ করে শহীদদের। কেউ শহীদ হলে প্রতিবাদহীন দেশবাসী মনে মনে স্বস্তি পায়। স্বস্তি পায় এই ভেবে যে তারা প্রতিবাদ না করে, নিষ্ক্রিয় থেকে ভালোই করেছে। শহীদরা প্রমাণ করে এই দেশে তোমাকে হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মসমর্পণ করতে হবে নয়তো মারা যেতে হবে। সবাই বেশ নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল এডোয়ার্ডকে মেরেই ফেলা হবে। কিন্তু এডোয়ার্ড এইমাত্র এলিসের কাছে সব শুনে বুঝতে পারে, ব্যাপারটি অন্যরকম ঘটাতে ইতিমধ্যে তাকে কেন্দ্র করে এই শহরে মহান এক বীরগাথা রচিত হয়ে গেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটিকে গ্রহণ করে নেয় এডোয়ার্ড এবং বলে—'কিন্তু আমার একটা সিদ্ধান্তে আমি স্থির থেকেছি এ আর এমন কী ব্যাপার? অন্য কেউ হলেও নিশ্চয় এমন করত।'

'অন্য মানুষের কথা বলছ?'—এলিস হেসে ওঠে—'চারিদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো কে কী করছে? সব ভিতুর ডিম, কাপুরুষ। ভয়ে দরকার হলে নিজের মাকেও অস্বীকার করতে পারে এরা।'

এডোয়ার্ড চুপ থাকে, এলিসও। হাত ধরাধরি করে হাঁটে দুজন। এডোয়ার্ডের কানের কাছে ফিসফিস করে এলিস বলে—'তোমার জন্য আমি সব করতে পারি এডোয়ার্ড।'

ঠিক এভাবে আগে কখনো কেউ বলেনি এডোয়ার্ডকে। কথাগুলো অপ্রত্যাশিত উপহারের মতো এসে উপস্থিত হয় এডোয়ার্ডের কাছে। উপহারটা যে তার প্রাপ্য নয় সেটা সে জানে তবু ভাগ্যে যখন প্রাপ্য কোনো উপহার মিলল না তখন অপ্রাপ্য উপহারের এই সুযোগটা কেনই বা সে হারাবে? এডোয়ার্ড তাই ভেবেচিন্তে বলে—'আমার জন্য আর কেউ কিছু করতে পারে না এলিস।'

'এভাবে বলছ কেন'—আর্দ্রকণ্ঠে বলে এলিস।

'আজ যারা আমাকে এমন বীর বানিয়ে তুলেছে আমি জানি প্রয়োজনে এরা কেউ আমার পক্ষে হাত তুলবে না। আমি খুব ভালো করে জানি আমাকে একাই চলতে হবে সবসময়।'

'না, মোটেও তোমাকে একা চলতে হবে না এডোয়ার্ড।'

'হবে আমি জানি এলিস।'

'না, হবে না।'

'সবাই আমাকে ছেড়ে যাবে এলিস তুমি দেখে নিয়ো।'

'আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না এডোয়ার্ড।'

'তুমিও যাবে।'

'না, যাব না।'

'না, এলিস, তুমি আমাকে ভালোবাসো না, কখনোই বাসোনি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মিথ্যা কথা'—করুণ অস্ফুট গলায় বলে এলিস।

এডোয়ার্ড পরিতৃপ্তির সাথে লক্ষ করে এলিসের চোখে জল।

'তুমি যে আমাকে ভালোবাসো না, সেটা যে-কেউ বুঝবে এলিস। তুমি সবসময় খুব নির্বিকার থাকো আমার সাথে। কাউকে ভালোবাসলে কোনো মেয়ে এরকম ব্যবহার করে না। এখন যেহেতু আমার উপর একটা বিপদ নেমে এসেছে তাই তোমার মায়া হচ্ছে। এটাকে ভালোবাসা বলে না এলিস।'

হাতে হাত ধরে নিঃশব্দে আরো কিছুক্ষণ হাঁটে তারা। এলিস ফুঁপিয়ে কাঁদে। একসময় সজল চোখে এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলে—'ভুল, সব ভুল। তুমি যা ভাবছ সব ভুল এডোয়ার্ড।'

'না, কিছুই ভুল না'—বলে এডোয়ার্ড। এলিস কাঁদতে থাকে নীরবে। শেষে এডোয়ার্ড বলে—'ঠিক আছে তাহলে আগামী শনিবার চলো গ্রামে যাব। বড়ভাইয়ের নদীর ধারের চমৎকার কটেজে উইকএন্ডটা কাটিয়ে আসব দুজন, রাজি?'

এলিসের দু'গাল বেয়ে চোখের পানি ঝরছে। সে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

৮

এলিসের সাথে আলাপ হলো মঙ্গলবার। আর ঠিক পরের বৃহস্পতিবারই পরিচালিকা আবার এডোয়ার্ডকে নিমন্ত্রণ করলেন। এডোয়ার্ড নিরুদ্বিগ্ন এবং বেশ ফুর্তিমনে হাজির হয় পরিচালিকার ব্যাচেলার ফ্ল্যাটে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে চার্চ-প্রসঙ্গটিকে এবার সে পরিচালিকার মন থেকে পুরোপুরি দূর করে দিতে পারবে। কিন্তু মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত। মানুষ ভাবে যে সে বুঝি ঠিক চরিত্রটিতেই অভিনয় করছে কিন্তু তার অজান্তে কখন যে পুরো নাটকটিই বদলে গেছে সে টের পায় না। হয়তো অভিনয়ের মাঝখানে সে হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নাটকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে।

এডোয়ার্ড পরিচালিকার মুখোমুখি একটি চেয়ারে আরাম করে বসে। তাদের দুজনের মাঝখানে একটি টেবিল, টেবিলের উপর একটি কোনিয়াকের বোতল। এই সেই কোনিয়াকের বোতল যার মাধ্যমে একজন উজ্জ্বল তরুণ আচমকাই আবিষ্কার করবে সমস্যাটি আসলে চার্চ নয়।

কিন্তু সুবোধ এডোয়ার্ড নিজেকে নিয়ে এতই আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে সে বিশেষ কিছুই আঁচ করতে পারে না। সে খোশমেজাজে কোনিয়াকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আলাপ

~ www.amarboi.com ~

করে (বিভিন্ন বিষয়ে খাপছাড়া আলাপ)। ঘণ্টাখানেক পর দেখা যায় পরিচালিকা সন্তর্পণে আলাপটিকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেন তিনি। এডোয়ার্ডের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি একজন বিবেচক, মধ্যবয়স্কা মহিলা, খুব সুখী হয়তো তাকে বলা যাবে না তবে নিজেকে তিনি সম্মানজনকভাবে সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কোনো ব্যাপারে তার কোনো ক্ষোভ নেই, এমনকি তার এই অবিবাহিত জীবন নিয়েও তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট, কারণ শুধু এভাবেই তিনি তার ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা এবং নির্জনতা উপভোগ করতে পারেন। তাছাড়া এই যে তিনি এমন একটি চমৎকার ফ্ল্যাটের মালিক হবার সুযোগ পেয়েছেন সেটিও তো কম বড় ব্যাপার নয়। শেষে বলেন এই ফ্ল্যাটে তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং তার ধারণা এ মুহূর্তে এডোয়ার্ডও নিশ্চয়ই তেমন খারাপ বোধ করছে না।

'না, না, আমার তো বেশ ভালোই লাগছে'—এডোয়ার্ড খানিকটা বিমর্ষ হয়ে উত্তর দেয়। কারণ ঠিক ঐ মুহূর্ত থেকেই সে কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। কোনিয়াকের বোতল (প্রথম দেখা হবার দিনটিতে যে পানীয়টি সে নেহাত অনিচ্ছায় চেয়েছিল এবং এখন যা তাকে বেশ তৎপরতার সাথে পরিবেশন করা হচ্ছে), এই ব্যাচেলর ফ্ল্যাট (যার ভেতরকার শূন্যতা ক্রমশ কেবলই যেন সংকুচিত হয়ে আসছে), পরিচালিকার দৃষ্টি (যা ভীতিকরভাবে তার উপর স্থির হয়ে আছে) এসব মিলিয়ে এডোয়ার্ডের একপর্যায়ে মনে হয় নাটকের পট যেন ধীরে ধীরে বদলে যচ্ছে। এডোয়ার্ড টের পায় তাকে ক্রমশ একটি পরিকল্পিত পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে নেয়া হচ্ছে। এবার তার সাড়া দেবার পালা। এডোয়ার্ডের বুঝতে বাকি থাকে না যে তার নাকের ডগায় বসে মদ ঢালতে থাকা এই শীর্ণ মহিলাটির প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার উপরই নির্ভর করছে তার চাকরির ভবিষ্যৎ। গলা শুকিয়ে আসে এডোয়ার্ডের।

এডোয়ার্ড মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পরিচালিকার কথা শোনে। কিন্তু টের পায় প্রচণ্ড উদ্বিগ্নতায় মদ তাকে ঠিক ধরছে না। কিন্তু লক্ষ করে ওদিকে মদ পান করে পরিচালিকা রীতিমত বেসামাল হয়ে উঠছেন। তার কথাবার্তায় সংযমের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে এবং কথাগুলো পৌঁছাচ্ছে বিপদজনক পর্যায়ে।

'আপনার একটা ব্যাপার আমি ঈর্ষা করি'—পরিচালিকা বলেন—'আপনি এখনও খুব তরুণ, আপনি জানেন না হতাশা কাকে বলে, স্বপ্নভঙ্গ কাকে বলে। আপনার কাছে পৃথিবী এখনও সম্ভাবনাময়, সুন্দর।'

তিনি টেবিলের উপর দিয়ে এডোয়ার্ডের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েন এবং বিষণ্ন নীরবতায় (মুখে একটি আরোপিত হাসি নিয়ে) এডোয়ার্ডের উপর তার ভীতিকর বড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বড় চোখদুটো স্থির করে রাখেন। ঠিক তখনই এডোয়ার্ডের মনে হয় এই মুহূর্তে তার খানিকটা মাতাল হয়ে পড়া খুব জরুরি, তা না হলে আজ বিশ্রী একটা কিছু ঘটে যাবে। সে দ্রুত গ্লাসে কিছু কোনিয়াক নিয়ে গলায় ঢেলে দেয়।

ওদিকে পরিচালিকা বলে চলেন—'কিন্তু আমিও তো জীবনকে আপনার মতোই দেখতে চাই।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান এবং দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলেন—'আমি প্রমাণ করতে চাই আমি একজন বিরক্তিকর মহিলা নই, আমি সত্যিই সেরকম মহিলা নই।'

পরিচালিকা এবার টেবিলটি ঘুরে এসে হঠাৎ এডোয়ার্ডের শার্ট খামচে ধরেন এবং বলেন—'বিশ্বাস করুন আমি সেরকম নই।'

'আমি জানি আপনি মোটেও সেরকম নন'—বলে এডোয়ার্ড।

'তাহলে আসুন আমরা একটু নাচি'—বলেই পরিচালিকা ছুটে রেডিওর নব ঘুরিয়ে একটি নাচের মিউজিক খুঁজে বের করেন এবং মুচকি হেসে এডোয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়ান।

এডোয়ার্ডও উঠে দাঁড়ায় চেয়ার থেকে। হাত ধরে পরিচালিকার এবং মিউজিকের তালে তালে নাচতে থাকে সারাঘর। মাঝে মাঝে পরিচালিকা আবেগতাড়িত হয়ে এডোয়ার্ডের ঘাড়ের উপর মাথা রাখেন, পরমুহূর্তেই চমকে উঠে মাথা তুলে তাকান এডোয়ার্ডের দিকে। মাঝে মাঝে নিজেই বাজনার সাথে গুনগুন করে গান ধরেন।

ভীষণ এলোমেলো লাগে এডোয়ার্ডের। নাচ থামিয়ে ফাঁকে ফাঁকে কোনিয়াকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নেয়। পরিচালিকার হাত ধরে সারাঘর নেচে নেচে বেড়ায় এডোয়ার্ড। তার মনে হয় নাচ নামের এই কষ্টকর সীমাহীন হাঁটাহাঁটি বন্ধ হবার শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার আপাতত কিছু করণীয় নেই। অবশ্য এই নাচ শেষ হবার পর আরো কী ঘটতে পারে সেকথা ভেবেও আতঙ্কিত হয় এডোয়ার্ড। ফলে নিরুপায় হয়ে তার সামনে আপনমনে গান গাইতে থাকা এই মহিলাটিকে অনুসরণ করতে করতে একপর্যায়ে এডোয়ার্ড টের পায় (সতর্কতার সঙ্গে) যে তার ভেতর ক্রমশ অ্যালকোহলের কাজ শুরু হয়েছে। এই অবস্থাটির জন্যই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে এডোয়ার্ড। সে যখন নিশ্চিত হয় যে তার মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিমাণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই এডোয়ার্ড পরিচালিকাকে তার দেহের সঙ্গে চেপে ধরে এবং তার বাম হাতটি রাখে পরিচালিকার স্তনের উপর।

অবশেষে এডোয়ার্ড সে কা[illegible] সন্ধ্যা থেকে যার আশঙ্কায় সে আতঙ্কিত ছিল। যে-কোনোকি[illegible] না-ক[illegible] প্রস্তুত ছিল এডোয়ার্ড।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সত্যি বলতে কাজটি সে করল, কারণ না করে তার আর কোনো উপায় ছিল না। বস্তুত সন্ধ্যার শুরু থেকে ক্রমান্বয়ে তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধ্য করা হয়েছে। হয়তো ব্যাপারটিকে আরো খানিকটা পরে ঘটানো যেত কিন্তু এটি একরকম অনিবার্যই ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে এডোয়ার্ড যখন পরিচালিকার স্তনের উপর হাত রাখে সে তখন আসলে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনের কাছে নতি স্বীকার করে নেয় মাত্র।

তবে তার উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায় যা ঘটে তা ছিল এডোয়ার্ডের ধারণাতীত। কোনো জাদুমন্ত্রে হঠাৎ যেন জেগে উঠেছেন পরিচালিকা। আবেগে তিনি গোঙাতে থাকেন এবং মুহূর্তে তিনি নিজেই তার রোমশ ঠোঁট চেপে ধরেন এডোয়ার্ডের ঠোঁটের উপর। এডোয়ার্ডকে তিনি টেনে নিয়ে যান বিছানার দিকে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় কোকাতে থাকেন, কামড় বসান এডোয়ার্ডের ঠোঁটে, জিভে। একপর্যায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে বলেন— 'একটু দাঁড়ান।' বলেই দৌড়ে যান বাথরুমে।

এডোয়ার্ড তার আঙুল চুষতে গিয়ে দেখে জিভ কেটে একদিকে খানিকটা রক্ত বেরিয়েছে। খুব ব্যথা করে সেখানে, মনে হয় এ ব্যথায় বহুকষ্টে যে মাতাল ভাবটি এসেছে সেটা বুঝি ছুটে যাবে। সামনে আরো কী ঘটতে যাচ্ছে ভেবে গলা শুকিয়ে আসে এডোয়ার্ডের। বাথরুম থেকে পানির শব্দ আসে। এ সুযোগে কোনিয়াকের বোতল থেকে কয়েক ঢোক গলায় ঢেলে নেয় এডোয়ার্ড।

কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন পরিচালিকা, তার গায়ে স্বচ্ছ নাইলনের নাইট গাউন (বুকের কাছে লেসের ঘন কারুকাজ)। এসেই এডোয়ার্ডকে জড়িয়ে ধরেন তিনি এবং মৃদু ধমক দিয়ে বলেন—'কী ব্যাপার এখনও গায়ে কাপড় কেন?'

এডোয়ার্ড তার জ্যাকেটটি খুলে পরিচালিকার দিকে তাকান (পারিচালিকা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন এডোয়ার্ডের দিকে)। এডোয়ার্ডের মনে হতে থাকে তার শরীর সম্ভবত পুরো আয়োজনটিকে মাটি করে দেবে। তাই শরীরকে জাগাবার জন্য নিরুপায় হয়ে আমতা আমতা করে বলে—'আপনিও খুলে ফেলুন না সব..'

সাথে সাথে একান্ত অনুগতের মতো ক্ষিপ্রভঙ্গিতে পরিচালিকা তার নাইলনের নাইটিটি ছুড়ে ফেলে দেন মাটিতে। এডোয়ার্ডের সামনে মেলে ধরেন তার শুকনো ফর্সা শরীর। পরিচালিকা ধীরে এগুতে থাকেন এডোয়ার্ডের দিকে। আর এডোয়ার্ড ত্রাসের সঙ্গে অনুভব করে, হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটছে, তার শরীর কুঁকড়ে আছে ভয়ে।

পাঠক, আমি জানি শরীরের এরকম হঠাৎ অবাধ্যতার সাথে আপনারা পরিচিত। এতে হয়তো আপনারা মোটেও বিচলিত নন। কিন্তু মনে রাখবেন এডোয়ার্ড নেহাতই নবীন এক যুবক। সে শরীরের এই হঠাৎ ষড়যন্ত্রে ভীষণ ভড়কে যায়, অপমানিত বোধ করে সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

-

ব্যাপারটি কোনো সুন্দরী মেয়ের সামনে ঘটুক অথবা এই কুৎসিত পরিচালিকার সামনে ঘটুক, ঘটনাটি যে খুব অপমানের এতে কোনো সন্দেহ থাকে না এডোয়ার্ডের। পরিচালিকা এখন এডোয়ার্ডের কাছ থেকে আর মাত্র এক হাত দুরে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না এডোয়ার্ড। ভয় পায়। হঠাৎ কখন, কীভাবে যেন অপ্রস্তুতের মতো বলে ওঠে (এই বলার ভেতর সত্যিই কোনো চতুরতা ছিল না তার)—'না, না ঈশ্বর, এ কিছুতেই হতে পারে না। এটা পাপ, ভয়ঙ্কর পাপ।'

বলেই ছিটকে পিছিয়ে যায় সে। কিন্তু পরিচালিকা তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন এবং বিড়বিড় করে বলেন—'কিসের পাপ? এতে কোনো পাপ নেই।'

এডোয়ার্ড পিছিয়ে টেবিলের এপাশ থেকে ওপাশে সরে গিয়ে বলে—'না, আমি কিছুতেই এ কাজ করতে পারব না, কিছুতেই না।'

পরিচালিকা এবার সামনের চেয়ারটি ঠেলে সরিয়ে এডোয়ার্ডের দিকে এগুতে থাকেন এবং তার বিশাল বাদামি চোখ এডোয়ার্ডের উপর স্থির রেখে আবারো বলেন—'না, এতে পাপ নেই, এতে কোনো পাপ নেই।'

এডোয়ার্ড আবার পিছিয়ে টেবিলের উল্টোদিকে চলে যায়। তার পেছনে তখন একটি সোফা আর এক হাত সামনে পরিচালিকা। পালাবার আর কোনো পথ নেই এডোয়ার্ডের। এই চরম নিরুপায় অবস্থার কারণেই সম্ভবত এডোয়ার্ড হঠাৎ পরিচালিকাকে এক অপ্রত্যাশিত ধমক দিয়ে বসে—'চুপ করে বসেন আপনি।'

পরিচালিকা অবাক হয়ে তাঁকান এডোয়ার্ডের দিকে। এডোয়ার্ড আবার কড়া ধমক দিয়ে বলে—'কী বললাম আপনাকে, বসেন, নীল ডাউন।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিকা বাধ্য শিশুর মতো মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন এবং হঠাৎ এডোয়ার্ডের পা জড়িয়ে ধরেন।

এডোয়ার্ড আবারো আদেশের সুরে বলে—'পা ছাড়েন, পা ছাড়েন বলছি। হাত জোড় করে বসেন।'

পরিচালিকা আর একবার অবাক হয়ে চোখ তুলে উপরে তাকান।

'কানে শোনেননি কী বললাম? হাত জোড় করেন।'

পরিচালিকা হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসেন।

'প্রার্থনা করেন'—এডোয়ার্ড নির্দেশ দেয়।

ভক্তিভরে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে পরিচালিকা তাকিয়ে থাকেন এডোয়ার্ডের দিকে।

'বলেন, ঈশ্বর যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন'—আবারো আদেশ দেয় এডোয়ার্ড।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচালিকা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে তার বড় বড় চোখ তুলে এডোয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই ফাঁকে এডোয়ার্ড একটি বেশ সুবিধাজনক বিরতি পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তার পায়ের কাছে বসে থাকা পরিচালিকাকে সে যখন উপর থেকে দেখে তখন ক্রমশ তার ফসকে যাওয়া আত্মবিশ্বাসটি ফিরে আসতে থাকে। তার এবার মনে হয় সে আর মোটেও নেহাত পরিস্থিতির শিকার নয় বরং পরিস্থিতির উপর তার একটি নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়েছে। পরিচালিকাকে আরো একটু ভালোভাবে দেখবার জন্য এক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় এডোয়ার্ড এবং আবার নির্দেশ দেয়—'প্রার্থনা করেন।'

তারপরও পরিচালিকা চুপ আছেন দেখে এডোয়ার্ড কড়া গলায় বলে ওঠে—'কী ব্যাপার জোরে পড়েন।'

এবং ঠিক তখনই ঐ শীর্ণ, নগ্ন, নতজানু মহিলাটি আবৃত্তি শুরু করেন—'হে পরমেশ্বর প্রভু, আপনি আমাদের পবিত্র করুন..

পরিচালিকা করজোড়ে হাঁটুমুড়ে বসে দাঁড়িয়ে থাকা এডোয়ার্ডের দিকে উপর দিকে চোখ তুলে যেভাবে প্রার্থনা করছিলেন মনে হচ্ছিল যেনবা এডোয়ার্ডই ঈশ্বর। এ অবস্থায় পরিচালিকার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক আনন্দ হয় এডোয়ার্ডের। তার সামনে একজন ইন্সটিটিউটের পরিচালিকা যিনি হাঁটু গেড়ে বসে আছেন তার অধস্তনের পায়ের কাছে, তার সামনে একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবী যিনি প্রার্থনা করছেন ঈশ্বরের কাছে, তার সামনে একজন প্রার্থনারত নারী যিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এই আশ্চর্য পরিস্থিতিতে হঠাৎ এডোয়ার্ডের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে যায়। তার শরীরে যে জট বেঁধেছিল কিছুক্ষণ আগে খুলে যায় সেটি। কামোত্তেজনা ফিরে আসে এডোয়ার্ডের।

পরিচালিকা যখন বলছেন—'আমাদের সব প্রলোভন থেকে দূরে রাখুন প্রভু' এডোয়ার্ড তখন একে একে তার সব কাপড় খুলে ছুড়ে ফেলে মেঝেতে। পরিচালিকা যখন বলেন—'আমেন' এডোয়ার্ড তখন তাকে ক্ষিপ্রতার সাথে মেঝে থেকে টেনে তুলে হেঁচড়ে নিয়ে যায় বিছানায়।

৯

ব্যাপারটি ঘটে বৃহস্পতিবার। পরের শনিবার এডোয়ার্ড এলিসকে নিয়ে বেড়াতে যায় তার ভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে। ওদের উষ্ণ আমন্ত্রণ জানায় ভাই। নদীর ধারের কটেজটির চাবি তুলে দেয় এডোয়ার্ডের হাতে।

সারা বিকেল বনের ধারে হেঁটে বেড়ায় দুজন। চুমু খায় এবং এডোয়ার্ডের তৃপ্ত হাত আবিষ্কার করে এলিসের নাভি বরাবর পাপপুণ্য-নির্ধারক সেই রেখাটি উধাও হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেছে। যেজন্যে এতদিনের অপেক্ষা সে ব্যাপারটি নিয়ে এলিসের সাথে একটু আলাপ করবে কিনা ভাবে এডোয়ার্ড। পরে সিদ্ধান্ত নেয় এ বিষয়ে এখন চুপ থাকাই ভালো। বহুদিন ধরে নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে যে এলিসকে এডোয়ার্ড টলাতে পারেনি আজ তো দেখতে পাচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে সে নিজে থেকেই টলে গেছে। অবশ্য সে জানে এ পরিবর্তনটি ঘটেছে কর্তৃপক্ষের সাথে এডোয়ার্ডের মহান আপসহীন সংগ্রামের একটি ভুল কাহিনীর ভিত্তিতে। এডোয়ার্ড যেখানে তদন্ত কমিশনের সামনে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি সেখানে এলিস কি এডোয়ার্ডের সামনে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? এগুলো নিয়ে আলাপ করতে গেলে পুরো ব্যাপারটির স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এডোয়ার্ড বেশ সতর্কতার সাথে তার মৌনতা বজায় রাখে। অবশ্য এডোয়ার্ড যে সতর্কতা অবলম্বন করছে সেটা বুঝবার কোনো উপায় নেই কারণ এলিস তখন অবিরাম কথা বলে চলেছে। দারুণ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে তাকে। নিজেকে এভাবে নাটকীয়ভাবে বদলে ফেলাতে এলিসের বিশেষ কোনো কষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

সন্ধ্যা নামে। তারা দুজন গিয়ে ঢোকে নদীর ধারের কটেজটিতে। বাতি জ্বালায়, বিছানায় শোয়, একে অন্যকে চুমু খায়। একসময় এলিস এডোয়ার্ডকে বলে বাতি নেভাতে। বাতি নেভালেও জানালা দিয়ে আকাশের উজ্জ্বল তারার আলো এসে পড়ছিল ঘরের ভেতরে। এলিসের অনুরোধে এডোয়ার্ড জানালার পর্দাগুলোও টেনে দেয়। তারপর সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এলিস নিরাবরণ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে এডোয়ার্ডের কাছে।

সেই কবে থেকে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে এডোয়ার্ড। অথচ কী আশ্চর্য ঘটনাটি যখন সত্যি সত্যি ঘটছে তখন তার মনে হয় এত দীর্ঘ অপেক্ষার তুলনায় এ যেন খুব মামুলি একটি ব্যাপার। সবকিছু কেমন যেন অতি সহজ, অতি স্পষ্ট মনে হতে থাকে তার কাছে। মিলনে ঠিক পুরো মনোনিবেশ করতে পারে না এডোয়ার্ড। তার মনে তখন ভিড় করতে থাকে এলিসের শীতলতা দূর করবার জন্য তার সেইসব নানা ব্যর্থ সাধনাগুলোর কথা, তার ইন্সটিটিউটের যাবতীয় দুর্ভোগের কথা। তার সেসব কষ্টের জন্য তো দায়ী আসলে এলিসই। ফলে আজ এলিস যতই নিজেকে সমর্পণ করুক এজন্য এডোয়ার্ডের মনে কোনো কৃতজ্ঞতা জাগে না। বরং তার ভেতর একধরনের প্রতিশোধস্পৃহা জাগে। এডোয়ার্ড মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবে, যে ব্যভিচার-সচেতন এলিসের ঈশ্বরের প্রতি এত শ্রদ্ধা, আজ কত অবলীলায়ই না সে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ভাবে এতবড় একটি পরিবর্তন অথচ কী আশ্চর্য এলিসের ভেতর কোনো ভাবান্তর নেই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, অনুতাপ নেই। প্রচণ্ড ক্ষোভ হয় এডোয়ার্ডের। সেই ক্ষোভ নিয়েই এডোয়ার্ড ক্রোধোন্মত্ত ভঙ্গিতে প্রচণ্ড বেগে এলিসের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয় যাতে এলিসের মুখ থেকে অন্তত অস্ফুট একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিৎকার, একটি গোঙানি বেরিয়ে আসে। কিন্তু লাভ হয় না। বালিকা নীরবই থাকে পুরোটা সময়। ফলে যথেষ্ট পরিশ্রম সত্ত্বেও নিঃশব্দে এবং অনাটকীয়ভাবে শেষ হয় তাদের সঙ্গম-পর্ব।

এলিস কয়েক মুহূর্ত পরে এডোয়ার্ডের বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এডোয়ার্ড জেগে থাকে দীর্ঘক্ষণ। ভাবতে থাকে এলিসকে নিয়ে (এলিসের শরীর নয়, চেষ্টা করে তার পুরো সত্তাটিকে কল্পনা করতে)। কিন্তু এলিসকে ধোঁয়াচ্ছন্ন মনে হয় তার।

এতদিন এডোয়ার্ডের কাছে এলিস ছিল এমন একজন যে সরল, সুস্থির, স্পষ্ট। এলিসের চমৎকার চাহনির মধ্যে তার জীবনের সারল্যকে দেখতে পেত এডোয়ার্ড। এলিসের বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে একটি সঙ্গতি খুঁজে পেত। কিন্তু কী আশ্চর্য একটি ভুল সংবাদ কী করে নষ্ট করে দিয়েছে এলিসের সত্তার সেই ভারসাম্য। এডোয়ার্ডের কাছে এলিসের জীবন, তার বিশ্বাস, তার দেহ পরস্পর সম্পর্কহীন বলে মনে হতে থাকে।

এডোয়ার্ড এলিসকে যখন কল্পনা করে (এলিস তখনও তার বুকের উপর ঘুমাচ্ছে) তখন এলিসের দেহ এবং তার ভাবনাজগৎকে দুটো পৃথক সত্তা বলে মনে হয় তার। দেহটিকে ভালোই লাগে তার কিন্তু ভাবনাজগৎটিকে মনে হয় যাচ্ছেতাই। দুটোকে মিলিয়ে কিছুতেই এলিসের একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা গড়ে তুলতে পারে না সে। তার কল্পনায় এলিসের সত্তা ব্লটিং পেপারে আঁকা কালির দাগের মতো আকারহীন, অবয়বহীন হয়ে পড়ে।

এলিসের দেহটি এডোয়ার্ডের সত্যিই পছন্দ। সকালে ঘুম থেকে উঠবার পর এডোয়ার্ড এলিসকে জোর করে আরো কিছুক্ষণ নগ্ন থাকতে বাধ্য করে। গতরাতে তারার মৃদু আলো ঘরে ঢুকছিলে বলে জানালা বন্ধ করতে উদগ্রীব ছিল এলিস। আজ সেই লজ্জা আর অবশিষ্ট নেই তার। এডোয়ার্ড নগ্ন এলিসকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে (নেচে নেচে চা আর বিস্কুটের আয়োজন করছে এলিস)। এডোয়ার্ডের দিকে তাকাতেই এলিসের মনে হয় সে কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। কী ব্যাপার জানতে চায় এলিস। এডোয়ার্ড বলে—'না, কিছু না। নাস্তা সেরে বড়ভাইয়ের সাথে দেখা করব ভাবছি।'

বড়ভাই এডোয়ার্ডের কাছে জানতে চায় স্কুলে কেমন কাটছে তার।

'মোটামুটি চলছে'—বলে এডোয়ার্ড।

বড়ভাই বলে—'ঐ চেহাচকোভাটা তো আসলে একটা শুয়োর। অবশ্য আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি অনেক আগেই। কারণ ও আসলে না-বুঝেই অনেক কিছু করেছে। ও আমার ক্ষতি করতে গিয়ে বরং একটা চমৎকার জীবনই উপহার দিয়েছে আমাকে। কৃষক হিসেবে এখন আমার আয় প্রচুর, প্রকৃতির কাছাকাছি থাকি ফলে শহরের নানা সব ঝুটঝামেলা থেকে আমি মুক্ত।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সত্যি বলতে কি ঐ মহিলা আমারও বেশ উপকারই করেছে বলা যায়'—ভাইয়ের কথায় যোগ দেয় এডোয়ার্ড।

এরপর সে তার ভাইয়ের কাছে সব ঘটনা খুলে বলে। এলিসের সাথে তার প্রেমের চেষ্টা তার ঈশ্বরবিশ্বাসের ভান, স্কুলের বিচারপর্ব, তাকে দীক্ষা দেবার জন্য চেহাচকোভার ভার নেয়া, তাকে এক মহান বীর ভেবে শেষে এলিসের আত্মসমর্পণ ইত্যাদি সব। অবশ্য পরিচালিকাকে প্রার্থনায় বাধ্য করার গল্পটি এডোয়ার্ড ভাইয়ের কাছে উহ্য রাখে কারণ ঐ গল্প তার ভাইয়ের পক্ষে আত্মস্থ করা কঠিন হবে।

এডোয়ার্ড থামলে তার ভাই বলে—'আমার অনেক দোষ আছে ঠিক তবে আমি কিন্তু তোর মতো কোনোকিছু নিয়ে কখনো ভান করিনি। যা বিশ্বাস করি তা সবার মুখের উপর বলে দিয়েছি।'

ভাইকে ভালো লাগে এডোয়ার্ডের, তাই তার এই মন্তব্যে মনটা একটু খারাপ হয় তার। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিজের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে ভাইয়ের সাথে তর্ক জুড়ে দেয় এডোয়ার্ড। একপর্যায়ে বলে—'আমি জানি তুমি খুব ঠোঁটকাটা মানুষ এবং সেটা নিয়ে তোমার একটা গর্বও আছে। কিন্তু আমাকে একটা সোজা প্রশ্নের জবাব দাও তো আমাকে বলো একজন মানুষের সত্য বলার কী প্রয়োজন? আমার কী ঠেকা পড়েছে যে আমাকে সত্যকথা বলতে হবে? সত্য বলাটাকে কী কারণে আমরা এমন একটা মহান কাজ বলে মনে করছি? আচ্ছা মনে করো একদিন একটা পাগল যদি তোমার কাছে এসে বলে যে সে একটা মাছ এবং তার ধারণা আমরা সবাই এক-একটা মাছ। তুমি কি তখন তার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দেবে? তুমি কি তখন তার সামনে কাপড় খুলে দেখাবে যে তোমার শরীরে মাছের মতো কোনো আঁশ নেই? তুমি কি তার মুখের উপর বলবে যা তুমি বিশ্বাস করো? বলো, বলবে?'

বড়ভাই নিশ্চুপ থাকে। এডোয়ার্ড আরো বলে—'ভেবে দ্যাখো তুমি যদি তাকে সত্যকথাটা বলো, পুরো সত্যটা, যা তুমি বিশ্বাস করো যদি তাই তাকে বলতে চাও তাহলে একজন পাগলের সাথে তোমাকে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর একটা আলোচনায় অংশ নিতে হবে, ফলে তুমি নিজেও পরিণত হবে একটা পাগলে। আমাদের চারপাশের অবস্থাটা হয়েছে এমনই। আমি যদি কারো মুখের উপর সত্যকথাটা বলি তাহলে বুঝতে হবে আমি মানুষটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। একটা গুরুত্বহীন ব্যাপারকে গুরুত্বের সাথে নেয়া মানে নিজেরও গুরুত্ব কমিয়ে ফেলা। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, আমি যদি একজন পাগলকে গুরুত্ব দিতে না চাই এবং নিজেকেও ঐ পাগলদের দলভুক্ত করতে না চাই তাহলে মিথ্যা আমাকে বলতেই হবে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১০

রোববার বিকেলে এডোয়ার্ড আর এলিস রওনা দেয় শহরের দিকে। ট্রেনের কামরায় শুধু ওরা দুজন (মেয়েটি অবিরাম বকবক করে), আর এডোয়ার্ড ভাবে তার অর্থহীন চাকরিজীবনের পাশে কদিন আগেও কিনা সে এই মেয়েটির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিল জীবনের অর্থ। অথচ এখন তার মনে হচ্ছে (ট্রেনের চাকার একটানা ধাতব শব্দ হচ্ছে) এলিসের সাথে প্রেম করবার চেষ্টার পুরোটিই ছিল অগণিত ভুলে ভরা অর্থহীন একটি উদ্যোগ। অনুশোচনা হতে থাকে এডোয়ার্ডের। সে ভাবলেশহীনভাবে এলিসের কথা শোনে এবং তার হাত নাড়ানো দেখতে থাকে (এলিস দুহাত নেড়ে অবিরাম কথা বলে চলেছে)। এডোয়ার্ডের মনে হয় এলিসের সবগুলো কথাই অর্থহীন, কাগজের ফাঁপা বাটখারা যেন। এডোয়ার্ডের কাছে এলিসের কথাগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই, যেমন গুরুত্ব থাকবার কথা নয় ঈশ্বরের কাছে নগ্ন পরিচালিকার প্রার্থনার।

হঠাৎ এডোয়ার্ডের মনে হয় চাকরি করতে এসে এই নতুন জায়গায় যত লোকের সাথে তার পরিচয় হলো তারা সবাই আসলে ব্লটিং পেপারে ছড়ানো কালি, যাদের সত্তার, বিশ্বাসের, আচরণের স্পষ্ট কোনো অবয়ব নাই। তার মনে হয় সবচাইতে যা খারাপ, সবচাইতে যা জঘন্য তা হলো এডোয়ার্ড নিজেও এই মানুষরূপী ছায়াগুলোর মতো একটি ছায়াতেই পরিণত হয়েছে। এডোয়ার্ড এই মানুষগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টায়, তাদের অনুকরণের চেষ্টায় অর্থহীনভাবে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলেছে। যদিও মনে মনে সে সবসময়ই হাসছে এবং সবকিছুর প্রতি তার একটি গোপন ঠাট্টাও রয়েছে কিন্তু তাতে কী বা এসে যায়? অনুকরণ তা সে বিদ্বেষ নিয়ে করলেও সেটি শেষপর্যন্ত অনুকরণই। যে ছায়া ঠাট্টা করে সেও তো তুচ্ছ একটি ছায়াই, এর বেশি কিছু নয়। এটি একটি কলঙ্ক, নিদারুণ কলঙ্ক।

ট্রেনের চাকার ধাতব শব্দ হচ্ছে অবিরাম (মেয়েটিও বকে যাচ্ছে অবিরাম)। এডোয়ার্ড হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—'এলিস তোমার বুঝি খুব ফুর্তি লাগছে?'

'ভীষণ'—উত্তর দেয় এলিস।

'আমার কিন্তু খুব বাজে লাগছে।'

'কেন? কী হলো তোমার?'

'কাজটা করা আমাদের উচিত হয়নি।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এর জন্য তুমিই তো বেশি উদগ্রীব ছিলে।'

'তা ঠিক। কিন্তু সেটাই তো আমার অপরাধ। ঈশ্বর আমাকে কোনোদিন এজন্য ক্ষমা করবেন না। এটা একটা পাপ। পাপ করেছি আমরা'—বলে এডোয়ার্ড।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'হলো কী তোমার? তুমিই না বলতে ঈশ্বর সবার আগে চান ভালোবাসা'—বলে এলিস।

যে যুক্তিতে একদিন এলিসকে জয় করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল এডোয়ার্ড আজ এলিসকে সেই যুক্তিই পুনরাবৃত্তি করতে দেখে প্রচণ্ড রাগ হয় এডোয়ার্ডের। সে বলে—'হ্যাঁ, সেকথা তখন বলেছিলাম আসলে তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য। এখন তোমার ঈশ্বরবিশ্বাসের জোরটা বোঝা গেল। যে এত সহজে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে মানুষ তো তার কাছে তুচ্ছ।'

এলিস নানাভাবে এডোয়ার্ডের কথার জবাব দেবার চেষ্টা করে। অবশ্য জবাব না দিলেই বরং ভালো হতো কারণ তা এডোয়ার্ডের রাগ আরো বাড়িয়ে তোলে। এডোয়ার্ড এলিসের প্রতি তার ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার কথা অবিরাম বলতে থাকে যতক্ষণ না এলিসের শান্ত, স্থির মুখটি অশ্রুতে ভিজে ওঠে, সে গোঙাতে থাকে।

'চললাম' বলে এডোয়ার্ড অশ্রুসিক্ত এলিসকে স্টেশনে রেখে বিদায় নেয়। বাড়িতে ফিরে তার ঐ অদ্ভুত রাগটি প্রশমিত হয়ে আসে। তারপর শান্ত মনে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ব্যাপারগুলো নিয়ে সে আবার ভাবতে থাকে। এলিসের দেহটির কথা মনে পড়ে তার, যে নগ্নদেহে সেদিন সকালে তার সামনে নেচে বেড়াচ্ছিল এলিস। নিজ হাতে এমন একটি চমৎকার দেহকে সে তার নাগালের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছে ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায় তার। নিজেকে গর্দভ মনে হয়, নিজের গালে নিজেরই ইচ্ছা হয় চড় বসাতে। কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে, সেগুলো শুধরাবার আর কোনো সুযোগ নেই।

এলিসের সুন্দর দেহটি হারানোর বেদনা এডোয়ার্ড কাটিয়ে ওঠে অচিরেই। শরীরকে সন্তুষ্ট রাখবার বন্দোবস্ত সে ইতিমধ্যে করে নিয়েছে। সপ্তাহে একদিন সে পরিচালিকার বাড়ি যায় (এখন আর প্রথম দিনকার সেইসব উদ্বিগ্নতায় ভুগতে হয় না তাকে)। তাছাড়া ইতিমধ্যে বিভিন্ন মেয়েকে কজা করতেও সে বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠেছে। নতুন এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এডোয়ার্ড। তবে একপর্যায়ে তার মনে আবার সেই পুরনো নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে ফিরে যাবার তীব্র ইচ্ছা জাগে। এখন সে প্রায়ই একা একা রাস্তায় হাঁটে এবং মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে চার্চে (আসুন শেষবারের মতো ব্যাপারটির দিকে মনোযোগ দেয়া যাক)।

না, ব্যাপারটি অতটা সহজ নয়। এডোয়ার্ড মোটেও ঈশ্বরবিশ্বাস করতে শুরু করেনি। গল্পটি এতটা স্ববিরোধিতায় শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ঈশ্বর যে নেই এ ব্যাপারে এডোয়ার্ডের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলেও সে যখন ঈশ্বর নিয়ে ভাবতে বসে তখন তার ভালোই লাগে, সে বেশ নস্টালজিক হয়ে পড়ে।

প্রেম, শিক্ষকতা, মননশীল চিন্তা কোনোকিছুকেই এডোয়ার্ডের তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি কখনো (পরিচালিকা আর এলিস বিষয়ক ঘটনার পর বেশ অনেকদিন কেটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেছে)। এডোয়ার্ড যেমন একটু বেশি চালাক বলে গুরুত্বহীন বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব খুঁজে পাবার ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারে না আবার সে যথেষ্ট বোকা বলে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু না-খুঁজেও পারে না।

ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমোহদয়গণ আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, একজন মানুষ যে আর কোনোকিছুকেই গুরুত্বের সাথে নিতে পারে না তার জীবন অত্যন্ত বেদনার।

আর এ কারণেই এডোয়ার্ড মাঝে মাঝে ঈশ্বরকে খোঁজে। কারণ একমাত্র ঈশ্বরই সেই সত্তা যিনি আছেন কিন্তু কারো সামনে হাজির হবার দায় তার নেই। কারণ একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া (যিনি অস্তিত্বহীন) গুরুত্বহীন এই পৃথিবীর বিপরীতে (যা বড়বেশি অস্তিত্বমান) গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।

তাই এডোয়ার্ড মাঝে মাঝে চার্চে গিয়ে বসে এবং গম্বুজের ভেতরের ফাঁকা শূন্যতায় তাকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তটি থেকেই এডোয়ার্ডের কাছ থেকে বিদায় নেয়া যাক। এখন বিকাল, চার্চ শান্ত এবং শূন্য। এডোয়ার্ড চার্চের একটি বেঞ্চে বসে আছে বিষণ্ন মনে। কারণ সে জানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার বিষাদ এত তীব্র যে ঐ বিষণ্নতার তলদেশ থেকে হঠাৎ ঈশ্বরের একটি জীবন্ত মুখ যেন ভেসে ওঠে তার মনে। লক্ষ করুন এডোয়ার্ড হাসছে। সে হাসছে এবং এই হাসি আনন্দের।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, দয়া করে আপনারা এডোয়ার্ডের এই হাসিমুখটুকুই মনে রাখবেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানালা দিয়ে দেখা

▼

ওরহান পামুক

যদি কিছু দেখবার না থাকত, শুনবার মতো কোনো গল্প না থাকত তাহলে সন্দেহ নেই জীবন হতো খুব ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। আমি যখন ছোট ছিলাম একঘেয়েমি কাটাবার জন্য হয় রেডিও শুনতাম নয়তো জানালা দিয়ে তাকিয়ে পাশের অ্যাপার্টমেন্ট দেখতাম কিম্বা দেখতাম নিচে রাস্তায় হেঁটে যাওয়া মানুষ। সেই সময়, সেই ১৯৫৮তে তুরস্কে তখনও কোনো টেলিভিশন আসেনি। কিন্তু আমরা যেন সেটি ঠিক মেনে নিতে চাইতাম না, আমরা বরং বেশ উৎসাহের সঙ্গে টেলিভিশন নিয়ে কথা বলতাম। ঠিক যেভাবে আমরা হলিউডের নতুন অ্যাডভেঞ্চার ফিল্মগুলো নিয়ে গল্প করতাম। তুরস্কে সেসব ছবি আসতে চার-পাঁচ বছর লেগে গেলেও ইস্তাম্বুলের সিনেমাহলগুলোতে সবসময় লেখা হতো, 'অচিরেই আসিতেছে...'।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা সময় কাটানোর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল যে টেলিভিশন যখন শেষপর্যন্ত তুরস্কে এল লোকে তখন টেলিভিশনসেটের দিকে এমনভাবে তাকাত যেন জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার বাবা, চাচা এবং দাদি যখন টেলিভিশন দেখতেন তখন তারা টেলিভিশনের দিকে ফিরে কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে কথা বলতেন এবং মাঝে বিরতি দিয়ে পর্দায় কী দেখেছেন তার বিবরণ দিতেন, ঠিক যেমন তারা করতেন জানালার দিকে তাকিয়ে।

'যেভাবে বরফ পড়ছে, মনে হয় না আর থামবে...' জানালা দিয়ে ঝরে পড়া তুষারকণা দেখতে দেখতে বলতেন আমার চাচি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'যে লোকটা হেলভা বিক্রি করে সে আবার নিশানতাশির কোনাটায় ফিরে এসেছে'—চৌরাস্তার দিকে মুখ করা অন্য জানালায় তাকিয়ে আমি বলতাম।

রোববার আমার চাচা, চাচিসহ নিচের তলার সবাই যেতাম দোতালায় দাদির সঙ্গে লাঞ্চ করতে। খাবার আসার আগে পর্যন্ত আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম। মা, বাবা, চাচা, চাচি সবার সঙ্গে থাকতে পেরে আমার এত ফুর্তি হতো যে মনে হতো যেন সবকিছু ডাইনিং টেবিলের উপর ঝুলে থাকা ঐ ঝাড়বাতিটার আলোয় ঝলমল করছে। আমার দাদির বসবার ঘরটি ছিল অন্ধকার, নিচের তলায় আমাদের বসবার ঘরটিও অন্ধকার কিন্তু আমার মনে হতো দাদির ঘরটি বেশি অন্ধকার। দাদির ঘরের ব্যালকনির দরজা খোলা হতো না কোনোদিন, সে দরজায় ঝোলানো ভারী পর্দাগুলোর জন্যই সম্ভবত ঘরটি এমন অন্ধকার লাগত। ঘরের মধ্যে সবার কেমন ভূতুড়ে ছায়া পড়ত। কিম্বা এমনটা লাগত সম্ভবত ঘরের পর্দা, প্রকাণ্ড টেবিল, আলমারি, ছোট পিয়ানো, তার উপর দেয়ালে টানানো ফটো এসবের জন্যই অথবা হয়তো ঐ বদ্ধ, সবসময় ধুলার গন্ধ ভরা অগোছালো ঘরটাই ওমন।

খাওয়ার পর পাশের আরেকটি অন্ধকার ঘরে চাচা সিগারেট টানতে বসেন। 'ফুটবল ম্যাচের একটা টিকিট আছে আমার কাছে, আমি যাব না, তোদের বাবা নিয়ে যাবে তোদের।'—চাচা বলেন।

'বাবা নিয়ে চলো না আমাদের ফুটবল ম্যাচে'—অন্য ঘর থেকে কেঁদে কেঁদে বলে আমার ভাই।

'নিয়ে যাও না, বাচ্চাগুলো একটু ফ্রেশ বাতাস পেত'—বসবার ঘর থেকে বলে মা।

'তুমি নিয়ে গেলেই তো পারো'—বাবা মাকে বলে।

'আমি আমার মার ওখানে যাচ্ছি'—মা বলে।

'তুমি আমার গাড়িটা নিতে পারো—' বলেন আমার চাচা।

'প্লিজ, বাবা'—বায়না ধরে আমার ভাই।

একটি লম্বা, অদ্ভুত নীরবতা। যেন ঘরের সবাই আমার মা'কে নিয়ে যার যার মতো একটা কিছু ভাবছে এবং আমার বাবা জানে সে ভাবনাগুলো কী।

'তাহলে তোমার গাড়িটা আমাকে দিচ্ছ?'—বাবা জিজ্ঞাসা করে চাচাকে।

তারপর আমরা নিচতলায় গেলে মা আমাদের সোয়েটার পরিয়ে দেয়, পায়ে পরিয়ে দেয় মোটা চেক উলের মোজা। বাবা তখন একটা সিগারেট টানতে টানতে করিডোরে পায়চারি করে। চা... ক্রিম কালারের অভিজাত ৫২ ডজ গাড়িটি টেসভিকি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মসজিদের সামনে রেখেছেন। বাবা আমাদের দুই ভাইকে সামনের সিটে বসবার অনুমতি দেয় এবং একবারেই ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে সক্ষম হয়।

স্টেডিয়ামে কোনো লাইন ছিল না। একটি টিকিট দেখিয়ে বাবা গেটে দাঁড়ানো লোকটিকে বলে—'এই টিকিটটা ওদের দুজনের জন্য। একজনের বয়স আট আরেকজনের দশ।' আমরা ভেতরে ঢুকে যাই কিন্তু লোকটির চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে আমার। ভেতরে অনেক সিট খালি। আমরা ঢুকেই বসে পড়ি।

দু'দলের প্লেয়াররা ইতিমধ্যেই কাদামাখা মাঠে নেমে পড়েছে। শাদা রঙের চমৎকার হাফপ্যান্টগুলো পরে ওরা ওয়ার্মআপ করার জন্য একবার সামনে একবার পেছনে যায়, দেখে খুব মজা লাগে আমার। 'ঐ দেখ পিচ্চি মেহমেট'—বলে আমার ভাই—'ও তো সেদিনমাত্র জুনিয়ার টিম থেকে এসেছে।'

'আমি জানি।'

খেলা শুরু হয়। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। কিছুক্ষণ পর আমার ভাবনা খেলার মাঠ ছেড়ে উধাও হয় অন্য কোথাও। আচ্ছা, সব ফুটবলারেরই তো নাম ভিন্ন তবু তারা একই রকম স্ট্রাইপ পড়ে কেন? আমি কল্পনা করতে থাকি মাঠে যেন আর কোনো খেলোয়াড় নেই শুধু কতগুলো নাম দৌড়ে বেড়াচ্ছে। প্লেয়ারদের হাফপ্যান্ট ময়লা থেকে আরো ময়লা হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখি গ্যালারির পেছন দিকে ধোঁয়া উড়ানো জাহাজ ভেসে যাচ্ছে বসফোরাস দিয়ে। হাফটাইম হয়ে গেছে তবু কেউ গোল করতে পারেনি। বাবা আমাদের দুজনের জন্য চিকপির কোনো আর পনির পিঠা নিয়ে আসে।

'আর খেতে পারছি না'—আধখাওয়া পিঠা দেখিয়ে বাবাকে বলি।

'নিচে রেখে দাও, কেউ দেখবে না'—বাবা বলে।

খানিকটা গরম হবার জন্য অন্যদের মতো আমরাও একটু হাঁটাহাঁটি করি। বাবার মতো করে আমরা আমাদের উলের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখি আর পেছনের গ্যালারি থেকে কেউ বাবার নাম ধরে ডাকলে, বাবার মতো আমরাও ঘুরে তাকাই। বাবা তার কানের কাছে হাত রেখে বোঝাতে চায় যে এই গণ্ডগোলে সে শুনতে পাচ্ছে না কিছু।

'না, আসতে পারব না।' আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বাবা বলে—'বাচ্চাগুলি সঙ্গে আছে।'

ভিড়ের সেই মানুষটি একটি বেগুনি রঙের মাফলার পরে আছেন। লোকটি পেছনের গ্যালারি থেকে মানুষজনকে ঠেলে এগিয়ে এসে আমাদের সারিতে বসেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবার সঙ্গে কোলাকুলি করে লোকটি বলেন—'এগুলো তোমার ছেলে? এতবড় হয়ে গেছে সব, বিশ্বাসই হয় না।'

আমার বাবা কিছু বলে না।

আমাদের দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে থেকে লোকটি বলে—'তা এগুলো পয়দা হলো কবে? তুমি কি স্কুল শেষ করেই বিয়ে করে ফেলেছিলে নাকি?'

তার দিকে না-তাকিয়েই বাবা বলে—'হ্যাঁ।' তারা দুজন আরো কিছুক্ষণ কথা বলে। বেগুনি মাফলার পরা লোকটি আমার এবং আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আমাদের দুজনের হাতের তালুতে কতগুলো আমেরিকান খোলা বাদাম রেখে দেন। লোকটি চলে গেলে বাবা তার সিটে বসে থাকে অনেকক্ষণ, কিছু বলে না।

নতুন হাফপ্যান্ট পরে দুদলের প্লেয়াররা মাঠে নামার কিছুক্ষণ পরেই বাবা বলে—'চলো বাড়ি চলো। তোমাদের ঠাণ্ডা লাগছে।'

আমার ভাই বলে—'আমার একটুও ঠাণ্ডা লাগছে না।'

'তোমার ঠিকই ঠাণ্ডা লাগছে। আর আলীরও ঠাণ্ডা লাগছে। চলো এখন বাসায় যাব'—বলে বাবা।

কারো হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে, কারো পায়ে পারা দিয়ে গ্যালারি থেকে বের হবার সময় নিচে রাখা আমার পনির পিঠাটি পা দিয়ে মাড়িয়ে দিই। আমরা যখন গ্যালারির সিঁড়ি দিয়ে নামছি শুনতে পাই রেফারি সেকেন্ড হাফ খেলা শুরুর বাঁশি বাজাচ্ছে।

'তোর কি ঠাণ্ডা লাগছিল? তুই বললি না কেন যে তোর ঠাণ্ডা লাগছিল না?'—আমার ভাই বলে। আমি চুপ থাকি। 'ইডিয়ট'—বলে আমার ভাই।

'বাড়িতে গিয়ে ম্যাচের হাফটাইমের পরের অংশটা রেডিওতে শুনো'—বলে বাবা।

'এই ম্যাচটা রেডিওতে ব্রডকাস্ট করবে না'—বলে আমার ভাই।

'আচ্ছা, এখন চুপ করো। যাওয়ার পথে আমি টাকসিম দিয়ে যাচ্ছি'—বাবা বলে।

আমরা চুপ থাকি। যা ভেবেছিলাম, গোলচত্বরটা পার হয়ে ঘোড়দৌড়ের বাজির দোকানটার কাছে গাড়িটা থামায় বাবা। আমাদের বলে—'কেউ বললেও দরজা খুলবে না। আমি যাব আর আসব।'

গাড়ি থেকে বের হয় বাবা। সে বাইরে থেকে দরজাগুলো লক করবার আগেই আমরা ভেতরের নবগুলো টিপে দরজা বন্ধ করে দিই। বাবা বাজির দোকানটিতে না গিয়ে ঐ পাথুরে রাস্তাটি পার হয়ে যেখানে একটি দোকানে জাহাজের ছবি লাগানো অনেক

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পোস্টার, প্লাস্টিকের এরোপ্লেন এবং ঝকঝকে রোদের দেশের সব ছবি। আজ রোববারও দোকানটি খোলা, বাবা ঐ দোকানে যায়।

'বাবা কোথায় গেল?'

'আচ্ছা বাড়ি গিয়ে একতালা দোতালা খেলবি?'—ভাই জিজ্ঞাসা করে।

বাবা যখন ফেরে, আমার ভাই তখন গাড়ির এক্সেলেটর নিয়ে খেলছিল। আমরা নিশানতাসিতে ফিরে যাই এবং বাবা গাড়িটি মসজিদের সামনেই রাখে। 'তোমাদের একটা কিছু কিনে দেব, কী নেবে বলো? তবে ঐ ফেমাস পিপল সিরিজটা চেয়ো না কিন্তু।'

'প্লিজ বাবা, ওটাই চাই'—বলে আমার ভাই।

আলাদিনের দোকানে গিয়ে বাবা আমাদের দুজনের প্রত্যেককে দশ প্যাকেট করে ফেমাস পিপল সিরিজের চুইংগাম কিনে দেয়। আমাদের বিল্ডিঙে ঢুকে, লিফটের কাছে পৌঁছাতেই আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে মনে হয় বুঝি প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলব। ঘর গরম এবং আমার মা তখনও ফেরেনি। আমরা চুইংগামের কাভারগুলো এক এক করে খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলতে থাকি। ফলাফল

আমি পাই দুটি ফিল্ড মার্শাল ফেভজি কাকমাক, একটি করে চার্লি চ্যাপলিন, কুস্তিগীর হামিত কাপলান, গান্ধি, মোজার্ট, দ্য গল, দুটি আতাতুর্ক এবং একটি গ্রেটা গার্বো- নাম্বার ২১—যা আমার ভাই পায়নি এখনও। এই নিয়ে এখন আমার আছে ১৭৩টি বিখ্যাত মানুষের ছবি। কিন্তু পুরো সিরিজটি শেষ করতে আমার আরো ২৭টি ছবি দরকার। আমার ভাই পায় চারটি ফিল্ড মার্শাল ফেভজি কাকমাক, পাঁচটি আতাতুর্ক এবং একটি এডিসন। আমরা চুইংগামগুলো মুখে পুরে, কার্ডগুলোর পেছনের লেখা পড়তে থাকি

ফিল্ড মার্শল ফেভজি চাকমাক
স্বাধীনতা যুদ্ধের জেনারেল (১৮৭৬-১৯৫০)
মাম্মো সুইট চুইংগাম কোম্পানি

যার কাছে ১০০ জন বিখ্যাত ব্যক্তির পুরো সেটটি থাকবে সে ভাগ্যবান পুরস্কার হিসেবে পাবে একটি চামড়ার ফুটবল।

আমার ভাই তার সংগ্রহের ১৬৫ কার্ডের সেটটি হাতে ধরে আছে। সে বলে—'টপ অর বটম খেলবি?'

'না।'

'তোর থেকে একটা গ্রেটা গার্বো আমাকে দিলে আমার ১২টা ফেভজি কাকমাক তোকে দিয়ে দেব।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'না।'

'কিন্তু তোর কাছে তো এখন দুইটা গ্রেটা গার্বো।'

আমি চুপ থাকি।

'কালকে যখন স্কুলে সবাইকে টিকা দিবে, তখন কিন্তু অনেক ব্যথা লাগবে। আমাকে আবার তখন ডাকাডাকি করিস না'—বলে আমার ভাই।

'আচ্ছা করব না।'

আমরা চুপচাপ আমাদের রাতের খাবার খাই। রেডিওতে যখন খেলার খবর হয় তখন জানতে পারি আমরা যে খেলাটি দেখতে গিয়েছিলাম সেই ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। এসময় মা আমাদের বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্য ঘরে আসে। আমার ভাই তার স্কুলের ব্যাগ গোছাতে থাকে আর আমি দৌড়ে বসবার ঘরে যাই। আমার বাবা জানালায় দাঁড়িয়ে তখন নিচে রাস্তা দেখে।

'বাবা, কালকে আমি স্কুলে যেতে চাই না।'

'কী বললে?'

'কালকে স্কুলে আবার সবাইকে টিকা দেবে। টিকা দিলে আমার জ্বর আসে তারপর আমি নিশ্বাস নিতে পারি না। মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।'

বাবা আমার দিকে তাকায়, কিছু বলে না। আমি দৌড়ে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটি কাগজ আর কলম নিয়ে আসি।

'তোমার মা জানে এসব?'—বাবা কাগজটি কিয়ার্কেগার্ডের বইটির উপর রাখে, যে বইটি বাবা বহুদিন ধরে পড়ছে কিন্তু শেষ করতে পারছে না। 'আমি লিখব তুমি স্কুলে যাবে কিন্তু টিকা দেবে না'—বাবা বলে।

লিখে কাগজটিতে সাইন করে বাবা। আমি ফুঁ দিয়ে কাগজের কালি শুকাই এবং তারপর সেটা ভাঁজ করে আমার পকেটে ঢোকাই। আমাদের শোবার ঘরে ফিরে আমি চুপ করে কাগজটি আমার ব্যাগের ভেতর রেখে দিই এবং তারপর বিছানায় উঠে লাফাতে থাকি।

'ব্যস্ অনেক হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো'—মা বলে।

২

স্কুলে লাঞ্চের ঠিক পর পর পুরো ক্লাস লাইন ধরে ঐ বিশেষ গন্ধওয়ালা কাফেটারিয়ার দিকে যায় টিকা নেবার জন্য। কেউ কেউ কাঁদতে থাকে, বাকিরা তাদের পালা আসবার জন্য ভয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভয়ে অপেক্ষা করে। সিঁড়ির ওপার থেকে আইওডিনের গন্ধ ভেসে আসতে থাকলে আমার বুক ধড়ফড় করতে থাকে। আমি লাইন থেকে বের হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকটির কাছে যাই। পুরো ক্লাস হৈ চৈ করতে করতে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়।

'হ্যাঁ, কী ব্যাপার তোমার?'—শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন।

বাবার সাইন করা কাগজটি পকেট থেকে বের করে আমি শিক্ষককে দিই। তিনি ভুরু উঁচু করে বিরক্তমুখে সেটি পড়েন। 'তোমার বাবা তো কোনো ডাক্তার না বুঝলে?' কথাটা বলে তিনি কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর বলেন—'আচ্ছা তুমি উপরতলায় রুম ২এ-তে গিয়ে বসো।'

আমার মতো টিকা দেয়া মাফ পেয়েছে এমন ৬/৭ টা ছেলে বসে আছে রুম ২এ-তে। একজন দারুণ ভয় পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। করিডোর থেকে ভয়ার্ত চিৎকার আর কান্না শোনা যাচ্ছে। চশমা-পরা একটি মোটা ছেলে বসে কুমড়ার বিচি চিবাতে চিবাতে কিনোভা কমিক বই পড়ছে। দরজা খোলে এবং সেখানে দেখা দেন আমাদের লিকলিকে ডেপুটি হেডমাস্টার সেইফি বে।

তিনি বলেন—'আমি জানি তোমাদের মধ্যে কারো কারো সত্যিই শরীর খারাপ, তাদের আর নিচতলায় নেয়া হবে না। তবে যারা টিকা থেকে বাঁচবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছ তাদের আমার কিছু কথা আছে। একদিন তোমরা বড় হবে, দেশের জন্য কিছু করবে, হয়তো দেশের জন্য প্রাণও দেবে। আজকে তুমি স্রেফ একটা টিকার ভয়ে পালাচ্ছ কিন্তু বড় হয়ে তুমি যদি এরকম কিছু করো যার কোনো সঠিক কারণ নাই তাহলে তুমি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে। শেম।'

একটা দীর্ঘ নীরবতা। আমি দেয়ালে টানানো আতাতুর্কের ছবির দিকে তাকাই। আমার দুচোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

পরে আমরা যার যার ক্লাসে চলে যাই। কেউ টের পায় না। যে ছেলেরা টিকা নিয়েছে তারা ক্লাসে ফিরতে থাকে। কারো শার্টের হাত গুটানো, কারো চোখে পানি, কেউ মুখ পেঁচার মতো করে রেখেছে।

'যাদের বাসা কাছাকাছি তারা চলে যেতে পারো'—বলেন টিচার। 'আর যাদের নিয়ে যাবার কেউ নাই তারা শেষ বেল বাজা পর্যন্ত বসে থাকবে। আর একজন আরেকজনের হাতে কিল ঘুষি মারবে না। বুঝতে পেরেছ? আর কালকে সবার ছুটি।'

একথা শুনে হৈ হৈ করে উঠে সবাই। কেউ কেউ তাদের হাত চেপে ধরে স্কুল থেকে চলে যায়, কেউ কেউ তাদের হাত থেকে গড়িয়ে পড়া আয়োডিনের স্রোত দেখায় আমাদের দারোয়ান [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি একটানে আমার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় নেমে দৌড়াতে শুরু করি। কারাবেতের মাংসের দোকানের সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি ট্রাফিক জ্যাম বাধিয়ে দিয়েছে। আমি সব গাড়ির ফাঁকফোকর গলিয়ে ছুটে যাই রাস্তার ওপারে আমাদের বাসায়। আমি হাইরির কাপড়ের দোকান, সালিয়ার ফুলের দোকান পেরিয়ে যাই। আমাদের দারোয়ান হাজিম ইফেন্দি আমাকে গেট খুলে ভেতরে ঢোকান।

'তুমি এসময় একা একা কেন?'—তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

'আজকে স্কুলে টিকা দিয়েছে সবাইকে আর আগে আগে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।'

'তোমার ভাই কই? তুমি একা এসেছ?'

'আমি একা একাই রাস্তা পার হয়েছি। কালকেও আমাদের ছুটি।'

'তোমার মা বাইরে। উপরে তোমার দাদির ওখানে যাও।'

'আমার শরীর ভালো লাগছে না, আমি আমাদের বাসায় যেতে যাই। আপনি আমাদের বাসার তালাটা খুলে দেন।'

তিনি দেয়ালে ঝোলানো একটি চাবি হাতে নেন এবং আমরা লিফটে গিয়ে উঠি। আমরা আমাদের ফ্লোরে যেতে যেতে হাজিম তার সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে ভরিয়ে ফেলে লিফট, আমার চোখ জ্বলতে থাকে। উনি আমাদের বাসার দরজা খোলেন। দরজা বন্ধ করতে করতে তিনি বলেন—'ইলেকট্রিকের সকেট টকেট নিয়ে খেলবে না কিন্তু!'

বাসায় কেউ নেই জানি তবু আমি চিৎকার করি—'কেউ আছে বাসায়?'

আমি আমার ব্যাগ ছুড়ে ফেলে দিই ফ্লোরে তারপর ভাইয়ের ড্রয়ারটা খুলি। দেখি সেখানে তার জমানো অনেক সিনেমার টিকিট, যা ও আমাকে আগে কখনো দেখায়নি। এরপর আমি ওর নোটবইটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকি যেখানে সে বিভিন্ন ফুটবল খেলার ছবির পেপারকাটিং আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখেছে। আমি এসময় বাইরে পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারি, বাবা আসছে। আমি তাড়াতাড়ি ভাইয়ের সিনেমার টিকিট আর স্ক্রাব বইটি ভালো করে আগের জায়গায় রেখে দিই যাতে সে বুঝতে না পারে যে আমি ওগুলো ধরেছি।

বাবা বেডরুমে ঢুকে তার ওয়াড্রপ খোলে।

'তুমি বাসায় চলে আসছ?'

'না, আমি তো প্যারিসে।'—কেউ আমাদের স্কুলে কাউকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সবাই এরকমই উত্তর দেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আজকে স্কুলে যাওনি?'

'আজকে আমাদের সবাইকে টিকা দিয়েছে।'

'তোমার ভাইয়া আসেনি? আচ্ছা ঠিক আছে তোমার ঘরে যাও এবং দেখি কেমন লক্ষ্মী হয়ে থাকতে পারো।'

আমি তাই করি। আমি জানালায় কপাল ঠেকিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। হলওয়ের কাছের শব্দ থেকে বুঝতে পারি সেখান থেকে বাবা একটি সুটকেস বের করছে। পাশের ঘরে হ্যাঙ্গারের শব্দ থেকে বুঝতে পারি বাবা তার ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে জ্যাকেট আর ট্রাউজার বের করছে। বাবা ওয়াড্রপের ড্রয়ারগুলো খুলতে আর বন্ধ করতে থাকে যেখানে তার শার্ট, মোজা, আন্ডারওয়্যার রাখা আছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম বাবা এসব তার সুটকেসে ঢোকাচ্ছে। বাবা বাথরুমে যায়, বেরিয়ে আসে আবার। বাবা সুটকেস বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেয়। তারপর সে আমার ঘরে আসে—

'কী করছিলে এতক্ষণ?'

'আমি জানালায় তাকিয়ে ছিলাম।'

'আসো আমরা দুইজন মিলে একসাথে জানালা দিয়ে দেখি।'

বাবা আমাকে কোলে নেয় এবং আমরা দুজন মিলে অনেক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। আমাদের আর সামনের অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানের লম্বা সাইপ্রেস গাছটির মাথা বাতাসে ওড়ে। বাবার গায়ের গন্ধ ভালো লাগে আমার।

'আমি অনেক দুরে চলে যাচ্ছি'—বাবা বলে। আমাকে চুমু খায়। 'তোমার মাকে বোলো না, আমিই পরে বলব।'

'তুমি কি প্লেনে করে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কাউকে একথা বোলো না, ঠিক আছে?'—বলে বাবা। আমার হাতে আড়াই লিরার বড় একটি কয়েন গুঁজে দেয় বাবা এবং আমাকে আবার চুমু খায়। 'তুমি যে আমাকে দেখেছ, সেটাও কাউকে বলবে না।'

আমি কয়েনটি আমার পকেটে ঢোকাই। আমাকে কোল থেকে নামিয়ে বাবা যখন তার সুটকেস তুলে নেয় আমি বলি—'যেয়ো না বাবা।' বাবা আমাকে আর একবার চুমু খায় এবং চলে যায়।

আমি জানলা দিয়ে তাকে দেখি। বাবা সোজা আলাদ্দিনের দোকানে যায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সি থামায়। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে সে আর একবার আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অ্যাপার্টমেন্টের দিকে উঁচু হয়ে তাকায় এবং আমার দিকে হাত নাড়ায়। আমিও হাত নাড়াই এবং বাবা চলে যায়।

জানালা দিয়ে রাস্তার ঐ মোড়টার দিকে আমি তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ। একটা ট্রাম চলে যায়, তারপর ভিস্তিওয়ালার ঘোড়ার গাড়ি। আমি বেল বাজিয়ে হাজিম আফেন্দিকে ডাকি।

'তুমি বেল বাজিয়েছ? বেল নিয়ে খেলবে না'—দরজায় এসে বলেন হাজিম।

আমি বলি—'এই আড়াই লিরা কয়েনটা নেন, আলাদ্দিনের দোকান থেকে আমার জন্য ফেমাস পিপল সিরিজের দশটা চুইংগাম এনে দেন। পঞ্চাশ কুরু ভাংতি আনতে ভুলেন না কিন্তু।'

'তোমার বাবা এই পয়সাটা দিয়েছে? তোমার মা আবার রেগে না যায়'—তিনি বলেন।

আমি চুপ থাকি, তিনি চলে যান। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে তাকে আলাদ্দিনের দোকানে যেতে দেখি। একটু পরেই চলে আসেন তিনি। আসার পথে তার সঙ্গে দেখা হয় মারামা অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ানের সঙ্গে, দেখি তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করেন।

ফিরে এসে তিনি আমাকে খুচরা পয়সাটি ফেরত দেন। আমি সাথে সাথে চুইংগামের প্যাকেটগুলো খুলি। আরো তিনটি ফেজভি কাকমাক, একটি আতাতুর্ক, একটি করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, সুলিমান দি ম্যাগনিফিশেন্ট, চার্চিল, জেনারেল ফ্রাঙ্কো, এবং আরো একটি নাম্বার ২১, গ্রেটা গার্বো, যেটি আমার ভাই তখনও পায়নি। আমার তাহলে এখন মোট ১৮৩টা ছবি। কিন্তু ১০০ জন বিখ্যাত লোকের পুরো সেটটি করতে আমার আরো ২৬টি ছবি দরকার।

আমি যখন দরজায় চাবির শব্দ পাই তখন ৯ নাম্বার কার্ডটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছি, যেখানে সেই প্লেনটির ছবি আছে যেটিতে চড়ে লিন্ডবার্গ প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। আমার মা! চুইংগামের যে খোসাগুলো আমি মেঝেতে ছড়িয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বিনে ফেলি।

'আমাদের আজকে টিকা দিয়েছে, টাইফয়েড, টাইফাস, টিটেনাস, আমি তাই আগে আগে চলে এসেছি।'

'তোমার ভাইয়া কই?'

'ওদের তখনও টিকা দেয়া হয়নি। আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি একা একাই রাস্তার মোড়টা পার হয়েছি।'

'তোমার হাতে ব্যথা...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি কিছু বলি না। একটু পরে আমার ভাই বাসায় আসে। ওর হাতে খুব ব্যথা হচ্ছিল। সে অন্য হাতের উপর ভর দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বেচারাকে করুণ দেখায়। ও যখন ঘুম থেকে উঠে বাইরে তখন অন্ধকার। ঘুম থেকে উঠে সে বলে—'মা, হাতে খুব ব্যথা করছে।'

অন্য ঘরে ইস্ত্রি করতে করতে মা বলে—'পরে তোমার একটু জ্বর জ্বরও লাগতে পারে। আলী তোমার হাতও কি ব্যথা করছে? চুপচাপ শুয়ে থাকো, নড়াচড়া করবে না।'

আমরা বিছানায় টান টান শুয়ে থাকি। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ভাই উঠে পেপারের স্পোর্টস পাতাটা পড়তে থাকে। সে বলে কালকে আমার জন্যই খেলার মাঠ থেকে আগে চলে আসতে হয়েছে আর আমরা চলে এসেছি বলেই আমাদের দলটি চারটি গোল মিস করেছে।

'আমরা না আসলেও ওরা ঐ গোল করতে পারত না'—আমি বলি।

'কী?'

কিছুক্ষণ ঝিমানোর পর ভাই আমাকে ছয়টি ফেভজি কাকমাক, চারটি আতাতুর্ক আর তিনটি অন্য কার্ডের বদলে আমার কাছ থেকে একটি গ্রেটা গার্বো চায়। আমি দিই না।

'টপ বটম খেলবি?'—সে জিজ্ঞাসা করে।

'আচ্ছা, চল্ খেলি।'

নিয়ম হচ্ছে, কার্ডের পুরো বান্ডিলটি হাতের তালুর উপর রাখতে হবে এবং একজন জিজ্ঞাসা করবে—টপ না বটম? যদি সে বলে বটম, তাহলে বান্ডিলের শেষ কার্ডটা দেখা হবে। ধরা যাক দেখা গেল সেখানে আছে নাম্বার ৬৮, রিটা হাওয়ার্থ আর বান্ডিলের সবার উপর আছে ১৮ নাম্বার, কবি দান্তে। যেহেতু বটম নাম্বারটি টপের চেয়ে বেশি, বটম জিতবে। তাহলে যে জিতল সে যে কার্ডটি তার সবচেয়ে অপছন্দ, অর্থাৎ যে কার্ডটি ইতিমধ্যেই তার সবচেয়ে বেশি আছে সেটি অপরজনকে দিয়ে দেবে।

আমরা এক ফিল্ড মার্শাল ফেবজি কাকমাকের ছবি চালাচালি করতে করতে রাতের খাবারের সময় হয়ে যায়।

'একজন উপরে গিয়ে দ্যাখো তো তোমার বাবা এসেছে কিনা?'—মা বলে।

আমরা দুজনই উপরে যাই। দাদির সাথে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন আমার চাচা। বাবা নেই। আমরা রেডিওতে খবর শুনি, খবরের কাগজের স্পোর্টসের পাতাটি পড়ি। দাদি খেতে বসলে আমরা নিচে চলে আসি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এতক্ষণ ধরে কী করলে তোমরা?' মা বলে—'উপরে তো খাওনি কিছু, তাই না? তোমাদের একটু ডালের স্যুপ দিই, আস্তে আস্তে খেতে থাকো এর মধ্যেই তোমার বাবা চলে আসবে।'

'রুটি টোস্ট নাই?'—আমার ভাই বলে।

আমরা যখন চুপচাপ স্যুপ খাচ্ছি, মা আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা যেভাবে মাথাটি একটু কাত করে রেখেছে, যেভাবে মাঝে মাঝে তার চোখ আমাদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে তাতে আমি বুঝতে পাচ্ছি মা লিফটের শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে। আমাদের স্যুপ শেষ হয়ে গেলে মা বলে—'আরেকটু স্যুপ নেবে?' আমাদের বাটির দিকে তাকিয়ে থাকে মা।

'ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে আমিও খেয়ে নিই, কি বলো?'—বলে মা। কিন্তু স্যুপ না-খেয়ে বরং মা জানালার কাছে গিয়ে নিশানতাশির মোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। জানালায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মা। তারপর ঘুরে টেবিলে এসে তার স্যুপটা খায়। আমি আর আমার ভাই গতকালের খেলাটি নিয়ে আলাপ করি।

'চুপ চুপ, লিফটের শব্দ না?'

আমরা চুপ করে যাই এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। না, ওটা লিফটের শব্দ না। রাস্তায় একটি ট্রাম যায়, ঘরে আমাদের টেবিলটি নড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে গ্লাস, জগ, জগের ভেতর পানি। আমরা যখন আমাদের কমলাগুলো খাচ্ছি তখন নিশ্চিত আমরা লিফটের শব্দ শুনি। লিফটটি আস্তে আস্তে আমাদের কাছাকাছি আসে। কিন্তু না, আমাদের ফ্লোরে না দাঁড়িয়ে সেটি চলে যায় উপরে দাদির ফ্লোরে। 'ওটা তো উপরেই চলে গেল'—মা বলে।

আমাদের খাওয়া শেষ হলে মা বলে—'তোমাদের প্লেটগুলো কিচেনে নিয়ে যাও আর তোমাদের বাবার প্লেটটা ওখানেই থাক।' আমরা টেবিল পরিষ্কার করি। বাবার পারিষ্কার প্লেটটি একা টেবিলে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ।

আমাদের যে জানালা দিয়ে নিচে পুলিশস্টেশন দেখা যায়, মা সে জানলায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ সে যেন মনস্থির করে ফেলে। বাবার খালি প্লেট, ছুরি, চামচ টেবিল থেকে উঠিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে যায় মা। 'আমি উপরে তোমার দাদির ওখানে যাচ্ছি, তোমরা মারামারি করবে না একদম'—বলে মা।

আমি আর আমার ভাই আমাদের টপ আর বটম খেলা শুরু করি।

আমি প্রথমবারের মতো বলি—'টপ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাই কার্ডটা ওঠায়, নাম্বার ৩৪, বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর কোকা ইউসুফ। সে একদম নিচের কার্ডটা বের করে নাম্বার ৫০, আতাতুর্ক। 'তুই হেরেছিস, দে কার্ড দে।'

আমরা অনেকক্ষণ ধরে খেলি আর বারবার ভাই জেতে। সে আমার কাছ থেকে ১৯টি ফেভজি কাকমাক আর ২টি আতাতুর্ক নিয়ে নেয়।

'আমি আর খেলব না, আমি উপরে যাচ্ছি মার কাছে'—আমি বলি।

'মা রেগে যাবে।'

'ভিতু। আসলে বাসায় একা থাকতে ভয় পাচ্ছ, না?'

বরাবরের মতো দাদির দরজা খোলা। রাতের খাওয়া শেষ, বাবুর্চি বেকির প্লেট বাটিগুলো ধুচ্ছে। দাদি আর চাচা মুখোমুখি বসে আছেন। মা জানালায় দাঁড়িয়ে নিশানতাশির মোড়ে তাকিয়ে আছে।

জানালার দিকে তাকিয়েই মা বলে—'আসো, এদিকে আস।' আমি মা আর জানালার মাঝের ফাঁকা জায়গাটিতে চলে যাই যেন জায়গাটি আমার জন্যই রিজার্ভ করা ছিল। মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে আমিও জানালা দিয়ে নিশানতাসির মোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। মা, আমার মাথার উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে থাকে।

'শুনলাম তোমার বাবা আজকে দুপুরে বাসায় এসেছিল, তোমার সাথে তো দেখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা একটা স্যুটকেস নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে, হাজিম এফেন্দি দেখেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে বলেছে কোথায় গেছে?'

'না, আমাকে আড়াই লিরা দিয়েছে।'

নিচের রাস্তা, মোড়ের অন্ধকার দোকানগুলো, গাড়ির লাইট, রাস্তার মাঝখানে ঐ ট্রাফিক আইল্যান্ড, ভেজা পাথুরে ফুটপাথ, গাছ থেকে ঝোলানো বিজ্ঞাপনগুলোর অক্ষর সব কেমন যেন একা আর বিষণ্ন। বৃষ্টি হতে শুরু করে। মা আমার চুলে আঙুল বুলাতে থাকে।

ঠিক সেসময় আমি খেয়াল করি, দাদি আর চাচার চেয়ারের মাঝখানে রাখা রেডিওটি, যা চলছিল এতক্ষণ, তা বন্ধ। কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে আমার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'জানালায় ওভাবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না মা'—দাদি মাকে বলে।

আমার ভাই ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে।

'তোমরা দুইজন রান্নাঘরে যাও'—আমার চাচা বলে। 'এই বেকির, ছেলে দুটাকে একটা বল বানিয়ে দাও তো ওরা ঐ হলওয়েতে খেলুক।'

রান্নাঘরে বেকিরের প্লেট বাটি ধোয়া শেষ। 'ওখানে বসো'—উনি বলেন আমাদের। কাচ ঘেরা যে বারান্দাটিকে দাদি গ্রিন হাউজ বানিয়েছে সেখানে গিয়ে বেকির অনেকগুলো খবরের কাগজ নিয়ে আসেন এবং সেগুলো মুচড়িয়ে একটি বল বানান। বেশ বড় একটি মণ্ড বানিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করেন—'এটা চলবে?'

'আরো কয়েকটা কাগজ পেঁচান'—ভাই বলে।

বেকির যখন আরো কয়েকটি খবরের কাগজ পেঁচাচ্ছেন আমি তখন দরজা দিয়ে দাদি, চাচা আর মা'কে দেখি। ড্রয়ার থেকে একটি সুতা বের করে বেকির ঐ মণ্ডটিকে পেঁচাতে থাকেন যতক্ষণ না সেটা একটা গোল বলের মতো হয়। এর চোখা কোণাগুলিকে উনি একটা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে চেপে চেপে দেন। ভাই বলটি ধরবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে।

'এটা তো একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।'

'এই জায়গায় একটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরো তো'—বলেন বেকির।

ভাই সুতার গিঁটটার উপর আঙুল দিয়ে চেপে ধরে থাকে এবং বেকির তাতে শেষ গিঁটটা দেয়। বল বানানো শেষ হয়।

'হলওয়েতে গিয়ে খেলো, এখানে খেললে জিনিসপত্র সব ভেঙে ফেলবে'—বলেন বেকির।

আমরা অনেকক্ষণ ধরে মনের মতো করে খেলি। আমি ভান করি আমি যেন ফেনেরবাকের লেফটার, তার মতোই ঘুরে বল ট্যাকল করতে থাকি। আমি যখনই দেয়ালের দিকে পাস করবার চেষ্টা করি তখনই ভাইয়ের যে হাতটায় ব্যথা সেখানে একটু ধাক্কা দিই। সেও আমাকে জোরে ধাক্কা দেয় কিন্তু আমার কোনো ব্যথা লাগে না। আমরা দুজনই ঘামতে থাকি, বলটি ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যায় এবং আমি পাঁচ-তিন গোলে জিততে থাকি। এসময় আমি ভাইয়ের ব্যথার হাতটিতে বেশ জোরে একটা ধাক্কা দিই। ও মেঝেতে শুয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

শুয়ে শুয়ে সে বলে—'দাঁড়া আমার হাতটা ভালো হয়ে নিক, আমি তোকে খুন করব।'

ও খেপে গেছে কারণ ও হেরে গেছে। আমি হলওয়ে ছেড়ে বসার ঘরে যাই। আমার দাদি, মা, চাচা সবাই গেছে স্টাডিরুমে। দাদি ফোনে ডায়াল করছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'হ্যালো মা, এটা কি ইয়সিলকয় এয়ারপোর্ট?'—ঠিক এভাবে দাদি আমার মা'র সঙ্গেও কথা বলেন। 'আচ্ছা শোনো মা, আমরা একজন যাত্রীর ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাই যে আজ দুপুরের দিকে ইউরোপ গেছে।' দাদি আমার বাবার নাম বলেন এবং টেলিফোনের তারটিকে আঙুলে জড়াতে জড়াতে অপেক্ষা করতে থাকেন। 'আমার সিগারেটটা দাও তো'—দাদি চাচাকে বলেন। চাচা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান দাদি তখন রিসিভারটা মুখ থেকে দূরে নিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আচ্ছা মা, সত্যি করে বলো তো, তুমি তো জানবে, অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক টম্পর্ক নাই তো?'

মা কী উত্তর দেয় আমি শুনতে পাই না। দাদি এমনভাবে মার দিকে তাকিয়ে আছেন যেন মা কিছুই বলেনি। এরপর টেলিফোনের অপরপ্রান্তে যে আছে সে কী যেন বলে আর দাদি রেগে যান। চাচা সিগারেট আর অ্যাশট্রে নিয়ে ফিরে এলে দাদি বলেন—'ওরা আমাদের বলবে না।'

মা যখন লক্ষ করে যে চাচা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, ঠিক তখনই টের পায় যে আমি ওখানে আছি। মা আমাকে আবার হলওয়েতে রেখে আসে। আমার পিঠে, গলায় হাত দিয়ে দেখে আমি অনেক ঘেমে গেছি কিন্তু মা কিছু বলে না।

'আমার হাতে ভীষণ ব্যথা করছে না'—ভাই বলে।

'তোমরা দুজন এখনই নিচতলায় যাও। ঘুমানোর সময় হয়েছে।'

নিচতলায় গিয়ে আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকি। ঘুমানোর আগে এক গ্লাস পানি খাবার জন্য আমি পায়জামা পরে রান্নাঘরে যাই, তারপর যাই বসবার ঘরে। দেখি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মা সিগারেট খাচ্ছে। প্রথমে মা টের পায়নি যে আমি এসেছি। তারপর বলে—'খালি পায়ে হেঁটো না, ঠাণ্ডা লাগবে। ভাই শুয়েছে?'

'ও ঘুমিয়ে পড়েছে মা। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।' মা আর জানালার মাঝখানে আমার জায়গা করে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করি। মা তার সামনের ঐ মিষ্টি জায়গাটুকু আমার জন্য খুলে দেয়, আমি তার ভেতরে ঢুকে যাই। বলি—'বাবা, প্যারিসে গেছে, জানো মা বাবা কোন্ সুটকেসটা নিয়েছে?'

মা নীরব থাকে। এই নীরবতার মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভেজা রাস্তা দেখি দুজন।

৩

ট্রাম লাইনের শেষে, সিসলি মসজিদের পাশে আমার নানির বাসা। এখন ঐ মোড়টায় বাসস্টপের ঝঞ্ঝাট, উঁচু কুৎসিত সব বিল্ডিং, নানা সাইনবোর্ডে ঢাকা ডিপার্টমেন্টাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্টোর আর অফিসের কর্মচারীদের ভিড় যারা দুপুরে একপাল পিঁপড়ার মতো বেরিয়ে আসে ফুটপাথে কিন্তু সেসময় ঐ জায়গাটি ছিল ইউরোপ সীমানার গা ঘেঁষে। বাসা থেকে বেরিয়ে ওখানে পৌঁছাতে লাগে ১৫ মিনিট। মায়ের হাত ধরে যখন মালবেরি গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল বুঝি কোনো গ্রামে চলে এসেছি।

আমার নানি পাথর আর কংক্রিটের তৈরি এক চারতলা দালানে থাকেন। দালানটি দেখতে কাত করে রাখা এক ম্যাচবক্সের মতো। বাড়িটির পশ্চিমে ইস্তাম্বুল শহর আর পেছনে মালবেরি বাগানের পাহাড়। আমার নানা মারা গেলে এবং তার তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ঐ বাড়ির একটি ঘরে থাকতে শুরু করেন নানি, যে ঘর ঠাসা শুধু ওয়াড্রপ, টেবিল, ট্রে, পিয়ানো আরো বিচিত্র সব ফার্নিচারে। আমার এক খালা তার জন্য রান্না করে কখনো নিজেই নিয়ে আসেন, কখনো একটি টিফিন ক্যারিয়ারে করে ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দেন। নানি তার রুম ছেড়ে ঠিক পাশের রান্নাঘরেই রান্না করতে যাবেন না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। উনি এমনকি ঐ বাড়ির আর কোনো ঘরেই যেতেন না যে ঘরগুলো ঢেকে আছে ঘন ধুলার চাদরে আর রেশমি মাকড়সার জালে। নানির মাও তার জীবনের শেষ বছরগুলো একটা বিরাট কাঠের বাগানবাড়িতে এভাবেই একা কাটিয়েছেন। আমার নানিকেও তার মা'র মতো এক রহস্যময় নিঃসঙ্গতার রোগে ধরেছিল। তিনি তার বাড়িতে এমনকি কোনো ঝাড়ুদার বা কেয়ারটেকারকেও ঢুকতে দিতেন না।

আমরা যখন তার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম আমার মা অনেকক্ষণ কলিংবেল চেপে থাকত তারপর লোহার গেটে ধাক্কাধাক্কি করত যতক্ষণ-না নানি মসজিদের দিকের দোতালার জানালার মরচে-পড়া শাটারটা খুলে উপর থেকে নিচে আমাদের দিকে তাকাতেন। যেহেতু তিনি তার চোখকে বিশ্বাস করতেন না, আসলে তিনি বেশিদূর দেখতে পারতেন না, তাই আমাদের বলতেন নিচ থেকে হাত নাড়াতে।

'ছেলেরা এদিকে আসো তো, যাতে নানি তোমাদের দেখতে পায়'—আমাদের সাথে সাথে ফুটপাথের মাঝামাঝি এসে মা চিৎকার করে বলে—'মা, আমি বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি, তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

তার মিষ্টি হাসি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আমাদের চিনতে পেরেছেন। একটু পরেই জানালা থেকে সরে তিনি ভিতরে যান, তার বালিশের নিচে রাখা বিশাল চাবিটি একটি খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নিচে ফেলে দেন। আমি আর আমার ভাই ধাক্কাধাক্কি করতে থাকি চাবিটি ক্যাচ ধরবার জন্য।

আমার ভাইয়ের হাতে তখনও টিকার ব্যথা থাকার কারণে সে বেশি তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারে না, ক্যাচটি আমিই ধরি এবং চাবিটি মাকে দিই। [illegible] করে মা শেষপর্যন্ত ঐ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশাল লোহার গেটটি খোলে। আমরা তিনজন মিলে ঠেলতে থাকলে গেটটি আস্তে আস্তে খোলে এবং সামনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই গন্ধ যা আমি আর কোথাও কখনো পাইনি—ক্ষয়, ধুলা আর বদ্ধ বাতাসের এক গন্ধ।' চোর-ডাকাতদের সাবধান করবার জন্য দরজার পাশের কোট র‍্যাকে নানি আমার মৃত নানার ফেল্ট হ্যাট আর ফার কলারের কোটটা রেখে দিতেন যাতে মনে হয় বাড়িতে কোনো পুরুষ আছে। আর অন্য এককোণে থাকত নানার জুতা যা দেখে সবসময় আমার কেমন যেন একটি ভয় হতো।

একটু পরে, খাড়া দুটো সিঁড়ির মাথায়, অনেক দূরে শাদা আলোয় আমরা নানিকে দেখি। তাকে কেমন ভূতের মতো দেখায়, ছায়ায় তার লাঠির উপর ভর করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, শুধুমাত্র কারুকাজ-করা দরজার পেছন থেকে একটু আলো এসে পড়ছে তার উপর। কাঠের সিঁড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে উপরে উঠতে উঠতে মা এবার কিছুই বলে না (মা সাধারণত বলে, কেমন আছ মা? মা, তোমাকে এত মিস করেছি, বাইরে কী ঠাণ্ডা ইত্যাদি)। আমি সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে উঠে নানির হাতে চুমু খাই, চেষ্টা করি তার মুখের দিকে কিম্বা তার কব্জির বিরাট তিলটার দিকে না-তাকাতে। তবু তার মাড়ির একটি নিঃসঙ্গ দাঁত, তার লম্বা চিবুক, চিবুকে কয়েকটি দাড়ি দেখে আমাদের দু ভাইয়ের কেমন যেন ভয় লাগে। ঘরে ঢুকে আমরা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকি। নানি তার বিছানায় ফিরে যান, যেখানে তিনি তার লম্বা নাইটগাউন, আর উলের সোয়েটার পরে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটান। সেখানে শুয়ে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং এমন একটি ভাব করেন যেন বলছেন, দেখি বাবারা এবার একটু তামাশা দেখাও তো আমাকে।

'তোমার স্টোভটা তো ভালো কাজ করছে না মা'—বলে আমার মা এবং স্টোভের কয়লাগুলো একটু নেড়ে দেয়।

নানি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে—'স্টোভের কথা বাদ দে। আমাকে নতুন কিছু শোনা। পৃথিবীতে কোথায় কী হচ্ছে বল্।'

'না, তেমন কিছুই না'—আমাদের পাশে বসে বলে মা।

'আমাকে কিচ্ছু বলার নাই তোর?'

'না মা কিচ্ছু বলার নাই।'

একটি সংক্ষিপ্ত নীরবতার পর নানি বলেন—'কারো সাথে দেখা হয়নি তোর?'

'সেসব তো তুমি জানো।'

'সত্যিই কোনো খবর নাই তোর কাছে?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা নিস্তব্ধতা চারিদিকে।

'নানি জানো আমাদের না স্কুলে টিকা দিয়েছে'—আমি বলি।

তার বিরাট নীল চোখ বড় বড় করে নানি বলেন—'তাই নাকি?'—যেন তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। বলেন—'ব্যথা লেগেছে?'

'আমার হাতে এখনও ব্যথা আছে'—আমার ভাই বলে।

নানি হেসে বলেন—'আহারে বেচারা।'

আবার একটা নীরবতা। আমি এবং আমার ভাই গিয়ে জানালায় দাঁড়াই, সেখান থেকে দূরে পাহাড় দেখা যায়, দেখা যায় মালবেরি বাগান আর পেছনের উঠানের মুরগির খোপ।

'আমাকে বলার কোনো গল্প তাহলে নাই তোর? উপরতলায় তোর শাশুড়ির ওখানে তো যাস, আর কারো সাথে দেখা হয় না ওখানে?'

'গতকাল বিকালে দিলরুবা হানিম এসেছিল, বাচ্চাদের দাদির সাথে বসে বেযিক খেলল'—বলে আমার মা।

বেশ খুশি হয়ে নানি বলেন, যা আমরাও প্রত্যাশা করছিলাম—'ও সেই প্যালেস কন্যা!'

আমরা জানি রূপকথার বই আর পত্রিকায় যে ক্রিম কালারের প্যালেসের ছবি থাকে নানি সেই প্যালেসের কথা বলছেন না বরং তিনি ডোমবালাক প্যালেসের কথা বলছেন। আমি অনেক পরে বুঝেছিলাম যে আমার নানি দিলরুবা হানিমকে অপছন্দ করতেন। দিলরুবা যিনি শেষ সুলতানের হারেম থেকে এসেছেন কারণ একজন ব্যবসায়ীকে বিয়ে করবার আগে তিনি ঐ হারেমের একজন উপপত্নী ছিলেন। আরো বুঝেছি যে নানি আমার দাদিকেও অপছন্দ করেন কারণ উনি দিলরুবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন।

তারপর মা আর নানি অন্য বিষয়ে আলাপ শুরু করে। আমার মা দেখা করতে এলেই তারা সাধারণত এ বিষয়ে আলাপ করে থাকে—সপ্তাহে একদিন আমার নানি একা আপটুল্লাহ এফেন্দি নামে বেওগলুর বিখ্যাত এবং খুব দামি একটি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে যান এবং তারপর তিনি সেখানে যা-কিছু খেয়েছেন তা নিয়ে নানা অভিযোগ করতে থাকেন। এরপর নানি তার তৃতীয় রেডিমেড বিষয়টি তোলেন এই প্রশ্নের মাধ্যমে—'বাচ্চারা, তোমাদের দাদি কি তোমাদের পার্সলি খাওয়ায়?'

আমরা দুইভাই আমাদের মায়ের শিখিয়ে দেয়া উত্তরটি একসাথে বলি—'না নানি, উনি তো খাওয়ান না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর নানি বলতে থাকেন যে তিনি একদিন একটি বিড়ালকে দেখেছেন বাগানের পার্সলি পাতার উপর পেশাব করতে এবং তিনি মনে করেন ঐ পাতাই কোনোরকম ধুয়েটুয়ে কোনো একটি ইডিয়ট ধরনের খাবার রান্না করা হয়। এবং কীভাবে তিনি এখনও সিসলি এবং নিশানতাসির সবজিওয়ালাদের সাথে এনিয়ে ঝগড়া করেন, সেকথা বলেন।

'মা, বাচ্চারা বোরড হয়ে যাচ্ছে, ওরা একটু অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখুক। আমি পাশের দরজাটা খুলে দিচ্ছি'—মা বলে।

নানি তার বাড়ির সবগুলো রুম বাইরে থেকে বন্ধ করে রেখেছেন যাতে কোনো চোর জানালা দিয়ে ঢুকে গেলেও অন্য ঘরে যেতে না পারে। ট্রাম লাইনের দিকে মুখ করা বড় ঠাণ্ডা ঘরটি মা খোলে এবং কিছুক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে হাতলওয়ালা চেয়ার, ডিভান, তার উপর ধুলোমাখা কভার, জং ধরা ধুলো ভরা ল্যাম্প, ট্রে, চেয়ার, পুরনো খবরের কাগজের বান্ডিল, ছেঁড়া ঘোড়ার জিন এবং কোণায় রাখা একটি মেয়েদের সাইকেলের ভেঙে পড়া হ্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অন্যবার যখন তার মন ভালো থাকে মা আমাদের পুরনো ট্রাঙ্ক খুলে দেখায়, এবার তা দেখায়নি। (জানো তোমাদের মা যখন ছোট ছিল তখন এই স্যান্ডেলটা পরত, দ্যাখো এটা তোমার খালার স্কুলড্রেস, বাচ্চারা তোমার মা'র ছোটবেলার মাটির ব্যাংকটা দেখবে?)

'তোমাদের ঠাণ্ডা লাগলে আমাকে বোলো'—বলে মা চলে যায়।

আমি আর ভাই গিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মসজিদ আর ট্রাম দেখি। তারপর আমরা পুরনো খবরের কাগজে ফুটবল ম্যাচের খবর পড়ি।

'আমার বোর লাগছে, টপ আর বটম খেলবে?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'হারু কুস্তিগীর আবার খেলতে চায়। আমি এখন পেপার পড়ছি'—পেপার থেকে চোখ না উঠিয়েই সে বলে।

সে সকালে এরপর আমরা আবার খেলি এবং আমার ভাই আবার জেতে।

'প্লিজ।'

'আচ্ছা তাহলে আমার একটা শর্ত আছে। আমি জিতলে তুই আমাকে দুটা ছবি দিবি আর তুই জিতলে আমি দিব একটা।'

'না, আমিও একটাই দিব।'

'তাহলে আমি খেলব [illegible] পেপার পড়ছি'—ভাই বলে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঞ্জেল থিয়েটারে আমরা সম্প্রতি যে ছবিটি দেখেছি তাতে ডিটেকটিভটি যেভাবে পেপারটা ধরেছিল ভাই ঠিক সেভাবে পেপারটি ধরে থাকে। আরো কিছুক্ষণ জানালার দিকে তাকিয়ে থাকার পর আমি আমার ভাইয়ের শর্তে রাজি হই। আমরা আমাদের পকেট থেকে বিখ্যাত মানুষদের কার্ডগুলো বের করি। প্রথমে আমি জিতলেও পরে সতেরোটা কার্ড হারি।

'এভাবে খেললেই আমি হারি। আগের নিয়মে না গেলে আমি খেলব না'—আমি বলি।

'আচ্ছা'—বলে আমার ভাই, তখনও সে ঐ ডিটেকটিভের ভঙ্গি নকল করছে—'তাহলে আমাকে অবশ্য এই পেপারগুলো পড়তে হবে।'

আবার কিছুক্ষণ আমি জানালা দিয়ে বাইরে দেখি। আমি মনোযোগ দিয়ে আমার ছবিগুলি গুনি। আমার আছে ১২১টি। আগের দিন বাবা যাওয়ার সময় আমার ছিল ১৮৩টা। কিন্তু সেটি নিয়ে আমি ভাবতে চাই না। আমি আমার ভাইয়ের শর্তে রাজি হই।

শুরুতে আমি কিছুক্ষণ জিতলেও পরে ও আবার জিততে থাকে।

নিজের মনের ফুর্তি লুকিয়ে সে আমার কাছ থেকে জেতা কার্ডগুলো নিয়ে ওর কার্ডের মধ্যে ঢোকাতে থাকে, হাসে না মোটেও।

'তুই চাইলে আমরা অন্য কোনো নিয়মেও খেলতে পারি'—কিছুক্ষণ পর বলে সে—'যেই জিতুক একটা করে কার্ড নেবে। আমি জিতলে আমার পছন্দমতো একটা আমি নিব। কারণ কোনো-কোনোটার একটাও নাই আমার কাছে আর তুই সেগুলির একটাও আমাকে দিচ্ছিস না।'

এবার আমি জিতব ভেবে রাজি হলাম। জানি না কী করে এটা হলো। কিন্তু পর পর তিনবার আমি আমার দামি কার্ডগুলো হারালাম এবং কিছু টের পাওয়ার আগেই আমি আমার দুটো গ্রেটা গর্বোই (২১) হারালাম এবং হারালাম আমার একমাত্র কিং ফারুক (৭৮)। আমি সবগুলো একবারে ফেরত পেতে চাইছিলাম বলে খেলা লম্বা হয়ে যেতে লাগল আমার অনেকগুলো কার্ড ছিল যেগুলো ওর ছিল না—আইনস্টাইন (৬৩), রুমি (৩) মাম্বো চুইংগাম আর ক্যানকাইড ফ্রুট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা সার্কেস নাযারায়ান (১০০) এবং ক্লিওপেট্রা (৫১)। কিন্তু মাত্র দুই রাউন্ডে এগুলো সব ওকে দিয়ে দিতে হলো।

আমি ঢোক গিলতে পারছিলাম না। আমার ভয় হচ্ছিল আমি হয়তো কেঁদে দেব। আমি জানালায় গিয়ে বাইরে তাকাই। পাঁচ মিনিট আগেও সবকিছু কেমন সুন্দর লাগছিল—টার্মিনালে ট্রাম ঢুকছে, পাতা ঝরে পড়া গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে অ্যাপার্টমেন্ট, ফুটপাথে বসে থাকা কুকুর অলসভাবে নিজের গা চুলকাচ্ছে। আহা

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

সময়টা যদি ওখানেই থেমে থাকত। আহা যদি শুধু পাঁচ দান আগে ফিরে যেতে পারতাম। আমি আর ভাইয়ের সাথে টপ আর বটম খেলব না।

কিন্তু জানালায় কপাল ঠেকিয়েই আমি বলি—'আবার খেলবে?'

'আমি আর খেলব না, খেললেই তো তুই কাঁদবি!'—বলে আমার ভাই।

'প্রমিজ করছি, কাঁদব না'—ওর কাছে গিয়ে বায়না ধরি, বলি—'কিন্তু প্রথমে আমরা যে নিয়মে খেলছিলাম সে নিয়মে খেলতে হবে, পুরনো নিয়মে।'

'তাহলে, আমি পেপার পড়ছি।'

'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে'—আমি আমার চিকন হয়ে যাওয়া কার্ডগুলো শাফল করে বলি—'আগের নিয়মে। টপ না বটম?'

কান্নাকাটি চলবে না—'আচ্ছা টপ।'

আমি জিতি এবং ও আমাকে একটি ফিল্ড মার্শাল ফেভজি কাকমাক দেয়। আমি নিতে চাই না—'আমাকে ৭৮ কিং ফারুকটা দিবে প্লিজ?'

'না, এমন তো কথা ছিল না।'

আরো দুই রাউন্ড খেলি আমরা এবং আমি হারি। ইশ্ যদি শুধু ঐ থার্ড রাউন্ডটা না খেলতাম—ওকে যখন ৪৯ নেপোলিয়ান দিচ্ছিলাম, আমার হাত কাঁপছিল।

'আমি আর খেলব না'—বলে আমার ভাই।

আমি আবার অনুরোধ করি। আমরা আরো দুই রাউন্ড খেলি। তারপর একপর্যায়ে ও যে কার্ডটি চায় সেটি ওকে না দিয়ে সবগুলো কার্ড আমি ওর মাথায় আর আকাশে ছুড়ে মারি। যে কার্ডগুলো আমি গত আড়াই মাস ধরে জমিয়েছি, যার প্রতিটি কার্ড নিয়ে আমি দিনরাত ভেবেছি, লুকিয়ে রেখেছি সবার কাছ থেকে এবং ভয়ে ভয়ে একটি একটি করে জমিয়েছি—নাম্বার ২৮, মে ওয়েস্ট, ৮২ জুলে ভার্নে, ৭ মেহমেট দি কনকোয়ারার, ৭০ কুইন এলিজাবেথ, ৪১ কলামিস্ট সেলাল সালিক, ৪২ ভলতেয়ার—এরা সব বাতাসে উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরের মেঝেতে।

মনে হলো যদি শুধু অন্য কোনো জীবনে সম্পূর্ণ নতুন কোনো জায়গায় থাকতে পারতাম! নানির রুমে যাবার আগে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে নামতে আমি এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের কথা ভাবি যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করত এবং একদিন আত্মহত্যা করেছিল। দাদি বলেছিলেন যারা আত্মহত্যা করে তারা মাটির নিচের অন্ধকারে থেকে যায়, কোনোদিন স্বর্গে যেতে পারে না। সিঁড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ নামতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নামতে আমি অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। এসময় ঘুরে আবার উপরে উঠি এবং সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপটায়, নানির রুমের পাশে বসে থাকি।

'আমি তো আর তোমার শাশুড়ির মতো বড়লোক নই'—নানির গলা শুনি—'বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করো আর অপেক্ষা করো।'

'কিন্তু মা প্লিজ আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আমাকে এখানে আসতে দাও'—মা বলে।

'তুই দুই বাচ্চা নিয়ে এই ধুলা, ভূত আর চোর-ডাকাতের মধ্যে থাকতে পারবি না'—নানি বলে।

'মা তোমার মনে নাই, আপার বিয়ে হয়ে যাবার পর, বাবা মারা গেলে আমরা দুজন মিলে এই বাসায় কত চমৎকার থাকতাম'—মা বলে।

'মা মেরুর, সারাদিন কাজের মধ্যে যা তুই করতি তা হলো তোর বাবার পুরনো ইলাস্ট্রেশন পত্রিকার পাতা ওল্টানো।'

'নিচের বড় স্টোভটা জ্বালিয়ে দিলে দুদিনের মধ্যে এ বাড়ি কেমন তাজা আর গরম হয়ে যায় দেখো।'

'তোকে বলেছিলাম ওকে বিয়ে না করতে, বলিনি?'—নানি বলে।

'একটা কাজের লোক আনলে দুইদিনে এ বাড়ির সব ধুলা ঝেড়ে সাফ করে দিতে পারবে সে'—বলে মা।

'আমি ওসব চোর কাজের লোক একটাকেও বাসায় ঢোকাব না'—নানি বলে—'যাহোক এই বাড়ির ধুলা আর মাকড়সার জাল সাফ করতে ছয়মাস লেগে যাবে ততদিনে তোর উড়নচণ্ডি স্বামীও আবার ফিরে আসবে।'

'তাহলে এটাই তোমার শেষ কথা?'—মা বলে।

'মেরুর মাগো, তুই যদি দুই বাচ্চা নিয়ে এখানে এসে উঠিস আমরা চারজনে খাব কী বল্ তো?'

'মা, কতবার তোমাকে বলেছি দখল হয়ে যাবার আগে বিবেকের জায়গাটা বিক্রি করে দাও।'

'আমি ঐ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে ওসব নোংরা লোকগুলোর কাছে আমার সিগনেচার আর ছবি দিতে পারব না।'

'মা এসব বোলো না। বড়আপা [illegible] আমি তোমার [illegible] কাছ থেকেই নোটারি কিনেছি'—গলা উঁচি[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমি ঐ নোটারিটাকে একদম বিশ্বাস করি না। ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ও একটা জোচ্চোর। আমার তো মনে হয় ও বেটা নোটারিই না। আর আমার সাথে এভাবে চিৎকার করে কথা বলবি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলব না'—বলে মা আমাদের খুঁজতে থাকে—'বাচ্চারা কোথায় তোমরা, চলো আমরা এখন যাব, তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাও।'

'দাঁড়া দাঁড়া, কথাই তো ঠিকমতো হলো না'—নানি বলে।

'তুমি তো আমাদের চাও না'—মা ফিসফিস করে বলে।

'এগুলো ওদেরকে একটু দে, বাচ্চাগুলো একটু মিষ্টিমুখ করুক।'

'না না, দুপুরের খাবারের আগে ওদের কিছু খাওয়ার দরকার নাই'—বলে মা আমার পেছন দিয়ে পাশের রুমে ঢুকে বলে—'এসব ছবি এভাবে এখানে ছড়িয়েছে কে? তাড়াতাড়ি এগুলি ওঠাও। আর তুমি ওকে সাহায্য করো'—মা ভাইকে বলে।

আমরা যখন নীরবে আমাদের কার্ডগুলো উঠাচ্ছিলাম মা তখন পুরনো ট্রাঙ্কের ঢাকনাটি খোলে এবং তার ছোটবেলার ড্রেস, ব্যালে ড্রেস, ছোট বাক্সগুলি দেখতে থাকে। পা দিয়ে চালানো সেলাইমেশিনটার কঙ্কালের নিচের ধুলায় আমার নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, চোখে, নাকে পানি আসছিল।

আমরা যখন ছোট বাথরুমটায় হাত ধুচ্ছিলাম, নানি নরম গলায় অনুরোধ করেন—'মেব্রুর মা, এই চায়ের পটটা তুই নিয়ে যা, এটা তোর এত পছন্দ। আমার দাদু আমার দাদির জন্য এটা এনেছিল যখন সে দামাস্কাসের গভর্নর ছিল। এটা সেই সুদুর চীনের জিনিস। তুই এটা নে মা'—বলে নানি।

'না মা, তোমার কোনো জিনিস আমি চাই না। ওটা তুমি আলমারিতে উঠিয়ে রাখো এখনই। আসো বাচ্চারা নানির হাতে চুমু খাও'—মা বলে।

'মা আমার লক্ষ্মী আমার, তোর এই বুড়ো মা'টার উপর এমন রাগ করিস না'—তার হাতে আমাদের চুমু দেবার সুযোগ দিয়ে নানি বলেন। 'আমাকে এভাবে একলা ফেলে চলে যাসনে মা।'

আমরা দৌড়ে নিচে নামি এবং তিনজন যখন ভারী লোহার দরজাটি ঠেলে আবার সরাই তখন আমাদের অভ্যর্থনা জানায় বাইরের চমৎকার রোদ আর খোলা হাওয়া।

'দরজাটা পেছন থেকে জোরে বন্ধ করে দিস'—চিৎকার করে বলেন নানি। 'মেব্রুর এ সপ্তাহে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবি তো?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা মা'র হাত ধরে হাঁটি, কেউ কোনো কথা বলি না। নীরবে ট্রাম চালু হবার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমরা অন্য যাত্রীদের কাশির শব্দ শুনি। শেষে যখন ট্রাম চলতে শুরু করে আমার ভাই এবং আমি পরের সারিতে যাই, বলি যে আমরা কন্ডাক্টারকে দেখতে চাই কিন্তু সেখানে গিয়ে টপ বটম খেলতে শুরু করি। প্রথমে আমি কতগুলো দানে হারি তারপর জিততে শুরু করি। একটু পরেই আমি আবার হারতে থাকি। ওসমানবে স্টপে আসলে ভাই বলে—'তোর হাতে যতগুলো কার্ড আছে সব আমাকে দিলে আমি তোকে নাম্বার ১৫টা দেব যেটা তুই ভীষণভাবে চাচ্ছিস।'

আমি খেলি এবং আবার হরি। একফাঁকে ওকে না-দেখিয়ে কার্ডের স্টক থেকে দুটি কার্ড সরিয়ে রাখি। আমি পেছনের সারিতে মায়ের কাছে গিয়ে বসি। আমি কাঁদি না। ট্রাম ধীরে ধীরে স্পিড নিতে শুরু করলে আমি বিষণ্নমনে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি। একে একে আমাকে পেছনে ফেলে চিরতরে যেন দূরে চলে যায় সেইসব মানুষ, জায়গা; ছোট সেলাইয়ের দোকান, বেকারি, ঢাকনা দেয়া পুডিং শপ, রোম সাম্রাজ্যের উপর ছবিগুলো দেখেছিলাম যে সিনোমাহলে সেই ট্যান সিনেমা, পুরনো কমিক বিক্রি হচ্ছে যে দোকানে তার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো বাচ্চারা, ধারালো ছুরি হাতে নাপিত, যাকে দেখে আমার ভয় করত, আর পাড়ার সেই আধান্যাংটা পাগল, যে বরাবর সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা হার্বিয়ে নেমে পড়ি। আমরা যখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি তখন আমার ভাইয়ের তৃপ্ত নীরবতায় আমার গা জ্বালা করতে থাকে। আমি আমার পকেটে লুকানো লিন্ডবার্গকে বের করি।

প্রথমবারের মতো কার্ডটি দেখে ভাই, প্রশংসার সুরে বলে—'ওটা তো ৯১ লিন্ডবার্গ। যে প্লেনটা দিয়ে সে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল এটা সেই প্লেনটা। তুই কোথায় পেলি এটা?'

'কালকে আসলে আমি কোনো টিকা দেই নাই। আগে আগে বাসায় চলে এসেছিলাম এবং বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার, বাবাই এটা কিনে দিয়েছে।'

'তাহলে অর্ধেকটা আমার। তাছাড়া শেষে যখন আমরা খেললাম তখন শর্ত ছিল তোর সব কার্ড তুই আমাকে দিবি।' ও আমার হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। আমার কব্জি ধরে জোরে একটা মোচড় দিলে আমি ওর পায়ে কষে একটা লাথি মারি। আমরা একজন আরেকজনের গায়ের উপর পড়ি।

'একদম চুপ, রাস্তার মাঝখানে এসব কী?'—মা বলে।

আমরা থামি। একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক এবং একজন হ্যাটপরা মহিলা আমাদের পাশ দিয়ে চলে যান। রাস্তায় মারামারি করবার জন্য আমার খুব লজ্জা হয়। ভাই দু'পা এগিয়ে পা চেপে ধরে মাটিতে পড়ে কাঁদতে থাকে—'আমার ব্যথা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা ফিসফিস করে বলে—'একী দাঁড়াও, দাঁড়াও, ছি ছি রাস্তার সবাই তোমাকে দেখছে।'

আমার ভাই ওঠে এবং সিনেমায় দেখা আহত সৈনিকের মতো করে রাস্তা দিয়ে সে হাটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলে—'দাঁড়া বাড়িতে গিয়ে দেখিস কী করি। মা, আলী কিন্তু গতকাল স্কুলে কোনো টিকা দেয়নি।'

'না মা আমি দিয়েছি।'

'চুপ করো তো তোমরা'—মা বলে।

আমরা আমাদের বাসার উল্টোদিকে গিয়ে দাঁড়াই। রাস্তা পার হবার আগে মাকা থেকে আসা ট্রামগুলোকে পার হতে দিই আমরা। ট্রাম চলে গেলে আসে একটা ট্রাক, আসে ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে থাকা লক্কর ঝক্কর একটি বাস, উল্টোদিকে একটি বেগুনি ডি সোটো। ঠিক সেসময় আমি দেখি চাচা বাসার জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছেন। উনি আমাকে দেখেননি, চাচা পার হয়ে যাওয়া গাড়িগুলো দেখছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে আমি তাকে দেখি।

অনেকক্ষণ হয়েছে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি মায়ের দিকে তাকাই, কেন মা এখনও আমাদের হাত ধরে রাস্তাটি পার হচ্ছে না? দেখি মা নীরবে কাঁদছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর্নেস্টোর মা

আবেলারদো কাস্তিলো

আর্নেস্টো কি জানত যে উনি ফিরেছেন আর কী কারণে ফিরেছেন? জানা হয়নি আমার। আর্নেস্টো তো উনি আসবার অনেক আগেই চলে গিয়েছিল টালাতে। তাছাড়া সেবার সামারের ছুটিতে বারদুয়েক ওর সঙ্গে দেখা হলেও সত্যি বলতে আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

ভাবনাটি মাথায় আসবার পর থেকেই কেমন একধরনের অপরাধবোধ হচ্ছে। কারণ প্রথমত ভাবনাটি জুলিওর আর দ্বিতীয়ত ভাবনাটি বাজে। অবশ্য আমরা কেউ এমন কোনো সাধু বাবাজি নই। আর ঐ বয়সে, ঐরকম একটি শহরে কে আর সন্ন্যাসী থাকতে পারে? তা না হলে ওরকম একটি বিশ্রী ভাবনা কী করেই বা আমাদের মাথায় আসে? এমন একটি কুৎসিত, বর্বর ভাবনা? তবে বলতেই হবে যে ভাবনাটি দারুণ। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাবনাটি আকর্ষণীয়।

সে অনেকদিন আগের কথা। হাইওয়ের পাশের 'আলাবামা' তখন বেশ জমজমাট। 'আলাবামা'কে একটি নিরীহ রেস্তোরাঁ বলা যেতে পারে। অন্তত দিনের বেলা তো বটেই। যদিও রাত এগারোটার পর সেটি একটি ছোটখাটো নাইটক্লাবে রূপান্তরিত হয়ে যেত। একদিন দেখা গেল আলাবামার তুর্কি মালিক রেস্তোরাঁর দোতালায় কয়েকটি নতুন ঘর তুলেছে। তার কিছুদিন পর দেখা গেল সেখানে একটি মেয়ে নিয়ে এসেছে সে। আলাবামার যে ছিটেফোঁটা নিরীহ চেহারা ছিল তা ঐ মেয়েটি সেখানে আসবার পর আর অবশিষ্ট রইল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'জানিস, টার্কটা একটা মেয়ে নিয়ে এসেছে?'

'বলিস কী!'

'হ্যাঁ, একেবারে জ্যান্ত মেয়েমানুষ।'

'পেল কই?'

জুলিওর রহস্যময় ভঙ্গির সাথে আমরা পরিচিত। ওর কথা বলা, হাঁটাচলার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার আছে যা অন্যদের চেয়ে ঈর্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। জুলিও গলা নামিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—'আর্নেস্টো কোথায় রে?'

আমি বলি—'ও তো টালাতে গেছে সেই কবে। ওখানে কী একটা ফার্মে কাজ করে। ওর মায়ের সেই ঘটনার পরপরই তো চলে গেছে। আর্নেস্টোকে আজকাল আর এদিকে দেখাই যায় না। কিন্তু এর মধ্যে আবার ওকে টানছিস কেন?'

জুলিও একটি সিগারেট ধরায়। তার ঠোঁটের কোণে তীর্যক হাসি। ভ্রুবাঁকিয়ে সে আমাদের বলে—'টার্ক যে মেয়েটাকে এনেছে জানিস সেটা কে?'

আনিবাল আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। হঠাৎ আমার আর্নেস্টোর মা'র মুখ মনে পড়ে। আমরা দুজনই নীরব থাকি।

বছর চারেক আগে এক জিপসি গানের দল এসেছিল আমাদের গ্রামে। আর্নেস্টোর মা তাদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে আমার দাদি সেদিন কিছুক্ষণ পর পর শুধু বিড়বিড় করছিলেন—'ঐটা একটা আস্ত ছেনাল, বেশ্যা মাগী।'

খুব সুন্দরী ছিলেন তিনি, শ্যামলা আর স্বাস্থ্যবান। বয়স তখন তার কতই বা হবে, চল্লিশ হয়তো!

আমি ঘোর কাটিয়ে বলি—'টার্ক আর কাকে আনবে, কোনো বেশ্যাটেশ্যা হবে আর কী'!

একটা নীরবতা আমাদের সবাইকে ঘিরে থাকে আরো কিছুক্ষণ। এসময় চিন্তাটা কি জুলিওই আমাদের মাথায় ঢোকাল নাকি আমরাও ব্যাপারটা ভাবছিলাম। ঠিক মনে পড়ছে না।

'শালা, ঐ মেয়েলোকটা শুধু যদি ওর মা না হতো!'—এইটুকু বলে জুলিও।

আমার মনে হয় সম্ভবত আর্নেস্টো ব্যাপারটি জানত। তা না হলে এই সামারের ছুটিতে ওকে এদিকে এত কম দেখলাম কেন? আর্নেস্টোর বাবা তো এদিককার ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে দিয়ে কবেই চলে গেলেন। কোথায় যে গেলেন, কে জানে। এর মধ্যে আর্নেস্টোর সঙ্গে আমার বার দুয়েক দেখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ঐ যে বললাম আমি ওর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখের দিকে তাকাতে পারিনি।

মনের মধ্যে যে সামান্য দ্বিধাটুকু ছিল সেটা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জুলিও হঠাৎ বলে ওঠে—'ওর মা হয়েছে তো কী হয়েছে, সে তো একটা বেশ্যাই। আলাবামায় উঠেছে ছয় মাস হয়ে গেল। ঐ টার্ক শালা কোন্‌দিন আরেকটা মেয়েলোক আনবে সেই আশায় বসে থেকে থেকে বুড়া হব নাকি?'

জুলিও এরপর আমাদের বলে, যা কিছুই হোক না কেন আলাবামায় সে যাবেই। এখন দরকার শুধু একটা গাড়ির। সে আরো বলে—'তোরা যদি সাহস না পাস আমি কিন্তু অন্য কাউকে খুঁজে বের করব যার বুকের পাটা আছে।'

সাহস নিয়ে প্রশ্ন তোলাতে আমরা অপমানিত বোধ করলাম।

'কিন্তু ভেবে দ্যাখ্ হাজার হোক সে তো আর্নেস্টোরই মা।'

'গুল্লি মার তোর মা, শুয়োরেরও তো বাচ্চা থাকে।'

'তারপরও ধর্ আর্নেস্টো তো আমাদের বন্ধু, একসাথে বড় হয়েছি আমরা।'

আর্নেস্টোর সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলবার সেইসব দিনের কথা আমার মনে পড়ে। কে যেন তখন আমার মনের কথাটি বলে ওঠে। নাকি আমি নিজেই বললাম—'তোদের মনে আছে সেই দিনগুলির কথা? ওর মায়ের কথা?'

হ্যাঁ আমাদের সবারই বেশ মনে আছে। খুব ভালোমতো মনে আছে আর্নেস্টোর শ্যামলা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী মাকে। আর দশজন মায়ের মতো নন, কেমন যেন অন্যরকম। ঠিক যেন মা নন, অন্যকিছু।

'তোরা জানিস, টাউনের হাফ মানুষ ইতিমধ্যে আলাবামা থেকে ঘুরে এসেছে, শুধু আমরা ছাড়া?'—বলে জুলিও।

'শুধু আমরা ছাড়া' কথাটির মধ্যে জোর ছিল। তাছাড়া এই যে আমাদের চেনা সেই মহিলাটি ফিরে এসেছেন এ ব্যাপারটির ভেতরেও তীব্র একটি আকর্ষণ ছিল।

তারপর কেমন যেন অশ্লীলভাবে ক্রমশ সবকিছু সহজ হয়ে আসতে থাকে। আমরাও আলাবামায় যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠি। কে জানে আলাবামার সেই মেয়েমানুষটি উনি না হয়ে অন্য কেউ হলে আমরা ব্যাপারটিকে এতটা গুরুত্বের সাথে নিতাম কিনা। কথাটি অদ্ভুত তবু বলি, সত্যি বলতে আমরা মনে মনে চাইছিলাম জুলিও আমাদের জোর করে হলেও ওখানে নিয়ে যাক। আলাবামার জন্য গোপন, রাক্ষুসে একটি আকর্ষণ গিলে খাচ্ছিল আমাদের।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আনিবাল অবশ্য আমাকে বলেছিল—'দ্যাখ্ উলিয়া, এসব ফালতু চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল্।'

সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। জুলিও এসে একদিন জানায়, ও একটি গাড়ি পেয়েছে। বলে—'আজ রাতেই কিন্তু যাচ্ছি।'

আমরা বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি।

'আমার মনে হয় জুলিও শালা পালিয়েছে।'

'আমার তো মনে হয়, ও আসলে কোনো গাড়িই পায়নি, সব ভুয়া।'

বলছিলাম বেশ নির্বিকারভাবে কিন্তু মনে মনে আসলে ঐরকমটাই প্রার্থনা করছিলাম। মনে মনে আশা করছিলাম জুলিও যেন গাড়ি না পায় এবং আমাদের আলাবামাতে যাওয়ার প্রোগ্রামটি যেন বাতিল হয়।

আনিবালও কি ঠিক তাই ভাবছিল? নইলে হঠাৎ সে কেন বলে উঠল—'আমরা নিশ্চয় সারারাত ওর জন্য অপেক্ষা করব না। আমি আর ঠিক দশ মিনিট দেখতে চাই। এর মধ্যে ও না এলে আমি কিন্তু চলে যাব।'

'আচ্ছা দেখতে এখন কেমন হয়েছে রে?'

'কার কথা বলছিস, ঐ মহিলা?'

আনিবাল বলতে পারত—'ওর মা' বরং সে বলল—'সেই মহিলা।'

দশ মিনিট কি এতটাই লম্বা? আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি।

আর্নেস্টোর বাড়ির উঠানে আমরা খেলছি আর সেই শ্যামলা, স্বাস্থ্যবান মহিলা আমাদের বলছেন—'বাবারা, একটু দুধ আর বিস্কুট খেয়ে যাও।' সেই দৃশ্য মনে পড়ে।

'শোন্, আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুব খারাপ হচ্ছে।'

'তুই ভয় পাচ্ছিস।'

'না, ঠিক ভয় না কিন্তু কেমন যেন খারাপ লাগছে।'

'শোন্ বেশ্যাদেরও বাচ্চাকাচ্চা থাকে। কারো না কারো মা তো সে হতোই।'

'সেটা কি এক কথা হলো? আর্নেস্টো তো আমাদের বন্ধু।'

কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। এদিকে দশ মিনিট আর কিছুতেই যেন পার হচ্ছে না। বড় কথা হচ্ছে, উনি আমাদের চিনে ফেলবেন। আমার মনে হলো উনি যখন আমাদের দিকে ভালো করে তাকাবেন তখন একটা কিছু ঘটে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আনিবালও কি ভয় পেয়েছে? দশ মিনিট সত্যিই খুব লম্বা সময়। আনিবাল হঠাৎ বলে ওঠে—'আচ্ছা ধর্ উনি যদি আমাদের ঘর থেকে বের করে দেন?'

আমি উত্তর দিতে যাব ঠিক সেসময় রাস্তায় আমরা গাড়ির শব্দ শুনতে পাই। হঠাৎ কী একটা যেন আমার তলপেট খামচে ধরে।

'ঐ যে জুলিও'—আমরা দুজন একসাথে বলে উঠি।

গাড়িটি আমাদের সামনে এসে জোরে একটি ঘূর্ণি দিয়ে দাঁড়ায়। গাড়িটির ইঞ্জিন, হর্ন সবকিছুর ভেতর কেমন একটি ঝড়ো ব্যাপার আছে। গাড়ির এই ঝড়ো, উচ্ছ্বসিত ভাবটি মুহূর্তে উদ্দীপিত করে তোলে আমাদের। গাড়ির পেছনে কতগুলো বোতল দেখে উত্তেজনা আমাদের আরো এক মাত্রা বেড়ে যায়।

'বোতলগুলি বুড়ো বাপের কাছ থেকে চুরি করেছি'—বলে জুলিও।

চকচক করে ওর চোখ। দু'ঢোক গিলবার পর আমাদের চোখও চকচক করতে থাকে। আমাদের গাড়ি রেলক্রসিং পার হয়ে হাইওয়েতে ওঠে।

মনে আছে উনার চোখও এমন চকচক করত সবসময়। খুব সাজগোজ করতেন তিনি। গাঢ় লিপস্টিক মাখতেন ঠোঁটে।

'তোদের মনে আছে, সে সিগারেট খেত?'—বলে জুলিও।

দেখা যাচ্ছে আমরা মনে মনে সবাই একই কথা ভাবছি।

'ঠিকই মনে আছে।'

'আচ্ছা, এখান থেকে কতক্ষণ লাগবে যেতে?'

'এই মিনিট দশেক।'

আবার সেই দশ মিনিট। লম্বা দশ মিনিট। এবার অবশ্য অন্য অর্থে লম্বা।

একদিনের সেই দুপুরবেলাটির কথা মনে পড়ে আমার। সম্ভবত আমাদের সবারই। খুব গরম পড়েছিল সেদিন। উনি উবু হয়ে ঘর মুছছেন। উনার বুকের কাপড় সরে গেছে। আমরা সেদিকে তাকিয়ে একজন আরেকজনকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিচ্ছি।

জুলিও পেট্রোল নিতে গাড়ি থামায়।

'এটা হবে তার শাস্তি। আর্নেস্টোর হয়ে আমরা প্রতিশোধ নেব। কুত্তিটার একটা শিক্ষা হবে।' কথাগুলি আনিবাল তুই বলছিলি মনের ঝাল মেটাবার জন্য কিন্তু তোর গলায় জোর ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'শাস্তি!' আমাদের মধ্যে কে যেন হেসে বলে ওঠে। সম্ভবত আমি। হ্যাঁ, আমিই তো।

তিনজনই হো হো হেসে ওঠি। জুলিওর হাত থেকে খানিকটা পেট্রোল ছলকে পড়ে।

'আচ্ছা, উনি যদি আমাদের ঘর থেকে বের দেন?' আনিবাল আবারও বলে।

'মাথা খারাপ নাকি? কাস্টমারের বেইজ্জতি? তাহলে ঐ টার্কের ঠ্যাং ভেঙে দেব না? শালার ব্যবসা আমি লাটে উঠাব'—বলে জুলিও।

আমরা যখন পৌছালাম, তখন হোটেল বারে তেমন ভিড় নেই। কয়েকজন ট্রাক ড্রাইভার আর গুটিকয় ভ্রাম্যমাণ ব্যাবসায়ী শুধু। শহরের পরিচিত কাউকে দেখতে পেলাম না। এতে অবশ্য আমার সাহস খানিকটা বেড়ে গেল। আমি কাউন্টারে দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখি। জুলিও এই ফাঁকে টার্কটির সাথে আলাপ সেরে নেয়। টার্কটি দূর থেকে আমাদের উপর চোখ বোলায়। তারপর কাউন্টারের মেয়েটিকে বলে—'ওদের উপরে নিয়ে যাও।'

কাউন্টারের ছোটখাটো মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। আমরাও তার পেছন পেছন উঠি। তার সরু, নির্লোম পা দুটির কথা এখনও মনে আছে আমার। মনে আছে ওর নিতম্বের দুলুনিটিও। মনে আছে মেয়েটিকে নিয়ে কী একটা টিটকারি করেছিলাম যেন। মেয়েটি রেগে ঘুরে তাকিয়েছিল। হো হো করে হেসে উঠেছিলাম আমরা তিনজন। এর মধ্যে হাস্যকর তো কিছু ছিল না! তাহলে কি গাড়িতে একটু বেশি বোতল গিলে ফেলেছিলাম!

এরপর আমরা একটি পরিষ্কার ঝকঝকে ঘরে ঢুকি। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল। দেয়াল ঘেঁষে একটি বেঞ্চ। কেমন একটি গম্ভীর, অনাত্মীয় পরিবেশ। যেন কোনো ডেন্টিস্টের ওয়েটিংরুম।

'আমাদের বোধ হয় দাঁত তোলা হবে।'—আমি ফিসফিস করে বলি। কেন যেন আমাদের খুব হাসি পায়। হাসি থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি।

'মনে হচ্ছে যেন চার্চে ঢুকছি'—জুলিও বলে।

আনিবাল হাতে মুখ চেপে বলে—'এখন যদি ঐ ঘরটা থেকে প্রিস্ট বের হয়ে আসে?'

আমরা সবাই মুখ চেপে আমাদের হাসি থামাবার চেষ্টা করি। এসময় পাশের ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসে। আমরা চুপ হয়ে লোকটিকে দেখতে থাকি। বেঁটে একজন লোক, দেখতে শূকরের মতো। তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব। একজন তৃপ্ত শূকর। নিচের ঠোঁটটি কামড়ে চোখ কপালে তুলে সে আমাদের পাশের ঘরটি দেখিয়ে দেয়। তারপর চুপচাপ নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে। লোকটির পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় একসময়। কিছুক্ষণ পর জুলিও বলে ওঠে—'তোদের হলো কী?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকি। ঠিক এই মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারিনি কিম্বা হয়তো ইচ্ছা করেই নিজেকে বুঝতে দিইনি যে আমরা এখন থেকে একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাব। দল বেঁধে নয়, আমরা তার মুখোমুখি হব একজন একজন করে, একা। আমি বেশ বেপরোয়া ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলি—'তোরা যে-কেউ আগে যেতে পারিস, আমার কোনো আপত্তি নাই।'

পাশের ঘরের দরজাটি অর্ধেক খোলা। ভেতর থেকে বালতিতে কলের পানি পড়ার টপটপ শব্দ আসছে। আমাদের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে। একপর্যায়ে পাশের ঘরের দরজাটি সম্পূর্ণ খুলে যায়। ভেতর থেকে একঝলক আলো এসে পড়ে আমাদের মুখের উপর। দরজার চৌকাঠে অবশেষে তাকে দেখা যায়। আমরা কেমন বিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে থাকি। তার কামিজের বোতামগুলো খোলা।

সেই গরমের দুপুর। সেই যে তিনি ঘর মুছছেন। তার বুকের কাপড় সরে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সেই যে আমরা কনুই দিয়ে একে অন্যকে গুঁতোগুঁতি করছি। তিনি বলছেন—'বাবারা এদিকে এসো তো, একটু দুধ আর বিস্কুট খেয়ে যাও।'

তেমনই স্বাস্থ্যবান আর শ্যামলা আছেন। নাকি খানিকটা ফর্সা হয়েছেন ইতিমধ্যে!

দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি হাসেন। পেশাদারি, নষ্ট একটি হাসি। বলেন—'ব্যাপার কী? আসো একজন।'

আগের মতোই আছে তার কণ্ঠ, বদলায়নি একটুও। তিনি আবার হাসেন। খানিকক্ষণ পর তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন—'হলো কী তোমাদের, হ্যাঁ?' যেন আদেশ করছেন। আমরা তিনজনই থতমত খেয়ে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াই। তার গায়ের ফিনফিনে কালো কামিজটির দিকে আমার চোখ যায়।

'আমিই যাচ্ছি'—বলে জুলিও। এক পা এগিয়ে যায় সে। তারপর আরেক পা। ব্যস্, ঐটুকুই। এরপর থেমে যায় জুলিও। আর এগুতে পারে না। কারণ ঠিক তখনই তিনি প্রথমবারের মতো ঝুঁকে ভালো করে আমাদের তিনজনের মুখের দিকে তাকান।

কেন থেমে গেল জুলিও? ভয়ে? লজ্জায়? প্রতিহিংসায়? কিন্তু এরপরই ভেস্তে যায় সব।

তিনি আমাদের সবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আমি আগেই জানতাম, উনি যখন আমাদের দিকে তাকাবেন তখন একটা কিছু ঘটবে। নিথর দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। কেউ যেন পেরেক দিয়ে আমাদের পা ঠুকে দিয়েছে মেঝেতে। কে জানে কী ছিল তখন আমাদের চেহারায়। উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং ধীরে ধীরে উনার মুখ বদলে যাচ্ছে। প্রথমে তার মুখে কিছুক্ষণ ছড়িয়ে থাকে একটি অনিশ্চয়তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছায়া। যেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কিছু। তারপরই অদ্ভুতভাবে বদলে যায় তার মুখ। যেন তিনি কিছু একটা আঁচ করেছেন। তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে ভয়, কষ্ট, উদ্বিগ্নতা আর প্রশ্ন।

'বাবারা, আর্নেস্টোর কোনো বিপদ হয়নি তো?'

কামিজের খোলা বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঢেউয়ের সাথে আমার জীবন

▼

অক্টাভিও পাজ

আমি যখন সমুদ্র থেকে ফিরছিলাম, একটি ঢেউ অন্যদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে আসে। চিকন, লম্বা এক ঢেউ। অন্য ঢেউগুলো পেছন থেকে চিৎকার করে হাওয়ায় উড়তে থাকা তার জামা টেনে ধরতে চাইলেও সে ছুটে এসে আমার হাত ধরে ফেলে এবং আমার সঙ্গে চলতে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। তার বন্ধুদের সামনে কিছু বললে সে লজ্জা পেতে পারে, এই ভেবে আমি তাকে কিছু বলা থেকে বিরত থাকি। তাছাড়া আশেপাশের বয়স্ক লোকেরা যেভাবে কড়াচোখে আমার দিকে তাকাতে শুরু করে তাতেও আমি কেমন স্তব্ধ হয়ে যাই। শহরে পৌঁছে আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে এটি অসম্ভব, বলি শহরের জীবন যে কেমন সেটা তার মতো একটি মেয়ের পক্ষে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়, যে জীবনে কখনো সমুদ্র ছেড়ে কোথাও যায়নি। আমার দিকে মারাত্মক এক চাহনি দিয়ে সে বলে, 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন আর পিছু ফিরবার কোনো উপায় নেই।' আমি মিষ্টি করে, শক্ত করে, ব্যঙ্গ করে নানাভাবে চেষ্টা করি বোঝাতে। সে কাঁদে, চিৎকার করে, আমাকে জড়িয়ে ধরে, শাসায়। আমি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হই।

পরদিন থেকে সমস্যা শুরু হয় আমার। ঢেউকে নিয়ে আমি ট্রেনে উঠব কী করে? কন্ডাক্টার, অন্যান্য যাত্রী, পুলিশ সবাই দেখে ফেলবে না? একটি ঢেউকে কীভাবে ট্রেনে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে কোথাও কোনো নিয়ম লেখা নেই। বিপদ তো সেখানেই। আমরা কড়া বিচারের মুখোমুখি হতে পারি। অনেক ভেবেচিন্তে আমি শেষে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেক আগে স্টেশনে পৌঁছাই। আমার সিটে গিয়ে বসি। একফাঁকে

~ www.amarboi.com ~

কেউ লক্ষ করবার আগে আমি কামরার এককোণায় যাত্রীদের জন্য রাখা পানির ফিল্টারের সব পানি ফেলে দিয়ে তার ভেতর সন্তর্পণে আমার বান্ধবীকে রেখে দিই।

প্রথম ঘটনা শুরু হয় যখন পাশের এক দম্পতির বাচ্চারা পানি পিপাসা পেয়েছে বলে হৈচৈ শুরু করে। আমি ওদের লেমোনেড খাওয়াব বলে কোনোরকম ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। বাচ্চারা বেশ মেনেই নিচ্ছিল কিন্তু এসময় আরেক পিপাসার্ত মহিলা ফিল্টারের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে । আমি তাকেও লেমোনেড খাওয়ানোর আমন্ত্রণ প্রায় জানিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু তার সাথের ভদ্রলোক যেভাবে আমার দিকে কটমট করে তাকালেন তাতে আর সাহস পেলাম না। মহিলা একটি কাগজের গ্লাস নিয়ে ফিল্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ফিল্টারের কলটি খুললেন। তার গ্লাসে একটু পানি পড়তেই আমি ঐ মহিলা আর আমার বান্ধবীর মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ি। খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকান মহিলা। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে-না-চাইতেই পাশের দম্পতির এক বাচ্চা ধুম করে ফিল্টারের কলটি আবার ছেড়ে দেয়। আমি আবার লাফ দিয়ে কষে বন্ধ করে দিই কলটি। আগের মহিলা তার কাগজের গ্লাসটিতে চুমুক দেন।

'অ্যাঁ! এই পানি তো একদম লবণ লবণ'—মহিলা বলেন।

বাচ্চাটিও তার কথার প্রতিধ্বনি করে। আশে পাশে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যায়। মহিলার স্বামী ট্রেনের কন্ডাক্টারকে ডেকে বলেন 'এই লোকটা ফিল্টারের পানিতে লবণ মিশিয়েছে।'

কন্ডাক্টার ইন্সপেক্টরকে ডাকেন 'ও তাহলে আপনি পানিতে কিছু একটা মিশিয়েছেন?'

ইন্সপেক্টর পুলিশকে ডাকেন 'আপনিই তাহলে পানিতে বিষ মিশিয়েছেন?'

পুলিশ এরপর ডাকেন ক্যাপ্টেনকে 'তাহলে আপনিই সেই বিষ-মিশ্রণকারী?'

ক্যাপ্টেন তিনজন লোককে ডাকেন। লোক তিনজন যাত্রীদের গুঞ্জন আর চাহনির মধ্যদিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওঠায় একটি খালি গাড়িতে। পরের স্টপেজে তারা আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে ঢোকায় জেলে।

কয়েকদিন ধরে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। তারপর লম্বা জেরা চলে। আমি ব্যাপারটি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেও কেউ আমার কথায় বিশ্বাস করে না, এমনকি জেলারও না। তিনি মাথা নাড়িয়ে বলেন 'কেসটা খুবই মারাত্মক। আপনি কি বাচ্চাগুলোকে বিষ খাইয়ে মারতে চাচ্ছিলেন?'

'আপনার কেসটা জটিল'—তিনি আবার বলেন—'আপনাকে আমি পেনাল জাজের কাছে পাঠাব।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বছর পেরিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত তারা আমার বিচার করে। যেহেতু কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি আমার তেমন কোনো শাস্তি হয় না। কিছুদিন পর আমি মুক্ত হয়ে যাই।

জেলের চিফ আমাকে ডেকে পাঠান : "আপনাকে মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। আপনার ভাগ্য ভালো যে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে কখনো আর এসব করার চেষ্টা করবেন না। তখন কিন্তু আর এত সহজে পার পাবেন না।"

তিনি কড়াচোখে তাকান আমার দিকে, ঠিক যেভাবে অন্যরাও সব আমার দিকে তাকাচ্ছে।

সেদিন বিকালেই আমি ট্রেন ধরি এবং কয়েক ঘণ্টার অস্বস্তিকর যাত্রা শেষে ম্যাক্সিকো সিটিতে পৌঁছাই। একটি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরি। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় এসে শুনি ভেতরে কে যেন হাসছে আর গান গাইছে। বুকে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করি। বিস্ময়ের ঢেউয়ের স্পর্শ আমাদের বুকের উপর দিয়ে চলে গেলে যেমন ব্যথা হয় তেমন। ঘরে ঢুকে দেখি আমার সেই ঢেউ বান্ধবী হাসছে, গান গাইছে বরাবরের মতো।

'কী আশ্চর্য তুমি ফিরলে কী করে?'

'খুব সোজা, ট্রেনে চড়েই। কেউ একজন ফিল্টারের পানি পরীক্ষা করে যখন দেখল যে আমি আসলে নেহাত লবণ-পানি ছাড়া কিছু না তখন সে ঐ পানিটাকে ঢেলে দেয় ট্রেনের ইঞ্জিনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি শাদা বাষ্প হয়ে উড়ে যাই আকাশে। যথারীতি কিছুক্ষণ পরেই আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ি ঐ ট্রেনেরই উপরে। ব্যস্ ট্রেনে চড়েই পৌঁছে যাই এখানে। পথে অবশ্য আমার অনেকগুলো ফোঁটা হারিয়ে গেছে। দেখছ না কেমন শুকিয়ে গেছি?'

ও আসাতে আমার জীবনটাই পুরো বদলে যায়। অন্ধকার করিডোর আর ধুলোমাখা ফার্নিচার-ভরা আমার ঐ ঘর ভরে ওঠে বাতাস, রোদ, শব্দ, সবুজ আর নীল রশ্মি, অসংখ্য সুখী কম্পন আর প্রতিধ্বনিতে। একটি ঢেউ আসলে কতগুলো ঢেউ? সে কী করে একটা দেয়াল বা আলমারিকে কোনো এক সৈকত বা শৈলচূড়া অথবা একটি জেটিতে পরিণত করে সেগুলোকে সাজিয়ে দিতে পারে ফেনায়? ঘরের অযত্নে ফেলে রাখা প্রান্ত, জমে ওঠা ধুলা, ময়লাও পেয়ে যায় তার মৃদু স্পর্শ। সবকিছু যেন মেতে ওঠে হাসিতে, সবগুলো জায়গা দেখায় তাদের ঝকঝকে উজ্জ্বল দাঁত। পুরো দেশ, শহর এমনকি অন্যান্য বাড়িগুলো ফেলে রোদ কেবল আমার বাড়িতে ঢোকে হাসিমুখে এবং বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবং কোনো কোনো গভীর রাতে, আতঙ্কিত তারারা তাকে চুপিসারে বেরিয়ে যেতে দেখে আমার বাড়ি থেকে।

ভালোবাসা একটি খেলা যেন, নিরন্তর এক সৃষ্টি। কেবলই সৈকত, বালি আর অবিরাম ঝকঝকে বিছানার চাদর। তাকে জড়িয়ে ধরলে গর্বে ফুলে ওঠে সে, অবিশ্বাস্য লম্বা হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওঠে, যেন পপলারের তরল এক স্তম্ভ। তারপর অচিরেই তা পরিণত হয় শুভ্র পালকের ঝরনায়, পরিণত হয় হাসির পালকে যা আছড়ে পড়ে আমার মাথায়, ঘাড়ে আর আমাকে ভরিয়ে দেয় শুভ্রতায়। কখনো সে আমার সামনে নিজেকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যেন এক অনন্ত দিগন্ত, যতক্ষণ না আমিও এক দিগন্তে পরিণত হই, পরিণত হই নীরবতায়। আমাকে সে আচ্ছাদিত করে যেন কোনো সংগীত কিম্বা অতিকায় কোনো ঠোঁট, পূর্ণাঙ্গ এবং বঙ্কিম। অবিরাম মৃদু চাপ, ফিসফিস, চুমু, এই ছিল তার উপহার। তার জলে অবগাহন করে মোজা অবধি ভিজে চুপচুপে হতাম আমি আবার চোখের পলকে নিজেকে খুঁজে পেতাম মাথা-ঝিম-ধরা উচ্চতায়, যেন ঝুলে আছি রহস্যময়ভাবে। অতঃপর এক পাথরখণ্ডের মতো ভূপাতিত হতাম কিন্তু মনে হতো আমাকে যেন একটি পালকের মতো আলতো করে রাখা হলো কোনো শুকনো চরে। সেই জলের ভেতর ঘুমানোর কোনো তুলনা নেই। তুলনা নেই হাজার সুখী মৃদু পরশ পেয়ে জেগে উঠবার, তুলনা নেই হাসি স্তব্ধ করে দেয়া হাজার আঘাতে জেগে উঠবার।

কিন্তু তার সত্তার গভীরে আমি পৌঁছাতে পারিনি কোনোদিন। কোনোদিন স্পর্শ করতে পারিনি বেদনা আর মৃত্যুর নগ্নতাকে। সম্ভবত ঢেউদের ওসব থাকে না, সেই গোপন চত্বর যা নারীদের নাজুক এবং নশ্বর করে তোলে। নারীর মতোই তার স্পর্শকাতরতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তবে সে তরঙ্গ কেন্দ্রমুখী নয়, কেন্দ্রাতিগ। প্রতিবার কেবলই যা ছড়িয়ে যায় দূর থেকে দূরে যতক্ষণ না সে-তরঙ্গ স্পর্শ করে অন্য কোনো গ্যালাক্সিকে। তাকে ভালোবাসা যেন অতিদূর আকাশে অচেনা কোনো তারাকে ছোঁয়া। কিন্তু তার সত্তার কেন্দ্র... না, তার কোনো কেন্দ্র নেই। আছে কেবল শূন্যতা যেমন থাকে জলের ঘূর্ণির, যে ঘূর্ণি আমাকে চুম্বকের মতো টেনে চুবিয়ে ফেলে অতলে।

পাশাপাশি শুয়ে আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস, কানাকানি, হাসি বিনিময় করেছি। আমার বুকের উপর আছড়ে পড়েছে সে এবং তারপর উন্মোচিত হয়েছে অস্ফুট স্বরের বাগানের মতো। আমার কানে কানে গান গেয়েছে সে, যেন এক কচি শামুক। সে বিনয়ী আর স্বচ্ছ হয়েছে। শান্ত জল ছোট্ট একটি প্রাণীর মতো আমার পা আঁকড়ে ধরেছে। সে এতটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠেছিল যে আমি তার সব ভাবনাগুলো পড়তে পারতাম। কোনো কোনো রাতে তার ত্বক ঢেকে থাকত ফসফরাসে, তাকে জড়িয়ে ধরলে মনে হতো আগুনের উল্কি আঁকা কোনো রাতকে যেন জড়িয়ে আছি। কিন্তু সে অন্ধকার এবং তেতোও হয়ে উঠত। হঠাৎ কোনোদিন সে গোঙাত, শরীর মোচড়াত। তার গোঙানিতে প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যেত। তার গোঙানি শুনে সমুদ্রের বাতাস এসে আমার দরজায় নখ আঁচড়াত, হুঙ্কার দিত ছাদের উপর। মেঘলা দিনে মেজাজ বিগড়ে থাকত তার। ঘরের আসবাব ভাঙত, বাজে কথা বলত, আমাকে ভরিয়ে রাখত অপমানে, সবুজ আর বাদামি ফেনায়। সে খেপে যেত, কাঁদত, কসম কাটত। চাঁদ, নক্ষত্র আর অন্য পৃথিবীর আলোর প্রভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বদলে যেত তার মন আর মুখ। আমার মনে হতো ভালোই তো! কিন্তু তা! ছিল জলোচ্ছ্বাসের মতো বিধ্বংসী।

একাকিত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে। ঘর ভরে যায় শামুক আর নানা সামুদ্রিক জীবে, ভরে যায় ছোট ছোট সামুদ্রিক নৌকায়, যে নৌকাগুলিকে সে তার রুদ্রদিনে ডুবিয়ে দিয়েছিল অতলে (সঙ্গে আরো কিছু, প্রতিরাতে আমার মস্তিষ্ক থেকে চিত্ররূপময় যা-কিছু বেরিয়ে ডুবে যেত তার ভয়ঙ্কর অথবা সুখকর ঘূর্ণিতে)। কত ছোট ছোট সম্পদ যে তখন হারিয়ে গেল। কিন্তু আমার নৌকা আর শামুকের সেই নিঃশব্দ সংগীত যথেষ্ট ছিল না তার জন্য। আমাকে ঘরের ভেতর একঝাঁক মাছের ব্যবস্থা করতে হলো। সত্যি বলতে মাছেরা যখন আমার বান্ধবীর ভেতর সাঁতার কাটত, তার স্তন স্পর্শ করত, তার উরুর মাঝখানে গিয়ে ঘুমাত, তার চুলকে নানা রঙের ঝলকে সাজিয়ে তুলত, হিংসা হতো আমার।

মাছগুলোর ভেতর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ মাছ ছিল বিশ্রী, ভয়ংকর। অ্যাকুরিয়ামের ক্ষুদ্র সেই বাঘগুলোর ছিল বড় বড় স্থির চোখ আর রক্তলোলুপ মুখ। জানি না কোন্ ভুলে আমার বান্ধবী এত আনন্দে তাদের সাথে খেলত, নির্লজ্জের মতো ওদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাত। সেসবকে আমি উপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঐ বিদঘুটে জীবগুলোর সঙ্গে একা একা দীর্ঘ সময় কাটাত সে। একদিন অসহ্য হয়ে ওঠে সব, আমি দরজা খুলে ওদের ভাসিয়ে দেই। দ্রুত, অশরীরী আত্মার মতো ওরা আমার হাত ফসকে বেরিয়ে যায় এবং আমার বান্ধবী তাই দেখে হাসে আর আমাকে আছড়ে ফেলে। আমার মনে হয় আমি বুঝি ডুবে যাচ্ছি। আমি যখন প্রায় মরতে বসেছি, নীল হয়ে পড়েছি ঠিক তখন সে আমাকে নিয়ে ঠেলে ফেলে সৈকতে। আমাকে সে চুমু খেতে থাকে এবং বলে আমি কিচ্ছু বুঝি না। আমি খুব দুর্বল, ক্লান্ত এবং অপমানিত বোধ করি। পাশাপাশি তার বিকট ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় আমি চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হই কারণ তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি এবং সে আমাকে ডুবন্ত মানুষের সুস্বাদু মৃত্যুর কথা বলে। আমি সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে ভয় এবং ঘৃণা করতে শুরু করি।

এতদিন আমার নিজের জগৎকে উপেক্ষা করেছি আমি। আমি আবার আমার বন্ধুদের বাড়িতে যেতে শুরু করি এবং পুরনো সম্পর্কগুলো ঝালাই করে নিই। আমার এক পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করি। আমার এই গল্প গোপন রাখার শপথ করিয়ে আমি তাকে ঢেউয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলি। একজন পুরুষকে উদ্ধার করবার সুযোগের মতো আর কিছু এতটা অনুপ্রাণিত করে না মেয়েদের। আমার সেই উদ্ধারকারী বান্ধবী তার সবরকম কলাকৌশল ব্যবহার করে, কিন্তু একজন নারী যার আত্মা একটাই, শরীর একটাই, সে আমার এই ঢেউ বান্ধবী যার রূপান্তর ঘটছে অবিরাম, তার সঙ্গে কী করে আর পারে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শীত আসে। ধূসর হয়ে যায় আকাশ। শহরের উপর কুয়াশা নামে। ঝিরিঝিরি হিম বৃষ্টি হয়। আমার বান্ধবী কাঁদে প্রতিরাতে। দিনের বেলা সে নিজেকে একা রাখে, থাকে শান্ত এবং বিপদজনক। ঘরের কোণায় বসে বকবক করতে থাকা বুড়ির মতো একটানা বিড়বিড় করতে থাকে সে। সে ক্রমশ কেমন শীতল হয়ে আসে। ওর সঙ্গে রাত্রিযাপন করা মানে দাঁড়ায় সারারাত ধরে শীতে কাঁপতে থাকা, এবং মনে হওয়া যেন আমি জমে যাচ্ছি, একটু একটু করে আমার রক্ত, হাড়, চিন্তা সব জমে যাচ্ছে। সে ক্রমশ হয়ে ওঠে গভীর, দুর্ভেদ্য আর অস্থির।

এরপর আমি প্রায়ই বাইরে বেরিয়ে যাই এবং আমার অনুপস্থিতির মাত্রা বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। সে ঘরের কোণে বসে চিৎকার করতে থাকে এবং তার ধাতব দাঁত আর ঝাঁঝালো জিহ্বা দিয়ে দেয়ালগুলোকে কামড়ে ভেঙে ফেলতে থাকে। সারারাত বিলাপ করে সে, অনুযোগ করে আমার নামে। সে দুঃস্বপ্ন দেখে, সূর্য আর উষ্ণ সৈকতের ভ্রম হয় তার। সে স্বপ্ন দেখে যেন উত্তর মেরুতে চলে গেছে এবং সেখানে পরিণত হয়েছে প্রকাণ্ড এক বরফখণ্ডে। দেখে সে যেন রাতের অন্ধকার আকাশের নিচে একখণ্ড বরফ হয়ে ভেসে চলেছে মাসের পর মাস। আমাকে অপমান করে সে। অভিশাপ দেয়, হাসে, ঘর ভরিয়ে রাখে অট্টহাসিতে আর বিভ্রমে। তার গভীর তলদেশ থেকে সে দানবদের ডেকে আনে। অন্ধ, তৎপর, ভোঁতা সবরকম দানব। যা-কিছু স্পর্শ করে সে তাকেই বিদ্যুতায়িত করে ফেলে, অ্যাসিডের মতো গলিয়ে ফেলে সব। তার মিষ্টি আলিঙ্গন দড়ির গিঁট হয়ে আমার শ্বাস রোধ করে। এবং তার শরীর এক অপ্রতিরোধ্য চাবুক হয়ে কেবলই আঘাত করে আমাকে, আঘাত করে, আঘাত করে। আমি পালিয়ে যাই। সেই বিদঘুটে মাছগুলো ভয়ঙ্করভাবে হাসে।

পাহাড়ের ঐ লম্বা পাইন গাছগুলোর মধ্যে গিয়ে আমি মুক্ত ভাবনার মতো ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। এক মাস পর আমি বাড়ি ফিরি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি।

এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে দেখি চিমনির মার্বেলের উপর, নিভে যাওয়া আগুনের পাশে আমার বান্ধবী জমে একটি বরফের মূর্তি হয়ে আছে। তার ক্লান্তিকর সৌন্দর্যে আমি আর বিচলিত হই না। আমি তাকে একটি বড় ক্যানভাসের ব্যাগে ঢুকিয়ে, কাঁধে ঝুলিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। রাস্তার শেষ মাথার রেস্টুরেন্টে আমার ওয়েটার বন্ধুর কাছে আমি আমার বান্ধবীকে বিক্রি করে দিই। ওয়েটার বন্ধুটি মুহূর্তেই আমার বান্ধবীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ছোট ছোট বরফকুচিতে পরিণত করে এবং ওয়াইনের বোতলগুলোকে ঠাণ্ডা করবার জন্য যে বালতিতে রাখা হয়েছে সেখানে ছড়িয়ে দেয় যত্ন করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধ উইলো আর ঘুমিয়ে পড়া মেয়ে

▼

হারুকি মুরাকামি

চোখ বুজলে ভেসে আসে বাতাসের ঘ্রাণ। গ্রীষ্মের বাতাস যেন ফেঁপে ওঠা নিটোল কোনো ফল। শাঁসালো, খসখসে, ভেতরে অসংখ্য বীজ। মাঝ আকাশে সে ফল ফেটে পড়লে তার ছড়িয়ে পড়া বীজগুলো হালকা বুলেটের মতো আমার নগ্ন হাতে এসে পড়ে। মৃদু একটা ব্যথা রেখে যায়।

‘কয়টা বাজে?’—জিজ্ঞাসা করে আমার খালাতো ভাই। আমার চেয়ে আট ইঞ্চি খাটো সে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় উপরদিকে তাকাতে হয় তাকে।

আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি—‘দশটা বিশ।’

‘ঘড়িটা ঠিক টাইম দেয় তো?’

‘আমার তো তাই মনে হয়।’

খালাতো ভাই আমার কব্জি ঘুরিয়ে নিজেই ঘড়ি দেখে। তার সরু, মসৃণ আঙুলগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে শক্ত। ‘ঘড়িটা কি খুব দামি?’

‘না, খুবই শস্তা’, আমি বাসের টাইম টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলি।

কোনো উত্তর নেই।

আমার খালাতো ভাইকে বিভ্রান্ত দেখায়। ঠোঁটের ফাঁকে তার দাঁতগুলোকে দেখায় চুপসে যাওয়া হাড়ের মতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'খুব সস্তা বুঝলি'—তার দিকে সোজা তাকিয়ে বলি এবং সযত্নে পুনরাবৃত্তি করি—'এটা খুবই শস্তা ঘড়ি কিন্তু সময় ঠিক দেয়।'

খালাতো ভাই নীরবে মাথা নাড়ে।

আমার খালাতো ভাই ডান কানে একটু কম শোনে। প্রাইমারি স্কুলে উঠবার পর একদিন একটা বেসবল ওর কানে এসে লাগে খুব জোরে, সেই থেকে ডান কানে সে একটু কালা। তাতে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে তার কোনো অসুবিধা হয় না অবশ্য। সে সাধারণ ছেলেদের স্কুলেই যায় এবং একেবারেই স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। ক্লাসে সে সামনের বেঞ্চের ডানদিকে বসে যাতে তার বাঁ কানটা শিক্ষকের দিকে থাকে। রেজাল্টও তার মন্দ না। তবে সমস্যা হচ্ছে কখনো সে বেশ ভালো শোনে আবার কখনো শোনে না। তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অনেকটা জোয়ার-ভাটার মতো। আবার কখনো সে কোনো কানেই ঠিকমতো শোনে না, সেটা হয়তো ঘটে বছরে দুবার। তখন যেন তার ডান কানের নৈঃশব্দ গভীর হতে হতে এমন এক বিন্দুতে পৌঁছায় যে তার বাম কান দিয়ে আসা শব্দগুলোকেও তা নস্যাৎ করে দেয়। সে অবস্থা যখন হয় বলাবাহুল্য তখন তার স্বাভাবিক জীবন জানালা দিয়ে পালায়, তাকে স্কুল থেকে ছুটি নিতে হয়। ডাক্তাররা দ্বন্দ্বে পড়ে যান। এধরনের কেস তারা আগে কখনো দেখেননি, ফলে বস্তুত তাদের কিছুই করণীয় থাকে না।

'একটা ঘড়ি দামি হলেই যে সেটা ঠিক সময় দেবে এমন কোনো কথা নাই।' খালাতো ভাই বলে। যেন সে নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'আমার একটা খুব দামি ঘড়ি ছিল কিন্তু সেটা শুধু বন্ধ হয়ে যেত। সেকেন্ডারি স্কুলে উঠে ঘড়িটা আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু পরের বছরেই সেটা হারিয়ে ফেললাম। তারপর থেকে আমি ঘড়ি ছাড়াই চলি। ওরা আমাকে আর কোনো নতুন ঘড়ি কিনে দেয়নি।'

'ঘড়ি ছাড়া চলতে তোর ঝামেলা হয় না?'—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'কী?' বলে সে।

আমি এবার গলা চড়িয়ে সোজা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি—'ঘড়ি ছাড়া চলাফেরা করতে তোর সমস্যা হয়?'

'না, না, কোনো সমস্যাই হয় না'—মাথা নাড়িয়ে বলে সে। 'আমি তো আর বন-জঙ্গলে থাকি না, দরকার হলে কাউকে জিজ্ঞাসা করি।'

'তা অবশ্য ঠিক'—আমি বলি।

আমরা দুজনই নীরবে থাকি কিছুক্ষণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি জানি আমার আরো কিছু বলা উচিত, ওর প্রতি সদয় হওয়া উচিত, ওকে আশ্বস্ত করা উচিত যতক্ষণ না আমরা হাসপাতালে পৌঁছাচ্ছি। কিন্তু ওর সঙ্গে পাঁচ বছর পরে এই আমার প্রথম দেখা। ইতিমধ্যে ওর বয়স নয় থেকে বেড়ে হয়েছে চৌদ্দ আর আমার হয়েছে বিশ থেকে পঁচিশ। এই সময়টা আমাদের মধ্যে কেমন একটা স্বচ্ছ দেয়াল তুলে দিয়েছে যেটা ভেদ করা দুরূহ। তাছাড়া আমি কিছু বলতে চেষ্টা করলেও ঠিক কথাটা যেন মুখে আসছে না। আর যতবারই আমি কিছু একটা বলতে গিয়ে কথাটাকে গিলে ফেলছি, ততবারই খালাতো ভাই আমার দিকে বিভ্রান্ত হয়ে তাকাচ্ছে। সেই তখন থেকে সে তার বাম কানটা আমার দিকে একটু উঁচু করে তুলে রেখেছে।

'এখন কয়টা বাজে?'—সে জিজ্ঞাসা করে আবার।

'দশটা উনত্রিশ'।—আমি বলি।

শেষপর্যন্ত বাসটা যখন দেখা গেল তখন ঘড়িতে দশটা বত্রিশ।

***

যে বাসটা এল সেটি নতুন ধরনের। আমি যেধরনের বাসে করে সিনিয়ার স্কুলে যেতাম এটা সেরকম নয়। সামনের উইন্ডস্ক্রিনটি প্রকাণ্ড, বাসটিও বিশাল, যেন পাখা ছাড়া এক বোমারু বিমান। এবং যতটুকু ভেবেছিলাম, বাসে ভিড় তার চেয়েও বেশি। কেউ দাঁড়িয়ে নেই যদিও কিন্তু পাশাপাশি দুটো সিট আমরা পেলাম না। আমরা বেশি দুরে যাচ্ছিলাম না, ফলে না বসে আমরা পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দিনের এই সময়টিতে বাসে কেন যে এত ভিড় তা এক রহস্য মনে হলো। বাসটি একটি রেলস্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে, পাহাড়ের উপর একটি আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে চক্কর দিয়ে ঐ স্টেশনেই যাত্রা শেষ করে। আর এদিকে কোনো ট্যুরিস্ট স্পটও নেই। পথে কয়েকটি স্কুল আছে ফলে স্কুলের সময় বাসে ভিড় থাকে কিন্তু এসময় তো বাস ফাঁকা থাকারই কথা।

খালাতো ভাই আর আমি বাসের ভেতরের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। বাসটি ঝকঝকে নতুন, বোঝা যায় কেবলই ফ্যাক্টরি থেকে বের করে আনা হয়েছে। ধাতব বহিরাঙ্গটি এত চকচকে যে তাতে মুখ দেখা যায়। সিটের গদিগুলো নরম, এমনকি ছোট্ট স্ক্রুগুলোতেও একটা গর্বিত, উত্তেজিত ভাব আছে যা নতুন যে-কোনো যন্ত্রে দেখা যায়।

এই নতুন বাস, বাসের ঐ অপ্রত্যাশিত ভিড় আমাকে কেমন বিভ্রান্ত করে। আমি যে রুটে চলতাম, বাস বোধহয় সে রুটটি বদলে ফেলেছে। আমি ভালো করে বাসের ভেতরটি দেখি, বাইরে তাকাই। বাইরে আমার সেই পরিচিত আবাসিক এলাকাটিকেই দেখতে পাই।

'আমরা ঠিক বাসে চড়েছি তো?'—উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে আমার খালাতো ভাই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাসে উঠার পর থেকেই আমার চেহারায় সম্ভবত একটি বিভ্রান্ত ভাব ফুটে উঠেছে।

‘চিন্তা করিস না, ঠিক বাসেই উঠেছি’—তাকে নয় আমি যেন নিজেকেই আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করছি। ‘এদিক দিয়ে একটা বাস রুটই আছে, সুতরাং এটাই নির্ঘাত সেই বাস।’

‘যখন সিনিয়ার স্কুলে যেতে, তুমিও কি এই বাসেই যাতায়াত করতে?’—খালাতো ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

‘হ্যাঁ, এ বাসেই।’

‘আচ্ছা স্কুল ভালো লাগত তোমার?’

‘খুব যে লাগত তা না। স্কুলে বন্ধুদের সাথে দেখা হতো আর বাসজার্নিটাও তো খুব লম্বা ছিল না।’

আমার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে থাকে আমার খালাতো ভাই।

‘তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কি এখনও তোমার দেখা হয়?’

‘না, অনেকদিন ওদের সাথে দেখা হয় না।’—আমি সাবধানে উত্তর দিই।

‘কেন? তুমি তাদের সঙ্গে দেখা করো না কেন?’

‘আমরা তো এখন সব দূরে দূরে থাকি।’ যদিও দেখা না-হবার এটাই আসল কারণ নয়, কিন্তু এ ছাড়া ঐ মুহূর্তে আমি আর কোনো কারণের কথা ভাবতে পারছিলাম না।

আমাদের ঠিক সামনেই একদল বুড়োবুড়ি বসে আছে। জনা পনেরো হবে। হঠাৎ মনে হলো আসলে এদের কারণেই বাসটিতে এত ভিড় মনে হচ্ছে। তাদের সবারই চামড়া ট্যান করা, এমনকি তাদের ঘাড়ের পেছনটিও তামাটে। আর প্রত্যেকেই খুব শুকনো, লিকলিকে। অধিকাংশ পুরুষ পাহাড়ে ওঠার ভারী পোশাক পরা, মহিলারা সাধারণ পোশাকে। প্রত্যেকের কোলের উপর একটি ব্যাগ, পাহাড়ে ছোটখাটো হাইকিংএ গেলে লোকে যেমন নেয়। অদ্ভুতভাবে তারা সবাই দেখতে প্রায় একই রকম। একটা ড্রয়ারের ভেতর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা কোনো জিনিস যেন। তবে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এদিকে পাহাড়ে উঠবার কোনো পথ নেই। তাহলে এরা সব যাচ্ছে কোথায়? বাসের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে সেকথাই ভাবি। বিশেষ কোনো সদুত্তর পাই না।

***

‘আচ্ছা এবারও কি ব্যথা লাগবে? প্রতিবার ট্রিটমেন্ট করতে [illegible] ব্যথা লাগে?’—খালাতো ভাই জিজ্ঞাসা করে।

‘আমি ঠিক জানি না [illegible]’

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আচ্ছা তুমি কি কোনোদিন কানের ডাক্তারের কাছে গেছ?'

আমি মাথা নাড়ি। আমি জীবনে কোনোদিন কোনো কানের ডাক্তারের কাছে যাইনি।

'আগে যখন ডাক্তার দেখিয়েছিস, তখন ব্যথা লেগেছে?'—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'তেমন না। তবে একদম যে লাগেনি তাও বলা যাবে না। একটু ব্যথা লাগে তবে সাংঘাতিক কিছু না।'

'এবারও হয়তো ঐ একই রকম হবে। তোর মা বলল প্রতিবার যা করে এবারও তাই করবে তারা।'

'ওরা যদি ঐ একই কাজ করে তাহলে আর লাভ কী হলো?'

'বলা যায় না। কত কিছুই তো হতে পারে হঠাৎ!'

'মানে ঐ কর্ক বের করার মতো?'—খালাতো ভাই বলে। আমি তার দিকে তাকাই কিন্তু সে ঠাট্টা করছে বলে মনে হয় না।

'একজন নতুন ডাক্তার এবার তোর ট্রিটমেন্ট করবে এতেই তো তোর অন্যরকম লাগার কথা। ধর্ ছোটখাটো নতুন কোনো একটা প্রসেস করল, তাতে তো নতুন কোনো রেজাল্ট হতেও পারে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না।'

'না, হাল তো আমি ছাড়ছি না।'—খালাতো ভাই বলে।

'কিন্তু তোর মনে হচ্ছে, যথেষ্ট হয়েছে আর চাই না, তাই তো?'

'হ্যাঁ তাই'—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে সে। 'আসলে ঐ ভয়টাই সবচেয়ে খারাপ। মনে মনে যতটা ব্যথার কথা আমি ভাবি আসলে কিন্তু অতটা ব্যথা লাগে না। আমি কী বলতে চাচ্ছি তুমি বুঝতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পাচ্ছি।'

***

ঐ বসন্তে অনেককিছু ঘটে। টোকিওর ছোট যে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে আমি গত দুবছর ধরে কাজ করছিলাম সেখানে ঝামেলা বেধে যাওয়াতে চাকরিটা ছেড়ে দিই। ঐ সময়টাতেই গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সে-ই কলেজ থেকে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তার একমাস পর আমার নানি মারা যান পাকস্থলীর ক্যান্সারে। এবং পাঁচ বছর পর একটি সুটকেস হাতে করে আমি ফিরে আসি এই শহরে। আমার পুরনো ঘরটি আমি ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, দেখি ঠিক সেভাবেই আছে। আমি যে বইগুলো পড়তাম সেগুলো সেভাবেই শেলফে পড়ে আছে। আমার ডেস্ক, বিছানা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরনো সেইসব রেকর্ড আমি যেগুলো শুনতাম সব ওভাবেই আছে। কিন্তু সবগুলো জিনিস কেমন যেন শুকিয়ে গেছে, সেই রং আর গন্ধ নেই আগের মতো। শুধু সময় দাঁড়িয়ে আছে স্থির।

আমার নানির ফিউনারেলের দুদিন পরই ভেবেছিলাম টোকিও ফিরে নতুন চাকরি খুঁজব। একটা নতুন অ্যাপার্টমেন্টেও যাব ঠিক করেছিলাম। আশপাশের দৃশ্যগুলো বদলানোর দরকার ছিল। কিন্তু দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল, নিজেকে ঠেলে নিয়ে অতকিছু করা অনেক ঝক্কি মনে হচ্ছিল তখন। উদ্যোগ নিয়ে কাজটা যে করব, সেটা পারছিলাম না। আমার ঐ আগের রুমেই ঘাপটি মেরে থাকলাম, পুরনো রেকর্ডগুলো বসে বসে শুনলাম, পুরনো বইগুলোই আবার পড়লাম, মাঝে মাঝে বাগানে গিয়ে আগাছা সাফ করলাম, ব্যস্। কারো সাথে দেখাসাক্ষাৎও করিনি। কথা বলবার মধ্যে বলেছি শুধু পরিবারের গুটিকয় লোকজনের সঙ্গে।

একদিন আমার খালা আমার সাথে দেখা করতে এসে বললেন খালাতো ভাইটাকে নতুন হাসপাতালটাতে নিয়ে যেতে। বললেন, তিনি নিজেই নিয়ে যেতেন কিন্তু সেদিন কী যেন একটা ঝামেলা হয়েছে ফলে তিনি যেতে পারছেন না। কিন্তু ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া আছে। হাসাপতালটি আমার পুরনো হাইস্কুলের কাছে, সুতরাং জায়গাটি আমি চিনি, তাছাড়া আমি তো তেমনকিছু নিয়ে ব্যস্তও ছিলাম না, ফলে 'না' করবার আর কোনো উপায় ছিল না। লাঞ্চ খাবার জন্য খালা টাকাসহ একটা খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

খালাতো ভাই পুরনো যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিল সেখানে তেমন কোনো উন্নতিই হচ্ছিল না, সে কারণেই এই হাসপাতাল বদল। আসলে তার সমস্যাটি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আমার খালা যখন এ নিয়ে পুরনো ডাক্তারটিকে অভিযোগ করেছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিলেন ছেলের সমস্যা যত না তার কানে, তার চেয়ে বেশি তার বাড়ির পরিবেশে। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে একটা বিতণ্ডাও হয়। নতুন হাসপাতালে গিয়ে তার কান রাতারাতি ভালো হয়ে যাবে এমন আশা অবশ্য কেউ করছে না। কেউ মুখ ফুটে কিছু না বললেও খালাতো ভাইয়ের কানের ব্যাপারে কোনোরকম আশা সবাই একরকম ছেড়েই দিয়েছে।

খালাতো ভাইটা আমার কাছাকাছিই থাকে। কিন্তু আমি ওর দশ বছরের বড় এবং যাকে বলে ঘনিষ্ঠ তা আমি তার সঙ্গে কখনোই ছিলাম না। কোনো অনুষ্ঠানে পরিবারের সবাই যখন মিলিত হতো তখন আমি হয়তো ওর সঙ্গে একটু-আধটু খেলাধুলা করেছি, ঐ পর্যন্তই। তারপরও সবাই ভাবত আমি আর খালাতো ভাই বেশ একটা জুটি, মনে করত খালাত ভাইটা আমার খুব নেওটা আর আমিও তাকে খুব পছন্দ করি। কেন যে লোকে এমন ভাবত বহুদিন আমি তার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। তবে এই মুহূর্তে খালাতো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাই যেভাবে ওর ঘাড়টি একটু কাৎ করে কানটি আমার দিকে উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাতে ওর জন্য আমার কেমন যেন মায়া হয়। বহুদিন আগে শোনা কোনো বৃষ্টির শব্দের মতো ওর ঐ বিচিত্রভঙ্গিটি আমাকে আপ্লুত করে। আত্মীয়রা কেন যে আমাদের দুজনকে একটি জুটি ভাবত তা যেন আমি কিছুটা আঁচ করতে শুরু করি।

***

বাস সাত-আটটি স্টপেজ পেরিয়ে গেলে খালাতো ভাই আমার দিকে চোখ তুলে বলে—'হাসপাতাল কি আরো দূরে?'

'হ্যাঁ, আরো খানিকটা দুরে। হাসপাতালটা অনেক বড় সুতরাং মিস করার কোনো চান্স নাই।'

আমি দেখি জানালা দিয়ে ঢোকা বাতাসে ঐ বুড়োবুড়িদের হ্যাটগুলো নড়ছে, গলায় পেঁচানো স্কার্ফগুলো উড়ছে। লোকগুলো কোথায় যে যাচ্ছে ভেবে পাই না।

'আচ্ছা তুমি আমার বাবার কোম্পানিতে চাকরি করবে?'—খালাতো ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই। ওর বাবা, আমার খালুর কোবেতে বড় একটি প্রিন্টিং কোম্পানি আছে। কিন্তু ওখানে কাজ করার কথা তো আমি কখনো ভাবিনি, কেউ আমাকে এব্যাপারে কোনো কথাও বলেনি।

'আমাকে তো কেউ কখনো এমন কিছু বলেনি, কেন জিজ্ঞাসা করছিস?'

খালাতো ভাই লজ্জা পায়। বলে—'না, এমনি মনে হলো তুমি তো করতেও পারো। তাছাড়া কেনই বা করবে না বলো তো। তোমাকে তাহলে কোথাও আর যেতে হবে না, সবাই খুশিই হবে।'

টেপ করা ঘোষকের কণ্ঠ পরবর্তী স্টপেজে নাম ঘোষণা করে। নামবার জন্য কেউ বোতাম টেপে না। ঐ স্টপেজে কেউ ওঠেও না।

'কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে, টোকিওতে ফিরে যেতে হবে আমার'—আমি বলি। খালাতো ভাই নীরবে মাথা নাড়ে।

আসলে করবার মতো মোটেও আমার কোনো কাজ নেই। কিন্তু আমি জানি এখানে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব না।

বাস পাহাড়ের গা ঘেঁষে উপরে উঠতে থাকলে বাড়িঘর ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে। গাছের বড় বড় ডাল রাস্তার উপর ছায়া ফেলে। আমরা কিছু বাড়ি পেরিয়ে যাই যেগুলো দেখতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেমন যেন বিদেশি ধাঁচের, রং করা, নিচু দেয়াল। ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। বেশ লাগে। বাস এক-একটি বাঁক ঘোরে আর নিচে দূরের সাগর চকিতে একটু দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। হাসপতাল আসা পর্যন্ত আমি আর খালাতো ভাই ওখানে দাঁড়িয়েই বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকি।

'পরীক্ষা টরীক্ষা করতে একটু সময় লাগবে, ওটা আমি একাই সামলে নিতে পারব। তুমি বরং অন্য কোথাও ঘুরে আসতে পারো'—খালাতো ভাইটা বলে। ডাক্তারকে দ্রুত 'হ্যালো' বলে আমি পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাই কাফেটারিয়ায়। সকালে ভালো করে নাস্তা করিনি, পেটে ক্ষুধা ছিল বেশ। কিন্তু মেনুর কোনো আইটেমই পছন্দ হচ্ছিল না। আমি এক কাপ কফি নিই।

কাজের দিন সকালবেলা, আমি আর একটি ছোট্ট পরিবার কাফেটারিয়ার পুরো জায়গাটি দখল করে আছি। যে পরিবারকে দেখছি তার বাবাটির বয়স মধ্য চল্লিশ, একটি নেভি ব্লু ডোরাকাটা পায়জামা পড়ে আছেন তিনি, পায়ে প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। মা এবং ছোট্ট দুটি যমজ মেয়ে দেখা করতে এসেছে। যমজ মেয়ে দুটি একই রকম শাদা ফ্রক পরেছে, টেবিলের উপর ঝুঁকে গম্ভীর মুখে কমলার জুস খাচ্ছে তারা। বাবাটির অসুখ তেমন সিরিয়াস কিছু মনে হচ্ছে না এবং বাবা মা বাচ্চা সবাইকে ক্লান্ত, বিরক্ত দেখাচ্ছে।

জানালার বাইরে লন। পানি ছিটানোর স্বয়ংক্রিয় ঝরনা ঘুরে ঘুরে ঘাসের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে রুপালি পানির ধারা। লম্বা লেজঝোলা একজোড়া পাখি ঠিক ঝরনার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। লন পেরিয়ে কয়েকটি জনশূন্য টেবিল, তারপর কোর্ট, নেট নেই। টেনিস কোর্ট পেরিয়ে একসারি জেলকোভা গাছ, তার পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাগর। ছোট্ট ঢেউগুলোর উপর চিকচিক করছে গ্রীষ্মের রোদ। হাওয়া জেলকোভার পাতার ভেতর দিয়ে সরসর করে বয়ে গিয়ে ঝরনার পানির ধারাকে খানিকটা বাঁকিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হলো বহু বছর আগে এ দৃশ্য আমি যেন কোথাও দেখেছি। ঐ প্রশস্ত লন, দুটো যমজ বাচ্চা ঝুঁকে কমলার জুস খাচ্ছে, লম্বা লেজঝোলা পাখি উড়ে যাচ্ছে কোনো অজানায়, দূরে সমুদ্র... কিন্তু সেটা নেহাতই একটা মায়া। খুবই স্পষ্ট, এত তীব্র মনে হয় যেন তা সত্য কিন্তু তারপরও সেটা একটি মায়াই। এ হাসপাতালে আমি জীবনে কখনো আসিনি।

আমি সামনের চেয়ারটির দিকে পা টান করি, বড় একটি নিশ্বাস নিই এবং আমার চোখদুটো বন্ধ করি। অন্ধকারে আমি একটি শাদা পিণ্ড দেখি। মাইক্রোস্কোপের নিচের কোনো জীবাণুর মতো একবার সেটা বড় হচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে আবার। আকার বদলাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে, জোড়া লাগছে আবার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আট বছর আগে আমি অন্য একটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের পাড়ে ছোট একটি হাসপাতাল। সেখানে জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছিল অলিয়েন্ডারের একটি ঝোপ। সেটা অবশ্যই একটি হাসপাতাল ছিল এবং সেখানে ছিল বৃষ্টির গন্ধ। আমার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডের বুকে অপারেশন হয়েছিল সেই হাসপাতালে এবং মনে আছে আমরা দুজন তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল আমাদের সিনিয়ার স্কুলের শেষ সামারের আগের বছর।

এমন বড় কোনো অপারেশন ছিল না। মেয়েটির পাঁজরের একটি বাঁকানো হাড়কে খানিকটা সোজা করতে অপারেশনটি করা হয়েছিল। এমন কোনো এমার্জেন্সি কিছু ছিল না তবে অপারেশনটি তাকে করতেই হতো একসময়। মেয়েটি ঠিক করেছিল করতে যখন হবেই তখন করে ফেলাই ভালো। অপারেশন তাড়াতাড়ি হলেও সেরে উঠবার জন্য তারা ওকে আরো দশ দিন হাসপাতালে থাকতে বলেছিল। আমি আর আমার বন্ধু একটি ১২৫ সিসি ইয়ামাহা মটরসাইকেল চালিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময় মটরসাইকেলটি আমার বন্ধু চালিয়েছিল আর আসার সময় আমি। বন্ধুটি আমাকে অনুরোধ করেছিল তার সাথে যেতে। 'হাসপাতালে আমি একা যাব? তোর মাথা খারাপ হয়েছে?'—সে বলেছিল।

যাওয়ার পথে রাস্তায় একটি চকোলেটের দোকানে থেমে বন্ধুটি এক প্যাকেট চকোলেট কিনেছিল। পিছনে বসে আমি এক হাতে ওর বেল্ট চেপে ধরেছিলাম আরেক হাতে শক্ত করে ধরেছিলাম চকোলেটের বক্সটি। খুব গরম পড়েছিল সেদিন। আমাদের শার্ট ঘামে ভিজে যাচ্ছিল আবার শুকিয়ে যচ্ছিল হাওয়ায়। বন্ধুটি মটরসাইকেল চালাতে চালাতে বেসুরো গলায় কীসব আবোলতাবোল গান গাইছিল। এখনও ওর ঘামের গন্ধ আমার নাকে লেগে আছে। এর কিছুদিন পরই আমার সেই বন্ধুটি মারা যায়।

***

মনে আছে আমার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডটি একটি নীল পাজামা আর হাঁটু পর্যন্ত নামানো গাউন জাতীয় একটি পোশাক পরেছিল সেদিন। আমরা তিনজন কাফেটারিয়াতে বসেছিলাম। আমরা শর্টহোপ সিগারেট খেয়েছিলাম, কোক আর আইসক্রিম খেয়েছিলাম। ওর গার্লফ্রেন্ড খুব ক্ষুধার্ত ছিল সেদিন, সে একটি চিনি-দেয়া ডোনাড খেয়েছিল আর খেয়েছিল অনেক ক্রিম-ভরা একটি কোকোয়া। তারপরও ক্ষুধা ছিল তার।

'এখান থেকে তুমি একটা আস্ত বেলুন হয়ে বের হবে'—মুখ খিঁচে গার্লফ্রেন্ডকে বলেছিল আমার বন্ধু।

আঙুলের ডগা থেকে ডোনাডের তেল মুছতে মুছতে বান্ধবীটি বলে—'আচ্ছা বাবা, আমি তো ভালো হয়ে যাচ্ছি, সেটাই বড় কথা তাই না!'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওরা যখন কথা বলছিল আমি জানালা দিয়ে ওলিয়েন্ডারের পাতা দেখছিলাম। বিশাল ঝোপ, নিজেরাই যেন একটা বন তৈরি করেছে। দূরে সাগরের ঢেউয়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম। অবিরাম বাতাসে জানালার রেলিংগুলোতে মরচে ধরে গিয়েছিল। অ্যানটিকের মতো দেখতে একটি ফ্যান ঘরের ভেতরের ভ্যাপসা গরমকে ঘোরাচ্ছিল। কাফেটারিয়ায় হাসপাতালের গন্ধ। এমনকি খাবার আর ড্রিঙ্কের ভেতরেও কেমন হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। বান্ধবীটির পায়জামায় দুটো পকেট, একটাতে সোনালি রঙের ছোট্ট একটা কলম। যখনই সে নিচু হচ্ছিল, আমি তার ভি-কলারের ফাঁকে ছোট্ট, ফর্সা স্তনদুটো দেখতে পাচ্ছিলাম।

** *

ঠিক এর পর থেকে আমার আর কিছু মনে পড়ে না। আমি মনে করার চেষ্টা করি এর পর কী ঘটেছিল। আমি কোক খেলাম, ওলিয়েন্ডারের ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, ওর স্তন দেখলাম, তারপর কী হলো?

আমি প্লাস্টিকের চেয়ারটিতে গিয়ে বসি, হাতের উপর মাথা রাখি এবং আমার স্মৃতির আরো গভীরে গিয়ে পরে কী ঘটেছিল তা খুঁজতে চেষ্টা করি। যেন একটা চোখা ছুরি দিয়ে বোতলের ভেতর থেকে কর্ক বের করছি।

মাথাটি অন্যদিকে সরিয়ে দৃশ্যটি ভাবার চেষ্টা করি। সেই দৃশ্যটি যাতে ডাক্তাররা মেয়েটির বুক চিরে তাদের গ্লোভস পড়া হাত সেখানে ঢুকিয়ে তার বাঁকা পাঁজরের হাড় সোজা করবার চেষ্টা করছেন। পরাবাস্তব, রূপকের মতো মনে হয় সে দৃশ্য।

এবার মনে পড়েছে। এরপর আমরা সেক্স নিয়ে কথা বলেছিলাম। অন্তত আমার বন্ধুটি বলেছিল। কিন্তু কী বলেছিল সে? আমাকে নিয়ে কিছু একটা হবে নির্ঘাত। আমি কীভাবে মেয়েদের সাথে সেক্স করতে গিয়ে ফেল মেরেছি, এসব নিশ্চয়ই। তেমন কোনো গল্পই না তবু আমার সেই বন্ধুর সবকিছুকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলার অভ্যাস আছে, সেই গল্প শুনেই মেয়েটি হেসে লুটোপুটি যাচ্ছিল। আমিও হাসছিলাম। মানতেই হবে আর যাই হোক বন্ধুটি গল্প বলতে জানে।

'আমাকে এত হাসিও না তো, আমার বুকে ব্যথা লাগছে।'—মেয়েটি বলে।

'কোথায় ব্যথা লাগছে?'—আমার বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করেছিল।

ঠিক তার বাম স্তনের ডান দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল। এ নিয়েও আমার বন্ধুটি কী যেন সব ঠাট্টা করেছিল, মেয়েটি আবার হেসেছিল খুব।

***

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি ঘড়ির দিকে তাকাই। এগারোটা পঁয়তাল্লিশ বাজে তবু আমার খালাতো ভাইয়ের দেখা নেই। দুপুরের খাবারের সময় হয়ে যাচ্ছে এবং কাফেটারিয়ায় ভিড় বাড়ছে। নানারকম শব্দ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ঘরটায়। আমি আবার আমার স্মৃতিতে ফিরে যাই এবং মেয়েটির বুকপকেটের সোনালি কলমটির কথা তখন আমার মনে পড়ে।

আমার মনে পড়ে সে তার কলম দিয়ে ন্যাপকিনের উপর কী যেন লিখেছিল।

মনে পড়ে সে আসলে একটি ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিল। কাগজের ন্যাপকিনটি খুবই পাতলা হওয়ার কারণে তার কলমের নিব আটকে যাচ্ছিল বারবার। তারপরও তাতে সে একটি পাহাড়ের ছবি আঁকতে পেরেছিল। পাহাড়ের উপর একটি ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির ভেতর ঘুমিয়ে আছে একটি মেয়ে। বাড়ির চারপাশে ঘিরে আছে এক সারি অন্ধ উইলো গাছ। ঐ অন্ধ উইলো গাছগুলোই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটিকে।

'অন্ধ উইলো আবার কী জিনিস?'

'আমি কোনোদিন শুনিনি।'

'না শুনবারই তো কথা কারণ আমিই এটা তৈরি করেছি'—হাসতে হাসতে বলেছিল মেয়েটি। 'অন্ধ উইলো গাছের অনেক পরাগ থাকে এবং ছোট ছোট মাছি গায়ে ঐ পরাগ মেখে মানুষের কানের ভেতর ঢুকে যায় আর এভাবেই তারা মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।'

সে আরেকটি নতুন ন্যাপকিন নিয়েছিল এবং সেখানে আরেকটি অন্ধ উইলোর ছবি এঁকেছিল। দেখা যাচ্ছে অন্ধ উইলো অনেকটা আজিলো গাছের সমান। গাছ জুড়ে অসংখ্য ফুল, তাদের ঘিরে আছে গাঢ় সবুজ পাতা, যেন গাছের উপর ভিড় জমিয়েছে অনেকগুলো বাঘের লেজ। অন্ধ উইলো গাছের সঙ্গে আসল উইলো গাছের কোনো মিল নেই।

'সিগারেট আছে?'—বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি তাকে ঘামে ভেজা হোপ সিগারেটের প্যাকেট এবং ম্যাচবক্সটা টেবিলের উপর দিয়ে ছুড়ে দিয়েছিলাম।

'অন্ধ উইলোকে বাইরে থেকে ছোট দেখা গেলেও এর শেকড় কিন্তু গেছে অনেক গভীরে'—বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড বলে। 'আসলে বড় হয়ে একপর্যায়ে উপর দিকে না উঠে গাছটি কেবলই নিচের দিকে নিজেকে ঠেলতে থাকে। যেন সে অন্ধকার থেকে পুষ্টি নেয়।'

'আর পরাগ বয়ে আনা ঐ মাছি মেয়েটার শরীরে ঢুকে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তাই তো?'—আমার বন্ধুটি বলেছিল। ড্যাম ম্যাচকাঠি দিয়ে সিগারেট জ্বালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করে—'কিন্তু মাছিগুলোর কী হয়?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মাছিগুলির আর কী হবে, ওগুলো মেয়েটার শরীরের ভেতরেই থেকে যায় এবং তার মাংস কুরে কুরে খায়'—গার্লফ্রেন্ডটি বলেছিল।

'গপ গপ করে গিলে ফেলে?'—বন্ধুটি বলেছিল।

***

ঐ সামারে সেই অন্ধ উইলো নিয়ে সে কী করে একটি লম্বা কবিতা লিখেছে আমাদের তা বোঝাচ্ছিল সেই মেয়ে। সেই সামার সেমিস্টারে ঐ একটি অ্যাসাইনমেন্টই করেছিল সে। কোনো এক রাতে দেখা এক স্বপ্ন থেকে সে ঐ গল্পটি বানিয়েছিল এবং হাসাপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ নিয়ে একটি লম্বা কবিতাও লিখে ফেলেছিল। আমার বন্ধুটি কবিতাটি পড়তে চায়। কিন্তু মেয়েটি তাকে ঐ কবিতাটি দেখায়নি, বলেছিল ওটা তখনও খসড়া অবস্থায় আছে। তার বদলে ন্যাপকিনে ঐ ছবি এঁকে ব্যাপারটি সে আমাদের সে বুঝিয়েছিল।

'অন্ধ উইলো যে মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে তাকে উদ্ধার করবার জন্য একদিন একটা ছেলে ঐ পাহাড়ে ওঠে।'—মেয়েটি বলে।

'ছেলেটা নিশ্চয়ই আমি?'—আমার বন্ধু বলে।

মাথা নাড়ে মেয়েটি—'মোটেও তুমি না।'

'সত্যি?'—সে বলে।

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি'—মুখটা বেশ গম্ভীর করে সে বলে—'জানি না আমি কেমন করে এতটা শিওর, কিন্তু আমি জানি ওটা তুমি না। তুমি রাগ করোনি তো?'

'কিন্তু আমি জানি ওটা আমি'—ঠাট্টা করে বলেছিল আমার বন্ধু।

'অন্ধ উইলোর ঘন বন পেরিয়ে ছেলেটা পাহাড়ের উপর উঠছে। অন্ধ উইলো ঐ পাহাড় দখল করার পর ঐ ছেলেটিই প্রথম ঐ পাহাড়ে ওঠে। হ্যাট দিয়ে চোখ ঢেকে হাত দিয়ে চারিদিকে ভন ভন করে উড়তে থাকা মাছিগুলো সরাতে সরাতে সে উঠতে থাকে।'

'কিন্তু ছেলেটা পাহাড়ে উঠবার আগেই মাছিগুলো মেয়েটার শরীর খেয়ে ফেলে নিশ্চয়ই?'—আমার বন্ধু বলেছিল।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই বলতে পারো'—বলেছিল বান্ধবীটি।

'কিন্তু তোমার এই মাছিতে খাওয়া মেয়ের গল্প তো আমার মন খারাপ করে দিল!'—বন্ধুটি বলেছিল।

একটু ভেবে মেয়েটি বলেছিল—'হ্যাঁ, ব্যাপারটা মন খারাপ করার মতোই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তোমার কী মনে হয়'—সে জিজ্ঞাসা করেছিল আমাকে।

'হ্যাঁ, আমার কাছেও গল্পটা কেমন স্যাড মনে হলো।'—বলেছিলাম।

***

ঠিক বারোটা বিশে আমার খালাতো ভাই ফেরে। হাতে একটি ওষুধের ব্যাগ আর চোখেমুখে কেমন একটা এলোমেলো ভাব। কাফেটারিয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে খুঁজে পেতে এবং আমার কাছে আসতে বেশ সময় লাগে তার। কেমন যেন টালমাটালভাবে হাঁটে সে যেন ঠিক ভারসাম্য রাখতে পারছে না। আমার সামনে এসে বসে একটি লম্বা শ্বাস নেয় সে যেন এতক্ষণ নিশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিল।

'কেমন হলো'—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'এই আর কী।'

আমি অপেক্ষা করি সে আরো কিছু বলে কি না শুনবার জন্য। কিন্তু সে কিছু বলে না।

'ক্ষুধা লেগেছে? কিছু খাবি?'—আমি জিজ্ঞাসা করি।

সে মাথা নাড়ে।

'এখানে খাবি না তো কি বাসে করে শহরে গিয়ে খাবি?'

সে ইতস্তত করে ঘরটির চারদিকে তাকায়। বলে—'না, এখানেই ভালো।' আমি লাঞ্চ টিকিট কিনে দুজনের জন্য সেট লাঞ্চ অর্ডার দেই। খাবার আসবার আগের সময়টি খালাতো ভাই জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি যা দেখছিলাম তাই দেখতে থাকে—সমুদ্র, জেলকোভা আর ঐ পানি ছিটানোর ঝরনা।

আমাদের পাশের টেবিলে কেতাদুরস্ত মধ্যবয়সী এক দম্পতি স্যান্ডউইচ খাচ্ছে এবং তাদের এক বন্ধুর গল্প করছে যার ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে। বলছে কীভাবে বছর পাঁচেক আগে সে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে, কীভাবে সকালে উঠে সে রক্তবমি করত। স্ত্রীটি প্রশ্ন করছে আর স্বামী উত্তর দিচ্ছে। 'একজন মানুষের কী ধরনের ক্যান্সার হচ্ছে সেটা থেকে সেই মানুষটির পুরো জীবনটাকে তুমি দেখতে পারবে।'

আমরা স্টেক, ভাজা মাছ, রোল আর সালাদ দিয়ে লাঞ্চ করি। মুখোমুখি বসে নীরবে আমরা খেয়ে যাই। আমরা যতক্ষণ খেলাম তার পুরোটা সময় পাশের ঐ দম্পতি একটানা আলাপ করে গেলেন কীভাবে ক্যান্সার হয়, কেন ক্যান্সার রেট বেড়ে যাচ্ছে, কেন এখনও ক্যান্সারের কোনো ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না, এসব।

~ www.amarboi.com ~

***

'ঐ একই ব্যাপার' নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলে আমার খালাতো ভাই। 'ঐ একই প্রশ্ন, একই সব পরীক্ষানিরীক্ষা।'

হাসপাতালের সামনের একটি বেঞ্চে বসে আমরা বাসের জন্য অপেক্ষা করি। আমাদের মাথার উপরের গাছের পাতাগুলো থেকে-থেকে হাওয়ায় দুলে ওঠে।

'মাঝে মাঝে কি তুই কিছুই শুনিস না?'—আমি জিজ্ঞাসা করি।

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিচ্ছু শুনতে পাই না।'—বলে আমার খালাতো ভাই।

'কেমন লাগে তখন?'

ঘাড়টা একদিকে কাত করে সে ভাবতে থাকে। 'একসময় হঠাৎ আর কিছু শুনতে পাই না। কিন্তু আসলে ঠিক কী হচ্ছে বুঝতে একটু সময় লাগে। কিন্তু ততক্ষণে আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় কানে এয়ারপ্লাগ লাগিয়ে সমুদ্রের একেবারে তলায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম কিছুক্ষণ চলে। পুরোটা সময় কিচ্ছু শোনা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু কানের না। পুরো একটা কী যেন ব্যাপার। কিছু শুনতে না-পারা পুরো ব্যাপারটার জাস্ট একটা পার্ট।'

'তোর খারাপ লাগে তখন?'

সে তার মাথা নাড়ে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিশ্চিত মাথা নাড়ে—'না, কেন যেন ঠিক খারাপ লাগে না। অস্বস্তি লাগে ঠিকই। কিছু শুনতে পাই না।'

আমি দৃশ্যটি ভাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনো ছবি ভেসে ওঠে না।

"আচ্ছা তুমি জন ফোর্ডের 'ফোর্ট এপাচে' ছবিটা দেখেছ?"—খালাতো ভাই জিজ্ঞাসা করে।

'অনেকদিন আগে'—আমি বলি।

কিছুদিন আগে টিভিতে দেখাল, খুব ভালো ছবি।

'হ্যাঁ তা ঠিক'—আমি বলি।

ছবির শুরুতে ফোর্টে একজন নতুন কর্নেল আসে ওয়েস্ট থেকে। ভেটেরেন ক্যাপ্টেন দেখা করতে যায় তার সঙ্গে। ক্যাপ্টেনের রোলে অভিনয় করে জন ওয়েন। ঐ কর্নেল ওয়েস্টের ব্যাপারস্যাপার তেমন জানে না। ফোর্টের চারপাশে তখন রেড ইন্ডিয়ানদের বিদ্রোহ চলছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খালাতো ভাই পকেট থেকে পাট করে ভাঁজ করা একটা রুমাল বের করে মুখ মোছে।

কর্নেল জন ওয়েনের দিকে তাকিয়ে বলে—'আসার পথে ঐদিকে বেশ কিছু ইন্ডিয়ান দেখলাম।' জন ওয়েন তার দিকে তাকায়, ঠাণ্ডা মুখে বলে—'চিন্তা করবেন না, আপনি যদি কিছু ইন্ডিয়ান দেখে থাকেন তার মানে হচ্ছে ওরা সেখানে নেই।' আমার এক্‌জাক্ট সংলাপটা মনে নেই কিন্তু এধরনের কিছু একটা সে বলে। 'তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ সে কী বোঝাতে চাচ্ছে?'

ফোর্ট এপাচের এমন কোনো সংলাপ আমার মনে পড়ে না। জন ওয়েনের ছবির সংলাপ হিসেবে এটি একটু বেখাপ্পা। ছবিটি অনেকদিন আগে দেখেছি।

'আমার মনে হয় এর মধ্যদিয়ে সে বোঝাতে চাচ্ছে যা সবাই দেখতে পায় সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'—আমি বলি।

খালাতো ভাই বলে—'আমিও কথাটা ঠিক পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি না। তবে কেউ যখন আমার কান নিয়ে সহানুভূতি দেখাতে আসে আমার ঐ কথাগুলো মনে পড়ে'—'আপনি যদি কিছু ইন্ডিয়ান দেখে থাকেন তার মানে হচ্ছে ওরা সেখানে নেই।'

আমি হাসি।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

'ঠিকই বলেছিস'—আমি হাসি। সেও হাসে। আমি বহুদিন পর ওকে এমন হাসতে দেখলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর নিজেকে যেন ভারমুক্ত করছে এমন ভঙ্গিতে খালাতো ভাই আমাকে বলে—'আচ্ছা তুমি আমার কানের ভেতরটা একটু দেখবে?'

'তোর কানের ভেতর দেখব আমি!'—অবাক হয়ে বলি আমি।

'না, এমনি জাস্ট বাইরে থেকে যা দেখতে পাও।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কেন দেখতে বলছিস বল্ তো?'

'জানি না। আমি চাই তুমি একটু দ্যাখো ওটা দেখতে কেমন?'

'অলরাইট, দেখি তো'—আমি বলি।

খালাতো ভাই আমার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডান কানটা আমার দিকে একটু উঁচু করে ধরে বসে। সুন্দর শেপের একটা কান আছে ওর। আকারে একটু ছোট কিন্তু এয়ারলোবগুলো ফোলা ফোলা, যেন কেবলই বেক করা ম্যাডেলেইন। এত মনোযোগ দিয়ে কারো কান আমি আগে কখনো দেখিনি। মানুষের কান মনোযোগের সাথে দেখলে

দুনিয়ার পাঠক

~ www.amarboi.com ~

এর আকার আকৃতি বেশ রহস্যময় মনে হয়। কেমন অদ্ভুত সব ঘোরানো, পেঁচানো, উঁচু, নিচু। হয়তো বিবর্তনের মধ্যদিয়ে কানের এমন অদ্ভুত একটা আকার হয়েছে যাতে সবচেয়ে ভালোভাবে শব্দ সংগ্রহ করা যায় বা কানের ভেতরটাকে রক্ষা করা যায়। এবড়োথেবড়ো দেয়ালঘেরা কানের ঐ ছিদ্র যেন একটা অন্ধকার, রহস্যময় গুহায় ঢোকার পথ।

আমার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডটিকে কল্পনা করি আমি, তার কানের ভেতর আণুবীক্ষণিক মাছি। তাদের ছোট্ট পায়ে লেগে আছে মিষ্টি পরাগ, তারা তার শরীরের অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে, ঢুকে গিয়ে শুষে নিচ্ছে ভেতরের রস, তার মস্তিষ্কে ছোট ছোট ডিম পাড়ছে। কিন্তু তাদের দেখা যায় না, তাদের পাখার শব্দ শোনা যায় না।

'ব্যস্ হয়েছে'—আমার খালাতো ভাই বলে। সে বেঞ্চ ঘুরে সামনের দিকে মুখ করে বসে। 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে?'

'না, অস্বাভাবিক তো কিছু দেখলাম না, অন্তত বাইরে থেকে।'

'কিছুই অন্যরকম মনে হলো না?'

'না, তোর কান তো একেবারে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

আমার খালাতো ভাইকে শান্ত মনে হলো। আমি মনে হয় ঠিক কথাটা বললাম না।

'এবারের ট্রিটমেন্টে কি ব্যথা লাগল?'

'না, ঐ একই ব্যাপার। একই জায়গায় ওরা খোঁচাখুঁচি করল। মনে হচ্ছিল কানটা বোধহয় ওরা ছিঁড়েই ফেলবে। মাঝে মাঝে মনে হয় এটা বোধহয় আমার নিজের কান না।'

***

'ঐতো আটাশ নাম্বার, ঐটা আমাদের বাস না?'—জিজ্ঞাসা করে আমার খালাতো ভাই।

আমি ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম। খালাতো ভাইয়ের কথায় আমি তাকিয়ে দেখি বাসটি গোলচক্কর ঘুরে ঢালু দিয়ে নেমে আস্তে থামছে। আমরা যে বাসটিতে এসেছি এটি তেমন নতুন ব্রান্ডের নয় বরং পুরনো ধাঁচের, যে বাসগুলোতে একসময় আমি চড়তাম। ২৮ নাম্বার লেখা একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে বাসটির সামনে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। একটি খরস্রোতের মধ্যে যেন আটকে গেছি আমি। আমার পা নড়ছে না।

বহুদিন আগের সেই সামারে [illegible] যাওয়ার সময় [illegible] চকোলেটের বাক্সটি নিয়ে গিয়েছিলাম [illegible] পাড়ে। [illegible] উৎফুল্ল [illegible] প্যাকেটটি খুলেছিল মেয়েটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং দেখতে পেয়েছিল চকোলেটগুলো সব গলে একটির সঙ্গে আরেকটি লেগে, প্যাকেটের গায়ে মাখামাখি হয়ে গেছে। হাসপাতালে আসার সময় আমি আর আমার বন্ধুটি সমুদ্রের পাড়ে মটরসাইকেলটি দাঁড় করিয়ে সৈকতে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি আর আড্ডা দিয়েছিলাম। পুরো সময়টি আমরা ঐ চকোলেটের বাক্সটিকে ফেলে রেখেছিলাম আগস্টের ঐ খাড়া সুর্যের নিচে। আমাদের অসাবধানতা, আমাদের স্বার্থপরতা ঐ চকোলেটগুলোকে একটি মণ্ড বানিয়ে ফেলেছিল। আমাদের বোঝা উচিত ছিল আগেই। আমাদের দুজনের একজনের অন্তত টের পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেদিনের বিকেলে আমরা কিছুই টের পাইনি, আমরা শুধু বোকা বোকা কতগুলো ইয়ার্কি করেছি এবং একে অন্যকে বিদায় জানিয়েছি। এবং ঐ পাহাড়টিকে অন্ধ উইলো গাছে ভরে উঠতে দিয়েছি।

খালাতো ভাই আমার ডান হাতটি শক্ত করে ধরে।

'কী হয়েছে তোমার?'—জিজ্ঞাসা করে সে।

তার কথায় সম্বিত ফিরে আসে আমার। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াই।

এবার আমার দাঁড়াতে কোনো সমস্যা হয় না। আমি আরেকবার আমার গায়ে মে মাসের মিষ্টি বাতাসের স্পর্শ পাই। কয়েক মুহূর্ত আমি ঐ অদ্ভুত, অস্পষ্ট জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম বস্তুত তার কোনোকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সেখানে বরং অস্তিত্ব ছিল অদৃশ্যের। শেষে আমার সামনে এসে হাজির হয় বাস্তবিক বাস নাম্বার ২৮ এবং খুলে দাঁড়ায় তার বাস্তবিক দরজা। আমি যেন ভিন্ন এক জগতে ঢুকে পড়ি।

আমি আমার খালাতো ভাইয়ের কাঁধের উপর হাত রেখে বলি—'আমার কিছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন

▼

হারুকি মুরাকামি

খাঁচায় চারটি ক্যাঙ্গারু—একটি পুরুষ, দুটি স্ত্রী এবং একটি বাচ্চা ক্যাঙ্গারু। আমি আর আমার বান্ধবী দাঁড়িয়ে আছি খাঁচার সামনে। শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে এটি তেমন কোনো চালু চিড়িয়াখানা নয়। তাছাড়া এই সোমবার সকালবেলা, সত্যি বলতে দর্শকের চেয়ে জন্তুজানোয়ারের সংখ্যাই বেশি।

চিড়িয়াখানায় যাওয়ার মূল কারণ একটিই, ঐ বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটিকে দেখা। নইলে চিড়িয়াখানায় আর কে যায়? গত মাসে স্থানীয় এক খবরের কাগজে ঘোষণাটি চোখে পড়ে আমাদের। চিড়িয়াখানার ক্যাঙ্গারুটি বাচ্চা দিয়েছে। সেই থেকে আমরা একটি চমৎকার সকালের জন্য অপেক্ষা করছি যেদিন ঐ ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটিকে দেখতে যাব। কিন্তু সেই চমৎকার দিনটি আর কোনোভাবেই আসে না। একদিন ঝমঝম বৃষ্টি, তারপর দিন আরো জোরে বৃষ্টি। এর পরদিন যথারীতি রাস্তা একেবারে কাদায় মাখামাখি। পরের দুদিন টানা দমকা হাওয়া। একদিন সকালে আমার বান্ধবীর দাঁতে ভীষণ ব্যথা। আরেকদিন আমাকে সিটি হলে যেতে হলো কী এক কাজে। আমি কোনো বিশেষ বাণী দেবার চেষ্টা করছি না, শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, জীবন এরকমই। এভাবেই আমাদের কাছ থেকে একটি মাস হাত ফসকে বেরিয়ে যায়।

একটি মাস কেমন করে যেন চলে গেল। সারা মাস জুড়ে ঠিক কী যে করলাম ভালোমতো মনেও করতে পারি না। কখনো মনে হয় বেশ অনেক কিছুই বোধহয় করেছি, আবার মনে হয়, কই কিছুই তো করলাম না। মাস শেষে পেপারের লোকটি

~ www.amarboi.com ~

যেদিন বিল নিতে এল সেদিন হঠাৎ মনে হলো, 'যাহ্, একটা পুরো মাস চলে গেল!' শেষমেষ কথা ঐ একটাই, জীবন এরকমই।

যাহোক, ঐ ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা দেখতে যাবার দিন শেষপর্যন্ত অবশ্য আমাদের জীবনে এল। সেদিন ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠেছি। জানালার পর্দা সরিয়ে মনে হলো, হ্যাঁ, আজকেই হচ্ছে ক্যাঙ্গারু দেখার শ্রেষ্ঠ দিন। মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে নিলাম, বিড়ালটাকে খাওয়ালাম, রোদ ঢাকতে মাথায় ক্যাপ পরে রওনা দিলাম চিড়িয়াখানার দিকে।

'আচ্ছা, কাঙ্গারুর বাচ্চাটা কি এখনও বেঁচে আছে?'—জিজ্ঞাসা করে আমার বান্ধবী।

'ঠিকই বেঁচে আছে, মরে গেলে পত্রিকায় লিখত নিশ্চয়!'—আমি বলি।

'না মরলেও হয়তো ওটা অসুস্থ হয়ে গেছে, ওকে হয়তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে'—বান্ধবী বলে।

'না, না, ওরকম কিছু হলেও পেপারে লিখত।'

'কিম্বা ধরো এমনও তো হতে পারে যে ওটা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার মানসিক অসুস্থতা? তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি?'

'না, না, বাচ্চার কথা বলছি না, বাচ্চার মা'টার কথা বলছি। কে জানে হয়তো মা'টা কোনো মানসিক আঘাতে ভুগছে। হয়তো মা আর বাচ্চাকে কোনো অন্ধকার ঘরে রেখে দেয়া হয়েছে।'

'মাই গুডনেস, মেয়েদের মাথায় যে কতরকম চিন্তা ঘুরতে পারে'—আমি ভাবি। বলি—'কী বলতে চাও? ক্যাঙ্গারুর আবার কী ধরনের মানসিক আঘাত?'

আমার বান্ধবী বলে—'শোনো, আসলে আজকে যদি ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটাকে দেখতে না পারি তাহলে মনে হয় আর কোনোদিন দেখার সুযোগ পাব না।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ।'

'আচ্ছা তুমি আগে কখনো ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা দেখেছ?'

'না, আমি দেখিনি।'

'তোমার কি সত্যি মনে হয় আর কোনোদিন দেখার সুযোগ পাব না?'

'কী করে বলব?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমার না কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।'

'কিন্তু শোনো, আমি তো জিরাফের বাচ্চাও দেখিনি, তিমি মাছও দেখিনি, তো এক ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা নিয়ে এত মাথা খারাপ করার কী আছে?'—আমি বলি।

'কারণ ওটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, বুঝেছেন?'—বলে আমার বান্ধবী।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকি। মেয়েদের সাথে আমি তর্কে পারিনি কোনোদিন।

যা ভেবেছিলাম, ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটি যথারীতি বেঁচে আছে এবং বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। তবে ওটাকে (এটি ছেলে না মেয়ে?) পত্রিকার ছবিতে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে বেশ বড় দেখা যাচ্ছে। সে খাঁচার চারিদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার চেয়ে বরং মনে হচ্ছে একটি মিনি ক্যাঙ্গারু। আমার বান্ধবী রীতিমতো হতাশ।

'এই দেখো, এটা তো আর বাচ্চা নাই, কেমন বড় হয়ে গেছে'—বলে আমার বান্ধবী।

'না, না, এখনও কেমন পিচ্চি দেখতে পাচ্ছ না?'—আমি তাকে চাঙা করার জন্য বলি। তার কোমরে হাত রাখি, মৃদু চাপ দিই। সে তার মাথা নাড়ে। তাকে কী করে খুশি করা যায় ভাবতে থাকি ।

তবে যতরকম চেষ্টাই করি না কেন, এ তো একেবারে জলজ্যান্ত সত্য যে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটি আসলে বড় হয়ে গেছে। সুতরাং আমি চুপ মেরে থাকি। আমি স্ন্যাকবারে গিয়ে দুটো কোনো আইসক্রিম কিনে আনি। আমার বান্ধবী তখনও খাঁচার গরাদগুলোতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ক্যাঙ্গারুগুলোর দিকে।

'ঐটা কিন্তু আর বাচ্চা নাই'—বান্ধবী আবার বলে।

'তাই!'—একটি আইসক্রিম তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলি।

'ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা তো মা'র থলির ভিতর থাকে, তাই না?'

আমি মাথা নেড়ে আইসক্রিমে কামড় দেই।

'কিন্তু ওটা তো মা'র থলির ভেতর নাই, ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

কোন্ ক্যাঙ্গারুটি বাচ্চাটির মা আমরা তা বুঝবার চেষ্টা করি। বাবাকে চিনতে সমস্যা হয় না। চারটি ক্যাঙ্গারুর মধ্যে গায়ে-গতরে সেই সবচেয়ে বড় এবং গম্ভীর। তাকে দেখতে লাগছে একজন মিউজিক কম্পোজারের মতো, যার এককালে প্রতিভা ছিল এখন আর নেই। সে স্থির দাঁড়িয়ে খাঁচার ভেতর তাদের খাবারের ট্রেতে দেয়া পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বাকি দুটো স্ত্রী ক্যাঙ্গারু। দুটোর আকার, রং, ভঙ্গি একই রকম। এর যে-কোনো একটি এ বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটির মা হতে পারে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এদের মধ্যে একটা বাচ্চাটার মা, অন্যটা না'—আমি বলি।

'হুম।'

'তাহলে কোন্‌টা এটার মা না বলো তো?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না।'

চারিদিকের কোনো তোয়াক্কা না করে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটি খাঁচা জুড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে অকারণে ময়লা হাতড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে তার (ওটা ছেলে না মেয়ে?) কাজের কোনো অভাব নেই। সে লাফিয়ে লাফিয়ে একবার তার বাবার কাছে যাচ্ছে, একবার এসে কয়েকটি পাতা চিবাচ্ছে, ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করছে কিছুক্ষণ, স্ত্রী ক্যাঙ্গারুগুলোকে বিরক্ত করছে, মাটিতে শুয়ে থাকছে তারপর উঠে আবার লাফাচ্ছে।

'আচ্ছা ক্যাঙ্গারুরা এত জোরে লাফায় কেন?'—আমার বান্ধবী জিজ্ঞাসা করে।

'শত্রুর কাছ থেকে পালানোর জন্য।'

'কোন্ শত্রু?'

'কেন মানুষ? মানুষেরা বুমেরাং দিয়ে এদের মারে আর ধরে ধরে খায়।'—আমি বলি।

'আচ্ছা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা মায়ের থলির ভেতর বসে থাকে কেন?'

'থলের ভেতর বসে থাকলে সেও মায়ের সাথে সাথে পালাতে পারে। বাচ্চা ক্যাঙ্গারুরা তো আর এত জোরে দৌড়াতে পারে না।'

'বাচ্চাগুলিকে মা'টা নিরাপদ রাখতে চায় তাই না?'—জিজ্ঞাসা করে আমার বান্ধবী।

'হ্যাঁ, বাচ্চাগুলিকে সেইফ রাখতে চায় ওরা'—আমি বলি।

'আচ্ছা কতদিন ধরে ওরা এভাবে বাচ্চাকে আগলে রাখে?'

আমি জানি এই চিড়িয়াখানা সফরের আগে এনসাইক্লোপেডিয়াতে ক্যাঙ্গারুর উপর লেখা চ্যাপ্টারটি আমার পড়ে আসা উচিত ছিল। জানতাম এধরনের হাজারটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে।

'তা এক মাস কি দু মাস হবে'—আমি বলি।

'কিন্তু ঐ বাচ্চাটার বয়স তো এক মাস, ওটা কেন মা'র থলির ভেতর থাকছে না?'—বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটির দিকে [illegible] আমার বান্ধবী।

'তাও তো ঠিক'—[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'থলির ভিতর থাকলে ওর জন্য কত ভালো হতো, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো।'

সূর্য ততক্ষণে উঠে গেছে মাথার উপর। কাছের কোনো একটা সুইমিং পুল থেকে বাচ্চাদের হৈ চৈ শব্দ আসছে। শরতের ধবধবে শাদা মেঘ উড়ে যায় আমাদের মাথার উপর দিয়ে।

'কিছু খাবে?'—জিজ্ঞাসা করি বান্ধবীকে।

'একটা হটডগ আর কোক'—সে বলে।

মিনি ভ্যানে হটডগ বিক্রি করছিল একটি ছেলে, কোনো ছাত্র হবে। সে যখন হটডগ বানাচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বুমবক্সে স্টিভ ওয়ান্ডার আর বিলি জোয়েলের গান শুনতে থাকি।

খাঁচার কাছে ফিরলে, আমার বান্ধবী উত্তেজিত হয়ে বলে—'দেখো দেখো। বাচ্চাটা থলির ভেতরে ঢুকে গেছে।'—সে একটি স্ত্রী ক্যাঙ্গারুর দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

আলবৎ দেখতে পাচ্ছি বাচ্চাটি তার মায়ের থলির ভেতর বসে আছে (ধারণা করছি ঐটাই ওর মা)। থলিটা পুরো ভরে আছে। একজোড়া ছোট্ট কান এবং লেজের ডগাটি একটু বের হয়ে আছে। অপূর্ব লাগছে দেখতে। এবং বলা যায় আমাদের সফরটি শেষ পর্যন্ত সফল হলো।

'আচ্ছা বাচ্চাটাকে থলির ভেতর নিয়ে মা'টার অনেক ভারী লাগছে না?'

'চিন্তা কোরো না, ক্যাঙ্গারুর অনেক শক্তি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তা না হলে এমনিতে এতগুলো বছর ওরা বেঁচে আছে?'

এই গরমের মধ্যেও মা ক্যাঙ্গারুটির তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সুপার মার্কেটে বিকালের শপিং সেরে কাছের কোনো কফিশপে বসেছে একটু বিশ্রাম নিতে।

'মা'টা বুঝি ওর বাচ্চাটাকে শত্রুর কাছ থেকে আগলে রাখছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে'—আমি বলি।

'আচ্ছা, বাচ্চাটা কি ঘুমাচ্ছে?'

'মনে হয়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা হটডগ আর কোক খাই। একসময় চলে আসি ক্যাঙ্গারুর খাঁচার কাছ থেকে।

আমরা যখন চলে আসছি বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটির বাবা, সেই প্রতিভালুপ্ত সুরকার তখনও খাবারের ট্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া সুর খুঁজছে। মা ক্যাঙ্গারু তার বাচ্চাটিকে নিয়ে একজোট। আর অপর রহস্যময় স্ত্রী ক্যাঙ্গারুটি খাঁচার ভেতর একাকী লাফাচ্ছে। যেন কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার মহড়া দিচ্ছে সে।

মনে হচ্ছে খুব গরম পড়বে আজকে। বহুদিন পর এমন গরম পড়ছে।

'চলো কোথাও গিয়ে একটু বিয়ার খাই'—বান্ধবী বলে।

'ঠিকই বলেছ, দারুণ হবে, চলো'—আমি বলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মূল গল্পের লেখক-পরিচিতি

মিলান কুন্ডেরা : চেক লেখক, জন্ম ১৯২৯। বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করেন। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'দি লাফেবল লাভস' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

ওরহান পামুক : তুরস্কের লেখক, জন্ম ১৯৫২। ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'আদার কালার: রাইটিংস অন আর্টস, বুকস অ্যান্ড সিটিস' বইটি থেকে নেয়া।

আবেলারদো কাস্তিলো আর্জেন্টিনার লেখক, জন্ম ১৯৩৫। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'দি আদার ডোর' বইটি থেকে নেয়া।

ওক্তাভিও পাজ : ম্যাক্সিকান লেখক, জন্ম ১৯১৪। ১৯৯০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'ঈগল অর সান' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

হারুকি মুরাকামি সাম্প্রতিক জাপানি সাহিত্যের আলোচিত লেখক, জন্ম ১৯৪৯। অনূদিত গল্পটি তাঁর গল্পসংগ্রহ 'ব্লাইন্ড উইলো, স্লিপিং ওম্যান' বইয়ের নাম-গল্প।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তরিত প্রবন্ধ

আড়চোখে আমেরিকা ১১৩
ভিনদেশি লেখকদের স্মৃতিতে আমেরিকা

নোবেল-বক্তৃতা ১৩৭
ভিস্লাভা শিমবোর্স্কা

নোবেল-বক্তৃতা ১৪৩
কেনজাবুরো ওয়ে

নয় এগারো ২০০১: আমেরিকার জন্য এক 'ডোজ' বাস্তবতা ১৫২
ডেরিক জেড জ্যাকসন

ইরাক আক্রমণ ২০০৩ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব বুশ ১৫৫
পাওলো কোয়েলহো

আক্রান্ত ইরাক আমাদের তেল ওদের বালুর নিচে কেন? ১৫৮
এদোয়ার্দো গালিয়ানো

ডায়েরি ১৬২
আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি

কলম্বাস অন্য চোখে ১৮৪
হাওয়ার্ড জিন

রাশিয়া ১৯২৭ ২০৪
কাজান জাকিস

যৌথ অবচেতনা ২২৮
কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখক-সমাজ সম্পর্ক ২৩৬
চিনুয়া আচেবে

চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ২৪৭
আর্নস্ট লিন্ডগ্রেন

সংগীতে সমাজচেতনা ২৫৯
আর্নস্ট ফিশার

শিল্পসাহিত্য এবং পুঁজিবাদ ২৭০
আর্নস্ট ফিশার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আড়চোখে আমেরিকা ভিনদেশি লেখকদের স্মৃতিতে আমেরিকা

একটা সময় ছিল যখন এদেশের মানুষের কাছে বিদেশ বলতে ছিল বিলাত, ইংল্যান্ড। স্বাধীনতার পর হঠাৎ আবিষ্কৃত হলো মধ্যপ্রাচ্য। এখন তো বিদেশ বলতে লোকের চোখ গিয়ে পড়ে কেবল আমেরিকায়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে আমেরিকাকে ঘিরে আছে আকর্ষণ, বিদ্বেষ, ক্রোধমেশানো এক মিশ্র অনুভব। লন্ডন থেকে প্রকাশিত, মর্যাদাবান সাহিত্যপত্রিকা *গ্রান্টা*র সাম্প্রতিক বিশেষ সংখ্যায় (*গ্রান্টা*, ৭৭, বসন্ত, ২০০২) পৃথিবীর নানা দেশের চব্বিশজন লেখক আমেরিকা নিয়ে তাঁদের টুকরো অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। সংবেদনশীল লেখকরা তুলে ধরেছেন আমেরিকার এক ভিন্ন পরিচয়। ভিনদেশি লেখকদের চোখে দেখা যাক কৌতূহলোদ্দীপক কিঞ্চিৎ আমেরিকা।

হানান আল-শাইখ, লেবানন

যদিও এবার আমিই এসেছি আমেরিকায় বেড়াতে, কিন্তু আমার ছোটবেলার সে দিনটির কথা বেশ মনে আছে যেদিন আমেরিকা এসেছিল আমাদের পাড়ায়, আমাদের বাড়িতে। সবাই উবু হয়ে দেখছিল আমেরিকাকে, স্পর্শ করতে চাইছিল। আমি ভিড় ঠেলে দাঁড়িয়েছিলাম আমেরিকার মুখোমুখি—লাল কাপড়ের কুশনের ওপর একটা নারীমূর্তি মাথায় মুকুট, হাতে উঁচু করে ধরা মশাল, কুশনের সঙ্গে উঁচু উঁচু দালানের ছবিঅলা একটা শুভেচ্ছা-কার্ডও ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার এক খালাতো ভাই আমেরিকা গিয়েছিল অ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, সে ওই আমেরিকাটিকে পাঠিয়েছিল আমাদের বাড়ি। চার বছর পর সে যখন বাড়ি ফিরল, তার সম্মানে ভেড়া জবাই দেওয়া হলো। সে তখন রাতারাতি খ্যাতিমান। সবার চোখ তখন আমাদের বাড়ির দিকে। আমরা সবাইও তখন রীতিমতো যেন বিখ্যাত।

বহু বছর পর আমি আমেরিকা এসেছি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে, অসংখ্য তালগাছঘেরা এই অঙ্গরাজ্য। এখানে আসবার পর থেকে আমার মা কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর অবাক হচ্ছেন এখানকার সূর্যটা এমন বেহায়া কেন? বুকের খুব গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আমার মা, যেন তিনি আশা করছেন এই দীর্ঘশ্বাসের জোরেই আমার বোন আর তার তিন ছেলেমেয়ের একটা থাকবার জায়গা জুটে যাবে। একদিন পরই তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। বৈরুতের ওপর এত যে যুদ্ধ হয়ে গেল, আমার মা কিন্তু কখনো ঘরছাড়া হননি। আমাদের তো জন্ম হয় পিঠে বাড়ি নিয়ে, ওই কাছিমের মতো। আমার মা বলেন।

আমার ভাগনা-ভাগনিরা তাদের জিনিসপত্র সব জড়ো করতে থাকে। কিন্তু ওই পোস্টারগুলোর কী হবে? আর ওই দেয়ালের? যেটি প্রতিধ্বনি তুলেছে ওদের গানের, ওদের হৈচৈয়ের। আমার বোন বাড়িময় ঘুরে কাপড় আর বইপত্রের গাঁটরি বাঁধছে। যেন ফসল কাটার মৌসুমে গমক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে গমের আঁটি বাঁধছে সে, যে ক্ষেতে আবার গজিয়ে উঠবে নতুন চারা। মালপত্রের ফাঁকে আমার একটা পুরনো বেল্ট দেখতে পেলাম। বেল্টটা দেখে আমার বৈরুতের মধুর দিনগুলোর কথা মনে পড়া উচিত ছিল কিন্তু আমার বরং বেল্টটার জন্য মায়া হলো, কারণ ও বেচারারও এখন আর কোনো বাড়ি নেই।

আমার বোন কিছু পুরনো মলিন কাগজপত্র বাইরে ফেলে দিতে নিলে ভাগনে-ভাগনিরা চেঁচিয়ে ওঠে। কাগজপত্রগুলো নাকি ওরা সঙ্গে নেবার জন্য আলাদা করে রেখেছে। ওদের চেঁচামেচিতে আমার মা অসুস্থ বোধ করেন, আমার বোন বলে আর একবার চেঁচালে ও পুলিশ ডাকবে। পুলিশের নাম উচ্চারণ করতেই সবার মনে পড়ে গেল, প্রতিবেশীদের অভিযোগের কারণে আগামী পরশু ওই পুলিশই আসবে ওদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে। বলে রাখা ভালো যে এবারই প্রথম নয়। র‍্যাপ সংগীত না শুনলে আমার বোনের ছেলেমেয়েদের বিশ্রাম হয় না। ওই ধুন্ধুমার সংগীত ওদের মনে প্রশান্তি আনে। ওরা আবার প্রতিভাবান সব শিল্পী বটে। নিজেরা গান শেখে, সুর দেয়, গায়। এ পাড়া না হয়ে অন্য কোনো পাড়া হলে হয়তো ওদের গান শ্রোতাদের আত্মার খোরাক হতো।

আমার বোন প্রায়ই ভাগনে-ভাগনিদের ছবি পাঠাত বৈরুতে। ওরা মার্কিন নাগরিক, যদিও অবশ্য চোখগুলো আরব। যদি জিজ্ঞাসা করেন, আরব চোখ দেখতে কেমন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলতে পারব না। সম্ভবত ওই চোখে একটা কমন সতর্কতার ভাব যাকে, আর থাকে খানিকটা দুষ্টুমি। আমি হাসতাম আর মনে মনে কল্পনা করতাম, লাঞ্চবক্স আর বেসবল ব্যাট কাঁধে নিয়ে পপকর্ন চিবাতে চিবাতে ওরা কুয়াশায় লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। ভাবতাম, বাড়িতে ওদের ঘরটা নিশ্চয়ই খেলনার দোকানের মতো, যে ঘর বছরখানেক পর দেখাবে গুহার মতো, যেখানে ওরা বাড়ি ফিরে মাথা গুঁজবে বয়ঃসন্ধির স্বপ্ন আর মুখের ব্রন নিয়ে।

বাস্তবে অবশ্য এসে দেখতে পাচ্ছি ওদের চোখগুলো কেমন যেন বোকাটে, যদিও তাতে একটা বিদ্রোহের ভাবও আছে। আর ঘরগুলো যেন গাড়ির গ্যারেজ কিংবা শরণার্থী শিবির। শরীর সেখানে বিশ্রাম নিতে পারে বটে, কিন্তু মন?

ঘড়ি টিকটিক করে। আমার মা ঘরের এককোণে একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা তার সাতটা বিশাল সুটকেসের চূড়ায় উঠে ওগুলোকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। যেন উনি ওগুলোর অস্তিত্ব ভুলে থাকতে চাইছেন। আমার মা আপসোসও করছেন, কেন তিনি শুধু শুধু এতসব উপহার কিনে সুটকেসগুলো ভরতে গেলেন। তিনি উপহার কিনেছেন তার প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন, এমনকি বৈরুতের পাড়ার রুটির দোকানদারটির জন্যও। তারা সবাই আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। এমনকি ম্যাকডোনাল্ড দোকানের একটা টিনের অ্যাশট্রে হলেও চলবে। সবার আমেরিকান একটা কিছু চাই। যেমন, 'নন-ডিসপজিবল ন্যাপি', যেন এছাড়া মলদ্বার তার নিয়মিত কাজটি করবে না। কিংবা বিছানার চাদর, ওষুধ, বাচ্চার খেলনা, নখপলিশ, নাইটি, নানা সাইজের জুতা। আমি কল্পনা করি, আমার মা বৈরুতে তার বাড়ির বসবার ঘরের মেঝেতে সব জিনিস ছড়িয়ে দিয়ে বলছেন, 'দ্যাখো, প'রে দ্যাখো। যার যেটা লাগে নিয়ে নাও।' আমার মা মাথায় হাত দিয়ে বসেন, যেন মাথা খুঁড়ে আমেরিকায় জানাশোনা কারো নাম খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। মানুষ এখানে রেশমপোকার মতো যার যার গুটির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে। মা ভাবছেন, আমেরিকা এত ফাঁকা কেন? মানুষজন সব কোথায় উধাও হলো? 'আমি তোর বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' বোনের কাছে অনুরোধ করেন আমার মা। মা বলেন, 'ওই লোকটাও তো মানুষ। তুই লোকটাকে হাতজোড় করে অনুরোধ কর্, সে যেন তোর ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে অন্তত তোকে এখানে থাকতে দেয়। আমরা ওকে বলব কী করে আমেরিকার মাটিতে পা ফেলার পর থেকেই তোর স্বামীর চোখ পড়ে থাকত এখানকার মেয়েদের বড় বড় বুক, সোনালি চুল আর এদেশের মদের দিকে। আরো বলব কী করে ওরকম একটা মেয়ের পিছু নিয়ে তোকে ছেড়ে চলে গেছে তোর স্বামী। সুতরাং বলব যে, তোর একার পক্ষে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করা কঠিন। আমরা বাড়িঅলার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, বাচ্চারা কেউ কখনো গান-বাজনা করবে না।

~ www.amarboi.com ~

এটা না স্বাধীনতার দেশ? স্বাধীনতা তো বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সবখানেই ছড়িয়ে থাকা উচিত, যেমন সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকে রক্ত।'

রক্ত আর স্বাধীনতার উপমা মেলাতে পেরে আমার মা নিজেই বেশ খুশি এবং ওই এক কথাই তিনি বারবার বলতে থাকেন, যতক্ষণ না আমার বোন তাকে ধমক দিয়ে থামায়। নতুন একটা ফ্ল্যাট খুঁজতে আমার বোন চারদিকে ফোন করতে থাকে। পাওয়া যায় না। বাড়িভাড়ার কোম্পানিগুলোর কাছে আমার বোন বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। বিড়াল যেমন তার বাচ্চাগুলো নিয়ে কেবল জায়গা বদল করে আমার বোনও তাই। বহুক্ষণ চেষ্টা করবার পর আমার বোন ধপ করে ফোনের রিসিভারটা রেখে দেয়। 'জামানত, সবাই শুধু জামানত চায়। জামানত আমি কোথায় পাব?' আমার বোন বলে।

আমার বোন কল্পনা করত সে বিমান থেকে নামছে আর তাকে বিমানবন্দরে উষ্ণ হাসিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগতম জানানো হচ্ছে এই আদর্শ দেশটিতে। আমেরিকা তো সে জেনে এসেছে সীমাহীন স্বপ্নের দেশ। যে দেশের তুলনা নেই আর একটাও। যেখানে কোনো সেকেলে আইন নেই। যে দেশের সংবিধানের ভিত্তি হচ্ছে সমতা আর ন্যায়বিচার। কিন্তু জামানতবিহীন বোন আমার জালে আটকে পড়া মাছের মতো এখন তড়পাচ্ছে। ঋণ সে নিতে পারে। কিন্তু একবার শুরু করলে ঋণ চারদিক থেকে তার ওপর ঝরতে থাকবে বৃষ্টির মতো।

আমার বোন টের পায় তার হাত বাঁধা। নানা আমলাতান্ত্রিকতা তার রক্তের ভেতর কী এক বিষ যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওর প্রাণশক্তি ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে। অভিবাসী হলে তোমার পকেটে ক্যাশ টাকা থাকতে হবে, নইলে নির্ঘাত তুমি মারা পড়বে। ভেনাস যেমন সাগর থেকে উঠে এসেছিল নগ্ন, দীর্ঘ আলুলায়িত কেশ ছাড়া আর কোনো ঐশ্বর্য ছিল না তার, তেমনি আমার বোন এই স্বপ্নের দেশে এসেছিল ঝাড়া হাত-পায়ে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে একজন স্থানীয় নাগরিকের রেফারেন্স লাগে, আমার বোনের তা ছিল না, কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। ছিল না কোনো সম্পদ, সম্মান, প্রভাব—যা দিয়ে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে পারে, গাড়ি কিনতে পারে, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে।

যেকোনো মূল্যে একটা চাকরি পাওয়া ছিল তার জন্য অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু তাও ছিল অসম্ভব। চাকরি খোঁজা ছিল যুদ্ধের ময়দানে নামার মতো। এই নতুন পরিবেশ, নতুন জীবনযাপন, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য খানিকটা সময় প্রয়োজন ছিল তার। কিন্তু সেসময় কে তাকে দেবে? নিরাপত্তাহীনতায় কেটে গেল তার দিন, আত্মবিশ্বাস কমতে লাগল। একটার পর একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে গেল সে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখন আবার সেই পুরো ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে আমার এবং আমার মায়ের সামনে। খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত একটা কোম্পানি বাড়িভাড়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিল এবং জানাল যে তাদের বাড়িতে আসবে। কর্মকর্তা সশরীরে বাড়িতে চলে আসছেন জেনে আমি এবং আমার মা বেশ পুলকিত হলাম। কিন্তু আমার বোন বলল, এটা খারাপ লক্ষণ, 'আসলে আমি আদৌ কোনো উদ্বাস্তু ভবঘুরে কিনা সেটা যাচাই করতেই ও আসছে।

মহিলা কর্মকর্তা ঘরের মাঝখানে বসলেন, আর ল্যাপটপটি পাশে রেখে চারদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিলেন। আমার মা তাকে কফি সাধলেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আমার বোনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আদৌ কোনো চাকরি করে কি না। কারণ তার অফিসে ফোন করে তিনি কাউকে পাননি। আমার বোন বলে সে আজকে কাজে যায়নি। আমার মা বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'অসুস্থ।'

'আপনার মা যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, তার মানে উনিও কি আপনার সঙ্গে থাকবেন নাকি?'

আমার বোন জানায় যে মা বেড়াতে এসেছেন, চলে যাবেন আগামী সপ্তাহে।

'কিন্তু কে জানে, হয়তো এর মধ্যেই আপনার মা সিদ্ধান্ত বদলাবেন এবং আমেরিকায় থেকে যাবেন।'

'আমি? আমেরিকায় থাকব? তার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।' পাশ থেকে আমার মা বলেন। আমার মা কী বলতে চাইছেন ভদ্রমহিলা বুঝতে পারেন না। তিনি আমার বোনের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চান। আমার বোন খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে যে তার কোনো গাড়ি নেই এবং সে গাড়ি চালাতে জানে না।

'তাহলে আপনি অফিসে যান কী করে? আপনি তো বললেন আপনি একটা চাকরি করেন।' ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন।

'আমি বাসে যাই।'

'কী বললেন? বাসে যান? এদেশে তো একমাত্র বুড়োরা বাসে চড়ে।'

মহিলা যেন তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি আমার বোনের প্রায় শূন্য ঘরে চোখ বোলান। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা অল্পকিছু জিনিস আর আমার মার সাতটা সুটকেস। মহিলা আবার আমার বোনকে জিজ্ঞাসা করেন, যেন জেরা করছেন, 'এটা কি সম্ভব যে আপনার কোনো গাড়ি নেই? আপনি ওই কৌতুকটি শোনেননি যে পুলিশ এক লোককে জরিমানা করেছে, কারণ সে আমেরিকার রাস্তায় হাঁটছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কৌতুকের কথা বললেও মহিলা নিজে হাসেন না। মহিলা আমার বোন যে অফিসে কাজ করে তাদের নামধাম জানতে চান। আমার বোন লজ্জায় ডালিমের মতো লাল হয়ে ওঠে। মহিলা আগে দু মাসের অগ্রিম নিয়ে বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু এখন চার মাসের অগ্রিম চাইলেন।

ভদ্রমহিলা চলে গেলে আমার মা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'আহা! বৈরুতের ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি তোর আর তোর বাচ্চাদের অবস্থা জানত! কেন যে আমি তোর এখানে বেড়াতে এলাম। আমি জানতাম তুই চোরাবালিতে পড়েছিস। আর মাথা তুলে রাখতে পারবি না। একটু একটু করে শুধু ডুববি। হায়! ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি জানত আমেরিকায় কী হয়... অবশ্য ও বিশ্বাস করত না কোনোদিন।'

যে ট্যাক্সিতে করে বৈরুত এয়ারপোর্ট আসছিলাম তার ড্রাইভার যখন জানল আমাদের আমেরিকার ভিসা এবং ফিরতি টিকিট আছে তখন সে বিস্ময়ে, ঈর্ষায় মাথা নাড়াচ্ছিল।

আমার মা ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথাই বলছিলেন।

'মা, রিগানের সঙ্গে তোমার ওই ছবিটাক কোনো কাজে লাগানো যায় না?' ঠাট্টা করে বলি।

রিগানের এক পোস্টারের পাশে মার একটা ছবি আছে। ফটোগ্রাফটা এত নিখুঁত যে, বৈরুতের কিছু শাদাসিধে মানুষের ধারণা হয়েছিল রিগানের সঙ্গে মার বুঝি বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তারা মাকে অনুরোধ করেছিল রিগানকে বলে মা যেন ওদের ভিসার ব্যবস্থা করে দেয়।

আমরা ঘুমাই কিংবা বলা যায় চোখ বন্ধ করি যাতে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি।

আমার মা আর বোন এক বন্ধুর বাড়িতে ঘুমাতে যায়।

আমার ভাগনেরা বলে ওরা রাত কাটাবে সৈকতে। এমন ওরা আগেও কাটিয়েছে। আকাশে কেমন উজ্জ্বল তারা। ওদের গায়ে এসে পড়বে ভোরের শিশির। আমার ভাগনি ঘুমাবে ওর এক বন্ধুর গাড়িতে।

আমার মার বুকে আগুন জ্বলবে কিন্তু তা থাকবে বরফ-শীতল।

ঠিক যেন পাখির খাঁচা, এমন এক কানের দুলপরা সেই আমেরিকান বৃদ্ধার স্মৃতি আমি ভুলে যাব। বেলবেকে রোমানদের ধ্বংসাবশেষের সামনে হতবাক দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৃদ্ধাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, আহা আমার দাদিও যদি এমন দেশ-বিদেশ ঘুরতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারত! আমি প্রথম জিনস স্পর্শ করবার অনুভূতি ভুলে যাব। বাবা তার এক কাপড়ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে ওই জিনসের প্যান্ট ধার করে এনেছিলেন আমার জন্য।

আমরা জিনসকে বলতাম 'কাউবয়'। বাবাকে কথা দিয়েছিলাম শুধু স্কুলের পার্টিতে ওই প্যান্ট পরব।

শেষপর্যন্ত ওই প্যান্ট আমার পরা হয়নি। ঠিক সাহস হয়নি। আমি ওই জিনস ছুঁয়ে দেখেই সন্তুষ্ট ছিলাম। ওই জিনসের প্যান্ট যেন আমার নাগালের বাইরে ছুটে চলা এক টুকরো আমেরিকা। পেছনে কারা যেন বলছে ছি ছি। ধাবমান জিনিসের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অমিত চৌধুরী, ভারত

ছোটবেলায় আমরা কাউবয় আর ইন্ডিয়ান সেজে খেলতাম। আমরা বরং কাউবয় হতেই বেশি পছন্দ করতাম। আমরা জেনেছিলাম, এ 'ইন্ডিয়ান' সে ইন্ডিয়ান নয়, এ হলো 'রেড ইন্ডিয়ান'। 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান' কথাটা তখনো চালু হয়নি। আমাদের কাছে তো নয়ই যারা সেই দক্ষিণ বোম্বের মালাবার হিলের পাশের এক বাড়ির গ্যারেজে কাউবয় সেজে খেলছি, আমরা জেনেছি আমাদের খুঁজতে গিয়েই কলম্বাস আলো ফেলেছিলেন আমেরিকার ওপর। দারুণ কাকতালীয় ব্যাপার। লোকে যদিও বিশেষ মনে রাখে না কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারে আমাদের ভারতের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়।

নানাভাবে, নানা জায়গায় বোম্বে যেন আমেরিকার প্রতিধ্বনি। ঠিক অনুকরণ নয় কিন্তু আমেরিকাকে পাওয়া যাবে বোম্বের রাস্তায়। অবশ্য এই আমেরিকার প্রতিধ্বনিই বোম্বেকে ভারতের অন্যান্য শহর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, একে দিয়েছে এক নিজস্ব বিষণ্ন গন্তব্য।

প্রথমেই ধরা যাক, বোম্বের উঁচু জাদুকরি দালানগুলোর কথা। দালানগুলো সব জড়ো হয়েছে নারিমান পয়েন্টে, যাকে বলা যেতে পারে বোম্বের 'ফাইন্যানসিয়াল ডিস্ট্রিক্ট'। ওখানেই আছে এয়ার ইন্ডিয়ার দালান (যাতে একবার বোমা বিস্ফোরণ হলো ১৯৯৩তে) আছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দালান, ওবেরয় টাওয়ার। পতিত জমি ভরাট করে গড়ে উঠেছে এ জায়গা।

আমার মনে আছে, নারিমান পয়েন্টে তখনো নেহাতই একটা পয়েন্ট, এক চিলতে জমি মিশে যাচ্ছে সমুদ্রে, পাথরে। অবশ্য দক্ষিণ বোম্বেতে আরো বিস্তর উঁচু দালান আছে। কোনো কোনো দালান তো খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মতোই বিখ্যাত, কোনো কোনোটি অবশ্য অতটা নিষ্কলঙ্ক নয়, যেমন বোম্বের অনেক তারকা। সত্তর দশকের শেষে কিংবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আশির দশকের গোড়ায় পোদ্দার রোডের পাহাড়ি ঢালের কাছে স্থপতি চার্লস কোরোর স্থাপত্যে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নামে এক দালান দেখা দিল।

বিশাল শাদাতে চারকোনা এক বাক্স, যার চারপাশে প্রকাণ্ড সব ফুটো, সে ফুটোর দেয়ালগুলো টকটকে লাল রঙে রাঙানো (ফুটোগুলো আসলে ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটের বারান্দা)। বহুদিন ওই দালানের সবগুলো ফ্ল্যাট ছিল খালি। যে জমির উপর দালানটা দাঁড়ানো তাতে নানা ঝামেলা ছিল। তা হোক, কিঞ্চিৎ বিরূপতা নিয়ে হলেও ওই দালান হয়ে উঠেছিল রীতিমতো তারকা। হয়ে উঠেছিল গুঁতোগুঁতি করে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচুনিচু, নতুন-পুরনো দালানে ঢাকা বোম্বের দিগন্তের অংশ।

রাতভর পার্টিমুখরিত বোম্বের দিগন্ত। বহু বছর পর ওই বারান্দাগুলোতে মানুষ দেখা গিয়েছিল। যদিও বোম্বের উঁচু দালানগুলোতে মানুষ দেখতে পাওয়াই আশ্চর্যের।

বোম্বেতে নিউইয়র্কে আভাসের চেয়ে খানিকটা বেশি কিছু আছে। ওই উঁচু দালানগুলো বাস্তবিকই 'উঁচুকপালে'। ওরা সব স্বাধীনতা-উত্তরকালের সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার দল। ওদের উচ্চতাই প্রমাণ করে ঔপনিবেশিককালের কেতাদুরস্ত ভদ্রতার চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অগ্রাধিকার।

আর এই যে অবারিত রোদ্দুর, সমুদ্র, তালগাছের সারি, এর মধ্যে খানিকটা ক্যালিফোর্নিয়ার ভাব। শরীরের সুখ, সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা শরীর এবং আরো ওই যে সব সমুদ্রসৈকত চৌপাত্তি, জহু, মার্ভে। গভর্নরের ব্যক্তিগত সৈকতের কথা নাইবা বললাম, যেখানে ক্যাথিড্রাল স্কুলের শিশুরা বছরে একবার বেড়াতে যায়। শিশুরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে আর বড়রা যাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতারক, ঠগ, তারা অর্ধনগ্ন হয়ে লাফঝাঁপ দেয়, যেন ফিরে গেছে দ্বিতীয় শৈশবে। এ দৃশ্য যেন বোম্বেরই প্রতিবিম্ব। শিশুসুলভতা আর বয়ঃপ্রাপ্তির মিশ্রণ, অর্বাচীনতার নৃশংসতার মিশ্রণ, যে মিশ্রণ আমি বেশ জানি যে অদ্ভুতভাবে আমেরিকানও বটে। শৈশবের কল্পনা আর প্রাপ্তবয়স্কের জ্ঞান, সারল্য আর বর্বরতা একই পরিসরে এমনকি একই শরীর আর মনে।

আমেরিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কমিক বইয়ের মাধ্যমে। আমার বাঙালি বাবা-মা স্কুলে যাওয়ার আগে আমাকে একটুও ইংরেজি শেখাননি। বাংলার বাইরে বোম্বেতে থাকতেন বলে তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি যেন বাংলাভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকি। আমি এক অক্ষরও ইংরেজি জানতাম না। তবু কী করে যে আমাকে বোম্বের স্কুলে ভর্তি করা হলো কে জানে।

ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য স্কুলের হেডমিস্ট্রেস আমার মাকে দ্বিমুখী পরিকল্পনা দিলেন; আমাকে লেডিবার্ড এবং কমিক—এই দুইরকম বই পড়তে দিতে বললেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেডিবার্ডের বইগুলোর মাধ্যমে আমার পরিচয় ঘটল ইংরেজ পরিবার আর তাদের পরিবেশের সঙ্গে।

ইংরেজি শেখার এই ধারাবাহিকতায় এল 'এনিড ব্লাইটন' যার বৃত্তাবদ্ধ পৃথিবীতে আছে অদ্ভুত সব নৃশংসতা আর আত্মম্ভরিতা, আরো আছে মাখন লাগানো কেক আর পিকনিকের ঝুড়ি।

এ জগৎ ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠ হলেও আমার কাছে মনে হতো দূরবর্তী।

বরং আমেরিকান কমিকগুলো কী করে যেন আমাদের বোম্বের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কোথায় কখন যে একটা শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হতো, টেরই পেতাম না।

লাইব্রেরির সবচেয়ে বেশি আঙুলের দাগ লাগা *আর্চি কমিক ডাইজেস্ট* ছিল রিভারডেল থেকে আমাদের পৃথক করার সরু রেখা। মাসে মাসে কেনা *গোল্ড কি* কমিকস, ভালো মানুষ ভূত আর ডাইনির দল 'রিচি রিচ', 'ফিডজেরালডীয়' কার্টুনচরিত্র যে কিনা সুইমিংপুল, চাকর, ড্রাইভার নিয়েও অসুখী। কিংবা আরো সব মহানায়কেরা, উঁচু উঁচু দালানে যারা চাকরি করে আর নীরস জীবন কাটায়, যারা সাধারণ হওয়ার জন্য আর ছদ্মবেশ ধরার জন্য স্রেফ চোখে একটা চশমা লাগায়, কিংবা যারা প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একাকী ধনকুবেরের মতো জীবন কাটায়, যে অট্টালিকার মাটির নিচের গ্যারেজে রাখা থাকে একটা মাত্র গাড়ি, কিংবা বিষণ্ন ইলাসটিকম্যানের মতো, যে কিনা জন্মগত পঙ্গুত্বকে পরিণত করে অপরাধ দমনের আশ্চর্য প্রতিভায়। কাফকার গ্রেগর সমস্যা যদি আমেরিকায় জন্ম নিত সে কি স্পাইডারম্যান বা ইনক্রেডিবল হাল্কের মতো বিখ্যাত হতে পারত?

বোম্বেতে আমাদের আমেরিকান শৈশব কাটছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়, যখন পৃথিবীর একটা অংশ ঢাকা ছিল ব্রেজনেভের প্রকাণ্ড ভুরুর শামিয়ানার তলে। আমরাও ছিলাম সে শামিয়ানার তলে। যদিও ভারত গণতান্ত্রিক দেশ তবু রাশিয়ার সঙ্গে তার ছিল একটা রাজনৈতিক কৌশলগত মিত্রতা। রাশিয়া আমাদের দিত নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঋজুতার ধারণা, পক্ষান্তরে আমেরিকা দিত একধরনের নিষিদ্ধ আনন্দ। সোভিয়েত আনন্দের মধ্যে ছিল সেইসব আশ্চর্য ফিল্ম। দুটো কারণে আমরা সোভিয়েত ফিল্ম দেখতে চাইতাম। প্রথমত, রুশ ছবি সিনেমার সচেতন নান্দনিক ধারার প্রতি ছিল অধিকতর অঙ্গীকারবদ্ধ হলিউডি ছবিতে যা ছিল অনুপস্থিত। দ্বিতীয় কারণটা অবশ্য উঁচুমানের কোনো ব্যাপার নয়। সোভিয়েতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্বের কারণে আমাদের জাতীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সোভিয়েত ফিল্মের প্রতি ছিল বাড়তি প্রশ্রয়। ফলে বাজে অনেক সোভিয়েত ফিল্মের নগ্নদৃশ্য তেমন কাটছাঁট হতো না। বরং হলউডি ছবিতে কাঁচি চালানোগুলো ছিল নেহাত আনাড়ি, অসম্মানজনকও বটে। একটা মেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়তো ব্লাউজের বোতাম খুলছে। তারপরই মনে হবে মেয়েটা যেন কিঞ্চিৎ খিঁচুনিতে ভুগছে। পরের দৃশ্যে দেখা যাবে মেয়েটা ব্লাউজের বোতাম লাগাচ্ছে। আমরা সত্তর দশকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই খিঁচুনিটিকে বোঝার চেষ্টা করতাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শালীনতার দেয়াল তুলে আমেরিকান ছবির নগ্নতাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল আমাদের কাছ থেকে। লৌহযবনিকার চেয়েও সে দেয়াল দুর্ভেদ্য।

মহানায়ক কিন্তু আবার ভিলেনও বটে। একটা প্রজন্মের কাছে হেনরি কিসিঞ্জার ভারতের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। ১৯৭৫ সালে সঞ্জয় গান্ধী অবশ্য কিসিঞ্জারকেও হার মানাত। তবে কিসিঞ্জারের ওই বুরোক্র্যাটিক স্যুট, মোটা চশমা আর ওই কড়া বাচনভঙ্গি ছিল ভারতীয়দের কাছে চরম বিরক্তিকর ব্যাপার এবং নিক্সন, যে কিসিঞ্জারের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশ যুদ্ধে পৌরোহিত্য করেছে এবং যথারীতি নিয়েছে ভুল পক্ষ, আমেরিকান সরকার যেমন সব সময় নিয়ে থাকে তবু বোম্বের ম্যারিন লাইনের ইউএসআইএস অফিসে আবেদনপত্র হাতে তরুণ-তরুণীদের ভিড়। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর সে লাইন, যারা সব শেষে পাড়ি জমায় আমেরিকায়। ছুটিতে ফিরে এসে তরুণেরা হাফপ্যান্ট পরে আর পরে গেঞ্জি, যাতে অচেনা সব আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। এমনকি ওদের বাবারাও হাফপ্যান্ট পরতে শুরু করে। গাড়ির পেছনের কাচে তারা সেসব অজানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার লাগিয়ে রাখে, বোম্বের ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অন্যদের সেসব নাম মুখস্থ করতে হয়। কী ওদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়? সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা আর সেখানে অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, যা ইউরোপ দিতে পারে না? ম্যানহাটানের ওই ভিড়ে মিশে যাওয়া (পুরোপুরি কি?) অথবা কোনো শহরতলিতে মাথা গোঁজা কিংবা এ দুয়ের মাঝামাঝি বিশাল প্রান্তরে কোথাও আস্তানা গাড়ার ক্ষমতা আর স্বপ্ন?

ওরহান পামুক, তুরস্ক

আমেরিকানদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শৈশবের সারল্যের আবহে। যদিও পরবর্তী সময়ে আমার ভেতর যে জটিল আকাঙ্ক্ষা আর ঈর্ষা দেখা দিয়েছিল তার আলামত ছিল তখনই।

১৯৬১ সালে বাবার চাকরিসূত্রে আমরা সবাই আঙ্কারা যাই। শহরের সবচেয়ে সুন্দর পার্কের উল্টোদিকে চমৎকার এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম আমরা। পার্কের ভিতরে ছিল একটা কৃত্রিম হ্রদ, যাতে সাঁতরে বেড়াত দুটি রাজহাঁস।

আমাদের ওপরতলার প্রতিবেশীদের নড়াচড়া আমরা বেশ টের পেতাম। ওরা ছিল আমেরিকান। ওদের নীল শ্যাভ্রোলেট গাড়িটা গ্যারেজে পার্ক করা থাকত। ওদের নিয়ে আমাদের বেশ কৌতূহল ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেরিকান সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের তখন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আঙ্কারার সিনেমাহলে রোববারে ম্যাটিনি শোতে শিশুদের জন্য টিকেট বিক্রি হতো ডিসকাউন্টে। হলভরা শিশুদের মাঝে বসে যে সিনেমাগুলো দেখতাম, সেগুলো আমেরিকা না ফ্রান্স থেকে এসেছে, তা নিয়ে আমরা ভাবতাম না। সাবটাইটেলসমেত ছবিগুলো কোনো পশ্চিম দেশ থেকে এসেছে, এটুকুই আমরা জানতাম শুধু।

আমরা কৌতূহলী ছিলাম আমেরিকান ওই লোকগুলোর ব্যাপারেই। আমাদের বাসার এলাকাটি ছিল তুলনামূলকভাবে নতুন এবং অভিজাত। অনেক আমেরিকান থাকত সেখানে। আমেরিকানরা যেসব জিনিস ব্যবহার করত কিংবা যেসব জিনিস রাস্তায় ফেলে দিত, সেগুলোর জন্যই ওদের বেশ মজাদার মনে হতো আমাদের। আমেরিকান সবচেয়ে মজার যে জিনিসটা আমরা আবর্জনা থেকে টেনে তুলতাম আর রেগেমেগে এক লাথিতে চ্যাপ্টা করে দিতাম সেটা হলো কোকাকোলার খালি ক্যান। ওই ধরনের কৌটাগুলোকে আমরা বলতাম 'কুকাস', তাতে অন্যান্য পানীয়র ক্যান আর বিয়ারের ক্যানও থাকত। যদিও আমরা ওই ক্যানগুলো দিয়ে নানারকম খেলা খেলতাম, সবচেয়ে বেশি খেলতাম 'কুকা লুকোচুরি'। যদিও ক্যানগুলো কেটে আমরা নানারকম চিহ্ন বানাতাম, ক্যানগুলোর আংটা দিয়ে নকল টাকা বানাতাম, তবুও আজ অবধি আমি কোক খাইনি, খাইনি অন্য কোনো ক্যানজাত পানীয়।

ওই নতুন অ্যাপার্টমেন্টগুলোর একটি বিশেষ বিল্ডিংয়ের প্রকাণ্ড ডাস্টবিনে আমরা ওই 'কুকাস' খুঁজতে যেতাম। ওই বিল্ডিংে এক আমেরিকান যুবতী থাকতেন যিনি তার রূপের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। একদিন চত্বরে আমাদের ফুটবল খেলার বিঘ্ন ঘটিয়ে সে যুবতীর স্বামী গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলেন। গাড়িটি ধীরে চালাতে চালাতে তিনি তার আঙুলের ডগায় চুমু খেয়ে সেটি ছুড়ে দিলেন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা তার সুন্দরী স্ত্রীর দিকে। এমন ভঙ্গি আমরা এর আগে কেবল সিনেমাতেই দেখেছি। আমরা সব নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা একে অন্যকে কতটা ভালোবাসে আমরা জানি না। কিন্তু আমরা কখনো বড়দের এভাবে অন্যদের সামনে নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দকে প্রকাশ করতে দেখিনি।

আমেরিকানরা যেসব জিনিস ব্যবহার করত, ওদের বন্ধু হলে সেসব জিনিস ওরা আবার দিয়েও দিত, সেসব জিনিস ওরা কিনত পি/এক্স নামের এক বিশাল দোকান থেকে। আমরা ওই দোকান কখনো দেখিনি কারণ তুর্কিদের জন্য ওই দোকান ছিল নিষিদ্ধ। আমরা ওই দোকানকে বলতাম 'পিয়েকস'। কতরকম জিনিস ওদের, নীল জিনস, চলতি আমেরিকান রেকর্ড, বিদঘুটে মিষ্টি আর নোনতা চকোলেট, রঙিন চুলের ক্লিপ, বাচ্চাদের খাবার, খেলনা আরো কত কী!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

-

আঙ্কারার অনেক দোকান চোরাপথে পিয়েকসর অনেক জিনিস এনে বিক্রি করত চড়া দামে। আমি আর আমার বড়ভাই মার্বেলের জন্য পাগল ছিলাম। পয়সা বাঁচিয়ে আমরা ওইসব দোকান থেকে আমেরিকান মার্বেল কিনতাম। ওইসব মার্বেল ছিল পোর্সেলিনের তৈরি। কাচের তৈরি আমাদের টার্কিস মার্বেলের পাশে ওই মার্বেলগুলোকে মনে হতো যেন হীরে জহরত।

আমাদের ওপরতলার প্রতিবেশী ছেলেটার এমন অনেকগুলো পোর্সেলিনের মার্বেল ছিল। ছেলেটি প্রতিদিন একটা কমলা রঙের স্কুলবাসে চড়ে স্কুলে যেত, যেমন বাস আমি পরে আমেরিকান সিনেমায় দেখেছি। ছেলেটি ছিল একাকী, কোনো বন্ধু ছিল না তার। ওর বয়স ছিল আমাদের মতো, চুল কাটা ছিল আমেরিকান কায়দায়। ছোট ছোট আর মাথার ওপর খাড়া খাড়া। ও নিশ্চয়ই অ্যাপার্টমেন্টের চত্বরে আমাদের মার্বেল খেলতে দেখেছে। ফলে সেও পিয়েকস থেকে কিনে এনেছিল অসংখ্য মার্বেল। মনে হয় কয়েক হাজার। একটা বড় ব্যাগ থেকে ছেলেটা মার্বেলগুলো মেঝের ওপর ফেলত। নিচের তলায় বসে আমি আর আমার বড়ভাই মন আনচান করে মেঝেতে শত শত ওই মার্বেল পড়ার শব্দ শুনতাম।

ছেলেটির অসংখ্য মার্বেলের গল্প অচিরেই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে দুতিনজন আমাদের বাড়ির পেছনে গিয়ে আমেরিকানদের জানালার নিচে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'এই ছেলে'। অনেকক্ষণ ডাকার পর ছেলেটি হঠাৎ বারান্দায় এসে বেশ রাগের ভঙ্গিতে একমুঠ মার্বেল নিচে ছুড়ে দেয়। মার্বেলগুলো নিয়ে সবার কাড়াকাড়ি। সে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখে এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন এক একাকী রাজা প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে মোহর। কোনো কোনো দিন সারা দিনে একবারও তাকে বারান্দায় দেখা যেত না। অচিরেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে রাজার বাস রাজাকে স্কুল থেকে ফিরিয়ে এনেছে এবং রাজার বাবা-মা রাজাকে একাকী বাড়িতে রেখে বেড়াতে গেছে। জনতা প্রাসাদের নিচে জড়ো হলে রাজা আবার দেখা দিতেন। এবার মুঠো করে নয়, এবার তিনি মার্বেল ছুড়ে দিতেন একটা একটা করে। কে সেটি ধরতে পারে এই নিয়ে ঠেলাঠেলি, মারামারি লেগে যেত আমার বন্ধুদের।

একদিন বিকেলে সে রাজা আমাদের বারান্দায় মার্বেল ছুড়ে ফেলতে লাগল। মার্বেলগুলো আমাদের বারান্দায় পড়ছিল, যেন শক্ত বৃষ্টির ফোঁটা। কোনো-কোনোটি বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। আমি আর আমার বড়ভাই বেশিক্ষণ আর স্থির থাকতে পারলাম না। বারান্দায় ছুটে গিয়ে মার্বেলগুলো কুড়াতে লাগলাম। মার্বেল পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল আমাদের হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি। 'ব্যাপার কী এখানে, ভেতরে যাও এক্ষুনি।' বারান্দায় এসে মা বলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিই এবং ভেতর থেকে বিষণ্ন হয়ে মার্বেলের বৃষ্টি দেখতে থাকি। বৃষ্টি ক্রমশ ধরে আসে এবং একসময় বন্ধ হয়ে যায়। রাজা টের পেয়েছে যে আমরা আর বারান্দায় যেতে পারছি না। সে তখন নিজের ঘরে গিয়ে মেঝেতে মার্বেলগুলো ফেলতে থাকে। ওই শব্দ আবার আমাদের উত্তেজিত করে তোলে। আশপাশে যখন আর কেউ নেই আমরা দুই ভাই লুকিয়ে বারান্দায় যাই এবং পড়ে থাকা মার্বেলগুলো কুড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই। পরদিন রাজা বারান্দায় এলে আমরা মায়ের কথামতো তাকে বলি, 'এই ছেলে বদলাবদলি করবে?' আমরা হাত উঁচু করে আমাদের কাচের মার্বেলগুলো দেখাই। পাঁচ মিনিট পর সে আমাদের দরজায় কলিং বেল টেপে। আমরা ওকে পাঁচটা কি ১০টা আমাদের টার্কিস কাচের মার্বেল দিই। ও আমাদের একমুঠো দামি আমেরিকান মার্বেল দেয়। আমাদের বাণিজ্য চলে নিঃশব্দে। ও আমাদের ওর নাম জানায়, আমরা ওকে জানাই আমাদের নাম।

লাভজনক বাণিজ্যের চেয়েও আমরা জেনে রোমাঞ্চিত হলাম যে ছেলেটির নাম ববি, ওর টেরা চোখের রঙ নীল আর ঠিক আমাদের মতোই খেলতে গিয়ে ওর প্যান্টের হাঁটুর জায়গাটা ময়লা। তারপর সে দৌড়ে ফিরে যায় ওর অ্যাপার্টমেন্টে।

ইয়ান লিয়ান, চীন

'পূর্ণিমার চাঁদ, আমেরিকায় পূর্ণতর।'—১৯৪৯-এর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের ওই সোনালি সাম্রাজ্যের লোভনীয় জীবনযাত্রাকে এভাবেই বর্ণনা করা হতো চীনে। ১৯৪৯-এর পর অবশ্য স্বভাবতই ওই 'পুঁজিবাদী কুকুর'-এর উদ্ভটত্ব পরিণত হলো আমাদের উপহাসের বিষয়ে। সে যাই হোক। আমেরিকার ইমেজ সবসময়ই শক্তিশালী, জ্বলজ্বলে। আর আধুনিক চীনে তো গোলগাল পূর্ণিমার চাঁদের যুৎসই উপমা হতে পারে গোলগাল আমেরিকান ডলার। অবশ্য আশির দশকের গোড়ার দিকে বেইজিংয়ের এক রেস্তোরাঁয় আমেরিকাবিষয়ক এই বিভ্রম আমার কেটে গিয়েছিল। আমেরিকান এক অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আমাকে ডিনারে দাওয়াত করেছিলেন। আমি তখন নবিশ কবি। স্বভাবতই আলাপে চীনের সেসময়কার রাজনৈতিক জটিলতার প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে এখানকার 'আন্ডারগ্রাউন্ড সাহিত্য'চর্চার প্রসঙ্গও। ডিনার শেষ হওয়ার পর টেবিলে বেশ কিছু খাবার বেঁচে গিয়েছিল। 'খাবারগুলো কি তুমি বাড়িতে নিয়ে যেতে চাও?' প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'কেন? খাবার বাড়িতে নিয়ে যাব কেন?' আমি খানিকটা অবাক হয়ে জানতে চাই। চীনে হোটেলের উদ্বৃত্ত খাবারের কোনো 'উদ্বৃত্তমূলক' নেই আর এখানে 'ডগি ব্যাগ' বলে কোনো কথারও প্রচলন নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমেরিকায় একজন কবির পক্ষে হোটেলের উদ্বৃত্ত খাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কোনো অস্বস্তির ব্যপার নয়। ওটা কুকুরকে দেওয়ার জন্য নয়, নিজের জন্যই।'

আমেরিকার কবি কি তাই বলে চীনা কবির চেয়েও গরিব? আমেরিকান চাঁদের নিচে এ তো বড়ই বেমানান কথা।

১৯৯২-এর মধ্য বসন্তের উৎসবের পর নির্বাসিত হয়ে আমি প্রথম নিউইয়র্ক এলাম। চায়না টাউনের এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন নিজের ভাগ্যের অভাবনীয় পরিণতি নিয়ে ভাবছি তখন পেছন থেকে কার ডাকে চমকে উঠলাম। 'ইয়ান লিয়েন।' তাকিয়ে দেখি আরেক চীনা কবি। আমার বেশ আগেই সে অভিবাসী হয়েছে। স্বাভাবিক নানা রসিকতার ফাঁকে সে বলল, 'তোমার নিউইয়র্কেই থাকা উচিত।'

'নিউইয়র্কেই কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'কারণ নিউইয়র্কে টিকে যেতে পারা মানে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় টিকে যাওয়া।' সে রীতিমতো গম্ভীর। শহরের উজ্জ্বল আলোর ওপরের শূন্যতায় দেখা দিচ্ছিল চাঁদের বিখ্যাত চাকা, যেনবা একটু বাড়তি ভরাট। তাহলে এই সেই 'আমেরিকান চাঁদ', আমি বুঝতে পারছিলাম না ঈর্ষান্বিত হব না কৌতুক বোধ করব।

এই নিউইয়র্কেই আমার এক আমেরিকান কবি বন্ধু ফোনে হা-হুতাশ করে বলছিল, 'মাই গড, আগামী মাসের শেষেই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একেবারে ফুটো হয়ে যাবে।' এরকম হা-হুতাশ সেবারই তার প্রথম কিংবা শেষ নয়। তার এ অবস্থা সে বর্ণনা করছিল গ্রিনউইচ ভিলেজের এক ফ্ল্যাটে বসে কবিতা লিখতে লিখতে। কী করা যাবে?

'তুমি আমাদের সঙ্গে এসে ডিনার করতে পারো। এক বেলা খাওয়ার পয়সা অন্তত বাঁচবে।' আমি এখানে এসে 'ডগি ব্যাগের' গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছি। অন্তত আমার লেখিকা স্ত্রী এক বাসায় পরিচারিকার কাজ করে কিছুটা পয়সা উপার্জন করছে। আমিও এদিক-ওদিক ছুটে দুএকটা কবিতা আবৃত্তি করে শখানেক ডলার কামাই করেছি। পুঁজিবাদ তো নেহাত একটা 'স্লোগান' নয়, এ এক শক্ত যৌক্তিক তারের জাল যাতে আটকা পড়ে আছে সবই। আমরা সেই সুখভোগকারী দলের লোক যারা 'সমাজতান্ত্রিক ভাত' খেয়ে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য', 'নিজস্বতা' এসব উচ্চ আদর্শের কথা বলেছি।

এখন এসে দাঁড়িয়েছি একেবারে সোজাসাপ্টা বাস্তবতায়। টেবিলের ওপর রাখতে হবে রুটি, ভাড়া দিতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে, কিনে খেতে হবে এক গ্লাস বিয়ার। টাকার জুলুম। ভয়ঙ্কর কিন্তু মজাদার। টিকে থাকার নিপীড়ন 'সাফল্যে'র আকর্ষণকে তীব্রতর করেছে। আমি আমেরিকায় এসে যে কবিতাগুলো লিখেছিলাম, সেগুলোর জন্য আমার অনুবাদককে নতুন ধরনের শব্দ তৈরি করতে চাপ দিয়েছিলাম। আমার একই কবিতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিরিজটির নাম দিতে চেয়েছিলাম অন্ধকারগুলি—চাঁদবিষয়ক সব পুরনো প্রবাদের জের। কবিতাগুলো আমেরিকান কবিদের নিয়ে আমার অনুভব যারা কিনা আমাদের চেয়েও ভয়াবহ গরিব। কবিতার জন্য ভালোবাসায় কে পয়সা খরচ করে, এখানে রাজনৈতিক বিরোধী কণ্ঠকে জয়টীকা পরানোর প্রশ্ন নাহয় বাদই দিলাম। সুতরাং কবিতা লিখতে চাও? কপালে দুঃখ আছে। যে কুকুর কবিতা লেখে সে স্বপ্নে 'ডগি ব্যাগ' দেখে, সে স্বপ্নে দেখে 'আমেরিকান চাঁদ' যে চাঁদ গোল। পুরো একটা মাংসের রুটির মতো। আমার বাবা আমাকে প্রায়ই বলত, 'মনে রেখো, কবিরা সব না-খেয়ে মরে।' আমেরিকান কবির বাবারা এ উদ্বিগ্নতার সঙ্গে নিশ্চয়ই আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

নিশ্চয়ই আমেরিকান সংস্কৃতি মানে হলিউড, ম্যাকডোনালডস, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি। কিন্তু আমার কাছে আমেরিকা মানে 'ডগি ব্যাগ শিল্প' আর আমাদের মতো হতভাগারা যাদের এমনকি ডগি ব্যাগেও বিশ্বাস নেই তারা আমার ধারণা শুধু একজন শ্রোতার জন্য এসব লেখালেখি, আবৃত্তি চালিয়ে যায়। সে শ্রোতা ওই যে আকাশের কোণে ঝুলে থাকা চিরকালের একাকী চাঁদ।

করিম রাসলান, মালয়েশিয়া

আমার বয়স যখন ছয় বছর, তখন মালয়েশিয়ান টেলিভিশনে ল্যাসি, হাই চ্যাপারাল আর দি মাস্কিস সিরিজগুলো দেখানো শুরু হলো। যেদিন সিরিজগুলো শুরু হলো সেদিনই কুয়ালালামপুরে আমাদের বাড়ির সামনে একটা কাচের বাক্স জমা হলো, যার ভিতর ২৩ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা। সেদিনই কি? হয়তো আমি ভুল করছি। আমাদের কারোই এখন আর সেই সঠিক দিনটি মনে নেই। তবে সে যাই হোক, একদিকে টিভি সিরিজ *বিউইচড* যার নায়িকা নাক কুঁচকালেই অন্যরা জাদুমন্ত্রে বশ হয়ে যায় আর অন্যদিকে গাঢ় লাল মলাটের এনসাইক্লোপিডিয়ার খণ্ডগুলোই ছিল আমার কাছে আমেরিকা। একদিকে হালকা, চটুল, মজাদারভাবে বোকাটে অন্যদিকে প্রশান্ত, গম্ভীর।

আমাদের বাড়ির সামনে এনসাইক্লোপিডিয়ার ওই অপ্রত্যাশিত অবতরণের বত্রিশ বছর পর, নিউইয়র্কের এই হাওয়াহীন ঘরে বসে বুঝতে পারছি ওই বইগুলো কতভাবেই না আমার চিন্তা, লেখা আর পৃথিবীকে দেখার ভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে। ওগুলো দিয়েই শুরু। ওই বইগুলো আমাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে। আমার মধ্যে যৌক্তিক ভাবনার ক্ষমতার ব্যাপারে আস্থা জাগিয়েছে, সেইসঙ্গে যাবতীয় আধ্যাত্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের ব্যাপারে জাগিয়েছে সংশয়।

ইসলামিক মৌলবাদীরা যখন শক্তি সঞ্চয় করে, যখন তারা কবি, লেখক, শিল্পীদের বাকরুদ্ধ করতে চায় তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই বইগুলো না উল্টালেই ভালো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতো। অনুসন্ধান, সন্দেহ, আলোকপ্রাপ্তি এসব শব্দ না-জানলেই ভালো হতো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। এখন তো আর অতীতকে নতুন করে গড়ার সুযোগ নেই, যা করেছি তাকে বদলাবার সুযোগ নেই। যা-কিছু মনে ঢুকেছে, তা আর মন থেকে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ নেই।

সেসব দিনে রাতের বেলা বাড়ির সবাই, কাজের লোকসহ গিয়ে বসত বাবার পড়ার ঘরের ঝিরঝির কাঁপতে থাকা শাদাকালো টেলিভিশনের পর্দার সামনে। আলো কমিয়ে, সামনে বাটিভর্তি তেলেভাজা মচমচে হেরিং আর চিংড়ি, সঙ্গে মরিচ বাটা নিয়ে আমরা টিভিতে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান দেখতে বসতাম। *দি ম্যান ফ্রম ইউএনসিএলই*, *ডাকদারি*, *আই লাভ লুসি* যা হতো তাই দেখতাম। বড়রা *আই ড্রিম অব জিনি*র বারবারা এডেনের হেরেমের পায়জামা দেখে হাসত, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলত যখনই ছবির ডিটেকটিভ চার্লি চ্যান বলত, 'এ হলো এক নাম্বার ছেলে।' সবাই যখন টিভির পর্দায় মুখ গুঁজে আছে, আমি একসময় উঠে যেতাম বুকশেলফের কাছে। আমার একটা নিজস্ব খেলা ছিল, যা আর কেউ জানত না। চোখ বন্ধ করে আমি শেলফ থেকে এনসাইক্লোপিডিয়ার যেকোনো একটা খণ্ড নামাতাম। চামড়ার মলাট সরিয়ে যেকোনো একটা পাতা উল্টাতাম, কল্পনা করার চেষ্টা করতাম কী আছে সেখানে—নেপোলিয়ন, অনুপ্রাস, মহারাষ্ট্র বা ইথিওপিয়া? যে বিষয়টাই থাকত আমি চটজলদি সেটা পড়ে ফেলতাম কেউ টের পাওয়ার আগেই।

কী সম্পর্কে, কার সম্পর্কে? যেমন ইমরে মাদাক, হাঙ্গেরির কবি (১৮২৩—১৮৬৪)। কী করেছিলেন তিনি? তিনি লিখেছিলেন *দি ট্র্যাজেডি অব ম্যান*। তারপর আমি ছবি দেখতে শুরু করতাম, ভাবতাম এই বুঝি আমি একটা নতুন ছবি দেখব, যা আগে দেখিনি। আমার ভালো লাগত অন্য কোনো দেশের ছবিগুলো দেখতে। বালির নর্তকী, ক্যালিফোর্নিয়ার ঘরবাড়ি, সাইবেরিয়ার ইস্পাত কারখানা থাই মন্দির, চীনের প্রাচীর। এ খণ্ডের কৌতূহল মিটলে আবার শেলফের কাছে গিয়ে নতুন করে খেলা শুরু করতাম।

আমাদের বাড়ির সামনে কাঠের বাক্সে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে আরো সব অসাধারণ, অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে অবতরণ করল। মালয়েশিয়ায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক নির্বাচনের পর মালয় মুসলিম আর চায়নিজদের মধ্যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হলো। ১৯৬৯ মালয়েশিয়ার জন্য এক অশুভ বছর।

প্রত্যাশিতভাবেই স্কুলগুলো যে বন্ধ হলো তাতে আমি বা আমার ভাই মোটেও অখুশি হলাম না। তবে বাড়িতে বসে থেকে-থেকে আমরা হাঁপিয়ে উঠলাম। কারণ আমাদের বাড়ি ছিল শহর থেকে দূরে পাহাড়ি উপত্যকায়। দেশে সত্যিকার কী হচ্ছে ওখানে বসে বিশেষ টের পাওয়া যেত না। শুধু অতিথি এলে তাদের কাছে নৃশংস সব হত্যাকাণ্ডের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গল্প শুনতাম, যে গল্পগুলো আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করত আমাদের বাবা-মা। ওই সময় এনসাইক্লোপিডিয়ার অবতরণ ছিল এক আনন্দদায়ক স্বস্তি। আশপাশে যাবতীয় উদ্বিগ্ন কথোপকথন এড়িয়ে আমি ডুব দিতাম এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায়।

নামটা নিয়ে আমি বেশ দ্বন্দ্বে পড়েছিলাম। ব্রিটানিকা, ব্রিটিশ নয়? না, ব্রিটিশ নয়। আমার মা আমাকে বোঝায় (যদিও এক সময় ছিল)। কেন যে এমন অদ্ভুত একটা ভুল করতাম, ভেবে পরে নিজেই অবাক হয়েছি। প্রকাণ্ড, ব্যাপক, সর্ববিষয়ক ধারণক্ষম এই এনসাইক্লোপিডিয়া আমার মায়ের দেশ ইংল্যান্ড থেকে আসা সম্ভব ছিল না। ইংল্যান্ড আসলে ক্লান্ত। ইংল্যান্ড ছোট, খেয়ালি, সনাতনী। বাড়িগুলো সংকীর্ণ সরু। আমার বাবার লাইব্রেরি থেকে আমি যতটুকু জেনেছি, ব্রিটিশদের নিজস্ব কিছু পছন্দের বিষয় আছে এনটিক, সরকারি ভবন আর উইনস্টন চার্চিল, আমেরিকা অন্যরকম।

স্কুল বন্ধের ওই অবারিত সময় আমি কাটিয়েছি এনসাইক্লোপিডিয়ার ছবি, ম্যাপ আর নকশা দেখে। এর সবকিছুই মজার। থাইল্যান্ডের মন্দির, মিসরের বীর, প্রজননতন্ত্র, আণবিক চক্র, ইসভার্লভক্সের ইস্পাত উৎপাদন, সার্ত্রে, কামু বা জ্যাকসন পোলকের জটিল চিত্রকলা। এসব নিয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি।

তবে মিথ্যা বলা হবে যদি বলি এর সব ছবি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। একটা ছবি ছিল যেটা দেখে আমার কেমন একটা অমঙ্গলের অনুভূতি হতো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে লিওপোল্ডভ্যালিতে এক প্রশস্ত কঙ্গোলিজ বাড়ির বারান্দায় বসে আছে মিশ্র জাতিসত্তার এক তরুণ পরিবার। ছবিতে বাড়ির কৌণিক রেখা আর চোখধাঁধানো রোদ দেখলে আমার নিজের বাড়ি আর মালয়েশিয়ার কথা মনে হতো। ছবির পরিবারের বাবাটি আফ্রিকান এবং কোনো চাকরিজীবী। ঘাড় সোজা করে, খুব আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে তার বসার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হতো লোকটি বুঝি ব্যাংকার, আমার বাবার মতো। মা-টি ইউরোপিয়ান, যার পাশে বসে আছে চকোলেট রঙের এক ছোট ছেলে। আমার মনে হতো, এ যেন আমাদের পরিবারেরই ছবি। ওরা আধুনিক, শিক্ষিত আর ভবিষ্যতের জন্য তৈরি। কিন্তু আমি জানতাম এটা ভুল প্রতিচ্ছবি। জাতিসংঘের শান্তিমিশনে মালয়েশিয়ার সেনাবাহিনীও রয়েছে। সবারই চাচা বা মামা কেউ একজন শান্তিমিশনে মধ্য আফ্রিকায় গেছেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বিস্তর গল্প। কঙ্গোর সমাজ ভেঙে পড়েছে। তাদের জীবন এনসাইক্লোপিডিয়ার ছবির মতো [illegible]নি। কখনো কখনো অন্ধকার আর অশুভ [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজা শেহাদেহ, প্যালেস্টাইন

সেই ছোটবেলা থেকে আমি আমার বন্ধু, আত্মীয়স্বজনকে হারাচ্ছি, যারা চলে যাচ্ছে আমেরিকায়। গ্রীষ্মের এক বিকেলের কথা আমার মনে পড়ে। রামাল্লার গ্রান্ড হোটেলের সবুজ বেতের চেয়ারে আমি বসেছিলাম। ঝিরঝির বাতাসে সামনে নড়ছিল গাছের পাতা। আমার বয়স তখন দশ। আমার বন্ধু ঈসা মিত্রির ভাইকে বড়রা বিদায় জানাচ্ছিল। ঈসা মিত্রি এবং আমিও সুযোগ পেয়েছিলাম বড়দের ওই বিদায় অনুষ্ঠানে। ঈসার ভাই পরদিন আমেরিকা যাচ্ছে। ওদের পরিবারের প্রথম ইমিগ্র্যান্ট। 'ইমিগ্র্যান্ট' শব্দটি এর আগে আমি কখনো শুনিনি। ভাবছিলাম তার মানে কি ওর ভাই আর কোনোদিন ফিরে আসবে না? ঈসা গম্ভীরভাবে বলেছিল, হ্যাঁ তাই। ঈসার কণ্ঠে বিষণ্নতা ছিল না, ছিল গর্ব। আমি ওর ভাই ইলিয়াসের দিকে তাকাই। লম্বা, খানিকটা বাঁকা লাজুক এক যুবক। তাকে তেমন খুশি মনে হচ্ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন? আমেরিকায় যাওয়া তো তখন আমার কাছে স্বর্গে যাওয়া। কিন্তু তার পরও কেন যে ঈসার ভাই খুশিতে আত্মহারা হচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছিলাম না।

কয়েক বছর পর ঈসাও চলে গেল আমেরিকায়। ওর স্কুলের শেষ বছরগুলো পড়তে। এটা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের ঠিক পরপর, যখন ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করে নিয়েছে। মিত্রি-পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ঈসা ওখানেই নিরাপদে থাকবে। ঘর দেখাশোনার জন্য কিছুদিন পর ওর মাও চলে গিয়েছিল আমেরিকা। ওর বাবা ছিলেন *নিউজউইক*-এর সংবাদদাতা, মাসখানেক একা থাকার পর তিনিও একদিন তল্পিতল্পা গোটালেন। আমার মনে আছে, যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দেশ ছাড়তে পেরে তিনি খুশি কি না। তিনি তিক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি বহুদিন এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখছি, যেদিন দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমার বাবার মন্তব্য শোনার জন্য তার পেছন পেছন ঘুরতে হবে না।' আমার বাবা ছিলেন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর আমার বাবা প্রস্তাব করেছিলেন দুটি রাষ্ট্র হোক। ইসরায়েলের দখলকৃত এলাকাগুলো নিয়েই হবে প্যালেস্টাইন। তখন এটা ছিল নতুন প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে অবশ্য আমার বাবার ইসরায়েল বা প্যালেস্টাইন কোথাও তেমন বন্ধু জোটেনি।

মিত্রিদের মতো রামাল্লার হাজার হাজার পরিবার আমেরিকায় স্থায়ীভাবে অভিবাসী হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রীষ্মের সময় দিনকয়েকের জন্য ফিরে এলে বারমুডা আর বেসবল হ্যাট পরে বড় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়, আইসক্রিম পারলারে দাঁড়িয়ে পুরনো বাচনভঙ্গি দোকানের মালিকের সঙ্গে স্মৃতিচারণ করে, যে বাচনভঙ্গি আজকাল আর রামাল্লায় শোনা যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই অভিবাসন শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। এখন রামাল্লাবাসীর সংখ্যা রামাল্লার চেয়ে আমেরিকায় বেশি। ১৯৬৭ সালের আগে অভিবাসী বন্ধু-আত্মীয়ের কাছে দেশটির নানা ভালো গল্প শুনেই আমেরিকা সম্পর্কে প্যালেস্টাইনিদের পরিচয়। কিন্তু ১৯৬৭-র পর সে পরিচয় পাল্টেছে।

প্যালেস্টাইনি এলাকা দখলের পরপরই ইসরায়েল আমাদের শহরগুলোর আশপাশের ব্যাপক এলাকাজুড়ে ইহুদি বসতির জন্য প্রচুর দালান ওঠাতে থাকে। এ ছিল এক বিপুল ব্যয়বহুল প্রকল্প। আমেরিকার সরকারি ও বেসরকারি উদার দান ছাড়া ইসরায়েলের পক্ষে আমাদের গ্রামগুলোর ওপর এমন নির্বিচার হামলা সম্ভব ছিল না।

প্যালেস্টাইন যখন ব্রিটিশ শাসনে ছিল তখন তারা আরব জমি দখল করে ইহুদি বসতি করেনি। প্যালেস্টাইনে একটা ইহুদি ভূমির দাবির প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে তারা তুলনামূলকভাবে কম আক্রমণাত্মক এবং কম ব্যয়বহুল পথ নিয়েছিল। ওরা শস্তা সব রাস্তা বানিয়েছিল। পাহাড়ের বাঁক ধরে ধরে বানানো সেসব রাস্তা ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব ফুরিয়ে যাওয়ার পরও লোকজন ব্যবহার করত। আশির দশকের গোড়ার দিকে আমি একদিন আমার বাবার গাড়িতে নাবলুসের আদালতে যাচ্ছিলাম। আমার বাবার গাড়ি চালানো তার রাজনীতির মতোই ঝুঁকিপূর্ণ। মনে আছে প্রতিবার বাঁক ঘুরতে পেট মুচড়ে উঠছিল আমার, আর বাবা কষে ব্রিটিশদের গালি দিচ্ছিল। 'রাস্তাটা সোজা কেটে নিলেই পারত; কিন্তু না, বেটারা সবগুলো পাহাড় ঘুরে ঘুরে এসেছে', বাবা বলছিল। কিছুদিন আগেই বাবা আমেরিকায় তার প্রথম যাত্রা শেষে ফিরে এসেছে এবং আমেরিকান উদ্দীপনায় বেশ মজে আছে। তার মনে হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের উচিত আমেরিকার মতো তাদের সীমানা উন্মুক্ত করে দেওয়া অন্য দেশের অভিবাসীদের জন্য। ফলে যে নতুন রক্তের আগমন ঘটবে, তারাই আমাদের এই অন্তহীন বিবাদের একটা সমাপ্তি টানবে। কিন্তু খাঁটি ইহুদিত্ব রক্ষার ইসরায়েলি স্বপ্নের কী হবে? বাবাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করার আর সুযোগ হয়নি।

আমার বাবা জাফায় আইন ব্যবসা শুরু করে ১৯৩৪ সালে, প্যালেস্টাইন তখনো অবিভক্ত। আমি যখন আইন ব্যবসা শুরু করেছি ততদিনে পশ্চিম তীর ইসরায়েলের দখলে। আমি আদালতে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশের পাহাড়গুলোতে দেখতে পাই ইসরায়েলি বাহিনির ভারী অস্ত্রশস্ত্র। নতুন বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকান ইহুদি, যারা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। তারা উপনিবেশ স্থাপনকারীদের যাবতীয় কৌশল ব্যবহার করেছে—জরিপ, ম্যাপ তৈরি, এই লুণ্ঠনকে বৈধ করার জন্য নানা আইনি যুক্তি বিস্তার, যে স্থানীয় প্যালেস্টাইনিরা বাধা দিয়েছে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করা ইত্যাদি। একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার এই প্রক্রিয়াকে ইসরায়েলিরা শোভন শব্দ ব্যবহার করে বলতে চাইত 'স্থানান্তর'। প্যালেস্টাইনিদের কাছে আমেরিকার মদদপুষ্ট এবং অনুদানে চলতে থাকা এই ইহুদি বসতি স্থাপনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রক্রিয়া আমেরিকার ভূমিতে আমেরিকানদের বসতি স্থাপনের আদি ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। কয়েক বছরের মধ্যেই দখল করা প্যালেস্টাইনি ভূমিতে তরতরিয়ে বেড়ে উঠল ইসরায়েলি বসতি। এরপর ওদের প্রয়োজন পড়ল নতুন রাস্তার, যা কিনা তাদের যুক্ত করবে মূল ইসরায়েলি ভূখণ্ডের সঙ্গে। তবে এবার তো আর ব্রিটিশ ধাঁচের পুরনো বাঁকাচোরা রাস্তায় চলবে না। এবার প্রয়োজন আমেরিকান স্টাইলের সোজা চার লেনের প্রশস্ত হাইওয়ে, যা পাহাড়ের বাঁক ঘুরে যাবে না বরং সামনে যে পাহাড় পড়বে তাকে কেটে-ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে সোজা।

প্যালেস্টাইন নেহাতই ছোট আর এর গ্রামগুলো সুন্দর, তবু ইসরায়েলি পরিকল্পনাবিদরা ১৯৮৪ সালের মধ্যে ওই পুরনো উত্তর-দক্ষিণ রাস্তা ছাপিয়ে এমন সব পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়ে তৈরি করে ফেলল, যা তাদের পশ্চিম তীরের ওই বাড়িগুলো থেকে ইসরায়েলে নিয়ে যাবে অর্ধেক সময়ে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল কোটি কোটি আমেরিকান ডলারের। স্বভাবতই টাকা কোনো সমস্যা হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাস্তার গল্প নেহাতই তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুত এই রাস্তা আমাদের একধরনের আধ্যাত্মিক ক্ষতিসাধন করেছে। এই হাইওয়ের কারণে হারিয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে একেবেঁকে চলা সেই সর্পিল রাস্তা, যা আমাদের পৌঁছে দিত এবাল আর গেরিজিম পাহাড়ের মাঝখানে গড়ে ওঠা প্রাচীন শহর নাবলুসে। হারিয়ে গেছে পথ চলতে দেখা সেসব অসাধারণ, নাটকীয় দৃশ্যাবলি। এখন পাহাড় কেটে বেরিয়ে যাওয়া এই দামি হাইওয়েতে চলতে চলতে কেবল দেখা যায় কাটা পাহাড়ের ক্ষত।

কিন্তু এধরনের প্রকল্পে অনুদান দিয়েই ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার সহায়তার কর্মকাণ্ড থেমে যায়নি, গত জুলাইতে আমার এক ভাই রামাল্লার দক্ষিণপ্রান্তের এক হোটেলে এক বিয়ের অনুষ্ঠান উপভোগ করছিল। এ সময় পার্শ্ববর্তী এক দালানে এফ-১৬ জেট প্লেন থেকে ভারী এক বোমা ফেলা হলো। সবকিছু ছিল চুপচাপ, নীরব। বিমান হামলার এমন কোনো পূর্বাভাসও দেওয়া হয়নি। নতুন দম্পতি আংটি বদল করছিল। পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত ছিল বিয়ের কেক। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণে হোটেলের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের প্রকাণ্ড জানালাগুলো ধসে পড়ল, গ্লাসগুলো গুঁড়িয়ে গেল, শক্তিশালী নিরাপত্তা দরজাও ভেঙে ছিটকে পড়ল। অতিথি সবাই ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

পাশের দালানটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দেখে বোঝার উপায় নেই এখানে কখনো কোনো ঘরবাড়ি ছিল। আমার সেই ভাইয়ের মধ্যে কী একটা যেন ঘটল। তার মনে হলো সে বুঝি মারা গেছে। কিন্তু পরে নিজেকে জীবিত দেখে অবাক হলো সে। সহসা তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। সব ভয় যেন কেটে গেল তার। সে আমেরিকানকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা করত না। আমেরিকাতেই পড়াশোনা করেছে সে। শেষবার নিউইয়র্ক যাওয়ার পর সে টুইন টাওয়ার ঘুরে এসেছে। টুইন টাওয়ারের ট্রাজেডি সে গভীরভাবে অনুধাবন করে। বম্বিঙের পর সে উদ্বিগ্ন হয়ে তার এক ভাইয়ের খোঁজ করছিল। সে নিয়মিত কাজের সূত্রে বোস্টন, লসএঞ্জেলেস ভ্রমণ করে। তবু আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমেরিকা সম্পর্কে তার কী ধারণা, সে বলেছিল আমেরিকাকে আমি বরদাশত করতে পারি না। কারণ সে ইসরায়েলের চামচা। ইসরায়েলকে সে বল্গাহীন সামরিক সহায়তা দেয় এবং নিরীহ সাধারণের ওপর সেসব আমেরিকান অস্ত্র প্রয়োগে কোনো বাধা দেয় না।

অধিকাংশ আমেরিকান কোনোদিন জানবে না, কেন আমার ভাই আমেরিকা থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমেরিকায় খণ্ড সমগ্রের চেয়ে বড়। হয়তো নানা বৈচিত্র্যের আমেরিকানদের আশাবাদ শক্তি আর বিরোধিতায় একদিন স্রোতের গতি পাল্টাবে এবং আমেরিকাকে অন্যের কথা শুনতে বাধ্য করবে।

আহদাফ সয়ীক, *মিশর*

দি ডেয়ারিং মেন অব দি ফ্লাইং ট্রাপেজ, এ পারফেক্ট ডে ফর বার্নানা ফিস—নামগুলোর মধ্যে কেমন একটা মুক্ত, দড়ি ছেঁড়া ভাব। গল্পগুলো অন্য দেশের গল্পের চেয়ে হয়তো ভিন্ন কিছু নয় কিন্তু নামগুলো উচ্ছ্বাসে ভরপুর। *টেন্ডার ইজ দি নাইট* জেনে অবাক হয়েছিলাম যে, এরকম একটা নামের বই যাকে আমি চটুল ভেবে তাচ্ছিল্য করছিলাম সেটি আসলে 'মিলস অ্যান্ড বুন' থেকে প্রকাশিত সিরিয়াস উপন্যাস। *বেবি ডল* বা *এজ আই লে ডাইং* বইগুলো এমন একটা পৃথিবীর মুখোমুখি করে, যা সেই একই সময় পড়া ইউরোপীয় উপন্যাসগুলোর চেয়ে অধিকতর তাৎক্ষণিক এবং বিপজ্জনক। *জিওভান্নিস রুম* হচ্ছে প্রথম বই যা আমি সমকামী সাহিত্য হিসেবে শনাক্ত করতে সমর্থ হই। আমার মনের নানা বাঁধ ভাঙে।

আমার কল্পনার পৃথিবী গড়ে উঠেছিল আমার মায়ের লাইব্রেরি থেকে আর আমার সংগীতের জগৎ গড়ে উঠেছিল বাবার মাধ্যমে। আমার সাতবছর বয়সী মনে বিটোফেনের সোনাটা ফাইভ আর ১৯২০-এরও আগে রেকর্ড করা আবদেল ওয়াহাবের গানের মাঝে অনায়াসে ঢুকে গিয়েছিল লুই আর্মস্ট্রংয়ের মৃদু গর্জন। আবদেল ওয়াহাবের সবচেয়ে আনন্দের গানগুলোর মধ্যেও আমি একটা বিষণ্নতার ঢেউ টের পেতাম। কোথা থেকে আসত এই বিষণ্নতা, কীভাবে তিনি তা অর্জন করেছিলেন? গানের কথা, তাল যদি এতটা আনন্দের তবে আমার বুকে কিসের ওই ব্যথার মোচড়? বড়দের দ্ব্যর্থকতার সঙ্গে সেই আমার প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৬৬-এর গ্রীষ্মকাল ছিল আমার শৈশবের শেষ 'স্বাভাবিক' গ্রীষ্মকাল। কারণ পরের জুন মাসেই শুরু হয় ছয় দিনের যুদ্ধ। অবশ্য সেই স্বাভাবিক গ্রীষ্মকালও পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল না। আমার ছোট খালা, যে একজন ডাক্তার, নিউইয়র্ক গিয়েছিল তার মেডিকেলের পড়া শেষ করতে। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাৎসরিক পারিবারিক ভ্রমণ থেকে খসে পড়েছিল একজন। ওই বছরের গ্রীষ্মকালেই আবদেল হালিম গাইলেন 'আলা হিজব ওয়াদাদ গালাব' এবং আমি ওরওয়েলের *নাইনটিন এইটি ফোর* পড়লাম। আমি 'রুম ১০০১' থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়। সেই থেকে আবদেল হালিমের গানের সুর আমাকে টেনে নিয়ে যায় রাতের মামুরা সৈকতের সেই বালুতে। আমার হাতে গুঁজে থাকা কমলা শাদা প্রচ্ছদের সেই পেপারব্যাক বই, তালগাছ ঘেরা ডিসকো থেকে ভেসে আসছে সুর। সামনে কালো সমুদ্রের মৃদু গর্জন আর সাগরের ওপারে শুধু আমার চেনা ইউরোপ নয়, তারও ওপারে দূরে বহুদূরে আছে আমেরিকা।

আমরা সেসময় টেলিভিশনে যে আমেরিকা দেখতাম সেটা ছিল *বোনানাজা* আর *দি ভারজিনিয়ান*-এর আমেরিকা। এগুলো অবশ্য আমার কাউবয় ছবির মতো অতটা ঝামেলাপূর্ণ মনে হতো না। সেই বয়সে আমার কাছে কাউবয় ছবির সমস্যা ছিল এই যে ওতে 'ইন্ডিয়ানরা' কখনো তাদের নিজস্ব গল্প শোনানোর সুযোগ পেত না। সাহসী, বলবান, গর্জন করতে থাকা ঘোড়সওয়ার অসংখ্য ইন্ডিয়ানকে যখন ছবিতে এক এক করে মেরে ফেলা হচ্ছে, তখন তাদের জন্য দর্শকরা দুঃখ পাবে এমন প্রত্যাশিত ছিল না। ছবিতে কখনো আমরা ইন্ডিয়ানদের কোনো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখতে পেতাম না। নিশ্চয়ই তাদের ছিল, কিংবা হয়তো ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল বন্দুক উঁচিয়ে শ্বেতাঙ্গ নায়কেরা পর্দায় আসার আগে। সেই ষাট দশকের মিশরে বসে রাজনৈতিক আমেরিকা বিষয়ে এতটা সচেতন বা সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য শুধু সিআইএ ছাড়া মিশরে কোনো আমেরিকানের সঙ্গে দেখা হলে সবাই ধরে নিত লোকটা নিশ্চয়ই সিআইএতে কাজ করে। এবং সবাই আলাপ করত যে, চে গুয়েভারার হত্যার পেছনে সিআইএর হাত রয়েছে। তবে কথা হচ্ছে, কায়রোতে কদাচিৎ আমেরিকানদের দেখা মিলত—ঠিক যেভাবে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ বা রাশানদের দেখা যেত, যারা নানা কাজের সূত্রে কায়রোতে বসবাস করছে। যেদিন আমি প্রথম জানলাম যে, 'শান্তিরক্ষা বাহিনী' বস্তুত সিআইএরই হাতিয়ার, সেদিন আমার মনে হলো ভাষার এমন অপব্যবহার এর আগে কখনো শুনিনি।

অবশ্য আমি এও বেশ জানতাম যে, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের কী একটা সমস্যা আছে। সম্ভবত আমি ধরে নিয়েছিলাম যেহেতু মিশর, অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মিলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে ফলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমস্যাটা সেখানেই। আমেরিকা এবং ইউরোপ মিলে আমাদের যে বাঁধ তৈরিতে বাধা দিচ্ছিল, সোভিয়েত আমাদের সাহায্য করছিল সে বাঁধ তৈরিতে।

ইসরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্ব তখনো এতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল-প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ শুরু হলে সবাই আঙুল তুলে আমেরিকাকে দেখাল। এই যুদ্ধ পরিচালনায় ইসরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা সবাই আলাপ করতে লাগল। এরপর *জেড* বা *মিসিং*-এর মতো ফিল্মগুলো এল যা অন্য দেশে সিআই-এর ভূমিকা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরল। কিন্তু তারপরও ব্যাপারটা এমন যেন তুমি সিআইএকে ঘৃণা করতে পারো কিন্তু রয়ে যেতে পারো আমেরিকার জ্যাজ কিংবা সাহিত্য নিয়ে, যে আমেরিকা কিনা এত মজাদার, গণতান্ত্রিকমুক্ত।

তারপর একসময় যখন দেশের বাইরে আমার পিএইচডি করার সুযোগ এল আমি আমেরিকা না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম—আমেরিকা আমার জন্য অনেক দূরবর্তী। আমি বরং ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাসটারে পড়াশোনা করলাম। অবশ্য ইংল্যান্ডও যে আমার বাড়ি থেকে কত দূর সে ধারণা আমার ছিল না। এই ল্যাঙ্কাসটারেই আমি *কাসারাঙ্কা* ফিল্মটা দেখি। সবাই যখন ছবিটার প্রশংসা করছে, আমি ভালোলাগা সত্ত্বেও নীরবে ভাবছিলাম আরবদের কথা। ছবিতে মরোক্কানরা কোথায়? আর একমাত্র অনিউরোপীয় চরিত্রটি কেনই বা এমন নোংরা, অগোছালো? কিংবা আমার ঘরকাতুরে মন হয়তো আমাকে বড় বেশি স্পর্শকাতর করে তুলেছিল।

হয়তো এই ফিল্মগুলোর কারণেই ১৯৭৮-এ আমি যখন প্রথম নিউইয়র্কে গেলাম আমার কাছে সবই মনে হচ্ছিল চেনা। তার মানে এই নয় যে, শহরটি আমাকে প্রভাবিত করেনি বরং তড়িতাঘাত করেছে। এ শহর তড়িতাঘাত করতে সক্ষম আবার ঘরোয়া। আমাদের মতোই দোকানি বাদামি কাগজের ব্যাগে সওদা তুলে দেয়। রাস্তার পাশ থেকে যে নোনতা 'প্রিৎজেল'গুলো কিনলাম ওগুলো ঠিক আমাদের 'সিমিট'এর মতো। সঙ্গে ওরা আবার বাড়তি একটু নুনও দিয়ে দেয়। রাস্তার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ময়লা আর কাগজ। মহিলাদের অন্তর্বাসের ছোট দোকানগুলোতে ওই একই নীরস, অবিচলিত স্তনের প্রদর্শনী, যা কায়রোর দোকানের জানালাতেও দেখা যায়। আর চারদিকে ওই একই তর্ক আর চেঁচামেচি করা বাচাল মানুষ। আমার একই সঙ্গে মনে হচ্ছিল আমি বাড়িতেই আছি আবার আছি কোনো ফিল্মের সেটে। অবশ্য দূরত্ব তৈরি করছিল ওদের বাচনভঙ্গি। সবার কথাতেই কেমন একটা শ্লেষ, যেন ওরা নিজেকে নিয়ে কিংবা কাউকে নিয়ে তামাশা করছে।

অবশ্য পরে যখন আরো কয়েকবার আমেরিকায় গেছি, তখন মনে হয়েছে তামাশা করার মতো বাস্তবিকই অনেক কিছু আছে সেখানে। প্রতি ১০ মিনিট পরপর বিজ্ঞাপন-জর্জরিত টিভি অনুষ্ঠানগুলা। টক শোতে নিজের যাবতীয় ব্যক্তিগত বিষয় আলাপ করতে আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উদ্ভট চরিত্রগুলো। টিভিতে বাইবেল প্রচারকদের নির্লজ্জ অনুদান চাওয়া। আর ওই যে একটা ধারণা যে 'সমাজতন্ত্র' একটা নোংরা শব্দ। সবই তামাশার ব্যাপার বটে।

গত দুই দশকে আমেরিকায় বহুবার ভ্রমণ করেছি আমি এবং এদের সদানন্দমানতা, বৈচিত্র্য আর কৌতুকপ্রবণতাকে পছন্দ করেছি। আমেরিকার সঙ্গে আমার উষ্ণ, দৃঢ়, দীর্ঘস্থায়ী একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাশাপাশি গত দুই দশকে পৃথিবীর ওপর আমেরিকার প্রভাব এবং আমেরিকার কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, ক্ষতিকর। সবচেয়ে যা ক্ষমার অযোগ্য তা হলো এ সবই করা হয়েছে 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র', 'শান্তি' এসবের নাম ভাঙিয়ে।

আমেরিকার বৈদেশিক নীতির ভণ্ডামি সবচেয়ে বেশি উন্মোচিত হয়েছে ইসরায়েলের প্রতি তার শর্তহীন সমর্থনে। একে সাধারণভাবে ইহুদিবাদী লবির শক্তি হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু 'ইহুদিবাদ' এবং ইসরায়েলকে সমার্থক করে তোলার এই প্রক্রিয়াকে অনেক ইহুদিই প্রকাশ্যে এখন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তারা হলোকস্টের ভুল শুধরে তুলতে চান। অবশ্য পারস্পরিক সাযুজ্য হয়তো আরো গভীরতর। কিন্তু আমেরিকাও তো তুলনামূলকভাবে তরুণ রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল একদল শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের হাতে, যারা এ দেশ 'আবিষ্কার' করেছিল এবং এখানে 'বসতি' স্থাপন করেছিল। অবশ্য এ দেশের নিজস্ব বাসিন্দা ছিল, কিন্তু তাদের কে তোয়াক্কা করে? ইসরায়েল যেন তার শিশু, আমেরিকা দেখছে কী করে শিশু তার বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আবার এখন দেখা যাচ্ছে উল্টো বাবা-মা তার সন্তানের কাছ থেকে শিখছে।

বেসামরিক লোকের ওপর বিমান হামলা, বিনা বিচারে লোকজনকে অবৈধভাবে বন্দি করে রাখা, জেরার সময় নির্যাতন করা, পৃথিবীব্যাপী সুনির্দিষ্ট হত্যা—এগুলো গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইসরায়েলেরই নিজস্ব কৌশল ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, আমেরিকাও এগুলো বেশ রপ্ত করেছে। কিন্তু ইসরায়েলে একটা মুক্ত গণমাধ্যম আছে। সে তার নিজের নাগরিকদের বলাবাহুল্য ইহুদি নাগরিকদের ওপর কোনো দমননীতি চালানোর সাহস পাবে না। কিন্তু আমেরিকা তো আমেরিকানদের ওপরই দমননীতি চালানোর প্রস্তাব করছে।

আমেরিকার আধিপত্যপীড়িত এই মুহূর্তের পৃথিবীকে খুব একটা নোংরা জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

আমি এখনো আমার আমেরিকান বন্ধুদের ভালোবাসি। পছন্দ করি ওদের সংগীত, গল্প। ওরা চৌকশ, রসিক, মুক্ত, উষ্ণ। তাহলে ব্যাপারটি কি সত্যি এই যে, নিজে ভালো থাকার জন্য আমেরিকাকে বাকি [illegible] ঘাড় মটকাতে হবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিস্লাভা শিমবোর্স্কার নোবেল-বক্তৃতা

(শিমবোর্স্কা পোলেন্ডের কবি। সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে)

লোকে বলে বক্তৃতার প্রথম বাক্যটা বলাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন। আমি সেই কাজটা অবশ্য সেরে ফেললাম। অন্তত প্রথম বাক্যটা তো বলা হলো। তবে সত্যি বলতে আমার কাছে শুধু প্রথম কেন, তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম এমনকি শেষ বাক্যটাও সমান কঠিন, বিশেষ করে আমাকে যদি কবিতা বিষয়ে কিছু বলতে হয়। কবিতা বিষয়ে আমি বলি খুব কম, বলতে গেলে তেমন কিছুই বলিনি। আর যা-কিছু সমান্য বলবার চেষ্টা করেছি, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেসব কথার আদৌ কোনো মূল্য আছে কিনা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমার বক্তৃতা হবে সংক্ষিপ্ত। ভুলভাল কথা তাও সহ্য করা হয় যদি স্বল্প মাত্রায় পরিবেশিত হয়।

আমি লক্ষ করি আজকালকার কবিদের মধ্যে নানা ব্যাপারে অবিশ্বাস আর সন্দেহ বেশ প্রবল, এমনকি নিজের ব্যাপারেও। দেখেছি তারা সচরাচর লোকজনের সামনে নিজেদের কবি হিসেবে পরিচয় দেন না। নিজেকে কবি বলতে তারা যেন বেশ একটু লজ্জাই পান। এই কোলাহলের যুগে আমরা নানা আকর্ষণীয় মোড়কে ঢেকে আমাদের অক্ষমতাগুলো বেশ স্বীকার করে নিই কিন্তু মেধাকে স্বীকার করতে আমাদের ভয়। আমরা নিজেরাই আমাদের মেধার ব্যাপারে বিশ্বস্ত নই। ধরা যাক কবির সঙ্গে নতুন একজনের পরিচয় হলো কিম্বা নানা কাজকর্মে কবিকে অনেকসময় কোনো জরিপের প্রশ্নমালা পূরণ করতে হয় যেখানে একটা প্রশ্ন থাকে, আপনার পেশা কী? তো আমি দেখেছি এই পেশার প্রশ্নে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখার বাইরে যে চাকরিটা করেন সেটার উল্লেখ করেন। খুব বেশি হলে তিনি হয়তো নিজেকে পরিচয় দেন একজন 'লেখক' হিসেবে। কিন্তু 'আমি কবি' একথাটা সহজে বলেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনি বাসে যাচ্ছেন আপনার সহযাত্রী যদি জিজ্ঞাসা করে আপনি কী করেন, কিম্বা কোনো একজন বড় আমলার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো, তিনি যদি জানতে চান আপনি কী করেন তখন আপনি যদি বলেন 'আমি কবি', আমি বুঝি যে তাতে বিপদ আছে। তারা আপনার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাবে এবং বেশ সতর্কতার সাথে আলাপ করবে। আমার ধারণা কেউ যদি নিজেকে দার্শনিক হিসেবে পরিচয় দেয় তার অবস্থাটাও অনেকটা এমন হবে। অবশ্য দার্শনিকদের একটা সুবিধা আছে। তারা হয়তো তাদের পরিচয় হিসেবে বলতে পারেন আমি 'ফিলোসফির প্রফেসর'—বেশ গালভারি শোনায় ব্যাপারটা। কিন্তু কবিরা তো আর নিজেদের কবিতার অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন না। কবিতা লেখাটা এমন কোনো পেশা নয় যার জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিক অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা অত্যাবশ্যকীয়। ব্যাপারটা তো এমন না যে আপনি নিয়মিত পরীক্ষা দিলেন, রেফারেন্স, ফুটনোট দিয়ে একটা থিসিস লিখলেন এবং শেষে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে বলা হলো যে আজ থেকে আপনি কবি। আবার এমনও হতে পারে আপনি পাতার পর পাতা অজস্র চমৎকার, নিখুঁত কবিতা লিখলেন তারপরও আপনি কবি নন, যতক্ষণ-না কোনো বিশেষ কর্তৃপক্ষ আপনাকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে রুশ কবিতার গর্ব পরবর্তীকালে নোবেল বিজয়ী জোসেফ ব্রদস্কির ব্যাপারে এমনই ঘটেছিল। তৎকালীন রাশিয়ার সরকার তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তাঁকে বলেছিল পরজীবী, কারণ কবি হিসেবে তার কোনো সরকারি সার্টিফিকেট ছিল না। ব্রদস্কির সাথে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার অনেক বছর আগে। আমার চেনা পরিচিত যত কবি আছেন তাদের মধ্যে একমাত্র ব্রদস্কিকেই দেখেছিলাম নিজেকে কবি বলতে খুব আনন্দ পেতেন এবং কোনো দ্বিধা ছাড়া জনসমক্ষে সগর্বে নিজেকে কবি বলে পরিচয় দিতেন। এমন একটা ভঙ্গিতে তিনি বলতেন 'আমি কবি', যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন, পারলে ঠেকাও। আমার মনে হয় যৌবনে তাঁর প্রতি যে অবজ্ঞা দেখানো হয়েছিল তা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি।

তবে যেসব দেশের কবিরা অতটা দুর্ভাগা নয়, যেখানে কবিকে অতটা অপদস্ত হতে হয় না সেখানেও কবিরা নিজেদেরকে আর দশজনের চেয়ে আলাদা করে তুলে ধরার কোনো চেষ্টা করেন না। নিজেদের বই প্রকাশিত হোক, লোকে পড়ুক, পড়ে বুঝুক এটুকুই প্রত্যাশা তাদের। অথচ খুব বেশিদিনের কথা নয়, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কবিরা তাদের উড়নচণ্ডী জীবন, উদ্ভট পোশাক এসবের মাধ্যমে আমাদের চমকে দেয়ার জন্য রীতিমতো সচেষ্ট থাকতেন। তবে ওসব নেহাত লোকদেখানো ব্যাপার। কারণ সবকালের কবিদের জীবনে সেই মুহূর্ত আসে যখন তাদের দরজা বন্ধ করে বসতে হয়, খুলে রাখতে হয় কবির তথাকথিত সাজসজ্জা এবং নিভৃতে, ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে হয় তার সামনে তখনও কালির আঁচড় না-লাগা শাদা কাগজটাকে। কারণ ঐ কাগজে যা লেখা হবে শেষপর্যন্ত বিবেচ্য সেটাই।

এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার না যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বা চিত্রশিল্পীদের জীবন নিয়ে বিস্তর সিনেমা হয়েছে। নামজাদা চলচ্চিত্র-পরিচালকরা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মাস্টারপিস পেইন্টিং সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটা সিনেমায় একরকম নিয়ে আসা যায়। ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতির নাড়াচাড়া ইত্যাদি দেখিয়ে দর্শকের আগ্রহ ধরে রাখা যেতে পারে। সেখানে একটা বেশ অনিশ্চিত উৎকণ্ঠাও কাজ করে। এই যে বৈজ্ঞানিক নানাভাবে হাজার বার একটি পরীক্ষা করছেন শেষপর্যন্ত তিনি তার প্রত্যাশিত ফলটি পাবেন তো! ব্যাপারটা বেশ নাটকীয়। একজন পেইন্টারকে নিয়েই সিনেমা হতে পারে তেমনই উপভোগ্য। বিখ্যাত কোনো পেইন্টিংএর বিবর্তন সিনেমায় দেখানো যেতে পারে। প্রথম পেন্সিলে টান থেকে শুরু করে ব্রাশের শেষ স্ট্রোক পর্যন্ত দর্শকরা পর্যায়ক্রমে পেইন্টিংটির বিবর্তন দেখতে পারে। একজন সংগীতকারকে নিয়েও এধরনের সিনেমা হয়ে থাকে, যেখানে দর্শকরা কয়েকটা সুর কী করে সিম্ফনি হয়ে ওঠে সেটা দেখে। যদিও এসবই নেহাত ছেলেমানুষি কারণ এসব থেকে একজন বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর বা একজন সুরস্রষ্টার সত্যিকার সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা প্রেরণাকে বোঝা সম্ভব না। কিন্তু কথা হচ্ছে এদের নিয়ে ছবি করলে তাদের কাজের প্রক্রিয়াটাকে দেখাবার বা শোনাবার কিছু একটা থাকে। কিন্তু কবিদের নিয়ে সিনেমা করা কঠিন। কবিদের কাজ মোটেও সিনেম্যাটিক নয়। দেখাতে হবে একজন মানুষ চেয়ারে বা সোফায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেয়ালে বা সিলিংএ। বহুক্ষণ পর সে হয়তো তার সমানে রাখা শাদা কাগজে গোটা সাতেক লাইন লিখল, আবার পনেরো মিনিট পরে হয়তো তার মধ্য থেকেই কেটে দিল এক লাইন। তারপর আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। পর্দায় এসব কতক্ষণ দেখা যায় বলুন!

কবিদের প্রেরণার কথা বলছিলাম। সাম্প্রতিককালের কবিদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রেরণা ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কি আদৌ আছে? তাহলে লক্ষ করি তারা প্রায়ই এ প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তবে বিষয়টা এমন নয় যে প্রেরণা নামের এই অন্তর্গত অনুভবের অভিজ্ঞতা এখনকার কবিদের হয় না। আসলে নিজে যা স্পষ্ট করে বুঝি না সেটা অন্যকে বোঝানো স্বভাবতই কঠিন। আমাকেও যখন কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন করে আমিও তা এড়িয়ে যাই। অবশ্য এ ব্যাপারে একটা উত্তর আমার আছে। আমি মনে করি প্রেরণা বিষয়টা শুধু কবি-সাহিত্যিকদের একার সম্পত্তি না। একদল মানুষের ভেতর প্রেরণা সবসময় দেখা দেয় এবং দেবে। এরা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যারা কাজ করে অন্তরের টানে, যাদের কাজে সবসময় ভালোবাসা এবং কল্পনার একটা মিশেল থাকে। একজন ডাক্তার বা শিক্ষক বা একজন বাগানের মালির ভেতর এই প্রেরণা থাকতে পারে। এদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাছে কাজ একটি অভিযান, একটি চ্যালেঞ্জ। সবসময় একটা কৌতূহল জারি থাকে তাদের মধ্যে। কোনো সমস্যা বা ব্যর্থতা তাদের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পারে না। একটি উত্তর পাবার পর আরো একঝাঁক নতুন প্রশ্ন ভিড় করে তাদের মধ্যে। 'আমি জানি না' এই হচ্ছে তাদের সবার প্রেরণার পেছনের মূলকথা। তবে এধরনের মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি না। অধিকাংশ মানুষই কাজ করে নেহাত বেঁচে থাকার তাগিদে। ভালোবেসে নিজের কাজ নির্বাচন করেছেন এমন মানুষ নেহাতই কম। অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনো একটা কাজকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। ভালোবাসাহীন একঘেয়ে কাজ। তবু তারা এ কাজ করে কারণ পৃথিবীতে বহু মানুষ এমনকি এই ভালোবাসাহীন একঘেয়ে এরকম একটা কাজ করারও সুযোগ পায় না। এটাকেই আমার এ পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন এক নির্মমতা বলে মনে হয়। আগামী শতাব্দীতে এই নির্মমতা যে ঘুচবে তার তো কোনো ইশারা দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং যদিও বলছিলাম যে প্রেরণা শুধু কবিদের একচ্ছত্র অধিকারের ব্যাপার না তবু একথা তো বলতেই হবে যে কবিরা হচ্ছেন সেই সৌভাগ্যবান দলের একজন যারা তাদের কাজের সঙ্গে ভালোবাসাকে যুক্ত করার সুযোগ পান।

এ পর্যায়ে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে পৃথিবীর যত স্বৈরাচারী শাসক, ক্ষমতালোভী বাক্যবাগীশ রাজনীতিবিদ তারাও তো তাদের কাজটাকে খুব ভালোবাসে এবং নিজের কাজ হাসিলের ব্যাপারে তারা বেশ সৃজনশীলও বটে। কথা ঠিক। কিন্তু সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, এদের কারো মনে 'আমি জানি না' এই ভাবনার কোনো স্থান নেই। এরা সবাই 'জানে' এবং যা জানে তাতেই তারা তৃপ্ত। এর বাইরে কিছু জানবার ইচ্ছা তাদের নেই, প্রয়োজনও নেই কারণ জানতে গেলে তাদের নিজেদের যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। প্রশ্নকে তারা ভয় পায়। কিন্তু যে জ্ঞান কোনো নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয় না তার মৃত্যু অনিবার্য। জীবনকে সচল রাখবার জন্য চাই প্রশ্নের উত্তাপ। 'আমি জানি না' তাই একথাটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা ছোট কিন্তু এর আছে উড়বার শক্ত ডানা। এই ছোট ভাবনাটি আমাদের মনের ভেতর তৈরি করতে পারে অবারিত স্থান যেখানে জায়গা করে নিতে পারে গোটা মহাবিশ্ব। আইজাক নিউটন যদি কখনো নিজেকে না বলতেন যে 'আমি জানি না' তাহলে হয়তো তার বাগানের আপেলটি এক টুকরো পাথরের মতো ঐ বাগানেই পড়ে থাকত কিম্বা খুব বেশি হলে তিনি বেঞ্চি থেকে উঠে ঐ আপেলটিতে একটা কামড় বসাতেন শুধু। মেরি কুরি যদি 'আমি জানি না' এই কথাটি নিজেকে না বলতেন তাহলে হয়তো তার জীবন শেষ হতো কোনো অভিজাত মেয়েদের স্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষিকা হিসেবে। তিনি তার মনের ভেতর 'আমি জানি না' এই ভাবনাটি সবসময় জাগরূক রেখেছিলেন বলেই তাকে একবার নয়, দুই দুইবার আসতে হয়েছে এই স্টকহোমে, যেখানে অতৃপ্ত, অনুসন্ধিৎসু মনকে ভূষিত করা হয় নোবেল পুরস্কারে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে কবি আন্তরিক আমি মনে করি তারও 'আমি জানি না' একথাটি নিরন্তর জপ করা প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে প্রতিটি সৎ কবিতা এই ভাবনাটিরই উত্তর। যদিও অবশ্য কবি যখন কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিটি লেখেন তখন তার মনে গভীর সন্দেহ নেহাতই সাময়িক, অপর্যাপ্ত, নিষ্ফল। ফলে সে কবি আবার একের পর এক নতুন উত্তর দেবার চেষ্টা করেন নতুন কবিতায়। সাহিত্য ইতিহাসবিদরা পরে জমা করেন এই অতৃপ্তিরই পেপারক্লিপ।

আমি মাঝে মাঝে এমন সব স্বপ্ন দেখি যা সত্যি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যেমন আমি একদিন নেহাত অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমি যেন গল্প করছি মহান কবি একলেসিয়াসটিসের সঙ্গে, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দাম্ভিকতায় যিনি ছিলেন ব্যথিত। দেখলাম আমি যেন তার সামনে নতজানু হয়ে তার হাত ধরে বলছি—'হে কবি, আপনি বলেছিলেন এই সূর্যের নিচে কিছুই নতুন নয়। কিন্তু কবি এই সূর্যের নিচে আপনার জন্মও তো ছিল একটা নতুন ঘটনা, যে কবিতাগুলো আপনি লিখেছিলেন সেগুলোও ছিল এই সূর্যের নিচে নতুন কারণ আপনার আগে কেউ এই কবিতাগুলো লেখেনি, আপনার যারা পাঠক তারাও তো ছিল নতুন কারণ আপনার জন্মের আগে যাদের মৃত্যু হয়েছিল তারা তো আপনার কবিতা পড়বার সুযোগ পায়নি, আর ঐ যে বৃক্ষটি যার নিচে আপনি বসেছিলেন সেটিও তো অনন্তকাল ওখানে দাঁড়িয়েছিল না। হয়তো এমন গাছ আরো ওখানে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু ঐ বিশেষ গাছটি তো ছিল না। তাই কবি একলেসিয়াসটেস আপনাকে বরং আমি প্রশ্ন করতে চাই, বলুন এই সূর্যের নিচে কোন্ বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করার কথা ভাবছেন? আগে যা বলেছেন তার সঙ্গে নতুন কী যোগ করতে চাচ্ছেন? নাকি সেসব পুরনো কথারই বিরোধী কিছু বলবার কথা ভাবছেন? আপনার প্রাথমিক পর্বের লেখায় আপনি আনন্দের কথা বলতেন, হোক না তা ক্ষণস্থায়ী, তাহলে এই সূর্যের নিচে আপনার নতুন কবিতাটি কি হবে আনন্দ নিয়েই? সে কবিতার খসড়া কি ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন? আমার অবশ্য সন্দেহ হয় আপনি হয়তো বলবেন—'আমার যা কিছু লিখবার আমি লিখে ফেলেছি। নতুন কিছু আর আমার লিখবার নেই।' কিন্তু না, পৃথিবীর কোনো কবিই এমন কথা বলতে পারেন না, আর আপনার মতো মহান কবির পক্ষে তো প্রশ্নই ওঠে না।

এ পৃথিবী বড় আশ্চর্যের জায়গা। এর বিশালত্বের পাশে আমাদের অসহায়ত্ব বড় মর্মান্তিক; মানুষ, পশু, উদ্ভিদের মনে জেগে থাকা দুঃখকষ্টের প্রতি এ পৃথিবীর উদাসীনতা বড় নির্মম। এই আশ্চর্য পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দূর মহাকাশের মৃত নক্ষত্র থেকে আলো এসে পড়ে। আমরা এই রঙ্গমঞ্চের প্রদর্শনী দেখবার একটা টিকিট পেয়েছি। যদিও সে টিকিটের মেয়াদ বড় কম, দুটো নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তা বাঁধা। অবশ্য এও ঠিক, আশ্চর্য কথাটার ভেতর একটা যৌক্তিক ফাঁদ লুকিয়ে আছে। আমরা আশ্চর্য হই তাতেই যা স্বাভাবিক নয়, যা সর্বসম্মত নয়, যা আমাদের জানা বোঝার বাইরে। কিন্তু কথা হচ্ছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তেমন স্বাভাবিক, সর্বসম্মত, স্পষ্ট পৃথিবী বলে তো কিছু নেই। ফলে আমাদের আশ্চর্য হওয়া কিছুতেই ফুরায় না। আমরা একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা করে আশ্চর্য হই।

কথা ঠিক যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি 'সাধারণ দিন', 'সাধারণ জীবন' বা 'সাধারণ ঘটনা' কিন্তু এ সবই আমাদের আটপৌরে জীবনের কথা যেখানে আমরা এতটা ভেবেচিন্তে শব্দ ব্যবহার করি না। কিন্তু কবিতার কথা তো আলাদা। কবিতায় আমরা প্রতিটি শব্দ ব্যবহার করি নিক্তি দিয়ে মেপে। ফলে সেখানে কিছুই স্বাভাবিক নয়, সাধারণ নয়। একটি পাথর বা একখণ্ড মেঘ মোটেও সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। কোনো একটি দিনও সাধারণ নয়, কোনো একটি রাতও। এমনকি কোনো একটি প্রাণ, কোনো একজন মানুষও নয় সাধারণ। অতএব মনে হচ্ছে কবিদের কাজ কখনো ফুরাবে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেনজাবুরো ওয়ের নোবেল-বক্তৃতা

(কেনজাবুরো ওয়ে জাপানের কথাসাহিত্যিক। সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে)

শেষ বিধ্বংসী মহাযুদ্ধ যখন চলছে আমি তখন নেহাত বালক। থাকতাম জাপানের প্রত্যন্ত শিহকু দ্বীপের এক অরণ্যঘেরা মালভূমিতে। যেখানে দাঁড়িয়ে আজ কথা বলছি সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে। মনে আছে সেসময় দুটা বই আমাকে মুগ্ধ করেছিল খুব। একটি 'দি হাকল বেরি ফিন' এবং অন্যটি 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব নিল' যে বইটি এই সুইডেনেরই নোবেল বিজয়ী লেখিকা সেলমা লেগারলফের লেখা। সম্ভবত হাকল বেরি ফিনের প্রভাবেই আমি সেসময় রাতের বেলা জঙ্গলে গিয়ে গাছপালার ভেতর ঘুমিয়ে থাকতাম। ঘরের চেয়ে বনে জঙ্গলেই বেশি নিরাপদ বোধ করতাম। আর ওদিকে লেগারলফের গল্পের নিল চরিত্রটি তো পাখিদের কথা বুঝতে পারে, একসময় সে নিজে হয়ে পড়ে এক ছোটখাটো ভূত এবং ভূত সেজে দুর্ধর্ষ সব অভিযানে নেমে পড়ে। নিলের ঐ অভিযানগুলো আমাকে ভীষণভাবে রোমাঞ্চিত করত। ঐ গল্পগুলো পড়বার পরই আমি আবিষ্কার করি আমার পূর্বপুরুষদের বাসভূমি এই শিহকু দ্বীপের বনজঙ্গলগুলো কতটা আনন্দময় একটা জায়গা। নিলের সাথে মনে মনে গোপনে আমার একটা বন্ধুত্ব হয়ে যায়। দুষ্ট এক বামন ভূত হয়ে এক রাজহাঁসের পিঠে চড়ে সে পুরো সুইডেন উড়ে বেড়ায় আবার একসময় ঠিকই হয়ে যায় ছোট্ট সুবোধ বালক। বাড়ি ফিরে এসে নিল চেঁচিয়ে বলে—'মা, বাবা দ্যাখো আমি আবার বড় হয়ে গেছি, আবার মানুষ হয়েছি।' পড়তে পড়তে আমার মন প্রশান্ত হয়ে যেত, আমিও নিলের সঙ্গে মনে মনে কথাগুলো বলতাম। আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করত নিলের ঐ কথাটি, 'দ্যাখো আমি আবার মানুষ হয়েছি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি যত বড় হচ্ছিলাম, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছিল। আমার পরিবার, জাপানের সমাজ, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নানা সংকট স্পর্শ করছিল আমাকে। সেসব কষ্টের দিনগুলোকে আমি পার করতে চেয়েছি শুধু লিখে। সেসময় প্রতিটা লেখা শেষ করবার পর আমার নিলের ঐ কথাটা মনে পড়ত, 'আমি আবার মানুষ হয়েছি'। এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নিজের সম্পর্কে এসব কথা বলা বোধহয় সমীচীন হচ্ছে না। তবে বিনয়ের সঙ্গে এটুকু বলতে চাই যে আমার সব লেখার পেছনেই আছে ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা এবং আমি চেষ্টা করি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে। ফলে আশা করি আমার ব্যক্তিগত জীবনের এই কথাগুলোকে আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

পঞ্চাশ বছর আগে আমার ঐ শিহকু অরণ্যে ঘুরে বেড়ানোর দিনগুলোতে, নিলের অভিযান পড়তে পড়তে আমি দুটো স্বপ্ন দেখতাম। এক, আমি নিশ্চয়ই একদিন পাখিদের ভাষা বুঝতে পারব, আর দুই, আমি হয়তো একদিন রাজহাঁসের ডানায় চড়ে উড়ে যেতে পারব নিলের দেশ সুইডেনে। বিয়ের পর আমাদের প্রথম যে সন্তানটি হলো সে ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। আমরা ওর নাম রেখেছিলাম হিকারি। জাপানি ভাষায় এর মানে হলো 'আলো'। হিকারি যখন শিশু তখন মানুষের কণ্ঠস্বরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। কিন্তু পাখির ডাকে সে চঞ্চল হয়ে উঠত। হিকারির বয়স যখন ছয় একদিন আমরা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছি তখন ঝিলের পারে ঝোপের আড়াল থেকে দুটা পাখি ডেকে উঠল। হঠাৎ হিকারি যেন সে একজন দোভাষী, যে পাখির ভাষার অনুবাদক, সেই ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওগুলো পানকৌড়ি'। এই প্রথম আমাদের ছেলে মানুষের গলায় কথা বলল। সেইদিন থেকে আমি আর আমার স্ত্রী হিকারির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। হিকারি এখন এই সুইডিসদের অনুদানে তৈরি প্রতিবন্ধীদের কারিগরি স্কুলে কাজ করে। ইতিমধ্যে সে অবশ্য সুরকার হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছে। পাখির গান হিকারিকে অনুপ্রাণিত করেছে, ওর কণ্ঠে ভাষা এনেছে, ওকে অনুপ্রাণিত করেছে সুর-রচনায়। আমি মনে করি আমার শৈশবের পাখির ভাষা বুঝবার সেই প্রথম স্বপ্নটি পুরণ হয়েছে আমার ছেলে হিকারির ভেতর দিয়ে। সেই সঙ্গে একথাটাও বলে রাখতে চাই যে আমার এ জীবন, যাবতীয় কাজ সবই অসম্ভব হতো যদি না আমার স্ত্রী আমার পাশে থাকতেন। তিনি তার নারীত্বের শক্তি আর অসাধারণ প্রজ্ঞা দিয়ে এযাবৎ আমাকে আগলে রেখেছেন। তিনি আমার কাছে নিলের গল্পের সেই রাজহাঁস। সত্যি বলতে তার পাখায় ভর করেই আমার পক্ষে সম্ভব হলো সুইডেনের স্টকহোমের এই নোবেল আসরে সুযোগ পাওয়ার। আমি তাই আনন্দের সঙ্গে অনুভব করছি যে আমার শৈশবের সেই দ্বিতীয় স্বপ্নটিও আজ পূরণ হলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাপানের প্রথম নোবেল বিজয়ী লেখক ইউসুনারি কাওয়াবাতো বহু বছর আগে এ মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার শিরোনাম তিনি দিয়েছিলেন, 'জাপান, সৌন্দর্য এবং আমি'। শিরোনামটি সুন্দর, কিন্তু অস্পষ্ট। আমি অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার করছি জাপানি শব্দের 'আইমাইনার' প্রতিশব্দ হিসেবে। এই জাপানি শব্দটিকে নানাভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। তবে কাওয়াবাতো যে সচেতনভাবে শিরোনামে এই অস্পষ্টতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়। শিরোনামটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এর অর্থ হতে হতে পারে, 'সুন্দর জাপানের জনৈক আমি' কিম্বা 'সুন্দর জাপান এবং আমি'। কাওয়াবাতো সেই বক্তৃতায় সাধারণভাবে প্রাচ্যের এবং বিশেষভাবে জাপানের স্বতন্ত্র অতীন্দ্রিয় বোধের কথা বলেছেন। এ স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে জেন-বুদ্ধবাদ। বিংশ শতাব্দীর লেখক হলেও কাওয়াবাতো নিজের ভাবনাজগৎকে তুলনা করেছেন মধ্যযুগীয় জেন সন্ন্যাসীদের কবিতার সঙ্গে। ভাষা দিয়ে সত্যকে ধরা দুরূহ, এই হচ্ছে জেন কবিতার মূল কথা। জেন কবিরা বলেন, কবিতার এক একটি শব্দ যেন এক একটি খোলস, এই খোলসের অনেক গভীরে নিহিত থাকে সত্য। তাঁরা বলেন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ না-করা পর্যন্ত কিছুতেই সেই শব্দের খোলস ভেঙে কবিতার যথার্থ সত্য অনুধাবন সম্ভব নয়।

আমি ভাবছিলাম কাওয়াবাতো কেন সেইসব রহস্যময় কবিতাগুলো অকপটে স্টকহোমের দর্শকদের সামনে পড়েছিলেন? কাওয়াবাতোর লেখকজীবনের শেষপ্রান্তের ঐ সাহসী স্বীকারোক্তির দিকে আজ আমি নস্টালজিক হয়ে তাকাই। কাওয়াবাতো ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন সাহিত্যের তীর্থযাত্রী, যে যাত্রাপথে তিনি সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ সব রচনা। সেই দীর্ঘ তীর্থযাত্রার শেষে তিনি স্বীকার করলেন প্রাচীন জাপানের সেইসব প্রহেলিকাময় কবিতাগুলো দিয়ে তিনি কতটা আলোড়িত হয়েছিলেন। এই স্বীকারোক্তির কারণেই তাঁর পক্ষে 'জাপান, সৌন্দর্য এবং আমি' নামের সেই বক্তৃতাটা দেয়া সম্ভব হয়েছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এই বলে, 'অনেকেই বলেন আমার লেখা হচ্ছে শূন্যতার কারুকাজ। কিন্তু অনুরোধ থাকবে আমার এই শূন্যতাবোধকে কেউ যেন পশ্চিমা বিশ্বের নৈরাজ্য চেতনার সাথে গুলিয়ে না ফেলেন। এই দুইয়ের আত্মিক ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন।' ডোগেন ঋতুবিষয়ক তাঁর কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'সহজাত বাস্তবতা'। তিনি যখন ঋতু-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তখন তিনি গভীরভাবে জেন-ভাবনাতেই নিমজ্জিত। এখানেও কাওয়াবাতোর অকপট, সাহসী আত্মপ্রত্যয় লক্ষ করি। একদিকে যেমন তিনি জেন দর্শন এবং প্রাচ্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন তেমনি তিনি নিজেকে বিযুক্ত করেছেন পাশ্চাত্যের নৈরাজ্যবাদী চেতনা থেকে। এভাবেই তিনি নিজেকে তুলে ধরেছেন অনাগত প্রজন্মের কাছে, যাদের ওপর আস্থা রেখেই আশান্বিত হয়েছিলেন আলফ্রেড নোবেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে সত্যি কথা বলতে আমার স্বদেশি লেখক যিনি এই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন ২৬ বছর আগে, তাঁর প্রতি আমি ততটা নৈকট্য অনুভব করি না যতটুকু করি আইরিশ লেখক ডাব্লিউ বি ইয়েটসের প্রতি। ইয়েটস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একাত্তর বছর আগে, যখন তাঁর বয়স ছিল ঠিক আমার সমান। বলা বাহুল্য আমি নিজেকে মোটেও ইয়েটসের প্রতিভার তুল্য মনে করি না। আমি নেহাতই তাঁর দূরদেশী এক ভক্ত মাত্র। ইয়েটস তাঁর মূল্যায়নে যে কবিকে উঁচু আসরে বসিয়েছিলেন সেই উইলিয়াম ব্লেক একবার লিখেছিলেন, 'এ যেন ইউরোপ, এশিয়া পেরিয়ে চীন, জাপান অবধি যাওয়া বিদ্যুৎচমকের মতো।'

গত কয় বছর ধরে আমি একটা ট্রিলজি লিখছি যাতে আমি আমার এযাবৎকালের সাহিত্য-অভিজ্ঞতাগুলোর সন্নিবেশ ঘটাতে চেষ্টা করছি। দুই খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ড আমি লিখে শেষ করেছি। বইটার নাম দিয়েছি 'একটি জ্বলন্ত সবুজ বৃক্ষ'। নামটি আমি নিয়েছি ইয়েটসের Vacilation কবিতা থেকে

> A tree there is that from its topmost bough
> Is half all glittering flame and half all green
> Aboudning foliage moistered with dew...

আমার ট্রিলজিটি সত্যি বলতে ইয়েটসের কবিতা দিয়ে খুবই প্রভাবিত। ইয়েটসের নোবেল পুরস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠানে আইরিশ মন্ত্রী ইয়েটসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর সাফল্যের মাধ্যমে একটি জাতি বিশ্বসংস্কৃতিকে তাদের অবদান রাখবার স্বীকৃতি পেল... একটি জাতি যা বিশ্বদরবারে এখনও গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি... ইয়েটসের নামের মধ্যদিয়ে আমাদের সভ্যতার মান যাচাইয়ের সুযোগ ঘটল... ধ্বংসের উন্মাদনা থেকে বেরিয়ে আসা প্রেরণাতাড়িত মানুষদের পদদলিত হওয়ার বিপদ অবশ্য বরাবর রয়েই যাবে।'

লেখক হিসেবে আমি ইয়েটসের পথ অনুসরণ করতে চাই। করতে চাই আরেকটি দেশের স্বার্থে যে-দেশটি সম্প্রতি 'বিশ্ব দরবারে' স্থান পেয়েছে। অবশ্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আর মটরগাড়ি তৈরির সুবাদে। আমি ইয়েটসের প্রেরণায় অগ্রসর হতে চাই কারণ আমিও এমন এক দেশের নাগরিক যারা একদিন নিজেদের মাটিতে এবং প্রতিবেশী দেশে 'ধ্বংসের উন্মাদনায় মেতেছিল'।

আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে এবং অতীতের তিক্ত স্মৃতিকে স্মরণ করে আমি অবশ্য কাওয়াবাতোর মতো বলতে পারছি না 'জাপান, সৌন্দর্য এবং আমি'। কিছুক্ষণ আগে আমি কাওয়াবাতোর অস্পষ্টতার কথা বলছিলাম। এখন থেকে আমি অস্পষ্টতার বদলে অনিশ্চিত শব্দটি ব্যবহার করবো। ব্রিটিশ কবি ক্যাথলিন রাইন একবার বলেছিলেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উইলিয়াম ব্লেক যতটা অস্পষ্ট তার চেয়ে বেশি অনিশ্চিত। আমি বরং আমার বক্তৃতার শিরোনাম দিতে চাই, 'জাপান, অনিশ্চয়তা এবং আমি'।

আমি মনে করি বহির্বিশ্বে উন্মুক্ত হওয়ার পর গত ১২০ বছরের আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় জাপান এখন অনিশ্চয়তার দুই বিপরীত মেরুতে বিভক্ত। লেখক হিসেবে আমিও এই মেরুকরণের ক্ষতকে বহন করি। এই অনিশ্চিতি এতটা তীব্র যে আমাদের রাষ্ট্র এবং জনগণকে তা নানাভাবে বিভক্ত করছে। জাপানের আধুনিকায়ন ঘটেছে মূলত পাশ্চাত্যকে নকল করে, অথচ জাপান একটি এশীয় দেশ এবং পাশাপাশি জাপান তার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকেও দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে। এতে যে অনিশ্চয়তার জন্ম হয়েছে তাতে জাপানকে মনে হয় যেন এশিয়ার অনুপ্রবেশকারী এক দেশ। আবার অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আধুনিক জাপান উন্মুক্ত থাকলেও তাদের কাছে জাপানের সংস্কৃতি ধোঁয়াটে, দুর্জ্ঞেয় একটা ব্যাপার। এও সত্য যে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গেও রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জাপান অনেকটাই বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেসব লেখক জাপানি সাহিত্যের অঙ্গনে এসেছেন বস্তুত তারাই আধুনিক জাপানি সাহিত্যের সবচেয়ে সৎ এবং সচেতন প্রতিনিধি। এই লেখকরা একদিকে যুদ্ধের ভয়াবহতায় গভীরভাবে ব্যথিত, অন্যদিকে নতুন এক সময়ের ব্যাপারে তীব্রভাবে আশাবাদী। এরা এশিয়ার দেশগুলোতে চালানো জাপানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার ক্ষতগুলোকে ভারাক্রান্ত মনে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে। এভাবেই তারা জাপানি বর্বরতার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বস্তুত এঁরাই ছিলেন আমার নিজের লেখার অনুপ্রেরণা।

সাম্প্রতিক জাপানি রাষ্ট্র এবং জাপানি জনগণের পক্ষে অনিশ্চিত হয়ে ওঠা ছাড়া আর উপায় নেই। জাপানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মাঝপথে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যে যুদ্ধ আধুনিকায়নেরই একধরনের ফলাফল। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় এবং যুদ্ধোত্তর লেখকদের সেসময়কার নির্মমতা এবং কষ্টকে সাহিত্যে রূপায়ণ, জাপান এবং জাপানি জনগণকে নতুন করে বেঁচে উঠবার সুযোগ করে দেয়। এই নবজন্মের নৈতিক মন্ত্র ছিল একদিকে গণতন্ত্রের উন্মেষ এবং অন্যদিকে যে-কোনো যুদ্ধ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এ মন্ত্র জেগে উঠেছিল নিজেদেরই রক্তাক্ত অতীতের ভেতর থেকে, যেখানে রয়েছে এশিয়ার অন্য দেশকে আক্রমণের ইতিহাস, রয়েছে হিরোশিমা, নাগাশাকির অসংখ্য মৃতদেহ, রয়েছে সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ার শিকার সেই মৃতদের বংশধর। (এর মধ্যে হাজার হাজার জনের মাতৃভাষা কোরিয়ান)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক জাপানি সেনাশক্তি নিয়োজিত নেই বলে সম্প্রতি জাপানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে জাপানের আরো উদ্যোগী ভূমিকা নেয়া উচিত। এ ধরনের অভিযোগে আমাদের মন ভেঙে যায়। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন সংবিধানে আমাদের একথা ঘোষণা করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে আমরা চিরতরে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করব। জাপান চিরশান্তিকে যুদ্ধের পরকালে আমাদের নবজাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আমার বিশ্বাস পশ্চিমা দেশগুলো আমাদের এই মন্ত্রের মূলভাবটি বুঝতে পারবে, যেখানে নৈতিক কারণে স্বেচ্ছায় সামরিক চাকরি প্রত্যাখ্যানকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এমনকি জাপানের ভেতরও একটি দল সংবিধান থেকে যুদ্ধ পরিত্যাগের এই নীতিকে বাতিলের চেষ্টা চালাচ্ছে দীর্ঘকাল। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগের এই নীতিকে বাতিল করার অর্থ হবে এশিয়ার জনগণ, সেইসঙ্গে হিরোশিমা, নাগাশাকির আণবিক বিস্ফোরণের শিকারদের প্রতি প্রতারণা করা। এই প্রতারণার ফল কী হবে লেখক হিসেবে তা অনুমান করা আমার জন্য খুব কঠিন কাজ না।

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সংবিধানে গণতন্ত্রের চাইতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাকে যেভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার অনেকটা জনসমর্থনও ছিল। আমাদের নতুন সংবিধানের বয়স পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো পুরনো সংবিধানের সেই নীতিকে সমর্থন করার লোকও রয়েছে প্রচুর। পঞ্চাশ বছর আগে আমরা যদি এই নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না দিতাম তাহলে যুদ্ধ-পরবর্তী ধবংস্তূপের মধ্য থেকে আমাদের এই আধুনিকায়নের প্রতিজ্ঞা, বিশ্বমানবতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করবার এই প্রতিজ্ঞা সবই হতো অসম্ভব, অর্থহীন। একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এমন আশঙ্কা আমার জাগে।

আমার বক্তৃতায় আমি যাকে অনিশ্চয়তা বলছি, তা একরকম দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বাসা বেঁধে আছে এই আধুনিক যুগের শরীরে। জাপানের প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতিও এই অনিশ্চয়তার ঊর্ধ্বে নয়। বিশ্বের ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে জাপানের অর্থনীতিকে দেখতে গেলে বোঝা যাবে এর ভেতর কত প্রচ্ছন্ন বিপদ আছে। এই অনিশ্চয়তা বস্তুত দিন দিন বাড়ছে। যারা বাইরে থেকে জাপানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন তাদের চোখে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়বে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় পৌঁছে তাকে সহ্য করবার একটা ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছিলাম, প্রতিকারের আশা আমরা তখনো হারাইনি। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে সাম্প্রতিকভাবে আমাদের বিপুল অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণে সৃষ্ট উৎকণ্ঠাকে সহ্য করার ক্ষমতাও যেন আমরা অর্জন করেছি। একটা নতুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতির যেন জন্ম হচ্ছে, যেখানে জাপানের সাফল্য বৃহত্তর এশিয়ার উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হবে।

টোকিওসহ সারা বিশ্বের ভোগবাদী জীবনের রূপায়ণ করা আমার সাহিত্যিক দায়িত্ব বলে আমি মনে করি না। আমি আরো গভীর মননশীল সাহিত্য রচনা করতে চাই। কিন্তু একজন জাপানি নাগরিকের কোন্ পরিচয়টি আমি খুঁজব? ঔপন্যাসিকের পরিচয় দিতে গিয়ে ডব্লিউ এইচ অডেন একবার বলেছিলেন—

among the just
But be just, among the filthy filthy too,
And in his own weak person, if he can;
Must suffer dully all the wrongs of the man.

লেখকের পেশা গ্রহণ করবার পর থেকে এই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার অভ্যাস।

একটি শব্দ জাপানিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বেশ যুৎসই—নম্র। জর্জ অরওয়েল যে চরিত্রগুলোকে পছন্দ করতেন তাদের বেলায় এই বিশেষণটি বেশ ব্যবহার করতেন। এছাড়া ব্যবহার করতেন 'মানবিক', 'বুদ্ধিমান', 'শান্ত'—এই শব্দগুলো। এই গুণবাচক বিশেষণগুলোর পাশে আমার ব্যবহৃত 'অনিশ্চিত' শব্দটি স্ববিরোধী মনে হতে পারে। বস্তুত বাইরে থেকে জাপানিদের যেমন দেখায় আর জাপানিরা আসলে যা হতে চায়, তার মধ্যে কৌতুককর একটা ফারাক আছে। 'মানবিক' শব্দটির বদলে আমি যদি 'নম্র' শব্দটি ব্যবহার করি জনাব অরওয়েল নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। দুটো বিশেষণই সহিষ্ণুতা আর সমবেদনার গুণাবলিকে প্রকাশ করে। জাপানিদের নম্র এবং মানবিক করে গড়ে তুলতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

আমাদের তেমন একজন পূর্বপুরুষ ফরাসি রেনেসাঁ ভাবনার পণ্ডিত প্রফেসর কাজুও ওয়াতানাবে, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যে বসেও সৌন্দর্য এবং প্রকৃতিমুখী জাপানি সনাতন বোধের সঙ্গে মানবিকতাকে যুক্ত করার সংগ্রাম করে গেছেন একা। অবশ্য বলে রাখা ভালো যে ওয়াতানাবের সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির ধারণা কাওয়াবাতোর 'জাপান, সৌন্দর্য এবং আমি' ধারণা থেকে ভিন্ন। জাপান যে প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা দেশের মডেলে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে তা এক ব্যাপক উদ্যোগ। খানিকটা ভিন্নপথে হলেও জাপানি বুদ্ধিজীবীরাও চেষ্টা করেছেন পশ্চিমের সাথে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবধান ঘুচিয়ে তুলতে। এ কাজ প্রচণ্ড পরিশ্রমসাধ্য তবে আনন্দদায়কও। সেই প্রেক্ষিতে প্রফেসর ওয়াতানাবের ফাঁসোয়া রাবেলের উপর গবেষণাটি জাপানি বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি কাজ। ওয়াতানাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে প্যারিসে পড়াশোনা করেছেন। তিনি যখন তাঁর সুপারভাইজারকে রাবেল অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন সেই বয়োবৃদ্ধ প্রখ্যাত ফরাসি অধ্যাপক এই তরুণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাপানিকে বলেছিলেন রাবেল অনুবাদ অসম্ভব, এই উদ্যোগকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, 'রাবেলেকে জাপানিতে অনুবাদের অভূতপূর্ব পরিকল্পনা'। আরেক ফরাসি পণ্ডিত বলেছিলেন, 'এ পরিকল্পনা কৌতুককর'। এইসব বাধা সত্ত্বেও ওয়াতানাবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিলেন। শুধু ফাঁসোয়া রাবেলেকে নয়, রাবেল পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব মানবতাবাদী চিন্তাবিদদের ভাবনা জাপানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আমার জীবন এবং সাহিত্যে আমি প্রফেসর ওয়াতানাবের একজন ছাত্র। আমি গুরুত্বপূর্ণ দুটা ব্যাপারে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। একটা আমার লেখার পদ্ধতিতে। আমি তাঁর করা রাবেলের অনুবাদ থেকে শিখেছি যাকে মিখাইল বাখতিন বলেছেন, 'বীভৎস বাস্তবতার রূপ কাঠামো কিম্বা জনপ্রিয় হাসিমশকরার সংস্কৃতি'। আমি জাগতিক এবং বস্তুগত কাঠামোর নীতিমালার গুরুত্ব বুঝেছি, বুঝেছি মহাজাতিক, সামাজিক, আর বস্তুগত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কটি, টের পেয়েছি মৃত্যু আর পুনর্জন্ম আকাঙ্ক্ষার অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে থাকবার তাৎপর্য, চিনেছি সেই হাসিকে যা যাবতীয় অহংতাড়িত বিষম সম্পর্ককে ধূলিসাৎ করতে পারে। এসব রূপকল্প অনুধাবনের কারণেই বোধহয় আমার মতো দূরপ্রান্তের একটি দেশের আরো দূর অঞ্চলের একজন মানুষের পক্ষে এমন একটি সাহিত্যভাষা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যার একটি আন্তর্জাতিক আবেদনও রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেই এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করি না যা নতুন অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিভূ বরং আমি সেই এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করি যার জন্ম দারিদ্র্যে, যে বহন করে চলেছে তার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য, প্রাচীন কিন্তু জীবন্ত যাবতীয় প্রতীককে আমি বহন করি। সেই ধারায় আমি নিজেকে যুক্ত করি কোরিয়ার লেখক কিম জি হো কিম্বা চীনের চোন আই ও মুজেনের সঙ্গে। এঁদের সঙ্গে নৈকট্যের মাধ্যমেই আমার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ঘটে যায়। একজন কোরীয় প্রতিভাবান কবির মুক্তির জন্য আমি অনশন করেছিলাম একসময়, একইভাবে আমি চীনের সেইসব প্রতিভাধর লেখকদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন যাঁরা তিয়েন মেন স্কয়ার ঘটনার পর তাদের বাকস্বাধীনতা হারিয়েছেন।

এছাড়া ওয়াতানাবে আমাকে প্রভাবিত করেছেন তাঁর মানবতার ধারণা দিয়েও। আমি মনে করি ইউরোপীয় সামগ্রিকতার মূল সুরে রয়েছে মানবতা। এ ধারণা মিলান কুন্ডেরার উপন্যাসের প্রেরণাবিষয়ক লেখাতেও প্রতিফলিত। ঐতিহাসিক পঠনপাঠনের ভিত্তিতে ওয়াতানাবে যেমন রাবেলের জীবনী রচনা করেছেন, তেমনি অনুপুঙ্খ জীবনী লিখেছেন এরাসমুস থেকে সেবাস্তিয়ান কাস্তেলিয়নের। এমনকি রানি মার্গারিটা এবং গ্যাব্রিয়াল ডি স্ত্রেসসহ চতুর্থ হেনরির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন নারীদের জীবনীও। এসব জীবনীর মাধ্যমে ওয়াতানাবে জাপানিদের মানবতার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সহিষ্ণুতা সম্পর্কে। সেই প্রেক্ষিতেই তিনি ডেনিস দার্শনিক ক্রিস্টোফার আরোপকে উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন, 'যারা যুদ্ধের প্রতিবাদ করে না, তারা যুদ্ধের সহযোগী।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইউরোপীয় চিন্তার মানবতাবাদী ধারাকে জাপানি মানসে স্থাপন করার মাধ্যমে তিনি সেই কথিত 'অভূতপূর্ব এবং কৌতুককর' কাজটি সামাধা করেছেন। ওয়াতানাবের মানবতাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ একজন লেখক হিসেবে আমি যেমন অক্ষরে নিজেকে প্রকাশ করে এসময়ের যন্ত্রণাকে অতিক্রম করতে চাই তেমনি আমার পাঠকদেরও সহায়তা করতে চাই যাতে তাঁরা কালের দংশনে সৃষ্ট তাঁদের অন্তরের ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে পারে। আগেই বলেছি আমি জাপানের দুই বিপরীতমুখী অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়ানো একজন দ্বিধান্বিত মানুষ। সাহিত্য আমার কাছে এই অনিশ্চয়তার ক্ষত সারিয়ে তুলবার উপায়। সাহিত্যের মাধ্যমে আমি আমার জাপানি দেশবাসীর ক্ষত উপশমের প্রার্থনা করি।

আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আরেকবার আমার প্রতিবন্ধী ছেলে হিকারির কথা উল্লেখ করতে চাই, যে পাখির গানের সূত্র ধরে বাখে এবং মোজার্টের সুরের কাছে পৌছেছে এবং শেষে নিজেই রচনা করেছে সুর। তার রচিত প্রথম সুরটি শুনে আমার মনে হয়েছিল তা প্রবল, সতেজ আনন্দে ভরা। মনে হয়েছিল সুরখণ্ডটি যেন ঘাসের উপর একফোঁটা শিশিরের উপর ঝিলঝিল করছে। এ এমন এক মনের তৈরি সুর যে কাউকে আঘাত করতে চায় না। হিকারির সেই সুর তার ছলনাহীন সারল্যেরই প্রাকৃতিক সংশ্লেষ।

কিন্তু হিকারি যখন আরো নতুন নতুন সুর করতে লাগল তখন এও আমার দৃষ্টি এড়াল না যে তার সুরের মধ্যে একটা কান্না একটা অন্ধকার আত্মার কণ্ঠ যেন ফুটে উঠছে। একজন মানসিক প্রতিবন্ধীর পক্ষে সুরসৃষ্টির এই দুরূহ কাজকে তার জীবনের অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে আমার ছেলেটি ক্রমশ আবিষ্কার করেছে তার অন্তরের গভীর গাঢ় দুঃখকে।

'কান্না এবং অন্ধকার আত্মার কণ্ঠ' হয়ে ওঠে সুন্দর, আর সুরের ভেতর সেই কণ্ঠকে প্রকাশ করার মাধ্যমে হিকারির আত্মার উপশম হয়। জেনেছি তার সুর তার শ্রোতাদের আত্মারও প্রশান্তি ঘটায়। শিল্প যে নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে সেকথা বিশ্বাসের ভিত্তি পেয়ে যাই আমি এই সংবাদে। অবশ্য আমার এ বিশ্বাসের প্রমাণ বিশেষ নেই। তবু নেহাত দুর্বল মানুষ আমি এই অপ্রমাণিত বিশ্বাসের উপর ভরসা করেই বিংশ শতাব্দীর যা-কিছু ভুল, প্রযুক্তির দানবীয় বিকাশের যা কিছু পরিণাম তার যন্ত্রণার ভার বহন করতে চাই। দেখতে চাই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী, প্রান্তিক এক মানুষ হিসেবে, লেখার মতো আমার এই ক্ষুদ্র, নম্র, মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের উপশমের সামান্য কোনো কারণ হতে পারি কি না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয় এগারো ২০০১ আমেরিকার জন্য এক 'ডোজ' বাস্তবতা

▼

ডেরিক জেড জ্যাকসন

আমেরিকার চারদিকে আজ হাহাকার, বিলাপ। এক অভূতপূর্ব যুদ্ধমুহূর্তে দেশ আজ হতভম্ব। স্মরণকালের ভয়াবহতম এক আক্রমণে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমাদের এই মাটিতে শত শত কিংবা হয়তো হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে গেল। কিন্তু এই শত্রুর হাতে ছিল না কোনো ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা, কোনো তারকা, কোনো হাতুড়ি ক্রুশ কিংবা স্বস্তিকা। এ আক্রমণের কোনো দৃশ্যমান সেনাদল নেই। আমেরিকা হতভম্ব কারণ তাদের রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী অথচ তার পেন্টাগন আজ বিধ্বস্ত। আমেরিকা হতভম্ব কারণ তারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ অথচ তার ঐশ্বর্যের যুগল প্রতীক আজ ভূলুণ্ঠিত। আমেরিকা হতভম্ব কারণ তার প্রেসিডেন্ট বলছেন, এ সন্ত্রাসকে বরদাস্ত করা হবে না অথচ তিনি জানেন না শত্রু ঠিক কোথায়। আমেরিকা হতভম্ব কারণ 'কিংকং' থেকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে'র মতো কাল্পনিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাদের দেখানো হয়েছে যে, আমেরিকা গরিলা থেকে শুরু করে ভিনগ্রহের বাসিন্দা যে-কারো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা পরাজিত হবে এবং আমেরিকাবাসী নিরাপদে বসবাস করবে। কিন্তু চলচ্চিত্র আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে অথচ কেউ আমেরিকাবাসীকে উদ্ধার করতে পারেনি। শত্রুরা কোনো মহাকাশযানে চড়ে আসেনি, এসেছে তাদের চেনাজানা উড়োজাহাজে চড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেরিকা হতবিহ্বল কারণ তারা সাধারণভাবে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের সহিংসতার, গণহত্যার ব্যাপারে উদাসীন অথচ আজ তারা বুঝতে পারছে কেউই সহিংসতার বিপদ থেকে মুক্ত নয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ৫০ হাজার মানুষ কাজ করে। আর ঐ বিধ্বস্ত বিমানটিতে ছিল আরো শতাধিক মানুষ। কারো বাবা, মা, ভাই, বোন। আমরা সবাই প্রার্থনা করছি তারা নিরাপদে ওই বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে আসুক। আজ আমরা প্রায় সবাই বিমানে ভ্রমণ করি। এ দেশে এমন কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, টিভি পর্দায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিস্ফোরিত ওই বিমানের দৃশ্য দেখেননি। বিমান এ আধুনিক যুগে একাধারে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি আর আমাদের অসহায়ত্বের প্রতীক। টিভিতে দেখে আমরা ভেবেছি আমরাও হতে পারতাম যেকোনো একটি বিমানের যাত্রী। ভাবতেও গা গুলিয়ে আসে যে, আগের রাতে ওই হাইজ্যাকাররা আমাদের এই বোস্টন শহরে নিরাপদে ঘুমিয়েছে। আমেরিকা আজ গভীরভাবে অনুধাবন করছে তাদের নাগরিক জীবনের নাজুকতা, অনুধাবন করছে যে তারা এই বিশ্বেরই একটি অংশ। নিঃসন্দেহে যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে তাতে সমস্যার আংশিক সমাধান হবে মাত্র।

আমাদের নিশ্চয় মনে আছে আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়নি কিন্তু পার্ল হারবার সব বদলে দিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ৭ ডিসেম্বর সেখানে মারা গিয়েছিল ২ হাজার ৪০০ সৈন্যসহ আরো ৪৯ জন সাধারণ মানুষ। আজ আবার আমেরিকা বাধ্য হচ্ছে নিজেকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করতে কিন্তু ইতিমধ্যে ক্ষতি হয়ে গেছে পার্ল হারবারের চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ পৃথিবীর সঙ্গে আমরা নিজেকে যুক্ত করছি? ধ্বংসস্তূপের ধোঁয়া এখনো নিভে যায়নি, ইতিমধ্যেই আমাদের মারমুখো নেতারা প্রতিশোধের চাবুক শানিয়ে তুলছেন। এক সিনেটর সেদিন টিভিতে বাতিকগ্রস্তের মতো সেই 'জারজ'দের গালাগালি করলেন। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা গর্জন করে বলছেন, সবচেয়ে সন্দেহভাজন সেই ওসামা বিন লাদেনকে যে দেশ আশ্রয় দিয়েছে তারাও এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু 'সম্পূর্ণ দায়ী' কথাটি বিপজ্জনক। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমেরিকা উপসাগরীয় যুদ্ধে 'পরোক্ষ ক্ষতি' হিসেবে কয়েক হাজার সাধারণ ইরাকিকে হত্যা করেছিল। সেটা যদি নেহাত তেলের লড়াই হয়ে থাকে তাহলে কি আমাদের উচিত হবে আবার আরেকটি দেশের, ধরা যাক আফগানিস্তানের নিরীহ নারী আর শিশুর ওপর বোমা হামলা করা? এটা বোধগম্য যে, সামনের দিনগুলোতে মৃতের সংখ্যা যত বাড়বে মানুষের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহাও তত বাড়বে। তবে এও আতঙ্কজনক যে, আমরা এমন এক সময় সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্ববাসীর সাহায্য চাচ্ছি যখন আমরা ক্রমশ পরিবেশ, বর্ণবাদ, ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষণ প্রশ্নে বিশ্বমঞ্চ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেন্টাগনে যারা আক্রমণ করছে, যারা আক্রমণ করছে আমাদের প্রাত্যহিক বিশ্বাস আর স্বাধীনতাকে তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু আমেরিকাকেও তার নিজের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। যে লক্ষ্যবস্তু দুটিকে আক্রমণ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা আমেরিকার অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতার প্রতীক, যে ক্ষমতার সঙ্গে মিশে আছে ঔদ্ধত্য। যতই নিজেদের সান্ত্বনা দিই না কেন এটিই কি সঙ্গত নয় যে, অস্ত্র নামক মৃত্যু আর ধ্বংসের যন্ত্রগুলোর সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক দেশ এই আমেরিকায় কোনো একদিন কোনো এক অশুভ শক্তি পাল্টা আক্রমণ করবে? সেদিন আমেরিকা জেনেছে যে, তার উদ্ধত আত্মা ক্ষণকালের জন্য হলেও ক্ষতবিক্ষত হতে পারে, ধূলিসাৎ হতে পারে তার অহঙ্কার। আমরা আমেরিকানরা কীভাবে এই ধুলার ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াই তার ওপর নির্ভর করবে এই যুদ্ধের পরিণতি। এই যুদ্ধের পরিণতি নির্ভর করবে কতটা বিনয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের অর্জিত ক্ষমতাকে ব্যবহার করব তার ওপর। স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের ক্ষমতাই আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। তবে এ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যতই আমরা সংযত হই না কেন, এখনো আমাদের দিকে ভয়াবহতম দুর্যোগটি নেমে আসতে পারে।

বোস্টন গ্লোব পত্রিকা থেকে
সূত্র *ইন্টারনেট*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইরাক আক্রমণ ২০০৩ আপনাকে ধন্যবাদ জনাব বুশ

▼

পাওলো কোয়েলহো

সাদ্দাম হোসেন যে তার নিজ দেশবাসী কুর্দ এবং ইরানিদের রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল আমরা তা ভুলতে বসেছিলাম। ধন্যবাদ জনাব বুশ যে আপনি তা আমাদের ভুলতে দেননি। তবে শুধু এজন্যই নয়, আরো বিবিধ কারণে ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য।

আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনার কারণে আমরা দেখতে পেলাম একটা দেশের জনগণকে এবং তার পার্লামেন্টকে কিনে ফেলা যায় না, এমনকি দু হাজার ছয়শো কোটি ডলারের বিনিময়েও নয়, যেমন তুরস্ক। আপনার কারণেই আমরা দেখতে পেলাম কী করে দুজন নির্বাচিত রাষ্ট্রনেতা অবলীলায় তার দেশের জনমতকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে, যেমন হোসে মারিয়া আসনার আর টনি ব্লেয়ার। ৯০ ভাগ স্পেনবাসী যুদ্ধের বিপক্ষে হলেও আসনার নির্দ্বিধায় সে মত উপেক্ষা করেন। ইংল্যান্ডের গত ৩০ বছরের ইতিহাসে বৃহত্তম যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ ঘটলেও ব্লেয়ার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করেন না। আপনাকে ধন্যবাদ, কারণ আপনার কারণে ব্লেয়ার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিশ্ববাসীর প্রতি ইরাকি হুমকির নিদর্শন হিসেবে 'ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা সংগৃহীত' এক দলিল পেশ করতে বাধ্য হলেন, যা অচিরেই ১০ বছর আগে এক ছাত্রের লেখা ভুয়া দলিল হিসেবে প্রমাণ হলো। আমরা ব্লেয়ারের নির্লজ্জতাকে চিনতে পারলাম। আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আপনার কারণে কলিন পাওয়েল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কাছে ইরাকি অস্ত্র কারখানার

~ www.amarboi.com ~

এমন সব ছবি উপস্থাপন করলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের নেতা হ্যানস ব্লিক্স যেগুলোকে প্রকাশ্যে ভুয়া বলে ঘোষণা করলেন। আমরা কলিন পাওয়েলের চূড়ান্ত গবেট মুখটাকে চিনলাম।

আপনাকে আরো ধন্যবাদ কারণ আপনার কারণে ফরাসি পররাষ্টমন্ত্রী দোমিনিক দু ভিলাপিন জাতিসংঘে যুদ্ধবিরোধী এমন এক বক্তৃতা দিলেন যে, তারপর অধিবেশনে দীর্ঘক্ষণ চলল তুমুল করতালি। জাতিসংঘের ইতিহাসে এমন আরেকবার ঘটেছিল কেবল নেলসন ম্যান্ডেলার বক্তৃতার পর। আপনাকে এইজন্যও ধন্যবাদ যে আপনার কারণেই সাধারণভাবে বিভক্ত আরব দেশগুলো কায়রোতে মিলিত হয়ে আপনার এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত মতামত রেখেছিল। 'জাতিসংঘকে এখন প্রমাণ করতে হবে আদৌ তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা'—আপনার এ ধরনের উদ্ধত মন্তব্যের কারণে অনেক দোদুল্যমান দেশও চকিতে আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পেরেছিল। এজন্য আপনার ধন্যবাদ প্রাপ্য। আপনার পররাষ্ট্র নীতির প্রভাবেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র অবলীলায় ঘোষণা করলেন একুশ শতকে যুদ্ধের একটা নৈতিক যৌক্তিকতা রয়েছে। আমরা তার প্রতি যাবতীয় বিশ্বাস হারালাম। এ মানুষগুলোকে চিনিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জনাব বুশ।

আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আপনি এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়েছেন যা বহুকাল কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আপনার কারণে আজ পৃথিবীর নানা প্রান্তের লাখো কোটি মানুষ একটা ভাবনাকে সামনে নিয়ে একত্র হতে পেরেছে। বহুকাল এমন ঘটেনি। যদিও অবশ্যই সে ভাবনা আপনার ভাবনার বিপরীত। আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আমরা পৃথিবীর নানা প্রান্তের লাখো কোটি মানুষ নতুন করে অনুভব করছি যে, আমাদের একত্র হয়ে আমাদের কথাটাকে সামনে তুলে ধরা সম্ভব, নাইবা সেকথা আপনার কাছে পৌঁছাল। আপনার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে দাঁড়ানো পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষকে এভাবে উপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ, কারণ ভবিষ্যৎ সবসময়েই প্রত্যাখ্যাতদের পক্ষে। ধন্যবাদ তো আপনারই প্রাপ্য, কারণ আপনাকে ছাড়া আমরা টেরই পেতাম না যে আমাদের মধ্যে মিলিত হবার এতটা ক্ষমতা আছে। এই মিলনে এবার হয়তো কাজ হলো না কিন্ত আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি কাজ ভবিষ্যতে হবেই।

আমরা সবাই মিলেও এবার যুদ্ধের দামামা থামাতে পারলাম না। কিন্তু আগ্রাসী এক সেনাপতিকে পাঠানো প্রাচীন এক রাজার ফরমানের কথা আবার স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন, 'সুন্দর হোক তোমার সকাল হে সেনাপতি, ভোরের আলো ঝলসে উঠুক তোমার সৈন্যদের তরবারিতে। কারণ বিকেলে তুমি আমার কাছে পরাজিত হবে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আপনার কারণে পৃথিবীর পথে পথে প্রতিবাদে হাত উঁচু করে দাঁড়ানো নামহীন অসংখ্য মানুষ অনুভব করলাম আমরা কতটা ক্ষমতাহীন আর ক্ষমতাহীন হওয়া কতটা ক্ষোভের, লজ্জার। এই ক্ষোভ, লজ্জা আমরা বুকে নিয়ে রইলাম।

অতএব আপনার সকালটি উপভোগ করুন জনাব বুশ। উপভোগ করুন এ বেলার যা-কিছু কথিত গৌরব আপনার। আমাদের কথার কোনো গুরুত্ব না-দেয়ার জন্য, আমাদের কথা না-শুনবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু জেনে রাখবেন, আমরা আপনার প্রতিটি কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছি, একটা কথাও ভুলছি না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব বুশ।

সূত্র *ইন্টারনেট*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আক্রান্ত ইরাক আমাদের তেল ওদের বালুর নিচে কেন?

▼

এদোয়ার্দো গালিয়ানো

মনে করে দেখুন গত বছর ঠিক এরকম সময়ে যখন প্রেসিডেন্ট বুশ এই ইরাক-যুদ্ধের বীজ বুনছিলেন তখন বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে পৃথিবীর যে-কোনো অখ্যাত, অকিঞ্চিৎকর কোণগুলোতেও আক্রমণ চালানো হবে।' বেশ, ইরাক তাহলে পৃথিবীর এক কোণের অখ্যাত, অকিঞ্চিৎকর এক দেশ? বুশের কি ধারণা যে সভ্যতা শুরু হয়েছে টেক্সাস থেকে এবং তার টেক্সাস জ্ঞাতিগোষ্ঠীই লেখ্যভাষার জন্ম দিয়েছেন? লোকটি অনেক ব্যাপারেই মূর্খ কিন্তু তিনি কি সত্যই কোনোদিন নিনিভে'র লাইব্রেরির কথা শোনেননি, বেবেলের টাওয়ার কিংবা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের কথা? তিনি কি বাগদাদ শহরকে ঘিরে গড়ে ওঠা আরব্য রজনীর ১ হাজার গল্পের কোনো একটিও জীবনে শোনেননি?

আপনারা কারা, যারা আমাদের এই গ্রহের একটি দেশে এমন একজন লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছেন? এমন একজন লোক যিনি তার নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু শুনতে পান না, যার বধির কানে রাজপথে দাঁড়ানো কোটি কোটি মানুষের যুদ্ধবিরোধী এই সোচ্চার কণ্ঠ গিয়ে পৌঁছায় না? লোকটি এমন যে প্রখ্যাত জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাসের একটি বন্ধুসুলভ পরামর্শতেও কর্ণপাত করেন না। ডাডি সিনিয়র বুশকে দারুণ একটা কিছু করে দেখানোর জন্য জুনিয়র বুশকে তড়পাতে দেখে গুন্টার গ্রাস তাকে

~ www.amarboi.com ~

মাসকয়েক আগে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'বাবাকে খুশি করার জন্য ইরাকে বোমা না মেরে বরং এ মুহূর্তে একজন মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।'

একটু পেছনে ফেরা যাক। ১৮৯৮ সাল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন উইলিয়াম ম্যাককিনলে। ম্যাককিনলে একদিন ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বর তাকে আদেশ করেছেন ফিলিপাইনকে দখল করে নিতে এবং সেখানকার মানুষকে সভ্য ও খ্রিস্টান করে তুলতে। ম্যাককিনলে জানান যে, হোয়াইট হাউসের করিডোরে মাঝরাতে ঈশ্বরের সঙ্গে তার কথা হয় তিনি এ আদেশটি পান। এক শতাব্দীরও পরে আরেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আজ সবাইকে নিশ্চিত করছেন যে, ইরাক দখলের এই অভিযানে ঈশ্বর তার সঙ্গে আছেন। আমাদের খুব জানতে ইচ্ছে হয়, হোয়াইট হাউসের কোন্ করিডোরে, রাত ঠিক কয়টার সময় বুশ এই ঐশ্বরিক বাণী পেয়েছেন? আমাদের এও জানতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বরও কেন বুশকে এবং পোপ জন পলকে দু রকম বাণী পাঠালেন?

যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্ববাসীর স্বার্থে, যে বিশ্ববাসী কিনা যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে অসুস্থ, বিবমিষা আক্রান্ত। এবং বরাবরের মতো যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শান্তির জন্য। বটেই তো শান্তির জন্য, তেলের জন্য নয় মোটেই। আচ্ছা ইরাক যদি তেল উৎপাদন না করে প্রচুর মুলা উৎপাদন করত তবে কি শান্তির জন্য ইরাক দখল এতটা জরুরি হতো? তেল কোম্পানিগুলোতে বুশ, ডিক চেনি এদের সাবেক বড় বড় চাকুরেগুলোর খবর কী? টনি ব্লেয়ারই বা সাদ্দাম হোসেনকে নিয়ে এতটা ঘোরগ্রস্ত কেন? ৩০ বছর আগে সাদ্দাম যে ব্রিটিশ-ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন এর সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে? আর ইরাক দখলের পর তেলকূপগুলো যখন ভাগাভাগি হবে তখন স্পেনের প্রেসিডেন্ট আযনারের ভাগ্যে কয়টা পড়বে? নেশাখোররা নেশাদ্রব্য শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে যেমন উন্মাদ হয়ে ওঠে, তেলে মাতাল ভোগবাদী দুনিয়া তেল মদ শেষ হওয়ার ভয়ে উন্মাদ। ওই মদ সবচেয়ে শস্তা আর সবচেয়ে বেশি আছে ইরাকে। নিউইয়র্কের এক শান্তিমিছিলের এক প্লাকার্ডে সেদিন লেখা দেখলাম 'আমাদের তেল ওদের বালুর নিচে কেন?'

আমেরিকা বলছে ইরাক বিজয়ের পর সেখানে তাদের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অবস্থানের প্রয়োজন পড়তে পারে। আমেরিকার জেনারেলরা সেদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সেদেশের মানুষকে সহায়তা করবে। এ গণতন্ত্র কি হাইতির মতো হবে, কিংবা ডোমিনিকান রিপাবলিক বা নিকারাগুয়ার মতো? গণতন্ত্রের নামে আমেরিকা সরকার হাইতিতে ১৯ বছর অবস্থান করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিল ফ্রাসোয়া দুভেলিয়েরের মতো স্বৈরাচারী সরকার। একইভাবে ডোমিনিকান রিপাবলিকে নয় বছর অবস্থান করে আমেরিকা জন্ম দিয়েছিল রাফায়েল ট্রাজেডির মতো স্বৈরাচারী। আমেরিকা ২১ বছর নিকারাগুয়ায় থেকে স্বৈরাচারী সমোজা-পরিবারের ভিত তৈরি করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার সহায়তায় ক্ষমতাগ্রহণকারী সামোজা-পরিবার সিকি শতাব্দি শাসন করে শেষে গণঅভ্যুত্থানের মুখে উৎখাত হয় ১৯৭৯ সালে। তারপরই প্রেসিডেন্ট রিগান ঘোড়ায় চেপে বসেন এবং নিকারাগুয়াকে সান্দানিস্তা বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষার জন্য ছুটে যান। নিকারাগুয়া পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটি, যেখানে সারা দেশে তখন ছিল পাঁচটি লিফট, যার একটি আবার নষ্ট। অথচ রিগান আমাদের শুনিয়েছিলেন যে, নিকারাগুয়া পৃথিবীর জন্য হুমকি। বুশ কি তার আতঙ্কগ্রস্ত পূর্বসূরির বক্তৃতাগুলোই নকল করছেন, কেবল নিকারাগুয়ার জায়গায় ইরাক শব্দটি ব্যবহার করে?

পত্রিকার হেডলাইনে লেখা হচ্ছে, 'আমেরিকা তার দেশে যেকোনো আক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত।' আমেরিকার বাজারে দেদারছে বিক্রি হচ্ছে ইনসুলেটিং টেপ, গ্যাস মাস্ক, রেডিয়েশন বড়ি ইত্যাদি। ব্যাপারটা মজার, দেখা যাচ্ছে আক্রান্তের চেয়ে আক্রমণকারী যেন বেশি ভীত। এ কি এক গণহিস্টিরিয়া? নাকি এ সত্যি এক বিপজ্জনক ভবিষ্যতের আভাস। ইরাকি তেল যদি সত্যি বিশ্বে আগুন ধরিয়ে দেয়!

আমাদের বলা হয়েছে সাদ্দাম মৌলবাদী আল-কায়েদাকে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু আমরা তো দেখেছি ইসলামি মৌলবাদীরা বরাবরই সাদ্দামকে গালিগালাজ করে এসেছে। ইরাকের সঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের কী সম্পর্ক যেখানে লোকে নিয়মিত হলিউডি সিনেমা দেখে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে ইংরেজি শেখে, খ্রিস্টানরা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আচার পালন করে, মেয়েরা সব সাহসী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়? টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনও ইরাকি নেই। বরং তাদের মোটামুটি সবাই আমেরিকার এক নম্বর ক্লায়েন্ট সৌদি আরবের।

আমেরিকারই আরেক প্রেসিডেন্টের কথা শোনা যাক। ১৯৫৩ সালে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন, "প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ ব্যাপারটা আসলে হিটলারের আবিষ্কার।" সত্যি বলতে এ ধরনের একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ আলাপ করতে এলে আমি তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে শোনার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না।

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অস্ত্র তৈরি এবং বিক্রি করে থাকে আমেরিকা। আমাদের এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমেরিকাই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা সাধারণ নাগরিকদের ওপর আণবিক বোমা ফেলেছিল। এবং সত্যি বলতে ইতিহাস ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে আমেরিকা ঐতিহ্যগতভাবে সবসময় কারো-না-কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। পৃথিবীর জন্য তাহলে কে হুমকিস্বরূপ? ইরাক?

কথা উঠেছে ইরাক জাতিসংঘের অধ্যাদেশ মানে না। তাহলে বুশ বিষয়ে কী বলা যাবে? যিনি সম্প্রতি যাবতীয় আন্তর্জাতিক আইনকে স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চপেটাঘাতটি হানলেন? কী বলা যাবে ইসরাইল বিষয়ে, যে কিনা জাতিসংঘের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আইন অমান্য করার ব্যাপারে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ? ইরাক জাতিসংঘের ১৭টি অধ্যাদেশ অমান্য করেছে আর ইসরায়েল এযাবৎ অমান্য করেছে ৬৪টি? বুশ কি দয়া করে তার প্রিয়পাত্র ইসরায়েলেও দু-একটা বোমা ফেলবেন?

জর্জ বুশের বাবা সিনিয়র বুশ ১৯৯১ সালে ইরাককে একরকম ধ্বংস করে দিয়েছেন, তারপর তাদের অবরোধের কারণে ইরাকের অনেক লোক তো আধপেটা খেয়েই বেঁচে আছে! ওখানে কীরকম বিধ্বংসী অস্ত্রই বা থাকতে পারে? অথচ ইসরায়েল যে কি না ১৯৬৭ সাল থেকে জোর করে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে রেখেছে, যার রয়েছে ঘোষিত পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার, আমেরিকার কাছে তাঁর সাত খুন মাফ। তেমনিভাবে পাকিস্তান যে কি না বীরদর্পে ঘোষণা করেছে তার পারমাণবিক অস্ত্রের কথা, সে কি না আমেরিকার বন্ধুদেশ। শত্রু হচ্ছে ইরাক, কারণ ইরাকের কাছে সেরকম বিধ্বংসী অস্ত্র 'হয়তো আছে'। সত্যি যদি ইরাকে তেমন অস্ত্র থাকত, যেমন উত্তর কোরিয়া জানিয়েছে যে তাদের আছে, তবে কি আমেরিকা ইরাককে আক্রমণ করতে এতটা তৎপর হতো? তা ছাড়া রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারেও বা কী বলা যায়? কুর্দিদের ওপর সাদ্দাম যে রাসায়নিক পদার্থগুলো ছুড়েছিল এবং যে হেলিকপ্টার থেকে ওগুলো ছোড়া হয়েছিল কে সেগুলো সাদ্দামের কাছে বিক্রি করেছিল? ওগুলো বিক্রির রসিদগুলো বুশ ঠিকমতো রেখেছেন তো?

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড র‍্যামসফিল্ড জানিয়েছেন তারা ইরাকে 'অ-প্রাণনাশক' গ্যাস ব্যবহার করবেন। এটি কি তেমন 'অ-প্রাণনাশক' গ্যাস যা রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন কিছুকাল আগে মস্কো থিয়েটারে ব্যবহার করেছিলেন এবং তাতে শতাধিক অবরুদ্ধ দর্শক নিহত হয়েছিলেন?

প্রতিদিন যে নিরীহ ইরাকিরা নিহত হচ্ছে তাদের আত্মাগুলো কোথায় যাবে? প্রেসিডেন্ট বুশের আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা রেভারেন্ড বিলি গ্রাহাম বলেছেন, স্বর্গে জায়গা খুব কম, সর্বসাকুল্যে নাকি ১৫ বর্গমাইল। স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিতরাই কেবল সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। তাহলে ভেবে দেখুন কোন্ দেশ ইতিমধ্যেই স্বর্গের সবগুলো টিকেট কিনে ফেলেছে?

আর সবশেষে পিতার কাছে এক কিশোরের প্রশ্ন

ওরা কি অনেক লোক মারবে, বাবা?

তোমার চেনাজানা কাউকে মারবে না খোকা, মারবে সব ভিনদেশি মানুষ।

সূত্র *ইন্টারনেট*

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কির ডায়েরি

(ব্যতিক্রমী রুশ চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভ্স্কির মৃত্যুর পর তাঁর ডায়েরি 'টাইম উইদিন টাইম' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। সে বছরই ঐ ডায়েরির নির্বাচিত কয়েকটি পৃষ্ঠা অনুবাদ করেছিলাম যা প্রকাশিত হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন 'নৃ'-তে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে একজন মুক্তচিন্তার চলচ্চিত্রকারের জীবনযাপনের সংগ্রাম ফুটে উঠেছে এই ডায়েরিতে।)

তারকোভ্স্কির জীবন এবং চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৩২ ৪ এপ্রিল মস্কো শহরে তারকোভ্স্কির জন্ম। মা মারিয়া ইভানোভা ছিলেন প্রতিভাধর অভিনেত্রী, বাবা অরসেনি তারকোভ্স্কি বিখ্যাত রুশ কবি ও অনুবাদক। মা'র অভিনয় আর বাবার কবিতা তাঁর মানসলোকে গভীর ছাপ ফেলে; পরবর্তীতে তাঁর ছবিতে বাবা আরসেনি তারকোভ্স্কির কবিতা ব্যবহার করেছেন। বাবা-মার বিবাহ-বিচ্ছেদের পর থেকে তারকোভ্স্কি ও তাঁর বোন মারিনা মায়ের সাথে থাকা শুরু করেন। ১৯৩৯-এ তাঁর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়।

১৯৪৩ তারকোভ্স্কি মস্কো ফিরে আসেন। স্কুলের পড়াশুনোর পাশাপাশি চলতে থাকে সংগীত ও ড্রইং-এর শিক্ষা।

১৯৫১ মস্কোর প্রাচ্য ভাষা ইনস্টিটিউট-এ যোগদান; আরবি ভাষা-সাহিত্যে পড়াশুনা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি কোর্স সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হন।

১৯৫৪ মস্কোর অল-ইউনিয়ন স্টেট সিনেমাটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট VGIK-এ কোর্সে ভর্তি হন। এখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান মিখাইল ইলিচ রম্-কে এবং তাঁর দ্বারা তারকোভ্স্কি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন।

~ www.amarboi.com ~

১৯৫৯ ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এ ডিপ্লোমা ছবি 'দেয়ার উইল বি নো লিভ টুডে' নির্মাণ।

১৯৬০ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সহপাঠী মিখালকভ কনচালোভ্ স্কির সাথে বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁর সাথে যৌথ চিত্রনাট্যে 'দি স্টিম রোলার অ্যান্ড দি ভায়োলিন' ছবিটি নির্মাণ করে VGIK-এর ডিগ্রি লাভ। এ ছবিটিতেই তারকোভ্স্কির পরবর্তী চলচ্চিত্রসমূহের চারিত্র-লক্ষণসমূহ সূচিত হয়।

১৯৬২ ভ্লাদিমির বোগোমোলভ-এর কাহিনী 'ইভান' অবলম্বনে 'ইভান চাইল্ডহুড' (৯৫ মিনিট) নির্মাণ। ছবিটি এবছরই ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'গোল্ডেন লায়ন' পুরস্কার লাভ করে।

১৯৬৬ 'আন্দ্রেই রুবিলিয়ভ' (১৮৬ মিনিট) নির্মাণ। কান চলচ্চিত্র উৎসবে রুবিলিয়ভ ব্যাপকভাবে আলোচিত ও পুরস্কৃত।

১৯৭১/৭২ পোলিশ ঔপন্যাসিক স্তানিসোয়াভ লেম-এর সায়েন্স ফিক্শন অবলম্বনে 'সোলারিস' (১৬৫ মিনিট) নির্মাণ।

১৯৭৪ তারকোভ্স্কির আত্মজৈবনিক ছবি 'দি মিরর' (১০৬ মিনিট) নির্মাণ। সোভিয়েত আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ছবিটি নির্মাণ ও পশ্চিম ইউরোপে প্রদর্শনে বিলম্বিত হয়।

১৯৭৭ তারকোভ্স্কির নির্দেশনায় লেলিনগ্রাদে, কমসোমল থিয়েটারে 'হ্যামলেট'-এর মঞ্চায়ন।

১৯৭৯ আর্কাদি স্ট্রুগাটস্কি ও বরিস স্ট্রুগাটস্কির উপন্যাস 'রোডসাইড পিকনিক' অবলম্বনে সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত তারকোভ্স্কির শেষ ছবি—'স্টকার'।

১৯৮২ মাতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ। 'নস্টালজিয়া'র শুটিং-এর জন্য ইতালি গমন।

১৯৮৩ কোভেন্ট গার্ডেন, লন্ডনে তারকোভ্স্কির নির্দেশনায় মুসরস্কির অপেরা 'বোরিস গদোনভ'-এর মঞ্চায়ন। সোভিয়েত-ইতালিয়ান কো-প্রোডকশন-এ 'নস্টালজিয়া' (১২৬ মিনিট) নির্মাণ।

১৯৮৫ 'স্যাক্রিফাইস'-এর শুটিঙের জন্য সুইডেন গমন।

১৯৮৬ তারকোভ্স্কি চলচ্চিত্র-চিন্তা ও চলচ্চিত্র-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' প্রকাশিত। তারকোভ্স্কির শেষ চলচ্চিত্র 'দি স্যাক্রিফাইস' (১৪৯ মিনিট) নির্মিত। অসুস্থ অবস্থায় সুইডেন থেকে রোমে প্রত্যাবর্তন। ২৯ ডিসেম্বর পারিসিয়ান ক্যান্সার ক্লিনিকে মৃত্যু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডায়েরির কয়েকটি পাতা

১৯৭০

১ সেপ্টেম্বর

পুরনো কাগজগুলো ঘাঁটতে গিয়ে 'আন্দ্রেই রুবিলিয়ভ'-এর উপর বিশ্ববিদ্যালয়-বিতর্কের অনুলিপিগুলো চোখে পড়ল। হায় ঈশ্বর, আলোচনার কী মান! করুণ। শুধু একজন অলোচক চমৎকার; মানিন নামের অঙ্কের অধ্যাপক, লেনিন পুরস্কারপ্রাপ্ত। বয়স তিরিশের নিচেই হবে। তাঁর ধারণার সাথে আমি একমত। অবশ্য নিজের সম্পর্কে কেউ নিশ্চয়ই ওভাবে বলবে না। তবে 'রুবিলিয়ভ' যখন তৈরি করেছিলাম আমার মাথায় ঠিক ঐ ভাবনাগুলোই ছিল। মানিনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সে বলেছিল—"সব বক্তারাই প্রশ্ন করলেন, ছবির এই তিন ঘণ্টা জুড়ে তাদের এমন একটি কষ্ট আর যন্ত্রণার অনুভূতি দেয়ার কী অর্থ? আমি এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব। যন্ত্রণার অনুভব এজন্যই জাগাতে হবে, কারণ আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে আবেগের এক অদ্ভুত রূপ দেখা দিয়েছে। পত্রিকায় ইন্দোনেশিয়ায় দুই লক্ষ মানুষকে হত্যা করার খবর পড়ে আমাদের যে অনুভূতি জাগে, সেই একই অনুভব নিয়ে আমরা পড়ি আমাদের হকি টিমের কোনো ম্যাচ জেতার খবর। দুই ঘটনার বিকট পার্থক্যকে আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা টেরও পাচ্ছি না কখন আমাদের বোধশক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। যাক, এ নিয়ে আমি বক্তৃতা দিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের মধ্যে এমন কিছু শিল্পী আছেন যারা আমাদের ঘটনার সত্যমূল্যকে উপলব্ধি করিয়ে দেন। সমগ্র জীবন ধরে তারা সেই সত্যের ভার বহন করেন। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

৫ সেপ্টেম্বর

আমাদের এই জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, যে আত্মার পরম মহত্ত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করে না তার জীবন মেঠো ইঁদুর আর বনের শেয়ালের মতোই অর্থহীন। মানুষ ধর্মের মাধ্যমে পরম শক্তির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু লাওৎসে যেমন বলেন—"জগতের যা পরম শক্তি তাকে কখনোই দেখা যাবে না, শোনা যাবে, স্পর্শ করা যাবে না।"

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

৭ সেপ্টেম্বর

এ বড় অশ্চর্যের, যখনই মানুষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয় তখনই একে অন্যকে ঘৃণা করতে শুরু করে, একে অন্যকে পেছনে ফেলতে চায়। কারণ মানুষ ভালোবাসে শুধু নিজেকেই। সমাজবদ্ধতা আসলে এক মায়া...

মানুষকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। কিংবা তিল তিল করে মানুষ একজন আরেকজনকে নষ্ট করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা আত্মার কথা বলছে তাদের নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। আধুনিক মানুষের মহত্ত্ব তার প্রতিবাদে। সেইসব মানুষকে ধন্যবাদ যারা অনুভূতিহীন বোধশক্তিহীন জনতার সামনে নিজেদের জ্বলন্ত পুড়িয়ে মেরেছে, যারা প্রতিশোধস্পৃহায় স্লোগানমুখর পোস্টার হাতে হেঁটে গেছে, যারা সগর্বে বলেছে—'না'।

১২ সেপ্টেম্বর

বাবা-মার সাথে সম্পর্কটি বড় জটিল। তাদের সাথে যখন থাকি নিজেকে আমার কখনোই প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয় না। আমার মনে হয় তারাও আমাকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করেন না। আমাদের সম্পর্ক সরল নয়, জটিল, অব্যাখ্যাত-অব্যক্ত। প্রচণ্ড ভালোবাসি তাদের কিন্তু তাদের কাছে যখন থাকি পুরোপুরি সহজ হতে পারি না। তারাও আমার কাছে কেমন লজ্জা পান, যদিও ওরা আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন।

আমরা যাদের ভালোবাসি তাদের নিয়েই মনের কোথায় যেন জেগে থাকে ভয়, লজ্জা। কে জানে কেন, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সাথে আমি অনেক সহজ বোধ করি।

আমি ওদের সবাইকে ভালোবাসি। বাবা, মা, মারিনা, সেনকা। কিন্তু কী যে হয় আমার, আমি আমার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারি না। আমার ভালোবাসা ঠিক সক্রিয় নয়। সম্ভবত শান্তিতে থাকতে চাই, হয়তো চাই বরং সবাই আমাকে ভুলে থাকে। আমি কারো ভালোবাসাও চাই না। চাই শুধু স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা তো কোথাও নেই, থাকবেও না।

২১ সেপ্টেম্বর

হেস্ বলেছিলেন—"তোমরা যাকে ভাবাবেগ বলো সেটা আত্মা আর বহির্জগতের দ্বন্দ্বের ফল।"

১৭ অক্টোবর

সমগ্র বিশ্বের মুক্তি দিয়ে কী হবে যদি তার অন্তরই মুক্ত না হয়।

১৫ নভেম্বর

গত কয় সপ্তাহ যাবৎ খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হয় আমি অসুস্থ নয়তো আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। কোনো কিছু না করেই হয়তো হঠাৎ একদিন মারা যাব। অথচ কত কিছু করবার ইচ্ছা জাগে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৭ নভেম্বর
রাশিয়ায় কি আর কোনোদিন শৃঙ্খলা আসবে? শুধু সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? এত সর্বব্যাপী চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা আগে দেখিনি। সব এক-একটা চরম মিথ্যাবাদী, জোচ্চর। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

১৯৭১

১৮ ফেব্রুয়ারি
দস্তয়ভস্কি বিষয়ক যতরকম বই আছে তাড়াতাড়ি সব যোগাড় করা দরকার। ডায়েরি, আর্কাইভ দারুণ অনুপ্রাণিত করে।

১৭ মার্চ
আন্দ্রেউশকার ছোট ছোট দাঁত উঠছে। ও-যে কী অদ্ভুত স্বর্গীয়! মনে হয় ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেই কাটিয়ে দেয়া যায় সারাটা জীবন।

১৪ আগস্ট
আমি বুঝি না কী করে সুনাম অর্জনই শিল্পচর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়। যাদের ভেতর দম্ভ দেখি—আমি নিশ্চিত হই এরা মাঝারি মানের লোক।

১৪ সেপ্টেম্বর
দস্তয়ভস্কি সবসময় দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে লিখতেন। তিনি অতিরিক্ত আলো পছন্দ করতেন না। লিখবার সময় প্রচুর সিগারেট খেতেন আর মাঝে মাঝে খেতেন কড়া চা। খুব একঘেয়ে জীবন ছিল তাঁর। তাঁর প্রিয় রং সমুদ্রের ঢেউয়ের রং। তাঁর নায়িকাদের প্রায়ই তিনি ঐ রঙের পোশাক পরাতেন।

২৯ ডিসেম্বর
কাল সিজভকে 'সোলারিস'-এর প্রিন্ট দেব। আমি জানি এরপর কমিটি থেকে, বোর্ড থেকে এমনকি সেন্ট্রাল কমিটি থেকে শুরু হবে লোকের আনাগোনা। হাঙ্গামা একটা বাধবেই। পেপারে ওরা 'রুবিলিয়ভ'-এর কোনো বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন দেয়নি। শহরে একটা পোস্টারও নেই। তবু হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। কতরকম মানুষ আমাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

১৯৭২

১২ জানুয়ারি

গতকাল সিজভ 'সোলারিস' বিষয়ে সেন্ট্রাল কমিটির সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্তব্য আমার কাছে পাঠিয়েছে। বহু জায়গায় তারা পরিবর্তন আনতে বলছে। উদ্ভট সব মন্তব্য। ওদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা মানতে গেলে পুরো ছবিটাই স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার বোধ হয় সব ছেড়ে দেয়াই উচিত। ওরা কী চায় আমার কাছে? ওরা কি ওদের নির্দেশ অমান্য করতে আমাকে বাধ্য করতে চাইছে? নাকি ওরা চাচ্ছে আমি ওদের মতামত মেনে নিই। কিন্তু ওরা তো ভালোভাবেই জানে যে আমি তা কখনোই করব না।

২১ *জানুয়ারি*

সোলারিসের যে পরিবর্তন ওরা করতে বলছে আমার পক্ষে তা করা অসম্ভব। পুরো ছবি তাতে নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা কী করতে চায়? আমি শুধু কিছু দৃশ্য পরিবর্তন করব যেটা আমার পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। এতে যদি ওরা খুশি না হয় আমার কিছু করার নেই। গতকাল ইয়ারমাসের সাথে দেখা করলাম। বললাম আমি কি কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড পরিচালক? কতদিন আমার উপর এই উৎপীড়ন চলবে? বছরে অন্তত দুটো ছবি বানাবার সুযোগ আমি পাব না? (দশ বছরেও দুটো বানাবার সুযোগ পাব কি-না কে জানে!) ওদের 'সোলারিস'-কে ছাড় দিতেই হবে নইলে আমি বড় ধরনের হাঙ্গামা বাধাব।

১৫ *ফেব্রুয়ারি*

আমি ক্লান্ত। সামনের এপ্রিলে আমি চল্লিশে পড়ব। আমাকে ওরা শান্তিতে থাকতে দিল না একদিনও। একটু নির্জনতা পেলাম না। পুশকিনের স্বাধীনতা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। আমার কোনোটাই নেই। একজনকে সুখী হওয়ার সুযোগ দেয়া হল, কিন্তু সে ঐ সুযোগ ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছে। কারণ তার ধারণা সুখী হওয়া অসম্ভব এবং উন্মাদরাই সুখী হতে পারে। শুধু টাকা দেয় বলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইচ্ছামতো কোনো নতুন চিন্তাচেতনাকে বুট দিয়ে মাড়িয়ে দিতে পারে, ছুড়ে দিতে পারে কাদায়।

২১ *ফেব্রুয়ারি*

বাগ্রাত ইয়াবাভান থেকে বিকেলে ফোন করে জানাল লা' হিউমানিতে পত্রিকায় লুই আরাগঁ নাকি বলেছেন দুটো ফিল্ম তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, গদারের 'পিয়েরে লো ফু' আর আমার 'রুবিলিয়ভ'। পত্রিকাটি যোগাড় করতে হবে।

২২ *ফেব্রুয়ারি*

আর কী আশা রইল? আগামী কয় বছর আমাকে বোধহয় বেকারই থাকতে হবে। মস্কোর ফ্লাট ছেড়ে দিয়ে আমার এখন গ্রামে চলে যাওয়া জরুরি।

২৩ *ফেব্রুয়ারি*

কী অদ্ভুত দেশ এটা! ওরা কি আন্তর্জাতিক মানের কোনো শিল্প চায় না? ওরা কি নতুন চলচ্চিত্র, নতুন বই চায় না? ওরা সত্যিকার সৎশিল্পকে ভয় পায়। যে শিল্প মানবিক সেটাই তাদের কাছে খারাপ। ওরা যা কিছু জীবন্ত, যা কিছু মানবিক, যেখানে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাকেই ধ্বংস করতে চায়।... এভাবে ক্রমশ যেমন নিজেদের ধ্বংস করবে, ধ্বংস করবে রাশিয়াকেও।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৪ ফেব্রুয়ারি
সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন জীবনে প্রথম তারা দেখছি। অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

২ এপ্রিল
"ভালো লিখতে চাইলে তোমাকে ব্যাকরণ ভুলতে হবে।"—গ্যাটে

৬ এপ্রিল
আজ চল্লিশে পড়লাম। এতগুলো বছর কী করলাম? তিনটা করুণ ছবি। এত সামান্য! কী হাস্যকরভাবে সামান্য! মূল্যহীন।

১৭ সেপ্টেম্বর
ওদেরকে ছবিটা (সোলারিস) সম্পর্কে আমার মতামত বললাম। ওরা চায় আমি যেন ছবিতে দেশের জন্য নতুন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখাই। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নতি এইসব। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম ওটা আমার লাইন নয়, আমি মানবিক বিষয়গুলো নাড়াচাড়া করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যা হোক শেষপর্যন্ত ওরা বলল এ বিষয়ে একটা পেপার লিখে পাঠাতে। ছবিটার বিষয়ে আমার পরিকল্পনাগুলো আমি আগেই লিখে পাঠিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত যে ওরা ওটার কিছুই বোঝেনি। মাসিক বেতন-বুলেটিন ছাড়া কিছু পড়ার ক্ষমতা ওদের নেই।

২৩ ডিসেম্বর
প্যারিস চমৎকার শহর। দারুণ মুক্ত লাগে ওখানে। তোমাকে কারো প্রয়োজন নেই, তোমারও কাউকে প্রয়োজন নেই।

১৯৭৩

২৭ জানুয়ারি
কী বিষণ্ন জীবন! ওদের হিংসা করি যারা রাষ্ট্রের খবরদারির বাইরে কাজ করতে পারে। আসলে এক নাটক আর সিনেমার বাইরের সবাই এখানে মুক্ত। যদিও তারা বেতন থেকেও মুক্ত, তবু ওদের কাজ করার সুযোগ আছে। আমাদের কর্তৃপক্ষগুলো এতই গবেট। ওরা কি সাহিত্য, কবিতা, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র এসব চায় না? ওরা না থাকলে জীবনটা কত সুন্দরই না হতো! আমি কাজ চাই, এর বেশি আর কিছু নয়। শুধু কাজ। ইতালির প্রেস যাকে একজন 'জিনিয়াস' বলছে সে এমন বেকার বসে থাকবে, এটা কি অন্যায় নয়?

২৯ জানুয়ারি
৫ ফেব্রুয়ারি ওরা 'সোলারিস' রিলিজ করবে। কী তাৎপর্যহীন জায়গায় এর প্রিমিয়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে। বসদের মতে এটা তেমন কোনো ভালো ছবি নয়।... আমি কোনো সুযোগসুবিধা চাইব না, তবে আমি প্রিমিয়ারেও যাব না।

আমার বোধহয় এখন বোঝা উচিত যে আমাকে কারো দরকার নেই এবং সেভাবেই ব্যবহার করা উচিত। এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। আমি তারকোভ্‌স্কি এবং মনে রাখা দরকার তারকোভ্‌স্কি একজনই, গেরাসিমভদের মতো জগৎজোড়া হাজারের একজন নই। আমার কাজ ছবি বানানো, ঐসব হৈ-চৈ, ঠেলাঠেলি নিয়ে ব্যস্ত থাকা নয়। চলচ্চিত্রের কাজ এমন একটা কাজ, অন্য আর কোনোভাবে যা করা সম্ভব নয়। কিংবা বলা যায়, এ এমন এক সৃষ্টি যা কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই করা সম্ভব এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই।

৫ ফেব্রুয়ারি

'রুবিলিয়ভ' যুগোস্লাভিয়ার আন্তর্জাতিক উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেল। 'অবৈধ' 'রুবিলিয়ভ' এ নিয়ে চারটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল।

৬ ফেব্রুয়ারি

'সোলারিস' লোকে ভালোই নিচ্ছে। একটা সিটও খালি ছিল না। কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'তারকোভ্‌স্কি দীর্ঘজীবী হোন।'

৭ ফেব্রুয়ারি

দ্বিতীয় কোনো তীর সংগ্রহে রাখতে নেই। দ্বিতীয় তীরটা হাতে থাকলেই প্রথম তীরটার ব্যাপারে অমনোযোগ থাকবে। সব সময় মনে রাখতে হবে তোমার হাতে শুধু একটা চান্স। ব্যস্‌ ঐ একটা এবং একমাত্র তীরটা দিয়েই তোমার লক্ষ্য ভেদ করতে হবে।

২০ অক্টোবর

ইউরোপের সবাই বলছে সোভিয়েতের শ্রেষ্ঠ পরিচালক তারকোভ্‌স্কি অথচ এখানে টুঁ শব্দটা পর্যন্ত নেই। যেন একটা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ তোমাকে প্রয়োজনীয় মনে করছে না, এ অবস্থাটা সহ্য করা খুবই কঠিন।

২ ডিসেম্বর

শিল্পীর একাকিত্বের যে ট্রাজেডি, সত্যান্বেষণে তার যে ক্ষয় এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

১৬ ডিসেম্বর

অবশেষে পকেট একেবারে শূন্য। ওদিকে ফ্ল্যাটের সমস্যা, ফিল্মের সমস্যা, কী যে হবে আমার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩১ ডিসেম্বর
আমি চলচ্চিত্রকে শিল্পমাধ্যমগুলোর ভেতর একটা জায়গা করে দিতে চাই।

১৯৭৪

৩ ফেব্রুয়ারি
শিল্পসৃষ্টি মানেই তো মৃত্যুকে অস্বীকার করা। অতএব শিল্পী সবসময় আশাবাদী। যদিও চূড়ান্ত বিচারে শিল্পী মাত্রই ট্রাজিক।

১৭ মার্চ
'মিরর' ভালোভাবে হচ্ছে না। ছবির বিষয়টা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। ছবিটা যে কী নিয়ে সিজভেরও কোনো ধারণা নেই। খুব বাজে অবস্থা।

২৭ জুন
কাল স্বপ্নে দেখলাম আমি মারা গেছি কিন্তু আমার আশপাশে কী হচ্ছে আমি টের পাচ্ছি। আমি অনুভব করলাম লারা আমার পাশে আছে, আরো কোনো বন্ধু যেন।

২৭ জুলাই
গতকাল ইয়ারম্যাস 'মিরর'-কে প্রত্যাখ্যান করল। ছবি নিয়ে কীসব রাবিশ আলাপ করল। ছবিটার বিন্দুমাত্র সে বোঝেনি এবং কেন যে প্রত্যাখ্যান করেছে তাও ঠিকমতো জানে না। আমি ক্লান্ত। টাকাপয়সা উপার্জনের অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে আমাকে এবং তারপর সোজা গ্রামে গিয়ে থাকা শুরু করতে হবে।

২৫ ডিসেম্বর
আমার ছবি একটি আবেগের বিস্ফোরক, যাতে আমি দার্শনিক এবং নৈতিক প্রশ্ন দিয়ে জীবনের অর্থকে স্পর্শ করতে চাই।

১৯৭৫

২ মার্চ
ইয়ারম্যাস 'মিরর'-কে কান ফেস্টিভ্যালে যেতে দিল না। কান-এ 'মিরর' নিশ্চয়ই পুরস্কার পেত, বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারত। কিন্তু ওসবে ইয়ারম্যাসের কোনো আগ্রহ নেই। ও ঐ নরম গদিতে হেলান দিয়ে থাকবে আর দেশের মহান স্বার্থ রক্ষা করবে।

১১ এপ্রিল
'মিরর' তাগানাকা এবং ভিটায়েজ হলে চলছে। কোনো প্রচার নেই, পোস্টার নেই। এবারও প্রচুর ভিড়. টিকিট পাওয়া দুষ্কর হচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৩ মে
আমি ব্রেজনেভ অথবা সুসলভকে চিঠি লিখব, আমার সম্পর্কে স্পষ্ট করে সব বলতে।

৪ জুলাই
বলা হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করো। কোনো কিছু থাকলেই না তুমি তা ত্যাগ করতে পারো। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কী আমার জানা নেই। কী করে আমি তা ত্যাগ করব!

২৫ জুলাই
উল্লেখযোগ্য পরিচালকের মধ্যে শুধু আন্তোনিওনি এসেছিলেন মস্কো ফেস্টিভ্যালে এবং বলেছেন তাঁকে 'মিরর' দেখতে না দেওয়া হলে তিনি এখনই চলে যাবেন।

১০ ডিসেম্বর
জীবনটা খুবই ছোট, কিছু নির্বোধের পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে তা কাটিয়ে দেয়ার কোনো মানে নেই... স্তাঁদাল

১৯৭৬

২৭ জানুয়ারি
গ্যাটে বলেছিলেন—"যুক্তি দিয়ে যে শিল্প যত কম বোঝা যাবে সে শিল্প তত মহৎ।"

১৮ ফেব্রুয়ারি
"একজন মহৎ মানুষ সর্বদাই সমাজের জন্য বিপজ্জনক।"—চিনা প্রবাদ

১১ ফেব্রুয়ারি
কাল রাতে বাজে একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমাকে কারাবন্দি করা হয়েছে, কী একটা ছোট কারণে। তারপর কখন যেন আমি 'মডার্ন টাইমস'-এর চ্যাপলিনের মতো বেরিয়ে এসেছি।

১৮ মার্চ
সিনেমা ছেড়ে দেয়া দরকার। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমার শৈশব নিয়ে একটা বই লেখা শুরু করব।

৫ আগস্ট
আমাকে কাফকার সব লেখাগুলো অবশ্যই আবার পড়তে হবে। কাফকা পড়লে নিশ্চয়ই আমার ভেতর একটা পরিবর্তন আসবে।

২৯ আগস্ট
কাল রাতে আবার [illegible] যেন [illegible] যাওয়া হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৩ সেপ্টেম্বর

আমরা একে-অন্যের শক্তিকে হয় অবমূল্যায়ন করি নয়তো অতিমূল্যায়ন করি। খুব কম মানুষ আছে যারা অন্যের সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে। এটা একটা বিশেষ গুণ। উঁচু মাপের মহৎ মানুষেরাই তা পারে।

২১ অক্টোবর

২৬ জানুয়ারি থেকে 'স্টকার'-এর কাজ শুরু করতে হবে।

১৯৭৭

৯ জানুয়ারি

সিনেমা কর্তৃপক্ষের এই সন্দেহ, অমন কুদৃষ্টি, পেছনে ঐসব অপমানকর মন্তব্য। আমি ক্লান্ত।

৪ জানুয়ারি

১৮৯০-তে লেখা চেকভের একটা চিঠি—"ঈশ্বরের পৃথিবী সুন্দর। একমাত্র যা খারাপ সেটা হল এই আমরা। কী সামান্য ন্যায়-অন্যায় বোধ আমাদের, কী সামান্য বিনয়, দেশপ্রেম নিয়ে কী দুর্বল ধারণা আমাদের। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী আমরা নাকি আমাদের দেশকে ভালোবাসি, কোথায় তার প্রকাশ? জ্ঞানের বদলে উগ্রতা আর আত্মপক্ষ নিয়েই ব্যস্ত আমরা। কঠোর পরিশ্রমের জায়গায় অলসতা, সম্মান বলতে শুধু পোশাকের সম্মান

২৩ জুন

ভুল এ জীবন। একজন মানুষের সমাজের কোনো দরকার নেই বরং সমাজেরই মানুষকে দরকার। মানুষ তো পশু নয় যে তাকে দলবদ্ধ থাকতে হবে। সে থাকবে একা, প্রকৃতির কাছাকাছি।

২৮ ডিসেম্বর

"দুর্বলতাই মহৎ, দৃঢ়তা তুচ্ছ। মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন সে দুর্বল, নমনীয়। মানুষ যখন মারা যায় তখন সে দৃঢ় এবং অনুভূতিহীন। একটি গাছ কেবল বড় হচ্ছে তখন সে দুর্বল, নমনীয় এবং যখন [illegible] তখন তা মৃত। দুর্বলতা জীবনের সহচর, দৃঢ়তা মৃত্যুর।"—[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৭৮

৭ এপ্রিল

লারা এবং আমি প্যারিসে 'মিরর'-এর প্রিমিয়ামে গিয়েছিলাম। 'মিরর' ওয়ানে দারুণ সফল, সব বসই অবাক। মে'র মাঝামাঝি স্টকারের কাজ শুরু করতে হবে।

'রুবলিয়ভ' ছবিটাকে এযাবৎকালীন পৃথিবীর ১০০টি শ্রেষ্ঠ ছবির তালিকায় স্থান দেয়া হয়েছে।

৯ এপ্রিল

প্রথম দেখাতেই কোনো মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা খুব কঠিন, কষ্টকর। আদৌ কি তা সম্ভব? আমি প্রায়ই ভুল করি। জীবনের গতিটাকে বদলানো দরকার। থেমে আবার নতুন করে শুরু করা দরকার। হেরমান হেস্‌ পড়তে দারুণ লাগছে।

১৪ এপ্রিল

এই ছবিগুলো আমাকে বিদেশে গিয়ে বানাতে হবে—

দি হোর্ডে
ডক্টর ফস্টাস
হ্যামলেট (ছবি)
হ্যামলেট (মঞ্চ থেকে)
ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট
দি রিনানসিয়েশন
জোয়ান অব আর্ক
হু স' দি ফক্স
জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স
হফম্যানিয়
ইতালিয়ান জার্নি

২৮ এপ্রিল

গ্যাটে বলেছিলেন—"তুমি যদি কবিকে বুঝতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই কবির মাতৃভূমিতে যেতে হবে।"

২০ সেপ্টেম্বর

"জন্ম মানে ঘুমিয়ে পড়া; তারপর এই জীবনজুড়ে যা-কিছু ঘটে তা সব স্বপ্ন। মৃত্যু মানে ঘুম থেকে জাগা। কেউ যদি অল্পবয়সে মারা যায় তাহলে বুঝতে হবে যথেষ্ট ঘুম হবার আগেই তাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছে, তার মানে তার ঘুম সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং বারবার তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল, শেষে সে নিজেই ঘুম থেকে উঠে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বসেছে। যে আত্মহত্যা করেছে সে দুঃস্বপ্ন দেখছিল যার সমাপ্তি সে টেনেছে; কারণ সে জেনেছে যে সে ঘুমাচ্ছিল এবং সচেতনভাবে সে তার ঘুম ভাঙিয়েছে।"—তলস্তয়

এত বছর যাবৎ মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে আছে তবু এখনো সে নিশ্চিত হতে পারল না তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী? কী অর্থ তার জীবনের? এ বড় আশ্চর্য হেঁয়ালি।

২৩ ডিসেম্বর

কিছুদিন যাবৎ আমার শুধু মনে হচ্ছে, যা দিনে দিনে আরো তীব্র হচ্ছে তা হল—আমাকে যেন খুব ট্রাজিক কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এবং আমি আরো গভীরভাবে কাজ করার, কিছু সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করছি।

'স্টকার' নিয়েও কি ওরা ঝামেলা বাধাবে? সেদিন 'মিরর' ছবির আলোচনায় অংশ নিলাম। অনেকরকম মন্তব্য পেলাম। এখন বলেছে—"আন্দ্রেই, আপনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ। আপনি রুশ শিল্পকে আবার তলস্তয় এবং গোগোলের স্তরে উন্নীত করেছেন।"

৩১ ডিসেম্বর ফ্রান্সে 'মিরর' শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছে। আমেরিকা ছবিটা কিনে নিয়েছে। গবেট ইয়ারম্যাস এসব দেখুক।

১৯৭৯

১০ ফেব্রুয়ারি

এ যাবৎ যে কয়টা ছবি বানিয়েছি তার মধ্যে 'স্টকার'ই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হতে যাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমি আমার ছবিগুলো সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করি। আমার ছবিতে প্রচুর বাজে ব্যাপার আছে, তবে স্টকারে হয়তো কিছুটা কম। কিন্তু অন্যদের ছবিগুলো তো আরো বাজে।

১৩ এপ্রিল

'ভয়েস অব আমেরিকা' বলেছে আমেরিকান ডাক্তাররা আসছে ব্রেজনেভের ব্রেইন টিউমার অপারেশন করতে। ওর মৃত্যুর পর কী ঘটবে এখানে? কোথায় যাবে দেশটা? ঈশ্বরই জানে! একটা ব্যাপার নিশ্চিত বলা যায় অবস্থা আরো খারাপ হবে। বুঝতে পারছি 'স্টকার'কে কোনো ফেস্টিভ্যালে পাঠানোর সম্ভাবনা নেই।

২৩ এপ্রিল

আমার সম্পর্কে নেইয়া জোরকায়া যে নিবন্ধ লিখেছেন তার বিরুদ্ধে একজনের ব্যক্তিগত চিঠি—"আমি তারকোভ্স্কির ছবির সামান্য একজন দর্শক। তার ছবিগুলোকে আমার মোটেও রহস্যময় সাংকেতিক ভাষা মনে হয় না। আমি তারকোভ্স্কির চিন্তাগুলো বুঝতে পারি, বুঝতে পারি তাঁর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা, রাশিয়া নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্নতা। তারকোভ্স্কির ছবিগুলো সম্ভবত আঙ্গিকের দিক থেকে কখনো জটিল এবং এ-ও সত্য আপনি যেমন বলেছেন যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রমিক ক্লাবের সদস্যরা সেসব ছবি বোঝে না। কিন্তু সে দায়টা তারকোভ্‌স্কির নয় বরং আমাদের দর্শকদের যাদের অশিক্ষিত সমালোচকদের লেখা গেলানো হয়।

জনাবা জোরকায়া, আমি কি আপনাকে একটা ছোট্ট উপদেশ দিতে পারি? আপনার ঠোঁটের উপর শালীনতার একটা ন্যূনতম পর্দা দেবেন, যখন কোনো মহৎ শিল্পীর নাম উচ্চারণ করবেন।"

২ জুন
"জিনিয়াস হল সেই নিগ্রো যে তুষারের স্বপ্ন দেখে"—নবোকভ

যে-কোনো কাজের মানের একটা উঁচু স্তর আমি রক্ষা করতে চাই। যেমন অ্যাটলাস তার কাঁধে পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে। সে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর সেটা ছুড়ে ফেলে দিতে পারত। কিন্তু তা করেনি, যেভাবেই হোক ধরে রেখেছে। এই মিথের লক্ষণীয় দিক এই যে, এখনো তার মোহভঙ্গ হয়নি এবং সেটা ছুড়ে ফেলে দেয়নি।

৫ অক্টোবর
মা বেলা একটায় মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় মা বোধহয় খুব কষ্ট পাননি। কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে আমরা কী-বা জানি, যেখানে জীবন সম্পর্কেই আমরা কিছু জানি না।

৩ ডিসেম্বর
মস্‌ ফিল্ম স্টুডিওতে নিচের ছবিগুলো বানাতে চেয়ে আবেদন করেছি—

নস্টালজিয়া	—চিত্রনাট্য তারকোভ্‌স্কি আর গুয়েরা
দি ইডিয়ট	—দস্তয়ভ্‌স্কির উপন্যাস
দি স্কেল	—লভ তলস্তয়ের শেষ বছরগুলো নিয়ে চিত্রনাট্য
ডেথ অব ইভান ইলিচ	—তলস্তয়ের গল্প
দি মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা	—বুলগাকভের উপন্যাস
দি ডাবল	—দস্তয়ভ্‌স্কির জীবনভিত্তিক ছবি।

২৫ ডিসেম্বর
আমি নিশ্চিত যে, এতদিন যেভাবে জীবন কাটালাম সেভাবে মোটেও আর কাটানো চলে না। এত সামান্য কাজ। মাঝে মাঝে আমাকে ছেয়ে থাকে হতাশা—জীবনের সামগ্রিকতার বোধকে ধ্বংস করে দেয়, কাজ করার জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। পারব কি তেমন জীবনযাপন করতে? কতটুকু জীবন বাকি আছে আমার?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯৮০

৬ ফেব্রুয়ারি

আমার 'জাক্সটাপজিসন' বইটা ওরা ছাপাবে না জানতাম। পাণ্ডুলিপিটা ইতালিতে নিয়ে ছাপাতে হবে।

কী ভয়ানক অনিশ্চিত সময়! কী যে আছে সামনের দিনগুলোতে! কী যে হবে রাশিয়ার! ঈশ্বর রক্ষা করো।

১৮ মার্চ

চলচ্চিত্র পরিচালকদের সমিতিতে আমাকে যেতে বাধ্য করা হল। সে এক বিভীষিকা। আমাকে কথা বলতে হল সম্পূর্ণ মনের বিপক্ষে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখনো কর্তৃপক্ষের কোথাও বক্তৃতা দেব না। একপর্যায়ে, শেষে এঙ্গেলসকে কোট করে বলতে হল—"যে শিল্পে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি যত প্রচ্ছন্ন থাকে সে শিল্প তত মহৎ।" জিমিয়ানিন ছিল মিটিঙে। ও নিশ্চয়ই জীবনে এক লাইনও এঙ্গেলস পড়েনি, ভেবেছে আমি খেপাবার জন্য ওটা বলেছি।

২৪ এপ্রিল

শরীর খুব খারাপ লাগছে, গলা ব্যথা করছে, ভীষণ জ্বর, ক্রমশ কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

২৫ এপ্রিল

'নস্টালজিয়া'র স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আরো প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

১৫ মে

রডি ফোন করে জানাল কান ফেস্টিভ্যালে 'স্টকার' দারুণ সাড়া জাগিয়েছে, কুরোশাওয়ার 'দি ডাবল' ছবিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

২ জুন

রডি একটা ইন্টারভিউ করল আমাকে। আমাকে দান্তের সাথে তুলনা করল। ও ঠাট্টা করার লোক নয়।

৬ জুন

কোথায় রসেলিনি, ককতো, রেনোয়াঁ, ভিগো? কোথায় হারিয়ে গেল কবিতা? শুধু টাকা, টাকা আর ভয়... ফেলিনি ভীত, আন্তোনিওনি ভীত। শুধু একজন, যে কোনোকিছুকেই ভয় করে না সে হল—ব্রেসোঁ।

২১ জুন

পৃথিবীকে মহাধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারে কেবল ভালোবাসা আর সৌন্দর্য। এছাড়া সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধ্বংস তো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২২ জুন
মানুষ কী অদ্ভুত ভাবেই না বেঁচে থাকে! তারা সব বৈরী পরিস্থিতির শিকার হয় অথচ বুঝতে পারে না তাদের এই জীবনযাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে মুক্তভাবে বেঁচে থাকার জন্যই। জীবনের সবটুকুই তো বিভীষিকা; কেবল মনের ঐ স্বাধীনতাটুকু ছাড়া।

১০ নভেম্বর
"শিল্পীর সবচেয়ে স্পষ্ট ইমেজটিও শেষ অবধি স্পষ্ট নয়। বরং যেমন আমাদের মাথার উপরের ঐ স্বচ্ছ আকাশের দিকে যখন আমরা তাকাই তাকে আর কেবল নীল মনে হয় না, মনে হয় গাঢ় ছায়াময়, গভীর, অতল কিছু। কোনো মহৎ শিল্পীর কাজের স্ফটিক-স্বচ্ছতার দিকে তাকিয়েও এর অতল গভীরতায় উদ্বিগ্ন হতে হয়। ঐ গভীরতার তল স্পর্শ করতে গিয়ে আমাদের হতবাক হয়ে থাকতে হবে।"—আন্দ্রে বেলে

১৯৮১

২০ জানুয়ারি
প্রেসিডিয়ামের কংগ্রেসের কাছে আমি একটা চিঠি লিখব যে, গোসিস্কো যেভাবে আমার ছবি ডিস্ট্রিবিউট করছে তাতে আমি আমার সংসার চালাতে পারছি না। ওরা কি আদৌ আমাকে চায়? যদি নাই বা চায় তাহলে আমাকে পুরস্কার দেয়া হল কেন?

২২ জানুয়ারি
'স্কটার' ছবিটাকে পার্টি ক্ষতিকর ছবি হিসেবে ঘোষণা করেছে। পার্টি থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা যাতে ছাত্রদের না-দেখানো হয়, তাতে তাদের নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৭ মার্চ
কাল স্বপ্নে চমৎকার একটা রূপকথার দৃশ্য দেখলাম, বিশাল প্রান্তর, সূর্যালোক, চারদিকে অনাবিল প্রশান্তি। আমি আর লারিসা যেন জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখছি। সেই সুখ কি কোনোদিন আসবে আমাদের জীবনে?

২৫ মার্চ
যত বিদ্যা তত বেদনা, যে তার জ্ঞানকে বাড়াচ্ছে সে আসলে তার দুঃখকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে; কষ্টকেই বাড়াচ্ছে।

৪ মে
কী অস্বাভাবিক গর্ব আর অন্ধত্বে ভরে আছে আমাদের মন। আমরা জ্ঞান, বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্বপ্ন নিয়ে কথা বলি কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এগুলো নিয়ে সবাই যখন বক্‌বক্‌ করে আসলে সবার মাথায় তখন ঘোরে সম্পূর্ণ অন্য কিছু।

২৪ মে

আমাদের জাগরণ আমদের নিদ্রার চেয়ে অন্ধ, আমাদের জ্ঞান আমাদের উন্মাদনার চেয়ে অজ্ঞ, আমাদের কল্পনা আমাদের যুক্তির চেয়ে মূল্যবান।

১ জুন

চলচ্চিত্রকারদের কংগ্রেসে কালিদজানভ আমার সম্পর্কে বলল—"উনি নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাধর পরিচালক এবং আমি বলতে চাই এটা খুবই দুঃখজনক যে উনি কেবল কিছু বোদ্ধা দর্শকের জন্যই ছবি করবেন। আমাদের জন্য এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার হতো যদি তারকোভ্‌স্কি এমন নতুন কোনো ছবি করতেন যা আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করত—যা লক্ষ লক্ষ সাধারণ দর্শক দেখে বুঝতে পারত এবং মুগ্ধ হতো।"

৪ জুন

স্বাধীনতার চিন্তায় আমি মোহগ্রস্ত হয়ে থাকি। আমার যদি স্বাধীনতা না থাকে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করি।

৮ জুন

কী করে একজন মানুষ বাঁচতে পারে, কী আশা কী লক্ষ্য নিয়ে সে বাঁচবে, যখন তাকে ঘিরে আছে ঘৃণা, স্বার্থপরতা, নির্বুদ্ধিতা?

১৫ জুন

আমি সবসময় আক্ষেপ করি, আমি আজ আর ততটুকু জ্ঞানী নই, যতটুকু ছিলাম সেই জন্মের দিনটাতে।

৩১ জুলাই

আমি একজন ব্যক্তির মধ্যে পুরো জাতিকে দেখি এবং পুরো জাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিকে।

৪ আগস্ট

অবশেষে আজ 'নস্টালজিয়ার' স্ক্রিপ্ট অনুবাদ শেষ হল। স্ক্রিপ্টটা সত্যিই ভালো হয়েছে।

১৪ আগস্ট

সত্যকে কখনো সত্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় সত্য অর্জনের পথে। সত্যান্বেষার পথটাই যথার্থ সত্য।

২২ আগস্ট

হাত একেবারে শূন্য। আন্দ্রেউশকার জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছি, ওকে তাড়াতাড়ি স্কুলে পাঠাতে হবে, ওর একটা রুম দরকার, কিছু কাপড়চোপড় দরকার। কী বিশ্রী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শোচনীয় অবস্থা আমার! ডাক্তার বলেছে ওর মাথার অপারেশন করতে হবে, তারপর বলা যাবে ভালো হবে না খারাপ কিছু ঘটবে, কিন্তু এই নাকি রোগের শুরু।

২৩ আগস্ট

এত বিষণ্ন লাগছে কেন আমার? অন্তত স্বপ্ন দেখে আমি কিছুটা মুক্তি পেতাম কিন্তু কিছুদিন কোনো স্বপ্নও তো দেখছি না, কোনো দিন তো এত নিঃসঙ্গ বোধ করিনি!

১৯৮২

৯ জানুয়ারি

কত হাজার বছর ধরে মানুষ সুখী হতে চেষ্টা করছে কিন্তু সে আজও সুখী নয়। কেন? কারণ তার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ সে সুখী পথটাই জানে না—কারণ দুটোই। সবচেয়ে বড় কারণ আসলে এই পৃথিবীতে আমাদের পরিপূর্ণ সুখী হওয়া উচিত নয়। সুখের প্রত্যাশায় যন্ত্রণা থাকা উচিত, ভালো-মন্দের এই দ্বন্দ্বেই এগিয়ে যাবে আমাদের সত্তা।

১৩ ফেব্রুয়ারি

"বাস্তবতা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার তো আমি কিছু দেখি না। বাস্তবতা বাস্তবতার জায়গায় বহাল থাকবে এবং আমাদের চমৎকার জিনিসগুলোর দিকে লক্ষ করবার আছে। বাস্তবতা নিয়ে তৃপ্ত থাকার কিছু নেই, বাস্তবতাকে শ্রদ্ধা বা পূজা করারও কিছু নেই। হতাশাব্যঞ্জক, আনন্দহীন বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় হল বাস্তবতাকে অস্বীকার করা এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করা যে আমরা বাস্তবতার চেয়েও শক্তিমান।"—হেরমান হেস

৩ মার্চ

কিছু বলার আগে নিশ্চিত হয়ে নাও তুমি আসলে কী বলতে চাচ্ছ। শুধু যা দরকার এবং সঠিক কেবল ততটুকুই বলো। নিজের যুক্তিকে খুব বড় করে তুলো না এবং মনে কোরো না যে তুমি অন্যদের চেয়ে ভালো জানো। আত্মসমালোচক হও। নিজেকে অন্যদের চেয়ে অযোগ্য ভাবো।

৪ এপ্রিল

দেখলাম তলস্তয় বোনাটিনের কাছে এত চিঠিতে নিঃসঙ্গ আনন্দ-বেদনার কথা লিখেছেন।

১৬ এপ্রিল

আমাদের বাহ্যিক জীবনটা বিশ্রী, যেমন বাচ্চা জন্মের ব্যাপারটা বিশ্রী, যদি না আমরা তাকে আবেগ দিয়ে দেখি। খাওয়া থেকে মলত্যাগ পর্যন্ত এই বস্তুজগৎটা কী বিশ্রী, বাজে! শুধু নিজের [illegible] প্রত্যাশা করা সত্যিই ন্যক্কারজনক একটা ব্যাপার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

২৭ এপ্রিল

আইজেনস্টাইন বলেছেন—"বিজ্ঞান বস্তুজগতের যতই নতুন আবিষ্কার করছে ততই আমরা এমন সব বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছি যা কেবল বিশ্বাস দিয়েই সমাধান করা সম্ভব।"

২ মে

'পজেশন' নামে একটা আমেরিকান ছবি দেখলাম—হরর, ভায়োলেন্স, থ্রিল এসবেরই এক উদ্ভট, অদ্ভুত মিশ্রণ। কী বীভৎস ছবি! শুধু টাকা, টাকা, টাকা! সত্য, সুন্দর সততা— এগুলোর কোনো তোয়াক্কাই নেই। শুধু মুনাফার ধান্দা। হলে বলে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছিল; শুধু টিকিট বিক্রির কথা চিন্তা করে মানুষ যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পারে!

গতকাল রাতে কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ঘুম ভেঙে গেলে বসে থাকলাম।

১৯৮৩

২২ মে

কান (ফেস্টিভ্যাল) থেকে ফিরলাম। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমি খুব ক্লান্ত। 'নস্টালজিয়া' ৩টা পুরস্কার পেল। প্রচুর অভিনন্দন পেলাম। আমার ছবি যাতে পুরস্কার না পায় বান্দারচুক তার কতরকম চেষ্টাই না করল। পুরস্কার পেলে আমার বাইরে কাজ করার সুযোগ আরো বাড়বে—সেটা ওরা ঠেকাতে চেয়েছিল।

২২ মে

আমার মনের যা-কিছু বাধা আমাকে আত্মিকভাবে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না—আমি তা অতিক্রম করতে চাই। প্রভু, আমাকে একজন শিক্ষক দাও, আমি যে বহুদিন তার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

২৫ মে

বাজে একটা দিন। কী ভয়ানক সব ভাবনা, আমার ভয় করছে। যাব-টা কোথায়? রাশিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়, রোমেও আমি থাকতে পারছি না।

১৯৮৪

৬ ফেব্রুয়ারি

ওতর ইয়োসেলিয়ানি বলল, কমিটি নাকি আমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওর শুটিং শেষ। মস্কো থেকে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। ও অবশ্য যেতে ভয় পাচ্ছে না, শেভার্দনাদজে নাকি ওর সাপোর্টে আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৮ নভেম্বর
কাল রাতে আবার আমি বাজে স্বপ্ন দেখলাম। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে চমৎকার একটা লেক। দেখলাম ভোর হচ্ছিল, দূরে লেকের ধারে অদ্ভুত সুন্দর ক্যাথিড্রালের দেয়াল দৃশ্যমান। কী ভীষণ বিষণ্ন লাগল; কী ভীষণ যন্ত্রণা!

১৯৮৫

৬ মার্চ
সুইডেনে শুটিং (স্যাক্রিফাইস) শুরু করতে হচ্ছে ঠিক সকাল ৯ টায়। একটু দেরি হলে চলবে না। ছবি করা কি অফিস করার মতো ব্যাপার নাকি যে এতটার সময় শুরু হবে, এতটার সময় শেষ হবে। ছবি করা একটা সৃষ্টির ব্যাপার। এরা এটা বোঝে না।

৯ মার্চ
লাওৎসে বলেছিলেন—"সৎ মানুষ কখনো ধনী হতে পারে না আর ধনী মানুষ কখনো সৎ হতে পারে না।"

সবচেয়ে দরকারি হল সময়ের ভেতর থেকে সময় বের করা। এ ছবিটা শেষ করেই 'ফ্লাইং ডাচম্যান'-এর কাজ শুরু করতে হবে। ব্যাপারটা খুবই কঠিন কিন্তু তা আমাকে করতেই হবে।

১০ মার্চ
অবিশ্বাস্য! ইয়েভতেশেঙ্কুকে নাকি হলিউডে ডাকা হয়েছে পরিচালক এবং অভিনেতা হিসেবে। সে তাঁর লেখা স্ক্রিপ্টে নাকি 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' পরিচালনা করবে, আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না। সব কি পাগল হয়ে গেল। লন্ডন, ইতালি, আইসল্যান্ড, ফ্রান্সে 'তারকোভ্‌স্কি কমিটি' হয়েছে; ওরা আমার হয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে।

১১ নভেম্বর
পালমি বলল—দুটো সম্ভাবনা আছে।

আমার ছেলেকে সুইডেনে আনার জন্য মিনিস্টারের কাছে আমার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখা। আমার পক্ষে সেটা অসম্ভব।

আমার হয়ে সে সোভিয়েত সরকারের কাছে আমার ছেলেকে দেশত্যাগের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দেবে। এটা তা-ও চলতে পারে।

ডাক্তার স্পেশালিস্টের কাছে X-Ray পাঠিয়েছে, কাল কাশির সাথে রক্ত গেল। আজও প্রচুর। লারিসাকে ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৮ নভেম্বর
আমি ভীষণ অসুস্থ। আমার মাথার পেছনে ভয়ানক কিছু একটা যেন সব পেশি, নার্ভ, ধমনিকে চাপ দিচ্ছে। ছবিটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে।

১০ ডিসেম্বর
ছবিটা (স্যাক্রিফাইস) আন্দ্রিউশকাকে উৎসর্গ করব। লিখব—"আমার ছোট ছেলে আন্দ্রিউশকার উদ্দেশে—যাকে কষ্ট দেওয়া হল অহেতুক, যেন সে বয়স্ক একজন মানুষ।"

১১ ডিসেম্বর
যত বয়স বাড়ছে মানুষকে আমার তত রহস্যময় মনে হচ্ছে। আমার দৃষ্টি থেকে তারা যেন ফসকে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আমার পর্যবেক্ষণের নিজস্ব নিয়মগুলো নষ্ট হচ্ছে এবং আমি মানুষকে বিচার করার ক্ষমতাও হারাচ্ছি। পর্যবেক্ষণের নিয়মকানুন ভেঙে যাওয়া একদিক দিয়ে ভালোই কিন্তু পুরো সিস্টেমটাই ধসে পড়লে সেটা কেমন হবে? আমি কি সবকিছু হারাচ্ছি? ঈশ্বর রক্ষা করো। আমার কী হয়েছে? যক্ষ্মাটাই কি বাড়ছে? না-কি নিউমোনিয়া, শেষে ক্যান্সারই ধরল আমাকে? ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ সঠিক তথ্যটা জানা যাবে।

১৩ ডিসেম্বর
একটি কালো শুক্রবার। ক্লিনিকে গেলাম। ডাক্তাররা আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করল, একটু বেশি ভালো যেন। আমার বাম ফুসফুসে কিছু একটা...। ডাক্তার বলল—আমি কি অপারেশন করাতে চাই? আমি বললাম—কী লাভ অত কষ্ট করে।

১৫ ডিসেম্বর
মানুষ জানে যে একদিন তাকে মরতে হবে কিন্তু সে জানে না সেটা কখন, কবে। ভবিষ্যতের কোনো এক অনিশ্চিত মুহূর্তের মধ্যে সেই দিনটিকে সে নির্ধারণ করে রাখে। কিন্তু আমি সে মুহূর্তটিকে জানি।... কী যে ভীষণ কষ্ট! লারিসাকে আমি কী করে সব বলব?

১৯৮৬

১২ জুলাই
গতকাল মাঠে গিয়ে আমার কী যে হল—আমি জুতা খুলে ফেললাম। খালিপায়ে হাঁটলাম কিছুক্ষণ। পৃথিবীটা কী শীতল!

৬ ডিসেম্বর
আন্দ্রেউশকার সাথে সিনেমা আর সাহিত্য নিয়ে আরো কথা বলতে হবে। ও জানে তা পরখ করে দেখা দরকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৫ ডিসেম্বর

বিছানা থেকে আর উঠতে পারছি না। পেটে, পিঠে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছি। পা-টা পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে পারছি না।... ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমি কি মারাই যাচ্ছি?...

[২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে মৃত্যুর আগে এ-ই ছিল তারকোভ্‌স্কির ডায়েরির শেষ লেখা।]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস

কলম্বাস অন্য চোখে

▼

হাওয়ার্ড জিন

বিজ্ঞ লেখক জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন—"যারা অতীতকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা ভবিষ্যৎকেও নিয়ন্ত্রণ করে আর যারা বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করে অতীতকে।"

কথাটা অন্যভাবে বললে দাঁড়ায় যে, সমাজের উপর বর্তমানে যাদের কর্তৃত্ব রয়েছে বস্তুত তারাই সে সমাজের ইতিহাস রচনা করে আর এভাবেই সে কর্তৃত্বকারী দল নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের ভবিষ্যৎ। এ কারণেই কলম্বাসের কাহিনি আমাদের জন্য জরুরি।

শুরুতেই বলে নেয়া দরকার যে বছর বারো আগে *এ পিপলস হিস্ট্রি অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস্* বইটা লিখতে শুরু করার আগে পর্যন্ত কলম্বাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল সামান্য। অবশ্য প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের চাইতে হয়তো খানিকটা বেশিই জানতাম কারণ ইতিহাসবিদ হিসেবে আমার একটা প্রশিক্ষণ ছিল এবং ইতিমধ্যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে পিএইচডিও করে ফেলেছিলাম। তবে আমেরিকার জনতার ইতিহাস বিষয়ে বইটা লিখতে শুরু করবার সময় আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কলম্বাস সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হবে। তথাকথিত আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ে আর একটা নতুন বই লিখবার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকার ইতিহাস লিখব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি চেয়েছি ইতিহাস বইয়ে

~ www.amarboi.com ~

যাদের কথা উপেক্ষিত থাকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি লিখতে। আমেরিকার ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছি আমেরিকার আদিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ, ক্রীতদাস, স্থানীয় শ্রমিক এবং অভিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি আমেরিকার শিল্পবিপ্লবকে রকফেলার, কারনেগি, যা ভেনডার বিল্টের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাইনি, দেখতে চেয়েছি সেসব মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা এ বিখ্যাত শিল্পপতিদের কয়লাখনি বা অয়েলফিল্ডে কাজ করেছে, যারা আমেরিকার বুকে দীর্ঘ রেলপথগুলো তৈরি করতে গিয়ে পঙ্গু হয়েছে, জীবন দিয়েছে। আমি যুদ্ধের কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু জেনারেল, প্রেসিডেন্ট বা সেইসব সামরিক নায়কদের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যাদের মূর্তি আমরা পথের মোড়ে মোড়ে দেখতে পাই। আমি যুদ্ধকে দেখতে চেয়েছি তাদের শত্রুদের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভেবেছি আমেরিকার সেই বিখ্যাত ম্যাক্সিকান যুদ্ধের সামরিক বিজয়কে ম্যাক্সিকানদের চোখ দিয়ে দেখলে কেমন দেখাবে!

তাহলে কলম্বাসের কোন্ কাহিনী আমি পাঠকদের শোনাব? কলম্বাস যখন এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন তখন এখানে যে আদিবাসীরা বসবাস করত কলম্বাস তাদের বলেছিলেন 'ইন্ডিয়ান' কারণ তিনি ভেবেছিলেন তিনি ভারতে পৌঁছে গেছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কলম্বাসকে আমি সেই আদিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু সেসব আদিবাসীর কোনো স্মৃতি বা ইতিহাস আমাদের হাতে নেই। তাদের সংস্কৃতির কোনো লিখিত রূপ নেই, তা মৌখিক। এছাড়া সেখানে কলম্বাসের পৌঁছানোর কয়েক দশকের মধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, সুতরাং বিকল্প হিসেবে আমি যা হাতে পেলাম বাধ্য হলাম তার উপর নির্ভর করতে। আমি নির্ভর করলাম সেসব স্পেনিশদের লেখার উপর যাদের সেসময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রথমত কলম্বাস নিজে। কলম্বাসের নোটবইটি এ ব্যাপারে খুবই সাহায্যকারী। কলম্বাস এ নোটবইয়ে সেসময়ে তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন বাহামা দ্বীপে পৌঁছানোর পর কীভাবে সেখানকার আরোয়াক আদিবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আরোয়াকরা বেলাভূমি থেকে সমুদ্রে নেমে গিয়ে কলম্বাস এবং তার সঙ্গীদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আরোয়াকদের কাছে কলম্বাসদের নিশ্চয়ই অন্য কোনো জগতের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আরোয়াকরা কলম্বাসের জন্য নানারকম উপহার এনেছিল। কলম্বাসের মনে হয়েছিল আরোয়াকরা খুবই ভদ্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ। কলম্বাস লিখেছিলেন—"তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই, অস্ত্র তারা চেনে না। আমি যখন ওদের হাতে একটা তলোয়ার তুলে দিলাম, ওরা তলোয়ারের ধার করা দিকটাতেই ধরল আর হাত কেটে একাকার করে ফেলল।" পুরো নোট জুড়ে কলম্বাস আদিবাসীদের গুণকীর্তনই করেছেন। কলম্বাস লিখেছেন—"আমার মনে হয় এরাই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সবচেয়ে ভদ্র। অপরাধ, অন্যায়, পাপ এরা জানে না। এদের মধ্যে চুক্তি বা খুনের কোনো ঘটনা ঘটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না। প্রতিবেশীকে এরা ভালোবাসে নিজের মতো। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাষায় কথা বলে আর আমি লক্ষ করি ওরা সবসময়ই হাসছে।" কলম্বাস তার স্প্যানিশ পৃষ্ঠপোষকদের কাছে লিখছেন—"এই আদিবাসীরা খুবই সরল আর সৎ এবং নিজেদের সম্পত্তি অন্যদের দিয়ে দেবার ব্যাপারে এরা খুবই উদার।" এরপরই কলম্বাস লিখছেন—"হ্যাঁ, এরা দাস হিসেবে হচ্ছে চমৎকার। এদের সবাইকে বশে আনবার জন্য আমাদের জনা-পঞ্চাশেক মানুষই যথেষ্ট। তারপর এদের দিয়ে আমরা যেরকম খুশি সেরকম কাজ করিয়ে নিতে পারব।" এই ছিল আমেরিকান আদিবাসীদের সম্পর্কে কলম্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি। এই অতিথিপরায়ণ মানুষদের তিনি দেখেছিলেন দাস হিসেবে। তিনি চেয়েছিলেন, 'এদের দিয়ে যেরকম খুশি সেরকম কাজ করিয়ে নিতে' আর ঐ ভূখণ্ডে কলম্বাসের যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, সেটা জানা বিশেষ কোনো কঠিন কাজ নয়। তার নোটবইয়ে তিনি প্রথম দুই সপ্তাহে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন পঁচাত্তর বার। আর সেই শব্দটি হচ্ছে—'সোনা'।

কলম্বাস-বিষয়ে প্রচলিত যেসব লেখাপত্র রয়েছে তাতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে কলম্বাসের ধর্মবিশ্বাসের ওপর। বলা হয়েছে কলম্বাসের মূল অভিপ্রায় ছিল ঐ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা, বাইবেলের ওপর তার অগাধ শ্রদ্ধার কথাও প্রচার করা হয়েছে। হ্যাঁ, ঈশ্বর নিয়ে কলম্বাসের ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু সোনা নিয়ে ভাবনা ছিল আরও বেশি। কলম্বাস এবং তার সঙ্গীরা ভারতীয় ঐ দ্বীপপুঞ্জে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। সেখানে তারা ক্রসচিহ্ন বসিয়েছেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি অগণিত ফাঁসির মঞ্চও বসিয়েছেন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ঐ দ্বীপগুলোতে সব মিলিয়ে কলম্বাসের বসানো ফাঁসির মঞ্চ ছিল তিনশো চল্লিশটি। একদিকে ক্রসচিহ্ন, অন্যদিক ফাঁসির মঞ্চ, অদ্ভুত সেই ঐতিহাসিক সমাপতন।

কলম্বাস মূলত বেরিয়েছিলেন সোনার খোঁজে এবং এ আদিবাসীদের কাছে তিনি দেখেছিলেন সোনার টুকরো আর তাতেই ভেবেছিলেন এ এলাকায় সোনা আছে প্রচুর। তিনি ঐ আদিবাসীদের আদেশ দিতেন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা এনে তার হাতে তুলে দিতে। সময় শেষে যে আদিবাসীরা নির্দেশিত পরিমাণ সোনা আনতে পারত না কলম্বাস তাদের হাত কেটে ফেলতেন। হাত কেটে তিনি অন্যদের শিক্ষা দিতেন যাতে তারা সময়মতো ঠিক পরিমাণ সোনা সরবরাহ করে। হার্ভার্ডের ইতিহাসবিদ কলম্বাসের জীবনীকার স্যামুয়েল ইলিয়ট মরিসন লিখেছেন—"সোনা সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য কলম্বাসই হাত কাটার এই ভয়ঙ্কর নিয়ম চালু করেন। পালিয়ে যেসব আদিবাসী পাহাড়ে গিয়ে লুকাত তাদেরকে কুকুর দিয়ে ধরে আনা হতো। তারপরও কেউ কেউ যারা পালাতে সক্ষম হতো তারা খেতে না-পেয়ে, অসুখবিসুখে মারা যেত। যারা ধরা পড়ত তাদের মধ্যে হাজার হাজার আদিবাসী কাসাভার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করত।" মরিসন আরও লিখেছেন—"১৪৯২-তে যে স্বর্ণভূমি হিস্পানিওয়ালা নামে পরিচিত ছিল কলম্বাসের একার কর্মকাণ্ডে তা ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়তে থাকে। আদিবাসী নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী ১৪৯৪ থেকে ১৪৯৬ সালের মধ্যে ঐ এলাকার তিন লক্ষ আদিবাসীদের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ আদিবাসীকেই মেরে ফেলা হয় এরকম নানা নির্যাতনের মাধ্যমে। ১৫০৪ সালে দেখা যায় ঐ এলাকায় মাত্র ষাট হাজার অধিবাসী বেঁচে আছে। স্পেনের সরকারি ইতিহাসবিদ ওভিওত্তর ধারণায় ১৫৪৮ সালে সর্বসাকুল্যে পাঁচশো জন আদিবাসী বেঁচে ছিল কি না সন্দেহ। তবে যাবতীয় জবরদস্তির পরও কলম্বাস রাজা-রানি এবং তার স্প্যানিশ পৃষ্ঠপোষকদের খুশি করার মতো সোনা জোগাড় করতে ব্যর্থ হলেন। শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সোনা নয় বরং অন্য এক পণ্য তিনি সেখান থেকে স্পেনে পাঠাবেন। এবং সেই পণ্য হলো দাস। সেই অনুযায়ী কলম্বাস এবং তার সঙ্গীরা ১২০০ আদিবাসীদের ধরে আনে এবং তার মধ্য থেকে দাস হিসেবে নির্বাচন করে পাঁচশো জনকে। এই পাঁচশো জনকে আটলান্টিক পাড়ি দেবার জন্য গাদাগাদি করে তুলে দেয়া হয় জাহাজে। অসুখে এবং শীতে ধুঁকে ধুঁকে পথেই মারা যায় দুইশো জন।

১৪৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বাস তাঁর নোটবইয়ে লিখছেন—"ঈশ্বর সহায়, বিক্রির জন্য এখান থেকে যত খুশি দাস পাঠানো সম্ভব।" বার্টালেম ডুলা কাসাস তার লেখায় আদিবাসীদের উপর স্প্যানিশদের নির্মম নির্যাতনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। স্প্যানিশ এবং আদিবাসীদের পারস্পরিক যোগাযোগের বিশদ বিবরণ আছে তার লেখায়। কাসাস একজন ডমিনিকান যাজক যিনি কলম্বাসের বছরখানেক পরে ঐ নতুন পৃথিবীতে গিয়ে পৌছান এবং হিস্পানিওয়ালাসহ পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলোতে চল্লিশ বছর কাটান। পরবর্তীকালে তিনি আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার প্রধান প্রচারকের ভূমিকা পালন করেন। কাসাস তার 'দ্য ডিভাস্টেশন অব ইন্ডিস' বইয়ে আরোয়াক সম্পর্কে লিখেছেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে সরল মানুষ হলো এরা। সবরকম চালাকি আর কপটতা থেকে মুক্ত অথচ এদের মধ্যে এসে হাজির হল স্প্যানিশরা এবং ক্ষুধার্ত পশুর মতো আচরণ করল এদের সঙ্গে। তাদের সব ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যার মূল লক্ষ্যই ছিল যত সম্ভব সোনা লুট করে নেয়া।"

স্প্যানিশদের বর্বরতা নানারূপে প্রত্যক্ষ করেছেন কাসাস। তিনি দেখেছেন কী করে সৈন্যরা নেহাত মজা করার জন্য আদিবাসীদের পেটে ছুরি বসিয়ে দিত। পাথরে গুঁড়িয়ে দিত শিশুর মাথা। যেসব আদিবাসী প্রতিবাদ করেছে স্প্যানিশরা তাদের রাইফেল, তীর, কুকুর, লাঠি যখন যেভাবে পেরেছে তাই দিয়ে হত্যা করেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাই আদিবাসীদের ছিল না, ফলে এমন ঘটেছে যে তারা তাদের নিজেদের অনেক জিনিস স্প্যানিশদের এমনিতেই দিয়ে দিয়েছে। আবার অনেক সময় একইভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্প্যানিশদের জিনিসও নিজেরা নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিন্তু স্প্যানিশরা তা বরদাস্ত করেনি। যে আদিবাসী স্প্যানিশদের কোনো জিনিস নিয়েছে তাদের হয় ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে নয়তো পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কাসাসের এসব বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও। একদল ডমিনিকান যাজক ১৫১৯ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে স্প্যানিশদের বর্বরতার কথা জানিয়ে রাজতন্ত্রের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান। সেই স্মারকলিপিতে তারা উল্লেখ করেন যে, ওখানে স্প্যানিশরা আদিবাসীদের শিশুদের ছুড়ে দেয় কুকুরের খাদ্য হিসেবে, বন্দি আদিবাসী নারীর সন্তান জন্ম হলে সেই নবজাতককে ফেলে দিয়ে আসে জঙ্গলে। সোনা সংগ্রহে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে দিতে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বহু আদিবাসী। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং অভুক্ত থাকার কারণে প্রসূতি মায়েদের বুকে দুধ হত না। ফলে দুধের অভাবে মারা গেছে বহু শিশু। কাসাস হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, কিউবাতে সেই সময়ে মাত্র তিন মাসে মারা গেছে সাত হাজার আদিবাসী শিশু। সেই সঙ্গে ইউরোপীয়রা সেই এলাকায় এমন সব রোগ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে যার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের কোনো প্রতিরোধক্ষমতা ছিল না, যেমন—টাইফয়েড, টাইফাস, ডিপথেরিয়া, গুটিবসন্ত। বহু আদিবাসী এসব রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। যেকোনো সামরিক বিজয়ের পর বিশেষভাবে বর্বরতার শিকার হয় নারীরা। কলম্বাসের এক অভিজাত ইতালীয় সহযাত্রীর লেখায় রয়েছে সেরকম এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তার লেখায় তিনি যাকে 'অ্যাডমিরাল' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন কলম্বাস, কারণ স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে তার চুক্তির একটা শর্ত ছিল যে তাকে 'অ্যাডমিরাল' উপাধি দিতে হবে। কুনিয় লিখেছেন—"লর্ড অ্যাডমিরাল আমাকে একজন সুন্দরী নারীকে ধরে এনে দিয়েছিলেন। ভাবলাম ওর সঙ্গে একটু মজা করি। কিন্তু মেয়েটা নারাজ। আমাকে এমন খামচি দিয়ে বসল যে ভাবছিলাম ওটার কাছে না-যাওয়াই ভালো। কিন্তু শেষে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। একটা দড়ি দিয়ে আচ্ছামতো মেয়েটাকে পিটালাম। শেষপর্যন্ত মেয়েটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হল।"

আদিবাসী নারীদের উপর ব্যাপক ধর্ষণের নিদর্শন আরও অন্যান্য লেখাতেও রয়েছে। স্যামুয়েল মরিসন লিখেছেন—"বাহামা আর হিস্পানিওয়ালাতে তাদের নাগালের মধ্যেই ছিল নগ্ন সুন্দরী তরুণীরা এবং অনুমান হয় সেসব তরুণীরা তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আগ্রহীও ছিল।" কিন্তু অনুমানটা কার? বলা বাহুল্য অনুমানটি মরিসন এবং তার মতো আরও অনেকের। স্প্যানিশদের এই আমেরিকা-বিজয়কে আরও অনেকের মতো মরিসনও দেখেছেন ইতিহাসের একটা রোমান্টিক অভিযান হিসেবে। তার কাছে এ এক পৌরুষদীপ্ত বিজয়। তিনি লিখেছেন—"১৪৯২ সালের অক্টোবর মাসের সেই দিনগুলোতে কুমারী নতুন পৃথিবী যেভাবে নিজেকে বিজয়ী স্প্যানিশদের কাছে সমর্পণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিল মর্তের মানুষ হয়তো আর কখনোই সেই আনন্দ, বিস্ময় আর মুগ্ধতার মুখোমুখি হবে না।”

কুনিয়র ‘মেয়েটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলো’ এবং মরিসনের ‘তরুণীরা তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আগ্রহী’ এই ভিন্ন দুটো বাক্য প্রায় পাঁচশো বছরের ব্যবধানে লেখা। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় এত বছরের ব্যবধানেও যৌন নিপীড়নের বিষয়টিকে যৌক্তিক করবার প্রক্রিয়া রয়ে গেছে একই। সেইজন্যই কলম্বাসের নোটবই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ লাস কাসাসের লেখা, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হান্স কুনি-এর ‘কলম্বাস, হিজ এন্টারপ্রাইজ’ বইটি। আমি যখন ‘পিপলস হিস্ট্রি’ বইটি লিখতে শুরু করেছি তখন এই বইটিতেই একমাত্র প্রচলিত ধারণাবিরোধী অনেক কথা পেয়েছি। আমার ‘পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস’ বইটি প্রকাশ হবার পর সারা দেশ থেকে আমি চিঠি পেতে শুরু করি। সবারই প্রশ্ন মূলত কলম্বাস নিয়ে। আমি ভাবলাম লোকে হয়তো আমার বইটির শুরুটাই কেবল পড়েছে, কারণ বইটা শুরু হয়েছে কলম্বাস নিয়ে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা তা নয়, আসলে লোকে আমার বইয়ের কলম্বাস-অংশটি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে। সেই প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রতিটি আমেরিকান শুনে আসছে কলম্বাসের গল্প। শিখে আসছে ১৪৯২ সাল কলম্বাস পাল তুললেন গভীর নীল সমুদ্রে...

প্রতি সেমিস্টারে আমি অসংখ্য চিঠি পেতে লাগলাম। নানারকম মন্তব্য, অগণিত প্রশ্ন। এই চিঠি যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কারণ তারা আমার বইয়ের মাধ্যমে এমন সব তথ্য জেনেছেন যা আগে জানতেন না, আর বাকিরা লিখেছেন খুব ক্ষুব্ধ হয়ে। তারা বেশ অবাক হয়ে জানতে চেয়েছেন কী করে, কোথায় আমি এসব তথ্য পেলাম এবং এমন অদ্ভুত সব সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম!

এক হাইস্কুল ছাত্র লিখেছে, “আপনার বইয়ের নিবন্ধগুলোর মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে ‘Colombus, The Indian and Human Progress’ নিবন্ধটি। আবার অভিযান নিয়ে আমার ভেতর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। আপনার কথায় মনে হচ্ছে কলম্বাস আমেরিকা এসেছিলেন নারী, দাস এবং সোনার লোভে। আপনি লিখেছেন আপনি বহু তথ্য পেয়েছেন কলম্বাসের নিজের লেখা সেই নোটবই থেকে। আমার তো সন্দেহ হয় আদৌ এরকম কোনো নোটবই আছে কি না। আর যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটি আমাদের ইতিহাসে এতদিন অন্তর্ভুক্ত হয়নি কেন? আপনি যেসব কথা বলেছেন আমাদের ইতিহাস বইয়ে সেসব কথা নেই কেন?”

চিঠিটা নিয়ে আমি বেশ ভেবেছি। চিঠিটির দুরকম অর্থ হতে পারে। এক. অন্য ইতিহাস বইয়ে, যা দেখেছি আমি তা লিখেছি তাই সে ক্ষুব্ধ, অথবা দুই, আপনি যা লিখেছেন তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। আপনি সব বানিয়ে লিখেছেন—এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় আমি বিস্মিত নই। এতে আমেরিকার বাকস্বাধীনতার সংস্কৃতি প্রমাণিত হয়, মুক্ত সমাজের গর্বও প্রকাশিত হয়, সেসঙ্গে এও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ছাত্ররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কলম্বাস-বিষয়ে একই তথ্য জেনে আসছে এবং শিক্ষাজীবন শেষেও বহু তথ্য তাদের কাছে গোপন থেকে গেছে।

আমেরিকার স্কুলগুলোতে কলম্বাস-বিষয়ে যে গল্প শেখানো হয় তার বিরুদ্ধে বিল বিগলো নামের এক শিক্ষক রীতিমতো সংগ্রাম শুরু করেছেন। তিনি তার ক্লাসের শুরুতে সামনের বেঞ্চের কোনো মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বেঞ্চের উপর রাখা মেয়েটির পার্স নিজেই বগলদাবা করেন। মেয়েটি স্বাভাবিকভাবেই বলে ওঠে—'কী ব্যাপার, আপনি আমার পার্স নিচ্ছেন কেন?' বিগলো তখন বলেন, 'নিলাম কোথায়, আমি তো এটা আবিষ্কার করলাম।'

বাচ্চাদের বইগুলোতে কলম্বাসের উপর কী লেখা হচ্ছে তা নিয়ে বিল বিগলো একটি গবেষণা করেছেন এবং সেখানেও দেখেছেন ঐ একই ধারণার পুনরাবৃত্তি। পঞ্চম শ্রেণীর যেকোনো একটি বইয়ে কলম্বাসের জীবনী শুরু হয় অনিবার্য সেই বাক্যটি দিয়ে—"একদেশে ছিল এক বালক, সে ভালোবাসত নোনা সমুদ্র", আমি ভাবছিলাম হুন দস্যু এটিলার জীবনীও এভাবে শুরু হতে পারত, "একদেশে ছিল এক বালক যে ঘোড়া ভালোবাসত।" দ্বিতীয় শ্রেণীর বাচ্চাদের বইয়ে লেখা হয়েছে—"তাদের সামনে এনে রাখা সোনা আর আদিবাসীদের তাকিয়ে দেখলেন রাজা আর রানি। তারা কলম্বাসের আশ্চর্য সব অভিযানের গল্প শুনলেন, তারপর তারা সবাই মিলে চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, গাইলেন। আনন্দে চোখে জল ভরে এল কলম্বাসের।"

আমি যখন একবার স্কুলশিক্ষকদের ওয়ার্কশপে কলম্বাস বিষয়ে বলছিলাম, একজন শিক্ষক বললেন লাস কাসাসের ঐসব বীভৎস বর্ণনা শিশুদের উপযোগী নয়। ঐসব ব্যাপার ওদের জানানো উচিত নয়। কেউ কেউ ভিন্নমতও প্রকাশ করলেন, বললেন বাচ্চাদের গল্পে এমনিতেই প্রচুর সন্ত্রাস থাকে। তবে হ্যাঁ, ওগুলো করে ডাইনি আর দৈত্য নামের খারাপ লোকেরা। যে জাতীয় বীরের নামে ছুটি পালিত হয় সে কি আর এমন বর্বর কাজ করতে পারে?

শিশুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার না করে কী করে তাদের ইতিহাসের সত্য বিষয়গুলো জানানো যায় সে-ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু তাতে ইতিহাস নিয়ে ভাঁওতাবাজির ব্যাপারটা রয়েই যায়। তাছাড়া শিশুকাল কঠিন সত্য জানবার বয়স নয় এ যুক্তিও ধোপে টেকে না, কারণ আমেরিকাতে কঠিন সত্যটি শুধু শিশুকালে নয় কোনোকালেই আর জানানো হয় না। আমি আগেই বলেছি গ্রাজুয়েট স্কুলে আসবার আগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি এমন কোনো তথ্যের মুখোমুখি হইনি যা কলম্বাস-বিষয়ে প্রাইমারি স্কুলে শোনা সেইসব পৌরাণিক কাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা যে আমারই মতো সেটা টের পেলাম আমার বইটি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন বয়সের মানুষদের প্রতিক্রিয়া থেকে।

শুধু ছোটদের কেন, বড়দের জন্য লেখা বইগুলোতেও লক্ষ করা যাক। যেমন কলম্বাস এনসাইক্লোপেডিয়া (আমার কাছে আছে ১৯৫০-এর সংস্করণ, তবে তাতে মরিসনের লেখা জীবনীসহ কলম্বাস বিষয়ে যাবতীয় সব তথ্যই আছে)-এর শুরুতেই এক হাজার শব্দের যে ভূমিকাটি রয়েছে তাতে একটিবারও কলম্বাস এবং তার সঙ্গীদের ঐ কুকীর্তির উল্লেখ নেই। তেমনি কলাম্বিয়া প্রকাশনীর 'বিশ্ব ইতিহাস' বইটির ১৯৮৬ সালের সংস্করণে কলম্বাসের কথা বহুবার এলেও স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে স্পেন এবং পর্তুগালের সম্পর্ক নিয়ে লেখা রয়েছে তাতে। সেখানে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয়েছে একটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে। বলা হয়েছে এই বিতর্ক সমসাময়িক ইতিহাসবিদ এবং তৎকালীন ধর্মতাত্ত্বিকদের ধারণার বিতর্ক। নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে মন্তব্যটির মাধ্যমে কেমন কৌশলে সব কুল রক্ষা করা হয়েছে—"আদিবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য সম্রাট এবং চার্চের সংকল্প, নতুন জমিকে নানাভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের চাহিদা, সেইসঙ্গে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কোনো-কোনো স্প্যানিশের উদ্যোগ, সেসময়ে এমন সব জটিল রীতি, আইন এবং সংগঠনের জন্ম দেয় যাতে করে আজও বহু ইতিহাসবিদ আমেরিকায় স্প্যানিশ শাসন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় পড়ে যান। ফলে বিতর্কিত এবং এক অর্থে মীমাংসার অতীত এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রচুর তাত্ত্বিক মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। তবে এটা নিশ্চিত যে নৃশংসতা, অত্যধিক পরিশ্রম এবং নানাবিধ রোগের শিকার হয়ে আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক জনসংখ্যা হ্রাস ঘটে। সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে জানা যায় ১৫১৯-এ মেক্সিকোর জনসংখ্যা ২৫ মিলিয়ান থাকলেও ১৬০৫-এ এসে তা দাঁড়ায় মাত্র এক মিলিয়নে।"

এখানে লক্ষণীয় যে, বিতর্কিত বিষয় তাত্ত্বিক মতভেদ মীমাংসার অতীত প্রশ্ন ইত্যাদি ভাষার জারিজুরি সত্ত্বেও এ-ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে মনে করা হয়েছে যে ইউরোপীয়রা সেখানে জোরপূর্বক শ্রম, ব্যাপক দাসবৃত্তির প্রচলন, ধর্ম, খুন ও অপহরণ ঘটিয়েছে। সেইসঙ্গে ইউরোপীয়দের বয়ে নিয়ে যাওয়া রোগের প্রকোপে মৃত্যুবরণ করেছে অসংখ্য আদিবাসী। ইতিহাস আলোচনায় এসব ঘটনাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হবে এবং আমাদের সমসায়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে এগুলোর কোনো গুরুত্ব রয়েছে কিনা মতভেদ আছে এই প্রশ্নে। যেমন স্যামুয়েল মরিসন কলম্বাসের জীবনীতে আদিবাসীদের সঙ্গে কলম্বাসের আচরণের কথা লিখেছেন। আমেরিকা আবিষ্কারে সামগ্রিক প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি 'গণহত্যা' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শব্দটি এসেছে কলম্বাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক স্তবকের একফাঁকে। মরিসন তার জনপ্রিয় 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস মেরিনার' বইটি শেষ করেছেন এভাবে—"হ্যাঁ দোষক্রুটি কলম্বাসেরও ছিল কিন্তু এই ক্রুটি তার অগণিত গুণেরই অংশমাত্র যা তাকে করেছে মহান, তার সেই অদম্য স্পৃহা, ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, যিশুকে সাগরের ওপারে নিয়ে যাবার দুর্দম ইচ্ছা, অবহেলা, দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে চলার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। তবে একটি ক্ষেত্রে তার কোনো ক্রুটির দিক নেই এবং সেটিই তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং আবশ্যিক গুণ—তার নৌদক্ষতা।" নৌদক্ষতাই বটে!

এখানে একটা ব্যাপার খোলাখুলি বলে নেয়া দরকার যে কলম্বাসকে খাটো করা কিংবা মহান করে তোলা কোনোটির ব্যাপারেই আমার কোনো আগ্রহ নেই। সে কাজের সময়ও পেরিয়ে গেছে। কলম্বাসকে নতুন একটি অভিযানে পাঠাবার যোগ্যতা যাচাই করতেও আমরা বসিনি। কলম্বাসের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ একারণে যে তার কাহিনী আমাদের নিজেদেরকে বুঝতে সাহায্য করে। নিজেদের সময়কে বুঝতে সাহায্য করে। আগামী শতাব্দী বিষয়ে আমাদের ভাবনাগুলোকে যাচাই করতে যাহায্য করে। আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন কেন আমেরিকা আবিষ্কারের এই পাঁচশত বর্ষপূর্তি উৎসব, আর কেনই বা কলম্বাস নিয়ে আজ এত বিতর্ক? কলম্বাসের মহিলা-কীর্তনের বিরুদ্ধে কেন আদিবাসী আমেরিকানদের এমন ক্ষোভ? এসব বিতর্ক একথাই প্রমাণ করে যে বিষয়টি কেবল ১৪৯২ সালের নয় বরং একইভাবে ১৯৯২ সালেও সমান প্রাসঙ্গিক।

আমরা যদি ঠিক একশো বছর পিছিয়ে যাই অর্থাৎ ১৮৯২-তে যখন আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিল তখনকার পরিস্থিতি লক্ষ করি তাহলে কী দেখতে পাই? সে বছর শিকাগো এবং নিউইয়র্কে হয়েছিল বিশাল উৎসব। লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল শহরে। পাঁচদিন ধরে মিছিল, আতশবাজি পোড়ানো, সামরিক কুচকাওয়াজ ইত্যাদি হয়েছিল। সেন্ট্রাল পার্কে একটি স্মরণ-ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়েছিল যা এখন 'কলম্বাস পার্ক' নামে পরিচিত।

কার্নেগি হলে হয়েছিল চারশো বছরপূর্তি বিশেষ সভা। তাতে বক্তৃতা করেছিলেন সি. ডেপিউ, আপনি যদি সম্প্রতি গুস্তাভাস মেয়ারের 'এ হিস্ট্রি অব দ্য গ্রেট আমেরিকান' নামের ধ্রুপদী বইটির উপর চোখ বুলিয়ে না থাকেন তাহলে হয়তো ডেপিউ নামটি আপনার কাছে অচেনা লাগবে। তিনি ছিলেন কর্নেলিয়াস ভেনডার বিল্ট এবং নিউইয়র্ক কেন্দ্রীয় রেলপথের হর্তাকর্তা ব্যক্তি। সেই পূর্তিসভায় ডেপিউ এসেছিলেন ব্যাগভর্তি টাকা এবং নিউইয়র্ক রাজ্যের সংসদসদস্যদের সৌজন্য রেলপাস নিয়ে আর ফিরে গিয়েছিলেন সেন্ট্রাল রেলপথের জন্য জমির অনুদান নিয়ে। কলম্বাস-উৎসবকে ডেপিউ বর্ণনা করেছিলেন সম্পদ আহরণ আর সাফল্যের মহতী উদ্‌যাপন হিসেবে। তিনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলেছিলেন—"এই উৎসব আমাদের সভ্য হয়ে উঠবার উৎসব। মহৎ ব্যক্তিদের আরাম, আয়েশ, আনন্দ, বিলাস আর ক্ষমতা অর্জনের উৎসব।"

বলা বাহুল্য ডেপিউ যখন এই কথাগুলো বলছেন তখন আমেরিকায় অসংখ্য দরিদ্র শ্রমিক চরম দুর্দশার মধ্যদিয়ে কাটাচ্ছিল। তারা তখন বসবাস করছে বস্তিতে, তাদের শিশুরা প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে রোগ আর অপুষ্টিতে ভুগে। তখন কৃষিতেও একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী কাজ করত এবং ঠিক ঐ সময়ে কৃষিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই বিক্ষোভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল পিপলস পার্টি। আরও উল্লেখ্য, এই পূর্তি উৎসবের ঠিক পরের বছর ১৮৯৩-তে আমেরিকায় এক ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। কার্নেগি হলে দাঁড়িয়ে ডেপিউ যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন হয়তো তার ঐ আত্মতৃপ্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ কেউ গুঞ্জনও তুলেছিলেন যারা সভ্যতা আর দেশপ্রেমের এই কপট মোহকে সন্দেহ করতেন। ব্যাপারটা এমন যেন কলম্বাসের বিজয়কে উদ্‌যাপন করা মানেই হচ্ছে দেশপ্রেমিক হওয়া। ডেপিউর কাছে দেশপ্রেম মানে হচ্ছে নতুন নতুন দেশ বিজয় করে দেশের সীমাকে প্রসারিত করা। কলম্বাস সে কাজটিই করেছেন। এবং আমেরিকাও তাই করে থাকে। ডেপিউর এই বক্তৃতার ঠিক ছয় বছর পর আমেরিকা কিউবা থেকে স্পেনকে উৎখাত করে কিউবা দখল করে নেয় (অবিরাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং মাঝে মাঝে সামরিক আগ্রাসন অব্যাহত থাকে)। একই সময় আমেরিকা দখল করে পোর্টোরিকা এবং হাওয়াই। পাশাপাশি ফিলিপাইনকে দখল করার জন্য শুরু করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

দেশজয়ই দেশপ্রেম, এই চেতনা যা কলম্বাসের চারশো বছর পূর্তি উৎসবে উচ্চারিত হয়েছিল তা আরও সহজ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের ক্রমশ পতন এবং পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার উত্থানের মাধ্যমে। সেসময়কার কোটিপতি হেনরি লুস, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সবসময়েই যার থাকত শক্ত হাত, যিনি ছিলেন টাইম, লাইফ ও ফরচুন পত্রিকার মালিক (শুধু পত্রিকার নয় তিনি বস্তুত টাইম, লাইফ আর ফরচুন বিষয়গুলোই নিয়ন্ত্রণ করতেন) বলেছিলেন বিংশ শতাব্দী হবে 'আমেরিকান শতাব্দী'। জর্জ বুশ ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন পাওয়ার পর বলেছিলেন—"এ শতাব্দীকে বলা হয় আমেরিকান শতাব্দী কারণ আমরা সক্ষম হয়েছি পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে। আমরা আরও একটি নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এবার তাহলে কোন্ দেশের নাম বহন করবে এই নতুন শতাব্দী? আমি বলতে চাই একবিংশ শতাব্দীও হবে আরেকটি আমেরিকান শতাব্দী।" কী অদ্ভুত ঔদ্ধত্য! বিংশ শতাব্দীতে উগ্র জাতীয়তাবাদের যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষের হয়েছে তাতে আমাদের উচিত আগামী শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের এই উগ্রতা থেকে যতদূর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্ভব নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা। অথচ আগাম ঘোষণা করা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দী হবে আমেরিকান শতাব্দী। শুধু আমেরিকান বলে কথা নয়, অন্য যেকোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ কেনইবা একটি শতাব্দীর উপর কর্তৃত্ব করতে চাইবে? বুশ হয়তো নিজেকে নয়া কলম্বাস ভেবেছেন। নতুন নতুন বিশ্ব আবিষ্কার করে সেখানে তিনি ওড়াবেন আমেরিকার পতাকা। ইতিমধ্যেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন আগামী শতাব্দীর শুরুতেই চাঁদে আমেরিকার একটি সাম্রাজ্য হবে এবং ২০১৯ সালে শনি গ্রহে একটা অভিযান চালানো হবে। কলম্বাসের আমেরিকা বিজয়ের পূর্তি উৎসবে ডেপিউ যে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন তার মূল রয়েছে বিজিত জাতিকে হীন ভাবার মানসিকতা। মনোভাবটা এমন যে আমেরিকার যে আদিবাসী ওগুলো তো মানুষেরই পদবাচ্য নয়, সুতরাং কলম্বাস যে তাদের আক্রমণ করে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছেন সেটি খুবই যৌক্তিক।

গৃহযুদ্ধের ঠিক আগে আমেরিকা যে টেক্সাস এবং ম্যাক্সিকোর বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছিল এর পেছনেও ছিল এ ধরনের জাতিবৈষম্যের যৌক্তিকতা। টেক্সাসের প্রথম গভর্নর স্যাম ইস্টোন বলেছিলেন—"অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির উচিত আমেরিকা মহাদেশের পুরো দক্ষিণ অঞ্চলটি দখল করে নেয়া। আমেরিকান আদিবাসীদের চাইতে ম্যাক্সিকানরা এমন বিশেষ কোনো উন্নত জাতি নয়। সুতরাং তাদের ভূমি দখল না-করার কোনো যুক্তি আমি দেখি না।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্যারিবিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে আমেরিকা যে আগ্রাসন চালিয়েছিল তার যৌক্তিকতা ছিল যে আমরা আমাদের চেয়ে নিচু জাতের কিছু মানুষের জায়গা দখল করছি মাত্র।

ডেপিউ ১৯০০ সালে আবার দাঁড়িয়েছেন কার্নেগি হলে বক্তৃতা দেবার জন্য। ইতিমধ্যে তিনি সিনেট সদস্য হয়েছেন। তিনি সেবার থিওডর রুজভেল্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের সমর্থনে প্রচারে নেমেছিলেন, আমেরিকার ফিলিপাইন জয়ের উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

"যে গোলার আওয়াজ উঠেছে ম্যানিলা উপসাগরে, তার শব্দ এখন শুনতে পাচ্ছে এশিয়া এবং আফ্রিকার নানা প্রান্তের মানুষ। এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে পিকিং-এর রাজপ্রাসাদে। প্রাচ্যবাসীদের কাছে পৌঁছে গেছে পাশ্চাত্যের এক নতুন শক্তির আগমনবার্তা। প্রাচ্যের বিশাল বাজারে প্রবেশের জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো আমরা আমেরিকানরাও এখন প্রস্তুত। প্রাচ্যের লোকেরা ভয় পায় শুধু ক্ষমতাকে। আমার বিশ্বাস ফিলিপাইন আমাদের জন্য খুলে দেবে এক বিশাল বাজারের দ্বার এবং তা হবে আমাদের অঢেল সম্পদের উৎস।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থিওডর রুজভেল্ট আমাদের মহান প্রেসিডেন্টদের একজন, তার মুখে ভাস্কর্য খোদাই করা আছে দক্ষিণ ডাকোটার রোজমুর পাহাড়ের গায়ে (সঙ্গে আছে ওয়াশিংটন, জেফারসন আর লিংকনের মুখ)। তিনি তার 'দ্য স্ট্রেনাস লাইফ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের জাতীয় ইতিহাস রাজ্য জয় এবং বিস্তারেরই ইতিহাস। অধম বর্বরদের হয় পালাতে হবে, নয় পরাজিত হতে হবে এই তো নিয়ম, কারণ যারা শক্তিধর এবং সভ্য তারা কখনো যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে না।"

ফিলিপাইনে কর্মরত এক আমেরিকান সামরিক অফিসার ব্যাপারটিকে আরো খোলাসা করেই বলেছেন—"আমরা যে আদিবাসীদের পরাজিত এবং ধ্বংস করে দিতে পেরেছি আমার ধারণা এজন্য অধিকাংশ আমেরিকাবাসী গর্বিত। এ ব্যাপারে দ্বিধার কোনো অবকাশ নাই যে প্রগতি এবং সভ্যতার স্বার্থে এ ধরনের যেসব জাতি বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের ধ্বংস করে দিতে হবে।"

তেমনিভাবে সরকারি ইতিহাসবিদ ফার্নান্ডেজ ডু ওভিডো ষোলো শতকের আমেরিকাবাসীদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাদের উপর ইউরোপীয়দের নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেননি। তিনি 'আকাশের অসংখ্য তারার' মতো মৃত্যুর কথা লিখেছেন। কিন্তু এই মৃত্যুতে তিনি অন্যায় কিছু দেখেননি। কারণ তার মতে "বিধর্মীদের প্রতি নিক্ষিপ্ত গুলি তো বস্তুত ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ্য নিবেদন।"

স্মরণ করা যেতে পারে প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলি যখন ফিলিপাইনে সেনা এবং নৌবাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে, ফিলিপিনোদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত এবং সভ্য করে তোলা আমেরিকানদের দায়িত্ব।

আদিবাসীদের পক্ষাবলম্বী লাস কাসাসের আবেদনের বিরোধিতা করে ধর্মতাত্ত্বিক জুয়ান গিনেস ডু সেপুলভেদা বলেছিলেন—"ঐ আদিবাসীদের মতো অসভ্য, বর্বর এবং নানা পাপে কলুষিত জাতিকে জয় করে আমরা যে ঠিক কাজটি করেছি এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।"

আদিবাসীদের সঙ্গে স্প্যানিশদের আচরণ যে যৌক্তিক তা প্রমাণ করবার জন্য এরপর তিনি দর্শনতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি অ্যারিস্টটলকে উদ্ধৃত করেছেন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে কিছু কিছু মানুষ জন্মগতভাবেই দাস। এবং তিনি মনে করেন কিছু কিছু মানুষকে বন্য পশু'র মতোই শিকার করে ধরে এনে সঠিক জীবনের পথ দেখাতে হবে।

উত্তরে লাস কাসাস লিখেছেন—"অ্যারিস্টটলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে যিশু একথাও বলেছেন যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ততটুকুই ভালোবাসো যতটুকু তুমি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেকে ভালোবাসো।" পরাজিতের অমানবিক আচরণ করা যেন যুদ্ধের অবধারিত নিয়ম। ব্যাপারটা এমন যেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এই নীচুজাতের মানুষের সঙ্গে নির্মম আচরণ করা যৌক্তিক। আমেরিকান দাসপ্রথা, জাতিগত বৈষম্য এবং এশিয়া, আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তারকে এভাবেই যৌক্তিকতা দেয়া হয়েছে।

আমেরিকা যখন ভিয়েতনামের গ্রামে বোমাবর্ষণ করেছে, মাইলুতে গণহত্যা সংগঠিত করেছে তখন আমেরিকার সাধারণ সৈনিকদের বলা হয়েছে যে যাদের বিরুদ্ধে এসব করা হয়েছে তারা আসলে কোনো সভ্য মানুষ নয়, তারা ফালতু এবং কম্যুনিস্ট। এরকম শাস্তিই তাদের প্রাপ্য।

একইভাবে উপসাগরীয় যুদ্ধে অস্বীকার করা হয়েছিল ইরাকি সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব। বলা হয়েছিল সাধারণ ইরাকি নারী শিশু বা যুবক আমাদের বোমাবর্ষণের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য নব্য হিটলার ঐ সাদ্দাম হোসেন। তবে আমাদের বোমাবর্ষণে যদি সাধারণ মানুষ মারা যেয়ে থাকে তারা বস্তুত ঐ নরদানবেরই ইরাকি শিকার মাত্র। আমেরিকান জেনারেল কলিন পাওয়েলের কাছে যখন ইরাকি সাধারণ মানুষের হতাহতের সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি বলেছিলেন—"সত্যি বলতে ঐ ব্যাপারে আমার মোটেও কোনো আগ্রহ নেই।"

আমেরিকার জনগণ ইরাকের বিরুদ্ধে এই নৃশংসতাকে যৌক্তিক মনে করেছে কারণ তাদের কাছে এমনিভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে ইরাকি সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গ রয়ে গেছে সম্পূর্ণ উহ্য। বলা হয়েছে আমেরিকা খুব চৌকশ বোমা ব্যবহার করে যা শুধু লক্ষ্যবস্তুকেই আঘাত করে, সাধারণ মানুষের তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ হার্ভার্ড মেডিক্যাল টিম ইরাক থেকে ফিরে এসে যখন জানাল যে আমেরিকার বোমাবর্ষণে ইরাকি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ার কারণে সেখানে ব্যাপক মহামারী দেখা দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে তখন আমেরিকার প্রধান পত্রপত্রিকাগুলো এ সংবাদ বেমালুম চেপে গেল।

লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে কলম্বাসের বিজয়কে শুধুমাত্র একটি সমুদ্র-অভিযানের বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, দেখা হয় প্রগতির একটি নতুন দিগন্ত হিসেবে। বাহামায় তার অবতরণকে মনে করা হয় ঐ নতুন পৃথিবীতে পাঁচশত বছরের পশ্চিমা সভ্যতার সূচনালগ্ন হিসেবে। কিন্তু এসব ধারণার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। গান্ধীকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর মত কী? তিনি বলেছিলেন—"Its a good idea !"

প্রগতি এবং সভ্যতা সংক্রান্ত এ ধারণাকে আমি পুরোপুরি অস্বীকার করছি না। এই পাঁচশো বছরে প্রযুক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি ক্ষেত্রে

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের হিসাব রাখতে হবে এজন্য মানুষকে কতটা মুল্য দিতে হয়েছে। মানুষের জীবনের ওপর প্রগতির সত্যিকার প্রভাব কী, সেটা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিল্পপ্রযুক্তির উন্নয়নের পরিসংখ্যান দিয়েই কি আমরা প্রগতির মূল্যায়ন করব? মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগের বিনিময়ে হলেও রাশিয়ার শিল্পকারখানার বিপুল উন্নতি ঘটিয়েছেন বলেই কি স্ট্যালিনকে আমরা প্রশংসা করব? আমার মনে আছে আমরা যখন হাইস্কুলে আমেরিকার ইতিহাস পড়তাম তখন গৃহযুদ্ধ এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়টাকে মহান শিল্পবিপ্লবের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এই সময়টাতেই আমেরিকা একটি বিরাট অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। মনে আছে যখন দেশজুড়ে ইস্পাত আর তেল কারখানার নাটকীয় বিকাশ আর জালের মতো রেলপথ তৈরির কাহিনীগুলো পড়তাম তখন শিহরিত হতাম। কিন্তু এই প্রগতির জন্য সাধারণ মানুষকে কী মূল্য দিতে হয়েছে সেইসব কাহিনী আমাদের জানানো হয়নি। আমরা জানতাম না যে সুতার কারখানায় যে প্রভূত উৎপাদন হয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের কারণে, আমরা জানতাম না যে কাপড়ের কলে কাজ করত খুব অল্পবয়সী মেয়েরা, যারা মাত্র বারো বছর বয়সে শ্রমিক হিসেবে কারখানায় ঢুকত এবং অধিকাংশ পঁচিশ বছর হওয়ার আগেই মারা যেত। আমরা একথাও জানতাম না যে আমাদের দীর্ঘ রেলপথগুলো তৈরি করেছিল চীনা এবং আইরিশ অভিবাসীরা, এদের অনেকেই গ্রীষ্মের গরমে পুড়ে, শীতে ধুঁকে ধুঁকে, আক্ষরিক অর্থে কাজ করতে করতে মারা গেছে। মিল-কারখানার শ্রমিকরা যে তখন বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করত, তাদের শিশুরা যে প্রতিনিয়ত অপুষ্টি আর মহামারীতে মারা যেত সে খবর আমরা কখনোই পাইনি। আমরা জানতে পারিনি কীভাবে শ্রমিক, অভিবাসী এবং আদিবাসীরা ধর্মঘটের মাধ্যমে দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার দাবি আদায় করে নিয়েছিল। এ সবকিছুই ঘটেছিল প্রগতির নামে। শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতিতে মানুষের বিস্তর উপকার হয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে গত পাঁচশো বছর ধরে এই পাশ্চাত্য উন্নয়নের ফল ভোগ করছে নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাতি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এখনও তৃতীয় বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে আছে, তাদের মৃত্যু হচ্ছে অতি সাধারণ সব রোগে।

তাই আবারো প্রশ্ন থেকে যায়, কলম্বাসের অভিযান কি সত্যিই বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ? কলম্বাস পৌঁছানোর আগে ঐ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছিল এক সভ্যতা, সেই সভ্যতার কী মূল্যায়ন করব আমরা? সেসব আদিবাসীদের জীবনযাপন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন লাস কাসাসসহ আরো অনেকেই। বহিরাগতদের আশ্চর্যান্বিত করেছিল সেসব মানুষের যৌথজীবনের ধরন, উদারতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সৌন্দর্যবোধ আর নারী-পুরুষের সামাজিক সমতায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্ক এবং পেনসিলভেনিয়ার আদিবাসী ইরোকুইসদের সমাজে গণতান্ত্রিক চর্চা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা। ইতিহাসবিদ গ্যারি ন্যাশ ইরোকুইসদের সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন—

"ইউরোপীয়রা আসবার আগে এই উত্তরপূর্ব জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার জনপদের জীবনে আইন, পুলিশ, কোর্টকাছারি, জেল ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তবু সে সমাজে আচার-আচরণের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। ভুলশুদ্ধের ব্যাপারে ছিল একটা কঠোর নীতিবোধ।"

এই আদিবাসীদের ভূমি দখল করেই গড়ে উঠেছে আমেরিকা নামের নতুন এক দেশ। বাধা দিলেই তাদের হত্যা করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি। তাদের কোণঠাসা করতে করতে পরিণত করা হয়েছে, দেশের ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীতে। এভাবেই চলছে পর্যায়ক্রমে আদিবাসী সমাজকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া।

১৮৩০-এ 'ব্ল্যাক হক ওয়ার'-এর সময় আদিবাসীদের সঙ্গে আমেরিকানদের শতাধিক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। সেসময় মিশিগানের গভর্নর লুইস কাস আদিবাসীদের হাজার হাজার জমি দখলকে 'সভ্যতার প্রসার' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'একটা সভ্য সমাজের সাথে একদল বর্বর মানুষ তো বসবাস করতে পারে না।'

১৮৮০ দশকে কংগ্রেস আদিবাসীদের যৌথ মালিকানাধীন জমিগুলোকেও খণ্ডখণ্ডভাবে ভাগ করে ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেয়। আজকের পরিভাষায় বললে বলা যায়, প্রাইভেটাইজেশন করা হয়। আদিবাসীরা কী ধরনের বর্বর ছিল তার ধারণা পাওয়া যেতে পারে প্রাইভেটাইজেশন আইন প্রণেতা হেনরি লুইসের বক্তব্যে। লুইস শেরোকি জাতিদের সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"নিজের একটা বাড়ি নেই এমন মানুষ এই জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তাদের মধ্যে কোনো ভিক্ষুক নেই, কারো কাছে কারো ঋণ নেই। এরা নিজেরাই নিজেদের স্কুল এবং হাসপাতাল গড়ে তুলেছে। তারপরও এদের সমাজের সীমাবদ্ধতা বেশ স্পষ্ট। এরা সবাই মিলে যতটুকু উৎপাদন করে ততটুকু নিয়েই তারা সন্তুষ্ট, কারণ এদের জমিগুলো সব যৌথ মালিকানাধীন। নিজে আলাদাভাবে উন্নতি করবার কোনো স্পৃহা তাদের নেই। তোমার বাড়িটা যে তোমার প্রতিবেশীর চাইতে আরো সুন্দর হতে পারে এই বোধই তাদের মধ্যে কাজ করে না। তাদের ভেতর স্বার্থপরতার কোনো বোধ নেই অথচ স্বার্থপরতাই তো সভ্যতার ভিত্তি।"

হ্যাঁ, কলম্বাসের অভিযানের মূল অনুপ্রেরণা ছিল এই 'স্বার্থপরতা' যা কিনা তাদের মতে সভ্যতার ভিত্তি। একইভাবে আজ আমেরিকার রাজনৈতিক নেতারা এবং সব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রচারমাধ্যমগুলো সোৎসাহে বলে বেড়াচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে মুনাফার মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলে তারা সেসব দেশের বিরাট এক উপকার করেছে।

স্বীকার করি অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে মুনাফার মনোবৃত্তির হয়তো একটা ভূমিকা আছে কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই মুনাফাভিত্তিক পশ্চিমা মুক্তবাজারের পরিণামও মারাত্মক। এই মুনাফার মনোবৃত্তিই শতাব্দীব্যাপী পশ্চিমা সভ্যতার পথ ধরে জন্ম দিয়েছে নির্মম সাম্রাজ্যবাদ।

আফ্রিকার সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে জোসেফ কনরাড তার 'হার্ট অব দ্য ডার্কনেস' বইটি লিখেছিলেন ১৮৯০-তে। সেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন হাতির দাঁতের লোভে কঙ্গোতে ছুটে আসা শ্বেতাঙ্গদের কর্মকাণ্ড। তিনি লিখেছেন—"বাতাসে শুধু একটি শব্দের গুঞ্জন, 'হাতির দাঁত'। তাদের দীর্ঘশ্বাসেও একটি শব্দের গুঞ্জন, 'হাতির দাঁত'। যেন হাতির দাঁতের নামে চলছে প্রার্থনা। শুধু তাই নয়, ঐ ভূখণ্ডে আর যা-কিছু আছে তাদের নিংড়ে নেবার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছে শ্বেতাঙ্গরা। অন্যের বাক্স ভেঙে চুরি করবার সময় ডাকাতের যে নীতিবোধ কাজ করে, বলা যায় শ্বেতাঙ্গদের নীতিবোধ ছিল তাই।"

সুতরাং আমরা যেন ভুলে না যাই মুনাফার লাগামহীন প্রবৃত্তি জন্ম দিয়েছে মানুষের উপর মানুষের সীমাহীন নিপীড়ন, শোষণ, বর্বরতা; জন্ম নিয়েছে শিশুশ্রম, বিষাক্ত আবহাওয়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশ।

লুথার স্ট্যান্ডিং বিয়ার ১৯৩৩-এ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"কথা সত্য যে শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু সভ্যতার এইসব ফল যা যেমন বর্ণাঢ্য এবং আকর্ষণীয় তেমনি পীড়াদায়ক এবং ভয়ঙ্করও বটে। চুরি, ডাকাতি এবং নিপীড়ন যদি সভ্যতারই উপাদান হয় তাহলে শেষপর্যন্ত প্রগতির সংজ্ঞাটাই বা কী দাঁড়ায়? যে লোকটি স্রেফ মাটিতে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে জীবনের গভীর অর্থ সন্ধান করছেন এবং নিজের সঙ্গে প্রাণী ও জড়জগতের ভ্রাতৃত্ব আর ঐক্যের বোধ ধারণ করছেন তিনিই তো নিজের মধ্যে সভ্যতার যথার্থ বীজ বপন করছেন।"

আজ পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তাতে বিজ্ঞজনেরা প্রগতির সংজ্ঞাকেই পুনর্বিবেচনা করার কথা বলছেন। পশ্চিমা ভাবনায় প্রগতির স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদরা ১৯৯১ সালে MIT-তে দুদিনের একটি সম্মেলন করেছিলেন। 'বোস্টন গ্লোব' পত্রিকায় সেই সম্মেলনের ওপর লেখা প্রতিবেদনে বলা হয়—"MIT সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন প্রগতির নামে এযাবৎ পৃথিবীর সম্পদের চূড়ান্ত অপব্যবহার করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে করা হয়েছে কলুষিত। এখন পৃথিবীর মানুষের উচিত প্রগতি এবং প্রবৃদ্ধির চাইতে স্থায়িত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং স্থিরতা নিয়ে বেশি ভাবা।... এই প্রশ্নে উত্তপ্ত আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন সম্মেলনের বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ, বৈজ্ঞানিক, ধর্মতাত্ত্বিক, চিকিৎসক আর অর্থনীতিবিদরা।"

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ইতিহাসবিদ লিও মার্ক্স বলেছেন—"প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাটাই একধরনের প্রগতি, যা প্রকৃতিকে জয় করার সনাতন ধারণা থেকে পৃথক।"

সুতরাং কলম্বাস নিয়ে পর্যালোচনা করা বস্তুত প্রগতি, সভ্যতা, প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলোই পুনর্বিবেচনা করা। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে আমরা যে-পদ্ধতিতে কলম্বাসকে পর্যালোচনা করছি সেটি সঠিক নয়। তাদের যুক্তি হল—"আপনারা কলম্বাসকে তার প্রেক্ষাপটের বাইরে এনে বিচার করছেন। আপনারা তাদের দেখছেন বিংশ শতাব্দীর চোখ দিয়ে। পাঁচশো বছর আগে যে ঘটনা ঘটে গেছে তাকে আজকের দিনের মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। এটি ইতিহাসসম্মত নয়।"

এ যুক্তি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। এই যুক্তির অর্থ কি এই যে পনেরো বা ষোলো শতকে বর্বরতা, শোষণ, লোভ, নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন ইত্যাদি নৈতিক বলে বিবেচিত হতো এবং কেবল বিংশ শতাব্দীতে এসে এ মূল্যবোধ পাল্টে গেছে? ব্যাপারটা তো তা নয়। এমন কিছু মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে যা কলম্বাসের যুগ এবং আমাদের যুগে একইভাবে সত্য। তার প্রমাণ পাই যখন দেখি কলম্বাসের কালের মতো আমাদের কালেও এমন কিছু মানুষ আছে যারা অন্যদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধে, শোষণ করে; পাশাপাশি যেমনি সেকালে তেমনি একালেও এমন কিছু মানুষ থাকে যারা এই শোষণ-বঞ্চনার বিরোধিতা করে, মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

একটা লক্ষণীয় এবং উৎসাহিত হবার মতো ব্যাপার হচ্ছে এবারের কলম্বাসের পাঁচশো বছর পূর্তি উৎসবের সময় আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একটা প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠেছে। আগের কোনো শতবর্ষ পূর্তিতে এমন ঘটনা ঘটেনি। এবার প্রধানত প্রতিবাদ জানিয়েছে আমেরিকার সংখ্যালঘু আদিবাসীরা। তারা সভা-সম্মেলন করে আমেরিকার জনগণকে জানাতে চেষ্টা করেছেন পাঁচশো বছর আগের প্রকৃত ইতিহাস এবং সেই ইতিহাস কী শিক্ষা দেয় জানাতে চেয়েছেন সেকথাও।

ইদানীং নতুন প্রজন্মের অনেক শিক্ষক দাবি তুলেছেন স্কুলে কলম্বাসের কাহিনীটি পড়ানো হোক আদিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৯৯০-এ আমি টেলিভিশনে কলম্বাস-বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান করি। ব্ল্যাক লিন্ডনে নামে এক হাইস্কুল ছাত্রী সেই অনুষ্ঠানে ফোন করে বলেছিল যে সে লস এঞ্জেলেস সিটি কাউন্সিলকে আবেদন করেছিল যেন এবার সনাতন এই কলম্বাস দিবস পালন করা না হয়। স্প্যানিশদের গণহত্যার শিকার আরোয়াক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আদিবাসীদের কথা সে লিখে পাঠিয়েছিল সিটি কাউন্সিলকে। কিন্তু কাউন্সিল তাকে তেমন পাত্তা দেয়নি। সেই অনুষ্ঠানেই হাইতির আদিবাসী এক মহিলা বলেছিলেন—"এই মেয়েটি ঠিকই বলেছে... আমাদের সেই জ্ঞাতিভাইরা তো আর একজনও বেঁচে নেই। সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ যে গণআন্দোলন হয় তখন জনতা কলম্বাসের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে, যা এখন সিটি হলের মাটির নিচের ঘরটিতে পড়ে আছে।" মহিলা শেষে বললেন—"আমরা কেন আদিবাসীদের মূর্তি তৈরি করি না?"

দেখা যাচ্ছে পাঠ্যবইয়ে এখনও সনাতন কাহিনী প্রচলিত থাকলেও বহু শিক্ষক এবং ছাত্র এখন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বিল বিগলো সনাতন এই ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে এমন কিছু লেখা ছাত্রদের পড়িয়েছেন এবং তারপর তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। একজন ছাত্র লিখেছে—"১৪৯২-তে কলম্বাস নীল সাগর পাড়ি দেবার জন্য জাহাজ ভাসালেন...এ গল্প সুইস পনিরের গল্পের মতোই সত্য।" আরেক ছাত্র তার ইতিহাস বইয়ে সত্য গোপন করা হয়েছে বলে ক্ষুব্ধ হয়েছে। সে লিখেছে—"সত্য যে গোপন করা হয়েছে তার একটা সহজ উদাহরণ হল কলম্বাসের কাহিনী...।" আরেক ছাত্র লিখেছে—"আমার মনে হচ্ছে লেখকরা বেছে বেছে শুধু আমাদের গৌরবের কাহিনীগুলোই ছাপিয়েছে যাতে আমরা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠি... তারা চায় আমরা যেন এই দেশটাকে মহান এবং খুবই শক্তিধর মনে করি, আমরা যেন মনে করি আমাদের দেশ যা করে সবই সঠিক।...আসলে দেখছি আমাদের সব মিথ্যা কথাই গেলানো হয়েছে।"

ছাত্ররা যখন জানতে পারে তাদের ইতিহাসপাঠের শুরু হয় যে কলম্বাসের কাহিনী দিয়ে সেই কাহিনীতেই রয়েছে গলদ। তখন পুরো ইতিহাস শিক্ষা নিয়েই তার মধ্যে একটা সন্দেহের জন্ম হয়। এই সন্দেহ স্বাস্থ্যকর। রেবেকা নামের এক ছাত্রী লিখেছে—"সত্যি বলতে কে আমেরিকাকে আবিষ্কার করল তাতে কী বা এমন এসে যায়? অথচ এই নিয়ে সারাজীবন আমাদের কত মিথ্যা গল্প না শোনানো হয়েছে, ভাবলে রাগ হয় ভীষণ।"

ইতিহাস নিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের সমালোচনামূলক মন্তব্যে একটা বিশেষ মহল অবশ্য বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এই মহলটি পশ্চিমা সভ্যতার একনিষ্ঠ গুণমুগ্ধ। ১৯৮৪ সালে রিগানের শিক্ষাসচিব উইলিয়াম বেনেট উচ্চশিক্ষাবিষয়ক এক প্রতিবেদনে পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কে লিখেছেন—"চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষার শিখরস্পর্শী এই সংস্কৃতিই আমাদের সাধারণ সংস্কৃতি।" পাশ্চাত্য সভ্যতা ধারণার ধারক-বাহকদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র দার্শনিক অ্যালেন ব্লুম ষাট দশকে শিক্ষাব্যবস্থা বদলানোর দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনে খুব আতঙ্কিত হয়েছিলেন। 'দ্য ক্লোজিং অব আমেরিকান মাইন্ড' বইয়ের লেখক কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিক্ষোভ দেখে ভীত হয়ে বলেছিলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এতে শিক্ষার চরম ব্যাঘাত ঘটবে। ব্লুমের ধারণার যে বিশ্ববিদ্যালয় তাতে এমন সব চৌকশ ছাত্র পড়বে যারা দিনরাত কেবল অ্যারিস্টটল আর প্লেটো চর্চা করবে। জানালার বাইরে বর্ণবৈষম্য আর ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত ছাত্রদের মিছিলে তারা বিরক্ত বোধ করবে। ফিরেও তাকাবে না। ব্লুমের এই লেখা পড়তে গিয়ে আমার মনে পড়ছিল আটলান্টার কৃষ্ণাঙ্গ কলেজে অধ্যাপনাকালীন কিছু সহকর্মীর কথা। নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যোগ দিতে বহু ছাত্র যখন ক্লাস ফেলে পথে নামছিল তখন এমনিভাবে অনেক শিক্ষকই বেশ নাখোশ হয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে এসব ছাত্রের পড়াশোনা গোল্লায় গেছে। অথচ আমার তো মনে হয় সামাজিক সংগ্রামের অংশগ্রহণের মাধমে ঐ ছাত্ররা কয়েক সপ্তাহে যা শিখেছিল, সারা বছর ক্লাস করেও তা শিখতে পারত না।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যারা মানবজাতির শীর্ষ অর্জন মনে করেন শিক্ষাবিষয়ে তাদেরই এই খর্ব, সংকীর্ণ ধারণা। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি মানবপ্রগতির সর্বোচ্চ শিখর হয় তাহলে তাদের মতে আমেরিকা হচ্ছে সে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ব্লুম লিখেছেন—"পৃথিবীর ইতিহাসে এখন চলছে আমেরিকার মুহূর্ত। আমেরিকার গল্প একটাই এবং তা হচ্ছে স্বাধীনতা আর সমতার অবিরাম বিকাশের গল্প। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিধা নেই যে সেই প্রথম বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং সমতার ধারণাই ছিল আমাদের জীবনের মূল নির্যাস।"

সত্যিই কি তাই? আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসী, গৃহহীন, স্বাস্থ্যবীমা-বঞ্চিত অসংখ্য মানুষ কিংবা আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির কোপানলের শিকার পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষও কি একইভাবে বলবেন যে আমেরিকার একটাই গল্প... স্বাধীনতা আর সাম্য?

পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি জটিল প্রসঙ্গ। এতে যেমন আছে অনেক চমৎকার ব্যাপার তেমনি আছে প্রচুর ঘৃণ্য উপাদানও। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে পাশ্চাত্য গুণকীর্তন করবার ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন জানতে পারি যে লুসিয়ানার ক্লু ক্লাক্স ক্ল্যান সদস্য প্রাক্তন নাজিকর্মী ডেভিড ডিউক বলে যে লোকে আসলে তাকে ভুল বুঝেছে। রিপোর্টারকে সে বলে—"আমার যাবতীয় কাজ এবং চিন্তার মূল অনুপ্রেরণা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আমার ভালোবাসা।"

অনেকেই অভিযোগ করেন কলম্বাসসহ সনাতন ইতিহাসপাঠকে সমালোচনা করে আমরা বাকস্বাধীনতার ক্ষতিকর সুযোগ নিচ্ছি। বলাবাহুল্য ইতিহাসের রক্ষণশীল অভিভাবকরাই এ ধরনের অভিযোগ করেন, যারা চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করতে চান না; নতুন দৃষ্টিকোণ, নতুন তথ্য, নতুন ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যারা পণ্যের মুক্তবাজারের খুব ওকালতি করেন তারা আবার চিন্তার মুক্তবাজারে বিশ্বাস করেন না। তারা চান পণ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং চিন্তা দুক্ষেত্রের বাজারই দখলে থাকবে ক্ষমতাবান এবং ধনবানদের হাতে। ভাবনার প্রতিষ্ঠিত বাজারকে আঁকড়ে রাখতে তারা আর কোনো নতুন ভাবনাকে প্রবেশাধিকার দিতে চান না।

যে সভ্যতা গত পাঁচশো বছর ধরে আমাদের উপহার দিয়েছে অগণিত যুদ্ধ, নিপীড়ন আর ধ্বংস তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে তোলা প্রয়োজন। পৃথিবী এখন আশ্চর্যজনকভাবে ছোট হয়ে এসেছে। পৃথিবীর সম্পদ বেড়েছে প্রচুর, মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগও তৈরি হয়েছে বিস্তর, ফলে পৃথিবীতে সুন্দর, শোভন একটি সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপকভাবে। সুতরাং আজকের পৃথিবীতে ক্ষুধা, অজ্ঞতা, নিপীড়ন, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি টিকে থাকবার আর কোনো যুক্তি নেই।

আমরা যখন ইতিহাস পর্যালোচনা করছি তখন শুধুমাত্র অতীতকেই বিবেচনা করছি না, বর্তমানের দিকেও লক্ষ রাখছি। আমরা সময়ের দিকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাবার চেষ্টা করছি যারা তথাকথিত সভ্যতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ইতিহাসকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার এই সহজ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমরা সম্পাদন করতে চাই। কাজটি আমাদের বিশেষভাবে করা দরকার, কারণ আমরা একটা নতুন শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছি। আগামী শতাব্দীটিকে আমরা যদি নতুন রূপে পেতে চাই তাহলে এ কাজ আমাদের করতে হবে, কারণ আমরা চাই না আগামী শতাব্দীটি হোক আমেরিকান শতাব্দী কিংবা পাশ্চাত্য শতাব্দী অথবা শ্বেতাঙ্গ শতাব্দী কিংবা পুরুষ শতাব্দী অথবা কোনো বিশেষ জাতির বা গোষ্ঠীর শতাব্দী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিকথা

রাশিয়া ১৯২৭

▼

কাজান জাকিস

একেকটা সময় আসে যখন আশ্চর্য গুঁতো দেয় বাস্তবতার গায়ে, ফুটো করে এবং ঢুকে পড়ে সেখানে। যখন সময় এল, লেনিন তাঁর জাগতিক ছোটখাটো যা-কিছু সম্পত্তি একটা বাক্সে ভরে নিলেন, তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপিগুলো বাঁধলেন একটা মোটা বান্ডিলে তারপর বিদায় নিতে চললেন সেই সুইচ মুচি ভদ্রলোকের কাছে, যার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন সুইজারল্যান্ডে।

বাড়িওয়ালা লেনিনের হাত চেপে ধরে, কণ্ঠে করুণা আর সহানুভূতি নিয়ে বললেন—"কোথায় চললেন ভ্লাদিমির ইলিচ? কোন্ পাগলামিতে আপনি রাশিয়ায় ফিরছেন বলুন তো? ওখানে কে আপনাকে থাকবার জায়গা দেবে, কাজ দেবে? তাছাড়া ওখানে গিয়ে করবেনই বা কী? তার চেয়ে আপনি বরং এখানেই আরাম করে থেকে যান।"

"কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে" বললেন লেনিন।

"যেতেই হবে কেন?"

লেনিন শান্তকণ্ঠে বললেন, "হবেই।"

"কিন্তু আপনি তো পুরো মাসের ভাড়াই দিয়েছেন, আর মাস শেষ হতেও তো এখনও ঢের বাকি। বাকি টাকাগুলো এখন কী করে ফেরত দিই বলুন তো?"

~ www.amarboi.com ~

লেনিন বললেন, "সে ঠিক আছে, ওটাকে আপনি রেখে দিন। আমি চললাম।"

এবং তিনি চলে গেলেন। গিয়ে পা রাখলেন রাশিয়ার মাটিতে। মাথায় তাঁর সেই ছোট্ট টুপিটি, গায়ে জীর্ণ সেই কোট। খাটো মলিন নিরস্ত্র একজন মাত্র সদস্য নিয়ে গড়া একটি সেনাবাহিনী। তাঁর সামনে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ চরাচর, বর্বর রুশ কৃষক, উৎফুল্ল অভিজাত শক্তিমান যাজক, দুর্গ, প্রাসাদ, কারাগার আর সেনা ছাউনি। সেইসাথে পুরনো আইন, পুরনো মূল্যবোধ এবং ভূমিদাসদের পেটাবার সেই তীক্ষ্ণ চাবুক। তাঁর সামনে আপাদমস্তক সমরসজ্জায় সজ্জিত এক বিশাল সাম্রাজ্য। ঐখানে তাঁর ঐ খুদে টুপিটি মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন লেনিন, তাঁর ছোট মঙ্গোলিয়ান চোখ গেঁথে রইল দিগন্তে। আর তখন তাঁর বুকের ভেতর একটা দানব শিস দিয়ে নাচতে নাচতে দাঁত কড়কড় করে বলত লাগল—"এ সবই তোমার, ভ্লাদিমির ইলিচ, তোমাকে দিয়ে দিলাম। বলো, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। বলো এবং দ্যাখো সোনায় সাজানো জার, ছাগুলে দাড়ি যাজক আর সুবেদী নাদুসনুদুস অভিজাতের দল কেমন এক ফুৎকারে উড়ে যায়। ওদের ঐ ভূপাতিত দেহের উপর দিয়ে হেঁটে যাও ভ্লাদিমির ইলিচ, এগিয়ে যাও বৎস এবং আরোহণ করো ক্রেমলিনের চূড়ায়। ওখানে টানিয়ে দাও তোমার ঐ লাল পতাকা, তোমার ঐ হাতুড়ির আঘাতে গুঁড়ো করে দাও ওদের মাথা, তারপর ঐ কাস্তে দিয়ে মাথাটাকে ছিন্ন করে ফ্যালো ধড় থেকে।"

"কে তুমি?" লেনিন জিজ্ঞাসা করেন বারবার, কান পেতে থাকেন তার ভেতরকার দানবটির উত্তরের জন্য। "তোমার নাম আমাকে জানতে দাও, বলো তুমি কে?"

"আমি আশ্চর্য"—দানব উত্তর দেয় এবং তার শিং দিয়ে গুঁতো দিতে থাকে রাশিয়ার গায়ে।

রাশিয়ার দিকে স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ চোখে তাকাতে পেরেছেন খুব কম মানুষই। আলো-আঁধারিতে ভরা রাশিয়ার বহুমুখী অবয়বের মধ্যকার ঐক্যটিকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছেন অধিকাংশই। বোঝেননি যে স্লাভিক আত্মা আর পশ্চিমা আত্মায় বিস্তর ফারাক। রুশরা তাদের অন্তরের বিবিধ দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে ঐকতান ঘটাতে জানেন, যা যুক্তিবাদী ইউরোপীয়দের স্বভাববিরুদ্ধ। ইউরোপীয়দের কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে হলো যুক্তি, যুক্তির ওপরই গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। কিন্তু রুশদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান তাদের অন্তর। অন্তর নামের সেই তমসাচ্ছন্ন, ঐশ্বর্যময়, স্ববিরোধী, দুর্বোধ্য শক্তি যা মানুষকে মুক্তিবোধের সীমানা পার করে পৌঁছে দেয় দুর্মর, অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগে। যুক্তির কঠিন শাসনমুক্ত একপ্রকার প্রবল সৃষ্টিক্ষম শক্তির অধিকারী তারা। মাটিলগ্ন একটি জাতি। অন্তরেও মাটি আর অন্ধকার।

রুশ কৃষক এই মুঝিকেরা যেন একতাল অন্ধকার, একতাল ময়দার মতোই তাদের ময়ান বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেনিন নামের আলোকপ্রাপ্ত এই অনমনীয় মানুষটি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মিক এবং জাগতিক এই দু আদিম শত্রু এবং মিত্রকে ক্রেমলিনের রক্তাক্ত চত্বরে লড়াইরত দেখব বলেই আমার উদগ্রীব অপেক্ষা।

ঘন বরফে ঢেকে আছে চারদিক। বিষণ্ন মুখে হাঁটছে মুঝিকের দল, কোনো তাড়া নেই, যেন হাতে তাদের অনন্তকাল। একটা কালো কুচকুচে কাক মাঝে মাঝে উড়ছে এই জনপদের উপর। খাবার খুঁজছে বুঝিবা।

একটা স্টেশনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি ট্রেনের জন্য। স্টেশন চত্বরে আমার চারপাশে অগণিত কোঁচকানো চোখের মঙ্গোলীয় মুখ, কারো দাড়িতে আটকে আছে তরমুজের বিচি। দূরে দুজন মহিলা গণককে দেখা যাচ্ছে, তাস ভাঁজ করে ভাগ্য গণনা করছেন মানুষের। একজন বয়স্ক মুঝিক কাপ থেকে চা পিরিচে ঢেলে সশব্দে পরম আনন্দে পান করছেন। ময়লা কম্বল জড়ানো মহিলাদের পিঠে ক্যাঙ্গারুর মতো থলিতে বাচ্চা ঝুলছে। আমার চারিদিকে একটি ঘর্মাক্ত ধূমায়মান মানবপিণ্ড। আস্তাবলের মতো একটা গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। বেথলেহেমের আস্তাবলের গন্ধ কি এরকমই ছিল?

দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়িয়ে এল, আমাদের অপেক্ষার শেষ নেই। আমার আশেপাশের মুখগুলো শান্ত নিরুদ্বিগ্ন। ট্রেন আসছে কিনা তা বাইরে গিয়ে একটু দেখবার উদ্যোগও নেই কারো। সবাই নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছে, তারা নিশ্চিত যে আজ হোক কাল হোক ট্রেন সন্দেহাতীতভাবে আসবেই। তারা জানে যে 'সময়' একজন অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক, মহান অধিপতি, তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো দুঃসাহস তাদের থাকতে নেই।

ভোরের দিকে দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। এবার সবাই উঠে তাদের মালপত্র গোছাতে লাগল, খুব একটা ব্যস্ত হতে দেখা গেল না কাউকেই। আমার পাশে ধূসর দাড়িওয়ালা যে বৃদ্ধটি লম্বা হয়ে শুয়ে সারারাত নাক ডেকে ঘুমিয়েছে, এবার তিনি আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার দিকে বেশ বিজয়সূচক একটা চাহনি দিলেন, যেন বলতে চাইছেন, ওহে ভদ্রলোক ট্রেন আসছে না বলে মিছেই তুমি রেগেমেগে গজগজ করলে সারারাত, একটু ঘুমোলেও না, এখন দ্যাখো তো, দ্যাখো, কী চমৎকার ঠিক ঠিকই এসে পৌঁছে গেছে সে।

ট্রেন চলছে। তুষারপাত। ছোট ছোট গ্রাম, চার্চের সবুজ সুচালো ছোট গম্বুজ, বাড়ির চালের উপর নিথর হয়ে আছে ধোঁয়ার রেখা। আরও কাক, আকাশ এবং তুষার। আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, গভীর নীলে ভাসিয়ে দিয়েছি দুই চোখ। দূরে ধূসর আকাশে হঠাৎ আবছা দেখা গেল, গোল অলঙ্কৃত সেই বিখ্যাত গম্বুজ।

তখন দুপুর। আমরা পৌঁছে গেলাম শ্রমিক জনতার নয়া জেরুজালেমে, রাশিয়ার হৃদয় মস্কোতে। বান্ধবী ইন্তকা স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। দেখা হতেই হেসে বলল, "জালে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আটকা পড়েছ এবার, অবশ্য ভয় নেই, এ বড় বিশাল জাল, যতদূর ইচ্ছে হেঁটে বেড়াও জালের সুতো খুঁজে পাবে না, যদিও জাল তোমাকে ঘিরে আছে ঠিকই। এটিই হল আসল স্বাধীনতা, বুঝলে।”

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি মস্কো নামের এই বহুবর্ণিল বিচিত্র বিশৃঙ্খলাকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। গোটা শহরটা যেন বরফের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভারী পাগড়ি মাথায় একদল ফেরিওয়ালা ফেরি করছে রাস্তায়। বানরের মতো চামসিটে চামড়ার একদল চীনা বিক্রি করছে কাগজ আর কাঠের তৈরি খেলনা। ফুটপাতের প্রায় প্রতিটি ইঞ্চিতেই পুরুষ আর মহিলা ফেরিওয়ালা, তারা চিৎকার করে ফেরি করছে ফল, ধূমায়িত মাছ, শিশুদের পোশাক, মুরগি এবং লেনিনের ছোট মূর্তি। তরুণী মেয়েরা ঠোঁটে সিগারেট চেপে খবরের কাগজ বিক্রি করছে। মাথায় লাল রুমাল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে মহিলা মজুর, হেঁটে যাচ্ছে মঙ্গোলীয় চোখে স্থূলকায়া মহিলারা। গম্বুজের মতো আস্ত্রাখান টুপি মাথায় হাঁটছে অর্ধ-উলঙ্গ শিশুরা। ল্যেংচে ল্যেংচে এগুচ্ছে কিছু পঙ্গু আর মাথা নিচু করে প্রতিটি পথচারীর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে হাত। কমলা রঙের পশু-চামড়ার পোশাক পরে হাঁটছে মুঝিকের দল। তাদের কারো দাড়ি জড়িয়ে দেখতে হয়েছে ভুট্টার মতো। তারা হেঁটে যাওয়ার পর বাতাস শুঁকলে মনে হবে বুঝি হেঁটে গেছে একপাল ষাঁড়।

রঙিন গম্বুজ-শোভিত চার্চ আর আকাশছোঁয়া দালান চারপাশে। চার্চে রাস্তায় ট্রামের গায়ে লেখা ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’। একটা বিরাট চার্চের দেয়ালে দেখলাম লাল অক্ষরে লেখা ‘ধর্ম জনগণের আফিম’। সন্ধ্যায় সশব্দ বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে হঠাৎ বেজে উঠল গভীর সুমধুর রুশ ঘণ্টাধ্বনি, সান্ধ্য উপাসনার আহ্বান। ‘বিশৃঙ্খলা’—মস্কো শহরে ঘুরবার পর এই শব্দটি মনে আসে প্রথম।

দ্বিতীয় যে শব্দটি মনে আসে তা হল ‘ভয়’। পৃথিবীর আর কোনো শহর এমন কঠিন, স্থির সংকল্প, গোমড়ামুখো মানুষ দেখতে পাওয়া যায় না, দেখা যায় না এমন আগুনে চোখ, চাপা ঠোঁট, এই উদ্বিগ্নতা। মনে হয় যেন মধ্যযুগীয় কোনো সন্ত্রস্ত শহরে এসে পৌঁছেছি। মনে হয় যেন নগরপ্রাচীরের বাইরে শত্রুরা এগিয়ে আসছে আর ভেতরের নগরযোদ্ধারা বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে প্রস্তুত হচ্ছে। প্রতিটি নাগরিকের মাথার উপর যেন ঝুলছে যুগপৎ ভয় আর আশা। মস্কোর আকাশে যেন ভীতিকর কিছু একটা ওত পেতে আছে। কোনো অগ্নিচক্ষু দেবদূত যেন বসে আছে ক্রেমলিনের চূড়ায়, যেন সে দেবদূত তার সহস্রচোখে নির্ঘুম প্রহরা দিয়ে চলেছে পুরো শহরটাকে।

হঠাৎ রাস্তার মোড়ে দেখা গেল লাল সৈন্যের একটি [illegible] তাদের কেমন হিংস্র উল্লাস। পথচারীরা সরে দাঁড়াল রাস্তা থেকে, ফুটপাত [illegible]। একজন গোলগাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহিলা হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তার ঝুড়ি থেকে লাল টকটকে আপেলগুলো গড়িয়ে পড়ল শাদা বরফের উপর। ভারী বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে লাগল সৈন্যরা, তাদের মাথায় সুচালো মোঙ্গল টুপি, পরনে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা কোট। সৈন্যদলের সামনে যে অফিসারটি আছেন দেখলাম তিনি একটি গান গাইতে শুরু করলেন প্রথমে। যখন কাছে এলেন দেখলাম তার গলার শিরা এমন ফুলে উঠেছে যেন ছিঁড়ে যাবে এখনই, মুখের মাংসপেশিগুলোতেও যেন খিঁচুনি ধরেছে তার, গাল দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। তিনি এতই উদ্দীপ্ত হয়ে মার্চ করছিলেন মনে হচ্ছিল যেন নাচছেন। অনেকক্ষণ তিনি একাই গাইছিলেন, একপর্যায়ে অন্যান্য সৈন্যরাও গান ধরল তার সঙ্গে। শীত জমে থাকা রাস্তাটি হঠাৎ যেন একটা আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠল, রাস্তাটিকে মনে হল যেন কোনো যুদ্ধক্ষেত্র। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা শিহরন খেলে গেল আমার শিরদাঁড়ায়। এই রুশ-উত্তেজনা বুঝি অচিরেই দখল করে নেবে লন্ডন, প্যারিসের মতো পৃথিবীর বড় শহরগুলোকেও। আমি জানি সবচাইতে রক্তলোভী এবং মাংসাশী প্রাণী কোন্‌টি, সেটি হচ্ছে একটি নতুন বিশ্বাস। আর সবচাইতে তৃণভোজী হচ্ছে, যে বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা এখন প্রবেশ করেছি নতুন বিশ্বাসের পাকস্থলীতে।

ঐ সন্ধ্যাতেই আমি নিকোলাই ক্লিয়েভ নামের একজন মরমী করিব সাথে পরিচিত হলাম। স্বল্প কেশ, সামান্য কটা দাড়ি। বয়স চল্লিশ কিন্তু দেখায় সত্তর। বেশ গর্বের সাথে আমাকে গোপনে তিনি বললেন, “রাজনীতি আর আইনকানুন নিয়ে ব্যস্ত রুশদের দলের আমি কেউ নই। আমি হলাম রূপকথা বানানোর দলে। আমরাই হলাম রাশিয়ার সোনার খনি, সত্যিকার রাশিয়ার ভবিষ্যৎ তো আমাদের উপরই।”

তিনি থেমে যান। এত সহজে কথাগুলো উচ্চারণ করে তিনি যেন অনুতপ্ত। কিন্তু বুকে অসীম গর্ব তার। নিজেকে চাপিয়ে রাখতে পারছেন না আর, আবার বলতে লাগলেন, “আসলে কি জানেন, ভাগ্যের দেয়ালকে গুঁড়ো করার কাজটা ষাঁড় আর ভালুকের দলের নয়, ও-কাজটা বরং করতে পারে একটা ফুটফুটে রাজহাঁসের হৃদয়।”

তিনি তাঁর গ্লাস ভদকায় ভরে একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলেন, জিহ্বায় তৃপ্তির শব্দ, তিনি আর একবার অনুতপ্ত হলেন। চোখ অর্ধেক বুজে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি কবি। আমার কথা বাদ দেন। কী বলছি নিজেই জানি না।”

রুশ বিপ্লব তাঁর মহান জন্মদিবস পালন করছে। সারা পৃথিবী থেকে তীর্থযাত্রীর দল এসে ভিড় জমিয়েছে এখানে, শাদা, কালো, হলুদ তাদের রং। একঝাঁক নিঃশব্দ পিঁপড়ের মতো পূর্বাঞ্চলের বাদামি মানুষেরা এভাবেই তো ভিড় করে মক্কায় অথবা বানারসে। তীর্থকেন্দ্র বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, ভালোবাসায় অথবা ঘৃণায়, শত্রু মিত্র সকলেরই চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে আজ মস্কোতে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়া জেরুজালেম, রেডস্কয়ারের পবিত্র সমাধিকেন্দ্রটি ঢেকে আছে বরফে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী অপেক্ষা করছে কখন সমাধির বন্ধ দরজা খুলবে। পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে ছুটে আসছে পুরুষ, নারী আর শিশুর দল। তারা মাটির নিচে শায়িত লাল সম্রাটের তাজা শরীরটিকে প্রণাম জানাবে। আমিও এসে জুটেছি তাদের সঙ্গে। কারো মুখে কোনো কথা নাই। ঐ কনকনে শীতের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। সবার চোখ ঐ পবিত্র সমাধির উপর। একসময় মানুষের বিশাল পিণ্ডটি নড়েচড়ে এগিয়ে যেতে লাগল ফটকটার কাছে। লাল সেনারা ফটকটা খুলেছে।

সেই মানবপিণ্ড ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঐ ফটকের অন্ধকারে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। সবার পিছু পিছু আমিও একসময় অদৃশ্য হলাম সে অন্ধকারে। আমরা ধীরে ধীরে মাটির নিচে নামতে লাগলাম। চারিদিকে বাতাস মানুষের নিশ্বাসে ভারী হয়ে আছে। আমার সামনে যে দুজন ভাবলেশহীন মুঝিক হাঁটছিল হঠাৎ তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন কোনো আলো এসে পড়েছে তাদের মুখে, বুঝি ভূগর্ভস্থ কোনো সূর্যের কিরণ। আমি গলা বাড়ালাম। অনেক নিচে অবশেষে পবিত্র শবদেহ সমেত কাচের বাক্সটি দেখা গেল। বিরল কেশ লেনিনের নীল মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে ভেতরে। শ্রমিকের পোশাকে যেন জীবন্ত হয়ে আছেন তিনি, কোমর থেকে পা পর্যন্ত লাল পতাকায় ঢাকা, ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ, বাম হাত বুকের উপর রাখা, আর তার হাসিহাসি মুখটিতে স্বর্ণাভ ছোট দাড়ি। আবেগে আপ্লুত চোখে রুশ জনগণ তাকিয়ে আছে ঐদিকে, বছরকয়েক আগে ঠিক যে-চোখে তারা তাকাত অলঙ্কৃত স্বর্ণাভ যিশুর প্রতিকৃতির দিকে। ইনি হলেন লাল যিশু। দুজনাতে সেই একই শাশ্বত মানবীয় নির্যাস, আশা আর ভয়। কেবল নামটি বদলে গেছে।

সমাধি থেকে আবার বেরিয়ে এলাম তুষারাবৃত চত্বরে। বিষণ্ন হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম লেনিনের জীবনসংগ্রামের কথা। যখন নির্বাসনে ছিলেন, কী দারিদ্র্য, বিশ্বাসঘাতকতা আর নিন্দাকে সহ্য করতে হয়েছে অবিরাম। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে গিয়ে হারিয়েছেন কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। কাচের বাক্সের ভিতর যে স্বর্ণাভ মুখটি দেখলাম তার নির্বাপিত চোখের পেছনে আমি রাশিয়ার গ্রাম শহর, তার বিস্তীর্ণ সমভূমি, প্রশস্ত নদী আর জনশূন্য বরফপ্রান্তরের কান্না আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। যেহেতু তিনিই ছিলেন রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিমান আত্মা তাই তিনিই হলেন সবচেয়ে দায়িত্ববান। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপন্ন রুশমাতাকে উদ্ধারের দায়িত্ব বর্তেছে তাঁর উপর। সবচেয়ে দুঃসাহসী দায়িত্বটি পালন করবেন বলেই তো রুশমাতা তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম, রক্ত আর অশ্রুর বিনিময়ে এমন একটি শক্তিমান আত্মার জন্ম দিয়েছেন।

রেড স্কয়ারে হাঁটছি এলোমেলো। আমার সাথে বান্ধবী ইতকা, আমার গাইড। ও কথা বলছে। ওর তারুণ্য আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমাকে বিস্মিত করে। ইতকা যখন কথা বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন ওর সমস্ত শরীর একটা আগুনের শিখায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, ঠিক এল গ্রেকোর আঁকা সন্তদের ছবির মতো। ইতকা বলে, "লেনিন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। কী বলব? কোথা থেকে শুরু করব? তিনি তো এখন আর মানুষ নেই, স্লোগানে পরিণত হয়েছেন। তিনি একজন পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। বিপ্লবের সময় যে শিশুরা জন্ম নিয়েছে তাদের বলা হয় লেনিনের সন্তান। মুঝিকদের সর্বদাই একজন অতিমানব ত্রাণকর্তা প্রয়োজন, তারা এখন তাদের আইকনস্ট্যান্ডে সাজিয়ে রাখে লেনিনের প্রতিমূর্তি, তার নিচে যত্নে জ্বালায় মোমবাতি। আর্কটিক সাগর থেকে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত রাশিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে জেলে, কৃষক আর রাখালের দল তাদের হাসি, গল্প আর দীর্ঘশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে লেনিনের প্রতিমূর্তি গড়ে। মহিলারা সিল্কে সেলাই করে তাঁর মুখ, পুরুষেরা কাঠে খোদাই করে আর শিশুরা কয়লা দিয়ে তাঁর মুখ আঁকে দেয়ালে। লেনিন নিজে একবার কোনো এক গ্রামে গমের দানা আর লাল মরিচের টুকরো দিয়ে তাঁর একটি প্রতিকৃতি পেয়েছিলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার কাছে লেনিন একটি স্লোগান। লেনিন জনগণের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছেন, তিনি জনগণের মাথার উপর ঝুলতে থাকা কোনো নেতা নন। জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে চিৎকার করে যা বলেছে তিনি তাকেই সুসংবদ্ধ একটা বাণীতে পরিণত করেছেন, একটা স্লোগানে রূপ দিয়েছেন। তাঁর স্লোগান মানেই তো সংগ্রাম, লড়াই।"

আর স্ট্যালিন? আমি জিজ্ঞাসা করি। আমার জানতে ইচ্ছে হয় গোঁফবাগানো, ধূর্তচক্ষু গম্ভীর চলনে বলনে মাপা, চৌকো ঐ ভয়ানক শরীরটি সম্পর্কে ইতকা কী বলে। কোন্ প্রজাতির পবিত্র দানব এই স্ট্যালিন?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ইতকা, বুঝি একটা যুৎসই উত্তর খুঁজছে। বোঝা যায় তার মন একটা নিষিদ্ধ অঞ্চলে ঢুকেছে এখন। অবশেষে কথাটি যেন খুঁজে পেল সে, বলল—

"লেনিন হলেন আলো, ট্রটস্কি শিখা আর স্ট্যালিন হলেন মাটি, রাশিয়ার কর্দমাক্ত মাটি। স্ট্যালিন তাঁর শরীরে একটা বীজ ধারণ করেছেন, গমের একটি দানা যা বপন করা হয়েছিল। এবার চাই কি প্রচুর বৃষ্টি হোক অথবা তুষারপাত কিংবা হোক মর্মান্তিক অনাবৃষ্টি তাতে কিছুই যায় আসে না। তিনি ঐ দানাকে আগলে রাখবেন, নষ্ট হতে দেবেন না কিছুতেই যতক্ষণ না সে বীজ একটা গমের শিষে পরিণত হয়। অসম্ভব ধৈর্যশীল আর অনমনীয় মানুষ তিনি, তিনি জানেন তিনি কী করছেন, সেইসাথে রয়েছে তাঁর অবিশ্বাস্য ধৈর্যশক্তি। একটা ছোট গল্প বলি শোনো। স্ট্যালিন তখন তিবলিসের একজন তরুণ শ্রমিক। তখন (রূপকথার মতো মনে হয় সেসব সময়কে) রুশ রাজারা মদ খেয়ে মাতাল হবার পর বন্দুকে হাত নিশানা করবার জন্য মুঝিকদের লাইন করে দাঁড় করাতেন বাড়ির চত্বরে। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসময় জারের সৈন্যরা প্রায়ই শ্রমিকনেতাদের গ্রেফতার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাত এবং মেরে ফেলত একপর্যায়ে। এরকমই একটা সময়ে তিবলিসের মালগাড়ির কুলিরা একদিন স্ট্রাইক করল। তারা বলল হয় আমাদের মানুষের মতো ন্যূনতম খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার একটা ব্যবস্থা করো নইলে আমরা কাজ বন্ধ রাখলাম। পুলিশ পাকড়াও করল সবাইকে, বাইরে লাইন করে দাঁড় করাল। জারের সেনাদল প্রত্যেকে একটা কাঁটা বসানো চাবুক হাতে নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। এক এক করে প্রতিটি শ্রমিক আদেশ অনুযায়ী তাদের পিঠের কাপড় খুলে সৈন্যসারির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল এবং প্রত্যেক সৈনিক সর্বশক্তি দিয়ে চাবুক বসাতে লাগল তাদের পিঠে। দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। অসহ্য ব্যথায় গোঙাতে লাগল সবাই। কেউ কেউ সৈন্যদের পুরো সারি পার হবার আগেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মারা গেল কয়েকজন। এবার কুলিদের নেতাটিকে আনা হলো। সে তার জামা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল এবং পিঠ পেতে দিল সৈনিকদের সামনে। সৈন্যসারির সামনে দিয়ে যাত্রা শুরু করবার আগে সে নিচু হয়ে মাঠ থেকে একটা কোমল ঘাসের পাতা ছিড়ে নিয়ে দুই দাঁতের মাঝখানে চেপে ধরল। তারপর সোজা হয়ে একে একে সব সৈনিকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। তীব্রবেগে চাবুকগুলো পড়তে লাগল তার পিঠের উপর। রক্ত গড়াতে লাগল তার শরীর বেয়ে কিন্তু মুখ খুলল না সে, একটা শব্দও করল না। ক্রুদ্ধ সৈন্যরা প্রত্যেকে একবারের জায়গায় দুবার তিনবার আঘাত করতে লাগল তাকে, কিন্তু সে নির্বাক। সে সৈন্যদের পুরো সারি একে একে পার হয়ে গেল, একটুও নিচু হলো না, গোঙাল না। শেষ সৈন্যটির চাবুকের আঘাতের পর সে তার দাঁতের ফাঁক থেকে সে ঘাসের পাতাটি ঐ সৈনিকটির হাতে দিয়ে বলল, "এইটা রাখো এবং আমার কথা মনে রেখো। ভালো করে দ্যাখো ঘাসটিতে আমি দাঁত বসাইনি। আমার নাম স্ট্যালিন।"

ইতকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, "প্রতিটি রুশ বহুবছর ধরে এমনি করে একটি কোমল সবুজ ঘাস দাঁতে চেপে আছে, সংগ্রাম করছে যাতে ওতে দাঁত না বসে যায়, বুঝলে?"

ঘাড় উঁচু করে ইতকার কথাগুলো শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল দূর স্তেপের বেগবান নিশ্বাস যেন বয়ে যাচ্ছে আমার শরীরের উপর দিয়ে। মনে আমার তোলপাড় হচ্ছে তখন।

আমাকে সবচেয়ে আলোড়িত করছিল এই সত্য যে, এই হট্টগোলময় শহর আর বরফাবৃত এই রুশভূমি ছাড়া আর কোথাও আমি এভাবে অদৃশ্যকে দৃশ্যমান হতে দেখিনি। না, অদৃশ্য বলতে আমি যাজকদের মতো ঐশ্বরিক কোনো ব্যাপারকে বোঝাচ্ছি না, আমি বলতে চাইছি মানুষের অন্তর্গত সেই রহস্যময় শক্তিমত্তার কথা যা মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। যেমন অদৃশ্য শক্তি বৃক্ষ, জীবজন্তুর পদার্থের উপর ভর করে তাকে

~ www.amarboi.com ~

ভারবাহী পশুর মতো একটা নির্দিষ্ট পথ, নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়, আমার চারপাশে সে শক্তিই দৃশ্যমান।

এখানে এখন সর্বদা যে কূটতর্ক, যুক্তিবিচার, আর্থরাজনৈতিক পরিকল্পনার আড়ম্বর চলছে বস্তুত এসবেরই মূলে রয়েছে এ যুগের অন্তর্গত চেতনা, আমাদের কালের বিষণ্ন, উন্মত্ত, নির্মম চেতনা। বর্বর মুঝিক থেকে শুরু করে সৌম্যদর্শন লেনিন সবাই চালিত হচ্ছেন সেই যুগচেতনারই তাড়নায়। এ চেতনা শুধু রাশিয়ার নয়, এ চেতনা কার্যত সারা পৃথিবীর অন্তর্গত চেতনা।

নয়া রুশ নামের এই ভয়ানক পরীক্ষাগারে পৌঁছে আমি তাদের অনেককেই নানাবিধ দার্শনিক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতাম। আমার মনে তখনও ভরপেট সেইসব সভ্যভব্য মানুষের হাবভাব, আলাপ আর ক্রীড়া করবার যাদের বিস্তর অবসর। পাশের দৃশ্যমান জগৎটিকে তখনও আমি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমার মনে তখনও আত্মার অদৃশ্য জগতের টানাপড়েন। আমি তো কেবলই বুদ্ধের পুষ্পশোভিত চত্বর থেকে ফিরেছি।

শোনা যায় বৃদ্ধ সক্রেটিস বাজারের পাশে একদিন হেঁটে বেড়াচ্ছেন এবং অপেক্ষা করছেন কোনো তরুণের জন্য, যার সাথে আলাপ জুড়ে দিয়ে তার ভাবনাচিন্তাকে বদলে দেবেন। কিন্তু সে সকালে কোনো তরুণের সাক্ষাৎ তিনি পেলেন না বরং তাঁর সাথে দেখা হলো এক বৃদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসীর। এ সন্ন্যাসী সক্রেটিসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বহুবছর পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছেছেন এখানে। সক্রেটিসকে দেখেই তিনি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, "হে ঋষি, পার্থিব জগৎ ত্যাগী, পরজীবন আর পরজগৎ জয়ী, ঈশ্বরজয়ী অহংদলনক্ষম, হে বলবান শ্বেত হস্তী, হে চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ জয়ী শরীর—আপনার দানের ঝুলি একটু উন্মুক্ত করুন আমার জন্য, দয়া করুন আমাকে। অনন্তে একটি বিন্দুর মতো ছুড়ে ফেলুন আমাকে, ছুড়ে দিন অনস্তিত্বের মহাসাগরে। হে প্রভু, হাত বাড়ান, আমাকে শাশ্বত বেদনার পথ দেখান।" সক্রেটিস এতসব বাক্যবিন্যাস শুনে সযত্নে তার হাসি লুকালেন এবং বললেন, "ওহে আগন্তুক, আমি যদি আপনার কথা সঠিক বুঝে থাকি তাহলে বুঝতে পারছি আপনি ঈশ্বর এবং অনন্ত বিষয়ে জানতে চাইছেন। আমি বরং আপনাকে আমার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি, পণ্ডিত যাজক সে, সে জানে কীভাবে পৃথিবীর জন্ম, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, নক্ষত্র কত বড়...এমনি অনেক কিছু। কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত যে এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না। আমার যা-কিছু ভাবনা শুধু এই পৃথিবী আর মানুষ নিয়ে।"

ভাবছিলাম কাল সকালে আমি যদি ক্রেমলিনে ঢুকে ঐ বৃদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতো প্রশ্ন শুরু করি তবে স্ট্যালিন কী হাসিটাই না হাসবেন

~ www.amarboi.com ~

ভোর হচ্ছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকালাম। হাতুড়ি কাস্তে আর লাল তারকার আলোকবাতি ভোরের আবছা আলোয় জ্বলছে। রাস্তায় সাজানো লাল ব্যানারের লেখাগুলো আমি পড়বার চেষ্টা করলাম। আরো খানিকটা ফরসা হলে পড়লাম শ্রমিক...লেনিন... বিশ্ববিপ্লব।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলাম। হোটেলের করিডোর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন নানা জাতির নানা বর্ণের মানুষের সাথে দেখা হচ্ছিল আমার। নানা দেশের আমন্ত্রিত শ্রমিক তারা। কেউ কায়িক, কেউ মানসিক। আমি অভিবাদন জানালাম একজন জাপানি লেখককে, পার্সিয়া ও আফগানিস্তানের দুজন আমন্ত্রিত অতিথিকে, দুজন আরবীয়কে, তিনজন ভারতীয় ছাত্র যুবককে এবং কাশ্মিরী শাল গায়ে দুজন ভারতীয় সুন্দরী তরুণীকে। দোতলায় আলাপ হলো দুজন বিশাল বপু মোঙ্গলীয়র সাথে এবং তিনজন বেঁটে চটপটে চীনা জেনারেলের সাথে। তাদের চোখেমুখে এশিয়ার উদ্বেগ। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই পৌঁছানোর জন্য সবাই ছুটতে লাগলাম। ধূসর আকাশ, প্রচণ্ড শীত, নাকমুখে সবার কুয়াশার ধোঁয়া। রেডস্কয়ার লোকে-লোকারণ্য। সরকারি কর্মকর্তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন লেনিনের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রের উপর। তার বিপরীতে ডিম্বাকৃতি গ্যালারিতে বসেছেন সারাবিশ্বের আমন্ত্রিত অতিথিরা, সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন নিশ্চল, তাদের পেছনে জনতার বিশাল ঢল, চাপা কোলাহল নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। আরো পেছনে দূরে ঘন কুয়াশায় ঢাকা কোনো প্রেতপুরীর মতো দেখা যাচ্ছে আইভান দি টেরিবল-এর প্রিয় ক্যাথিড্রালের বর্ণালি গম্বুজ। চটপটে চীনা জেনারেল তিনজন আমার পাশেই বসেছেন, বুকে তাদের নানারঙা পদক ঝোলানো, আরেক পাশে বসেছেন কয়েকজন ভারতীয় ছেলে এবং মেয়ে, একজন জাপানি বুদ্ধিজীবী এবং কানে সোনার দুল পরা একজন প্রকাণ্ড নিগ্রো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে দৃষ্টি বিনিময় করছিলাম, মৌন প্রীতি জানাচ্ছিলাম। একজন জাপানি কবি আমার হাত চেপে ধরল। আমি শুধু একটাই জাপানি শব্দ জানতাম, 'ককরু' যার অর্থ হৃদয়। বুকের উপর হাত রেখে আমি তার কানের কাছে গিয়ে বললাম—ককরু। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে কবি, জড়িয়ে ধরল আমাকে।

হঠাৎ কুচকাওয়াজের বাজনা বেজে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই, উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবার মুখ। এগিয়ে আসছে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় আর কালমাকের অশ্বারোহী দল, দলনায়ক মুখের সামনে একটা খোলা তরবারি উঁচু করে ধরে আছে আর পেছনের অশ্বারোহীর হাতে বল্লম আর নানারঙের ব্যানার নিয়ে নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোশাকে সেজে রয়েছে। লেনিনের সমাধিকে অভিবাদন জানিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে তারা। এরপর ঢেউয়ের মতো আসছে একটির পর একটি দল। আর্টিলারি, ইনফেন্ট্রি, বাল্টিক আর কৃষ্ণ সাগরের নাবিকদল, বিমানবাহিনী, মস্কো গার্ড, চামড়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পোশাকে সজ্জিত শ্রমিকেরা, মাথায় লাল রুমাল আর কাঁধে বন্দুকসহ মহিলা মজুর দল। এরপর আসতে লাগল জনতার অন্তহীন, বিস্ময়কর এক মিছিল। চারিদিকে লাল। যেন সমগ্র চত্বরজুড়ে ধীরে বয়ে চলেছে একটি লাল নদী। হেঁটে চলেছে অগণিত ছাত্র, কমিউনিস্ট যুবক, কৃষক; উটের পিঠে চড়ে চলেছে এশিয়া অঞ্চলের মানুষ; চীনারা চলেছে কাগজের তৈরি বিশাল এক ড্রাগন হাতে, ড্রাগনটার মুখ একবার বন্ধ হচ্ছে একবার খুলছে। একটা চাকা লাগানো ভেলায় শিকল দিয়ে বাঁধা বিশাল একটা লোককে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা শিশু হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে শিকলগুলো ভাঙছে। তার পিছনে গাড়িতে চলে দলে দলে আসছে যুদ্ধাহতের দল, জনতাকে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে তারা। মায়েরা এগিয়ে যাচ্ছে শিশুদের কোলে নিয়ে।

কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় কুয়াশা ফুঁড়ে দেখা দিল সূর্য। উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবার মুখ, চকচক করে উঠল চোখ, পুরো চত্বর কেঁপে উঠল জনতার উল্লাসধ্বনিতে। আমার সামনের দুই ভারতীয় তরুণী তাদের গায়ের শাল খুলে শরীর মেলে দিল বাতাসে। আমি চারপাশে তাকালাম, দেখলাম সবাই কাঁদছে। আমি আবার তাকালাম, কিছুই দেখতে পেলাম না এবার, আবার চোখও অশ্রুতে ঝাপসা। পাশের সেই চীনা জেনারেলকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলাম আমি এবং দুজনেই কাঁদতে লাগলাম। সেই নিগ্রোটি সবাইকে ঠেলে এসে সজোরে হাত চেপে ধরল আমার, সেও কাঁদছে এবং হাসছেও সশব্দে। এই অদ্ভুত স্বর্গীয় মত্ততা কতক্ষণ অটুট থাকে? কত দিন? কত শতাব্দী?

আমি যখন চীনা জেনারেলকে জড়িয়েছিলাম, তখন নিগ্রোটির সাথে করমর্দন করছিলাম, অনুভব করছিলাম আমার ভেতরের সীমানাগুলো ভেঙে যাচ্ছে, নামের সীমানা, দেশের সীমানা, জাতির সীমানা। চারপাশে কান্না, হাসি আর আলিঙ্গন। মানুষ মিলিত হচ্ছে মানুষের সঙ্গে। একটা বিদ্যুৎচমক যেন হঠাৎ আলোকিত করে দিয়েছে সবার মন, সবাই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে যে তারা মানুষ এবং এক। অনুভব করলাম সীমাহীন রুশ-প্রান্তরের মতোই আমার ছোট্ট হৃদয়টাও কেঁপে উঠছে। মনে হলো নিজেকে এবং অন্যকে যাবতীয় ভয় আর মিথ্যার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম ছাড়া কী আর লক্ষ্য হতে পারে জীবনের? অনেক অন্যায় জমেছে মানবজাতির মাথার উপর। এবার তার শেষ হওয়া উচিত। আমাদের অবশ্যই শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে মুক্ত বাতাসের, খেলনার আর শিক্ষার। নারীদের দিতে হবে সহানুভূতি আর স্বাধীনতা। পুরুষদের শেখাতে হবে ভদ্রতা আর বিনয়।

এটাই হলো রাশিয়ার কণ্ঠস্বর। আমি শপথ নিলাম এ স্বর আমি আজীবন বহন করব আমার কণ্ঠে। প্রেমে পড়া একজন মানুষের শপথ। আমি আমার জীবন উৎসর্গ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে প্রস্তুত ছিলাম তখন। আমি প্রথমবারের মতো সেইসব মানুষের অন্তর্গত আনন্দকে অনুধাবন করলাম যাদেরকে কোনো আদর্শ লালন করার কারণে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। আমি প্রথম ভ্রাতৃত্ববোধের ব্যাপারটির গভীর মর্মার্থ উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম 'সকল মানুষ এক'—এই সহজ কথাটির যথার্থ অর্থ। উপলব্ধি করলাম জীবনের চেয়েও বড় এমন অর্ঘ্য রয়েছে যা কিনা জয় করতে পারে মৃত্যুকেও।

মস্কোয় একদিন ইস্ত্রাতি আমাকে বললেন, 'চলুন'। আমি বললাম, কোথায়? বললেন 'গোর্কির বাড়ি।'

সাথে চার বোতল ভালো আর্মেনিয়ান মদ আর সিগারেট কেস বোঝাই করে ইস্ত্রাতি আমাকে নিয়ে চলেছেন গোর্কির বাড়িতে। দারুণ উত্তেজিত তিনি, প্রথমবারের মতো তিনি গোর্কিকে দেখতে যাচ্ছেন। ইস্ত্রাতি ভাবছিলেন টেবিল ভরা খাবার, হাসি, কান্না, নিবিড় আলিঙ্গন আর প্রচুর আড্ডায় সয়লাব করে দিবেন পুরো সময়টা। আমি বললাম, 'আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ইস্ত্রাতি।'

কোনো উত্তর দিলেন না তিনি। বিরক্ত হলেন এবং আমাকে ফেলে একটু এগিয়ে গেলেন সামনে। আমরা বেশ বিরাট একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম উপরে। আমি আড়চোখে আমার সঙ্গীর উত্তেজনাকে উপভোগ করছিলাম। আমি বললাম, "ওসব হইচই আলিঙ্গনের চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার কি আর একটু সংযত হয়ে গোর্কির সামনে যাওয়া উচিত নয়?" তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "না, আপনি কি আমাকে ইংরেজ ভাবেন নাকি? ভুলে যাবেন না আমি একজন গ্রিক। আমি চিৎকার করি, আলিঙ্গন করি, নিজেকে উজাড় করে দিই। ওসব মার্জিত ভক্তিভাব ইংলিশরা দেখাতে পারে।"

কথা বলতে বলতেই দেখি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন গোর্কি, ঠোঁটে একটা সিগারেট চেপে আছেন। পেটানো শক্তসমর্থ বিরাট শরীর গোর্কির, দোমড়ানো চোয়াল, উঁচু হয়ে আছে গালের হাড়, ক্লিষ্ট, বিষণ্ন ছোট ছোট নীল চোখ আর বর্ণনাতীত তিক্ততায় ভরা একটা মুখ। আমি জীবনে কোনো মানুষের মুখে এত তিক্ততা দেখিনি। তাকে দেখেই একলাফে তিনটা সিঁড়ি পার হয়ে ইস্ত্রাতি চেপে ধরলেন তার হাত। 'আমি ইস্ত্রাতি'—তিনি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, মনে হচ্ছিল এই বুঝি তিনি গোর্কিকে জড়িয়ে ধরেন। গোর্কির কোনো ভাবান্তর হলো না, শান্তভাবে এগিয়ে দিলেন তার হাত। বললেন, 'আসুন।'

গোর্কি সামনে যাচ্ছেন, ইস্ত্রাতি অপ্রতিভ হয়ে যাচ্ছেন পেছনে পেছনে। তার কোটের পকেট থেকে মদের বোতলগুলো দেখা যাচ্ছে। আমরা যে ঘরে গিয়ে বসলাম তার পাশে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরেকটি ঘরে আরও কিছু যুবক অপেক্ষা করছে। গোর্কি রুশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, তাই আলাপ করাটা বেশ মুশকিল হচ্ছিল। ইস্ত্রাতি উদ্দীপনায় বিহ্বল হয়ে অসংলগ্ন এটাওটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গোর্কি খুব সংক্ষেপে শান্তভাবে তাঁর গম্ভীর মিষ্টি গলায় উত্তর দিচ্ছিলেন এবং সিগারেট জ্বালাচ্ছিলেন কিছুক্ষণ পরপরই। তাঁর সব কথায় একটা বিষাদ যেন ছড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ। মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যায় জীবনে সহ্য করেছেন অনেক, সহ্য করছেন এখনও, বোঝা যায় মানুষটির চোখে জীবনের এমন সব ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য গেঁথে আছে যা এই সোভিয়েত উৎসব, সম্মান, আনন্দ কোনো কিছুতেই মুছবার নয়। ঐ নীল চোখের মধ্যে সেঁটে আছে অনারোগ্য বিষাদ। তিনি বললেন, "আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষক বালজাক। মনে আছে আমি যখন তাঁর বই পড়তাম তখন বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো আলোর খুব কাছে নিয়ে ধরতাম আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম অক্ষরগুলোর দিকে এবং প্রায় আর্তনাদ করে বলতাম, একজন মানুষ কী করে এত শক্তি পেতে পারে? কোথায়, কীভাবে পেলেন তিনি এ ভীষণ গুপ্তধন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আর দস্তয়ভস্কি, গোগল?" তিনি বললেন, "রুশদের মধ্যে শুধু লেসকভ।" কিছুক্ষণ চুপ রইলেন তিনি, তারপর বললেন, "তবে সবচেয়ে বেশি শিখেছি জীবনের কাছে। জীবনে প্রচুর কষ্ট করেছি। আর এর মধ্যদিয়েই যারা কষ্ট করে তাদের জন্য প্রবল ভালোবাসা গড়ে উঠেছে আমার, এর বেশি কোনো ব্যাপার নেই।" থামলেন তিনি, চোখটা অর্ধেক বুজলেন, সিগারেটের নীল ধোঁয়া বেরুতে লাগল মুখ থেকে।

ইস্ত্রাতি পকেট থেকে মদের বোতলগুলো বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। কিন্তু ওগুলো খুলতে সাহস হচ্ছিল না তার। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সবকিছু ঠিক মিলছে না। তার কাঙ্ক্ষিত আবহাওয়াটি তৈরি হচ্ছে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিস্থিতি আশা করেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন গোর্কির সাথে মিলে হইচই করে প্রচুর মদ খাবেন, কথা বলবেন, গান গাইবেন, মাটি কাঁপিয়ে নাচবেন। কিন্তু গোর্কি পুরোটা সময় তেমনি বিষণ্নতার গহ্বরেই ডুবে রইলেন। একসময় পাশের ঘরের অপেক্ষমাণ তরুণেরা তাঁকে ডেকে পাঠাল, গোর্কি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে।

"কেমন বুঝলেন ইস্ত্রাতি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। ইস্ত্রাতি সশব্দে একটি বোতল খুললেন, বললেন, "কাছে তো কোনো গ্লাস দেখছি না, বোতলে খেতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?" আমি বোতলটা হাতে নিলাম, বললাম, "দেখুন, মানুষ আসলে নির্জন একটা জীব। প্রতিটি মানুষের চারপাশে ঘিরে আছে সাত সমুদ্র, এবং সে সাগর পেরুবারও কোনো সাঁকো নেই। আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই?" ইস্ত্রাতি বিরক্ত হয়ে বললেন, "খেয়ে বোতলটা তাড়াতাড়ি দিন তো খুব তেষ্টা পেয়েছে, আর ও-কথা? সে আমি জানি কিন্তু ভুলে থাকতে চাই সবসময়।" বললাম, "এ কারণেই আপনি খুব বড় মানুষ ইস্ত্রাতি। কথাটা যদি না জানতেন তাহলে হতেন নির্বোধ। আর জেনেও যদি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনি ভুলে থাকতে চেষ্টা না করতেন তাহলে হতেন শীতল, সংবেদনহীন একজন মানুষ। অথচ এখন আপনি উষ্ণ যথার্থ একজন মানুষ। আপনার মধ্যে অসংগতি আছে, আশা আছে, আছে আশাভঙ্গ।" পকেটে বোতলগুলো আবার ঢুকিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "যাক গোর্কিকে তো দেখা হলো।" যেতে যেতে বললেন, "গোর্কিকে বড় বেশি শীতল মনে হলো আমার, আপনার কেমন লাগল?" বললাম, "গোর্কি তিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জরিত একজন মানুষ, যার সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু নেই, কোথাও।" ইস্ত্রাতি রাগ করেই বললেন, "কিন্তু সেজন্যই নিজেকে হালকা করার জন্য তাঁর চিৎকার, হইচই করা উচিত, মাতাল হওয়া উচিত, কাঁদা উচিত।" আমি বললাম, "একবার মুসলমানদের প্রিয় এক আমির মারা যাবার মুহূর্তে তাঁর সগোত্রীয়দের আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, দুঃখে কেঁদো না কখনো, বিলাপ কোরো না পাছে তোমার দুঃখ হালকা হয়ে যায়। ইস্ত্রাতি, এই আত্মনিয়ন্ত্রণটিকেই আমি মানুষের সবচেয়ে বড় অহংকার মনে করি। আর এজন্যই আমার খুব ভালো লেগেছে গোর্কিকে।"

মস্কোর বিখ্যাত ক্যাথেড্রলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম পরদিন। ভেতরে ঢুকলাম, জার আমলের রুশ-অহংকার এই প্রকাণ্ড উপাসনালয়টি তখন শূন্য, অন্ধকার, শীতল। দেয়ালে দেয়ালে অলঙ্কৃত সন্ন্যাসীগণ শীতে জমে আছে। যে বৃদ্ধা মহিলা ক্যাথেড্রালের দেখাশুনা করেন তিনি বসে আছেন দানপাত্রটির সামনে, পাত্রে একটি কোপেকও নেই। এই একটি শরীর এ বিশাল গৃহের কতটুকুই বা উত্তপ্ত রাখতে পারে, ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি, নাকমুখ দিয়ে ঝরছে কুয়াশার ধোঁয়া। হঠাৎ পুরুষ ও নারীকণ্ঠে দেবদূতীয় মধুর স্বরে স্তোত্র শুনতে পেলাম দোতলার উঁচু গ্যালারিতে। অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে আমি মার্বেলের সিঁড়ি খুঁজে পেলাম, উঠতে লাগলাম উপরে, আবছা আলোয় দেখতে পেলাম আমার সামনে দু তিন জন বেঁটেখাটো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়েছে সবাই, হাঁপাচ্ছে।

সিঁড়ির শেষধাপ পেরুতেই দেখলাম আমি একটা উষ্ণ কক্ষে গিয়ে পৌঁছেছি। কারুকাজে অলংকৃত উপাসনালয়, মোমবাতি জ্বলছে, নতজানু মানুষ, স্বর্ণখচিত সিল্কের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন যাজক। ঐ ঘরের ঐ মুহূর্তের চমৎকার উষ্ণতাটুকু আমি ভুলব না কোনোদিন। যারা উপস্থিত আছে সকহে বৃদ্ধবয়সের, গালের দুপাশে ঝোলানো জুলফি দেখে বোঝা যায় সকলেই সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। মহিলারা মাথা ঢেকে রেখেছেন বরফ-শাদা রঙের ঘোমটায়, সোনা-রুপায় খচিত যিশুর মুখটি জ্বলজ্বল করছে। চারপাশের নতজানু ঐ মানুষগুলোর মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, আবেগাপ্লুতভাবে। পুরো সমাবেশটিকে মনে হচ্ছিল একটা হৃদয়বিদারক বিদায়-অনুষ্ঠান, যেন খুব প্রিয় কেউ বহুদূরে খুব ভয়ঙ্কর যাত্রায় রওনা হচ্ছে আর তার বন্ধুরা এসে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। একদিকে একজন পুরোনো বিশ্বাসকে করুণ বিদায় জানাচ্ছে আর অন্যদিকে আরেকদল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরোনো বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সবেগে এগিয়ে আসছে, আনছে নয়া বিশ্বাস। আমরা একটা নির্মম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের রক্তে একটি পুরোনো ধর্মের মৃত্যু ঘটছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন এক ধর্ম। আমরা যে সময়টি অতিবাহিত করছি এবং আমাদের পুত্র-প্রপৌত্রেরও যে অনাগত কালটিকে অতিক্রম করতে হবে তা বাস্তবিকই অত্যন্ত ভয়াবহ, কঠিন। অবশ্য জীবনের প্রেরণা তো এই কঠিন বাধাই। বাধা এলেই আমাদের ভেতরের ভালো মন্দ যাবতীয় সত্তা জাগ্রত হয়, উদ্দীপিত হয়ে ওঠে; যাবতীয় আকস্মিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের শক্তি পায় সে—যে শক্তি বাধা না পেলে হয়তো ঘুমিয়ে থাকত অন্তরে, নয়তো চলত খুব ধীরে। বাধা পেতে পেতে সে শক্তির গতি বাড়ে, সচল হয়ে ওঠে আরো এবং সে গতিতে কখনো কখনো সে আমাদের এমন কোথাও নিয়েও পৌঁছে যেখানে আসবার জন্য হয়তো আমি প্রস্তুতই ছিলাম না, এ শক্তি প্রায়শই শুধু আমাদের ব্যক্তিগত নয়, এমনকি কেবল মানবিকও নয়। এভাবেই যে শক্তি আমাদের সর্বদা উপরে উৎক্ষিপ্ত করে তা বস্তুত ব্যক্তিগত, আন্তর্জাতিক এবং প্রাগমানবিক—এই তিন শক্তির সমন্বয়। কখনো কখনো মানুষ নিজের অবস্থান থেকে একটা দীর্ঘ উল্লম্ফন নেবার জন্য প্রথমে নিজের ভেতরেই সংকুচিত হয়ে আসে ঠিক স্প্রিঙের মতোই, তখন এর ভেতর এ গ্রহের জীবজগতের যাবতীয় অভিজ্ঞতাটিই সংকুচিত হয়ে উৎক্ষেপ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ সময়টিতেই আমরা সহসা সেই সত্যটিকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করি যা আমরা আমাদের স্বচ্ছন্দ, নিরাপদ দিনগুলোতে অনুধাবন করি না, আমরা তখন বুঝি যে মানুষ অমন নয় সত্য কিন্তু সে এমন কারো জন্য বা এমন কিছুর জন্য নিজেকে নিবেদন করতে পারে যা অমর।

উপাসনা শেষ হলো। একে একে ঐ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে লাগলেন বিশ্বাসীদের শেষ দলটি। এসময়ে একজন পাণ্ডুর কৃশকায় তরুণ আমার দিকে এগিয়ে এল। মুখে চাপদাড়ি, ক্লান্ত নীল চোখ, সে কাঁদছে। আমাকে বলল, "তুমি কি আমাদেরই একজন? তুমি নিশ্চয়ই যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করোনি।" আমি বললাম, "আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, যদি না তিনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।" "যিশু কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করেন না" অবাক হয়ে বলল সে যুবক। বলল, "তিনি কখনোই প্রতারণা করেন না, তিনি শুধু প্রতারিত হন।" একটু থেমে আবার বলল, "এখানে খুব ঠাণ্ডা, আমার বাড়ি চলো, চা খাওয়া যাবে।"

ছেলেটির বাবা একজন প্রাক্তন অভিজাত, বিশাল এক প্রাসাদের মালিক ছিলেন তিনি। এখন সেই প্রাসাদের শুধু দুটো রুম তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, বাকিগুলোতে থাকে অনেকগুলো শ্রমিক-পরিবার। তার রুমটিতে সূর্যের আলো সবচেয়ে কম। কারণ শ্রমিক-পরিবারের মতো তার কোনো শিশুসন্তান নেই আর শিশুদেরই তো অধিক সূর্যালোক প্রয়োজন। যুবকটি একটি কারখানায় কাজ করে। কিন্তু আসলে সে একজন কবি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজের ফাঁকে সময় পেলেই কবিতা লিখে সে। সে বলে, "এ মুহূর্তে আমি একটা সংলাপধর্মী দীর্ঘ কবিতা লিখছি। যিশু কথা বলছেন একজন শ্রমিকের সঙ্গে। ভোর, কারখানার ঘন্টা বেজেছে, তুষারে ঢাকা চারদিক, ভয়ানক শীত, নারী এবং পুরুষ শ্রমিকেরা শীতে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে কাজে যাচ্ছে কারখানায়। শরীর ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে গেছে সবার। আমার সেই শ্রমিক, যিশুর হাত ধরে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন পুরো কারখানা, কয়লার খনি। যিশু দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। যিশু বলছেন, "কেন ওদের এই নির্মম অমানবিক জীবন? কী অন্যায় করেছে ওরা?" শ্রমিকটি বলে, "আমি জানি না প্রভু, তুমিই বলে দাও।" তারপর সে যিশুকে নিয়ে যায় তার স্যাঁতসেতে কুঁড়েঘরে, দেখায় তার ক্ষুধায় গোঙাতে থাকা শিশুদের, তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্রমিক দুহাতে চেপে ধরে যিশুর হাত, বলে, "প্রভু বলে দাও, এখন সিজারের প্রতি কী কর্তব্য আমাদের? কতটুকু তার প্রাপ্য আর কতটুকু আমাদের?" যুবকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল, সে থেমে গেল। উত্তেজনায় সে তার হাত কেবল সামনে পিছনে নাড়ছে। আমি বললাম, "তারপর, কী উত্তর দিলেন যিশু?" চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে যুবক আমাকে বলল, "আমি জানি না, সত্যিই আমি জানি না এখনো, আসলে এর বেশ আমি কিছুই জানি না।" বলেই যুবক পাশের চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে গোঙাতে লাগল, "কেন? কেন জানি না?"

এ তার নিজেরই প্রশ্ন যার উত্তর পাচ্ছে না। যিশু কি পারবেন তার উত্তর দিতে? সে কেন লেনিনকে জিজ্ঞেস করে না। আমি খানিকটা রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি লেনিনকে জিজ্ঞসা করোনি কেন?" "জিজ্ঞেস করেছিলাম"—সে বলে। "কী উত্তর দিলেন তিনি?" লেনিন বললেন, "দুনিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হতে হবে", আমি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলাম, "কিন্তু ভ্লাদিমির ইলিচ, আমি তো আত্মার কথা বলছি, ঈশ্বরের কথা বলছি, বলছি অনন্তের কথা।" "তারপর?" তারপর লেনিন কাঁধ ঝাঁকালেন, হাসলেন এবং বললেন, "বুর্জোয়া..." মুখের সিগারেটটা জুতার নিচে সজোরে মাড়িয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি।

যতই দিন যাচ্ছে অনুভব করছি রাশিয়ার রহস্যাবৃত মোহ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে আমার মনে। এ মোহ শুধু ভিনদেশ বা শীতের দৃশ্য দেখে নয় কিংবা চারপাশের মানুষ, প্রাসাদ, চার্চ আর অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার নতুন অভিজ্ঞতার কারণেও নয়। এ অন্যকিছু, আরো রহস্যময় আরো গভীর। আমি এই রাশিয়ার বাতাসে জীবনের দুটো আদিম প্রাণশক্তিকে উন্মুক্তভাবে প্রায় দৃশ্যমান অবস্থায় লড়াই করতে দেখি। চারপাশে পরিব্যাপ্ত এ লড়াই এমনভাবে মানুষের ভেতরকে স্পর্শ করে যে সে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একপর্যায়ে জড়িয়ে যায় দুটোর কোনো এক শক্তির সাথে এবং লড়াই করে। আমার এই ক্ষুদ্র শরীরে যে অন্তর্গত লড়াইয়ের স্বাদ আমি লালন করি, সে লড়াইয়ের এক ভয়ঙ্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রূপ আমি প্রত্যক্ষ করছি রাশিয়ার প্রকাণ্ড শরীরে। আমার ভিতরকার সেই আজীবন লড়াই, সেই একই শাশ্বত বৈপরীত্বের সংগ্রাম, আলো আর অন্ধকার, এভাবেই আমার অন্তর্গত ব্যক্তিসংগ্রাম রাশিয়ার সংগ্রামের সাথে একীভূত হতে লাগল। রাশিয়ার এই সংগ্রাম আরও স্পষ্ট করে দেখব বলে আমি এরপর মস্কো থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাশিয়ার অবারিত প্রান্তরে। ঘুরে বেড়ালাম মারমনস্ক থেকে আরটিক, সেখান থেকে বোখারা, সমরখন্দ, লেনিনগ্রাদ থেকে ভ্লাদিভস্ক যার প্রতিটি জায়গায় লড়াই চলছে নতুন আর পুরাতনের। প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্রুশবিদ্ধ মানুষ। সুখী মানুষ তারা। কারণ যে ক্রুশবিদ্ধ হবে সেই তো উপভোগ করবে পুনরুত্থানের আনন্দ। আমি সর্বত্র ক্রুশবিদ্ধ রাশিয়াকে প্রত্যক্ষ করলাম। রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ আর গ্রাম ঘুরতে গিয়ে আমি শ্রদ্ধায়, ভয়ে শিহরিত হয়েছি। কোনো ক্রুশদণ্ডের উপর এত সংগ্রাম, এত বেদনা কি কখনো দেখা গেছে, এত আশাও কি দেখা গেছে কখনো? ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে আমি প্রথমবারের মতো গভীরভাবে অনুভব করছিলাম মানুষের পক্ষে তার পুরনো প্রেম, পুরনো বিশ্বাস, পুরনো অভ্যাসকে জয় করা, একে ত্যাগ করে একপা মাত্র এগিয়ে যাওয়াও কী নিদারুণ কঠিন, কষ্টকর এক ঘটনা। যে বিশ্বাসই একসময় ছিল তার চলবার শক্তি, কালে কালে সে বিশ্বাসই স্তব্ধ করে দিয়েছে তার চলিষ্ণুতাকে, মাঝপথে ভণ্ডুল করে দিয়েছে যাত্রাকে। এখন তারা বুকে নতুন বিশ্বাস ভরে নেবার সংগ্রাম করছে।

লক্ষ লক্ষ মুঝিক প্রত্যাখ্যান করছে এ নতুন বিশ্বাস। তারা বোঝেনি, মুক্ত হতে চায়নি। অতীতের সাথে নিজেদের যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে তারা। যুগের পর যুগ মাটির সাথে কাজ করতে করতে মাটি হয়ে গেছে ওদের মন, আগুনকে ওরা ভয় পায়, ঘৃণা করে। এ ক্ষুধার্ত, ক্লিষ্ট অমার্জিত জনতাকে কখনো মিষ্টি কথায়, কখনো সহিংসতায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের মুক্তির পথে।

আর রাশিয়ায় যখন এই আলো আর অন্ধকারের লড়াই চলছে তখন আশেপাশের বিশ্বের সুখী ভরপেট জগতের মানুষেরা অট্টহাসি হাসছে আর বলছে, "শেষ! রাশিয়া একদম শেষ।"

কিন্তু যিশুর সেই উক্তি মনে পড়ে, "একটি গমের দানা যদি গমের শিষে বিকশিত হতে চায় তবে তাকে মাটির কাছে আসতেই হবে এবং তার সত্তাও বিলীন করতে হবে।" একটি গমের দানার সেই বেদনাদায়ক সংগ্রামের মতোই একটি আদর্শের জন্য রাশিয়ার সংগ্রাম।

একটি সুসমাচারে আছে কী করে একজন শিষ্য একটি ক্রুশ-দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যা দেখে তিনি ভীত হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন। তিনি মানসচক্ষে একটি ক্রুশ দেখেছেন যা কাঠের তৈরি নয়, তৈরি আগুনের, এবং সে ক্রুশে কোনো একজনকে বিদ্ধ করা হচ্ছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না, বিদ্ধ করা হচ্ছিল একাধারে শত শত নর-নারী শিশুকে। তারা আর্তনাদ করছে, মারা যাচ্ছে। শিষ্য ভয়ে কেঁপে উঠেছেন, কোনো একজনের উপর মনোযোগ নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু পারছেন না, অগণিত মানুষ ক্রুশ অতিক্রম করে চলেছে। হঠাৎ একসময় দেখলেন সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে শুধু একটি কান্না। আমার সামনে সেরকমই একটি দৃশ্য। আজকের যিশু কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমগ্র জনতা। রুশের লক্ষকোটি পুরুষ, নারী, শিশুরাই যৌথভাবে ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছে আজ। রুশভূমি যেন এক ক্রুশদণ্ড। তার উপর দেশবাসীরা একটা আদর্শের জন্য বেদনার্ত আত্মাহুতি দিচ্ছে। কাউকে পৃথকভাবে দেখা যাচ্ছে না। এখানে সেই ক্রুশবিদ্ধ কান্নাকে আমি প্রত্যক্ষ করছি। এই তো এভাবেই পৃথিবী উদ্ধার পাবে নতুন করে। উদ্ধার পাবে বলতে আসলে কী বোঝায়? এর অর্থ বেঁচে থাকার একটা নতুন মানে খুঁজে পাওয়া। পুরনোটা ফুটো হয়ে গেছে। সভ্যতার অট্টালিকা ধারণ করবার ক্ষমতা তার নেই। সে মানুষই বস্তুত সবচেয়ে সুখী যিনি তার নিজস্ব যুগের কান্নাটি শুনতে পায় এবং সে কান্নার পক্ষে কাজ করে এবং এভাবে তিনি নিজেও উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

বহু শতাব্দী পর আমাদের এই যুগকে মধ্যযুগ বলা হবে। মধ্যযুগ অর্থাৎ ক্রান্তিকাল। আমাদের সভ্যতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সৃজনীক্ষমতা শেষ হয়েছে এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। নতুন একদল মানুষ তাদের নতুন বিশ্বাস, ভালোবাসা, দৃঢ়তা বিশ্বাস নিয়ে নতুন এক সভ্যতা গড়বার আয়োজন করছে। এ নতুন আয়োজন সম্পর্কে এখনও কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না, যেমন কোনো সৃজনশীল ব্যাপার সম্পর্কেই চূড়ান্ত কোনো পূর্বঘোষণা দেয়া যায় না। ভবিষ্যৎ পুরোটা যাচ্ছেতাই লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে, হতে পারে একটা ভীরু আপস; কিন্তু নতুন সৃষ্টির জন্য এই ভাঙনটাই ইতিবাচক। আমরা একটি ক্রান্তিলগ্নে আছি যা একটি নতুন সভ্যতার যন্ত্রণাকাতর প্রসববেদনার পর্যায়ে। কোনোকিছুই এখন নিশ্চিত নয় আর এজন্যই আজ প্রতিটি ব্যক্তির মানুষের এই নিরাবয়ব, অনিশ্চিত যুগের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে, আগের যেকোনো যুগের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সে দায়িত্ব। এরকম অনিশ্চিত অথচ সম্ভাবনাময় কালেই প্রতিটি মানুষের ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের জীবনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে আমাদের স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা দরকার এবং সচেতনভাবে আমাদের প্রত্যেকের ছোট্ট একক শক্তিগুলোকে নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। সময়ের সঠিক দাবির সাথে থেকেই মানবজাতির মুক্তির কঠিন, অনিশ্চিত, বিপদসংকুল আরোহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হবে।

রাশিয়াব্যাপী আমার তীর্থযাত্রার শেষ পর্যায়ে এসে পৌছালাম বোখারায়। সাইবেরিয়ার ভয়ঙ্কর শীত পেরিয়ে বোখারায় পৌঁছে মনে হচ্ছিল প্রিয়সূর্য যেন গায়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। একেবারে শিরদাঁড়া পর্যন্ত উষ্ণ হয়ে উঠছে আমার। দুপুরের কিছু আগে এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৌঁছেছি এখানে। প্রচণ্ড গরম। রাস্তাগুলোকে পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়া হয়েছে। বাতাসে জেসমিনের গন্ধ। নানারকম বিচিত্র পাগড়ি পরা মুসলমানগণ রাস্তার পাশে খড়ের ছাউনিতে বসে শরবত পান করছে। রেস্তোরাঁর টুলের উপর দাঁড়িয়ে গোলগোল আকারের কয়জন তরুণ লোকগীতি জাতীয় কোনো গান গাইছে আবেগে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লান্ত আমি একটা তরমুজ কিনে বিখ্যাত কোককুবা মসজিদের ছায়ায় বসলাম। তরমুজটি হাঁটুর উপর রেখে ছোট ছোট টুকরো করে খেতে লাগলাম। এর অসাধারণ স্বাদ আর চমৎকার ঘ্রাণ আমার একেবারে হাড়ে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল। আমি তরমুজের ঐ শীতলতায় অবগাহন করলাম, নতুন জীবন পেলাম যেন। বছর সাতেকের একটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল আমার সামনে দিয়ে, সারা পিঠে তার ছড়িয়ে আছে চুলের ছোট ছোট বেণি, বেণিতে আবার নীলকান্তমণি পাথর বসানো, পরে জেনেছি অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই নাকি এ পাথর ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে। পেছন থেকে মেয়েটিকে রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মেয়ের মতো মনে হচ্ছিল। বাতাস ভরে গিয়েছিল কস্তুরীর গন্ধে।

বিকেল হলে দেখলাম শাদা দাড়ি, সবুজ পাগড়ি মাথায় মুয়াজ্জিন আমার সামনের মিনারটিতে উঠলেন, কানের উপর হাতের তালু রাখলেন, আকাশের দিকে তাকালেন এবং গম্ভীর মিষ্টি গলায় বিশ্বাসীদের ডাকলেন নামাজে। তিনি যখন আযান দিচ্ছিলেন একটা সারস পাখি তখন বিকেলের লাল আকাশে উড়তে উড়তে ঐ মিনারটির চূড়ায় এসে বসল।

শুনছিলাম কান পেতে, দেখছিলাম চোখ মেলে। আমি তখন মিষ্টির চূড়ান্ত, অপরূপ সেই ফলের আস্বাদে বুঁদ হয়ে আছি। অবসাদে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই তো ঘুমিয়ে পড়ব আর ঘুমালেই বঞ্চিত হব এতসব সুখ থেকে। তাই চোখ খুলে রইলাম আমি। আমার সামনে শূন্য পড়ে আছে বোখারার প্রসিদ্ধ রেজিস্তান। একসময় প্রতি বসন্তে বিশ্বের প্রত্যন্ত মুসলিম অঞ্চল থেকে অভিযাত্রীরা এ শহরে আসত এবং নির্মমভাবে নিহত হযরত আলীর দুই পুত্র হাসান ও হোসেনের নামে বিলাপ করত। মশলা, আপেল আর পবিত্র পতিতা সমেত কেরাভান এসে ভিড়ত এ শহরে, অল্পবয়স্ক বালকেরা থাকত শাদা ঘোড়ায়। তাদের কোলে থাকত শাদা রাজহাঁস। তাদের কামানো মাথায় ছিটানো থাকত ছাই। এদের পেছনে থাকত ধবধবে শাদা আলখেল্লা গায়ে উন্মত্ত ধর্মবিশ্বাসীদের একটি দল যারা ছুটি দিয়ে ক্রমাগত নিজেদের মাথায় আঘাত করতে থাকত, যতক্ষণ-না রক্ত তাদের দাড়িমোচ বেয়ে শাদা পোশাকটিকে রঞ্জিত করত। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত তারা এভাবে 'হাসান হোসেন', 'হাসান হোসেন' বলে বিলাপ করত। বিলাপ করতে করতে ঐ রক্তমাখা শরীরেই তারা শুয়ে পড়ত পুষ্পশোভিত বৃক্ষের নিচে এবং পবিত্র [illegible] সাথে সমাহিত হত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু রেজিস্তান চত্বর এখন ফাঁকা, পরিত্যক্ত বর্ণাঢ্য মসজিদটিও প্রায় ধ্বংসের মুখে। এক মোরগডাকা ভোরে যেন সব উধাও হয়ে গেছে, প্রেত হয়ে গেছে যেন সবাই।

কোনো একটা কিছু নিয়ে মানুষের কেন এত মত্ততা? তখন কিংবা এখনই? সকলে মিলে কেন এত উন্মাদনা, কোলাহল? কী তার উদ্দেশ্য? কোথায় পৌঁছাতে চায় মানুষ? কোথায় যেতে চায় সে? একসময় আমিও এ প্রশ্নের উত্তরে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলতাম সব মায়া। জগৎ কিছু না। আনন্দ, বেদনা, অন্যায়, ক্ষুধা, কাজ সব মিথ্যা সব মায়া। কিন্তু এখন আমরা স্পর্শাতীত জগৎ ছেড়ে রক্তমাংসের পার্থিব জগতে দাঁড়িয়েছি, স্বস্তি অনুভব করছি। রেজিস্তান চত্বরে সন্ধ্যা নামছে। আকাশের দিকে তাকালাম।

এসবের কী উদ্দেশ্য? এ প্রশ্ন অবান্তর, কেউ জানে না এর উত্তর, এমনকি ঈশ্বরও নয়। কারণ তিনিও তো আমাদের সাথে সাথে চলছেন, তিনিও উদ্দেশ্য খুঁজছেন, তিনিও যন্ত্রণাকাতর সংগ্রাম করছেন আমাদের মতো। ক্ষুধা কিংবা অন্যায় কোনোটাই মায়া নয়, নেই বললেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায় না, তারা রক্ত মাংসে আছে। তাদের ছোঁয়া যায় না। বাতাসে তাদের কান্না শোনা যায়। ওরা কাঁদছে। তারা সাহায্য চায়। আমার কাছে, আপনার কাছে, প্রতিটি মানুষের কাছে। শুধু প্রশ্ন করাই আমাদের কর্তব্য নয়, পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে সহজতর করা দরকার সভ্যতার অভিযাত্রাকে।

রুশ ভ্রমণ শেষে গ্রিসে যাওয়ার পথে আমি যখন বার্লিন এবং ভিয়েতনামে অবস্থান করছিলাম পৃথিবী তখন আমার কাছে বদলে গেছে। পৃথিবী তো বদলায়নি, বদলে গেছে আমার চোখ। আশেপাশে উগ্র সাজে সজ্জিত মেয়ে আর পুরুষ, তাদের চতুর হাসি, অর্থ, ও চুম্বনের জন্য তাদের লালসা নির্লজ্জ নৃত্য, বর্বর আধুনিক সংগীত, যা আগে আমার নিকট অদ্ভুত মনে হতো এখন তা আমার বমন এবং ভীতির উদ্রেক করছে। এসব কিছুর মধ্যেই একটা মহা অশুভ সংকেত শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। বাতাসে এক ঘোর বেদনা যেন ভাসছে, যেন পৃথিবীতে পচন ধরেছে।

ঠিক একই রকম বোধই কি জেগেছিল পম্পেই নগরীর অন্তরে, ধ্বংস হবার শেষ মুহূর্তগুলোতে? আলোকোজ্জ্বল পথ আর নারী-পুরুষের কোলাহলে আচ্ছন্ন ভিয়েনা শহরে একরাতে হাঁটতে হাঁটতে আমার ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটির কথা মনে পড়ল। আমি যখন প্রথম পম্পেই নগরী দেখি তখন আমি নেহাতই বালক। এ শহর আমার জন্য কী ভীতিকর সংবাদ বহন করে চলেছে তা আবিষ্কারের সময় তখনও আমার হয়নি। সে সংবাদ তখন খুঁজবার চেষ্টাও করিনি। আমার পৃথিবী তখন নিশ্চিন্তে যিশুর পিঠে চড়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন? বাড়ি ফিরবার আগে আমি আর একবার পম্পেই নগরী দেখতে যাব সিদ্ধান্ত নিলাম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারপাশের চত্বর ভরে আছে বসন্তের সবুজ ঘাসে, রাস্তাঘাট ফাঁকা। আমি ঐ ফাঁকা শহরে শিস দিতে দিতে একা ঘুরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পম্পেই। বাড়িগুলো উন্মুক্ত, দরজা নেই, মালিক নেই। ফাঁকা পড়ে আছে শুঁড়িখানা, মন্দির, থিয়েটার এবং স্নানঘর। ধ্বংসের হাত থেকে যে দেয়ালগুলো রক্ষা পেয়েছে তাতে অস্পষ্ট নানাবিধ রঙিন ছবি। নগ্ন নর্তকীর, কিউপিডের, মোরগের, কুকুরের এবং মানুষের ও পশুর যৌনমিলনের নির্লজ্জ বিচিত্র ছবি। হঠাৎ মনে বেজে উঠল, "আহা, এভাবে যদি প্যারিস অথবা লন্ডনের পথে পথে ঘুরে রাশিয়ার কথা গল্প করতে পারতাম।" একটা ভয়ানক অমঙ্গলের শিহরন জাগ্রত হতে লাগল আমার শিরদাঁড়ায়।

পম্পেইয়ের মাংসাগার ছিল পূর্ণ, ছিল স্নানধৌত, নির্লজ্জ রমণীকুল এবং বিশ্বাসহীন ক্লান্ত পুরুষদল। গ্রিক, এশিয়া, আফ্রিকার ভীরুরা মেষপালের মতো সেখানে ভিড় করেছিল গণতান্ত্রিক উপায় চরম নষ্টামির চর্চা করতে। জনতাকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত করে রেখেছিল ধূর্ত হাসি হেসে। পুরো শহরটি বিসুভিয়াসের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে নির্বিকার চিত্তে হে হে করে হাসছিল।

একটা ছোট্ট টিলার উপর উঠে দাঁড়ালাম। পম্পেই নগরীকে ধন্যবাদ। এ নগরীই আমাকে জানাচ্ছে যে সমগ্র পৃথিবীই আজ একটি বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের আগের সেই শহর। কী দরকার এমন পৃথিবীর, যেখানে এমন নির্লজ্জ নারী, বিশ্বাসহীন পুরুষ, যেখানে এত নীচতা, অন্যায়, রোগ? কেবল বেঁচে থাকবে এই ধূর্ত ব্যবসায়ী, নরমাংসখেকো শিকারি এবং ঈশ্বর-ব্যবসায়ী যাজক, আর সব নপুংসক মানুষের দল? কেন এতসব শিশু বড় হচ্ছে একদিন ঐসব শুঁড়িখানা, কারখানা আর বেশ্যালয়গুলো দখল করবার জন্য, যা এখন তাদের বাবা-মারা দখল করে আছে? যে জীবনচেতনা একসময় এ পৃথিবীকে একটা উজ্জ্বল সভ্যতা উপহার দিয়েছে, দিয়েছে বিশ্বাস, আদর্শ, শিল্প, বিজ্ঞান, কাজ আজ তা লুপ্ত। আজ তাই যাক না চুরমার হয়ে পুরনো পৃথিবীর যাবতীয় জঞ্জাল, পথ পাক নতুন চেতনার স্রোত।

প্রভুরা সব অতিভোজন আর পানে ক্লান্ত হয়ে ঢুলে পড়ছিল টেবিলে, তাদের আক্রমণ করেছে বঞ্চিত ক্ষুধার্তের দল। আক্রমণকারীরা আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছে। অন্য টেবিলের ভরপেট মানুষেরা গোলমাল শুনে ঘুরে তাকিয়েছে। প্রথমে তারা খুব হেসে উঠলেও ক্রমশ ম্লান হয়ে গেছে তাদের মুখ। উদ্বিগ্নতার সাথে উপলব্ধি করেছে তাদের দাসদাসীরা, মজুরেরা, ঐ খালিপায়ের নিকৃষ্ট মানুষেরা কী ভয়ানক শক্তিমান হয়ে উঠেছে। পবিত্র একটি মুহূর্ত। এই মুহূর্তগুলোতেই মানুষ তার চিন্তা, শিল্পকর্মের অসাধারণ সাফল্যগুলো অর্জন করেছে।

সব প্রভুরা যৌথভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদের কালের গতিটি আজ তাদের বিপক্ষে। তারা এতকাল খেয়েছে, পান করেছে, একটা সভ্যতাও গড়ে তুলেছে। আজ তাদের যাবতীয় তেজ, শক্তি নিঃশেষিত। তাদের কর্তব্যপালনের শেষ ধাপে পৌঁছেছে তারা এবার তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সময়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই দাসেরা যখন সে টেবিল দখল করবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মোটা হতে শুরু করবে এবং একসময় আহারে পানে বুঁদ হয়ে সংজ্ঞা হারাবে। আর একদল আবার তাদের নতুন ক্ষুধা এবং নতুন আলোর শিখা নিয়ে উঠে আসবে মাটি থেকে, আবার তাদের নিজস্ব পথ করে নেবে। এভাবেই অনিঃশেষ, চিরদিন প্রবহমান থাকবে এই দ্বন্দ্ব।

এইটাই নিয়ম। এভাবেই কালে কালে জীবন নিজেকে নতুন করে তোলে এবং এগিয়ে যায়। সকল জীবন্ত প্রাণ (একটি আদর্শ এবং একটি সভ্যতাও একপ্রকার জীবন্ত প্রাণ) নিজের ভেতর এক অপ্রতিরোধ্য তাগিদ অনুভব করে, কর্তব্য বোধ করে তার আশেপাশের সম্ভাব্য সবকিছুকে নিজের আয়ত্তে আনতে, শাসন করতে। পারলে গোটা বিশ্বটাকেই। আর একটি নতুন আদর্শই হলো সবচেয়ে ক্ষুধার্ত এবং লোলুপ জন্তু।

কিন্তু পাশাপাশি আর একটা নিয়মও চালু হয়ে যায়, নির্মম নিয়ম। প্রাণ যতই নিজেকে আবিষ্কৃত করবার জন্য অন্যকে শাসন করবার কর্তব্য পালন করতে থাকে, ততই সে তার পতনের দিকে ধাবিত হয়। প্রাণের শক্তি যতই ঘনীভূত হতে থাকে তার ধ্বংসও তত নিকটবর্তী হতে থাকে। তবে এও সত্য যে, প্রাণ তার কর্তব্য পালন করে বলেই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে যদি অন্যকে জয় করবার অন্তর্গত তাগিদে সাড়া না দেয়, যদি তার কর্তব্য পালন না করে তবে কিন্তু সে বেঁচে যায়, দীর্ঘদিন নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটিয়ে দেয়, নিজে কোনো ঝামেলায় জড়ায় না, অন্যকেও ঝামেলা করে না। যে প্রাণ অন্যকে জয় করবার অভিযান সম্পন্ন করেছে তার অপসারণই তো বাঞ্ছনীয়। নইলে সে পথ আগলে রাখবে অন্য কোনো বিদ্রোহী প্রাণের, যে নতুন প্রাণ ভাবছে পৃথিবীকে জয় করবার পালা এবার তার। যেন জীবনের প্রতিটি অণুতে কোনো বিস্ফোরক পোঁতা আছে এবং যে-কোনো সংঘর্ষে বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। জীবন তার অন্তর্গত গভীর আকাঙ্ক্ষাকে এভাবেই প্রকাশ করে এবং এগিয়ে যায়।

সহসা একে অত্যন্ত অন্যায্য একটি নিয়ম বলে মনে হয় আমাদের, ক্রোধ হয়। কিন্তু একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ করলেই এ নিয়মকে প্রশংসা না করে আমরা পারি না। এ নিয়মকে ধন্যবাদ। এ নিয়ম আছে বলেই যাবতীয় বর্বর শক্তি একদিন তার তেজ হারায়। এ নিয়মের কারণেই শক্তিমানের অপরিমিত অহংকার, সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। কারণ একদিকে এ নিয়ম যেন তাকে তার শক্তির সর্বাধিক প্রকাশে প্রবৃত্ত করে তেমনি পাশাপাশি তাকে প্রতিমুহূর্তে জানায় যে শক্তিমান যতই তার শক্তির প্রকাশ ঘটাবে ততই তার ব্যক্তিগত বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হবে।

বলশেভিক নেতারা এ নিয়ম জানেন না, তাদের জানবার কথাও নয়। তাদের অন্তর্গত তেজেই তারা একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে এগিয়ে চলেছে চোখ বুজে। তারা তাদের কর্তব্য পালন করছে, পুরনোকে জয় করবার অভিযান সম্পন্ন করছে। আশেপাশে তারা এখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাকাচ্ছে না, তাকাবার কথাও নয়। তাহলে তাদের অন্তর্গত সেই বিস্ফোরকের তেজ যাবে কমে।

মানুষ এতকাল যা করেছে, এখন যা করছে, ভবিষ্যতে যা করতে চায় তার পুরো বৃত্তটিকে অনুধাবনের সংগ্রাম করতে চাই আমি, বুঝতে চাই কোন্ সে হাওয়া যা মানুষকে এমনি ঠেলে সামনে নিয়ে চলেছে, পৌঁছে দিতে চাচ্ছে কোথাও। মানবকর্মের সেই বিশাল বৃত্তের অত্যন্ত ক্ষুদ্র, একটি ভগ্নাংশ আমার এই সমকাল, যে কালে আমি বেঁচে আছি। নতজানু হয়ে আমি আমার সমকালকে বুঝবার চেষ্টা করছি, বুঝবার চেষ্টা করছি একালের সঠিক কর্তব্যটিকে। একটি অবিনশ্বর নিয়মের সাথে নিজেকে যুক্ত করে এভাবেই বোধকরি একজন মানুষ তার নশ্বর ক্ষুদ্র জীবনে অবিনশ্বরতার ছোঁয়া আনতে পারে।

এভাবে যে মানুষ তার সমকালের সঠিক কর্তব্যটি অনুধাবনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন আমি মনে করি তিনি খনিজ থেকে বৃক্ষে, বৃক্ষ থেকে প্রাণী, প্রাণী থেকে মানুষ আরোহণ করেন এবং তারপর চূড়ান্ত মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেন। একেক যুগে একেক অবয়বে আবির্ভূত হন সে যোদ্ধা। আজ তিনি জাগ্রত, শ্রমজীবী মানুষের নেতার অবয়বে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চেঁচিয়ে বলছেন ন্যায়! সুখ! মুক্তি! তার এই আহ্বান উদ্দীপ্ত করছে কমরেডদের। কিন্তু এই ভয়ানক গোপন সংবাদটি কি আমরা জানছি যে, যতই আমরা ন্যায়, সুখ আর মুক্তিকে স্পর্শ করতে চাইছি ততই তারা আমাদের দূরবর্তী হচ্ছে?

তবে এও সত্য এবং প্রয়োজনীয় যে, যারাই কোনো আদর্শের জন্য সংগ্রাম করবে তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে একদিন তারা ঐ আদর্শে পৌঁছাবেই এবং ঐ আদর্শে পৌঁছালেই পৃথিবীতে আসবে যথার্থ ন্যায়, সুখ, মুক্তি। মানুষকে যে অন্তহীন এক চূড়ায় আরোহণ করতে হবে! তাই তাকে ধাপে ধাপে নতুন একেকটি বিশ্বাসের জীবনীশক্তিতে নিজেকে সঞ্জীবিত করে নিতে হবে এমনিভাবেই।

একেক যুগে মানবজাতির একেকটি কান্না জমাট বাঁধে এবং সে কান্না তার পক্ষের মানুষদের নিয়ে উপরে উঠে আসে। আমি যদি অন্য কোনো যুগে জন্মাতাম তাহলে আমি হয়তো এ কান্না দেখতে পেতাম অভিজাত, শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে, যখন তারাই ছিল উদীয়মান বিদ্রোহীর দল। মানুষকে অন্তহীন এক পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে হবে। এভাবেই উঁচু থেকে এক এক যুগের সবচাইতে শক্তিমান মানবগোষ্ঠীকে টেনে উপরে তোলে অনন্তকাল। তাদের ছেড়ে নতুন তেজি কাঁচামালের দিকে মনোযোগী হয়। এই অন্তহীন আরোহণে অংশগ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। অনন্তকালের কাছে আজকের কাঁচামাল, যারা ক্ষুধার্ত, যারা দাস। মানব আরোহণের নেতৃত্ব দেবার জন্য অনন্তকাল এ যুগে তাদেরই নির্বাচিত করেছে। যদিও তারা এই অনন্ত আরোহণকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাদেরই প্রাত্যহিক প্রয়াজনের সাথে মিলিয়ে একালের প্রেক্ষিতে একটি নাম দিয়েছে। তারা এর নাম দিয়েছে সুখ, সাম্য, শান্তি।

কিন্তু জনতার এই ক্রমঅপস্রীয়মাণ সুখ, শান্তি, সাম্যের ধারণার মধ্য থেকে কোনো কোনো সংগ্রামী মানুষ মানবমুক্তির নির্যাসটিকে আবিষ্কারের সংগ্রামে নামেন। তাই তাদের সংগ্রামটি ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক। তাদের মনোযোগ মানুষে নয়, মানুষের অন্তরের সেই আগুনে যা মানুষকে প্রজ্বলিত রাখে। একটি লাল রেখায় তাদের গতিপথ, যে রেখা মানুষের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে যায়, রচনা করে একটি নরমুণ্ডের জপমালা। ঐ লাল রেখাটি ধরবার সাধ আমার, যদিও জানি সেটি আমার নিজের মস্তিষ্ককেই বিদীর্ণ করে যাবে।

তবে আমরা বরং মানবিক সীমানাতেই ক্ষান্ত হই, বস্তুত ঐ সীমানার ভেতরেই আমাদের সবকিছু কাজ, দায়িত্ব। আমরা নাইবা ঐ সীমানার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম, ওখানে দাঁড়ালে যে ভয়ঙ্কর গহ্বরটিকে আমরা মুখ ব্যাদান করে থাকতে দেখব তাতে আমাদের রক্ত হিম হয়ে আসতে পারে। ঐ গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে শান্ত, বিষধর হাসি হেসে বুদ্ধ পারেন এ জগৎকে উধাও করে দিতে। কিন্তু আমরা চাই না যিশু এ বিশ্বের ভার তাঁর কাঁধে বহন করে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে আসুন। আমরা এই পৃথিবীটাকেই চাই, চাই সে আমাদের মতো জীবন্ত, সংগ্রামমুখর থাকুক। যেমন কুম্ভকার তার মাটিকে ভালোবাসে, কামনা করে, আমরাও এ পৃথিবীকে তেমনি কামনা করি, ভালোবাসি। আর কী নিয়েই বা কাজ করতে পারি আমরা? এই মহাজাগতিক চরাচরে আর কোনো চত্বর রয়েছে কি যেখানে আমরা বীজ বপন করতে পারি, ফসল তুলতে পারি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনস্তত্ত্ব

যৌথ অবচেতনা

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং

শুধু একটি বক্তৃতার মধ্যে পুরো যৌথ অবচেতনার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা নিতান্তই কঠিন। তবু আমি চেষ্টা করছি, বক্তৃতাটিকে কতগুলো শিরোনামে ভাগ করে নিয়ে যৌথ অবচেতনা ধারণাটির মূল রূপরেখার একটি পরিচয় তুলে ধরতে।

সংজ্ঞা

মানুষের মনের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, সচেতন মন, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অবচেতন মন, এবং তৃতীয়ত, যৌথ অবচেতন মন। মনের সচেতন স্তর শুধু বর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকাণ্ড চালায়। মনের সবচেয়ে উপরিতলের এই সচেতন অংশ সম্পূর্ণভাবে বর্তমানের সাথেই সম্পর্কিত। আর ব্যক্তিগত অবচেতন মন এমন সব উপাদান দ্বারা গঠিত যা একসময় ব্যক্তির সচেতন মনেই বিরাজ করছিল কিন্তু ক্রমান্বয়ে বিস্মৃতি, নতুন উপাদানের চাপ এবং অবদমনের মাধ্যমে অবচেতনার ঐ দ্বিতীয় স্তরে চলে গেছে। মানুষের মনের দ্বিতীয় স্তরের এই ব্যক্তিগত অবচেতনা সম্পূর্ণভাবে ঐ মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা ও অতীত ভাবনাচিন্তার ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু মনের এই ব্যক্তিগত অবচেতনার স্তরের নিচেও আর একটি চূড়ান্ত অবচেতনার স্তর রয়েছে, যে স্তরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই, যা ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না

~ www.amarboi.com ~

এবং ব্যক্তি তা ব্যক্তিগতভাবে অর্জনও করতে পারে না। ব্যক্তি মনের এই স্তরকে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বহন করে। মনের এই তৃতীয় স্তরটি কখনই সচেতন মনের গণ্ডির মধ্যে ছিল না, অবচেতন হিসেবেই এর জন্ম। বিশেষ কোনো স্থান বা কালের সাথে মনের এই অংশ সম্পর্কিত নয়। সকল মানুষের মনেই এই চূড়ান্ত অবচেতনার অংশটি বিরাজমান। এটি সমগ্র মানবজাতির শাশ্বত অবচেতন মন। মনের এই স্তরকেই আমি বলছি যৌথ অবচেতনা। যৌথ অবচেতনা হচ্ছে মানুষের মনের সবচেয়ে গভীর স্তর, এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত অবচেতনা এবং সচেতনা। যৌথ অবচেতনার উপাদান গড়ে ওঠে মূলত আর্কিটাইপ দ্বারা।

যৌথ অবচেতনার ধারণার সাথে আর্কিটাইপ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর্কিটাইপ মনের এমন কিছু নির্দিষ্ট প্রবণতার কথা বোঝায় যা ব্যক্তি নিজে গড়ে তোলে না; স্থান, কাল নির্বিশেষে বংশগতভাবে যে প্রবণতা ব্যক্তির মনে বিরাজ করে। মিথ বা পুরাণকথার গবেষণায় এদের বলা হয়েছে মোটিফ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে বলা হয়েছে গোত্রীয় কল্পনা, এডলফ কাস্টেইন বহুদিন আগে একে বলেছিলেন আদিম চিন্তা। অর্থাৎ আমি যে আর্কিটাইপের কথা বলছি ধারণা হিসেবে এর ইঙ্গিত জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও রয়েছে।

তাহলে আমার সারকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের তাৎক্ষণিক সচেতন মন ও ব্যক্তি অবচেতন মন ছাড়াও তৃতীয় একটি মানসিক স্তর রয়েছে যা যৌথ এবং সর্বজনীন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের ভিত্তিতে মনের এই স্তর গড়ে ওঠে না। এই যৌথ অবচেতনা আর্কিটাইপ দ্বারা গঠিত, যা মানুষের একটি সর্বসাধারণ মানবিক উপাদানের মতো পূর্বনির্ধারিত। বিশেষ মানসিক পরিস্থিতিতে তাই এই ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই এমন কিছু আচরণ প্রকাশিত হয়ে ওঠে, যে আচরণের সাথে ঐ ব্যক্তিটির নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা, জানাশোনার কোনো সরাসরি সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, এ আচরণ বস্তুত মানুষের সর্বজনীন ঐ যৌথ অবচেতনাকেই প্রকাশ করে।

যৌথ অবচেতনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ফ্রয়েড এবং এডলার মনোবিজ্ঞান চর্চা করেছেন প্রধানত ব্যক্তিবিশেষের মনকে কেন্দ্র করে। তাদের মনোবিজ্ঞান মূলত ব্যক্তিনির্ভর মনোবিজ্ঞান। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে তাদের ঐ মনোবিজ্ঞানকেও শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছে মানুষের সর্বজনীন, সাধারণ কিছু জৈবিক গুণাবলির উপর। তারা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মানুষের এমন কিছু সহজাত তাড়না রয়েছে যা সকলের মধ্যে সমানভাবে বিরাজমান এবং যা মানুষের মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। এটা তো জানা কথা যে, মানুষের যৌনতাড়না কিংবা আত্মপ্রকাশের তাড়না শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়, এটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সর্বজনীন। সেইসাথে দেখা যাচ্ছে এই প্রবৃত্তিগত তাড়নাগুলো এমনভাবে মনে নিহিত রয়েছে যে, মনের সচেতন অংশ এদের উপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে না। দেখা যাচ্ছে কোনো মানুষের মনের সচেতন অংশ যখন পুরোপুরি পুষ্ট হয়ে ওঠেনি তখন যেভাবে ঐ প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে, পরবর্তীকালে সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ সাধন হলেও ঐ প্রবৃত্তি একই পর্যায়ে ক্রিয়াশীল রয়েছে, অর্থাৎ সচেতন মনের বিকাশের সাথে সেই প্রবৃত্তিগুলোর কর্মকাণ্ডের কোনো তারতম্য ঘটছে না। মানুষ অধিকাংশ সময় এই প্রবৃত্তিগুলোর সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েছে এবং আধুনিক মনোচিকিৎসায় প্রায়ই আমাদের মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হচ্ছে। এই সহজাত প্রবৃত্তিগত তাড়নাগুলোর সাথে আমার যৌথ অবচেতনার ধারণার একটা ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য রয়েছে। এদের অবস্থান আর্কিটাইপের খুব কাছাকাছি।

মানুষের চরিত্রে প্রবৃত্তির অস্তিত্ব যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে যৌথ অবচেতনার ধারণাও এমন কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হবে না। আমরা সকলেই মেনে নিই যে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, আমাদের যুক্তিপূর্ণ সচেতন মনের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এই প্রবৃত্তি মানুষের আচরণকে বহুলভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং যদি বলা হয় আমাদের কল্পনা, ধারণা এবং চিন্তাও তেমনিভাবে মনের সচেতন গণ্ডির বাইরের কিছু সহজাত, সর্বজনীন আদি মানসিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত তবে নিশ্চয়ই খুব অভিনব কছু বলা হবে না। যদিও আমার এই ধারণাটিকে প্রায়ই নানা রহস্যের আবরণ দিয়ে প্রচার করা হয়। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, যৌথ অবচেতনার ধারণা কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়, এটা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত, অভিজ্ঞতালব্ধ একটা ধারণা। তবে একথা সত্যি যে সাধারণভাবে মানুষের মনের যৌথ অবচেতনাকে চিহ্নিত করা সহজ নয়। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে কীভাবে, কত বিবিধ প্রক্রিয়ায় বর্তমান মানুষের মধ্যেও অনেক আদিম মটিফের পুনরাবির্ভাব ঘটছে।

একটা উদাহরণ থেকে ব্যাপরটা বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনারা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শিশু যিশুর সাথে মাতা মেরি ও সেন্ট অ্যানি ছবিটি দেখেছেন। ফ্রয়েড এই ছবিটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ভিঞ্চি এই ছবিতে যিশুর দুইজন মাকে চিহ্নিত করেছেন কারণ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নিজেরই দুজন মা ছিল, ফলে নিজেকে যিশুর সাথে মিলিয়ে দিতে গিয়ে ছবিতে নিজের জীবনের দুই মায়ের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করেছেন। এই ব্যাখ্যাটি নেহাতই ভিঞ্চির ব্যক্তিজীবন নির্ভর এবং অযথার্থ। বরং আমি লক্ষ করতে বলব কীভাবে এ ছবিতে ভিঞ্চির মধ্যদিয়ে অতিপরিচিত, সর্বজনীন, আদিম একটি ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে দুইবার জন্মের বিশ্বাস, মায়ের দুইটি রূপ সম্পর্কে বিশ্বাস অর্থাৎ একজন পার্থিব মাতা, অন্যজন ঐশ্বরিক মাতা; একইভাবে একটা পার্থিব জন্ম, অন্যটা পারলৌকিক জন্ম, যার সাথে সাযুজ্য রয়েছে পুনর্জন্মের বিশ্বাসের। এই বিশ্বাস প্রাচীন মিথে, আদি উপকথায়, তুলনামূলক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধর্মতত্ত্বে ঘুরেফিরে বহুবার আমরা উল্লেখিত হতে দেখি। মিশরের ফারাওকে একই সাথে মানুষ ও দেবতা ভাবা হতো। মিশরের ধর্মমন্দিরগুলোতে জন্ম-কুঠুরি নামে একটি ঘর থাকত, যার দেয়ালে ফারাওয়ের পারলৌকিক গর্ভাবস্থার ছবি আঁকা থাকত। মিশরের মানুষ বিশ্বাস করত ফারাও দুইবার জন্মগ্রহণ করেছে। খ্রিস্টীয় ধর্মমতেও এই দ্বিতীয় জন্মের ধারণাটি প্রচলিত। বাইবেলে বলা আছে, জর্ডানে যিশু যখন খ্রিস্টমতে জল সিঞ্চন করেছেন, তখন জল ও আত্মা সহযোগে তিনি দ্বিতীয় জন্মলাভ করেছেন। রোমান প্রার্থনা পদ্ধতিতে যে জলপাত্রের জল দিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয় ঐ পাত্রটিকে তারা বলে জরায়ু। প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধারণাতে যে স্বর্গীয় আত্মা পায়রা-বেশে মেরির কাছে এসেছিল তার নাম ছিল সোফিয়া-স্যাপিয়েনসিয়া অর্থাৎ জ্ঞান ও যিশুর মা। আজকের শিশুদের জন্মদিনে পরীরা এসে আশীর্বাদ করে যায় না ঠিকই কিন্তু তার বদলে এখন ওদের ধর্ম-মা আর ধর্ম-বাবা নির্ধারণ করতে হয়।

এই দ্বিতীয় জন্মের ব্যাপারটা প্রায় সকল দেশে, সকল সময়ই দেখা যায়। আদিম চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় আরোগ্যলাভকে নতুন জন্ম বলে বিশ্বাস করা হতো। প্রায় সকল ধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা বদ্ধমূল, মধ্যযুগের গুপ্ত দর্শন চর্চার এটাই ছিল প্রধান বিষয়। এখনও বহু শিশুকে কাল্পনিক এ ভাবনায় আক্রান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তাদের পিতামাতা তার সত্যিকারের পিতামাতা নয়, পালক পিতামাতা মাত্র। যেমন বেনভেনুটো কেলিনি সারাজীবন দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করতেন এবং তার জীবনগ্রন্থেও সেকথা লিখেছেন। সুতরাং এটা কোনো প্রশ্ন নয় যে যারা দুই জন্মে বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকেরই দুজন মা ছিল কিংবা এটাও ঠিক নয় যে ভিঞ্চির মতো যে স্বল্পসংখ্যক মানুষের সত্যিই দুই মা ছিল তারা গোটা মানবজাতিকে এ ধারণার বশবর্তী করেছে। বরং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে এই দ্বিতীয় জন্মের মোটিফের প্রচলন মানবজাতিরই সহজাত, সর্বজনীন একটি মানসিক প্রবণতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। যদি ভিঞ্চি ঐ ছবিতে তাঁর নিজেরই দুই মাকে প্রতিফলিত করে থাকেন (আমার কাছে মোটেও তা মনে হয় না) তবু আমি বলব তিনি তাঁর আগের এবং পরের বহু মানুষেরই একটা সহজাত বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করেছেন। ছবিতে যে শকুনিটি আঁকা রয়েছে তাতে এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়। এই প্রতীকটির উৎস খুঁজতে গিয়ে আমি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সমসাময়িক অত্যন্ত জনপ্রিয় হোরাপোলোর লেখা হাইরোগ্লিফিকা বইটি পড়ি, তাতে দেখা যায় শকুনিকে মায়ের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে শকুনিদের কোনো পুরুষজাতি নেই, এরা বাতাস দ্বারা গর্ভবতী হয়। খ্রিস্টধর্মে বাতাসের অন্য একটি অর্থ আত্মা। ইহুদিদের ধর্মানুষ্ঠানেও বাতাসকে আত্মা হিসেবে উপাসনা করা হয়। তাই আমি মনে করি ছবিতে ঐ শকুনির প্রতীক অবশ্যই মেরিকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যে মেরি নিজেও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুমারী এবং ঐ শকুনির মতোই বায়ু দ্বারা অর্থাৎ আত্মা দ্বারা গর্ভবতী হয়েছেন। সুতরাং একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ভিঞ্চি এই ছবিতে মানুষের পার্থিব জন্ম ও ঐশ্বরিক জন্মের একটা পৌরাণিক ধারণাকেই চিহ্নিত করেছেন, মোটেও তার পারিবারিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেননি। তেমনি এই একই থিমের উপর ভিত্তি করে আঁকা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিত্রকরের অসংখ্য চিত্রকলা আমরা হাজির করতে পারি, তাদের সকলেরই কি দুইজন মা ছিলেন?

এখন ভিঞ্চির এই ব্যাপারটি একজন মনোরোগীর ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখা যাক। ধরা যাক একজন রোগী, যে তার মা সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌছাতে পারছে না, যে মাতার দ্বৈত রূপের গূঢ়েষায় ভুগছে এবং হয়তো তার ব্যক্তিজীবনে দুজন মা রয়েছে। এখন রোগীর এই ব্যক্তিজীবনকেই যদি শুধু বিবেচনায় আনি তবে তার গুঢ়েষার মোটেও কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে রোগীটির মনে দ্বৈত মাতৃসত্তার আর্কিটাইপটিও প্রবল হয়ে উঠে থাকতে পারে। আমরা আগেই দেখেছি এই আর্কিটাইপ সর্বজনীনভাবে ব্যক্তির মনে সুপ্ত থাকে বাস্তবে তার দুজন মা থাকুক বা না-থাকুক। যে চিকিৎসক এই দ্বৈত মায়ের মোটিফ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেন না, তার পক্ষে এ রোগীর চিকিৎসা করা দুস্কর। তার পক্ষে এটি ধারণা করাও কঠিন কী করে একটি আর্কিটাইপ মানুষের মনের সচেতন বিন্যাসকে গৌণ করে দিয়ে এত প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই তো আমরা দেখতে পাব মানুষের মনের কোনো একটি বদ্ধমূল পৌরাণিক বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস কী প্রচণ্ড শক্তিতে একজন ব্যক্তিকে অথবা যূথবদ্ধ মানুষকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং সামষ্টিক চেতনার অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে কেবল ব্যক্তিচেতনার ভিত্তিতে মনোরোগ নির্ণয় একটি ভুল চিকিৎসা পদ্ধতি। আমি মনে করি মনের ঐ আদি মোটিফগুলোর সাথে সঠিক ভারসাম্যের অভাবই অধিকাংশ মনোবিকারের কারণ। মানুষের মনের যৌথ চেতনার অস্তিত্ব আজ কি আরও প্রবল হয়ে ওঠেনি? আমরা কি দেখছি না হিটলারের জার্মানে পুরো একটি জাতি বিস্ময়করভাবে যেন পৌরাণিক ধর্মানুষ্ঠানের মতো, পৌরাণিক একটি প্রতীককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে, কত অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিমন বিস্ফোরণের মতো বিলীন হচ্ছে যৌথ মনে? যেন প্রাচীন যূথবদ্ধ মানুষেরা জেগে উঠছে আমাদের মধ্যে। একটি জাতির ভবিষ্যৎ, সে জাতির সকল মানুষের মানসিক চরিত্রের যোগাযোগ দ্বারা নির্ধারিত নয় কি?

একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতা যদি একজন বিশেষ মানুষের মধ্যেই শুধু পরিলক্ষিত হয় তবে সেখানে আর্কিটাইপের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে, কিন্তু একসাথে অনেকগুলো মানুষ যখন একটা বিশেষ মানসিক প্রবণতা পোষণ করে তখন সেখানে একটা আর্কিটাইপের অস্তিত্ব অনিবার্য। আমাদের মনে রাখতে হবে মানসগঠন প্রক্রিয়াটিই একটা সামাজিক ব্যাপার। আর মনের গভীর স্তরে যে আর্কিটাইপ ঘুমন্ত থাকে বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে, সেগুলোই জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তীব্র শক্তিতে শুরু করে তার প্রভাব। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ইউরোপের কোনো মানুষ যদি ভবিষ্যদ্বাণী করত যে, মানুষ আবার মধ্যযুগের ধর্মাচারে ফিরে যাবে, হাজার বছর আগে একটা ক্রুশচিহ্ন যেমন অসংখ্য মানুষকে যূথবদ্ধ করত, তেমনি একটা পৌরাণিক স্বস্তিকাচিহ্ন আবার অজস্র মানুষকে একত্রিত করবে, মৃত্যুকে মোকাবেলা করার জন্য তবে ঐ লোকটির ভাগ্যে নির্ঘাত জুটত বিস্তর তিরস্কার। অথচ কী অদ্ভুতভাবে আজ সেকথাই সত্য হয়ে উঠছে। আদি মানুষেরা যেমন কিছু যৌথ চেতনা নিয়ে বসবাস করত; ছিল না কোনো ব্যক্তিচেতনা, সে অবস্থাটিই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠছে এবং এটি এখন নিছক কিছু ভারসাম্যহীন মানুষের ব্যাপার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষেরই পরিণতি।

মানুষ পৌনঃপুনিকভাবে অসংখ্যবার মনের যে প্রবণতার অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই মনে গভীরভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে বিশেষ একটা আকার নিয়ে আর্কিটাইপ রূপে। পরবর্তীকালে যখনই জীবনের বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা, ঐ আকারটির সাথে মিলে যায় তখনই তা জাগ্রত করে দেয় ঘুমন্ত সেই আর্কিটাইপকে। আচরণে দেখা দেয় আর্কিটাইপের প্রভাব, প্রবৃত্তির মতোই যা তখন মানুষের ইচ্ছা আর যুক্তির তোয়াক্কা না করে প্রকাশিত হতে থাকে।

প্রমাণ করবার উপায়

আর্কিটাইপের প্রধান উৎস হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নই হচ্ছে সবচেয়ে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত অবচেতন মনের প্রকাশ যার মধ্যে সচেতন মনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে স্বপ্নেই আবির্ভূত হতে পারে যৌথ অবচেতনার উপাদান। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জেনে নিতে পারি তার স্বপ্নে দেখা মোটিফগুলোর যতগুলো তার স্মরণ আছে সেগুলোর কয়টি তার জানা, শোনা, দেখার অভিজ্ঞতার আওতার মধ্যে পড়ে এবং এর কোন্‌গুলো তার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত, অচেনা। এই অচেনা মোটিফগুলো থেকে আবার সেসব মোটিফ বাদ দিতে হবে যেগুলো সম্পর্কে তার পরোক্ষভাবে ধারণা থাকা সম্ভব। যেমন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির শকুনির প্রতীকটি। আমরা জানি না ভিঞ্চি হোরাপোলের বইটি পড়েছেন কিনা, তবে ধরে নেয়া যায় তৎকালীন একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে তার পক্ষে বইটি পড়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে তার ক্ষেত্রে ঐ শকুনির আর্কিটাইপ সরাসরি তার চেতনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে ঐ বইটির পরোক্ষ প্রভাবেও উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে।

এইভাবে আমরা লোকটির স্বপ্ন থেকে সেসকল মোটিফ খুঁজে নিতে পারি যা সেই লোকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং যা কোনোভাবেই তার অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত নয়,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেগুলো বস্তুত অবচেতন আর্কিটাইপের উপাদান যা সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণহীনতার সুযোগে আবির্ভূত হয়েছে স্বপ্নে।

এছাড়া সচেতন মনোনিবেশের মধ্যদিয়ে যে অলীক কল্পনা করা যায় তা থেকেও আর্কিটাইপের উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব। অলীক কল্পনায় অবচেতন মন তৃপ্ত হয়। আলীক কল্পনায় এমন সব উপাদান উদ্ভাসিত হয় যেগুলো সচেতন মনের গণ্ডিতে আসতে প্রায়শই চেষ্টা করে থাকে। একজন লোককে যদি তার অলীক কল্পনার মধ্য থেকে বিশেষ একটি উপাদান সংগ্রহ করে কেবল ঐ উপাদানকে ঘিরে আবার গভীর ধ্যানে মগ্ন হতে দেয়া যায়, তবে ঐ উপাদানকে কেন্দ্র করে তার অবচেতন মনের আরো গভীর অন্তস্তল থেকে নতুন উপাদান উদ্ভাসিত হবে। পুনরায় সেই উপাদানগুলো থেকে যদি একটাকে নির্বাচিত করে আবার তাকে ধ্যানে মগ্ন করা হয় তবে মন আরো গভীর স্তরের উপাদানকে স্পর্শ করবে। এইভাবে অবচেতন মনের এক একটি স্তর অতিক্রম করে একসময় কল্পনা স্পর্শ করবে যৌথ অবচেতনার গভীর স্তরকে, সেখান থেকে তখন উদ্ভূত হবে আর্কিটাইপের উপাদান। তবে এটি যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ একটি পদ্ধতি, কারণ যে লোকটি দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে সে একপর্যায়ে বাস্তব থেকে অতিমাত্রায় দূরে সরে গিয়ে বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং এ ধরনের পদ্ধতি সতর্কতার সাথে চর্চা করা উচিত।

এছাড়া খুব কৌতূহলোদ্দীপক আর্কিটাইপের সন্ধান পাওয়া যায় প্যারানোইয়া রোগীদের প্রলাপ থেকে; সম্মোহিত অবস্থার কল্পনা থেকে এবং পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশুদের স্বপ্ন থেকে। তবে তখনই একটি উপাদানকে কেবল নিশ্চিতভাবে আর্কিটাইপ বলা যাবে যখন এর সমান্তরালে যথাযথ একটি পৌরাণিক উপাদানের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ পুরাণ বা মিথেই রয়েছে মানুষের যৌথ অবচেতনার সবচাইতে যথার্থ প্রতিফলন। তবে তার মানে এই নয় যে, একজন কেউ স্বপ্নে সাপ দেখলেই তা পৌরাণিক সাপের প্রতীকের সাথে একই অর্থ বহন করবে। কারণ এক একটা প্রতীকের একটা বিশেষ ঘটনা-পরম্পরা-সম্পর্কিত কার্যকরী অর্থ রয়েছে। সেই বিশেষ কার্যকরী অর্থের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা হলেই কেবল তাকে যথার্থ সমান্তরাল প্রতীক বলা যাবে। এটা অবশ্য দীর্ঘ গবেষণা এবং পরিশ্রমসাধ্য একটা প্রক্রিয়া।

উদাহরণ

এ প্রসঙ্গে একজন রোগীর উদাহরণ দিয়ে আমি বক্তৃতা শেষ করব। আমার রোগীটির বয়স ছিল ত্রিশের কোঠায়। সে সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিল। সে অত্যধিক প্রলাপ বকত, কখনো কখনো সে অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিত, কখনো নিতান্ত নির্বোধের মতো কাজ করত এবং অধিকাংশ সময়েই উদ্ভট সব কল্পনার কথা বলত। সে ছিল সাধারণ একজন অফিসের কেরানি কিন্তু নিজেকে সে সবসময় যিশুখ্রিস্ট ভাবত। সে প্রায়ই দৃষ্টিভ্রমে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আক্রান্ত হত। একদিন আমি তার বিছানার কাছে আসতেই দেখি সে জানালা দিয়ে সূর্যের দিক তাকিয়ে চোখ মিটমিট করে মনোযোগের সাথে কিছু একটা দেখছে এবং ঘন ঘন মাথাটিকে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছে। আমাকে দেখে সে আমার হাত ধরে বলল, আমাকে সে একটা জিনিস দেখাতে চায়। জানালার কাছে যেতেই সে বলল, আমি যদি এই মুহূর্তে চোখ অর্ধেক বুজে সূর্যের দিকে তাকাই তাহলে আমি সূর্যের পুরুষাঙ্গটিকে দেখতে পাব এবং আমি যদি আমার মাথা ডানে এবং বামে নাড়াই তাহলে সূর্যের লিঙ্গটিও সামনে পেছনে আসবে, সেইসাথে সে আমাকে জানাল সূর্যের পুরুষাঙ্গের এই গতির কারণেই বস্তুত বাতাসের জন্ম হয়।

এই রোগীটি আমি পাই ১৯০৬ সালে। ১৯১০ সালে আমি যখন মিথের উপর পড়াশোনায় নিমগ্ন রয়েছি তখন আলব্রেখট দিয়েটেরিচের একটা বই আমার হাতে আসে। বইটিতে মিথ্রীয় জাতির গুপ্ত উপাসনা পদ্ধতির বিবরণ লেখা রয়েছে। তাতে রয়েছে কিছু আদেশ, নির্দেশ এবং তাদের বিশ্বাসের কিছু চিত্রকল্প। একটি চিত্রকল্পের বর্ণনা এমন— 'ঐ নলটিই বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্যের দিকে তাকালে দেখবে তার গোলক থেকে কী যেন একটি ঝুলে আছে, যা দেখতে একটি নলের মতো। নলটির মুখ পশ্চিম দিকে ঘোরানো, কারণ পূর্বে অনেক বাতাস আছে, আবার মাঝে মাঝে যখন পশ্চিম দিকে বাতাস বেশি হয়ে যায়, নলটির মুখ পূর্বদিকে ঘুরে যায়।' গ্রিক ভাষায় নলের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তার অর্থ বায়ুযন্ত্র। অর্থাৎ তাদের ধারণায় সূর্য থেকে একটি নলের মাধ্যমে পৃথিবীতে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

আমার রোগীটি ঐ দৃশ্য দেখেছে ১৯০৬ সালে আর প্রাচীন মিথ্রীয় জাতির উপর ঐ প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১০ সালে। ফলে এ বিষয়ে রোগীর স্মৃতিকে প্রভাবিত করবার কোনো সম্ভাবনাই বইটির নেই। অথচ দৃশ্যদুটো একই সমান্তরাল। এই সমান্তরাল দর্শনটি যে মোটেও আকস্মিক কোনো ঘটনা নয় সে ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন আমি মধ্যযুগের কিছু চিত্রকলার সন্ধান পাই, যেখানে আঁকা হয়েছে স্বর্গ থেকে একটি লম্বা নল নেমে এসে মাতা মেরির জামার ভেতর প্রবেশ করছে। এই নলের মধ্যদিয়েই পবিত্র আত্মা কবুতর-রূপে অবতরণ করে মেরিকে গর্ভবতী করে দিয়ে গেছে বলে তারা বিশ্বাস করে। ইহুদি ধর্মাচারে ক্ষিপ্রগতি বাতাসকে বলা হয় পবিত্র আত্মা। ল্যাটিন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে 'এবং সূর্যের গোলক থেকে আত্মা অবতরণ করেন।' মধ্যযুগীয় দর্শনে এটি খুবই সাধারণ একটি বিশ্বাস।

সুতরাং রোগীটি যে দৃশ্য দেখছে এটা মোটেও কোনো আকস্মিক ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হয় না। বরং মানুষের সহজাত, সর্বজনীন কিছু আদিম ধারণাই যা আর্কিটাইপ হিসেবে মনের যৌথ অবচেতনার স্তরে সুপ্ত ছিল, তা এই রোগীটির বিক্ষিপ্ত মনে পুনরায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য

লেখক-সমাজ সম্পর্ক

চিনুয়া আচেবে

মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সাহিত্য লিখিতরূপে বিবর্তিত হওয়ার অন্যতম একটি ফলাফল হলো লেখার উপর লেখকের স্বত্ব।

আদিম কথক আগুনের চারপাশে বসে শ্রোতাদের যে গল্প শোনাত, মুখনিঃসৃত হবার পর সেই গল্পের উপর তার আর কোনো অধিকার থাকত না। কিন্তু সেই কথকের উত্তরসূরি আজকের লেখক যখন টেবিলে বসে গল্প লেখেন তখন সেই গল্প হয়ে যায় তারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই পরিবর্তনের একটা সহজ বাস্তব কারণ হচ্ছে এই যে, মুখের বলা গল্পের কোনো জড় রূপ নেই। কিন্তু বইয়ের এই জড় রূপের কারণেই যে শুধু লেখকের স্বত্বের ব্যাপারটির আবির্ভাব ঘটেছে তা নয়। বরং বলা যায় স্বত্বাধিকারের যে আকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যেই বিরাজমান ছিল বই তাকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। এই আকাঙ্ক্ষার মূল নিহিত রয়েছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চর্চার মধ্যে।

আমি এমন এক শৈল্পিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করি যেখানে এমন শিল্পবস্তু তৈরি করা হয় যার একটা বড় রূপ রয়েছে তবু কেউ এর ব্যক্তিগত স্বত্ব দাবি করে না, এমনকি কখনোবা সেই স্বত্ব প্রত্যাখ্যান করারও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকে। আমি ইগবোল্যান্ডের কোনো কোনো অঞ্চলের 'ওমবারি' শিল্পের কথা বলছি।

সাধারণত ভূমি দেবতার উদ্দেশে ঐ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নিবেদিত হয় 'ওমবারি' নামের এই জমকালো শিল্পকর্ম। গোষ্ঠীর নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি মাসের পর মাস ধরে,

~ www.amarboi.com ~

এমনকি বছরের পর বছর ধরে নিভৃত এক স্থানে বসে চিত্রকলা আর ভাস্কর্য দিয়ে তৈরি করে এই দেবতার অর্ঘ্য। কিন্তু তৈরি হয়ে যাবার পর সেই প্রতিনিধিরা (যাদের বলা হয় ওনডিমবে) এই শিল্পকর্মটি নির্মাণের যাবতীয় কৃতিত্ব সচেতনভাবে অস্বীকার করতে থাকে। তারা মনে করে এটি দেবতার সম্পদ এবং এর উপর অধিকার আছে শুধুমাত্র তাদের গোষ্ঠীর। তারা মনে করে ওনডিমবেগণ নেহাতই কয়েকটি পাত্র যাতে দেবতারা মানুষের সৃজনশীলতার ক্ষমতাকে স্থাপন করেছেন এবং তার বিনিময়ে সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এই গোষ্ঠী দেবতাকে নিবেদন করতে পারছে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য। নিভৃতবাসে তাদের শিল্পকর্মটি তৈরি হবার সাথে সাথে ওনডিমবেগণ ফিরে আসে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এবং তাদের সম্প্রতি তৈরি ঐ শিল্পকর্মটি থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে চলে। হার্বার্ট কোল ব্যাপারটি সম্পর্কে লিখেছেন—"ওনডিমবেরা সবসময় সন্ত্রস্ত থাকে এই বুঝি তাদের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—দ্যাখো এই জিনিসটি আমি বানিয়েছি। একথা বলেছে তো মরেছে। কারণ জিনিসটা যার সেই দেবতা তাকে মেরে ফেলবে।"

ব্যাপারটি অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি যে শিল্পের সত্য প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এ ব্যাপারটিতে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়। এখানেই আমি ফিরে আসছি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে পশ্চিমা মনস্তত্ত্ব এবং জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ধারণা। বলা হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গলজনক, বিশেষ করে শিল্পীদের জন্য। জন প্লামেনাজ তার *ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি* বইতে শিল্পীদের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আলাদা করে বলেছেন—"শিল্পীরা তার নিজস্ব হলরেখায় লাঙল চালায় আর অন্য বুদ্ধিজীবীরা নিজের পড়ার ঘরের নিভৃতে বসে কাজ করলেও বস্তুত সাধারণের জমিই চাষ করেন।"

বলা হয় আমেরিকান ওয়ালডো এমারসন সম্ভবত প্রথম ইংরেজিতে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' শব্দটি ব্যবহার করেন, যার মাধ্যমে তিনি জীবনে ব্যক্তির প্রাধান্যের ধারণাটিকে তুলে ধরেন। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংজ্ঞা আমেরিকান ধাঁচের আশাবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমারসনের সমসাময়িক ফরাসি আলেক্সিজ ডু টেকোভিল ছিলেন বরং তুলনামূলকভাবে কম আশাবাদী। তিনি তাঁর *ডেমোক্রেসি ইন আমেরিকা* গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শব্দটাকে নিন্দাসূচক হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং বলেছিলেন এটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমারসনের ধারণাটি শুধু আমেরিকাতে নয় সমগ্র পশ্চিমা জগতের জীবনেই পথ করে নিয়েছে।

প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা দুনিয়ার যে সাফল্য তা আধুনিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ফলে এটি স্বাভাবিক যে পশ্চিমা এইসব অসাধারণ সাফল্য, সেইসঙ্গে পশ্চিমা মূল্যবোধকে লোকে প্রশংসা করে এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধকে সঠিক এবং অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করে। তবে বিভিন্ন সময়ে যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও এ বিষয়ে সন্দেহের কথাও উচ্চারিত হয়েছে।

সেনেগালের মুসলিম লেখক শেখ হামিদু কেন্-এর উপন্যাস 'অ্যামবিগুয়াস অ্যাডভেঞ্চার'-এর নায়ক প্যারিসে দর্শন অধ্যয়নরত একজন আফ্রিকান ছাত্র। তাকে এক ডিনারে একজন জিজ্ঞাসা করে : একজন আফ্রিকানের উপর পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া কী? ছাত্রটি যে উত্তর দিয়েছিল : আমি মনে করি সেটি উপন্যাসের অন্যতম একটি অংশ। সে বলেছিল—

"আমার মনে হয় পশ্চিমা চিন্তার ইতিহাস একটা দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে এর গতিপথ পরিবর্তন করেছে এবং এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা তার ছিল না। আমি কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছেন? সক্রেটিসের সঙ্গে সেন্ট অগাস্টিনের চিন্তার মৌলিক পার্থক্য আছে বলে আমার মনে হয় না, যদিও দুজনের মাঝখানে যিশু আছে। পাসকাল পর্যন্ত মূল পরিকল্পনা একই, কোনো আকস্মিকতা নেই। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না দেকার্তের কাছে এসে সেই পরিকল্পনা বদলে গেছে এবং তা পাসকাল থেকে ভিন্ন? মূল রহস্যটি বদলে যায়নি, বদলে গেছে এই রহস্যকে কেন্দ্র করে প্রশ্নগুলো এবং এই প্রশ্নের পাপ্য উত্তরগুলোর প্রত্যাশা। অন্বেষার ক্ষেত্রে দেকার্তে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কৃপণ। তার পদ্ধতিকে ধন্যবাদ। তিনি যদি আরো অধিক সংখ্যক উত্তরও খুঁজে পেতেন তাতে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হতো না।"

ঠিক ধৃষ্টতা না হলেও কারো পক্ষে বিশেষ করে একজন আফ্রিকান ছাত্রের পক্ষে আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের পিতা দেকার্তেকে একটি দার্শনিক দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা রীতিমতো সাহসের ব্যাপার। তবে এই কথার একটা ভালো ভিত্তি আছে। সক্রেটিস কিংবা তাঁর ছাত্র প্লেটো অথবা অগাস্টিন যদি আজকের পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাহলে হয়তো পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে তার আফ্রিকার যৌথজীবনকে বেশি পছন্দ করবেন। *দ্য রিপাবলিক* মূলত সমাজের মানুষকে সুশৃঙ্খল করারই মহাপরিকল্পনা এবং *দ্য সিটি অব গড* প্যাগানদের দ্বারা রোমান সাম্রাজ্য পতনের পর সমাজকে খ্রিস্টীয় পুনর্গঠনেরই প্রস্তাব। অন্য কথায় ঐতিহাসিকভাবে যিশু থেকে সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্লেটো এবং অগাস্টিনের দর্শন মূলত একটি উন্নততর সমাজ গঠনের স্থাপত্য নিয়েই ভাবিত। অন্যদিকে দেকার্তে যদি আবার জন্মাতেন তিনি হয়তো আমেরিকার নাগরিক হতে চাইতেন। তিনি দর্শনের সনাতনি ধ্যানমগ্ন আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সেখানে এনেছিলেন নতুন নিরীক্ষাধর্মী যৌক্তিকতা এবং জড়জগৎ সম্পর্কে অধিযন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন মানবজাতির উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে এবং নিজের আলোকবিদ্যা এবং শরীরবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তবে যে ব্যাপারটি তাঁকে সত্যিকার অর্থে আধুনিক পাশ্চাত্য মানুষ করে তুলেছে সেটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে এই যে, তার দর্শনের প্রাসাদ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক ভাবনার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর উত্তরপুরুষ 'cogito ergo sum'—"আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি।"

সম্ভবত এই অহংতাড়িত বিজয়দীপ্ত ঘোষণাই অ-ইউরোপীয় মনকে কখনো কখনো অস্বস্তিতে ফেলে দেয় কারণ তারা একক ব্যক্তির ঊর্ধ্বেও কর্তৃত্ব রয়েছে বলে মনে করে এবং সেই থেকেই তাদের মধ্যে পশ্চিমা চিন্তার দুর্ঘটনা বিষয়ক উদ্ধত ভাবনার জন্ম হয়। তবে এ নিয়ে অস্বস্তিতে সে যতই পড়ুক পশ্চিমা দেশের বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং জাগতিক প্রয়োজন মেটানোতে তাদের ক্ষমতায় অ-ইউরোপীয়রা মুগ্ধও বটে। ফলে আমরা দেখি যে এই অসাধারণ পশ্চিমা সাফল্যের গোপন রহস্য বুঝবার জন্য অপশ্চিমারা ছুটে আসছে পশ্চিমে এবং সেটি দুঃসাধ্য হলে অন্তত পশ্চিমা সাফল্যের ফলগুলো ভোগ করছে।

পশ্চিম এবং আফ্রিকার মধ্যকার দার্শনিক সংলাপের বিষয়টি *অ্যামবিগিউআস অ্যাডভেঞ্চার* বইটির মতো এত চমৎকারভাবে আর কোথাও উপস্থাপিত হয়নি। গল্পের প্রথম পর্বে দেখা যায় পশ্চিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ চরাচরে হাজার বছর ধরে কর্তৃত্বকারী ইসলামের চাঁদতারার বাহক গর্বিত শাসকগোষ্ঠী ফরাসি ঔপনিবেশিকদের কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে কেমন কাতরাচ্ছে এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে কেমন ভাবিত হয়ে পড়ছে। তারা কি তাদের সন্তানদের নতুন ফরাসি স্কুলে পাঠাবে? বহু উত্তপ্ত বিতর্কের পর তারা এই স্কুলগুলোকে মেনে নেয়, তবে এই বলে নয় যে তাদের নিজস্ব স্কুলগুলো ফরাসি স্কুলগুলোর চেয়ে কোনো অংশে কম এবং এই আকাঙ্ক্ষাতেও নয় যে একদিন তারা ফরাসিদের মতো হবে। বরং তারা এটি মেনে নেয় কৌশলগত কারণে। তারা মনে করে তাদের নতুন প্রভুদের কাছে শিখতে হবে কীভাবে সঠিক পথে না-থেকেও জিতে যাওয়া যায়।

তবে এই সিদ্ধান্তের সমস্যা হলো এই যে এই শিশুরা, যাদের কবি সেনয়ের হয়তো বলতেন 'কোমল পায়ের পথভ্রষ্টের দল', এই শিশু ম্যাজাইরা তখন থেকে শুরু করল এক অনিশ্চিত যাত্রা, যে যাত্রার উদ্দেশ্য স্ববিরোধী 'অভিজ্ঞতা' নেওয়া কিন্তু 'হওয়া' নয়। শুরু থেকেই যা পর্যবসিত হলো হতাশা আর ব্যর্থতায়।

গল্পের নায়ক, নতুন প্রজন্মের তুখোড় প্রতিনিধি ফ্রান্স থেকে ফিরে আসে দার্শনিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে। একসময়কার সমাজ, গোষ্ঠী নিয়ে তার ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। তাকে যখন নেতৃত্ব দেবার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তার যন্ত্রণাদগ্ধ আত্মা একা থাকবার জন্য আকুতি জানায়। তাদের সমস্যায় আমার কী যায় আসে? সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। আমি তো আমার, আমার আছে শুধু আমি। বেচারা, পশ্চিম তাকে ভালোমতোই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমা সাহিত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই সাহিত্য এই ধারণা তুলে ধরে যে সমাজ এবং তার সংস্কৃতি হচ্ছে একটি কারাগার। মুক্তি এবং পরিতৃপ্তির জন্য ব্যক্তিমানুষের উচিত এই কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যবাধকতা, শ্রমসাধ্য প্রয়াস এগুলোর অনুপস্থিতিই তো তৃপ্তি বা মুক্তি নয়। বরং একটা সীমানার ভেতর এগুলোর শক্তিশালী উপস্থিতি যা নিশ্চিত করবে ব্যক্তির বাধাহীন চলাচল তা-ই হলো মুক্তি, পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি হলো অন্যের সঙ্গে আত্মিক সঙ্গতি অর্জনের জন্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। লোকে যখন পরিতৃপ্তির কথা বলে তারা আসলে আত্মসন্তুষ্টির কথা বোঝায় যা সহজ ক্ষণস্থায়ী এবং আত্মকেন্দ্রিক— নেশাদ্রব্যের মতো যা বারবার গ্রহণ করতে হয় এবং ক্রমান্বয়ে মাত্রা বাড়িয়ে। কিন্তু পরিতৃপ্তি আত্মকেন্দ্রিক ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অন্যের। পরিতৃপ্তি রয়েছে আত্মবিসর্জনের মধ্যে, এই বিসর্জন হয় কোনো ব্যক্তিমানুষের কাছে কিংবা কোনো উদ্দেশ্যের কাছে। যারাই এই পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা এই ব্যক্তিবহির্ভূত বাস্তবতার সত্যতা স্বীকার করেছেন। ধার্মিক মানুষেরা পরিতৃপ্তির জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করেন। যৌবনে আত্মকেন্দ্রিক আনন্দ উপভোগের পরবর্তী পর্যায়ে আদি খ্রিস্টীয় চার্চের মহান যাজক সেন্ট অগাস্টিন এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"হায় ঈশ্বর, আমাদের আত্মা অস্থির, যতক্ষণ না সেটি তোমার উপর স্থির হচ্ছে।" শিল্পী বৈজ্ঞানিকরা পরিতৃপ্তি পান তাদের সৃজনশীল কাজে, যা একটি মানবিক সেবা। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো সাধারণ মানুষ পরিতৃপ্তি পায় অন্যের সান্নিধ্যেই; হয়তো সন্তান, পিতামাতা, স্বামী, স্ত্রী বা প্রেমিকের সান্নিধ্য এবং বিবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে।

ফরাসি নৃতাত্ত্বিক ও মানোনি, মালাগাছির মেরিনা সম্পর্কে লিখেছেন—

"আমরা তার অন্তর্গত ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক সত্তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখতে পাই না যা সচরাচর চোখে পড়ে যে-কোনো সভ্য মানুষের মধ্যে।"

বলাবাহুল্য আমরা যেন সভ্য মানুষ সম্পর্কে মানোনির আকস্মিক ধারণাটি দিয়ে বিভ্রান্ত না হই। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা আরো বলতে পারি এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার নব্য প্রতিনিধিদের মধ্যেও পরিলক্ষিত। একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই মানসিক দ্বন্দ্ব প্রত্যাশিত না হলেও অবশ্যম্ভাবী কারণ এই দ্বন্দ্বের মূল্যেই পশ্চিমে ঘটেছে সম্পদ, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ইত্যাদির অসাধারণ অগ্রগতি। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের বাইরের মূল্যবোধগুলোও যে আধুনিকায়নে ভূমিকা রাখতে পারে, সাম্প্রতিক জাপানের আগে সে কথা কখনো বিবেচনাতেই আনা হয়নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার মনে আছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমারা এবং তাদের স্থানীয় সমর্থকরা আমাদের প্রায়ই বলতেন যে আমরা যে আফ্রিকান উপন্যাস লিখি সেগুলো আদৌ কোনো উপন্যাস নয় কারণ ইউরোপের সামন্ত সমাজের ক্ষয় এবং পুঁজিবাদের উত্থানের সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির যুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে উপন্যাস নামের যে নতুন মাধ্যমের যাত্রা শুরু হলো, আমাদের উপন্যাসগুলো তার সঙ্গে খাপ পায় না। আমাদের বলা হয়েছে এই মাধ্যমটির জন্মই হয়েছে সমাজ নয়, ব্যক্তির দশাকে ফুটিয়ে তুলতে।

তবে উপন্যাস, তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার জন্মভূমিতেও সবসময় সেরকম আচরণ করেনি। নতুন, তেজি এই শিল্পমাধ্যম ক্লান্তিহীন পথপরিক্রমা করেছে এবং অদ্ভুত সব অভ্যাস গড়ে তুলেছে।

খুব বেশিদিনের কথা নয় চেক-লেখক মিলান কুন্ডেরা লিখেছেন—

"উপন্যাস হচ্ছে মানবসত্তার অনুসন্ধান, এটি কোনো সত্য বা নৈতিকতা প্রচার করে না... সেসব অন্যদের কাজ যেমন রাজনৈতিক দল, প্রেসিডেন্ট, সন্ত্রাসী, যাজক, বিপ্লবী কিংবা সম্পাদক। উপন্যাসের জন্ম হয়েছে তখন যখন আধুনিক মানুষ বুঝতে শুরু করেছে যে সত্যের কাছে পৌঁছানো কতটা কঠিন এবং মানুষের জীবন ও বাস্তবতা কতটা আপেক্ষিক।"

আমি স্বীকার করি এই বক্তব্যের কিছু ব্যাপার আমার পছন্দের, এমনকি প্রেসিডেন্ট এবং সন্ত্রাসীকে পাশাপাশি রাখবার ব্যাপারটিও, কারণ একজন প্রেসিডেন্ট যখন একজন সন্ত্রাসীর পিছু নেয় তখন তাদের দুইজনকে আলাদা করে চেনা বেশ দুরূহ। তবে কুন্ডেরার অবস্থানটি আমার মতে খুবই ইউরোকেন্দ্রিক, গোঁড়া, যে কারণে ভুল। একটা বিশেষ পরিস্থিতি এবং পদ্ধতির মধ্যে যদি উপন্যাসের উৎপত্তি ঘটেও থাকে তবু কি তাকে সেই আদি অবস্থানেই থাকতে হবে? মানুষের জীবন এবং বাস্তবতা যে আপেক্ষিক এ সত্য কি সকলেই ইউরোপের মতো দেরিতে আবিষ্কার করেছে? এবং পরিশেষে এ কথা কি সত্যি কেউ গুরুত্বের সাথে বলতে পারে যে উপন্যাস কোনো নৈতিকতা প্রচার করে না?

Ninety nine Novels—The Test in English Since 1939 বইটির ভূমিকায় ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এন্থনি বার্গেস সঠিকভাবেই লিখেছেন—"যা সংগীত, চিত্রকলা বা ভাস্কর্য নয় তা-ই হচ্ছে উপন্যাস, এটা এমন এক আঙ্গিক যা নৈতিকতায় নিমজ্জিত।" বলাবাহুল্য বার্গেস মোটেও রবিবাসরীয় প্রার্থনাসভার সনাতন নৈতিকতার কথা বলছেন না। বরং তিনি বলছেন—"উপন্যাস সনাতন ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে এবং আমাদের একথা জানাবে যে নৈতিক সিদ্ধান্তে আসা একটা কঠিন কাজ। একে বলা যেতে পারে উন্নততর নৈতিকতা।" তবে আমরা এত সহজে মিলান কুন্ডেরার আবেদন নাকচ করতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারি না যিনি একজন শিল্পী এবং যিনি একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলছেন, যে রাষ্ট্র লেখকের জন্য সত্য এবং নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়। "আমরা আর বাস্তবতা কত আপেক্ষিক"; কিংবা বার্গেস বলেছেন— "নৈতিক সিদ্ধান্তে আসা একটি কঠিন কাজ।"

আমরা হয়তো এমনভাবে আলাপ করছি যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাটি পশ্চিমেই আবিষ্কৃত হয়েছে যা একজন এমার্সন নামের আমেরিকান আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানবসমাজের সমানই পুরনো। মানুষ যখন থেকে দলবদ্ধ হতে শুরু করেছে তখন থেকেই মানোনির সেই সামাজিক সত্তা আর অন্তর্গত সত্তার কিংবা সহজ করে বললে ব্যক্তি আর সমষ্টির মধ্যকার দ্বন্দ্বও শুরু হয়েছে। এ দ্বন্দ্ব না-থাকার কথা ভাবা যায় না। সুতরাং এই দ্বন্দ্ব সবসময় ছিল কি না প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে কী করে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করেছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টে একটা নাটকীয় মুহূর্তে এযকাইল তার শিষ্যদের এই পুরনো দ্বন্দ্ব মোকাবেলার নতুন পথ খুঁজতে পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি যখন বলেন, "যে আত্মা পাপ করবে তার মৃত্যু ঘটবে" তখন তিনি সাহসের সঙ্গে পুরনো সেই শিক্ষা 'বাবা টক খেলে তার সন্তানের দাঁতও টকে থাকবে' তাকে অতিক্রম করে যান।

বছর কয়েক আগে জন আপড়াইক আমার *অ্যারো অব গড* বইটি পড়ে আমাকে একটি চিঠি লেখেন যাতে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু মন্তব্য রয়েছে। আমি সেই চিঠির ঠিক অংশ উদ্ধৃত করছি, কারণ তাতে এমন কিছু মন্তব্য রয়েছে যা আমার এই আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক— "*অ্যারো অব গড* এর শেষ পরিবর্তনটা অপ্রত্যাশিত এবং তা চমৎকার অনুরণন সৃষ্টিকারী, বেদনাবিধুর এবং ধর্মতাত্ত্বিক। সেই ইযুলু যাকে আমরা দেখলাম নোয়াবকা এবং ক্লারগির বিরুদ্ধে অপরাজেয় শক্তিতে যুদ্ধ করতে সে কিনা হঠাৎ তার নিজের ঈশ্বর উনুর কাছে কেমন পরাস্ত হয়ে গেল এবং পরাজিত হলো তার ভেতরকার প্রতিশোধপ্রবণতার কাছে। মাত্র এক দুই পৃষ্ঠায় পরাজয় হলো এমন একজনের যে কিনা তার জনতার খ্রিস্টীয় ভারশঙ্কু। উপন্যাসে এমন একটি সমাপ্তি রচনা করা কোনো পশ্চিমা লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এমন একজন নায়ক তৈরি করে কিছুতেই তার এমন পতন ঘটাতেন না, এমনকি তারা প্রক্রিয়ার এই নির্মম বাস্তবতার ব্যাপারেও আপনার মতো এতটা সত্যবাদী হতে পারতেন না।"

নিশ্চয়ই একজন পশ্চিমা লেখক তাঁর তৈরি দেবদূত, পরমোৎকর্ষের মূর্ত রূপ যে ব্যক্তি নায়ক তাকে এমন এক-দুই পাতায় ধ্বংস করতে চাইবেন না কিছুতেই। আর যদি তা করতেই হয় তবে তিনি তা করবেন বিস্তারিতভাবে এবং অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যৌক্তিকতা দিয়ে যা সমাপ্তিতে হয়ে দাঁড়াবে একটি শোকগাঁথা। এবং সেই নায়ককে সুযোগ দেয়া হবে এক বিশাল বিদায়ী স্বগতোক্তি উচ্চারণে।

অপশ্চিমা লেখকদের সেই বাধ্যবাধকতা নেই, কারণ তার ঐতিহ্যে মনুষ্য নায়ক এতটা বিশাল নয়। এমনকি ইযুলু যে একজন নেতা এবং যাজক সেও সত্যিকার অর্থে তার গোষ্ঠীর অধীনস্থ। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সে মনুষ্য অতীত মহাজাগতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে শক্তিকে আপনি ঈশ্বর, ভাগ্য, সুযোগ যাই বলুন না কেন। আমি তাদের কখনো বলি ঘটনার পেছনের শক্তি, কারণ তা প্রজ্ঞার আকর যা এখনো কিংবা হয়তো অনাগত কালেও আমাদের নাগালের বাইরে রয়ে যাবে। বাস্তবতার শৃঙ্খলার সেইসব শক্তির কাছে মনুষ্য নায়ক নেহাতই তুচ্ছ। তারা যদি তার পতন ঘটায় তবে সে-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে তারা বাধ্য নয়।

তাহলে এর অর্থ কি এই দাঁড়াচ্ছে যে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে, ধরা যাক ইগবোদের মধ্যে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই, স্ববিরোধী শোনালেও প্রশ্নটির জোরালো উত্তর হবে না। ইগবোদের মধ্যে একক ব্যক্তিত্বের ধারণাটি অনন্যসাধারণ। বহু সংস্কৃতিতে প্রতিটি ব্যক্তির গুরুত্ব বিবেচিত হয় এই অর্থে যে তারা একই ঈশ্বরের সৃষ্টি কিন্তু ইগবোদের অনন্য ধারণা এই যে প্রতিটি ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের প্রতিনিধির সৃষ্টি, যার নাম 'চি'। তারা মনে করে দুজন ব্যক্তি এমনকি যদি তারা রক্তসম্পর্কের ভাইও হয় তবু কখনো একই 'চি' দ্বারা সৃষ্ট নয়। তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইগবো জনগণ ব্যক্তির একই আশ্চর্য বিশেষত্ব সত্ত্বেও একে ভারসাম্যে রাখছে ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশের সীমানা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে। প্রথম সীমানা এই, যেখানে ব্যক্তি তার ব্যবহারিক এবং সামাজিক বিষয়ে গোষ্ঠীর অধীনস্থ। এছাড়াও রয়েছে নৈতিক সংস্কার। বিভিন্ন শক্তিশালী সতর্কতামূলক গল্পকাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়া হয়।

শুরুতে আমি ইগবো জনগোষ্ঠীতে শিল্পকর্মের উপর শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বত্বে প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলাম। এখানে আমি সিমন ওটেনবার্গ নামের একজন আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদকে উদ্ধৃত করব। তিনি একজন আফিকপো জাতির ধর্মীয় মুখোশ কারিগরের কাজের বিবরণ দিয়েছেন—

"মাঝে মাঝে তার বন্ধুরা জানতে পারে যে সে জঙ্গলে কাজ করছে। তখন তারা সেখানে যায় এবং তার পাশে গিয়ে বসে তার মুখোশ বানানো দেখে। কখনো কখনো বন্ধুরা তাকে মুখোশ বানানো সম্পর্কে পরামর্শ দেয় যদিও হয়তোবা তারা নিজেরাই মুখোশ বানানো সম্পর্কে কিছু জানে না। তাদের পরামর্শে সে অবশ্য অপমানিত বোধ করে না... আমার মনে হয়েছে সে এবং তাদের সঙ্গ উপভোগই করে।

~ www.amarboi.com ~

দেখা যাচ্ছে এখানে স্পষ্টত শিল্পী এবং তার সমাজের লোকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। কী করে সবচেয়ে সুন্দর মুখোশটি বানাতে হয় এ নিয়ে তাদের সবার একমত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শিল্পীর সঙ্গে সমাজের অন্যান্যরাও মুখোশ বানানোর প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে সেটা ঐ গোষ্ঠীর জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ফলে তা মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে যে আকাঙ্ক্ষা একদিন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শিল্পসৃষ্টিতে। এটি কল্পনার মাধ্যমে বাস্তবতাকে বিকল্পভাবে মোকাবেলা করার আকাঙ্ক্ষা।

তবে আমি যে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্যদের পদ্ধতির মাঝে একটা পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করছি, Chinweizu যেমন তার বইয়ের দৃষ্টিকাড়া শিরোনাম দিয়েছিলেন 'দ্য ওয়েস্ট অ্যান্ড দ্য রেস্ট অব আস' তাতে একটা মারাত্মক সরলীকরণের ঝুঁকি রয়েছে। আমি আশা করি কোনো দুটি সমাজের বিশেষত্বের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে আমি আমার পাঠকদের এমন কোনো ফাঁদে নিয়ে ফেলিনি যাতে তারা ভেবে বসে থাকবেন যে সমাজের পার্থক্যগুলো আপেক্ষিক নয় বরং ধ্রুব। তবে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি আবারো বলছি জন আপডাইকের প্রশংসা বা এন্থনি বার্গেসের সিদ্ধান্ত এ ধারণাকে অনুপ্রাণিত করে না যে এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য এবং আমাদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী একটা বিভাজন রয়েছে।

এ বিষয়ে আরেকটু অগ্রসর হয়ে আমি আরেকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি জে বি প্রিস্টলি উদ্ধৃত করছি, যিনি তার 'লিটারেটার অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ম্যান' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"সমাজের চরিত্ররাই তৈরি করে উপন্যাস... বস্তুত মননশীল ঔপন্যাসিকের কাছে সমাজই উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে সমাজ নিজেই একটা চরিত্র হয়ে ওঠে, সম্ভবত হয়ে ওঠে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।"

প্রিস্টলি সম্ভবত এখানে সমাজের বাস্তব সম্পর্কের চাইতে গল্পের প্রয়োজনে সমাজকে ব্যবহারের কথা বলেছেন। তবে তিনি যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন সমাজের সঙ্গে লেখকের যে সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার কথা তিনি বলছেন তা মোটেও পশ্চিমে লেখক এবং সমাজের মধ্যে যে তৈরি সম্পর্ককে উৎসাহিত করা হয় তার অনুকূলে নয়।

পরিশেষে আমি লেখকের আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গটি তুলতে চাই। কে আমার সমাজ? 'ওমবারি' এবং আফিকপো শিল্পীর কাছে রয়েছে তুলনামূলকভাবে ছোট, অপেক্ষাকৃত স্থবির এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সমাজ। কিন্তু আধুনিক নাইজেরিয়ার মতো উন্মুক্ত বহু সাংস্কৃতিক এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল একটা সমাজের লেখকের পক্ষে কি নির্ধারণ করা সম্ভব কোন্‌টি তার যথার্থ সমাজ? সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের কৌশল নির্ধারণ তো আরো পরের কথা। আমি যদি এমন একটা সমাজে বসে উপন্যাস লিখি যার অধিকাংশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাগরিকই অশিক্ষিত তাহলে কে আমার সমাজ? আর আমি যদি ইংরেজিতে লিখি যেখানে ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা এবং সীমিত সংখ্যক লোক সে ভাষা জানে তাহলে আমার এ লেখার অর্থ কী?

এগুলো খুবই মারাত্মক প্রসঙ্গ, এটা আশ্চর্যের নয় যে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এসব প্রসঙ্গের গ্রহণযোগ্য উত্তর খুঁজছেন। এটাও আশ্চর্যের নয় যে, কম চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একটা তাৎক্ষণিক এবং যন্ত্রণাহীন উপশমের উপায় খুঁজে নেন। লেখালেখি প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে শুনেছি যে, বই আজকাল না-লেখাই ভালো, তারচেয়ে বরং আজকাল তৈরি হওয়া উচিত নাটক কিংবা সিনেমা। বইয়ের দিন শেষ। বই মৃত, জয় টেলিভিশনের। তবে একটা প্রশ্ন কেউ তুলছে না যে, পাঠক আর লেখকের যদি মৃত্যুই হয় তবে ঐ নাটকগুলোর সংলাপ আর সিনেমার চিত্রনাট্য লিখবে কে? ভাষার ব্যাপারেও এমনি সরল সমাধানের পথ বাতলে দেয়া হয়। বলা হয় ইংরেজি ব্যবহার বন্ধ করে দাও। কিন্তু ইংরেজির বদলে কী ব্যবহার হবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে শুরু হয় গুরুতর বিভেদ। একটা সমাধান হচ্ছে নাইজেরিয়ার ব্যবহৃত ২০০টি ভাষা বাদ দিয়ে বরং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষা ব্যবহার করা হোক। অতীতে যেমন কোনো রাজা তার উত্তরসূরি না-পেয়ে অনেক সময় অন্য এক রাজ্যের কোনো যুবরাজকে ধরে আনত।

আলোচ্য গুরুতর সমস্যার এ ধরনের হালকা সমাধান নিয়ে আমি আর বাক্যব্যয় করতে চাই না। আমার যে সহকর্মীরা এ ব্যাপারে একটা দ্রুত সমাধানে পৌঁছার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন তাদের জন্য আমি একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে চাই। ধরা যাক একজন গুণী গায়ক বিরাট প্রেক্ষাগৃহে গান গাইবার জন্য দাঁড়ালেন এবং শেষ মুহূর্তে জানতে পারলেন যে এই প্রেক্ষাগৃহের চারভাগের তিনভাগ দর্শকই সম্পূর্ণ বধির। তার প্রযোজকরা তখন তাকে প্রস্তাব করলেন তিনি গান না-গেয়ে বরং সবাইকে নাচ দেখান। বধিররা গায়কের গান শুনতে না-পেলেও নাচ তো দেখতে পারে। এই গায়কের কণ্ঠ দেবদূতের মতো কিন্তু পা পাথরের মতো ভারী। তাহলে এখন এই গায়ক কী করবেন? তিনি কি প্রেক্ষাগৃহের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দর্শকের জন্য চমৎকারভাবে গান গেয়ে শোনাবেন নাকি প্রেক্ষাগৃহের সব দর্শককে বিশ্রীভাবে নেচে দেখাবেন? পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কোন্ সিদ্ধান্ত নেব। আমি মনে করি যিনি গায়ক তার উচিত সমগ্র পৃথবীর সামনে বিশ্রীভাবে নাচার চাইতে শুধুমাত্র নিজের জন্য হলেও চমৎকারভাবে গান গাওয়া। আমি স্বীকার করছি এটা খুব চূড়ান্ত একটা উদাহরণ কিন্তু এ পথ আমাকে নিয়ে হচ্ছে সাম্প্রতিককালের বর্বর সরলীকরণের আক্রমণের কাছ থেকে শিল্প এবং শুভবুদ্ধি উভয়কে রক্ষা করার জন্য। সৌভাগ্যবশত আমরা বাস্তব জীবনে এ ধরনের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে পড়ি না। অবশ্য যদি-না আমরা নিজে সচেতনভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি করি। আমার মনে হয় না আমি কখনো এমন নির্মম পরিস্থিতিতে পড়ব যখন আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বই পড়া অথবা সিনেমা দেখা কিংবা ইংরেজি অথবা ইগজু এই দুয়ের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে বলা হবে। আমার কাছে একটা অথবা অন্যটা নয় বরং দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। এতে অবশ্য আমার জীবন খানিকটা জটিল এবং অগোছালো হয়ে ওঠে কিন্তু এ-ই আমার ভালো।

আত্মপরিচয়ের ঘোর সংকট আমাদের ঘিরে থাকলেও আমি দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি শিল্পী এবং সমাজের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্কের উন্মোচন। এ উন্মোচন চোখের পলকের দ্রুততায় ঘটবে না, ঘটবে ধীরে তবে অবশ্যম্ভাবীরূপে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ

▼

আর্নস্ট লিন্ডগ্রেন

"গল্প আর কবিতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, গল্পকে বলা যায় বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনার সুসংবদ্ধ তালিকা, এরা পরস্পর সময়, স্থান, পরিবেশ, কারণ ও প্রভাব দ্বারা সংযুক্ত, কিন্তু কবি মানব-প্রজাতির শাশ্বত কিছু অনুভূতিকে, মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে রূপায়িত করেন কবিতায়। প্রথমটি সাময়িক, কেবল একটা বিশেষ সময়ে ক্রিয়াশীল এবং কিছু ঘটনার এমন একটা সমন্বয় যা এমনিভাবে ঘটবে না আর কখনোই। কিন্তু অন্যটা চিরকালীন এবং মানব-অনুভূতির যত পরিবর্তন, পরিবর্ধনই ঘটুক না কেন তার সাথে কবিতার সম্পর্ক থাকবেই। যে 'সময়' গল্পের সৌন্দর্য এবং বিশেষ ঘটনাবলির প্রভাবকে ম্লান করে দেয়, সে সময়ই কবিতার শাশ্বত সত্যকে আরও উন্মুক্ত এবং পূর্ণ করে তোলে নতুনতর ব্যাখ্যার প্রভাবে।"—পার্সি বিসি শেলী

"চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ" শিরোনামের 'শিল্প' কথাটাকে যদি শুধু কৌশল এবং কায়িক শ্রমের সাথে সম্পর্কিত করি (কারণ মৃৎশিল্প বা পোশাকশিল্পকে তো আমরা শিল্পই বলি) তাহলেও চলচ্চিত্রের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সকলেই জানেন যে, কোনো একটি সাধারণ চলচ্চিত্রনির্মাণেও কী বিস্তর শ্রম ও বহুবিধ কৌশলের প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শুধুমাত্র প্রমোদের জন্য নির্মিত হতে পারে আবার এমন চলচ্চিত্রও নির্মিত হতে পারে যা

~ www.amarboi.com ~

মানুষের আবেগ, বুদ্ধিকে নাড়া দিয়ে তার বাস্তব জীবনকেও প্রভাবিত করবে, কিংবা হতে পারে এ দুটোর সম্মিলন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, চলচ্চিত্রে এমন কোনো বিশিষ্ট ভাষার বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি, যে ভাষা একজন একক ব্যক্তি, একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী, ইয়েটস-এর ভাষায় 'একাকী মানুষ' ব্যবহার করতে পারবেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ মাধ্যমে হিসেবে? সেই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র চলচ্চিত্রে এমনভাবে কি দর্শকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব যা অন্য কোনো মাধ্যমেই সম্ভব নয়? যা দেখে যেমন কবিতার ক্ষেত্রে বলা যায় তেমনভাবে বলা যাবে—যা বলা হয়েছে এবং যেভাবে বলা হয়েছে তাতে কোনো পার্থক্য নেই? আমরা যদি মনে করি তা সম্ভব নয় তবে বৃথাই আমাদের শিল্প হিসেবে 'আর্থ', 'লা লোত্তে', 'রশোমন' এবং 'লুসিয়ানা স্টোরি'র প্রতি অভিনন্দন এবং যারা মনে করেন একটা ভালো নাটক, ভালো সংগীত বা ভালো চিত্রকলার নিরিখেই একটা ভালো চলচ্চিত্র বিচার সম্ভব তবে তাদের সমালোচনাও অর্থহীন।

এমন লোক এখনও আছেন যারা চলচ্চিত্রের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একে শুধু আনন্দের উপকরণ হিসেবেই উপভোগ করেন। চলচ্চিত্রকে পূর্ণ শিল্পের মর্যাদা দিতে এদের কুণ্ঠা। আবার এও খুব আশ্চর্যের নয় যে অনেক চলচ্চিত্রনির্মাতাও নেহাত অবজ্ঞাভরেই দিনের পর দিন একই যান্ত্রিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নির্মাণ করছেন স্বল্পায়ুর জঘন্য সব চলচ্চিত্র। এসব ছবি দেখতে দর্শকরা যে-কোনো সময়ে হলে ঢুকতে পারেন আবার ঘটনার যে-কোনো পর্যায়ে হল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। অথচ এমন একটি অবস্থা কোনো নাটক বা কনসার্ট হলে খুব বেশিদিন সহ্য করা হতো না নিশ্চয়ই। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা নির্মাণে অক্ষম এই পরিচালকগণ এবং তাদের সমর্থকরা মনে করেন, ঘটমান একটি ব্যাপারকে শুধুমাত্র ক্যামেরায় ধারণ করাই হলো ক্যামেরার কৃতিত্ব, চলচ্চিত্র যেন বাক্সবন্দি থিয়েটার। সম্পাদনার কৌশলে ধারণকৃত চিত্রকে যে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করা যায় একথা মেনে নিলেও তারা বলেন সম্পাদনা নিতান্তই একটি যান্ত্রিক কাজ এবং প্রশ্ন তোলেন এই যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় কতগুলো ধারণকৃত চিত্রকে ওলটপালট করার মধ্যে কতটুকুই আর সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে? নিরেট শূন্যতাকে ধীরে ধীরে কল্পনার শিল্পরূপ দিয়ে ভরিয়ে তোলাই তাদের মতে যথার্থ সৃষ্টিশীলতা। তাদের আপত্তি, চলচ্চিত্রে সেই সুযোগ কোথায় যেমন সেজান পারেন এবং শূন্য ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমে তাকে রঙে, রেখায় ভরে তুলতে, যেমন শেক্সপিয়র বসেন একটি শূন্য শাদা কাগজ নিয়ে, যেমন মাইকেল এঞ্জেলো দাঁড়ান একটি আকারহীন পাথরের সামনে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই। আমরা জানতে চাই "কল্পনার যথার্থ শিল্পরূপ" ব্যাপারটি আসলে কী? তাছাড়া কোনো শিল্পী কি বাস্তবিকই কখনো কেবল শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

১৯২৭ সালে আমেরিকান লেখক জন লিভিংস্টোন লোয়েজ 'দ্য রোড টু যানাড়ু এ স্টাডি ইন দ্য ওয়েজ অব দ্য ইমাজিনেশন' নামে একটি বই লেখেন। লেখক এই বইটিতে কোলরিজের 'দ্য রাইম অব দ্য অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার' ও 'কুবলাই খান' এই বিখ্যাত কবিতাদুটির উপর পরীক্ষা চালিয়ে আবিষ্কার করেছেন, কোন্ উৎস এবং কী উপকরণ কবিকে এই কবিতাদুটো লিখতে প্রবৃত্ত করেছিল। কোলরিজ প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থায় আর দ্বিতীয়টি লিখেছিলেন অচেতন ঘোরে আফিমে বুঁদ হয়ে। লোয়েজ তাঁর বইটিতে শুধুমাত্র কবিতাদুটোর উৎস খোঁজার গোয়েন্দাবৃত্তি ছাড়াও সন্ধান করেছেন কী প্রক্রিয়ায় ঐ উৎসগুলো লেখকের কল্পনায় প্রভাব ফেলেছে।

কোলরিজ ছিলেন মহাপেটুক পাঠক এবং তার সব পাঠ থেকেই তিনি তাঁর কবিতার জন্য প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত; দৃশ্য বা শব্দকে সংগ্রহ করতেন। কোনো লেখা পড়ে মনকে নাড়া দেওয়ার মতো কিছু পেলেই তিনি তা টুকে রাখতেন এবং এক বইয়ে অন্য একটা বইয়ের উল্লেখ পেলেও তা যোগাড় করে পড়তেন। সৌভাগ্যবশত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কোলরিজের টুকে রাখা লেখার এইরকম একটা নোটবই সংরক্ষিত আছে। নব্বই পাতার একটা পাণ্ডুলিপি কিছুটা কলমে, কিছুটা পেন্সিলে এবং সবক্ষেত্রেই খুব বিক্ষিপ্তভাবে লেখা। এই নোটবইয়ের সূত্রধরে লিভিংস্টোন লোয়েজ আবিষ্কার করেছেন ১৭৯৫ থেকে ১৭৯৮ সালের মধ্যে কোলরিজ অবশ্যই কোন্ কোন্ বই পড়েছেন এবং নিজেও সেসব বই পড়ে নিয়েছেন। এই তিন বছরই কোলরিজের সৃষ্টিশীলতার সুবর্ণ সময় এবং এসময়েই কবি হিসেবে তাঁর সুনাম। লোয়েজের এই গবেষণার ফলাফল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

খুব সংক্ষেপ করেও লিভিংস্টোনের ৪৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ আলোচনা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ছোট একটি উদাহরণ দেয়া যায়। কোলরিজ তাঁর 'এনশিয়েন্ট মেরিনার' কবিতায় রং, রেখায় সমৃদ্ধ একটি চিত্রের মতোই বর্ণনা করেছেন তার সেই জাহাজটির কথা যেটি গ্রীষ্ম অঞ্চলের মধ্যসাগরে বায়ুহীনতায় গতিহীন হয়ে পড়েছে, তৃষ্ণায় তার সকল সহযাত্রীই মৃত, বেঁচে আছেন শুধু তিনি একা—

গতিময় চাঁদ উঠে আসে উঁচু আকাশের গায়ে
কোথাও থেমে না থেকে ধীরে ধীরে অনেক উঁচুতে
উঠে যায় সে একটি কি দুটি তারাকে সঙ্গী করে।
তার কোমল কিরণে ফুটে ওঠা এপ্রিলের শুভ্র
হিমের আমেজ সমুদ্রের গুমোটকে লজ্জা দেয়
কিন্তু যেখানে পড়েছে জাহাজের সুবিশাল ছায়া
সে জলের লাবণ্যকে মনে হয় দগ্ধ, রং জ্বল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসাড় ও বীভৎস লাল।
জাহাজের ছায়ার ওপারে
আমি জলসাপদের দেখি
তারা দল বেঁধে ঘুরে ফেরে শাদা উজ্জ্বল রেখায়
এবং যখন ফণা তোলে তারা, আলেয়ার আলো
তাদের আঁশটে শরীরে পিছলে পড়ে।
আর জাহাজের ছায়ার ভিতরে আমি
তাদের রঙিন, বহুমূল্য সজ্জার সম্ভার দেখি
নীল, মসৃণ সবুজ কিংবা ভেলভেট কালো রং
তারা কুণ্ডলী পাকিয়ে সাঁতরে বেড়ায় অবিরল
তাদের প্রতিটি গতিরেখা যেন একেকটি
উজ্জ্বল সোনালি আগুনের ঝলকানি।

সহজ, সরল, চমৎকার এই পঙ্‌ক্তিগুলো। সৃষ্টিশীল কল্পনার নমুনা এখানে যথার্থই রয়েছে। কিন্তু কোলরিজ কি নিতান্তই তার শূন্য মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি করেছেন এ পঙ্‌ক্তিগুলো? এবার নিচের এই পরিচ্ছেদগুলো পড়া যাক। এই অংশগুলো কোলরিজের ব্যক্তিগত সেই নোটবই থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলো তিনি তার নোটবইয়ে টুকেছিলেন এই কবিতাটি রচনারই কিছুকাল আগে—

ক. কেবল চলন্ত জাহাজই নয়, মাছেরাও সাঁতরে যাবার সময় তাদের পেছনে একটি আলোকিত রেখা সৃষ্টি করে...। আমি কখনো কখনো অনেক মাছকে দেখেছি তারা পানির উপর খেলা করছে এবং তাতে পানির উপর যেন একটা কৃত্রিম আলোকচ্ছটা সৃষ্টি হচ্ছে। (ফাদার বোর্জেসের ধাবমান জাহাজের পশ্চাৎবর্তী আলোকিত দৃশ্য বিষয়ে লেখা একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, যাজকদের নিবন্ধ সংকলন থেকে তা রয়েল সোসাইটির দার্শনিক কার্যক্রমে উল্লেখিত; ভলিয়ুম ৫, পৃ. ২১৩)

খ. নিশ্চল সমুদ্রে, দুই তারিখের সকালে সাগরের একটি অংশে মনে হলো যেন পিচ্ছিল একরকম কাদায় লেপ্টে আছে, পাশে কতগুলো সামুদ্রিক প্রাণী সাঁতার কাটছিল। যে প্রাণীগুলোকে দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট, সেগুলো ছিল প্রায় গোলাকৃতি এবং সেগুলো আলোয় ঝিলমিল করছিল। এছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোট কিছু প্রাণীও দেখা যাচ্ছিল যেগুলোর রং ছিল শাদা এবং উজ্জ্বল...কখনো তাদের রং মনে হচ্ছিল যেনবা নীলাভ, যে রং আবার ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল রক্তিমাভায়...এবং মাঝে মাঝে এত উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল যে তা আশেপাশের পানি এমনকি জাহাজকেও আলোকিত করে তুলছিল... কিন্তু মোমের আলোতে সেই রংই আবার হয়ে উঠল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবুজ আর অন্ধকারে সেগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন একটা নিভন্ত আগুনের কুণ্ড। এই উজ্জ্বল প্রাণীগুলোকেই সম্ভবত প্রায়ই রাতের বেলা সমুদ্রে জাহাজের আশেপাশে দেখা যায়। (ক্যাপ্টেন জেমসবুক, 'প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭)

গ. কী অদ্ভুত সুন্দর এই মাছগুলো। ঝাঁক বেঁধে ধীরে ধীরে সাঁতরাচ্ছে এদিক ওদিক। মাছের শরীরের অধিকাংশই সোনালি রং এবং আঁশগুলো মাঝে মাঝে লাল, হলুদাভ, রুপালি, নীল বা সবুজ। ফুলকার চারপাশে রুপালি এবং ভেলভেট কালো। (বার্ট্রাম, তাঁর ভ্রমণলিপিতে 'হলুদ কিরণ বা সূর্য মাছের' বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, পৃ. ১৫৩-১৫৪)

ঘ. সমুদ্রে আমরা অসংখ্য জলসাপ দেখলাম, বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন আকারের। আজ আমরা দুটো সাপকে দেখলাম পানির উপর ফণা তুলে দ্রুত সাঁতরে যাচ্ছে। (ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ড্যামপিয়েরে তাঁর 'বিশ্বব্যাপী নতুন সমুদ্র অভিযান' গ্রন্থে)

ঙ. সমুদ্রযাত্রা করবার পরপরই আমরা অসংখ্য ডলফিন আর বিচিত্র রঙের জলসাপ দেখলাম। তেমনি দেখলাম অসংখ্য মাছ ('আমেরিকান জলদস্যুদের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড)

চ. ডলফিনগুলো খেলছিল শরীরের একটি অংশ বাঁকিয়ে ঢেউয়ের নিচে ঢেকে আর বাকি অংশ জলের উপর শূন্যে তুলে। গরমের দিনে, সমুদ্রে যখন একটুও হাওয়া বয় না তখনই জলসাপগুলো দেখা দেয়। বিচিত্র ভঙ্গিতে বাঁকানো বা চোরানো অবস্থায় থাকে এরা। এদের মধ্যে কিছু পানির উপরে উঠে আসে, কিছু পানির নিচেই থাকে। (লিমিউসের লেখা 'ডো লাপোনিবাস ফিনমারচিয়ে', কোপেনহেগেন ১৭৬৭, পৃ. ৩০৭-৩৩২)

ছ. কিন্তু এখন বিশাল জাহাজের পশ্চাৎ সমুদ্রে
একঝাঁক ক্রীড়ামগ্ন ডলফিন টের পায় তারা
তাদের উজ্জ্বল আঁশ থেকে বিকিরিত হয় আলো
যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সমুদ্রই ঝলমল করে।
জোয়ারের জলে তারা কুণ্ডলী পাকিয়ে খেলা করে
কখনো লাফিয়ে ওঠে ঊর্ধ্বে, কখনো ঝাঁপায় নিচে
ঢেউয়ের তলায় জেগে থাকে তাদের ক্ষণিক
ডুবসাঁতারের রেখা, আর জলের উপরিতলে
জ্বলজ্বল করে রুপালি আলোকচ্ছটা।
আফ্রিকার প্রজ্বলন্ত তীর থেকে উত্তরের দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবার তাদের সঙ্গ নেয় কিছু শুশুকের ঝাঁক
সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারা খেলা করে কতভাবে
কখনো লাফিয়ে ওঠে উর্ধ্বে, কখনো ঝাঁপায় নিচে।
শুভ্র ফেনিল রেখায় গাঁথা থাকে তাদের উল্লাস
সমুদ্রের বুকে জ্বলা উজ্জ্বল আলোকমালা হয়ে।
(ফ্যালকোনারের কবিতা 'জাহাজডুবি')

উল্লেখিত উদ্ধৃতিগুলোর সাথে কোলরিজের কবিতাটির একটি স্পষ্ট সম্পর্ক অনুধাবন করা খুব কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। ব্যাপার যা ঘটেছে তা পরিষ্কার। পড়তে পড়তে কোলরিজের যেসব বিষয় মনকে নাড়া দিয়েছে, তিনি তা লিখে রেখেছেন তার অসাধারণ তীক্ষ্ণ স্মৃতিতে। তারপর সেসব ধীরে ধীরে ডুবে গেছে তার অবচেতন মনে এবং অবশেষে সে তথ্যগুলোই যখন আবার সচেতন মনে ভেসে উঠেছে সেগুলো তখন একেবারেই নতুন। লিভিংস্টোন লয়েজ ঐ টুকে-রাখা তথ্য বা দৃশ্যগুলোকেই বলেছেন কোলরিজের কবিতার কাঁচামাল যার সবকিছুই এই কবিতায় আছে আবার কিছুই নেই। যে মাছ ফাদার বোর্জেসর উষ্ণ অঞ্চলে দেখেছেন, বার্ট্রাম দেখেছেন ফ্লোরিডার একটি ছোট্ট হ্রদে এবং জ্বলজ্বলে নীল আর সবুজাভ যে প্রোটোজোয়া ক্যাপ্টেন কুক দেখেছেন প্রশান্ত মহাসাগরে কিংবা ড্যাম্পায়ারের দক্ষিণ সমুদ্রের সেই জলসাপ এবং ফ্যালকোনারের উন্মুক্ত শুশুক আর ডলফিন, এ সবকিছুরই বা তার খণ্ডচিত্রের পুনরুত্থান, পুনর্জন্ম ঘটেছে কবিতায়। কবির কল্পনার ছোঁয়ায় ওগুলোই হয়ে উঠেছে জোছনাময় সাগরের এক অলৌকিক জীব। তবে সেই কল্পনার জন্যও কবির প্রয়োজন পড়েছে কাঁচামালের এবং একটি তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির যা ঐ কাঁচামাল বহন করবে।

লিভিংস্টোন লোয়েজ 'কুবলা খান' কবিতাটিও একই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এ কবিতাটি কোলরিজ আফিমে বুঁদ হয়ে স্বপ্নে দেখেছেন এবং জেগে উঠে স্মরণযোগ্য অংশগুলো শুধু লিখেছেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আরও চমকপ্রদ। লোয়েজ এখানে তাঁর নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন প্রায় ত্রিশ বছর আগে পড়া 'দ্য অটোক্র্যাট অব ব্রেকফাস্ট টেবল' বইটির একটি অদ্ভুত বাক্য তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি তখন সে বইটি যোগাড় করে তাঁর স্মৃতির ঐ বাক্যটি খুঁজতে লাগলেন। তিনি বইয়ের একটা জায়গায় ঐ বাক্যের মাত্র অংশবিশেষ খুঁজে পেলেন কিন্তু পাতা উল্টাতেই তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর বাক্যের হারানো অংশ। দুটো ভিন্ন পৃষ্ঠার ভিন্ন বাক্যাংশ তাঁর অবচেতন মনে গিয়ে মিলিত হয়ে তার স্মৃতিতে একটা অভিন্ন বাক্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাঁর মনে এটা সকল মানুষেরই একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং কবিদের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা আরও প্রবল। কোলরিজের স্মৃতিতে এ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তিনি যা পাঠ করেছেন তা থেকে নির্বাচিত অংশগুলো একটা একটা টুপটাপ করে পড়েছে তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মৃতির কুয়োয়। সেই অন্ধকার অতলে সচেতন মনের অনেক নিচে চলেছে ঐসব তত্ত্ব ও তথ্যের পারস্পরিক বিক্রিয়া। গভীর কুয়োয় ঐ সহাবস্থানের পর অবশেষে আবার তারা ভেসে উঠেছে সচেতন, সজ্ঞান মনের উপরিতলে, নতুনভাবে। আমাকে ব্যাপারটা রূপকের সাহায্যে বোঝাতে হচ্ছে কারণ এ ছাড়া তা বোঝানোর আর কোনো উপায় নেই, কিন্তু এর সত্যতা সম্পর্কে আমার কোনো দ্বিধা নেই। যেসব তথ্য, ভাবনা অবিরত সচেতন মনে প্রবেশ করছে তাই ডুবে গিয়ে অবচেতন মনের তলে রাসায়নিক পদার্থের মতোই বিক্রিয়া করে, যেমন করেছিল আমার 'দ্য অটোক্র্যাটে'র বেলায়। তেমনি কোলরিজের মনের গভীরে, অন্ধকারে ঐ সময়গুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছে অদ্ভুত সব মাছ আর সমুদ্রপ্রাণীর ছায়া, ছলকে উঠেছে গহিন সমুদ্রের সেসব সর্পিল আকৃতি। এসব দৃশ্য তাঁর মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করেছে। ফাদার বোর্জেসের মাছ জলের উপর এক কৃত্রিম আগুন তৈরি করেছে, ক্যাপ্টেন কুকের প্রটোজোয়াকে মনে হয়েছে যেন জলে ভাসমান উজ্জ্বল আগুন। আগুন, মাছ, জলসাপ সব মিলিয়ে একটি মণ্ড থেকে রচিত হয়েছে এই পঙ্‌ক্তিগুলো, যাতে পৃথকভাবে এদের প্রত্যেকেরই রূপ চিত্রিত হয়েছে।

লোয়েজ বলছেন এভাবেই সকল সৃষ্টিশীল মানুষেরা কাজ করে থাকেন। কোলরিজের বেলায় এ প্রক্রিয়া আবিষ্কারে সাহায্য করছে তাঁর ফেলে যাওয়া নোটবই। অন্যান্য শিল্পীদের বেলাতে তা বেশ কষ্টকর এবং হয়তো অসম্ভবও কিন্তু এ সত্যটি অনস্বীকার্য যে, সকল শিল্পীর কল্পনা নির্মাণের জন্যই প্রয়োজন কাঁচামাল। 'ক্র্যাফট অব ফিকশন' গ্রন্থে পার্সি লুবোক টলস্টয়ের সৃষ্টিশীল মন বিষয়ে লিখতে গিয়ে এক অংশে বলেছেন– "টলস্টয় খুঁজছেন মুক্ত, বন্ধনহীন একটা জীবন। জীবনের যে-কোনো ঘটমান দৃশ্যে তিনি স্থাপন করেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত হাত, ডান থেকে বাঁ থেকে ছিঁড়ে খুবলে তুলে আনেন এর বৈশিষ্ট্যময় অংশগুলো। তারপর এই উৎসগুলোর সাথে যুক্ত করেন তাঁর কল্পনা। এদের বিশেষত্ব আবিষ্কার করেন, অপ্রয়োজনীয় অংশকে ছুড়ে ফেলে দেন, অবশেষে তাদের এমন একটি মুক্ত জগতে সাজিয়ে দেন যেখানে এরা আগে কখনোই ছিল না, যেখানে এদের বিকাশ বাধাহীন। পুরনো জগতের উপাদানেই তৈরি হয় নতুন জগৎ, টলস্টয়ের শিল্পনৈপুণ্যে এ জগৎ পুরনোটির চেয়েও যেন অধিকতর কিছু। চোখের সামনে চলমান, অনন্ত এ দৃশ্যপট, যে দৃশ্য কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির না হয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চোখের উপর প্রতিভাত হয়, সেই দৃশ্যপট থেকেই তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনায় অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলো কেটে ফেলে রচনা করেন বিশিষ্ট দৃশ্য।"

টলস্টয়কে রেখে এবার আমরা ভিন্ন আর একটি মাধ্যমকে লক্ষ করি। ভাস্কর হেনরি মুরও করেছেন– "আমার ভাস্কর্যে আমি কোনো বিশেষ বস্তুর আকার নির্মাণের চেষ্টা করি না বরং আমি প্রকৃতির বিবিধ আকার সম্পর্কে আমার স্বতঃস্ফূর্ত ধারণাগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করি।" তিনি আরও বলেন– "প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা শিল্পীর একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরিহার্য কাজ, এতে আকৃতি সম্পর্কে তার ধারণা বৃদ্ধি পায়, যে-কোনো প্রথাবদ্ধতা থেকে তাকে মুক্ত রাখে, তার অনুপ্রেরণা বাড়ে।"

শিল্পী তাঁর কল্পনাকে পুষ্টি দেন জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে (ভাস্কর জড়বস্তুকে, চিত্রকর আকার ও রংকে এভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী বিভিন্নভাবে)। এই পর্যবেক্ষণেই পাওয়া উপাদান ধীরে ডুবে যায় অবচেতন মনে, সেখানে তারা মুক্ত সংযোগ, সহাবস্থানে ঐ খণ্ড উপাদানগুলো থেকে নির্মাণ করে এক অখণ্ড অংশ। যে প্রক্রিয়া কোনো সচেতন মনে ঘটা সম্ভব নয়। উপাদান গ্রহণ করার পরই শিল্পী তার চোখের নিচে ঘটমান ঐসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো অনুভব করেন, এরপর সেই শিল্পী কঠোর পরিশ্রম করেন তার মনের নেপথ্যের ঐ প্রচ্ছন্ন অখণ্ড উপাদানকে কোনো একটি শিল্পমাধ্যমে প্রকাশিত করতে, যা তখন আরও অনেকের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। এভাবেই সম্ভবত কিছুটা সহজ করে মনোজগতের একটি জটিল, আপাত অজ্ঞাত অথচ সত্য ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা যায়। শেলি বলেন, "কবির ভাষা মূলত রূপক অর্থাৎ তিনি বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দেশ করেন এবং তাদের ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে চিরকালীনত্ব দান করেন।"

সংক্ষেপে বললে, একজন চলচ্চিত্রকারও সম্পাদনার সাহায্যে ঠিক এ কাজটিই করেন তার নিজস্ব মাধ্যমে। পুদভকিন বলেন—"কবির কাছে তার কবিতার একক যেমন শব্দ; চলচ্চিত্রকারের কাছেও তেমনি একক প্রতিটি শট। সম্পাদনাই হলো চলচ্চিত্রের মূল সৃষ্টিশীল শক্তি, যে কৌশলে বিচ্ছিন্ন নিস্প্রাণ শটগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সম্পাদনা চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতার চালিকাশক্তি আর প্রকৃতি হলো সেই সৃজনশীলতার কাঁচামাল সরবরাহকারী। এই হচ্ছে বাস্তবতার সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক।" এর দশ বছর পর আইজেনস্টাইন লিখছেন, "একথা অবশ্যই সত্য যে দুটো দৃশ্যের পাশাপাশি অবস্থান শুধুমাত্র দৃশ্যদুটোর যোগফল নয় বরং এটা একটা সৃষ্টি। পারস্পরিক এই অবস্থান এবং পৃথকভাবে দেখা দৃশ্যদুটোর গুণগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয়।" অনেকেই বলেন সম্পাদনার এই দৃশ্য-সংযোজন নিতান্তই বাহ্যিক একটি ব্যাপার। অবচেতন মনের অন্ধকারে দৃশ্য-তথ্যের যে জটিল সংমিশ্রণ ঘটে তার সাথে টেবিলে বসে ফিল্ম জোড়া দেয়ার মতো শারীরিক কাজের কী সম্পর্ক? কিন্তু একইভাবে একজন চিত্রকর যখন ব্রাশ দিয়ে ক্যানভাসে রং লাগান কিংবা একজন কবি শাদা কাগজে কলমে বাক্য লিপিবদ্ধ করেন তখন তারা কি একটি সচেতন শারীরিক কর্মই করেন না? আসলে প্রতিটি সৃষ্টিতেই একটি অবচেতন মানসিক কর্ম থাকে, আরেকটি থাকে সেই মানসিক ক্রিয়াকে দৃশ্যমান করে তুলবার জন্য সচেতন শারীরিক প্রয়াস। আমাদের তাই লক্ষ করতে হবে সচেতন প্রয়াসের আগে স্রষ্টার ঐ মানসিক তৎপরতাকে। এভাবেই টেবিলে বসার আগে, এমনকি কোনো দৃশ্যগ্রহণেরও আগে সম্পাদনার কাজটি চিত্রনাট্যকারের মনেই রচিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে থাকে, ঐ মনই সম্পাদনার টেবিলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। চিত্রনাট্যকার তার ভাবনা শুরু করার আগে, কল্পনায় দৃশ্য একটি পর্দা দেখতে পান এবং তাকে ধীরে ধীরে পূর্ণ করেন, ঠিক যেন সেজান দাঁড়ান তার শূন্য ক্যানভাসের সামনে। যে-কোনো শিল্পীর মতোই তিনিও তার সামনে চলমান বিস্তৃত দৃশ্য, ঘটনা থেকে তার শটের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেন। সাধারণভাবে চলচ্চিত্রকারের এই মানসিক প্রক্রিয়াটি অস্পষ্ট থেকে যায় এজন্য যে অনেক জটিল এবং বিশাল যান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যদিয়ে এই সৃজনশীল প্রক্রিয়াটি পর্দায় দর্শকের কাছে এসে পৌঁছায়।

তবে একথাগুলোতে অভূতপূর্ব কোনো ব্যাপার নেই। একজন শিল্পীর মানসিক কর্মকাণ্ডের সাথে আমাদের সাধারণের মানসিক কর্মকাণ্ডের তেমন কোনো পার্থক্য নেই, তফাৎ কেবল মাত্রায়। আমরা সাধারণত স্বতন্ত্রভাবে বস্তুজগতে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি না বরং বস্তুজগতের মধ্যে নিজেকে এবং সেই জগতের সাথে নিজের পারস্পরিক অবস্থানকে উপলব্ধি করি। পার্সি লুবোকের যে বইটির কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে কোনো উপন্যাস পড়তে গিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব দৃশ্যগুলো তৈরি করি, কোনো অংশকে হয়তো খুব গুরুত্ব দিই, কোনো অংশ হয়তো মনেই রাখি না। তিনি আরও বলেন—"এ ধরনের সৃষ্টি আমরা প্রতিদিনই চর্চা করছি। আমরা পরিপার্শ্বের প্রতিদিনের জীবন থেকে দৃশ্য, ঘটনা, তথ্যকে আমাদের চিন্তার জগতে সন্নিবেশিত করছি এবং একটা ব্যক্তিগত অদৃশ্য জগৎ গড়ে তুলেছি। যদিও তা অসম্পূর্ণ, এলোমেলো, তবু সব মানুষই তার অভিজ্ঞতার সাথে একজন শিল্পীর মতোই আচরণ করে থাকে। মেধা অনুসারে সকলেই একটি ঘটনা, দৃশ্য, তথ্য বা ব্যক্তিকে তার চিন্তায় একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে আনতে চেষ্টা করে—যাতে তা স্পষ্ট রূপ পায়। এ প্রক্রিয়া প্রত্যেকের মনে প্রতি মুহূর্তে চলছে।"

পার্থক্য হলো এ জটিল বিষয়াদি মস্তিষ্কে ধারণ করার পর কে কত সুসংহতভাবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করে সাজিয়ে তুলতে পারছে। যেমন, সভ্যতার সংস্পর্শহীন কোনো মানুষ কেবল খুব সহজ সম্পর্কগুলো আবিষ্কার করতে পারে। ফরাসি পর্যটক গনট্রান ডো পোনশিনস অ্যাস্কিমোদের সাথে বসবাসের পর তার অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে নিচের কাহিনীটি বলেছিলেন—"একদিন একজন অ্যাস্কিমো আমাদের তাঁবুতে এল। তার মুখ বিকৃত যন্ত্রণাকাতর। গিবসন এবং আমি ওর সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম তখন সে কথা বলল। সে কোনো কথাই বলছে না দেখে গিবসন তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কী? ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অ্যাস্কিমোটি হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং তার বুকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ঘামানো' অর্থাৎ এখানে। আমরা ভাবলাম সম্ভবত এখানে তার ব্যথা করছে। তারপর সে দাঁড়িয়েই রইল, সে একবার তার হাত উপরে উঠাল কিন্তু হাতটি আবার পড়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা বুঝলাম সে আরো কিছু বলতে চাইছে। অবশেষে একসময় সে হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল। অবিরল, অনর্গল তার মুখ থেকে কথা বের হতে লাগল যেন সে তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছে এবং সে যেন তার অবচেতন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু এই আদিম মানুষগুলো তা পারে না। সে কখনোই একটানা কথা বলতে পারে না, সে মাঝপথে শুরু করে এবং প্রথমেই সে তার মনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলে নেয়, তারপর আবার শুরু করে প্রথম থেকে। আমার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে এক মিশনারি আমাকে বলেছিলেন—'অ্যাস্কিমোরা প্রথমে ভাবে, তারপর কিছুক্ষণ ভাবা বন্ধ রাখে, তারপর আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু সে কখানেই প্রথম থেকে শেষ অবধি ধারাবাহিকভাবে কিছু ভাবতে পারে না।' একটি শব্দ হয়তো প্রথমে মনে পড়েছে আমাদের এই অ্যাস্কিমোটির তারপর আর কিছু মনে পড়ছে না। হঠাৎ হয়তো অনেক দৃশ্যপট ওর মনের মধ্যদিয়ে ভেসে গেছে, কিন্তু সেখানে অসংখ্য আর জটিল বলে সে সেগুলোকে আর সাজিয়ে বলতে পারেনি। অসংলগ্ন বিভিন্ন শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে যেন সে ভয় পাচ্ছে, যদি সে তার মনে উদ্ভাসিত কথাগুলো সাথে সাথে উচ্চারণ না করে তবে সেগুলো কোনো অতলে হারিয়ে যাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর আবার নেমে আসছে নীরবতা।"

আপাত বিশৃঙ্খল বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ এবং সুসজ্জিত করার মধ্যদিয়েই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। বস্তুবিশ্বের উপর সচেতন মনের অনুশীলন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণই বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তি। কিন্তু অন্যদিকে শিল্পীর ভূমিকা কেবল সচেতন অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় নয় বরং তিনি ধারণ করেন প্রতিটি অভিজ্ঞতায় একজন পূর্ণ মানব হিসেবে তার সচেতন, অবচেতন প্রক্রিয়াকে।

প্রশ্ন হতে পারে এসব কথার সাথে চলচ্চিত্রের কী সম্পর্ক? এই প্রতিটি কথাই চলচ্চিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যদি আমরা চলচ্চিত্রের শিল্পগুণ কথাটাকে নেহাত একটা বুলি মনে না করি। আমরা দেখলাম জীবনের চলমান দৃশ্য, ঘটনার প্রতি সচেতন ও অবচেতন প্রতিক্রিয়া এবং এদের নির্বাচিত অংশের সুসজ্জবদ্ধ সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় চলচ্চিত্র। ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে এই একই ব্যাপার ঘটে অন্যান্য শিল্পের বেলাতেও। সুতরাং দৃশ্যের যান্ত্রিক আয়োজনে চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয় বলে তা শিল্প নয়, এটা নিতান্তই একটি মিথ্যা অভিযোগ। এখন শুধু প্রশ্ন থাকে কতটুকু জটিল আর বিবিধ প্রেক্ষাপটে জীবনকে চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু অন্য কোনো মাধ্যমও কি একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর সকল অনুপুঙ্খ বোধকে সার্বিকভাবে ধারণ করতে পারে? একটি শিশুকে কতগুলো রঙিন জিনিস একটি কাপড়ের উপর সাজাতে দিলে সে এমনভাবে তা সাজাবে যা তার ভালো লাগবে, কিন্তু তার এই ভালো লাগা হবে নিতান্ত সরল এবং সীমাবদ্ধ। ঠিক তেমনিভাবে একজন সংগীতকারও খুব সরল সহজ কিছু ধ্বনি নিয়েই কাজ করেন। এই সরল স্বরগুলোকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার উন্নত মেধায় তাল, লয়, ছন্দ, যতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে সংগীতকার যখন সুর সৃষ্টি করেন তখন তা আমাদের কাছে একটা জটিল আয়োজন বলে মনে হয় এবং তার একটা বিশেষত্ব থাকে। চলচ্চিত্রের বেলাতেও ব্যাপারটি সংগীত থেকে ভিন্ন কিছু নয়। চলচ্চিত্রের প্রতিটি শটেও তেমনি দৃশ্য, শব্দ, আলোর হ্রাস, বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যময় আয়োজন থাকে। যদিও বিচ্ছিন্ন এককভাবে ঐ শটটিও নিতান্ত সরল, সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখনই একটি শটকে আর একটি শটের পাশে ধারাবাহিকভাবে স্থাপন করা হয় তখনই তা জটিল এবং বিশেষত্বমণ্ডিত হয়ে ওঠে। নির্বাক যুগের সোভিয়েত-চলচ্চিত্রকারগণ শটের এই পারস্পরিক অবস্থানের অভাবনীয় সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে শব্দ-সংযোজনের পর দৃশ্যের এই জটিল আয়োজনের সম্ভাবনার দিগন্ত আরও বিস্তৃত হয়েছে। চোখ যা ধারণ করে, কান যা শোনে, বাস্তব বা কল্পনা, এমন কিছুই নেই যা চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা যাবে না। মেরু থেকে বিষুবরেখা, গভীর গহ্বর থেকে সূক্ষ্ম ছিদ্র, নিমেষে ধাবমান বুলেট থেকে একটি ফুলের ধীর পরিস্ফুটিত হওয়া, আবেগে কম্পমান মুখ আবার আবেগহীন নিস্পন্দন মুখ সবকিছুই চলচ্চিত্রে ধারণ করা সম্ভব। এমন কোনো স্থান, উচ্চতা বা গতি নেই যা চলচ্চিত্রের আওতাভূত নয়। এমনকি চলচ্চিত্রের কাঁচামালকেও ব্যবহার করা যায় মুক্তভাবে। তা বস্তুগত, বাস্তববাদী ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হতে পারে আবার একান্তই আত্মগতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে কিংবা থাকতে পারে এর মাঝামাঝি কোথাও। এমনকি জা ভিগো বহুপূর্বেই দেখিয়েছেন মানুষের যুক্তিবোধহীন স্বপ্নকেও কীভাবে চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া রঙিন ফিল্ম, টেলিভিশন বা ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র আবিষ্কারে এই মাধ্যমটির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এসকল উপকরণ চলচ্চিত্রে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে? এই উপকরণগুলোর সাহায্যে চলচ্চিত্র খুব মজাদার, উত্তেজনাপূর্ণ একটা গল্প বলতে পারে। কিন্তু 'নিছক একটি গল্পে আগ্রহ হলো সবচেয়ে সরল এবং নিম্ন পর্যায়ের আগ্রহ' বলেছেন ই. এম. ফরস্টার। গল্পের মূল আকর্ষণই হলো এরপর কী হচ্ছে, সেটা জানার উত্তেজনা। জেনে গেলেই আগ্রহের মৃত্যু ঘটে। অধিকাংশ সাধারণ ছবির প্রধান উদ্দেশ্যই হলো এই গল্প বলা আর সেজন্যই এসব ছবিকেও আর দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছা পোষণ করে না। কিন্তু কেবল ঘটনার পরম্পরার সাথে যখন কাহিনির কারণ, যুক্তি, প্রভাবকেও যুক্ত করা হয় তখন স্বভাবতই কাহিনি জটিল হয়ে উঠে। তখন 'কী' প্রশ্নটি পর্যবসিত হয় 'কেন' প্রশ্নে। কেন ঘটনাটি এভাবে ঘটছে? কেন ঘটনার পাত্র পাত্রী এভাবে আচরণ করছে? তখন অভিনেতাকে শুধু পুতুলের মতো অভিনয় নয়, হতে হয় অনেক বেশি জীবন্ত। শিল্পে মানবজীবনের জটিলতাকে সবচেয়ে সার্থক এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে ধারণ করেছেন শেক্সপিয়ার তার মহান ট্র্যাজিডিগুলোতে। শেক্সপিয়ারকে সর্বোচ্চ মান ধরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যদি শেষ প্রশ্ন করা হয়, চলচ্চিত্রের ভাষাতে কি ঐ শেক্সপিয়ারীয় স্তরে পৌঁছানো সম্ভব? আমি নির্দ্বিধায় বলব নিশ্চয় তা সম্ভব। আমরা আগেই দেখেছি নির্বাক ছবির কাব্যিক সম্ভাবনা। ১৯৩৩ সালে ডেজারটার শেষ করার পর পুদভকিন লিখেছেন—"আমি নিশ্চিত যে সবাক চলচ্চিত্রই হবে আগামী দিনের শিল্প। এটি দৃশ্য, শব্দ এবং দর্শনের সংশ্লেষণ। আমাদের সুযোগ এসেছে আলো, ছায়া, রেখায় সমস্ত বিশ্বকে এ সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পে প্রকাশিত করার পুরনো সকল শিল্পমাধ্যকে অতিক্রম করে এটিই হবে শ্রেষ্ঠ, কারণ এ মাধ্যমে আজ এবং আগামীকালকে প্রকাশ করা যায়।" এর সাথে আমি যুক্ত করতে চাই আইজেনস্টাইন-এর কথা কয়টি—"চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা অন্তহীন এবং আমার বিশ্বাস আমরা সেই সম্ভাবনার সামান্য স্পর্শ করতে পেরেছি।"

গত কয় দশকে চলচ্চিত্রের প্রায়োগিক কৌশলের তেমন কোনো উত্তরণ ঘটেনি যেমন ঘটেছিল গ্রিফিথ বা আইজেনস্টাইনের হাতে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের পরিচালক ভিগে, বুনুয়েল, ডিসিকা, বার্গম্যান, অ্যান্টোনিওনি সকলেই সেই প্রায়োগিক কৌশলকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন তাদের উন্নত, বৈচিত্র্যময় শৈল্পিক আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে, যে মান তাদের পূর্বসূরিদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাদের হাতে এবং তাদের মতো আরও অনেকের প্রতিভাদীপ্ত হাতে নির্ভর করছে চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যৎ, অতীতের ঔজ্জ্বল্যকেও ছাড়িয়ে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংগীত

সংগীতে সমাজচেতনা

▼

আর্নস্ট ফিশার

শিল্পকলার সকল শাখার মধ্যে সংগীতের বিষয় এবং আঙ্গিকের সম্পর্কটিই সবচাইতে জটিল। সংগীতের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি এবং সেইসব সাংগীতিক প্রকাশভঙ্গির অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্যের সীমারেখাটি বেশ অস্পষ্ট। যার ফলে দেখা যায় সংগীতকে নিয়ে কোনোরকম সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হলে একটি শ্রেণি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে ওঠেন। অবশ্য বুর্জোয়া-বিশ্ব কোনো শিল্পেরই সামাজিক ব্যাখ্যায় তেমন আগ্রহী নয়, তবে সংগীতের ক্ষেত্রে এই অনাগ্রহ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সংগীতকেই তারা সমাজ-নিরপেক্ষ শিল্পের নির্ভরযোগ্য নমুনা হিসেবে মনে করে।

বিটোফেন সম্পর্কে ইগোর স্ট্রাভিনস্কির উক্তিকে এ প্রসঙ্গে একটা আদর্শ উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। তিনি বলেন—"আসলে বাদ্যযন্ত্রগুলোই বিটোফেনের সংগীত-ভাবনা এবং অনুপ্রেরণার উৎস। অথচ দার্শনিক আর সমাজতাত্ত্বিকেরা তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন সেগুলোর সাথে তাঁর রচিত সুরের আদৌ কি সম্পর্ক আছে? 'সিম্ফোনি তিন' রচনার পেছনে শাসক নেপোলিয়ন বা গণতান্ত্রিক নেপোলিয়নের প্রভাব করবার কোনো অর্থ নেই। আসল ব্যাপার হলো স্রেফ তাঁর সুর। বাক্যবাগীশ লেখকেরা অযথা তাঁর সুরের স্বঘোষিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিটোফেন ওদের জন্য নয়, তিনি ওদের জন্যই যারা সংগীত শুনতে চায়। আমার মনে হয় না আমি ভুল করব যদি বলি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিগুলো অসাধারণভাবে ব্যবহার করবার ক্ষমতাই বিটোফেনের প্রতিভার উৎস।"

~ www.amarboi.com ~

'বাক্যবাগীশ লেখকে'র গালমন্দটি মাথায় নিয়েই বলছি একটি জায়গায় স্ট্রাভিনস্কি ঠিকই বলেছেন, যখন তিনি বলেছেন যে, বিটোফেনের সংগীতকে শুধুমাত্র সামজতাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে নয়, সংগীত হিসেবেই বিচার করা উচিত। কিন্তু এখানে এসেই আমাদের প্রশ্ন জাগে, তবে সংগীত ব্যাপারটি কী? জানতে ইচ্ছা হয় সংগীত কি কেবলই কিছু ধ্বনির সমন্বয়, নাকি এর অতিরিক্ত কিছু? তাঁর এই যুক্তিটি বেশ মজার যে, ফরাসি বিপ্লবের কোনো প্রভাব নয় বরং কেবল বাদ্যযন্ত্র-ব্যবহারের কৃতিত্বই বিটোফেনকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। তবে কি আমরা বলব আশেপাশে বিপ্লব, বিদ্রোহ ঘটে গেলেও সংগীতজ্ঞগণ চোখ কান বুজে শুধুমাত্র পিয়ানো সম্পর্কেই জ্ঞান আহরণ করেন? বস্তুত দুটো জ্ঞানই এখানে পরস্পরের সম্পূরক। যদি বলি, শুধুমাত্র জ্যাকোবিনদের প্রতি সহানুভূতিই বিটোফেনের সংগীতসৃষ্টির মূল কারণ, তবে বোকার মতো কথা বলা হবে, তাঁর সময় এবং পরিপার্শ্বের ঘটনা সম্পর্কে কোনো ধারণা নয়, কেবল বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানই বিটোফেনের সৃষ্টির উৎস।

সংগীত বিচিত্রভঙ্গিতে সাজানো বিবিধ ধ্বনির সম্মিলন এবং তা বিমূর্ত, কথাটি মিথ্যে নয়। কিন্তু সংগীত শুধু এই ধ্বনিতেই সীমাবদ্ধ নয়, ধ্বনির সুষম সমন্বয়ে তা একটি অর্থ ধারণ করে। সংগীত নন-অবজেকটিভ বলে এর কোনো বিষয় নেই কথাটি সত্য নয়। হেগেল তাঁর 'ফিলসফি অব আর্ট'-এ বলেন—"সংগীতের বিষয় এবং এর গঠনের সহধর্মিতা দেখে যদি মনে করা হয় যে তা বহিজর্গতের বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন তবে সেটি হবে কোনো ফরমাল ধারণা। সংগীতের অবশ্যই বিষয় আছে, তবে সে বিষয় কবিতা বা চিত্রকলার মতো নির্দিষ্ট আকার প্রকারের বিষয় নয়। সংগীতের একটি ভাব বা ধারণাগত অবজেকটিভিটি আছে।" তিনি আরো বলেন—"সংগীতের বিচিত্র মাধুর্যময় ধ্বনি সমন্বয়ের মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিষয়কে বাক্য বা ভাবনা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যাক বা না যাক, সংগীতের কারণে একটি আত্মিক বা অনুভূতিজাত প্রভাব সৃষ্টি হয় বলেই তা যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে।"

আমরা দেখছি যুগ থেকে যুগান্তরে বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যদিয়ে সংগীত নতুন রূপ লাভ করছে, এই পরিবর্তনের ধারাকে কখনোই শুধুমাত্র নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার এবং তার ব্যবহারে দক্ষ সংগীতজ্ঞদের দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ইতিহাসের সার্বিক পরিবর্তনের শর্তগুলোর নিরিখেই এ পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে। (এমনকি বহু বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার বা প্রত্যাহারও সামাজিক অবস্থা ও মতাদর্শ দ্বরা নিয়ন্ত্রিত। একটি উদাহরণ, এথেন্সীয় বীণা অনেক উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও স্পার্টার প্রত্যাখ্যান।) প্রশ্ন করব, বিটোফেন কেন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে নির্দিষ্ট অবস্থানে সাজিয়ে এক-একটি সিম্ফোনি রচনা করলেন? হেগেল বলেন—"ধ্বনিকে বিশেষ অবস্থানে সাজিয়ে তার মধ্যে একটা প্রাণ সঞ্চার করতে, সজ্জিত ধ্বনির মধ্যদিয়ে একটি ভাব প্রকাশ করতে।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই ভাবটিই হলো সংগীতের বিষয়, যা সংগীতকার তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে চান। সুরকারের জীবনিক অভিজ্ঞতাই সেই সুরে সংগীতের ভাষায় মূর্ত হয়ে ওঠে। আর একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে একজন সুরকারের জীবনে শুধুমাত্র সংগীতযন্ত্র বিষয়েই অভিজ্ঞতা থাকে না, সেই অভিজ্ঞতায় তাঁর সমকাল, সমাজ, ইতিহাসেরও অনিবার্য প্রভাব থাকে। সুরকারের ব্যক্তিত্বে এই ঐতিহাসিক প্রভাবকে সরল করে দেখবার কোনো যুক্তি নেই, বরং এই বিচিত্র প্রভাবকে মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করা উচিত। তাই সুরের মধ্যে শুধু সুরকেই শুনতে চাওয়াকে আমরা নির্বুদ্ধিতা বলি, এমনকি সংগীতের গঠনকে অস্বীকার করে একে শুধু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করতে চাওয়া থেকেও তা অর্থহীন।

স্ট্রাভনস্কি বলেছেন 'বিটোফেন ইরোইকা সৃষ্টি করবার সময় শাসক নেপোলিয়ন না গণতান্ত্রিক নেপোলিয়ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেটা লক্ষ করবার কোনো প্রয়োজন নেই।' তাঁর এই বাগ্মিতায় কিছু প্রমাণ হয় কি? স্ট্রাভিনস্কি যদি বলতে চান শাসক নেপোলিয়ন বা বিপ্লববিরোধী কোনো শক্তিও বিটোফেনকে সংগীতসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তবে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই, কারণ একথা কেউ বলে না যে বিপ্লবই একজন শিল্পীর অনুপ্রেরণার একমাত্র স্থল। কিন্তু এই সত্যটি আমরা কিছুতেই ভুলে থাকতে পারি না যে ফরাসি বিপ্লব বিটোফেনের জীবৎকালীন একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাঁর শিল্পকর্ম এবং ব্যক্তিত্ব অনুধাবনে ফরাসি বিপ্লবের ধারণা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তবে বিষয় যতই মহৎ হোক একজন অক্ষম সুরকার তা থেকে মহৎ সুর সৃষ্টি করতে পারে না। বিটোফেনের বেলায় সুরের অভিনব গঠনের মাঝে বিপ্লবকালীন ভাবের অপূর্ব সমন্বয় দেখেই আমরা মুগ্ধ হই।

সাহিত্য এবং চিত্রশিল্পের মতো সংগীতের বিষয়টি এত স্পষ্ট নয় বলেই তা সহজে যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তেমনি মহৎ সংগীতের বিষয়ও এত অস্পষ্ট নয় যে স্ট্রাভিনস্কির মতো বলা যাবে, 'কোনো সংগীতের উৎস বিপ্লব বা বিশ্বাসঘাতকতা সেটি দেখবার প্রয়োজন নেই।' সংগীত নিরপেক্ষ এবং উদ্দেশ্যহীন আবেগই প্রকাশ করে, এ ধরনের একটা ধারণা আমরা শোপেনহাওয়ারের মধ্যেও পাই। শোপেনহাওয়ার বলেন—"সংগীত কখনোই কোনো বিশেষ আনন্দ, কোনো নির্দিষ্ট দুঃখ, ব্যথা, ভয় বা উৎফুল্লতা অথবা মনের প্রশান্তিকে প্রকাশ করে না বরং নিরপেক্ষ আনন্দ, বেদনা, ভীতি, উৎফুল্লতার সম্মিলিত বিমূর্ত এক অনুভূতিই সৃষ্টি করে, এই অনুভূতির বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না, তাই কোনো উদ্দেশ্যও থাকে না।" একথাকে সত্য বলে মেনে নিলে কোনো আনন্দ-সংগীতের আনন্দ-অনুভূতিটি নামপরিচয়হীন বিমূর্ত, অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ আমরা তো বলতে পারি না, একজন ফটকাবাজের স্টক এক্সচেঞ্জে টাকা পাবার আনন্দ, একটি শিশুর ক্রিসমাস বৃক্ষ দেখবার আনন্দ অথবা একজন মদ্যপের এক গ্লাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্যাম্পেন পানের আনন্দ সব একই চরিত্রের আনন্দ। কোনো 'আনন্দ সংগীতে'র আনন্দর পরিচয়টি জানা তাই আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। তা না হলে আমরা কি মেনে নেব বিটোফেনের সুরের আনন্দ আর লেহারের সুরের আনন্দের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই? হেগেন তাই বলেন, "সংগীতকে যদি কেবল নামহীন আবেগ বা বিবিধ ভাবের সমন্বিত রূপ বলা হয় তবে তা নেহাত ফাঁকা এবং সরল সাধারণীকরণ দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। মনে করি, যদি কোনো কিছু হারানোর দুঃখ থেকে একটি শোকের সুর সৃষ্টি করা হলো, তবে আমাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে, কী হারানোর দুঃখ, দুঃখের চরিত্রটি কী? সংগীত কখনোই ফাঁকা আত্মার প্রকাশ নয়, তার একটা অন্তর্গত পরিচয় আছে। প্রতিটি মানবিক আবেগেরই নির্দিষ্ট ভিন্ন রূপ আছে, তাই সংগীতেও সেই আবেগ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়।" কিন্তু আমরা দেখছি স্ট্রাভিনস্কি বিটোফেনের সংগীতকে শুধু এর ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য এবং এর আঙ্গিক দ্বারাই বিচার করতে চান। শোপেনহাওয়ারও এ ধারণা পোষণ করে বলেন—"আমরা যদি বিটোফেনের সিম্ফোনির আবেগময় দ্বন্দ্ব আর মোহনীয় ঐক্যের দিকে লক্ষ করি তো দেখতে পাব সেখানে মানুষের সকল রকম ভাবাবেগের একটি একত্রিত রূপ ফুটে উঠেছে। বিবিধ বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ, বেদনা, প্রেম, ঘৃণা, আশা। বস্তুরূপহীন আত্মার জগতের মতোই নির্দিষ্ট বিষয়হীন বিমূর্ত আবেগই প্রকাশিত হয়েছে সে সুরে।" এখানেও অবশেষে সেই শীতল বিমূর্ততার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু সুরের যে অন্তর্গত প্রাণের কথা আমরা বললাম, সেটি তো কোনো বায়বীয় শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হয় না। এর জন্ম হয় সুরকারের মনেই, যে তার সমকাল এবং বাস্তব জগতের প্রতি বিবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে এবং যে জগতে বিমূর্ত কোনো আনন্দ বা বেদনা নেই, সবই কার্যকারণঘটিত আনন্দ বা কার্যকারণঘটিত বেদনা। ইরোইকার বিদায়ী কুচকাওয়াজের সুর কোনো অর্থহীন বিমূর্ত শোক নয়, এটি বিপ্লবী আবেগময় শোকগাঁথা। বিটোফেনের এই সুরে কোনো মৃত প্রেমিকের জন্য একজন প্রেমিকার দুঃখ প্রকাশ হয় না অথবা ঠিক সেই সুরে যিশুর ক্রুশবিদ্ধতার শোকও প্রকাশ করা যায় না; এটি একটি নির্দিষ্ট চেতনারই সুর এবং তা একান্তই বিপ্লবী চেতনার সিম্ফোনি। কী হারানোর দুঃখ? হেগেলের সেই প্রশ্নের চমৎকার জবাব পাওয়া যাবে এই সিম্ফোনিতে। ঠিক সেভাবেই তার নবম সিম্ফোনিতে যে আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে সেটা বিমূর্ত কোনো আনন্দ নয় বরং বিষাদ এবং হতাশাকে অস্বীকার করবার আনন্দই সংগীতে রূপ নিয়েছে এই সিম্ফোনিতে। আরও একটা ব্যাপার এই সিম্ফোনিতে লক্ষ করা যায় তা হলো এ আনন্দটি যেন একান্ত নাগরিক কোনো আনন্দ, এর সাথে গ্রামীণ প্রাকৃতিক, স্নিগ্ধ, সরল আনন্দের কোনো সম্পর্ক নেই। আবার বিটোফেনের শেষদিককার সুরগুলোতে দেখা যায়, সেখানে একরকম বিবর্ণ নিঃসঙ্গতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই নিঃসঙ্গতাটিও কিন্তু পরিচয়হীন বিমূর্ত নয়। এই একাকিত্বের সাথে কোনো ধ্যানমগ্ন ঋষির একাকিত্বের মিল নেই কিংবা মিল নেই কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের চূড়ায় নিঃসঙ্গ কুটিরে আবদ্ধ একজন একাকী কৃষকের, বরং এতে ছড়িয়ে আছে নতুন এক নাগরিক নিঃসঙ্গতার আবহ যে নিঃসঙ্গতাবোধ পুঁজিবাদী যুগের সূচনায় নব্য বুর্জোয়াদের মধ্যে দেখা দিচ্ছিল এবং বিটোফেনের মধ্যেই প্রথম সেই বোধ সাংগীতিক রূপ পায়। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিটোফেনের সুরে মোটেও বিবিধ আবেগ-অনুভূতির বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেনি বরং এমন নির্দিষ্ট বোধ তাঁর সুরে রূপ পেয়েছে যা এর আগের যুগে ছিল অজ্ঞাত।

এবার একটি আধুনিক উদাহরণ বিচার করা যাক। লেনিনের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে রচিত হ্যান্স ইসলামের গীতিনাট্যটিকে এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া যায়। যে নতুন আঙ্গিকে এখানে শোকগাঁথাটি রচিত হয়েছে তাতে আবারও প্রমাণিত হয় বিমূর্ত ভাব নয়, সামাজিক উপাদানই সংগীতের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রেখটের মূলপাঠের উপর যদিও ইসলামকে কাজ করতে হয়েছে তবু এক্ষেত্রে সুরকারের দায়িত্বটি নেহাত সহজ ছিল না। কীভাবে লেনিনের জন্য শোক প্রকাশ করা যায়? সামান্য লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, সুরের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সুরকারের শুধু সংগীতপ্রতিভা থাকলেই চলবে না, তার সাথে প্রয়োজন বিস্তৃত রাজনৈতিক ধারণার। লেনিনের জন্য শোক প্রকাশ করতে গেলে আধ্যাত্মিক ভাবময় সুর নিশ্চয়ই কোনো কাজে লাগবে না, খ্রিস্টীয় স্তবগীতির সুরেও সে শোক প্রকাশ করা যাবে না অথবা ইরোইকার সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সুরও এই শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী নেতার আবহে যথার্থ হবে না, এমনকি যথার্থ হবে না রোমান্টিক অতি-আবেগময় সুরও। সুরকারকে তাই সম্পূর্ণ নতুন একটি সুরভঙ্গি খুঁজে নিতে হয়েছে। তাকে এমন একটি সুর আবিষ্কার করতে হয়েছে যে সুর লেনিনের মৃত্যুর বা স্বর্গারোহণকে প্রধান করে তুলবে না বরং অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের মনে তাঁর নিরন্তর অস্তিত্বকেই প্রাণময় করে তুলবে। এই সমস্যাই সুরকারকে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টিতে বাধ্য করেছে। লেনিন গীতিনাট্যের এই আঙ্গিক তাই কেবল আঙ্গিকের কারণে আঙ্গিক নয় বরং নতুন বিষয়ের প্রয়োজনেই উদ্ভূত নতুন আঙ্গিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিষয়ই বস্তুত সংগীতের সামগ্রিক রূপটি নির্ধারণ করছে।

সংগীতের ক্ষেত্রে বিষয় এবং আঙ্গিকের সম্পর্কটি বাস্তবিকই জটিল। যেমন, যখন কোনো কাব্যে সুরারোপ করা হয় তখন ঐ সুরের বিষয় সেই কাব্যতেই নির্দিষ্ট করা থাকে, যদিও অনেক সময় সুর শুধুমাত্র কাব্যকে অনুসরণ না করে তা থেকে বেরিয়ে এসে শক্তিশালী একটি দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি কোনো বাদ্যযন্ত্রে একটি সুর বাজানো হয় এবং প্রশ্ন করা হয়, এই সুরটুকুর মধ্যে কী বিষয় নিহিত আছে, তবে উত্তর কী হবে? ভাববাদীর কাছে অবশ্য উত্তরটি সহজ। শোপেনহাওয়ার যেমন বলেন—"সুরের সাথে বস্তুজগতের অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই, সুর কেবল মানুষের অন্তর্গত কোনো বাসনার প্রতিরূপ। সেজন্যই অন্যসব শিল্পের চেয়ে সংগীত সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাশালী।" হেগেলও স্বীকার করেছেন—"সংগীতের একটা আত্মগত অন্তর্নিহিত স্বাধীন সত্তা আছে।" কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার গুরু হেগেল সংগীতের নির্দিষ্ট উপাদানের ব্যাপারেও মতামত রেখেছেন। একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর পক্ষে খুব অবলীলায় এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। এর যথার্থ জবাব পেতে হলে তাকে অবশ্যই সংগীতের ঐতিহাসিক বিকাশকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সংগীতের পরিবর্তনশীল শর্তগুলো লক্ষ করতে হবে।

আদিম কাল থেকেই দেখা গেছে সংগীত সংঘবদ্ধ আবেগকে উজ্জীবিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যবহৃত হয়েছে কোনো কাজ বা যুদ্ধের অনুপ্রেরণাদায়ী শক্তি হিসেবে। সংগীত মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে, চেতনাকে মোহিত করে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ভিন্ন একটা মানসিক অবস্থার জন্ম দিয়েছে। এই মানসিক অবস্থানটিই লক্ষ করার বিষয়। ড্রামের ধুপধাপ শব্দ, কাঠের ঠুকঠাক শব্দ অথবা ইস্পাতের টুংটাং ধ্বনির আলাদাভাবে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এসমস্ত ধ্বনিরই যুক্তিনিষ্ঠ সম্মিলিত আয়োজন মানুষের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সংগীতের সামাজিক ভূমিকা অনুসন্ধান করার অর্থ ঐ প্রতিক্রিয়াকেই আবিষ্কার করে। হ্যান্স ইসলাম একেই বলেছেন নির্দিষ্ট ছন্দ আর ধ্বনিরূপের মধ্য থেকে উদ্ভূত এক 'স্বতঃস্ফূর্ত' আবেগ। সামরিক কুচকাওয়াজ, শোক মিছিল বা নাচের সংগীতে এ ব্যাপারটি আমরা স্পষ্ট লক্ষ করতে পারব। এসব সংগীতের বেলায় দেখা যাবে, যে-কোনো মানের শ্রোতাই এ সংগীতের আবেগে অংশগ্রহণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ অনুভব করছে। সংগীতের এই সম্মিলিত আবেগ সঞ্চার করবার ক্ষমতা, কিছুক্ষণের জন্য সকল মানুষকে একই অনুভূতিতে একত্রিত করে রাখবার ক্ষমতাটিই ব্যবহৃত হয় সামরিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তাই একথাও বলা যায়, সব শিল্পের মধ্যে সংগীতই সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিকে মেঘাচ্ছন্ন করে, মোহগ্রস্ত করে, প্রশ্নহীন আনুগত্য তৈরি করে, এমনকি মৃত্যুর ইচ্ছাকে পর্যন্ত জাগ্রত করে।

সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সংগীতের এই অদ্ভুত শক্তিকে ব্যবহার করেছে। মধ্যযুগের ক্যাথলিক চার্চ কখনোই চাইত না সংগীত খুব সুমধুর হোক বরং চাইত তার বিপরীতটাই। সেসময় সংগীতের কাজ ছিল প্রার্থনাকারীদের অনুতপ্ত আর নম্র করে তোলা এবং ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট করে একদল বাধ্য বিশ্বাসী গড়ে তোলা। চার্চে এসে প্রতিটি মানুষই তার নিজস্ব পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠত, সেইসাথে সংগীতের আবহে সে আরও বিশাল এক বিশ্বব্যাপী পাপবোধে নিমজ্জিত হতো এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় আকুল হয়ে উঠত। তুমি এক অবোধ, অসহায় পাপী জীব, যিশুর কষ্টকে অনুধাবন করো, তবেই তুমি রক্ষা পাবে—এরকম একটি বোধ জাগ্রত করাই ছিল সেসব সংগীতের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে হেগেল লিখেছেন—"প্রাচীন চার্চসংগীতে যিশুর মৃত্যু, তাঁর যন্ত্রণা এত গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে সেটি আর কারো ব্যক্তিগত বেদনা বা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণায় আবদ্ধ না থেকে একটি সর্বজনীনতা লাভ করেছে। ফলে এই সংগীতের প্রভাবে শ্রোতা যে যন্ত্রণাটি উপলব্ধি করে তা তার একান্ত নিজস্ব বলেই বোধ হয় এবং এই উপলব্ধি তার সচেতন জীবনযাপনকেও প্রভাবিত করে।" অন্যভাবে বলা যায়, শক্তিশালী চার্চ-সংগীত ব্যক্তিভেদে শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন অনির্দিষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করে না রবং সকল শ্রোতাকে স্বর্গীয় যাতনা এবং মানবিক পাপবোধ সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট অনুভূতিতে একত্রিত করে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ধর্মসভার সদস্যগণ শুধুমাত্র সাধারণ শ্রোতা নয়, এরা সমস্বার্থে বিশ্বাসী একটি দল। হেগেল বলেন—"এ সংগীতে শ্রোতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্নতায় নানাবিধ ভাব সঞ্চারিত হয় না, এ সংগীত তাদের মধ্যে একটি সংগঠিত সম্মিলিত আবেগ সৃষ্টি করে।" এ ধরনের সংগীতে শ্রোতারা তাই একটি নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থায় উপনীত হয় এবং সেই মানসিক অবস্থা তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকেও প্রভাবিত করে। তাই এভাবে বলা যায় যে, এসব সংগীতের বিষয় শুধুমাত্র সংগীতের অন্তর্গত নয়, সংগীতের বাইরেও তা বিস্তৃত। সংগীতের নিজস্ব ধ্বনিগত রূপ এবং শ্রোতার মনে তার প্রতিক্রিয়ার যোগফলই এ সংগীতের বিষয়। এ যোগফল লোকনৃত্য এবং সামরিক কুচকাওয়াজের বেলাতেও সত্য। যেমন, নাচের সংগীতের নিজস্ব কোনো বিষয় নেই। এ সংগীতের কাজ হচ্ছে শ্রোতার মনে নাচের ইচ্ছাটাকে উস্কে দেয়া, এর ফলে যখন নাচিয়েদের মধ্যে উত্তেজনা এবং অঙ্গভঙ্গি লক্ষিত হয় তখনই বলা যায় নাচের সংগীত বিষয়প্রাপ্ত হলো। নাচের সংগীতের তালবদ্ধ সুর এবং শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া, এ দুটো একত্রিত হয়ে সে সংগীতের বিষয় গঠন করলেও এর আঙ্গিক কিন্তু সামাজিক অবস্থান দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়। যেমন, বিশেষ সামাজিক উপাদানই জন্ম দেয় ওয়াল্টজ বা রক-এন-রোল ধরনের নাচ। তেমনি কুচকাওয়াজে সৈন্যদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার বোধ সৃষ্টিই সামরিক সংগীতের বিষয় হলেও তার ধারণাটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। কিন্তু সিম্ফোনির বেলায় ব্যাপারটি উল্টো ঘটে। নাচ বা সামরিক সংগীতে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়াজাত কর্মকাণ্ডের সাথে যেমন এ সংগীতের বিষয়ের একটি সম্পর্ক দেখা গেল, সিম্ফোনির ব্যাপারে তার প্রয়োজন পড়ে না, সিম্ফোনির আঙ্গিক এবং বিষয় এর নিজের মধ্যেই পুঞ্জীভূত। 'স্বতঃস্ফূর্ত ভাব' সৃষ্টির ক্ষমতায় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সংগীতে জটিল প্রক্রিয়ায় কেবলি বিষয় আঙ্গিকে পরিণত হচ্ছে, আর আঙ্গিক বিষয়ে। সামাজিক উপাদান সংগীতের আঙ্গিকের উপর প্রভাব ফেলছে বা নতুন প্রয়োজনে পুরনো আঙ্গিককে কাজে লাগাচ্ছে।

এখানে দুধরনের সংগীতের পার্থক্যটি আমাদের বুঝে নিতে হবে। এক, যে সংগীত শ্রোতার মনে সমধর্মী, নির্দিষ্ট একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং একদল মানুষকে একটি সংঘবদ্ধ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। দুই, যে সংগীতের বিষয় তার নিজস্ব সুরব্যঞ্জনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং যা মানুষের মনে সমধর্মী আবেগ সঞ্চার করে না বরং এতে প্রত্যেকের

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত বিভিন্নতায় আবেগ এবং অনুভূতি জাগ্রত হবার মুক্ত সম্ভাবনা থাকে। মধ্যযুগের ধর্মসংগীতকে প্রথম শ্রেণিতে ফেলা যায়, অন্যদিকে এর বিপরীতে রয়েছে বুর্জোয়া বিকাশের সাথে সাথে উদ্ভূত ধর্মনিরপেক্ষ আত্মগত সংগীত। মধ্যযুগ থেকে ক্রমান্বয়ে সংগীতের এই ধর্মবিচ্যুতির দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা মানতে বাধ্য হব যে, সংগীত একটি সামাজিক ঘটনা। যদিও সংগীত কিছু ধ্বনির সমন্বয় কিন্তু এই ধ্বনির সমন্বয় কোনো বিশেষ সময়ে, বিশেষ সমাজের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বিত রূপের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। দেখা যায়, সেই একাদশ শতাব্দীর ফরাসি গীতিকবি থেকে শুরু করে, বিভিন্ন প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে, রাজাদের জোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংগীত ক্রমে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। প্রাচীন চার্চ-সংগীত শুধুমাত্র চার্চের সাথেই সম্পর্কিত ছিল, অনুমোদিত পূজাবিধি দ্বারাই নির্দিষ্ট ছিল এর বিষয়। কিন্তু তার মধ্য থেকেই পারগোলেসির 'স্টাবাট ম্যাটার' এর সুরে একটা আনন্দময় বিশ্বজনীনতা লক্ষ করা যায়। এ সুর শুধু চার্চে নয়, যে-কোনো জায়গায় সমান তৃপ্ততায় উপভোগ করা যেতে পারে। এ সংগীতের বিষয় ধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চেতনায় শ্রোতার মনে বিবিধ ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা আছে। এভাবে সংগীত পর্যায়ক্রমে মানবিক হয়ে উঠেছে এবং তা মানুষের আত্মগত স্বরূপকে বিনষ্ট না করে আরো দৃঢ় করে তুলেছে। ধর্মসংগীতের ধর্ম-সংকীর্ণতা থেকে সংগীতের চূড়ান্ত মুক্তি ঘটেছে বিটোফেনের মিজো সলেমিসএ। এ সুর চার্চে বাজালে নির্ঘাত ধর্মনীতির কঠোর প্রথার মধ্যে মানুষের আত্মগত চেতনা জাগ্রত হবে। কারণ এ সুরে কোনো আধ্যাত্মিক ধোঁয়াচ্ছন্নতা নেই, এ সুর মানুষের পাপ বা ঈশ্বরের কথা বলে না, জানায় সেই মানুষের কথা যা ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তার বেদনা এবং আনন্দের কথা, ঘোষণা করছে তার মহত্ত্ব আর জয়। এ সংগীতের বিষয় ঈশ্বর নয় বরং বিপ্লবকালীন আত্মসচেতন মানুষ। শুধু বিষয় নয়, সংগীতের আঙ্গিকের মধ্যেও এই ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে লৌকিকীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, সমবেত বা কোরাস সংগীত হলো সামন্তযুগের সংগীত। এ সংগীতে প্রতিটি স্বরের নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে, একটি স্বর অপরটিকে অতিক্রম করে যাবার প্রতিযোগিতায় নামে না, সম্মিলিতভাবে একদিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে একক-সংগীত হলো উঠতি বুর্জোয়া সমাজের সংগীত, যে সমাজে প্রথম পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার নীতির উদ্ভব হয়। এভাবেই শ্রেণিবিরোধের এ যুগে বিভিন্ন ভাবের দ্বন্দ্বই হয়ে উঠেছে সংগীতের উপজীব্য। এ ঘটনা একদিনে ঘটেনি, প্রাচীন ধর্মসংগীতের কোলেই এর জন্ম, যেমন করে সামন্তের কোলে জন্ম নিয়েছে বুর্জোয়া। লৌকিক সংগীতের প্রতিষ্ঠা মানেই বুর্জোয়াজির আধিপত্য, কারণ ইতিমধ্যে বণিকেরাও যাজকের স্থান দখল করেছে। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ বিবিধ মানবিক দ্বন্দ্বের রূপ প্রকাশই হয়ে উঠেছে সংগীতের লক্ষ্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই দ্বন্দ্বগুলো ধারণ করবার জন্য বারোক-সংগীত থেকে উদ্ভূত হলো সিম্ফোনি। সংগীতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হলো। সংগীতে কখনো সামাজিক, কখনো ব্যক্তিগত বোধ রূপায়িত হতে লাগল, সংগীতে মূর্ত হলো মানবিকতা, বীরোচিত আশাবাদ, বেদনা বা একাকিত্ব। একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর ধরনের নতুন সংগীতে স্পষ্ট হয়ে উঠল; দেখা গেল এ সংগীতের আবেদন প্রধানত সংগীতজ্ঞ এবং সংগীত-রসিকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ধর্মসংগীত রচিত হতো কেবল কিছু বিশ্বাসীদের ধর্মীয়বোধকে তৃপ্তি দেয়ার জন্য, কোনোরকম নান্দনিক প্রশান্তি দেয়ার জন্য নয়। নতুন এই সংগীত কিছুটা যেন এর আদি মানবিক চরিত্র থেকে সরে এল। সাধারণ, অপটু শ্রোতার জন্য এ সংগীতের রসাস্বাদন দুরূহ হয়ে পড়ল। যেমন দেখা যায়, বিটোফেন তাঁর ইরোইকা সিম্ফোনির শেষ অংশর আঙ্গিকে বিশেষ বারোক-গঠন সংযুক্ত করেছেন, সুরের এই বিশেষ রসিক শ্রোতা ছাড়া উপভোগ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি হেগেল প্রথম চিহ্নিত করেন—"সাধারণ শ্রোতা সংগীতে এমন আবেগ বা বিষয় শুনতে চায় যা সহজেই বোধগম্য। অপরদিকে সংগীত-রসিক সংগীতের ধ্বনির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুভব করেন এবং সুরের উত্থান-পতন, এর অন্তর্গত স্রোতকে অনুধাবন করে শৈল্পিক রসটি গ্রহণ করতে পারেন।"

এ যুগে ধর্মসংগীতের মতো সুরকারদের ওপর আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকল না বলে বিবিধ নতুন মৌলিক ভাবনা, আঙ্গিক সংগীতে প্রকাশিত হতে লাগল। এতে করে একটা বিপদও দেখা দিল। দেখা গেল সংগীতবোদ্ধাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র-নির্ভর সংগীত অধিক রচিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে আবার সংগীতের দুটি ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হলো। প্রথমত সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন উচ্চমার্গীয় সংগীত, দ্বিতীয়ত, সাধারণ আনন্দের জন্য লঘু সংগীত। এ দুয়ের প্রভেদ পরবর্তীকালে বুর্জোয়া সমাজে এক জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বাখ, মোজার্ট, বিটোফেন বা ব্রাহামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম মোটেও জনপ্রিয় ছিল না এবং আজও তা কেবল কতিপয় মানুষই উপভোগ করে। সংগীতে এ ধরনের জনবিচ্ছিন্ন নিরীক্ষার সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, সেটা হলো একজন সুরকার অন্যান্য শিল্পীর মতো একটা সামাজিক তাগিদে শিল্প রচনা করলেও শিল্পীর নিজস্ব একটা সৃষ্টিশীল আনন্দবোধের কোনো অনুমোদন ছিল না, কেবল আধুনিক সংগীতেই সেই বাধার মুক্তি ঘটেছে। হেগেল যখন বলেন—সুরকার তার সংগীতের বিষয় ছাড়াও শুধুমাত্র সংগীতের গঠনের স্থাপত্য নিয়ে মগ্ন হতে পারেন; তখন তিনি শিল্পকে বিচিত্র সম্ভাবনায় স্থাপন করবার জন্য শিল্পীর নিজস্ব সেই আনন্দের কথাই বলেন। এভাবেই বিটোফেন তাঁর Eriocaর শেষ অংশে সেই বিপ্লবী আবেগকে অতিক্রম করে শুধুমাত্র আঙ্গিক নিয়েই চমৎকার ক্রীড়া করেছেন, যাতে ফুটে উঠেছে তাঁর অসাধারণ সংগীতনৈপুণ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী শৈল্পিক প্রবণতার একটা নৈতিক বিচারও হওয়া উচিত, বিশেষ করে যেহেতু আমরা শিল্পের সামাজিকতার প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে অঙ্কের সাথে একটা তুলনা দেয়া যেতে পারে। একটি গণিতের সমস্যাকে বিভিন্নভাবে সমাধান করা যায়। অঙ্কটিকে খুব জটিল পদ্ধতিতে সমাধান করা যায়, আবার সহজ কোনো উপায়েও করা যায়। কিন্তু গণিতজ্ঞগণ একটি সূত্র নির্ধারিত করেন যাতে করে সবচেয়ে শোভনভাবে সেই গাণিতিক সমাধানটি করা যায়। সূত্রটি শুধু শুদ্ধ বলেই শোভন নয়, এ সূত্রের সাহায্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সহজে সমাধানটি পাওয়া যায় বলেই তা শোভন। একথাটি সার্বিক বিচারে শিল্পের ক্ষেত্রেও সত্য। কোনো শিল্পে বিশেষ কোনো বিষয়ের জন্য সবচেয়ে শোভন একটি আঙ্গিকগত সমাধান থাকে। সেই শোভন আঙ্গিকটি আবিষ্কার করাই মহৎ শিল্পীর প্রত্যাশা। শিল্পে আঙ্গিক শুধু বিষয়ের ধারকমাত্র নয়। শিল্পীর চেতনাগত বিষয় প্রকাশের সমস্যা এবং তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার আনন্দ প্রকাশের জটিলতার সবচেয়ে সুন্দর সমাধান হলো আঙ্গিক। আঙ্গিক চর্চার নান্দনিক গুরুত্বের সাথে একটি নৈতিক গুরুত্বও আছে। একজন সুরকার তাই সাধারণ অপটু শ্রোতার জন্য সহজবোধ্য সংগীত রচনা করে ক্ষান্ত হতে পারেন না। সংগীতের তাতে অনুর্বর এবং স্থবির হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সুরকারকে তাই উন্নততর নান্দনিক বোধ সৃষ্টির জন্য বিষয়ের মতো আঙ্গিকগত সমস্যাগুলোও চর্চা করতে হবে। হয়তো সে চর্চা শুধুমাত্র শিক্ষিত সংগীতজ্ঞগণই প্রশংসা করতে পারবেন, হয়তো সাধারণ শ্রোতার কাছে এই আঙ্গিকগত উদ্ভাবনা উদ্ভট, অগ্রহণযোগ্য মনে হবে, তবুও সংগীতমাধ্যমের পূর্ণতা এবং উৎকর্ষের জন্য এ চর্চা প্রয়োজন। অনেক সময় শিল্পীর এই আঙ্গিকগত নৈপুণ্যই অনেক শিল্পের মান বৃদ্ধি করেছে। মায়াকোভস্কি তাঁর 'কীভাবে কবিতা লেখা হয়' বইটিতে পেট্রোগ্রাডে যুদ্ধরত রেড আর্মিদের জন্য লিখিত তাঁর একটি ছন্দোবদ্ধ পথসংগীতের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন—'নতুন যে সংগীতে এই কবিতা রচিত হয়েছে, ভঙ্গির সেই নতুনত্বই বস্তুত একে যথার্থ কবিতা করে তুলেছে।' আমরা ধরে নিতে পারি যে, হয়তো রেড আর্মির সদস্যগণ কবিতাটির এই আঙ্গিকগত অভিনবত্বের বিষয়টি মোটেও উপভোগ করেনি, কিন্তু তবু কী আশ্চর্য! শ্রমিক আন্দোলনের মহান কবি আমাদের বলছেন, ঐ আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যই তাঁর রেড আর্মি সংগীতটিকে যথার্থ কবিতা করে তুলেছে। সংগীতের ক্ষেত্রেও এভাবেই আসলে বিষয় এবং আঙ্গিক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

আবার আঙ্গিকের প্রশ্নটি সংগীতে যেহেতু অত্যন্ত দৃঢ়, তাই এতে আঙ্গিক-সর্বস্বতা দেখা যাওয়ার সম্ভাবনাও সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেইসাথে আঙ্গিকের প্রাধান্য থাকলেই কোনো সংগীতকে বাতিল করে দেয়াও যথার্থ হবে না। সেই যুক্তিতে তাহলে আমরা বাখের সংগীত, বারোক সংগীত, বিটোফেন, মোজার্টের অনেক শিল্পকর্মকেও সে দোষে দুষ্ট দেখতে পাব। সাধারণত সংগীতে বাহুল্য আঙ্গিক চর্চা নিম্নোক্ত রকম হয়ে থাকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথমত যে সমস্ত আঙ্গিক গঠনগত সমাধানের জন্য নয় বরং শুধু আঙ্গিকগত চমক বা শিল্পীর প্রতিভা প্রদর্শন করে আত্মপ্রশান্তি অনুভব করবার জন্যই করা হয়। সাধারণ শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করবার কোনো বাসনা এদের নেই, কিন্তু বিশেষজ্ঞ প্রশংসা অর্জনের অহংকার এদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত রয়েছে ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করার নামে পুরনো নিয়মের হীন পুনরাবৃত্তি, স্থূল নকল, রোমান্টিক গ্রাম্য সুরে অনেকটা জেটবিমানের বিকট শব্দকে ঢাকা দেবার জন্য রচিত কতিপয় আধুনিক সংগীত। এ সংগীতের আঙ্গিকসর্বস্বতা মিথ্যাসর্বস্ব। এই সংগীত এমন বিষয় ধারণ করে যা লুপ্ত হয়ে গেছে, এমন আঙ্গিককে ধারণ করে যার আর কোনো ক্ষমতা নেই, হয়তো একসময় তা প্রাণবন্ত ছিল। এসব সংগীত শুনলে মনে হবে গত একশো বছরে পৃথিবীতে তেমন কিছুই ঘটেনি, এ শতাব্দীর সুরকারের পক্ষে গত শতাব্দীর সংগীতের বৈশিষ্ট্যগুলোকে জাবর কাটা ছাড়া যেন অন্য কিছু করবার নেই। এ সময় যা মহৎ ছিল, পরিবর্তিত পরিবেশেও সেই একই সংগীতকে সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা দিয়ে নবায়িত না করে শুধু পুনরাবৃত্তি করা নেহাতই নীরস পদ্ধতি। তৃতীয় রূপটি হলো, অনেকটা জোর করে সংগীত থেকে আবেগ-অনুভূতিকে বর্জন করা। ঐতিহাসিক একটা পর্যায়ে সংগীতের মেদ কমানোর জন্য এবং তাকে যথার্থ শৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ ধরনের প্রচেষ্টার হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন একথা মেনে নেয়া সম্ভব নয় যে, আঙ্গিক ছাড়া সংগীতে আবেগের কোনো ভূমিকা নেই। যদি সংগীত থেকে সবরকম ভাবকে দূর করে দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, অণুপরমাণুর নিয়মে কসমস সংগীত রচনা করবার চেষ্টা করা হয় তবে তা হবে নেহাত বাতুলতা। জড়জগতের নিয়মে সংগীত রচনা করা যাবে এই সম্ভাবনা মেনে নিয়েই বলতে হয় এ ধরনের নিরীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা চাই সংগীতে মানবিক ভাব, অনুভূতির প্রকাশ হোক। ধর্মসংগীত ছিল একটি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত নৈর্ব্যক্তিক সংগীত কিন্তু এধরনের অতিবুদ্ধিবৃত্তিমূলক শীতল, কৃত্রিম আধুনিক সংগীত বর্তমান কালাকাল থেকে বিচ্যুত নতুন এক ধর্মীয় সংগীতে পরিণত হবে, যা বস্তুত চরম বিচ্ছিন্নতারই প্রকাশ। এরকম রীতিসর্বস্বতা আমাদের এক অসার জগতের দিকে নিয়ে যায়।

এখানে সংক্ষেপে সংগীতের বিষয় এবং আঙ্গিকের জটিল দ্বন্দ্বটি আলোচনা করা গেল। আমরা দেখতে পেলাম এযাবৎ সংগীতে আঙ্গিকের চর্চা যতটুকু স্পষ্ট, বিষয়ের ক্ষেত্রে তা ততটুকু স্পষ্ট নয়। তাই বলা যায় সংগীতের মুক্তি এবং এর পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করছে জীবনের নতুন চেতনা, নতুন প্রজ্ঞা, নতুন মিলনকে সংগীতে ধারণ করবার মাত্রার ওপর। যথোচিত আঙ্গিকে বিশ্বব্যাপী অগণিত শ্রমজীবী মানুষের বিকাশমান চেতনা, জীবনবোধ এবং কর্মপ্রবণতাকে স্পষ্টতার সাথে সাংগীতিক রূপ দেয়ার মধ্যেই নির্ভর করছে সংগীতের বিশ্বজনীনতা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নন্দনতত্ত্ব

শিল্পসাহিত্য এবং পুঁজিবাদ

▼

আর্নস্ট ফিশার

পুঁজিবাদী যুগে শিল্পী-সাহিত্যিক অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। রাজা মাইডাস যেমন কোনোকিছু স্পর্শ করলেই সেটা সোনা হয়ে যেত, পুঁজিবাদ তেমনি সবকিছুকে রূপান্তরিত করেছে পণ্যে। পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদন ক্ষমতার অকল্পনীয় প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, মানবিক অভিজ্ঞতার প্রতিটা ক্ষেত্রে, ফলে পুরনো বিশ্বটি ঘূর্ণায়মান অনুচূর্ণের একটা মেঘখণ্ডে পরিণত হয়েছে, ধ্বংস হয়ে গেছে পণ্য উৎপাদক এবং তার ব্যবহারকারীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, উৎপাদিত সকল দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হয়েছে অনামিক বাজারে ক্রয় অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। অতীতে একজন কারিগর বাঁধা কোনো খরিদ্দারের মর্জিমাফিক কাজ করতেন কিন্তু আজ পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের কারিগর কাজ করেন বাজারের অচেনা খরিদ্দারের উদ্দেশে। তার উৎপাদিত পণ্যটি বাজারি প্রতিযোগিতার বন্যায় কোন্ অনিশ্চিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় উৎপাদক তা জানেন না। সর্বব্যাপী পণ্য উৎপাদন, ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগ, ছদ্মবেশী অর্থনৈতিক শক্তি, ইত্যাদি অনিবার্য পুঁজিবাদী উপাদানসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছে মানবিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষতা, বাড়িয়ে দিয়েছে সমাজবাস্তবতা এবং নিজের সত্তা থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে। এমন একটা জগতে শিল্পসাহিত্যও অবধারিতভাবে পরিণত হয়েছে পণ্যে, শিল্পীও হয়েছেন তাই পণ্য উৎপাদক। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার স্থান দখল করেছে দুর্বোধ্য মুক্তবাজার যা কিনা তথাকথিত 'জনগণ' নামের একদঙ্গল অচেনা খরিদ্দারের একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পিণ্ডবিশেষ। ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্যও তাই বাধ্য হয়েছে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার নিয়মে বাঁধা পড়তে।

ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো শিল্পী হয়েছেন 'মুক্ত' শিল্পী, 'মুক্ত' ব্যক্তিত্ব; এ এমনই এক মুক্তি যা তাকে পৌঁছে দেয় অযৌক্তিক উদ্ভটতায়, বরফশীতল একাকিত্বে। শিল্পচর্চা আধা-রোমান্টিক, আধা-বাণিজ্যিক একটা পেশায় পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদের কাছে শিল্পসাহিত্য তুচ্ছ, সন্দেহভাজন এবং ধোঁয়াচ্ছন্ন একটা ব্যাপার। "শিল্পসাহিত্য তো কোনো প্রতিদান দেয় না।" প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ ঝুঁকেছিল ভাবনাহীন বিপুল অমিতব্যয়িতা, বন্ধনহীন অপব্যয়ে আনন্দ এবং শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দিকে, কিন্তু পুঁজিবাদ এ ব্যাপারে একেবারে স্থিরমস্তিষ্ক, গোঁড়া হিসেবি। প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে সম্পদ ছিল উদ্বায়ী প্রসারণশীল কিন্তু পুঁজিবাদ চায় সম্পদ অবিরাম কেবল সংগৃহীত হোক, ঘনীভূত হোক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকুক। কার্ল মার্কস পুঁজিপতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"মূল্যবৃদ্ধির প্রতি ধর্মোন্মাদের মতোই নতজানু পুঁজিপতি, মানুষকে কেবল উৎপাদনের স্বার্থে উৎপাদনের জন্য ধাওয়া করে নিয়ে চলেন। তাতে সামাজিক উৎপাদনক্ষমতা বিকাশ লাভ করে এবং উৎপাদনের সেইসব বস্তুগত শর্ত সৃষ্টি হয় বা একমাত্রভাবে একটা উন্নততর সমাজের ভিত্তি রচনা করতে পারে, যে সমাজের মূলনীতি প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের মুক্ত এবং চূড়ান্ত বিকাশ। কেবল পুঁজির ব্যক্তিস্বরূপ অর্জনের মাধ্যমেই যেহেতু পুঁজিপতির সম্মান, পুঁজিপতি তাই কৃপণের মতোই সম্পদকে শুধুমাত্র সম্পদ হিসেবেই আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু কৃপণের বেলায় যে আকাঙ্ক্ষা একটা বাতিক, পুঁজিপতির সেই আকাঙ্ক্ষা বস্তুত সমাজযন্ত্রের প্রভাবেরই ফলাফল, যে যন্ত্রে তার ভূমিকাটি নেহাত সেই চাকাটির মতো যা ঘুরিয়ে যন্ত্রের অন্যান্য অংশ সচল রাখা হয়। তাছাড়া পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ, শিল্পায়নে লগ্নীকৃত পুঁজির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে এবং পুঁজিবাদ যে-কোনো দমনমূলক নীতির মতোই প্রত্যেক পুঁজিপতিকে তার অন্তর্গত নিয়মের অধীনস্থ থাকতে বাধ্য করে। বাজারি প্রতিযোগিতা, পুঁজির প্রসারণ ঘটাবার জন্য ক্রমাগত পুঁজিপতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং পুঁজির এই প্রসারণ তখনই সম্ভব হয় যখন পুঁজিপতি আরও অধিক হারে পুঁজি জমিয়ে তুলতে সক্ষম হন।"

এবং তারপর—"জমাও আর জমাও। তাতেই মোক্ষলাভ। 'শিল্পকারখানা সেইসব উপাদানের যোগান দেয় এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়' (অ্যাডাম স্মিথ, ওয়েলথ অব নেশন), সুতরাং যে-কোনো মূল্যে তোমাকে সঞ্চয় করতেই হবে, উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশ আর উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে অতি সত্বর পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে হবে। জমানো কেবল জমানোর স্বার্থে, উৎপাদন কেবল উৎপাদনের স্বার্থে—এ নীতিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ বুর্জোয়া-যুগের ঐতিহাসিক অযাত্রাকে প্রকাশ করেছেন।"

একথা অবশ্যই সত্য যে পুঁজিপতির বর্ধিষ্ণু সম্পদও জীবনে প্রাচুর্য এনেছে, কিন্তু মার্কস যথার্থই বলেছিলেন—"সামন্তপ্রভুর ভাবনাহীন নিরেট অমিতাচারিতার সাথে পুঁজিপতির অপব্যয়ের কোনো সাযুজ্যই নেই, পুঁজিপতির অপব্যয়ের নেপথ্যে সর্বক্ষণ রয়েছে অর্থের লোভে নোংরা ওতপেতে থাকা আশঙ্কাগ্রস্ত হিসাব-নিকাশ।" বিলাসবহুল জীবনযাপনে পুঁজিপতির ব্যক্তিগত তৃপ্তিলাভ ঘটতে পারে, কিন্তু এই জীবনযাপন, সম্পদ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিরও একটা সুযোগ ঘটে। কার্যত পুঁজিবাদ শিল্পসাহিত্য বিকাশের সহযোগী বিশেষ কোনো শক্তি নয়। কোনো পুঁজিপতি নেহাত যদি শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহবোধ করে থাকেন তবে হয় তা তার ব্যক্তিগত জীবনকে অলংকৃত করার লক্ষ্যে নয়তো একটা বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে। তবে পক্ষান্তরে একথাও সত্য যে পুঁজিবাদ যেমন অর্থনৈতিক উৎপাদন তেমনি শৈল্পিক উৎপাদনেরও অভূতপূর্ব মুক্তি ঘটিয়েছে। পুঁজিবাদ শিল্পীর মনে নতুনতর ভাবনা, নতুনতর অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে নতুনতর শিল্পপদ্ধতির। এসময় শিল্পসাহিত্যের কোনো অনড়, ধীরগতি প্রকাশপদ্ধতিকে আঁকড়ে থাকা সম্ভব হয়নি, সেসব স্থবির প্রকাশপদ্ধতি এসময় যাবতীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিস্তৃত, বেগবান হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে। তাই, পুঁজিবাদ যদিও মৌলিকভাবে শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব কোনো শক্তি নয় তবু স্মরণ রাখতে হবে এ সমাজ শিল্পের বহুমুখী বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করেছে, জন্ম দিয়েছে অসংখ্য, বিচিত্র, মৌলিক শিল্পকর্ম।

পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পসাহিত্যে ততদিন পর্যন্ত কোনো সঙ্কট দেখা দেয়নি যতদিন বুর্জোয়া শ্রেণিটি একট বিকাশমান শ্রেণির চরিত্র বজায় রেখেছিল। সেসময় অবধি যে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ বুর্জোয়া ধ্যানধারণাকে সমর্থন করেছিলেন তারা বস্তুত প্রগতিরই পক্ষে ছিলেন।

রেনেসাঁকালপর্বে যখন বুর্জোয়া বিকাশ প্রথম তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল তখন পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলো স্বচ্ছ ছিল, শ্রমবিভাগ তখনও পরবর্তীকালের সঙ্কীর্ণ ও স্থবির চরিত্রটি ধারণ করেনি এবং নব্য উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্ট সম্পদগুলো তখনও মূল্যবান সম্ভাবনাময় সম্পদ হিসেবে বুর্জোয়া ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত ছিল। সার্থক বুর্জোয়া এবং তাদের সাথে যোগসাজশকারী সামন্তরাই তখন ছিলেন শিল্পসাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক। নতুন এই পৃথিবী তখন সৃজন প্রতিভাশীল ব্যক্তিদের জন্য ছিল উন্মুক্ত। সেসময় এমন অনেক ব্যক্তিরই দেখা মেলে যাঁদের মধ্যে একাধারে বিকশিত হয়েছিল ভূতাত্ত্বিক, আবিষ্কারক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর এবং লেখকের সমন্বিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিভা। এই প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ সর্বাঙ্গীণভাবে সমর্থন করতেন তাদের সমকালীন বিশ্বকে। এককথায় তাদের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূল সুর ছিল—"দ্যাখো, বেঁচে থাকা কত আনন্দের"। দ্বিতীয় তরঙ্গটি জেগেছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে, যার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে। তৎকালীন বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণির আদর্শিক কর্মসূচি ছিল স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে আত্মমুক্তি এবং স্বদেশ বিশ্বের মিলন। সে-যুগে এ ধ্যানধারণাকেও শিল্পী-সাহিত্যিকগণ পুনরায় তাদের গর্বিত আত্মসচেতনতায় প্রকাশ করেছিলেন তাদের শিল্পকর্মে।

কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। পুঁজিবাদ স্বাধীনতার কথা বলেছে কিন্তু জন্ম দিয়েছে মজুরি শ্রমের অদ্ভুত বেড়াজাল, পুঁজিবাদ প্রতিটি মানুষের মুক্ত বিকাশের আশা করেছে কিন্তু তাকে ছুড়ে দিয়েছে প্রতিযোগিতার বন্য আইনের ঘেরাটোপে, পুঁজিবাদ বহুমুখী মানবব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাকে বিশেষজ্ঞ তৈরির মাধ্যমে একমুখীন সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করে রেখেছে। এসব দ্বন্দ্ব তখনই সঙ্কটের আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এইসব নিরস, উদ্বেগজনক ফলাফল প্রত্যক্ষ করে মানবতাবাদী আন্তরিক শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাদের মোহমুক্তি ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা তাই লক্ষ করব ১৯৪৮ সালে ইউরোপে বিপ্লবের পতন ঘটবার পর সমগ্র শিল্পসাহিত্যে যেন একটা স্বপ্নভঙ্গের ব্যাপার ঘটে গেল। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল শিল্পসাহিত্যের দিন ফুরিয়ে এল। শিল্পী এবার প্রবেশ করলেন পূর্ণাঙ্গ বিকশিত পণ্য উৎপাদক পুঁজিবাদী জগতে, যে জগতের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য মানবিক সত্তার চরম বিচ্ছিন্নতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যান্ত্রিকায়ন, শ্রম বিভাগ, দ্বিখণ্ডীকরণ, কঠোর বিশেষজ্ঞায়ন, ক্রমবর্ধমান আত্মকেন্দ্রিকতা।

এমন একটা জগৎকে কোনো মানবতাবাদী সৎশিল্পী কিছুতেই আর সমর্থন করতে পারলেন না। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিজয়ই যে মানবতার বিজয় একথা বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

রোমান্টিকতাবাদ

রোমান্টিকতাবাদ (Romanticism) একটা প্রতিবাদের আন্দোলন। ব্যবসা আর মুনাফা-কণ্টকিত নিরস পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অথচ, স্ববিরোধী একটা প্রতিবাদ। জার্মান রোমান্টিক লেখক নোভালিস গ্যেটের *Wilhelm Meister* গ্রন্থের যে কঠোর সামলোচনাটি লিখেছিলেন সেটা এই মনোভাবের যথার্থ প্রতিফলন (যদিও অপর রোমান্টিক লেখক ফ্রেডেরিক স্লেগেল গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন)। গ্যেটে *Wilhelm Meister* গ্রন্থে বুর্জোয়া মূল্যবোধকে ইতিবাচক আস্থার সাথে উপস্থাপন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন এবং সৌন্দর্যবাদ ছেড়ে রূঢ় বুর্জোয়াজগতের কর্মময় জীবনে প্রবেশ করার পথ নির্দেশ করেছিলেন। নোভালিস এর কোনোটাই অনুমোদন করেন না।

"দুঃসাহসী অভিযাত্রী, ভাঁড়, বেশ্যা, দোকানদার আর নিম্নরুচির ইতর মানুষেরাই এই উপন্যাসের উপাদান। যে এ বইকে অন্তরে স্থান দেবে সে আর কখনো অন্য বই পড়বে না।"

রুশোর 'ডিসকোরসেস' থেকে শুরু করে মার্কস এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' পর্যন্ত, রোমান্টিকতাবাদ ছিল সমগ্র ইউরোপীয় শিল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী মনোভাব। পেটিবুর্জোয়া সচেতনতায় বিকাশমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্গত অসঙ্গতিগুলোকে দর্শন, সাহিত্য এবং শিল্পে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত করেছিল রোমান্টিকতাবাদ। এই অসঙ্গতিগুলোর যথার্থ স্বরূপ এবং উৎসকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস, তাঁরা উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিক সূত্রকে, সেইসাথে এ সত্যও জানিয়েছিলেন যে শুধু শ্রমজীবী মানুষের হাতেই গচ্ছিত আছে এই অসঙ্গতির উত্তরণের শক্তি। সামাজিক অসঙ্গতির যথার্থ প্রতিরূপ হলেন পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়, তাই তাদের রোমান্টিক মানসিকতাও অবধারিতভাবে থাকে সিদ্ধান্তহীন, বিহ্বল। তারা কখনো পুঁজিবাদের নব নব সাফল্যে আশান্বিত হয়ে ওঠেন, আবার এই উত্তরণের প্রক্রিয়ায় নিজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন, কখনো নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেন আবার আঁকড়ে ধরেন পুরনো নিয়মনীতির নিরাপদ আশ্রয়, তাদের চোখ কখনো নিবন্ধ হয় অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, কখনো আবার নস্টালজিক দৃষ্টিতে ফিরে তাকান অতীতের সুখ সময়ের দিকে।

সুতরাং রোমান্টিকতাবাদ মূলত একটা পেটিবুর্জোয়া আন্দোলন যে আন্দোলন প্রতিবাদ জানিয়েছিল মহত্ত্ব-সংক্রান্ত ধ্রুপদী ধারণার বিরুদ্ধে, যাবতীয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং সাধারণ সমস্যাকে উপেক্ষা করে কেবল অভিজাত বিষয় চর্চার বিরুদ্ধে। রোমান্টিক শিল্পসাহিত্য জীবনের কোনো প্রসঙ্গকেই শিল্পের আঙিনায় অচ্ছুত বলে প্রত্যাখ্যান করেননি।

স্তাঁদাল আর মেরিমের ভক্ত বৃদ্ধ গ্যেটে ১৮৩০ সালের ১৪ মার্চ বলেছিলেন—

"আতিশয্য আর অস্বাভাবিকতার দিন ফুরিয়েছে, এখন শিল্পে মুক্ত আঙ্গিকে জীবনের বহুমুখী, বিচিত্র আর বিবিধ বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে, অতঃপর বিস্তৃত জগতের কোনো কিছুই আর অকাব্যিক হিসেবে প্রত্যাখ্যান হবে না।"

নোভালিস গ্যেটের প্রায় সব মতামতের বিরোধিতা করলেও এ ব্যাপারটি তিনিও লক্ষ করেছিলেন যে রোমান্টিক শিল্পীগণ যাবতীয় পরিত্যক্ত এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করতে চাইছেন। তিনিও লিখেছিলেন—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আটপৌরে বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা, সাধারণকে রহস্যের আবরণে অসাধারণ করে তোলা, অজ্ঞাত, অপরিচিতকে মর্যাদাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, এই হলো রোমান্টিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য।"

শেলি তাঁর 'ডিফেন্স অব পয়েট্রি' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"কবিতা সাধারণ বস্তুকেই এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে তাকে আর সাধারণ বলে মনে হয় না।" রোমান্টিকতাবাদ ধ্রুপদীর সাজানো বাগান ত্যাগ করে এক বিজন প্রদেশে পা রেখেছিল।

রোমান্টিকতাবাদ যেমন ধ্রুপদী ভাবধারার বিরোধিতা করেছিল তেমনি বিরোধিতা করেছিল বুদ্ধিবৃত্তিকতার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা সর্বাঙ্গীণ বিরোধিতা ছিল না বরং তা নির্দিষ্ট ছিল যান্ত্রিক ধারণা এবং আশাবাদী সরলীকরণের বিরুদ্ধে। বার্ক, কোলরিজ, স্লেগেল প্রমুখ জার্মান রোমান্টিক লেখকগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকে বর্জন করলেও শেলি, বায়রন, স্তাঁদাল প্রমুখ লেখকগণ যাঁদের লেখায় সামাজিক অসঙ্গতির প্রকাশ ছিল অধিকতর স্পষ্ট তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তির ধারাকে রক্ষা করে চলেছিলেন।

পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাগ, জীবনের খণ্ডায়ন এবং বিশেষজ্ঞায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে যে একাকী, অসম্পূর্ণ মানুষটি উদ্ভূত হন তেমনি একজন মানুষের অভিজ্ঞতাই রোমান্টিকতাবাদের অন্যতম অভিজ্ঞতা। পূর্বে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান ছিল অন্যান্য মানুষের সাথে এবং সার্বিকভাবে বৃহত্তর সমাজের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যস্থতার একটা অবস্থান। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ সমাজের মুখোমুখি হন সম্পূর্ণ একা মধ্যস্থতাবিহীন। একজন আগন্তুক কত মুখোমুখি হন আরও অসংখ্য আগন্তুকের, একাকী একজন 'আমি' এসে দাঁড়ান অসংখ্য 'অ-আমির' বিরুদ্ধে। এমন একটা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষের মধ্যে যেমন আত্মসচেতনতা এবং গৌরবান্বিত আত্মমুখিনতা বৃদ্ধি পায় তেমনি বৃদ্ধি পায় অসহায়তাবোধ এবং আবেগময়তা। এতে যেমন দেখা দেয় নেপোলিয়নীয় প্রকট 'আমি', পাশাপাশি দেখা যায় সামান্য সহায়ের প্রত্যাশায় দেবমূর্তির পায়ের নিচে মাথা কুটে মরা অসহায় 'আমি'কে। একদিকে সমগ্র পৃথিবীকে জয় করার দৃঢ়তাসম্পন্ন 'আমি' অন্যদিকে ভয়াবহ একাকিত্বে মুষড়ে থাকা 'আমি'। এই নিঃসঙ্গ আত্মসচেতন আমিত্বের অধিকারী শিল্পী নিজেও। অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে অন্যান্যদের মতো তার এই আমিত্বকেও বন্ধক রাখতে হয় পুঁজিবাদী বাজারের কাছে কিন্তু প্রতিভার গৌরবে শিল্পী এই বন্দিত্বের বিরোধিতা করেন, স্বপ্ন দেখেন হারানো ঐক্যের, সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে কখনো অতীতে তাকান, কখনো তাকান ভবিষ্যতে। দ্বান্দ্বিকতা সূত্রের তিনটি শর্ত এই রোমান্টিকতাবাদের গভীরে বিদ্যমান থিসিস (উৎসের ঐক্য), অ্যান্টিথিসিস (বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, খণ্ডায়ন), সিনথেসিস (দ্বন্দ্বের অপসারণ, বাস্তবতার সাথে পুনর্মিলন, বিষয় ও বিষয়ীর আত্মপরিচয়, হারানো ঐক্যপ্রাপ্তি)

~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিকতাবাদের সহজাত অসঙ্গতিগুলোর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল পুঁজিবাদ বিকাশের প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী জাগরণগুলোর উদ্ভবকালে যার সূত্রপাত আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং সমাপ্তি ওয়াটারলুর যুদ্ধে। এই বিপ্লবী আন্দোলন এবং এর প্রভাবপুষ্ট ভাবধারাই ছিল তখন রোমান্টিকতাবাদের মূল ভাবনাপ্রসঙ্গ। প্রতিবার প্রতিটি ঘটনার নাটকীয় প্রান্তে পৌঁছে আন্দোলন বিভক্ত হয়ে গেছে প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধারায় এবং প্রতিবারই পেটিবুর্জোয়া নিজেকে প্রমাণ করেছে 'মূর্তিমান অসঙ্গতি'রূপে যে পদটি মার্কস স্কুইটজারের কাছে লিখিত এক পত্রে ব্যবহার করেছিলেন।

সকল রোমান্টিক শিল্পীদের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতাগুলো লক্ষণীয় ছিল তা হলো, পুঁজিবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা (কারো অভিজাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, কারো বঞ্চিতের), ব্যক্তিত্ব অতৃপ্ত আত্মার প্রতি ফাউস্তীয় বা বায়রনীয় বিশ্বাস এবং 'ভাবাবেগের নিজস্ব অধিকারে' (স্তাঁদাল) আস্থা। সমাজে বস্তু উৎপাদন যতই সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে স্বীকৃত হতে থাকল, কুটিল ব্যবসা যতই বয়ে আনতে লাগল সামাজিক সম্মান ততই শিল্পী সাহিত্যিকগণ সুতীব্র আবেগে মানুষের হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন, আপাত সুন্দর বুর্জোয়াসমাজের মুখে ছুড়ে দিলেন ভাবাবেগের বাষ্প। পুঁজিবাদী সমাজে কোনো মূল্যবোধের স্থায়িত্ব লাভ করার সম্ভাবনা যেহেতু অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল শিল্পীগণ তাই ভাবাবেগকেই মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কীটস লিখেছেন—"আমি আমার হৃদয়ের আকর্ষণ ছাড়া আর কোনোকিছুতেই বিশ্বাস করি না।" 'দ্য সেনসি' গ্রন্থের ভূমিকায় শেলি লিখেছিলেন—"অবিনশ্বর ঈশ্বর যেমন নশ্বর ভাবাবেগকে রক্ষা করার জন্য মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন তেমনি করেছেন কল্পনাকে।" জরিকো, দেলাক্রোয়া যাকে বলেছিলেন 'চরমপন্থী' তিনি একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, সবকূল ভাসানো উদ্দাম উল্লাসের এক কাঁপুনির কথা, লিখেছিলেন সেই আগ্নেয়গিরির অদম্য অগ্নির কথা যা বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দিনের আলোয়।

রোমান্টিকতাবাদ ছিল যথার্থই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এ আন্দোলন যেমন ধাবিত হয়েছিল মানবচেতনার সুদূর, সীমাহীন দিগন্তে তেমনি তা ফিরে তাকিয়েছে নিজস্ব অতীতের দিকে, নিজের স্বভাবের দিকে, জনগণের দিকে। রোমান্টিক শিল্পীগণ যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন নেপোলিয়ানের মতো একক বিশ্বব্যক্তিত্বকে তেমনি তারা সমর্থন করেছেন জনগণের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে। জে ফস্কলো নেপোলিয়ানের সম্মানে 'দ্য বোনাপার্ট লিবারেটর' নামে গাঁথা রচনা করেছিলেন তিনিই আবার ১৮০২ সালে ইতালির কিসালপিন প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে নেপোলিয়ানের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং পরিশেষে প্রবল বিতৃষ্ণার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বিশ্বজয়ী বীর নেপোলিয়ানের কাছ থেকে। এইভাবে বিরূপ হয়েছিলেন লিওপার্ডি। বীরের প্রতি তাঁরও মোহভঙ্গ ঘটেছিল ফ্রান্সের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতায়। 'ক্যানজোনি' কবিতায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই তিনি আবেগরুদ্ধ ভাষায় লিখেছিলেন—

অস্ত্র, আমাকে অস্ত্র দাও,
আমি যুদ্ধ করব একাই
একাই বরণ করব মৃত্যুকে
আমার রক্তই হোক
ইতালীয় হৃদয়ের অনুপ্রেরণা।

পূর্ব ইউরোপে, রোমান্টিকতাবাদ ছিল খাঁটি এবং সরল একটা বিদ্রোহ, সেখানে পুঁজিবাদ তখনও যথেষ্ট বিকশিত হয়ে ওঠেনি, মানুষ তখনও বাস করছিল মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজে। রোমান্টিকতাবাদ সেখানে মানুষকে আহ্বান করেছিল স্বদেশি এবং বিদেশি শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে, এবং সামন্ততান্ত্রিকতা আর চিরস্থায়িত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। বায়রন ঝড়ের মতো মাতিয়ে রেখেছিলেন এসব দেশকে। ক্ষয়িষ্ণু সময়ের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার অস্ত্র হিসেবে রোমান্টিক শিল্পীগণ লোকঐতিহ্য এবং লোকশিল্পকে আদর্শায়িত রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। রোমান্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বস্তুত ছিল সমসাময়িক মানুষকে মধ্যযুগীয় বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্ত করারই উপায়। যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তখনও পূর্বাঞ্চলে সমাধা হয়নি তারই আভাস দূর বিদ্যুচ্ছটার মতো কখনো কখনো ঝলসে উঠেছিল রাশিয়া, হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ডের রোমান্টিক শিল্পীদের কাজে।

বিভিন্ন অঞ্চলের রোমান্টিক শিল্পীদের প্রকাশগত পার্থক্য থাকলেও সকলের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন পরিপার্শ্বের জগতের সাথে একাত্ম হতে পারার অক্ষমতায় আত্মিক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ, অস্থিরতাবোধ এবং নিঃসঙ্গতাবোধ যে বোধ তার মনে জন্ম দেয় সামাজিক ঐক্যের স্বপ্ন, জনগণ এবং তাদের সংগীত ও উপাখ্যানের প্রতি অনুরাগ এবং অসামান্য একক ব্যক্তিত্বের প্রতি গুণমুগ্ধতা এবং সেইসাথে বায়রনীয় বন্ধনহীন আত্মমগ্নতা। রোমান্টিকতাবাদের কালপর্বেই প্রথম এমন একজন মুক্ত লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল যে লেখক সকল বন্ধনকে অস্বীকার করেছেন, যিনি নিজেকে বুর্জোয়াসমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন অথচ একই সাথে অসচেতনভাবে বুর্জোয়া বাজারি উৎপাদন নীতিকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের এই বন্ধনমুক্তি এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রোমান্টিক প্রতিবাদই তাদের বাধ্য করেছিল সমাজবর্জিত এক খ্যাপা জীবনযাপনে। তারা তাদের রচনাকে যথাযথভাবে বাজারি পণ্য হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন যাকে তারা নিজেরাই ঘৃণা করতেন। যদিও রোমান্টিকতাবাদের বিশেষ পক্ষপাত ছিল মধ্যযুগের প্রতি তবু এটা নিঃসন্দেহে একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, পুঁজিবাদের আধুনিকতম সমস্যার বীজও অন্তর্নিহিত ছিল এ আন্দোলনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অসাধারণ প্রতিভা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী নোভালিস, যিনি ছিলেন জার্মান রোমান্টিক শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক তিনি অবশ্য পুঁজিবাদের শুভ উপাদানগুলোর ব্যাপারে সজাগ ছিলেন এবং লিখেছিলেন সেই আশ্চর্য পঙ্ক্তিসমূহ—

"ব্যবসার জীবনীশক্তিই হলো সমগ্র পৃথিবীর জীবনীশক্তি। এ এক বিস্ময়কর জীবনীশক্তি, খাঁটি এবং সরল। এ শক্তি সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে, তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। জন্ম দেয় শহর এবং দেশ, জাতি এবং শিল্পকর্ম। এই হলো সংস্কৃতির জীবনীশক্তি, মানবজাতির পূর্ণতার জীবনীশক্তি।"

কিন্তু তাঁর এই মেধাবী পর্যবেক্ষণ সর্বক্ষণই ঢাকা পড়ে থাকত জীবনের যান্ত্রিকায়ন আর যন্ত্রের প্রতি ভয়ানক ভয়ে। নোভালিস জার্মানে বিকাশমান নতুন বুর্জোয়া, ব্যবসায়িক সমাজকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন—"অর্ধেক রাষ্ট্র, অর্ধেক প্রকৃতি এই হলো মধ্যপন্থী সরকারের কাঠামো—এ নেহাতই কৃত্রিম, ভঙ্গুর একটা যন্ত্র মাত্র। যে-কোনো মহৎ চিন্তার কাছে তাই তা বিতৃষ্ণাজনক কিন্তু সেটাই হয়েছে আমাদের সময়ের ছেলেখেলার কাঠের ঘোড়া। এ যন্ত্রটিকে যদি কোনোভাবে জীবিত এবং স্বাধীন করে তোলা যেত তবেই এ সমস্যার সমাধান হতো।" এভাবেই রোমান্টিক শিল্পীগণ 'যান্ত্রিক' চেতনার বিপক্ষে একটা 'জৈবিক' চেতনার ধারণাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। 'জীবন মাত্রই হবে যন্ত্রবিরোধী, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে থাকবে তীব্র অগ্রাহ্যতা এবং প্রতিবাদ'—ইটিএ হফম্যান তাঁর লেখায় এই অ্যান্টিথিসিসেরই চর্চা শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে পর্যবসিত হয়েছিল মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে এক ভৌতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে। হাইনে বলেছিলেন হফম্যানের সমগ্র লেখা বস্তুত 'বিশ ভলিয়ুম ভয়ের আর্তনাদ'। যা-কিছু 'প্রাকৃতিক' এবং 'জৈবিক' তাকেই আদর্শায়িত করার এই রোমান্টিক প্রবণতা বস্তুত বুর্জোয়া বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবাদে পরিণত হয়েছিল। অতীত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তারা বলেছিলেন 'জৈবিক' এবং যা-কিছু নতুন শ্রেণি কর্তৃক সৃষ্ট তাকে বলেছিলেন 'পাপী' ও 'যান্ত্রিক'। তারা বলেছিলেন 'পৃথিবীর ঘুম' ভাঙানো উচিত নয়। প্রয়োজন নেই প্রাচীন রাত্রিকে নতুন সকালে রূপান্তরিত করার। 'হাইমস্ টু দ্য নাইট' কবিতায় নোভালিস প্রশ্ন করেছেন—

সকাল কি বারবার ফিরে আসবেই?
পার্থিবের ক্ষমতা কি কখনোই ঘুরাবে না?
অশুভে ঐ কারখানাগুলোই গ্রাস করছে
রাত্রির পবিত্র আবরণ

ফেডেরিক স্লেগেল অতীতকে 'অন্ধকার যুগ' নামে আখ্যায়িত করার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—মানবতার সেই স্মরণীয় কালকে হয়তোবা রাত্রির সাথে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুলনা করা যায়—"কিন্তু কী চমৎকার তারকাশোভিত সে রাত্রি। আজ যেন আমরা বেঁচে আছি আলো-আঁধারির এক মেঘাচ্ছন্ন ক্রান্তিকালে। যে তারাগুলো সে রাত্রিকে আলোকিত করে রেখেছিল, তার অধিকাংশই আজ ম্লান অথবা অদৃশ্য হয়ে গেছে, অথচ ভোর হচ্ছে না কিছুতেই। স্বর্গসুখ আর শাশ্বত সত্যের আসন্ন সূর্যোদয়ের কথা আমাদের বহুবারই বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা বারবারই প্রমাণ করেছে এ নেহাতই মিথ্যা, হঠকারী এক প্রতিশ্রুতি। আমাদের জন্য কেবল অপেক্ষা করে আছে ভোরের বাতাসের সেই শীতটুকু, যা সূর্যোদয়ের আগে প্রবাহিত হয়।"

মোহভঙ্গের পাশাপাশি রোমান্টিক শিল্পী সাহিত্যিকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এমনি এক শীতের অনুভবের উপস্থিতি যা বস্তুত নিঃসঙ্গ, অনাত্মীয় এক পৃথিবীতে বসবাসের অনুভব। রোমান্টিক শিল্পীগণের মাধ্যমেই এই অনুভবের সূত্রপাত, যে অনুভব পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধির পথ ধরে কেবলই উত্তরোত্তর প্রকট হয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল উষ্ণ নিরাপদ কোনো স্থানে ফিরে যাবার বাসনা, কল্পনায় যার রূপ অনেকটা মাতৃজরায়ুর মতো। এমনকি জন্ম নিয়েছিল মৃত্যুর সুখলাভের প্রত্যাশা। একপর্যায়ে মৃত্যুর মধ্যেই তারা খুঁজে পেয়েছিলেন সমগ্রতা এবং ঐক্যের বোধ—

একদিন সকলই হবে দেহ
এক ও অভিন্ন দেহ।
স্বর্গীয় রক্তস্রোতে
ভাসমান সুখী যুগল প্রণয়ী
সমুদ্র রাঙা হয়ে
উঠেছে ইতিমধ্যেই, আর সুউচ্চ
পর্বতচূড়া ফুলে ফেঁপে
সুগন্ধী মাংসের রূপ নিচ্ছে।

রোমান্টিক শিল্পী সাহিত্যিকদের এই মৃত্যুকামনা এবং শাশ্বত যৌনতাবোধ পরবর্তীকালীন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের চিন্তারই পূর্বাভাস দেয়, যেমন ফ্রেডেরিক স্লেগেল তাঁর 'ডাইওনাইসিয়ান' এবং 'এপলোনিয়ান' ধারণার মধ্যদিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রেডেরিক নিৎসের পূর্বাভাস। নোভলিস লিখেছিলেন—"চিন্তার যে অঙ্গ, সেটাই হচ্ছে প্রকৃতির দেহের যৌনাঙ্গ।" অন্যস্থানে লিখেছিলেন—"এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এতদিন আমরা লক্ষ করিনি যৌনতৃপ্তি, ধর্মবোধ এবং নৃশংসতার মূল প্রবণতা বস্তুত একই এবং তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।"

রোমান্টিক মনে সামাজিক বাস্তবতা হয় অবলুপ্ত নয়তো বিকৃত আকার ধারণ করেছিল এবং পরিণত হয়েছিল ব্যঙ্গ-কৌতুকের বিষয়ে। ফ্রেডেরিক স্লেগেল লিখেছিলেন—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"জার্মান কবিতা উত্তরোত্তর অতীতের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে, এর মূল স্পর্শ করেছে পৌরাণিক কাহিনীকে, যে উৎস থেকে এখনও সদ্যোজাত কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হয়। এ কবিতা যদি নেহাতই বর্তমান বাস্তবতাকে ধারণ করতে চায় তবে তা কেবল ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমেই ধারণ করতে পারে।"

নোভালিস লিখেছিলেন—"জগৎকে রোমান্টিকতার অধীনে আনতে হবে। সাধারণকে মহত্ত্ব দানের মাধ্যমে, আটপৌরে বিষয়কে রহস্যাবৃত করে জ্ঞাতের চেয়ে অজ্ঞাতকে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে এবং সসীমকে অসীম তুল্য করে তুলেই কেবল মৌলিক সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব। আমাদের দৈহিক এবং চেতনাগত দুর্বলতার কারণেই আমরা নিজেদের একটা মায়াবী জগতের মধ্যে দেখতে পাই না।"

পশ্চিমের পুঁজিবাদ এবং পূর্বের সামন্তবাদের মাঝামাঝি জার্মানের অবস্থান। সেইসাথে জার্মানের রয়েছে বিপর্যস্ত, সর্বনাশা এক ইতিহাস, ফলে দেখা যায় জার্মানের রোমান্টিকতাবাদ আন্দোলনেই ছিল সবচেয়ে স্ববিরোধী চরিত্র। দেখা যায় জার্মানে যথাযথ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হবার আগেই সেখানকার শিল্পসাহিত্যে পুঁজিবাদের প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে গেছে, মোহ দানা বাঁধার আগেই ঘটে গেছে মোহমুক্তি। তাই লক্ষ করা যায় জার্মান রোমান্টিকতাবাদ পুঁজিবাদের বিপ্লবী উত্থানকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, পুঁজিবাদী উত্থানের প্রারম্ভিক স্তরেই তারা বিরোধিতা করেছে মৌলনীতি এবং সংশ্লিষ্ট ভাবধারাকে। হাইনে পুঁজিবাদ-বিরোধী এই প্রবণতাকে চিহ্নিত করে লিখেছিলেন—

"সম্ভবত অর্থলাভের জন্য সর্বব্যাপী অন্ধ উন্মাদনার প্রতি অরুচি এবং সর্বত্র ওত পেতে থাকা স্বার্থপরতার প্রতি ঘৃণার কারণেই কতিপয় জার্মান রোমান্টিক কবি সৎ উদ্দেশ্যে বর্তমানকে প্রত্যাখ্যান করে অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন এবং আহ্বান করেছেন মধ্যযুগকে।"

জার্মান রোমান্টিক কবিগণ তাদের সমসাময়িক বিকাশমান সমাজবাস্তবতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'না'। কিন্তু শুধুমাত্র 'না'-বোধক চেতনা কোনো চিরস্থায়ী শিল্পচেতনা হতে পারে না। শিল্পীকে সৃজনশীল থাকার জন্য অবশ্যই কোনো একটা 'হ্যাঁ'-কে চিহ্নিত করতে হবে যেমন ছায়া তার উৎসবস্তুকে চিহ্নিত করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্মাণকারী কোনো সামাজিক শ্রেণির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ছাড়া বিকল্প কোনো 'হ্যাঁ' থাকতে পারে না। ওদিকে পশ্চিমের দেশগুলোতে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই শ্রমজীবী শ্রেণি বিকশিত হতে শুরু করেছিল এবং এদিকে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোকে কৃষক, শ্রমিক, বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী সমন্বিতভাবে প্রচলিত সামন্ত নিয়মনীতির বিরোধিতা করছিল। কিন্তু জার্মান রোমান্টিক শিল্পীদের সামনে বুর্জোয়া ব্যবসায়ী ইতিমধ্যেই একজন বিরক্তিকর চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেলেও তার বিপরীতে সেখানকার শ্রমজীবী শ্রেণি এতই বিপর্যস্ত এবং দুর্বল ছিল যে এই শ্রেণির মধ্যে ভবিষ্যৎ নির্মাণকারী কোনো শক্তির সম্ভাবনা সে কবিগণ খুঁজে পাননি। তাই সম্ভাবনাহীন বর্তমান থেকে নিস্কৃতি নিয়ে তারা অতীত সামন্তজীবনে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। তারা পুঁজিবাদী অশুভ বর্তমানের বিপক্ষে তাই দাঁড় করিয়েছিলেন অতীতের কিছু শুভ উপাদানকে, যেমন—উৎপাদক এবং ভোক্তার অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্কের অধিকতর প্রত্যক্ষতা, জোরালো সমষ্টিচেতনা, কম মাত্রার শ্রমবিভাজন, ফলে মানবিক ব্যক্তিত্বের অধিকতর ঐক্য। কিন্তু পুঁজিবাদী বিভীষিকার মুখোমুখি হবার আগেই তারা এই অতীত উপাদানগুলোকে এদের প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অতিমাত্রায় আদর্শায়িত করে তুলেছিলেন, টেনে এনেছিলেন অন্ধভক্তির পর্যায়ে। রোমান্টিক শিল্পীগণ যদিও জীবনের সামগ্রিকতার প্রত্যাশী ছিলেন কিন্তু তারা জীবনকে সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকতায় বিচার করতে ছিলেন অক্ষম। তাই বলা যায় তারাই ছিলেন পুঁজিবাদী জগতের যথার্থ সন্তান। সকল সামাজিক অনড়তাকে উৎখাত করে, মানবিক সম্পর্কের সকল আদিম ভিতকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ যে বস্তুত নতুনতর এক মানবিক ঐক্যের সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, রোমান্টিক শিল্পী সাহিত্যিকগণ সে সত্যটি অনুধাবন করতে পারেননি।

কোনো বাস্তব উপায়ে বাস্তবের ঊর্ধ্বের ঐ 'মায়াবী জগতে' পৌছানো সম্ভব নয়, সচেতন মনকে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে রেখে স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করলেই কেবল তা সম্ভব। নোভালিস তাই শিল্পের এক নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন—

"গল্পের ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ থাকবে কিন্তু পারম্পর্য থাকবে না, ঠিক যেমন স্বপ্ন। কবিতা হবে আবেগনির্ভর সুখশ্রাব্য শব্দের সমষ্টি কিন্তু তার কোনো অর্থ থাকবে না, খুব সামান্য কিছু কবিতাই কেবল বোধগম্য হবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের খণ্ডাংশ দিয়ে নির্মিত হবে এসব শিল্প।"

ভগ্ন খণ্ডিত এক পৃথিবীতে বসবাসের এই অনুভব, বাস্তব জগৎ থেকে পালিয়ে যোগাযোগহীন, অর্থহীন বিষয়বেষ্টিত এক মায়াবী জগতে আশ্রয় গ্রহণের এই বাসনা, পরবর্তীকালে বুর্জোয়া জগতের সকল শিল্পের মূল ভাবধারায় পরিণত হয়েছিল, যার প্রারম্ভ ঘোষণা করেছিলেন সূচনাপর্বের রোমান্টিক শিল্পীগণ।

তবে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া বিশ্বের বিরুদ্ধে রোমান্টিক প্রতিবাদ, অতীতে পলায়ন ইত্যাদি উপাদানগুলোর মধ্যে শুভ দিকটিও বিদ্যমান ছিল, রাত্রির পাশে দিনও ছিল সেখানে, রোমান্টিক শিল্পী সাহিত্যিকগণ সামগ্রিকভাবে মানবিক ঐক্যের প্রত্যাশা করতেন, তাদের এই সৎবিশ্বাস ছিল যে মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এখানেই তাদের প্রগতিশীলতা [illegible]ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"সমষ্টিচেতনাই আমাদের ধ্যানধারণার নির্যাস। আমাদের আত্মিক আলস্যই আমাদের পীড়িত এবং নির্যাতিত করে রেখেছে। আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রসার এবং চর্চার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা যদি এই বিশ্বের সাথে আমাদের মেধাকে ভারসাম্যে স্থাপন করতে পারি তবে আমরা ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়ে উঠব।"

জার্মান রোমান্টিকতাবাদের অশুভ পশ্চাৎমুখী উপাদানগুলোর প্রভাবে বহু রোমান্টিক লেখক শেষ পরিণতিতে গোঁড়া ক্যাথলিক বা ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়েছিলেন। ফ্রেডেরিক স্লেগেল শেষকালে উপদেশ দিয়েছিলেন অনুভবের খাঁটি খ্রিস্টীয় সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল শিল্পরচনায় মনোনিবেশ করতে, অবজ্ঞা করেছিলেন 'দানবীয় উদ্দীপনায় কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্যকে', লর্ড বায়রনের গভীর ধ্যানমগ্নতাকে। সে কারণে দেখা গেছে, বায়রন যখন গ্রিসের মুক্তির পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে ম্যালিনিয়ার মারা গেলেন, স্তাঁদাল যখন ইতালির স্বাধীনতাযুদ্ধকে সমর্থন করলেন এবং পুশকিন যখন আস্থা জ্ঞাপন করলেন ডিসেম্বরিস্টদের প্রতি, তখন অধিকাংশ জার্মান রোমান্টিক লেখকই মেটারনিকের সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন, তারা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন হাইনের ঘৃণাভরা রায়কে— "ওরা সব মিথ্যুকের দল, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশ্বস্ত অনুচর, অতীতের যতসব নোংরামি, বীভৎসতা আর নির্বুদ্ধিতার ধারক।"

জার্মান রোমান্টিকতাবাদ বা পরবর্তীকালের এ ধরনের আন্দোলনগুলো আলোচনার সময় এদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, চিহ্নিত করতে হবে এদের শুভ এবং অশুভ উভয় উপাদানকে। সবক্ষেত্রে দেখা যাবে সেই একই দ্বন্দ্ব, একদিকে বুর্জোয়া মূল্যবোধের প্রতি গভীর ক্ষোভ অথচ অন্যদিকে বিপ্লবের উন্মেষের প্রতি ভীতি এবং রহস্যময়তায় পলায়ন, যার অবধারিত পরিণতি প্রতিক্রিয়াশীলতা। আমাদের কালের এক্সপ্রেশনিজম, ফিউচারিজম বা সুররিয়ালিজম থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যত শিল্পসাহিত্যের আন্দোলন হয়েছে তার আদর্শ নমুনা জার্মান রোমান্টিকতাবাদ। এসব আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় এর সাথে যুক্ত শিল্পীসাহিত্যিকের মধ্যে সকলেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েননি। যেমন জার্মান রোমান্টিক হাইনরিখ হাইনে আর নিকোলাস লেনাউ হয়েছিলেন বিপ্লবী কিন্তু অন্যেরা যেমন উহল্যান্ড এব ইকেনডর্ফর্ম কখনোই নিজেদের কথিত সেই মিথ্যুকের দলের সাথে যুক্ত করেননি।

সেইসাথে লক্ষণীয় যে রোমান্টিকতাবাদের অংশবিশেষ সমাজের বাস্তববাদী সমালোচনাতেও উন্নীত হয়েছিল। বহু মহৎ লেখকদের লেখায় রোমান্টিকতাবাদ এবং বাস্তববাদকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার উদাহরণ বায়রন এবং স্কট, ক্লেইস্ট এবং গ্রিলপার্জার, হফম্যান এবং হাইনে, স্তাঁদাল এবং বালজাক, পুশকিন এবং গোগল। এঁদের লেখায় কখনো প্রাধান্য পেয়েছে রোমান্টিক উপাদান, কখনো বাস্তববাদী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপাদান। সাম্প্রতিক বুর্জোয়াসমাজের মহান বাস্তববাদী লেখক টমাস মান জার্মান রোমান্টিকতাবাদের ঐতিহ্যে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর লেখায় সূক্ষ্ম পরিহাসের ইঙ্গিতময়তার চমকের মধ্যে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে সে প্রভাব। সেই পরিহাসকে মান বলেছিলেন 'মৌল প্রবৃত্তির প্রতিসরণ'।

লোকশিল্প

রোমান্টিকতাবাদই লোকশিল্পের ধারণাটি গড়ে তুলেছিল, যা ছিল এ আন্দোলনের অন্যতম উপাদানগুলোর একটি। পুঁজিবাদী বিশ্বে ব্যক্তি আর সমষ্টির মধ্যে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব, তার নিরসন চাইছিলেন রোমান্টিক শিল্পীসাহিত্যিকগণ, তারা আকুল হয়ে খুঁজছিলেন মানবিক চেতনার হারানো ঐক্যকে। তাদের এই প্রত্যাশা, এই অন্বেষার নিষ্পত্তি ঘটেছিল লোকশিল্পের বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে। তাঁরা লোকশিল্পের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বন্দ্বহীন মানবিক চেতনার ঐক্যকে। আত্মতৃপ্তির সাথে তারা ঘোষণা করেছিলেন লোকশিল্পই হচ্ছে প্রকৃত জনগণের যথার্থ, সমসত্ত্বীয় সুসমাচার। জনগণের মধ্যে যে সৃজনশীল একটা সমন্বিত 'লোকআত্মা' ক্রিয়াশীল থাকে লোকশিল্প তারই প্রকাশ—এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত, কিন্তু 'জনগণ' বলতে যে শ্রেণিবিভাজনের উর্ধ্বে সমন্বিত কোনো সাধারণ সত্তাকে বোঝায় না, এ সত্যটি তারা অনুধাবন করেননি। এই অস্পষ্টতা নিয়ে এমনকি আজও অনেকে 'জনগণ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। কথিত প্রকৃত জনগণের সেই লোকশিল্পকে নিয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন রোমান্টিক শিল্পীসাহিত্যিকগণ। লোকশিল্পকে তারা অন্যান্য সকল শিল্পের বিপক্ষে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অন্যান্য সকল শিল্পই বানিয়ে তোলা, কৃত্রিম, অথচ লোকশিল্প প্রকৃতির মতোই সহজাত স্বাভাবিক। যেহেতু লোকসাহিত্য, লোকসংগীত বা লোকচিত্রের রচয়িতাদের কোনো পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না তাই তারা ধরে নিয়েছিলেন এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের সচেতন রচনা নয় বরং নামহীন কোনো রহস্যময় জনগোষ্ঠীরই স্বতঃস্ফূর্ত যৌথ সৃষ্টি। নানাবিধ লোক-ছড়ায় মেতে উঠেছিলেন রোমান্টিকগণ। যেমন,

> কে রচেছে এ মধুর গান?
> সাগরের ওপার থেকে এ-গান আনল বয়ে
> তিনটি রাজহাঁস,
> দুটি তার ধূসর রঙের একটি কেবল শাদা।

ছড়াটি কাব্যিক হতে পারে কিন্তু সত্য বা রূপক কোনো অর্থেই গ্রহণযোগ্য নয়। লোকশিল্প কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত এবং সাধারণ কিছু ধ্যানধারণারই যে প্রতিফলন একথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা শুধু লোকশিল্প কেন, যে-কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিল্পের ক্ষেত্রেই সমানভাবেই সত্য। তাতে সেসব শিল্প যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং যৌথ সৃষ্টি তা প্রমাণিত হয় না। আসলে যৌথ চেতনার ভিত্তিতে শিল্প সৃষ্টি হলেও যৌথভাবে তা সৃষ্টি হয় না। এমনকি সেই প্রস্তরযুগের সাধারণ মানুষের অতৃপ্ত, অদ্ভুত কামনাগুলোরও পরিতৃপ্তি ঘটত জাদুর মাধ্যমে, যা পরিবেশন করতেন আদিমতম শিল্পী কোনো বিশেষ একজন চৌকশ জাদুকর। এভাবেই সমষ্টির চিন্তাচেতনা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বস্তুত একজন ব্যক্তি বিশেষই শিল্পে ধারণ করে। সেই গুহাচিত্র বা পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের লোকগাঁথা বা সংগীত এমনিভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষেরই সৃষ্টি। কিন্তু রোমান্টিকগণ লোকশিল্পের ব্যাপারে ছিলেন অতিমাত্রায় উদার, সমালোচনাহীন। লোকশিল্পের মাঝে তারা যেহেতু যৌথ লোকআত্মার অনুরণন শুনতেন তাই তাদের কাছে গ্রহণ-বর্জনের কোনো ব্যাপার ছিল না। সে কারণে দেখা যায় ব্রেন্টানো এবং আর্নিম সম্পাদিত 'Das knaben wunderhorn' নামক সংকলনটিতে যেমন অনেক চমৎকার মৌলিক কবিতা তেমনি রয়েছে অসংখ্য স্থূল, নিকৃষ্ট কবিতা।

রোমান্টিক বিরোধী শিল্পীসাহিত্যিক গোষ্ঠী দাবি করেন লোকশিল্প, উচ্চপর্যায়ের শিল্পেরই গৌণ এবং উপজাত অংশ। (যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক আজকাল ভাইরাসকে জীব আর জড়ের মধ্যবর্তী কোনো স্তর মনে করেন না বরং জীবনেরই পশ্চাৎগামী একটা ধারা মনে করেন)। রোমান্টিক বিরোধী গোষ্ঠীর এই দাবির প্রমাণ হিসাবে যদিও উপরোক্ত ঐ সংকলনের বহু কবিতাকেই উপস্থাপন করা যাবে তবু আমি মনে করি এ ধারণার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সত্য নিহিত নেই, এই রোমান্টিকদের মতোই একপেশে একটা সিদ্ধান্ত। হতে পারে লোকশিল্প অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন বীরগাথা, ধর্মীয়গাথা, বা শতাব্দী-পুরাতন গীতিকবিতাগুলোর পশ্চাদ্‌গামী উপজাত অংশ যা ক্রমান্বয়ে লোকসমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না সেইসব বীরগাথা বা ধর্মীয়গাথাগুলোর উৎস আরও অতীতের সেই পৌরাণিক উপাখান, যে উপাখ্যানগুলো সৃষ্টি হয়েছিল এমন এক সামাজিক স্তরে যখন শাসক বলে কোনো শ্রেণির উদ্ভব ঘটেনি, ফলে জনগণ নামের কোনো সত্তারও অস্তিত্ব ছিল না। শিল্প তখন একটা সমসত্ত্বীয় জনগোষ্ঠীকেই প্রতিফলিত করত। লোকশিল্পের বহুক্ষেত্রেও এমন একটা উৎস থাকা অবশ্যই সম্ভব যার সাথে শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সেইসব উচ্চতর শিল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকশিল্পের আংশিক স্রষ্টা পল্লিবাসী মানুষগণ যারা বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে থাকেন, কিন্তু এর ব্যাপক অংশই সৃষ্টি হয়েছে জনপথে, যে পথে পার হয়ে গেছে নামহীন বিচিত্র যাযাবর, পরিব্রাজক, ধর্মপ্রচারক, ভবঘুরে ভ্রাম্যমাণ জাদুকর আর অভিনেতার দল।

এ পর্যন্ত কোনো লোকগীতি বা লোকনাটককেই যথার্থ প্রমাণিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। সময়ের সাথে সাথে তা রূপান্তরিত হয়ে গেছে, কখনো উন্নত হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রায়শই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে পড়েছে স্থূল, অশ্লীল। বেলাবারটোক হাঙ্গেরির লোকসংগীতের মধ্য থেকে বিকৃত এবং আরোপিত অংশগুলো বর্জন করে এর আদিরূপটি আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যে-কোনো দেশের লোকশিল্পের বেলাতেই এ প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে যদিও এ সন্দেহ মনে রাখতেই হবে যে কখনোই এর সঠিক আদিরূপটি উদ্ধার করা সম্ভব নয় কারণ রূপান্তরই লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে বেলাবারটোকের কৃতিত্ব এটুকুই যে তিনি সেইসব লোকসংগীত থেকে অশ্লীল, স্থূল আবেগময় আর কুরুচিপূর্ণ অংশগুলোকে ছেঁটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন যদিও সেসব উপাদানের অনেকগুলোই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

লোকসংগীতগুলোতে প্রায়শই দেখা যায় মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্যময় উপাদানের সাথে এমন কিছু উপাদান যুক্ত হয়েছে যা বস্তুত জনগণ এবং শাসকশ্রেণির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক থেকেই উদ্ভূত। এরকম একটা সুন্দর উদাহরণ রয়েছে ফ্র্যাজারের *The Golden Bough* গ্রন্থটিতে। সেই লোকসংগীতটিতে লক্ষ করা যায় প্রাচীন জাদুবিদ্যা ও রক্তবলির ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়েছে ভূস্বামী আর গ্রামীণ কৃষকের শ্রেণিদ্বন্দ্বের উপাদান—ফসলের মৌসুমে পোমেরানিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষকেরা রাস্তার উপর একগাছা দড়ি ফেলে প্রত্যেকটি পথচারীর পথ রুদ্ধ করে দেয়। পথিক দাঁড়িয়ে গেলে তাকে ঘিরে তারা একটা বৃত্ত রচনা করে এবং যার যার কাস্তেগুলি ধার দিতে থাকে। একসময় তাদের দলনেতা গেয়ে উঠে—

চাষিরা প্রস্তুত,
কাস্তেও শানানো
শস্য হবে সুপ্রচুর
ভদ্রলোককে এবার কাট।

পথিককে ঘিরে রেখে এরপর কাস্তে শানানো চলতেই থাকে। রমিন অঞ্চলের কৃষকেরা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। এ পর্যায়ে তারা বৃত্তের মাঝখানের ঐ আগন্তুককে উদ্দেশ করে বলে—

আমাদের খোলা তলোয়ার দিয়ে
ভদ্রলোককে কতল করব,
যা দিয়ে আমরা কাটি ফসল
আবার প্রভু আর রাজপুত্রের গলাও কাটি।
কৃষকেরা তো প্রায়শই তৃষ্ণার্ত থাকে,
তখন ভদ্রলোকেরা ব্র্যান্ডির যোগান দাও যদি
তবেই সব ঝামেলা চুকে বুকে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

> কিন্তু আমাদের প্রার্থনা না মানো যদি,
> তাহলে কাস্তেরও আঘাত করার অধিকার আছে,
> জেনে রেখো।

তিনটি উপাদান এখানে লক্ষ করবার মতো। প্রথমত, সম্ভাবনার আশায় মানুষ বলি দেবার প্রাগৈতিহাসিক জাদুবিশ্বাস যা তখনও পুঁজিবাদের আঘাতে বিনষ্ট হয়ে যায়নি; দ্বিতীয়ত, ভূস্বামী আর রাজপুত্রের কতল করবার গোপন বাসনা; তৃতীয়ত কৃষকদের উদ্যমহীনতা, সামান্য ব্র্যান্ডির বিনিময়ে বিক্রীত হয়ে যেতে প্রস্তুত থাকার মানসিকতা, বস্তুগত লাভের প্রতি নির্লজ্জ, কুশ্রী লোভ, যে মানসিকতাগুলোর নেপথ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে অতীতের বহু কৃষকবিদ্রোহের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা। লোকসংগীতগুলোতে এভাবেই দেখা যায় প্রাগৈতিহাসিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়েছে বহুবিধ সাম্প্রতিক উপাদান, সেগুলো কোনোটি জন্ম নিয়েছে গণসংগ্রাম আর বিদ্রোহ থেকে আবার কোনোটি জন্ম নিয়েছে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অবধারিত স্থূলতা আর অশিষ্টতা থেকে। অসীম বীরোচিত বিদ্রোহের সন্ধান মেলে রবিনহুডের গাথা কাহিনীতে, তেমনি চাপা ক্রোধ ফুটে ওঠে জার্মান লোকসংগীতের সেই দুঃখী Schwartenhal-এর গানে—

> তলোয়ারখানা হাতে তুলে নিই
> তারপর গুঁজি কোমরের খাপে।
> হায়, গোবেচারা আমি। আমাকেই হাঁটতেই হলো
> আমার তো কোনো ঘোড়া নেই।
> প্রশস্ত পথ ধরে
> অনেকটুকু হাঁটা হলো।
> এক ধনীপুত্তুর তখন দেখা দিল পথে,
> তার টাকার থালটা আমাকেই দিয়ে যেতে হলো।

ক্ষোভ সেই একগুঁয়ে বউটির গানেও—

> আমার বার্লি খেতে ভালো লাগে না
> সকালে ঘুম থেকে উঠতেও ভালো লাগে না আমার।
> কোনো ইচ্ছে নেই, তবু আমাকেই নাকি হতে হবে সন্ন্যাসিনী
> যারা চায় আমি আশ্রমে বন্দি হয়ে থাকি।
> তাদের সবার প্রতি আমার চরম অভিশাপ।

এগুলোর সবই ঐ 'Des Kneben Wunderborn' নামক সংকলনটিতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এর পাশাপাশি সে সংকলনে এমন ছড়াও রয়েছে যাতে প্রকট হয়েছে ফাঁকা অতীন্দ্রিয়বাদ, বঞ্চিত মানুষের অনুগত দাস মনোভাব, প্রভুর টেবিলের শুকনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুটির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। যেমন 'দ্য মিস্টিক রুট'-এর—

কী আশ্চর্য! এক শরীরে দুই আত্মা
ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, তিনি পরমাত্মা।
কিংবা 'সঙ আর ইটার্নিটি'তে
শোনো হে মানুষ, যতক্ষণ ঈশ্বর আছেন
নরকের যন্ত্রণা আছে ততক্ষণ
এবং আছে স্বর্গের আনন্দও।
হে অনিঃশেষ যন্ত্রণা, হে অনিঃশেষ আনন্দ।
আছে সুখী রাখালের গান—
এ পৃথিবীর কিছুই
তুল্য নয়
রাখালের আনন্দের সাথে।
সবুজ মাঠ
আর ফুলভরা বাগানেই
প্রকৃত আনন্দ
এ সত্যই জেনেছি আমি।

উপরোক্ত লোকসংগীতগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিগত এবং গুণগত মানের সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করলেই বোঝা যায় এগুলো মোটেও রোমান্টিক শিল্পীদের কথিত সেই সমন্বিত, একক কোনো পল্লি আত্মার সৃষ্ট নয়। এসব সংগীত বিভিন্ন শ্রেণিচেতনার এবং বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিদের দ্বারা তো বটেই, বিভিন্ন মাত্রার মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত। যুগযুগের অভিজ্ঞতায় জনগণ যা-কিছু আত্মস্থ করেছে এবং সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করেছে তার মধ্যে যেমন ভালো আছে, মৌলিক আছে, তেমনি কৃত্রিমও আছে। অতএব লোকশিল্প মাত্রই রসোত্তীর্ণ, চমৎকার রোমান্টিকদের—এহেন একতরফা, বিশ্লেষণহীন প্রশংসাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। যে মাপকাঠিতে আমরা অন্যান্য সকল শিল্পকে বিচার করে থাকি, সেই মাপকাঠিতেই লোকশিল্পকেও বিচার করব, বিচার করব এর সামাজিক উপাদান এবং শিল্পসৌকর্যের নিরিখে।

এছাড়া আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে, যুগ যুগ ধরে যে লোকশিল্প গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এসেছে, আধুনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন তাকে অনিবার্যভাবে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তাই বলে গণমানুষের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে না। আজকের বিশ্বের গণমানুষের নতুন আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে, নতুন বিষয়ে, নতুন আঙ্গিকে নতুনতর লোকশিল্প রচিত হবার সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশা দুইই দেখা দিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের তাদের মুক্ত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নিরন্তর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উন্মোচন করে চলেছে লোকশিল্পের নতুন নতুন দিগন্ত। আজকের গণমানুষের লোকসংগীত হিসেবে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে 'গণসংগীত' আন্তর্জাতিক সংগীত। বার্টোল্ড ব্রেখট বা হ্যান্স আইসলার তাদের মেধাবী প্রয়াসে যে উচ্চমানের সংগীত সৃষ্টি করেছেন তা-ই হয়ে উঠেছে আজকের সংগ্রামশীল মানুষের নতুন 'লোকসংগীত'। রোমান্টিক শিল্পীগণ যে সমসত্ত্বীয় জনগণের রহস্যময় লোকআত্মার কথা প্রচার করেছিলেন সেটা বিভ্রান্তিকর তো ছিলই উপরন্তু তা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাও পালন করেছিল। এধরনের ধারণার মধ্যদিয়ে জনগণের মধ্যে তারা যে 'সামাজিক সৌহার্দ্য' অন্তঃসারশূন্য, অমূলক বাণী প্রচার করেছিলেন তাতে প্রকারান্তরে শ্রেণিসংগ্রামের বোধকেই নিস্তেজ করে দেয়া হয়েছিল।

নানা ভঙ্গিতে, নতুন নতুনভাবে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে অস্থির, অতৃপ্ত রোমান্টিক প্রতিবাদ বস্তুত একটা অনাত্মীয় পরিবেশে শিল্পীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটা। অসাধারণ মেধা এবং ধৈর্যের সাথে এই বুর্জোয়াসমাজের লেখকেরাই নির্মাণ করেছিলেন 'বাস্তববাদের' মতো একটা শিল্পপদ্ধতি। সে পদ্ধতির মাধ্যমেই তারা সমাজের সকল দ্বন্দ্বগুলোকে স্বীকৃতি দিতে এবং প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সার্থকতা অর্জন করেছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকার সাহিত্য। দেখা যায় যেসব দেশে পুঁজিবাদ খুব দ্রুতলয়ে বিকশিত হয়েছে এবং বৈপ্লবিক চরিত্র ধারণ করেছে কিংবা সেসব দেশের সামাজিক পরিস্থিতি এতই বিপর্যস্ত ছিল যে, সেখানকার অতিষ্ঠ আপামর জনগণ তীব্র ক্ষোভ নিয়ে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে, সে সমস্ত দেশেই বাস্তববাদ অত্যন্ত দ্রুত এবং সার্থকতার সাথে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যবর্তী সামাজিক পরিস্থিতির দেশগুলোতে বাস্তববাদের বিকাশ ঘটেছে ধীরে লয়ে এবং দুর্বলভাবে. জার্মান এবং অস্ট্রিয়ার সাহিত্য তার প্রমাণ।

শিল্পের জন্য শিল্প

'শিল্পের জন্য শিল্প' আন্দোলনটিও রোমান্টিকতাবাদের সাথে সম্পর্কিত। বিপ্লব-পরবর্তী বুর্জোয়া বিশ্বে বাস্তববাদের সমসাময়িককালে এই আন্দোলনের জন্ম। মহান বাস্তববাদী কবি বোদলেয়ারই বস্তুত 'শিল্পের জন্য শিল্প' ধারণাটি গড়ে তুলেছিলেন; যে দাবির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল বুর্জোয়াদের স্থূল উপযোগিতাবাদ এবং অশ্লীল বেনিয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যে পুঁজিবাদী সমাজে সবকিছুই পণ্যে পরিণত হয় সেখানে শিল্পীসাহিত্যিকগণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারা কোনো পণ্য সৃষ্টি করবেন না। তাদের সে প্রতিজ্ঞাই জন্ম দিয়েছিল এ আন্দোলনের। তবে এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন প্রখ্যাত জার্মান প্রবন্ধকার ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (হিটলার-অধ্যুষিত জার্মান থেকে তিনি নির্বাসিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হন এবং ১৯৪০ সালে আত্মহত্যা করেন) বোদলেয়ারের কাব্য-পর্যালোচনায় তিনি লিখেছিলেন—

"পণ্যের চরিত্র সম্পর্কে বোদলেয়ারের সবিশেষ জ্ঞান তাকে বাধ্য করেছিল পণ্য বাজারকে তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। সাহিত্যের বাজারে একটা যুৎসই আসন করে নিতে হলে অন্যান্য প্রতিযোগী সাহিত্যিকদের যে হটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে একথা তিনি ভালোই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বাজারের অন্যান্য কবিতাকে ম্লান করে দেবার লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের কবিতাকে নানারকম চাতুর্যে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিলেন।"

এ যুক্তির বিপক্ষে বোদলেয়ার সম্পর্কে আমার নিজের একটা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি—

"আত্মতুষ্ট বুর্জোয়াদের অশ্লীল জগতের বিরুদ্ধে বোদলেয়ার নির্মাণ করেছিলেন 'পবিত্র সৌন্দর্য'। কেবল ভণ্ড পাণ্ডুর নন্দনতাত্ত্বিকরাই বলতে পারে যে 'সৌন্দর্য' বাস্তব থেকে পালানোর উপায় কিংবা একধরনের স্থূল মোহাচ্ছন্নতা। বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিলেন তা যেন দৃঢ়, বিশাল এক পাথরের প্রতিমূর্তি, যেন অঞ্চল ভাগ্যের ঈশ্বরী। তাঁর কবিতা যেন আগুনের তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা অভিশাপের দেবদূত; যে দেবদূত ক্রোধান্বিত চোখে অভিসম্পাত দিচ্ছেন কুৎসিত, অমানুষ-অধ্যুষিত এই জগৎকে। এ কবিতার উজ্জ্বল নগ্নতার সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ে সমাজের প্রচ্ছন্ন দারিদ্র্য, গোপন রোগ আর নেপথ্যে মিথ্যাচার। যেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে, 'সৌন্দর্য' তার বিচার করছে আর ইস্পাত-দৃঢ়তায় ঘোষণা করছে রায়।"

তবে বেঞ্জামিনের নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি মনোযোগের দাবি রাখে। তিনি লিখেছিলেন—

"বোদলেয়ার প্রথম অনুধাবন করেছিলেন যে বুর্জোয়াবিশ্ব ক্রমশ তার ফরমায়েশি খাটার দায়িত্বভার শিল্পীদের হাত থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এ অনুধাবন সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলে শিল্পীরা এখন কার ফরমায়েশ খাটবেন? শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এখন আর কোনো বিশেষ শ্রেণি রইল না, বাঁচার জন্য এই বিনিয়োগ বাজারই তাই এখন শিল্পীর কাছে সবচেয়ে সম্ভাব্য আশ্রয়। বোদলেয়ার কোনো তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ছিলেন না বরং তার আগ্রহ ছিল সুপ্ত দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ায়। কিন্তু এই প্রত্যাশাটি যে পণ্যবাজারে পরিপূর্ণতা লাভ করবে সে বাজারের চরিত্রই কবির উপর এমন এক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এবং জীবনযাত্রার ধরন দিয়েছিল যা ছিল তার পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেবার মতো কোনো সম্মান যে সমাজের হাতে ছিল না, বোদলেয়ার সে সমাজের কাছে কবির সম্মান দাবি করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ বক্তব্যের মূল কথাটি এই যে, বুর্জোয়াসমাজ তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই বোদলেয়ারের শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে সমর্থ ছিল না এবং তিনি একটা আকারহীন, নামহীন বাজারের জন্য লিখে চলেছিলেন, যে অর্থে তা 'শিল্পের জন্য শিল্প' কিন্তু এর পিছনে তিনি একজন অচেনা পাঠক বা বাজারি ক্রেতাকে যে প্রত্যাশা করতেন সেকথাও সত্য। বোদলেয়ারের বহু উক্তিই তার স্ববিরোধী মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে যা আমার এবং বেঞ্জামিন উভয়েরই যুক্তি প্রমাণ করবে। একদিকে তিনি তীব্র, উগ্রভাবে বুর্জোয়া পাঠকের মনকে তছনছ করে দিতে চেয়েছেন আবার এ সমাজের আতঙ্কের প্রতি একধরনের আকর্ষণও বোধ করেছেন। বোদলেয়ার বাস্তবতার প্রতি সুতীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন যেমন, তেমনি আবার লিখেছেন 'অসুখের অভিজাত আনন্দের' কথা। তাঁর 'অভিজাত আনন্দ' আসলে সৌন্দর্য নিয়ে ঘৃণ্য বুর্জোয়া মনকে ভয় দেখানোর একটা কৌশল, যেন তিনি অত্যাচার করবার জন্য চকচকে সুন্দর কোনো অস্ত্র দেখাচ্ছেন। তিনি বুর্জোয়া ক্রেতাদের জন্য রচনা করতে অস্বীকার করেছিলেন অথচ সাহিত্যের বাজারকেই তার যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মৌলনীতি যে 'উৎপাদনের জন্য উৎপাদন' তা মার্কস আমাদের জানিয়েছেন, অনুরূপ ধারণাপুষ্ট নীতিই হলো 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' কিংবা 'শিল্পের জন্য শিল্প'। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের ধারকেরা, বুর্জোয়াদেরই মূলনীতি 'উৎপাদনের জন্য উৎপাদন' স্বীকৃতি দিয়ে সেই বুর্জোয়াদেরই প্রভাবমুক্ত হবার ব্যর্থ এবং বিভ্রান্তিকর চেষ্টা চালিয়েছেন।

রোমান্টিক প্রতিবাদের উপাদান এবং তাদের বিদ্রোহের তীক্ষ্ণতা বোদলেয়ারের কবিতায় ছিল সুস্পষ্ট। নোভালিস রোমান্টিকদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, বোদলেয়ারের শিল্পভাবনায় বারবার তার পুনরুত্থান ঘটেছে। রোমান্টিকতাবাদের মূলনীতি ঘোষণা করতে গিয়ে নোভালিস লিখেছিলেন—"এ কবিতা কেবল সুরেলা আর নান্দনিক শব্দের সমাহার...স্বল্প কিছু কবিতাই কেবল বোধগম্য"। এ নীতি কবিতায় সগৌরবে চর্চা করেছিলেন শিল্পের জন্য শিল্পের সোচ্চার সমর্থক মালার্মে। হুগো ফ্রেডেরিক তাঁর 'আধুনিক কবিতার গঠন প্রকৃতি' গ্রন্থে মালার্মে সম্পর্কে লিখেছিলেন—"মালার্মের গীতিকবিতাগুলো পূর্ণাঙ্গ একাকিত্বেরই রূপায়ণ। খ্রিস্টীয়বোধ, মানবতাবোধ বা সাহিত্যের ঐতিহ্যবোধ কোনোকিছুর ব্যাপারেই এ কবিতার কোনো আনুগত্য নেই। বর্তমানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ কবিতা পাঠককে দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং কখনোই মানবিক হয়ে উঠতে চায় না।"

হুগোর মতে মালার্মে সা[illegible] গঠ[illegible] বা প্র[illegible] থেকে মু[illegible] হতে চেয়েছিলেন। মালার্মে লিখেছিলেন—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"অন্যের চোখে আমার কবিতাগুলো দিগন্তে ভাসমান মেঘদল অথবা অর্থহীন তারার মতো। কবিতা থেকে বাস্তবতার সামান্য ছোঁয়াও মুছে ফেলা উচিত কারণ তা নেহাতই সাধারণ। কেবল অসম্ভবের দিকে দৃষ্টিপাত করে রহস্য নির্মাণ কবির একমাত্র লক্ষ্য।"

এভাবে মালার্মে কবিতা থেকে অনুভবযোগ্য সকল বাস্তবতাকে বর্জন করেছিলেন, বোদলেয়ারের এই প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি এ কবিতায়। বিদ্রোহ পরিণত হয়েছিল নীরব পলায়নে। বোদলেয়ারের কবিতার সেই মৃত্যু-আহ্বান বা অদৃশ্যে ঝাঁপ দেবার মধ্যে নতুন এবং অজানার একটা প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু মালার্মের কবিতা যেন ভৌতিক পর্দায় ঢাকা নিরেট এক শূন্যতা, এ কবিতা নোভালিসের প্রিয় সেই মায়াবী জগৎও নয়। এ কবিতার জগৎ এমনই বরফশীতল যেখানে কোনো মায়াবী জীবেরও অস্তিত্ব নেই। 'শিল্পের জন্য শিল্প' চর্চা তাঁর হাতে পর্যবসিত হয়েছিল শূন্যতার চর্চায়। 'শিল্পের জন্য শিল্প' আন্দোলন চূড়ান্ত স্তরে পৌছেছিল মালার্মের মরিয়া আবেগে, হেরেডিয়ার সূক্ষ্ম গীতিকবিতায়, পরিশেষে স্তেফান জর্জের অভিজাত ঘৃণায়। পরবর্তীকালে তাঁরা গুটিকয় শিষ্য-পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ বৃত্তে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সাধারণ জনগণের ঊর্ধ্বে একক ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

ইম্প্রেশনবাদ

ইম্প্রেশনবাদও (Impressionism) একটা বিদ্রোহ। প্রাতিষ্ঠানিক এবং কেতাবি শিল্পকর্মের আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে কতিপয় প্রতিভাবান শিল্পীর বিদ্রোহ। উনিশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সের যে চিত্রকর্মগুলো বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল সে চিত্রকর্মগুলোর সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ফ্রান্সিস জরডাইন। তিনি এই সংকলনটির নাম দিয়েছিলেন 'বিশ বছরের মহৎ চিত্রকলা অথবা নির্বুদ্ধিতার অনুশীলন'। সংকলনটিতে পুরস্কৃত সেইসব শিল্পীর নামের পাশাপাশি সমসাময়িক আরও কতিপয় শিল্পীর নামের একটা তালিকা যুক্ত হয়েছিল যারা তৎকালীন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা পুরস্কার লাভ করেননি। লক্ষ করুন, স্বীকৃতিহীন শিল্পীর সেই তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন—দেগা, সিসেলি, পিসারো, মানে, রেনোয়া, সেজান, রুশো, গঁগা, লুত্রেক, বোনার্ড, মাতিস, রোয়া এবং ড্যাফি। কিন্তু কী আশ্চর্য, উল্লেখিত এই শিল্পীদের শিল্পকর্মই কালোত্তীর্ণ হয়েছে, আজ তারাই সেকালের চিত্রকলার যথার্থ প্রতিনিধি। অথচ বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেছে পুরস্কৃত সেইসব আত্মম্ভরী শিল্পীদের নাম। তাদের চিত্রকলা আজ কেবল আত্মতুষ্ট ধৃষ্টতা আর উঁচুদের ভণ্ডামির প্রমাণ হিসেবেই স্মরণযোগ্য। পুরস্কৃত সেই চিত্রগুলোতে রয়েছে কিছু গুমোট ঐতিহাসিক ক্যানভাস, রয়েছে কিছু হালকা আমুদে দৃশ্য—অভিবাদনরত নির্ভীক সৈনিক, শিশিরের মতো পেলব ত্বকের নগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রমণী, পদমর্যাদায় উদ্ভাসিত বিনম্র রাজকর্মচারী, লজ্জাবনতা নারী কিংবা ক্রুশবিদ্ধ বেদনাহত সন্ন্যাসী।

এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলাগুলোর ফাঁকা ধ্রুপদীত্ব, বাতিল বিষয়ের উপর চুরি করে চাপানো পুরনো আঙ্গিক, ফরমায়েশি আদর্শবাদিতা আর অশ্রুসিক্ত ভুয়া আবেগের চর্চা ছিল ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের বহুবিধ বিতৃষ্ণাজনক কর্মকাণ্ডগুলোরই উপাদান বিশেষ। নগ্ন বাণিজ্যের বেশ্যাবৃত্তিতে যে সমাজে তখন সকল প্রকার সম্ভ্রমই ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল সে সমাজে দাঁড়িয়ে এই শিল্পীগণ মিথ্যা আর অন্তঃসারশূন্য বুলিতে ভণ্ড আহ্বান জানাচ্ছিলেন ধ্রুপদী আর রেনেসাঁর সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যকে। এ ভণ্ডামি শুধু শিল্পকলার ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তখন লক্ষণীয় ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদরা তখন রবিবাসরীয় বিকেলে তাদের 'স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের' তিনরঙা বিপ্লবটি, ন্যাপকিনের মতো শরীরে জড়িয়ে বসেছেন। চিত্রকরদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল কেবল নির্লজ্জতার মাত্রায়। চিত্রকরগণ দর্শকের দৃষ্টিকে তখন সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যই বস্তুত ধ্রুপদী ভঙ্গি ধার করে চলেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক সেইসব বীর শিল্পীগণ টিসিয়ান আর রোসেঁকে বলতেন একঘেয়ে, তাদের ঠোঁটে সর্বক্ষণ লেগে থাকত 'সৌন্দর্য' আর 'মহত্ত্বের' বুলি এবং অন্যান্য সকল শিল্পীকে তারা বলতেন 'ক্ষয়িষ্ণু' অথচ কার্যত তারাই ছিলেন সবচেয়ে লজ্জাজনক অবক্ষয়ের উদাহরণ। কারণ যে বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে এইসব শিল্পী এমন ভাব করেছিলেন যেন সবকিছুই ঠিকঠাক আছে এবং শিল্পীদের দায়িত্ব এখন কেবল ধ্রুপদী চিত্রকলার আলংকারিক সাজসজ্জাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা যা ছিল তৎকালীন শিল্পীগণের সমকালীন অভিজ্ঞতারই বেগবান মৌলিক প্রকাশ। একজন শিল্পীর চেতনায় এরচেয়ে বেশি আর কী অবক্ষয় ঘটতে পারে?

ঐতিহ্যবাহী লতাগুল্মে গোপন অঙ্গ ঢাকবার চেষ্টায় রত, পদক শোভিত এইসব শিল্পের কৃত্রিমতা আর শঠতার বিরুদ্ধেই ছিল ইম্প্রেশনবাদের বিদ্রোহ। শিল্পী কুর্বে, যিনি পরে প্যারিস কমিউনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁকে দেয়া রাষ্ট্রীয় সম্মান যখন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রাষ্ট্রের শিল্পকলা মন্ত্রীকে পাঠালেন তাঁর গর্বিত প্রত্যাখ্যানপত্রটি বস্তুত তখনই সূত্রপাত ঘটল এই বিদ্রোহের। তিনি লিখেছিলেন—

"কোনো অবস্থাতেই আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করতাম না আর আজকের পরিস্থিতিতে তো প্রশ্নই উঠে না। আজ সর্বব্যাপী কেবল বিশ্বাসঘাতকতা, মানুষের মন আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বার্থপরতায়। এ অবস্থায় যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আমাকে দেয়া হচ্ছে, আমার শিল্পীচেতনা তা গ্রহণে প্রস্তুত নয়। আমি মনে করি এ রাষ্ট্র শিল্পবিষয়ে রায় দেবার যোগ্য নয়।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুর্বে তাঁর চিঠিতে আরও লিখেছিলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান শিল্পীর মৃত্যুরই শামিল। এ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক চিত্রকলার বিরুদ্ধে রীতিমতো এক যুদ্ধঘোষণা। কুর্বে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানকে উপেক্ষা করে, রাজমিস্ত্রির কর্নিকের মতো দৃঢ়মুষ্টিতে ব্রাশকে আঁকড়ে ধরে, স্বচ্ছন্দে এঁকেছেন সাধারণ কৃষক শ্রমিকের ছবি, এঁকেছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল, ফল। তিনি ইম্প্রেশনবাদী ছিলেন না কিন্তু তিনি মিউজিয়ামের দেয়াল ডিঙিয়ে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বরণ করেছিলেন তরতাজা রঙ আর আলোর ভুবনকে, আটপৌরে মানুষের জীবনযাত্রাকে তুলে এনেছিলেন ক্যানভাসে। তাঁর এই প্রবণতাগুলোই পরবর্তীকালে সুগম করেছিল ইম্প্রেশনবাদের পথ। সেজান কুর্বে সম্পর্কে বলেছিলেন—

"তিনি একজন রুদ্র রাজমিস্ত্রি, রঙের কারিগর। এ শতাব্দীতে তাঁকে অতিক্রম করবার মতো কেউ নেই। তিনি জামার হাত গুটিয়ে, কানের উপর টুপি উঠিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন ভেন্দম স্তম্ভ। তাঁর ব্রাশের আঁচড় ধ্রুপদী ঢঙের। তিনি গভীর, নির্মল, শান্ত। তাঁর নগ্নিকাগণ পাকা শস্যের মতো স্বর্ণাভাময়, তারা আমাকে উন্মাদ করে তোলে। তাঁর রঙেও শস্যের ঘ্রাণ লেগে থাকে। আহ্ সেই রমণীগণ! এই বিস্তার, এই সুখকর বিলাসব্যসন, এই বিশ্রাম 'মানে' ও তার 'ডেজুনে' ছবি আমাদের দিতে পারেননি।"

কুর্বে ছিলেন প্রকৃতি আর সাধারণ মানুষের চিত্রকর। তাঁর অনুগামী ইম্প্রেশনবাদী শিল্পীরাও এমনিভাবে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষ আর সমকালীন নানাবিধ বস্তুকে চিত্রে রূপ দেবার নেশায়। বোদলেয়ার আর জোলার বন্ধু মার্জিত, রুচিশীল মানেও একপর্যায়ে নগরপ্রধানকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, হোটেল ভিলির মিলনায়তন কক্ষটি প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিকচিত্র দিয়ে ঢেকে না রেখে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়, যেমন বাজার, রেলস্টেশন, জনাকীর্ণ পার্ক ইত্যাদির চিত্র দিয়েই সজ্জিত করা উচিত। সাহিত্যের স্বাভাবিকতাবাদের সমসাময়িক চিত্রকলার ইম্প্রেশনবাদীরাও তাদের চোখ ফিরিয়েছিলেন বর্তমানের বাস্তব জগতের দিকে, চিত্রের বিষয় হিসেবে তুলে এনেছিলেন নেহাত শাদামাটা বস্তুকে, এমনকি কুৎসিতকেও। 'মানে' তাই বলেছিলেন—

"শিল্পীরা আজ বলেন না যে 'এই দেখুন একটা নিখুঁত কাজ'। তাঁরা বলেন 'এই দেখুন একটা আন্তরিক কাজ'। এই আন্তরিকতাই ছবিটিকে একটা প্রতিবাদী চরিত্র দান করে। যদিও শিল্পী হয়তোবা শুধুমাত্র তার অনুভবকেই ছবিতে ধারণ করেছেন।"

'মানে' আরও বলেছিলেন, তিনি যদিও এই প্রতিবাদী প্রবণতার সাথে একাত্ম হতে প্রস্তুত নন তবু এ ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের এবং তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়াই তাঁকে বাধ্য করেছে এ ধরনের অনুদারতার বিপক্ষে দাঁড়াতে। ১৮৪২ সালে ক্লদ মানে, সালোন ডে রিফিউজে একটা প্রদর্শনী করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'Spiel Impression'। এ প্রদর্শনী কেতাবি সেইসব শিল্পীদের নির্বোধ ক্রোধকে আরও উসকে দিয়েছিল। নতুন আন্দোলনের বিদ্রোহী চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখনই।

কিন্তু ইম্প্রেশনবাদের মধ্যেও ছিল স্ববিরোধিতা। এই আন্দোলনকে যে প্রতিভাধর শিল্পী একই সাথে শীর্ষ এবং সমাপ্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই পল সেজান, এই স্ববিরোধ সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। অতীতের মহৎ শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—

"তাঁরা ছবির প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে ধ্যানস্থ হতে পারেন। সমগ্র ছবিটিই আপনাকে অনুসরণ করবে। ছবির যে-কোনো সূক্ষ্ম কাজেই মনোনিবেশ করুন, মনে হবে সেখান থেকে আপনি সমগ্র ছবিটির সুর শুনতে পাচ্ছেন। ছবির সমগ্র থেকে কোনো অংশবিশেষকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।। তাঁরা আমাদের মতো খণ্ড খণ্ড অংশে কাজ করেন না।"

এবং দেলাক্রোয়ার Femmes d' Alger ছবিটির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—'এই দেলাক্রোয়া নামের মানুষটির মধ্যেই আমাদের সকলকে খুঁজে পাওয়া যাবে...। সবকিছু সংযুক্ত, সমগ্র থেকে নির্মিত।' সেজান অনুধাবন করেছিলেন, এখন কেবলই 'জোড়াতালি'র কাজ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অতীতের সেই মহৎ ঐক্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে, যেমন শিল্পে তেমনি সমাজজীবনেও। কিন্তু এই ভাঙনের বিরুদ্ধে একমাত্র দেলাক্রোয়াই তখনও অন্তরে বিদ্রোহের শিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর রোমান্টিক বেদনা মানবিকতার সংগ্রামের বিপুল আবেগকেই প্রকাশ করেছিল। দেলাক্রোয়াই ছিলেন শেষ শিল্পী যাঁর মধ্যে মানুষকে একটা সামগ্রিক সত্তায় দেখবার রেনেসাঁয় প্রত্যাশা সবচেয়ে মৌলিক এবং প্রবলভাবে জাগরূক ছিল। বোদলেয়ার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—

"দেলাক্রোয়ার ছবিগুলো দেখে মনে হয় এ যেন মানুষের মহত্ত্ব আর ভাবাবেগের স্মৃতিচারণা...। একটি ভালো ছবিকে এই বিশ্বপ্রকৃতির মতোই গড়ে তুলতে হয়। দেলাক্রোয়ার প্রতিভা এই যে, তিনি ক্ষয়কে চেনেন না, কেবল প্রগতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তিনি কখনোই তার বিপ্লবী উৎসকে ভুলে যাননি।"

এরপর দেলাক্রোয়া এবং স্তাঁদালের মধ্যে একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন বোদলেয়ার। এঁদের দুজনের মধ্যেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল সম্ভ্রম, বিদ্রোহ আর রোমান্টিকতার চেতনা। এঁদের মধ্যে একইসাথে, ভাবাবেগ আর যুক্তি, ব্যক্তিগত অহম আর সামাজিক সচেতনতা, অনুভবের উত্তাপ আর আঙ্গিকের কঠোরতা মিলেমিশে সৃষ্টি করেছিল এক উত্তেজনাকর ঐক্য। দেলাক্রোয়ার মধ্যদিয়েই এই ঐক্যের সমাপ্তি ঘটে, শুরু হয় সেজান-কথিত সেই খণ্ডিত শিল্পের জগৎ। নব্য এই ইম্প্রেশনবাদী নীতিকে বহুবার সূত্রবদ্ধ করেছিলেন সেজান—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"শিল্পী তার ধারণকৃত অনুভূতিগুলা রেকর্ড করার একটা যন্ত্রমান। কোনো তত্ত্বকথা নয়, শুধু কাজ। তত্ত্বকথা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আমরা হলাম ঝলমলে বিশৃঙ্খলা। আমি আমার ভাবনার সামনে এসে দাঁড়াই এবং তাতেই বিলীন হয়ে যাই। সত্যিই আজও কেউ যথার্থ ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে পারেনি। মানুষের উপস্থিতি নয়, উচিত তাকে ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে দ্রবীভূত করে নেয়া। বুদ্ধের সেই মহান আবিষ্কার—নির্বাণের মতো, আবেগহীন, ঘটনাহীন, উপশম। ইম্প্রেশনবাদ কাকে বলে? এ হলো রঙের আলোকবিজ্ঞানসম্মত মিশ্রণ। বোঝা গেল? ক্যানভাসের উপর রঙকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া আবার চোখের মধ্যে তাকে পুনর্মিলিত করা। মনে রেখো চিত্রকরের পক্ষে সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই। (যদিও দেলাক্রোয়া অত্যন্ত আবেগের সাথে সাহিত্যের সাথে যুক্ত ছিলেন) রঙ ছাড়া ছবি আর কিছুই প্রকাশ করে না, করা উচিতও নয়। (যেমন মালার্মে বলেছিলেন কবিতা ভাবনা নয়, শুধু কিছু শব্দকে ধারণ করে।)"

ইম্প্রেশনবাদ জগৎকে আলোয় দ্রবীভূত করে, রঙে বিভক্ত করে এবং একে একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরম্পরা হিসেবে ধারণ করে ক্রমান্বয়ে অধিকহারে বিষয় আর বিষয়ীর জটিল, ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কটিকেই প্রকাশ করে চলেছিল। একাকিত্বে নিমজ্জিত, আত্মকেন্দ্রিক কোনো ব্যক্তির কাছে এ জগৎ, স্নায়ুকে উত্তেজিত করার উপাদান, ভাবনা আর মেজাজের উৎসস্থল এবং ঝলমলে বিশৃঙ্খলা। তার কাছে এসবই 'আমার' অনুভূতি, 'আমার' অভিজ্ঞতা, চিত্রকলার ইম্প্রেশনিজমের সাথে সাদৃশ্যে রয়েছে দর্শনের পজিটিভিজমের। পজিটিভিজমেও করা হয়েছে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো জগৎ নেই, আমার অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ কোনো বস্তুজগৎকে তারা স্বীকার করেননি। এভাবেই ইম্প্রেশনবাদের বিদ্রোহের উপাদান আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সংশয়বাদী, অস্পষ্ট, সংগ্রামহীন ব্যক্তিত্ববাদিতায়। শিল্পী এখানে নেহাতই একজন পর্যবেক্ষক মাত্র! নিজের অনুভূতি ছাড়া জগতের অন্য কোনো ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, এ জগৎকে পরিবর্তন করবারও কোনো স্পৃহা নেই। তার কাছে একটি রক্তপাতের ঘটনা কেবল কিছু লাল রঙের ছড়াছড়ি, একটা লাল রঙের পতাকা গমক্ষেতে ফুটে থাকা কোনো পপিফুলের মতোই সাধারণ, স্বাভাবিক।

ইম্প্রেশনবাদ আন্দোলন তাই এক অর্থে সমাজের অবক্ষয়, মানববিবর্জন আর বিখণ্ডীকরণেরই লক্ষণ। সেসাথে একথাও সত্য যে ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত পুঁজিবাদের দীর্ঘকালীন যে 'বদ্ধ যুগ' অতিবাহিত হয়েছে সেসময় এই ইম্প্রেশনবাদ আন্দোলনই ছিল বুর্জোয়া শিল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল সাফল্য, সোনালি শরৎ, শিল্পীদের পাওয়া সবচেয়ে উচ্চতর প্রকাশ পদ্ধতি। অন্তর্দ্বন্দ্বের এ দুটো দিকই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ইম্প্রেশনবাদের প্রতি আমরা যদি যথার্থ সুবিচার করতে চাই তবে যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর সমাজপ্রভাবিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে, তেমনি সম্মান করতে হবে এর অক্ষয় সাফল্যগুলোকেও।

স্বাভাবিকতাবাদ

সাহিত্যের স্বাভাবিকতাবাদ (Naturalism) আন্দোলনটির বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদের মাত্রা ছিল ইম্প্রেশনবাদের চেয়েও তীব্র। অবশ্য এ আন্দোলনও ছিল সেই একই অন্তর্বিরোধে আক্রান্ত। যে নির্বোধ সাহিত্যিকগণ তখন তাদের সাহিত্যকর্মকে বাস্তববাদী নামে চালিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, তাদের সাথে এই সাহিত্যকর্মের পার্থক্য, সেইসাথে বাস্তববাদের একটি বিশেষ এবং বিদ্রোহী রূপকে বর্ণনা করার জন্য জোলা এই সাহিত্য-আন্দোলনকে 'স্বাভাবিকতাবাদ' নামে অভিহিত করেছিলেন। অবশ্য স্বাভাবিকতাবাদের প্রকৃত উদ্‌গাতা ছিলেন ফ্লবেয়ার যার *মাদাম বেভেরি* গ্রন্থটিই এই নতুন আন্দোলনের যথার্থ পথপ্রদর্শক। জোলা লিখেছিলেন—

"আমরা সকলে সাহিত্যে যে সত্য এবং যথার্থ শব্দটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম তার আবির্ভাব ঘটালেন ফ্লবেয়ার। *মাদাম বেভোরি* গ্রন্থটিই সুস্পষ্ট এবং নিখুঁতভাবে এই নতুন ধারার সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী মডেল।"

একথা ভেবে সহসা বিস্মিত হতে হয় যে বোদলেয়ারের মতো সৌন্দর্যপ্রেমী ফ্লবেয়ার কী করে প্রাদেশিক পেটিবুর্জোয়াদের স্থূল, অসাড় জীবনের মতো এমন একটা পীড়াদায়ক প্রসঙ্গকে তাঁর উপন্যাসে এত যথার্থতা এবং শৈল্পিক একনিষ্ঠতায় উপস্থাপিত করলেন। তবে তাঁর Impassibilete-এ বুর্জোয়াসমাজের স্থূলতা, মূর্খতা এবং সংকীর্ণতার প্রতি সেই একই ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে, যে ঘৃণায় বোদলেয়ার এ সমাজকে বিচারের কাঠগড়ায় তলব করেছিলেন তাঁর সুন্দর কবিতাসমূহে। ফ্লবেয়ার জর্জ স্যান্ডকে লিখেছিলেন—

"কোনো বিষয়ে মতামত দেয়ার অধিকার শিল্পীর নেই। ঈশ্বর কি কখনো কোনো মতামত দিয়েছেন? আমি মনে করি মহৎ শিল্প হবে বৈজ্ঞানিক এবং নৈর্ব্যক্তিক। আমি ভালোবাসা, ঘৃণা, করুণা, ক্রোধ কিছুই চাই না। ন্যায়বিচারকে শিল্পে অন্তর্ভুক্ত করার এটাই কি সঠিক সময় নয়? সাহিত্যে বর্ণনার নিরপেক্ষতা তখন আইনের মর্যাদার তুল্য হবে।"

এই আপাত নিরপেক্ষতা জন্ম দিয়েছে সমগ্র বুর্জোয়াসমাজের প্রতি এক সুতীব্র ঘৃণার। ফলে ডান, বাম, দোকানি, কাজের মানুষ সকলের প্রতিই জন্মেছে বিতৃষ্ণা। মানুষ এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই ঘটেছে মোহমুক্তি।

"মানুষের নিরন্তর এই বর্বরতা আমাকে বেদনার অন্ধকারে ভরিয়ে তোলে...আমার সমসাময়িকদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আমাকে অতীতের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করে।"

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং—

"শিল্পীর কাছে করণীয় একটা কাজই রইল, তা হলো নিজের সবকিছুকে শিল্পের জন্য উৎসর্গ করা। জীবনকে কেবল একটা প্রক্রিয়া হিসেবেই শ্রদ্ধা করতে হবে, অন্য কারণে নয় এবং সর্বপ্রথম বাতিল করতে হবে নিজেকে। পৃথিবীরও একটা সীমানা আছে কিন্তু মানুষের মূর্খতা সীমাহীন।"

এই হতাশ, হতোদ্যম কণ্ঠস্বর মাদাম বেভোরির। বেভোরি রোমান্টিক হিস্টিরিয়ার এক কল্পজগতে পালাতে চায়, কিন্তু পরিবেশ তাকে মুক্তি দেয় না, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে নির্মম বন্ধনে। এই মেধাবী, নির্দয় উপন্যাসটি স্বাভাবিকতাবাদের আদর্শ উদাহরণ।

বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের এই মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন জোলা। যদিও তিনি একথাও বলেছিলেন যে 'জগতের পক্ষাপাতহীন অনুশীলন কাঙ্ক্ষিত নয়, কার্যত তা অসম্ভবও বটে'। তিনি বলেছিলেন—'আমাদের শতাব্দী বিজ্ঞানের শতাব্দী। লেখক অবশ্যই ডারউইন আর ক্লদ বার্নার্ড-এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ব্যবহার করবেন লেখায়, প্রয়োগ করবেন বিবর্তন মতবাদ, পরিবেশের প্রভাবের নীতিমালা, বংশের প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্ব'। জোলা, মার্কস-এঙ্গেলসকে জানতেন না, তাই তিনি উল্লেখ করেননি শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বের কথা, অনুধাবন করেননি সমাজ বিকাশের শর্ত। তাঁর কাছে মানুষ ছিল বংশ আর পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত, ভাগ্যতাড়িত নিষ্ক্রিয় একটা প্রাণী বিশেষ। মানুষ তাঁর কাছে বিষয় নয়, বরং বিরাজমান পরিবেশের একটা উপাদান মাত্র। ব্যাপারটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় 'খাঁটি কবিতার' প্রতিনিধি মালার্মে 'দি কলার' উপন্যাসে লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতাকে খুব প্রশংসা করে উপসংহার লিখেছেন—"আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন সৌন্দর্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকাশ হয়ে উঠেছে সত্য।" এভাবেই স্বাভাবিকতাবাদ এবং শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদের প্রবল বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গোপন একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

জোলা সামাজিক যন্ত্রণাকে সর্বাঙ্গীণ নিষ্ঠুরতায় উন্মোচন করেছিলেন, নগ্ন করেছিলেন সমাজের সকল গোপনতা; তথাপি দীর্ঘদিন তিনি কোনো রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে ছিলেন অস্বীকৃত।

"আমরা এখন কেবল বিশ্লেষণ করতে পারি, সিদ্ধান্তে আসবার সময় এখনও আসেনি। সে দায়িত্ব তো আইনকর্তার। তিনি এসব ভাবুন এবং সবকিছু ঠিকঠাক করবার ব্যবস্থা করুন। এ ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই।"

বহুদিন পরে Dreyfus এবং তাঁর চমৎকার J' accuse-এর পর জোলার ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। তখন তিনি যে মতামত প্রকাশ করেন তাতেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক

~ www.amarboi.com ~

বাস্তববাদের পূর্বাভাস। তিনি তখন বলেছিলেন—‘আগামীকালের উত্তরণের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আজকের সমাজের অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা উচিত’। এই পর্যায়ে পৌঁছেই তিনি সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করে তার নোটবইয়ে লিখেছিলেন—

“শাসকশ্রেণি হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখবার জন্য এবং পুঁজিবাদী সুবিধাগুলো রক্ষা করবার জন্য বুর্জোয়াসমাজ আজ তার বৈপ্লবিক অতীতকে বিদ্রূপ করছে। ক্ষমতা যখন একবার কুক্ষিগত হয়েছে তখন কিছুতেই তাকে তারা জনগণের কাছে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত নয়। আর তাই বুর্জোয়াসমাজ নির্ঘাত একদিন ফসিলে পরিণত হবে। এ সমাজ ক্রমশই প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা আর সামরিকতন্ত্রের শংকরে পরিণত হচ্ছে। আমি বারবার বলব বুর্জোয়া সম্প্রদায় ফুরিয়ে গেছে, ক্ষমতা আর সম্পদ রক্ষার স্বার্থে তারা এখন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কেবল জনগণের হাতে এবং ভবিষ্যৎকালেই নিহিত রয়েছে যা কিছু আশা।”

বুর্জোয়াসমাজের এই ক্ষয়, সাধারণ মানুষের এই দুর্ভাগ্য, পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণির প্রতিরোধ ইত্যাদি সবকিছুকেই জোলা চিত্রিত করেছিলেন তাঁর উপন্যাসে কিন্তু কোনো সমাধানের আশা তিনি পোষণ করেননি, সবকিছু তিনি লিখেছিলেন দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা নিয়ে, যে স্বপ্ন ভাঙবার নয়। সামাজিক অবস্থার এই পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যথার্থ চিত্রণের পাশাপাশি এ অবস্থার পরিবর্তনশীলতার প্রতি অনাস্থা যুগপৎ স্বাভাবিকতাবাদের শক্তি ও দুর্বলতা। এখানেই এ আন্দোলনের স্ববিরোধ। কিন্তু একসময় একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায় উপস্থিত হয় যখন স্বাভাবিকতাবাদকে হয় সমাজতন্ত্রের পক্ষ নিতে হবে নয়তো প্রতিষ্ঠা করতে হবে অদৃষ্টবাদ, রহস্যবাদ, ঈশ্বরনিষ্ঠতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ। জোলা গ্রহণ করেছিলেন প্রথম পথটি কিন্তু তাঁর সহযোগীদের অনেকেই গিয়েছিলেন দ্বিতীয় পথে। কমিউনের ভয়ে ভীত টাইন হয়েছিলেন ধর্মবিশ্বাসী শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। উজেমানস প্রথমে পালিয়েছিলেন বিকৃতির জগতে, পরবর্তীকালে প্রবেশ করেছিলেন ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে। পল বোর্জে চললেন খ্রিস্টধর্মের আবেগময় আলো-আঁধারির পথে। ইবসেন এবং ইপ্টমান যে প্রতীকবাদ এবং রহস্যবাদের পথ গ্রহণ করেছিলেন, স্টিনডবার্গ যে নয়া-রোমান্টিকতাবাদ এবং অন্ধকুসংস্কারবাদে নিমগ্ন হয়েছিলেন তার পেছনের কারণও স্বাভাবিকতাবাদের ঐ সংকটময় চরিত্র এবং অনিশ্চিত অবস্থান। স্বাভাবিকতাবাদ এমন এক অবস্থান যেখান থেকে সবদিকেই যাওয়া যায়, এদিক নাহয় ওদিক, সামনে নাহয় পেছনে।

প্রতীকবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ

স্বাভাবিকতাবাদ পরিশেষে প্রতীকবাদ (Symbolism) এবং অতীন্দ্রিয়বাদে (Mysticism) পরিণতি লাভ করেছিল, এ পরিণতির পেছনে সামাজিক কারণ এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিকতাবাদের নির্দিষ্ট প্রকাশপদ্ধতি, উভয়েরই সবিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বুর্জোয়া বিশ্বের কোনো বিপ্লবী আন্দোলন যখন শুধুমাত্র প্রতিবাদের পর্যায় অতিক্রম করে গণজাগরণের সৃষ্টি করে তখন দেখা গেছে এর অন্তর্গত বুদ্ধিবৃত্তির এবং শৈল্পিক বিদ্রোহসমূহের মধ্যেও একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্ত উপস্থিত হয়। ফরাসি বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এবং প্যারিস কমিউনের ঘটনাসমূহ ছিল রাজনীতি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি সিদ্ধান্তগ্রহণের কাল। শিল্পীসাহিত্যিকগণ তখন পক্ষ নির্বাচনে বাধ্য হয়েছিলেন, হয় প্রগতির নয় প্রতিক্রিয়ার। প্যারিস কমিউনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের এই প্রচেষ্টা সমাজজীবনে এক দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে আতঙ্ক তখন ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে আক্রান্ত করেছিল তা যেমন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল একদিকে বৃদ্ধ হিপোলিট টাইনকে তেমনি অন্যদিকে তরুণ ফ্রেডেরিক নিটশেকে, যার কাছে কমিউন ছিল এক অবিস্মরণীয় আঘাত। শ্রমিকশ্রেণি তখন যতই ঘটনার অগ্রভাবে এসে দাঁড়াচ্ছিল ততই বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এ সমাজের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনকেই চূড়ান্ত দায়িত্ব ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শ্রেণিসংগ্রামের তীব্রতা তাদের বাধ্য করেছিল পক্ষ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে। হয় তাদের শ্রমিকশ্রেণির সাথে নিজেদের যুক্ত করতে হবে নয় দাঁড়াতে হবে প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে আর তৃতীয় পথটি ছিল সামাজিক নৈরাজ্যের আপাত স্বাধীনতার পক্ষ গ্রহণ, যারা কার্যত ভবিষ্যৎ শক্তিসমূহের বিরুদ্ধাচার করে সামাজিক স্থবিরতাকেই সমর্থন করেছিলেন।

স্বাভাবিকতাবাদ দাবি করেছিল তারা বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতায় প্রকাশ করেছে। কিন্তু এ ছিল বিভ্রান্তিকর বস্তুনিষ্ঠতা। বাস্তবতা যে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দ্বন্দ্বমান একটা পরিস্থিতি, এ সত্য অনুধাবনে স্বাভাবিকতাবাদ, ইম্প্রেশনবাদের মতোই ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাভাবিকতাবাদ বাস্তবতাকে দ্বান্দ্বিকতার প্রেক্ষিতে দেখেনি, দেখেছিল কেবল পরিবর্তনশীল বর্তমানের একটা স্থির মুহূর্ত হিসেবে। টাইন তাঁর প্রগতিশীল অবস্থানের পর্যায়কালে একবার তরুণ জোলাকে লিখেছিলেন—

"তুমি যদি নিজেকে শূন্যতায় আবদ্ধ রেখে পাঠককে কেবল উন্মাদ, দানব আর রোগাক্রান্ত দুরাত্মার আশাহীন কাহিনী শোনাও তবে তুমি তাকে নিষ্ক্রিয় রাখতেই সফল হবে। যথার্থ শিল্পীর প্রয়োজন বিস্তৃত জ্ঞান, প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা, যা পাঠককে সামগ্রিকতা অনুধাবনে সহায়তা করে। আজকাল লেখকগণ বেশি মাত্রায় বৈশিষ্ট্যবাদী। তারা বাস্তবতার একটা বিশেষ অংশের আণুবীক্ষণিক বর্ণনায় নিজেদের বন্দি করে রাখেন কিন্তু সমগ্রের দিকে দৃষ্টি দেন না।"

শিল্পী সামগ্রিকতার [illegible] হারিয়ে ফেলেছেন [illegible] জোলাও বলেছিলেন। স্বাভাবিকতাবাদের [illegible] অধিকা[illegible] না। স্বাভাবিক কিংবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আকস্মিক প্রতিটি ব্যাপারে অনুপুঙ্খ বর্ণনাই সেখানে সমান যুক্তিযুক্ত। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের মধ্যে একটা গুঞ্জনরত মৌমাছির আবির্ভাব কিংবা একজন ডিম-বিক্রেতা মহিলার আগমন যদিও কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তবু লেখকের কাছে তা ঐ কথোপকথনের মতোই সমাজবাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ। দ্বন্দ্বের বদলে অনড়তার ধারণার মাধ্যমে বাস্তবতার এই ফটোগ্রাফিক উপস্থাপন জন্ম দিয়েছিল অর্থহীনতার বোধ, সৃষ্টি করেছিল আশাহীন গুমোট এক নিষ্ক্রিয় আবহাওয়ার। এক অর্থে স্বাভাবিকতাবাদ মানববিবর্জনেরই সূচনা ঘোষণা করেছিল, সূচনা করেছিল বস্তুর কাছে মানুষের হতাশ, বিষণ্ন আত্মসমর্পণের; যে বস্তু অমানবিক পুঁজিবাদী নিয়মের সুবাদে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে। এ বোধ পরবর্তীকালের শিল্পসাহিত্যে আরও নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাভাবিকতাবাদ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া বিশ্বের বিখণ্ডীকরণ, কুশ্রিতা এবং এর উপরিতলের আবর্জনাকে উন্মোচিত করেছিল ঠিকই কিন্তু তার দৃষ্টি সেই গভীরতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে যেখানে ভিন্ন এক শক্তি এই বিশৃঙ্খল সমাজ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করে নতুন এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দৃষ্টিশক্তির এই অগভীরতার কারণেই স্বাভাবিকতাবাদী লেখকগণ প্রতীকবাদে এবং অতীন্দ্রিয়বাদে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন বলেই সমাজবাস্তবতার উর্ধ্বে জীবনের অর্থ আর তার রহস্যময় সামগ্রিকতা খুঁজে পাবার মিথ্যে ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

বিচ্ছিন্নতা

বিচ্ছিন্নতার ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জাঁ জ্যাক রুশো। ক্যালভিনিস্ট রিপাবলিকান জেনেভার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রতিনিধিগণ যখন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন তখন তারা তাদের নিজস্ব সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ফলে তারা আর জনগণ থাকেন না। তিনি লক্ষ করেছিলেন, সংগঠন সরকারের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু সাধারণের ইচ্ছা রক্ষার জন্য কখনো নয়, কারণ তখন তা রাষ্ট্রের জনকাঠামো থেকে নিজেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

"প্রতিনিধি কখনো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। সার্বভৌমত্বকে প্রতিনিধিত্ব করা যায় না, সার্বিক সাধারণ ইচ্ছাসমূহের মধ্যে তা নিহিত থাকে, যার কোনো প্রতিনিধি হতে পারে না। এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই।"

পরিস্থিতিসমূহ এত জটিল হয়ে পড়েছে এবং রাষ্ট্রসমূহ এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে রাষ্ট্রক্ষমতার বিভাজন এবং জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিকে পরিত্যাগ করা আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্ভব নয়, কিন্তু এ থেকেই শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নতা, ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ, গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার পরাজয়।

হেগেল এবং তরুণ মার্কসই বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করেছিলেন। যেদিন থেকে মানুষ শ্রম এবং উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়েছে সেদিন থেকেই তার বিচ্ছিন্নতার শুরু। মার্কস লিখেছিলেন—'মানুষ দুটি সত্তা গড়ে তোলে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে তেমনি তার দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে, ফলে সে তার নিজের তৈরি একটা জগতেই নিজেকে স্থাপন করে'; মানুষ যতই প্রকৃতি এবং তার পরিপার্শ্বের জগৎকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় ততই সে এমন এক জগতের মুখোমুখি হয় যেখানে তার নিজেকেই মনে হয় একজন আগন্তুক। নিজেকে সে এমন সব বস্তু দ্বারা আবৃত দেখতে পায় বস্তুত যা তারই সৃষ্টি অথচ যে বস্তুসমূহ তার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে চায়, ক্ষমতায় হতে চায় তার চেয়েও শক্তিমান।

এ বিচ্ছিন্নতা মানুষের প্রগতির জন্যই জরুরি, সেইসাথে ক্রমাগত এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করারও প্রয়োজন যাতে মানুষ কাজের প্রক্রিয়ায় উত্তরোত্তর আরও অধিক সচেতন হয়ে ওঠে এবং যাতে পুনরায় সে তার নিজের তৈরি নতুন আরেক জগতে নিজেকে স্থাপন করতে পারে যে জগতে সে তার সৃষ্ট বস্তুর দাস হবে না, হবে প্রভু। একজন সৃষ্টিশীল কারিগর স্বভাবতই নিজের কাজের সাথে একাত্ম বোধ করেন, নিজস্ব সৃষ্টির প্রতি তার থাকে বিশেষ একটা ব্যক্তিগত অনুরাগ। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন যে শ্রমবিভাগের জন্ম দিয়েছে তাতে এ ধরনের বোধের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একজন মজুর শ্রমিক কখনোই তার কাজের সাথে একাত্ম বোধ করে না, নিজের ভেতরের বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করতে পারে না কিছুতেই। নিজের তৈরি বস্তুকে তার মনে হয় যেন 'তার চেয়েও ক্ষমতাবান, তার অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বস্তু'। নিজের সৃষ্ট বস্তু থেকে সে যেমন বিচ্ছিন্ন তেমনি উৎপাদনকর্মে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে সে তার আপন সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন।

এ অবস্থায় মার্কসের মতে—

"কাজকে মনে হয় যন্ত্রণা, শক্তিকে মনে হয় ক্ষমতাহীনতা, উৎপাদনকে মনে হয় শক্তিক্ষয়। শ্রমিকের নিজস্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং তার ব্যক্তিগত জীবন কিসের জন্য, যে জীবনে কোনো কাজ নেই? কারণ তার নিজের কাজ তো তার বিপক্ষে গিয়েই দাঁড়ায়, এ কাজ তার নিজের জন্য নয়, এর উপর তার কোনো কর্তৃত্বও নেই।"

মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায়ের সরল অর্থনীতিতে জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল একান্তই ব্যক্তিগত (ভূস্বামী ও কৃষক, শিল্পী এবং শিল্পক্রেতার সম্পর্ক)। কিন্তু একটা উন্নত পণ্য উৎপাদনকারী সমাজে এই সম্পর্ক ছদ্মবেশ ধারণ করে পরিণত হয় বস্তুর সাথে বস্তুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামাজিক সম্পর্ক, পরিণত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক। অতীতে একজন কারিগর বিশেষ একজন ক্রেতার মর্জিমাফিক কাজ করতেন। কিন্তু একজন পুঁজিপতি কারখানা-মালিকের কাছে এ প্রশ্নটি মোটেও জরুরি নয় যে তার কারখানা কী উৎপাদন করে কিংবা কার জন্যই বা উৎপাদন করে। তার কাছে যে-কোনো উৎপন্ন দ্রব্য মুনাফার বাহক মাত্র। যারা এই ব্যবসায়িক লেনদেনে যুক্ত থাকে তারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন তেমনি ঐ উৎপন্ন পণ্যগুলোও বিচ্ছিন্ন তাদের উৎপাদক থেকে। ব্রেখট তাঁর 'সমাধান' নাটকের ব্যবসায়ীর সেই গানটিতে এ ব্যাপারটিই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

আমি কী করে জানব চাউল কাকে বলে?
আর কে যে তা জানে, সে কথাও বা কী করে জানি?
চাউল সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।
আমি শুধু চাউলের দাম জানি।

আমরা কেবল বস্তুর মূল্যের কথা বলি, স্টক এক্সচেঞ্জের কথা বলি এবং এর মাধ্যমে আমরা অনুমোদন করি মানববিবর্জিত অদ্ভুত এক স্বনির্ভর বস্তুস্রোতকে, যে স্রোত মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে, যেমন ঝর্না ভাসিয়ে নেয় বৃক্ষখণ্ডকে, এ এমনই এক পণ্য উৎপাদনকারী জগৎ যেখানে উৎপন্ন পণ্যই নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদককে, যেখানে পণ্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখানে বস্তু পরিণত হয়েছে দীর্ঘ ছায়াবিস্তারী অতিকায় পরাক্রমশালী এক দানবে।

শিল্পোন্নত সমাজের বৈশিষ্ট্যকে কেবল সামাজিক সম্পর্কের এই বস্তুনির্ভরতার মধ্যদিয়েই চেনা যায় না, চেনা যায় এর ক্রমাগত শ্রমবিভাজন এবং বিশেষজ্ঞায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও। মানুষ যত কাজ করে ততই হয়ে পড়ে খণ্ডিত। সমগ্রের সাথে তার যোগাযোগ লুপ্ত হয়ে যায়। সে পরিণত হয় বিরাট একটা যন্ত্রের সাথে কোনোরকম লেগে থাকা একটা নাটবল্টুতে। এই শ্রমবিভাজনের কারণে যেহেতু মানুষকে নিতান্ত আংশিক একটা কাজ করতে হয় ফলে তার দৃষ্টির ক্ষেত্রটিও হয়ে পড়ে সংকীর্ণ। কাজের প্রক্রিয়া যত সংকীর্ণ হয় সে কাজের ক্ষেত্রে তত কম মেধার প্রয়োজন পড়ে এবং ততই মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে কাজের সমগ্রতা থেকে। তাই উৎপাদনের মাত্রা যত বিশাল হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব তত সংকীর্ণ হতে থাকে।

ফ্রানজ কাফকাই, তাঁর পূর্বেকার সকল শিল্পীর তুলনায় সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুধাবন করেছিলেন এই বিচ্ছিন্নতা। জানোয়াকের সাথে টাইলোরিজম (যা কিনা এমন একটা পরিকল্পনা যাতে গণউৎপাদনের ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিককে একটা উৎপাদনযন্ত্রে পরিণত করা হবে) সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'এ পদ্ধতি শুধু শ্রমকেই অস্বীকার ও কলুষিত করে না, এর সাথে সম্পর্কিত মানুষকেও করে মর্যাদাহীন। এ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবন একটা ভয়াবহ অভিশাপ যা অভীষ্ট সম্পদ আর মুনাফার বদলে ক্ষুধা আর দুর্দশারই জন্ম দিতে পারে। একেই বলে অগ্রগতি...'। 'জগতের ধ্বংসের দিকে অগ্রগতি'—বললেন জানোয়াক। কাফকা মাথা নাড়িয়ে বললেন—'তাও যদি নিশ্চিত হতো, তাও তো নিশ্চিত নয়।... কারখানার মালবহনকারী ফিতার মতো জীবন তোমাকে কোথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ তা জানে না। মানুষ এখন জীবন্ত কোনো প্রাণী নয়, নেহাত বস্তুমাত্র।'

মানুষের এই খণ্ডসত্তা, সেইসাথে তার কেবল বিশেষ ধরনের জ্ঞান আর শিক্ষা তার অস্তিত্বকে যেমন সীমায়িত করে তুলেছে, তেমনি তার পক্ষে চারপাশে সামাজিক পরিস্থিতি এবং শর্তগুলো হৃদয়ঙ্গম করাও হয়ে পড়েছে দুরূহ।

রবার্ট মুশিল 'দ্য ম্যান উইদাউট কোয়ালিটি' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"মানুষের একত্রে বসবাস এতই বিস্তৃত এবং ঘন হয়ে উঠেছে এবং তাদের সম্পর্কগুলো এত অসীমভাবে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে গেছে যে, কোনো চোখ, কোনো ইচ্ছাই জীবনের কোনো অংশকে ভেদ করতে পারছে না। প্রতিটি মানুষই তার নিজের ক্ষুদ্র বৃত্তটির বাইরে অন্যের উপর একটা শিশুর মতোই নির্ভরশীল। আগে কখনোই মনের গণ্ডি এত সীমিত ছিল না, যা আজ সর্বব্যাপী।"

রুশোর উপর লেখা একটা নোটে মুশিল লিখেছিলেন—

"জীবনের ঐ অবিভক্ত মহান শক্তিকে সংরক্ষণ করতে হবে, শ্রমের সামাজিক ও মানসিক বিভক্তি সেই ঐক্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে আত্মার জন্য বিপদ ঘটাচ্ছে।"

'ম্যান উইদাউট কোয়ালিটি'তে উলরিচ বলেন—"আজকের তুলনায় অতীতে মানুষের আরও সহজ বিবেকবুদ্ধি ছিল।" সে মনে করে—"দায়িত্বজ্ঞানের ভরকেন্দ্র এখন আর মানুষের মধ্যে নেই, আছে বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে।" অন্যত্র বলছেন—"অন্তঃসারশূন্যতা, খণ্ডের প্রতি ব্যগ্রতা আর সমগ্রের সাথে বিচ্ছিন্নতার রহস্যময় মিশ্রণ, মানবসত্তার খণ্ডাংশের এই পরিত্যক্ত মরুভূমি...।"

এই ভৌতিক নামহীনতা ঘিরে আছে সবকিছুকে। বড় বড় ফার্ম আর প্রতিষ্ঠানের সংক্ষেপিত নামগুলো যেন প্রাচীন কোনো রহস্যময় শক্তিধরের হিরোগ্লিফিক লিপি। প্রতিটি ব্যক্তি মুখোমুখি হয় দুর্বোধ্য, নৈর্ব্যক্তিক বিশাল সব যন্ত্রসমূহের যার আকার আর শক্তি তাকে নিজের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। কে সিদ্ধান্ত নেয়? কার দায়িত্ব? কার কাছে যায় বিচার আর সাহায্যের প্রত্যাশায়? এ প্রশ্নগুলোই ঘুরেফিরে কাফকার শ্রেষ্ঠ কাজ 'দ্য ট্রায়াল', 'দ্য ক্যাসল' ইত্যাদিতে এসেছে। দুর্বোধ্য, অচেনা কোনো এক ক্ষমতার ধারক সমন জারি করেছে 'কে'-এর বিরুদ্ধে, তাকে জেরা করছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাণদণ্ড দিচ্ছে। 'কে' যে অপ্রবেশ্য প্রাসাদের মালিক কাউন্ট ওয়েস্ট পশ্চিমের আমলাতন্ত্রের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে, তা সকল বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। মানুষের সমাজবিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে বড় একটা উপাদান এই আমলাতন্ত্র। আমলাদের মধ্যে কোনো মানবিক সম্পর্কের প্রশ্ন নেই, তাদের সম্পর্কের ভিত্তি কেবল কিছু ফাইল। মানুষ বস্তুত কিছু ফাইলে রূপান্তরিত হয়েছে সেখানে। একজন মৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয় ক্রমিক নাম্বার দিয়ে। এমনকি যখন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি করে তলব করা হয় সে তখন কোনো ব্যক্তি নয়, একটা কেস মাত্র।

'দ্য ট্রায়াল'-এ উকিল 'কে'-কে জানায়, বাদীর আপত্তিটি কোর্টে পড়া হয়নি, সেটা ফাইলবদ্ধ করা হয়েছে, যে ফাইলটি পরে পরীক্ষা করা হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয়, বাদীর আপত্তির ফাইল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানচ্যুত এবং লুপ্ত হয়ে যায় এবং যদি তা কোনোক্রমে শেষপর্যন্ত রেখে দেয়া হয়, কদাচিৎ তা পড়ে দেখা হয়, পড়ে দেখা হয়েছে বলে যা শোনা যায়, তা নিতান্তই গুজব। মামলার কার্যধারা জনগণের কাছে তো গোপন রাখা হয়ই, আসামির কাছেও তা গোপন থাকে। এমনকি তা গোপন করা হয় নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকেও যাতে তারাও কখনো তাদের কার্যধারা অনুসরণ করতে না পারে। উকিলের ব্যক্তিগত যোগাযোগই এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার, কারণ এগুলোর উপরই নির্ভর করে প্রতিরক্ষার সামর্থ্য।

যে ব্যক্তি একটা কেসে পরিণত হয়েছেন তিনি পুরো ব্যবস্থাটার কেবল নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সংস্পর্শে আসেন, উচ্চপদস্থগণ থাকেন সুদূর রহস্যে ঢাকা। 'দ্য ক্যাসল'-এর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ক্লাম বস্তুত অদৃশ্য। ক্লামের কর্মচারী বারনোবাস সবসময়ই সন্দিহান যে তিনি আদৌ ক্লামের সাথে কথা বলছেন কি না! সে ক্লামের সাথে কথা বলছে, কিন্তু সে কি সত্যিই ক্লাম? সে কি এমন কেউ নয়, যে অনেকটা ক্লামের মতো? বারনোস তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না কারণ তার ভয় হয় সে হয়তো তাতে কোনো অজ্ঞাত নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধ করবে কিংবা তার চাকরিটি হারাবে।

আগন্তুক ব্যক্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করতে ক্যাসল যে দুজন নিম্নপদস্থ আমলা সহযোগীদের পাঠিয়েছে তারা নাটকে কেবল তাদের কাজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই উপস্থিত, অন্যত্র তারা ব্যক্তিত্বহীন অর্থাৎ অনুপস্থিত। 'কে' তাদের তুলনা করে বলেছেন—

'তোমাদের দুজনকে আমি কি করে পৃথক করি? তোমাদের দুজনের পার্থক্য তো কেবল তোমাদের নামে, তাছাড়া তোমরা দুজন দেখতে ঠিক...' সে থেমে যায় এবং সহসা বলে ওঠে, 'তোমরা দুজন ঠিক দুটো সাপের মতো।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারা কেবল খাঁটি কাজ. ন্যস্ত দায়িত্বের ছায়া, নেপথ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষমতার আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। সেই কেসটির সিদ্ধান্ত হয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে।

আজ যেকোনো একজন আটপৌরে সাধারণ মানুষ মাত্রই অনুভব করেন তিনি যেন বিশাল কোনো এক ক্ষমতাচক্রের সামনে সর্বক্ষণ আসামি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যদিও তিনি জানেন না কী তার অপরাধ। প্রধান সিদ্ধান্তগুলো যখন আর জনতার প্রতিনিধি দ্বারা গৃহীত হয় না এখন তা ন্যস্ত হয়েছে একট ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠীর হাতে। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যে নাগরিকদের কাছে রাষ্ট্র হলো 'উপরওয়ালাদের ব্যাপার'! তারা কখনোই ভাবতে পারে না রাষ্ট্র 'আমাদের'। তাদের এই বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজনীতি বা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে তাদের দুর্বল মতামতগুলোর মধ্যে। নাগরিকদের কাছে রাজনীতির পুরো ব্যাপারটাই নোংরা এবং সে ভেবে থাকে এর চেয়ে ভালো কিছু হওয়াও সম্ভব নয়, সুতরাং একে আমাদের মেনে নেয়াই উচিত। কোনোমতে বেঁচেবর্তে থাকো এবং চুপচাপ থাকো এই হচ্ছে এখন চালু বিশ্বাস। সক্রিয় নাগরিকের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একান্ত ব্যক্তিজীবনে পলায়ন করাই হয়েছে সামাজিক নীতি।

একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অন্যদিকে সামাজিক বোধগম্যতার পশ্চাৎপদতা, এ দুয়ের দ্বন্দ্বও জন্ম দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। আজকের বিজ্ঞানের আণবিক জ্ঞান, কোয়ান্টামতত্ত্ব, আপেক্ষিকতত্ত্ব, সাইবারনেটিকসের বিকাশ জগৎকে সাধারণ মানুষের কাছে যে পরিমাণ দুর্বোধ্য করে তুলেছে, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, কেপলার মিলেও মধ্যযুগের মানুষকে এতটুকু দুর্বোধ্যতার দ্বন্দ্বে ফেলেননি। স্পর্শযোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছে অধরা, দৃশ্যমান জিনিস হয়েছে অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের বাইরে তৈরি হয়েছে আরও এক জগৎ যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে, যাকে কেবল প্রকাশ করা যায় গণিতের ফর্মুলায়। গ্যাটে যে প্রকৃতিকে দেখেছিলেন কবি আর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে, সেই শক্তিধর বাস্তবতা তার সকল আকার আর রংসহ পরিণত হয়েছে এক বিকট বিমূর্তে। এধরনের একটা জগতে সাধারণ মানুষের পক্ষে কিছুতেই আর স্বাভাবিক এবং একাত্মবোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। চারপাশের দুর্বোধ্য জগতের শীতল নিশ্বাস তাদের শিউরে দেয়। যে জগৎ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা বোধগম্য সেখানে তারা বিচ্ছিন্ন বোধ করেন।

কোনো কোনো সময় আছে যখন যান্ত্রিক উন্নয়ন মানুষকে মুগ্ধ করে, যেমন মহাশূন্য ভ্রমণ, যা ছিল মানুষের আদিম এক মোহনীয় স্বপ্ন। কিন্তু প্রকৃতিকে জয় করার এই একই যান্ত্রিক শক্তি আবার জন্ম দেয় ক্ষমতাহীনতার বোধ, জাগ্রত করে এক গোপন ভয়। সামাজিক সচেতনতা এবং যান্ত্রিক উন্নয়নের এই অসংগতি অবশ্যই আশঙ্কাজনক। রাডারের একটা সংকেতের খুব সামান্য একটা ভুলপাঠ কিংবা সাধারণ একজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারিগরের কোনো ত্রুটির জন্য আজ নিমেষে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মানবতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এ নিশ্চয়ই কেউ চাইবে না।

বিংশ শতাব্দীর শিল্পসাহিত্যে এই বিচ্ছিন্নতা এক ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাব পড়েছে কাফকার মহৎ লেখাগুলোতে, স্কোয়েনবার্গের সংগীতে, সুরিয়ালিস্টদের মাঝে, বিভিন্ন বিমূর্ত শিল্পীদের শিল্পে, অ্যান্টি-ঔপন্যাসিক ও অ্যান্টি-নাট্যকারদের লেখায়, এমনকি আমেরিকার বিটনিক কবিতায়। যার একটা নমুনা এরূপ—

এখন কথাটা শোনো
একটা ব্যবচ্ছেদ যন্ত্র,
একটা হাইড্রোজেন স্ট্রফি
নিয়ে যা-খুশি করো দেখবে সম্ভব হয়েছে
উৎকৃষ্টতম আণবিক বিস্ফোরণ।
তারপরই ভাব
ভ্রূণের মজাদার সব বিকৃতি
একেই বলে প্রসন্ন নরমেধ।
এটা কিন্তু বেশ গণতান্ত্রিকও বটে
ছিন্নভিন্ন মানুষ বিনা যে গণতন্ত্র হয় না
মুক্তবিশ্বে
সমানভাবে
প্রত্যেকে উন্নত ঊর্ধ্বমুখী হবে
অন্তিম সেই প্রোজ্জ্বল তেজস্ক্রিয়ার ভিতর...।

নৈরাজ্যবাদ

অবক্ষয়কে কেউ যদি যথার্থই অনুধাবন করে থাকেন, তবে তিনি নিটশে। অবক্ষয়ের অপরিহার্য ফলাফল যে নৈরাজ্যবাদ (Nihilism) নিটশে তা বুঝেছিলেন। "সমগ্র ইউরোপে সংস্কৃতি সুদূর অতীত থেকে ক্রমবর্ধমান এক দুর্বিষহ উদ্বেগ নিয়ে প্রবল প্রপাতের বেগে অধঃপতিত হচ্ছে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার দিকে", এভাবেই নিটশে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর সমকালকে, যে কালের আবর্তে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন বলে মনে করতেন (কালের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হবার এই ধারণাটি পরবর্তীকালে অস্তিত্ববাদের একটা বিশিষ্ট ভাবধারায় পরিণত হয়েছিল)।

"ব্যাপক ক্ষয় আর ভাঙনের সময় এখন... বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদ মনে করে অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য একটা মধ্যবর্তীকালীন রোগাক্রান্ত অবস্থা। হয়তোবা ইতিবাচক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শক্তিগুলো এখনও যথেষ্ট শক্তিমান নয়, হয়তোবা অবক্ষয়ও এখন দ্বিধাগ্রস্ত এবং সহায়ক শক্তিহীন... নৈরাজ্যবাদ অবক্ষয়ের কারণ নয় বরং তার পরিণাম।”

নৈরাজ্যবাদকে স্পষ্টতই এখানে একটা ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে নিটশের অন্ধত্বের কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে নৈরাজ্যবাদের ওতপ্রোত যোগাযোগকে চিহ্নিত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। লক্ষণীয় যে, নৈরাজ্যবাদ সাম্প্রতিক বুর্জোয়া-বিশ্বের বহু শিল্পীসাহিত্যিকেরই প্রধান মনোভাবে পরিণত হয়েছে, যার পূর্বাভাস ইতিপূর্বেই দিয়েছিলেন ফ্লবেয়ার। কিন্তু আমাদের জানতে হবে, এই নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাই বহু অস্থির বুদ্ধিজীবীকে এক দুষ্ট পাপচক্রে পুনর্মিলিত করেছে এবং স্মরণ রাখতে হবে যে নৈরাজ্যবাদের বিদ্রোহী ভঙ্গিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটকীয় সুবিধাবাদের লক্ষণ। নৈরাজ্যবাদী লেখক বলে থাকেন, পুঁজিবাদী বিশ্ব নোংরা, বিশ্রী। আমি ক্ষমাহীন কণ্ঠে একথা বলতে চাই, যে-কোনো পরিস্থিতিতেই আমি আমার এই মতামত ঘোষণা করতে প্রস্তুত। এ জগতের বর্বরতা সীমাহীন। যে বিশ্বাস করে যে এ পৃথিবীতে মানুষের জন্য এখনও মূল্যবান ও মঙ্গলকর কিছু অবশিষ্ট আছে, হয় সে নির্বোধ নয়তো সে প্রতারক। শোষক অথবা শোষিত, মুক্তিকামী মানুষ অথবা স্বৈরাচারী শাসক সকলেই এখন পাপী, দুশ্চরিত্র। একথা উচ্চারণ করতেও চাই সাহস। এরপর গটফ্রিড বেনের লেখা অনুসরণ করা যাক—

“আমার মনে হয় একজন দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের কাছে এ বোধ হয় আরও বিপ্লবাত্মক, আরও সাহসিকতার ব্যাপার যিনি মানবজাতিকে বলতে পারবেন—এই হলো তোমার অবস্থা, এ থেকে তোমার নিস্তার নেই, এভাবেই তুমি বেঁচে আছ, এভাবেই তুমি বেঁচে ছিলে এবং ভবিষ্যতেও এভাবেই বাঁচবে। তোমার যদি ধনদৌলত থাকে, তবে স্বাস্থ্যও থাকবে, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তবে নিজেকে করতে হবে না, যদি তুমি সরল হও, তবেই তুমি সঠিক। ইতিহাস তাই বলে। এ কথায় যার বিশ্বাস নেই তাকে কেঁচোর মতোই বালু-কাদাতে ঘর বাঁধতে হবে। সন্তানের চোখের দিকে তাকিয়ে এখনও যে আশান্বিত হয়, সে আসলে হাত দিয়ে বিদ্যুৎচমককে আড়াল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তবু সেই রাত্রি থেকে কেউই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, যে রাত্রি একটা জাতিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার আবাস থেকে। ...ভাগ্য এবং মুক্তি থেকে সৃষ্ট এই যাবতীয় বিপর্যয়, অর্থহীন ফুল ফোটা, উত্তাপহীন শিখা আর তাদের পেছনে সীমাহীন ‘না’-এর দুর্ভেদ্য দেয়াল।”

যে-কোনো কমিউনিটি মেনিফেস্টোর চাইতেও কথাগুলো বিপ্লবাত্মক শোনায় অথচ শাসকশ্রেণি কদাচিৎ [illegible] বিপ্লবী কথায় বাধা দিয়ে থাকেন। বরং দেখা গেছে

~ www.amarboi.com ~

শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে যখন কোনো বিপ্লবী অভ্যুত্থান দানা বেঁধে ওঠে তখন এ ধরনের নৈরাজ্যবাদী সংলাপই তাদের অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। গণঅভ্যুত্থানকে দমন করতে বুর্জোয়াসমাজের সরাসরি স্তুতির চেয়েও এজাতীয় নৈরাজ্যবাদী চেতনা বেশিমাত্রায় কার্যকরী। বুর্জোয়াসমাজের সরাসরি স্তুতিবাদ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে কিন্তু সমাজের প্রতি এ ধরনের চরম নৈরাজ্যবাদী অভিযোগ যে-কোনো বিপ্লবী আন্দোলনের ধ্বনিকে উদ্দেশ্যহীনতায় এবং নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শাসকশ্রেণি যখন নিজেকে অতিমাত্রায় নিরাপদ মনে করে, বিশেষ করে তারা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়, শুধুমাত্র তখন পুঁজিবাদ বিরোধী এই নৈরাজ্যবাদী চেতনার প্রতি তাদের সন্তুষ্টি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তখন তাদের প্রয়োজন পড়ে সরাসরি আত্মপক্ষ সমর্থনকারী এবং কিছু শাশ্বত মূল্যবোধ। নৈরাজ্যবাদ তখন 'অধঃপতিত শিল্প' নামের কলঙ্কে ভূষিত হয়।

বুর্জোয়া বিশ্বের সবকিছুকে অস্বীকার করে এবং একে একটা সম্ভাবনাহীন, বিপর্যস্ত এবং স্থবির জগৎ হিসেবে মেনে নিয়ে নৈরাজ্যবাদী শিল্পীরা যে বস্তুত বুর্জোয়া বিশ্বের কাছে আত্মসমর্পণই করে থাকেন এ ব্যাপারে তারা ছিলেন অসচেতন। অবশ্য সমাজে যে সম্ভাবনা তখনও পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়নি তাকে সাহিত্যে মূর্ত করে তোলা অনেক সৎ সাহিত্যিকের পক্ষেও নিতান্ত দুরূহ কাজ। এর কারণ প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে পুঁজিবাদী সমাজের শ্রমিকশ্রেণিও যথার্থ অর্থে দুর্নীতিমুক্ত বা শুদ্ধ থাকে না। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ অতিক্রমণ কেবল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবেই নয়, আত্মিক প্রবণতাকেও একটা দীর্ঘ যন্ত্রণাকর প্রক্রিয়া, সেইসাথে এই নতুন বিশ্ব সর্বাঙ্গীণ নিখুঁতভাবেও আবির্ভূত হয় না, থাকে অতীত বিশ্বের প্রভাবে খণ্ডিত এবং বিকৃত। পুরাতন বিশ্বের মৃত্যুযন্ত্রণা আর নতুন বিশ্বের প্রসবযন্ত্রণা, এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অথবা একটা ভেঙে পড়া প্রাসাদ আর একটা অসমাপ্ত প্রাসাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চাই উচ্চমানের সামাজিক সচেতনতা। একইভাবে একটা সমাজের কুৎসিত উপাদান স্মরণ রেখে এর প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতেও প্রয়োজন উঁচুপর্যায়ের সামাজিক সচেতনতা। পুঁজিবাদী সমাজের প্রচ্ছদপটে যে বীভৎসতা আর অমানবিকতা মুখ ব্যাদান করে আছে তাকে চিহ্নিত করা সহজ; সহজ একে অভিশাপ দেয়া কিন্তু সে সমাজের মূল অনুসন্ধান করে সম্ভাব্য আগামীর ইঙ্গিত দেয়া একটা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ। নতুন সমাজ নির্মাণের সেই দুর্গম কাজের দায়িত্ব নৈরাজ্যবাদী শিল্পীগণ গ্রহণ করেন না, তারা কেবল অবক্ষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ভাব উদ্রেককারী, সহজবোধ্য রূপটিই চিত্রিত করেন। বস্তুত নৈরাজ্যবাদের সাথে দায়িত্ববোধের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানববিবর্জন

মানববিবর্জন, সাম্প্রতিক বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্যের অপর একটা উপাদান। এ ধরনের শিল্পসাহিত্যকে মানবতাবিরোধী আখ্যা দেয়া মার্কসবাদী সংস্কারমাত্র নয়, মার্কসবাদের বিপরীত শিবিরের শিল্পতাত্ত্বিকগণও এ ব্যাপারে একই ধারণা পোষণ করেন এবং এই মানবতাবিরোধী প্রবণতাকে প্রায়শই তারা প্রশংসার সাথে শিল্পের একটা গুণ এবং প্রগতিশীল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। আঁদ্রে মালরো লিখেছেন—

"শিল্প যদি আবার জীবনের দিকে ফিরে আসতে চায় তবে সে যেন কোনোপ্রকার সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে। কারণ যা-কিছু মানবিক, শুরু থেকেই তাকে বর্জন করা উচিত। মানবিক শিল্প ছিল সেই সংস্কৃতির অলংকার যে সংস্কৃতি তাক সমর্থন করেছে। অ-মানবিক শিল্পের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে সমসাময়িক সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পীর সংযোগহীনতা প্রকট হয়ে ওঠার কারণে শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ কমে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।"

এ ধরনের মতামত শিল্পীর সমাজবিচ্ছিন্নতাকে এবং মানবতাবাদী চেতনা থেকে তার দৃষ্টির অপসারণকে স্বীকৃতি দেয়া। এই স্বীকৃতিদানের মধ্যে উদ্বেগ নেই বরং সন্তুষ্টি আছে। এই ধারার শিল্পীগণ ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন রেনেসাঁ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণাসমূহকে, যেমন—যুক্তি এবং মানবতা, সকলকিছুকে মানবিক মানদণ্ডে বিচার করা কিংবা মানুষকে তার নিজের এবং এই বিকাশমান সমাজের স্রষ্টা হিসেবে দেখা। মালরো দানবের প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন—

"মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যা-কিছু মানবধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এ হলো সেই দানবের রাজত্ব। চার্চের দানব, ফ্রয়েডের দানব, বিকিনির দানব সকলেরই ঐ এক রূপ। ইউরোপে যতই নতুন দানব দেখা দেবে ততই ইউরোপকে ফিরে তাকাতে হবে পূর্বসূরিদের দিকে যারা সেই প্রাচীন দানবদের চিনতেন।"

যে সমাজে কেবল বস্তুরই মূল্য আছে সেখানে মানুষও হয়েছে অসংখ্য বস্তুর মাঝে একটা বস্তু এবং আপাতভাবে সেই হয়েছে সবচেয়ে নির্বীর্য এবং নিকৃষ্ট বস্তু। ইম্প্রেশনবাদীদের বদৌলতে মানুষ অবশ্য ইতিমধ্যেই শুধু রঙ আর আলোর মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, মানুষ ছিল অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক বিষয়েরই সাধারণ অংশমাত্র। 'মানুষের কোনো উপস্থিতি চলবে না'—বলেছিলেন সেজান। মানুষ ক্ষয়ে যেতে যেতে তাদের হাতে প্রকৃতির আরও নানাবিধ রঙের মতোই একপ্রস্থ রঙে পরিণত হয়েছিল, তাদের ল্যান্ডস্কেপগুলো ছিল নির্জন, নাগরিক রাস্তাগুলো বিরান, মানুষের অস্তিত্ব নেই কোথাও। যদিবা মানুষের দেখা মিলত তা ছিল বিকৃত। কিন্তু সে বিকৃতির মধ্যে গ্রথিত শিল্পের উৎফুল্লতা ছিল না (যা থেকে ইম্প্রেশনবাদের অংশবিশেষ আবির্ভূত) বরং এ বিকৃতি

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

ঘটানো হয়েছিল পুতুলের গড়নে যার অংশগুলো ইচ্ছেমতো খুলে নেয়া যায়, যা এক কিম্ভূত দানবিক বস্তু। মানুষ নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছে একটা মুখোশ অথবা জুজুরূপে। মানুষের সকল মানবিক গুণাবলি লুট করে নিয়েছে মার্কসকথিত সেই 'সর্বব্যাপী পণ্যভক্তি'।

আজ বহু সমালোচক যে নৈর্ব্যক্তিকতাকে আধুনিক গীতিকবিতার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও রয়েছে মানববিবর্জনের বৈশিষ্ট্য। এইসব কবিতা থেকে কবির ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়া হয় (আমরা দেখেছি ফ্লবেয়ার এই প্রত্যাহারকে একটা নীতিতে পরিণত করেছিলেন) এবং কবিতাটি একটা নৈর্ব্যক্তিক এবং আপাত বস্তুগত চরিত্র লাভ করে। যদিও কবিতার এই বস্তুগত রূপের মধ্যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণি মূর্ত হয়ে ওঠে না। এমনকি কবি নিজেকেও কোনো বিশেষ সমাজের বাসিন্দা মনে করেন না বরং তিনি এমন একজন 'আমি'-কে আবিষ্কার করেন যে 'আমি' এখনও মনের সচেতন স্তরেই এসে পৌছায়নি, এ যেন সেই ফ্রয়েড কথিত 'ইউ'; যে 'ইউ' পৌরাণিক অতীতে গ্রথিত, কবিতা যেন সেই 'ইউ'-কে প্রকাশ করবারই মাধ্যম। রাঁবো নাকি বলেছিলেন—"আমার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে আমার কোনো হৃদয় নেই" কবিতার বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "আমি হচ্ছি অন্য। টিন যে ট্রাম্পেট হয়ে বেজে ওঠে সেটা তার কৃতিত্ব নয়। আমার চিন্তা পুষ্পিত হওয়ার মধ্যেই আমার উপস্থিতি, আমি তা লক্ষ করি এবং শুনি। আমি ছড়ি দিয়ে একটা আঘাত করি এবং ইতিমধ্যেই সিম্ফোনি অনেক গভীরে নাড়া দেয়। আমি চিন্তা করি একথা বলা ভুল, বলা উচিত আমাকে নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।"

নৈর্ব্যক্তিকতার বোধ এমন মায়ার সৃষ্টি করে যাতে মনে হয় ঐ 'ইউ'-কে বিশ্বাস করলে নির্বাক বস্তুকে দিয়েও বুঝি কথা বলা সম্ভব। জেমস জয়েস তাঁর দুর্বোধ্য গ্রন্থ Finnegans Wake-এ সে চেষ্টাই করেছেন। সে গ্রন্থে তিনি এমন এক ভাষা নির্মাণ করেছেন যা নাকি বাতাস এবং পানির ভাষা। আসলে বস্তু তো কথা বলেনি বরং মানুষই এখানে নিজেকে বস্তুরূপে কল্পনা করেছে। সচেতন মনের উপর তার আর আস্থা নেই, এখন কেবল অবচেতন মনকেই তার বিশ্বাস। গাটফ্রিড বেন, লেভি ব্রুলের তত্ত্বের উল্লেখ করে বলেছেন, প্রাগযৌক্তিক ভাবনা যৌক্তিক ভাবনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ তা মনের অধিকতর গভীর এবং সুদূর অঞ্চল থেকে উঠে আসে। এরপর তিনি কবিতার প্রাণ হিসেবে এক পৌরাণিক 'আমি'র কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—"ওহে 'আমি', তুমি সকলের সাথে মিলিত হতে নেমে এসো। আমার কাছে তুমি মুগ্ধকর দৃশ্য, মাদকতা এবং প্রভাতের নাগরিক।" বর্তমান সামাজিক গোষ্ঠীর উপর কবির আর আস্থা নেই, ক্ষয়িষ্ণু কবি তাই প্রাচীন, পৌরাণিক, মহাজাগতিক এক গোষ্ঠীকে খুঁজে নেন, যারা তার কাছে সকল কবিতার যথার্থ উৎসশক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিল্পসাহিত্য মানববিবর্জনের চর্চায় মানুষের এই বিকৃতি এবং অন্তর্ধানই শেষ কথা নয়, এই চর্চা মানবতাবিরোধী চেতনাতেও পর্যবসিত হতে পারে, যে চেতনা কখনো কখনো সমাজের অত্যন্ত নির্মম সমালোচনার রূপ ধারণ করে। আমেরিকান থ্রিলারগুলো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—যে থ্রিলারগুলো বস্তুত লুপ্ত, প্রাচীন বীরগাথারই আধুনিক বিকল্প। থ্রিলারের বীরেরা হাসিমুখে জীবনের সব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, এবং নানাবিধ অসাধ্য সাধন করে বেড়ায়। ন্যূনতম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণহীন, উত্তেজক ঘটনায় ভরপুর এই থ্রিলারগুলো মানববিবর্জনের আদর্শ উদাহরণ। স্পিলানের কথা আপাতত উহ্য রাখলাম, নতুন ধরনের থ্রিলারের স্রষ্টা হামেটের কথা ধরা যাক। তাঁর 'ম্যালটেজ ফ্যালকোন' গল্পের শেষ দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি গোয়েন্দাটা তার সঙ্গিনীকে সঁপে দিচ্ছে আদালতের কাছে এবং পরিশেষে ইলেকট্রিক চেয়ারে। বরফশীতল যুক্তিতে সে তার সঙ্গিনীকে বুঝিয়ে বলছে যে, একাজ করার পেছনে কারণ হলো, যে-কোনো রকম আবেগের চাইতেও তার কাছে টাকা, সাফল্য এবং তার নিজের জীবন অধিক মূল্যবান। সঙ্গিনী তখন তাকে জিজ্ঞাসা করছে—'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?' গোয়েন্দার উত্তর—'আমি জানি না ভালোবাসার কী মূল্য? কেউ কখনো জেনেছে কি? ধরা যাক আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাতে কী? কে বলতে পারে, হয়তো আগামী মাসে আমি তোমাকে ভালোবাসব না। তারপর? তখন ভাবব আমি তোমাকে বোকা বানালাম, আর যদি আমিই দণ্ডিত হতাম তা হলে ভাবতাম আমিই বোকা বনলাম। তবে হ্যাঁ, তোমাকে দণ্ডিত করে আমি কিন্তু নরকযন্ত্রণাই ভোগ করব, আমাকে কিছু দুঃসহ রাত সহ্য করতে হবে, কিন্তু তাও নিশ্চয়ই কেটে যাবে'—এটা সহ অন্যান্য উপন্যাসেও হামেট মার্কিন পুঁজিবাদকে ক্ষমাহীন সততায় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তাঁর মনোভাব হলো জীবনটা এমনই। এ মনোভাব মানবতাবিরোধিতাকে প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে মানববিবর্জনের প্রক্রিয়াটিকে কোনো দার্শনিক অলংকার ছাড়াই নগ্নভাবে প্রকাশ করে। শুধু থ্রিলার নয়, বুর্জোয়া বিশ্বের সাম্প্রতিক আরও বহু সাহিত্যেই এই মানববিবর্জনের উপাদান বিদ্যমান—যেসব সাহিত্যের মূল ভাব মানুষ কিছু নয়, সাফল্যই সব।

খণ্ডায়ন

আজকের মানুষ এবং তার জগতের খণ্ডায়ন প্রক্রিয়াটি আমাদের কালের শিল্পসাহিত্যে বারবার উপস্থাপিত হয়েছে। কোথাও আর ঐক্য নেই, নেই সম্পূর্ণতা। সম্প্রতিক আমেরিকার নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আর্থার মিলার বলেছিলেন—"আমরা আমেরিকাবাসীগণ সম্ভবত উন্নতির একটা শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি, কারণ বছরের পর বছর আমরা শুধু নিজেদেরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছি অথচ কেউ যেন তা লক্ষ করছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না।" আলোচনায় তিনি আরও বলেছিলেন দৃষ্টিশক্তির সংকীর্ণতার কথা, শিথিল মুষ্ঠির কথা, বলেছিলেন সমস্ত জগৎকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে এর ভিত্তিসমেত কাঁপিয়ে দেবার অক্ষমতার কথা, যা ছিল সকল মহৎ নাটকেরই অভীষ্ট। তিনি বলেছিলেন যদিও আমরা এখন মহৎ বিষয় এবং সংকীর্ণ বিষয়, মুক্ত দৃষ্টি এবং সংকীর্ণ দৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হচ্ছি না তবু নেহাত সংশ্লিষ্ট আবেগসমূহের অনুকম্পার উপরই আমরা টিকে আছি। এ হলো কোনোকিছুর পূর্ণাঙ্গ সঠিক আকারটি দৃষ্টিগোচর করতে পারার অক্ষমতা। এটা অবক্ষয়ের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এ এমন এক মানসিকতার ফল যে মানসিকতা নতুন এবং পুরাতন সমাজের সংগ্রামের মধ্যে এবং সকল অন্তরায় সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র-অভিমুখী পৃথিবীর অগ্রযাত্রার মধ্যেই যে বিশ্বকে ভিত্তিসমেত কাঁপিয়ে দেবার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি প্রচ্ছন্ন আছে সে সত্যকে স্বীকৃতি দিতে ভয় পায়।

কিন্তু খণ্ডায়নের সমস্যা এর চেয়েও ব্যাপক। খণ্ডায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে আধুনিক সমাজের বিশেষজ্ঞায়ন এবং বিপুল যান্ত্রিকায়নের সঙ্গে। আমরা সকলে আজ ব্যক্তিগতভাবে এমন সব কাজে নিযুক্ত আছি যা বিশাল এক কর্মযজ্ঞের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশমাত্র, ফলে সেই কর্মযজ্ঞের অর্থ, এর কার্যকারিতা কিছুই আর আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না, এ সত্যটির সাথেও জড়িয়ে আছে খণ্ডায়নের সমস্যা। রোমান্টিক শিল্পীগণ বুর্জোয়াবিশ্বে জীবনের এই খণ্ডায়নের ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। হাইনে লিখেছিলেন—'কী খণ্ড বিখণ্ড এ জগৎ আর জীবন...' পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্যা ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে শিল্পীদের সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্বটা পরিণত হয়েছে অসংখ্য বিচিত্র খণ্ডাংশের কোলাহল চত্বরে। সেখানে রয়েছে শুধু মানুষ এবং বস্তু, হাত এবং দাঁড়িপাল্লা, দৈহিক শক্তি এবং চাকা, দৈনন্দিন একঘেয়েমি এবং ক্ষণস্থায়ী আবেগ। জগতের এই বিবিধ খণ্ডাংশের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মানুষের কল্পনা, ফলে এই কল্পনার পক্ষে এই ভগ্নাংশগুলোকে একটা সমগ্র হিসেবে অনুভব করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আধুনিক মেট্রোপলিসের প্রথম লেখক এডগার অ্যালেন পো এবং বোদলেয়ার এই খণ্ডিত বাস্তবতার সাথেই নিজেদের কল্পনাকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে ধারণ করেছিলেন মস্তিষ্কে, পুনরায় তাদের একটা স্বনির্ভর ঐক্যে ফিরিয়ে আনবার লক্ষ্যে। বোদলেয়ার বলেছিলেন—"কল্পনা, সমগ্র সৃষ্টিজগৎটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তারপর সেখান থেকে খণ্ড খণ্ড অংশ গ্রহণ করে তাকে সাজিয়ে তোলে নিয়মমাফিক, যে নিয়ম আত্মার গভীর থেকে উত্থিত হয়। এভাবে সৃষ্টি হয় নতুন আরেক জগৎ।" বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ছাড়াও একটা আপাত ধ্রুপদীত্বকে ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁর কবিতার গাঁথুনি মজবুত, আঙ্গিক সুষম। র‍্যাঁবোই প্রথম কবি যিনি কবিতার গতানুগতিক আঙ্গিক এবং গঠনের উপর আঘাত হানেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লিখেছিলেন এমন এক ঝড়ের কথা, যে ঝড় দেয়ালে ফাটল ধরায়, বাড়ির সীমানা গুঁড়িয়ে দেয়। সাধারণ বাস্তবতাকে ভেঙে দিয়ে নতুন কবিতা নিজের জন্য নতুন এক জগৎ নির্মাণ করে নিয়েছিল। Le bateauivre কবিতাটিই যেন একটার পর একটা দৃশ্যের বারিপাত, যেন আদি অন্তহীন এক ঝর্নাধারা ধ্বংসপ্রাপ্ত জগতের ভগ্নাংশসমূহকে দৃষ্টি আর মনের বাইরে বয়ে নিয়ে চলেছে—

বিদ্যুৎগর্ভ ছোট ছোট চন্দ্রখচিত,
কালো সামুদ্রিক অশ্ববাহিত,
সেই ধাবমান উন্মাতাল পাটাতন,
জুলাই-এর দিনগুলো যখন উজ্জ্বল চিমনিসম
বিশুদ্ধ নীল আকাশকে সবেগে এসে আঘাত করে,
দেড়শো মাইল দূরত্বে আমি কাঁপি আর বুঝতে পারি
প্রগাঢ় প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে আটকে পড়া অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক
প্রাণীদের আর্তনাদ।
হে নীল নিশ্চলতার চির আবর্তক, আমি চাই ইউরোপ আর
তার সুপ্রাচীন দুর্গপ্রাচীর!
আমি তো দেখেছি নক্ষত্রখচিত দ্বীপমালা।
দেখেছি সেই দ্বীপমালা যার মাতাল আকাশ ভাসমান
মানুষের কাছে উন্মুক্ত
হে লক্ষ লক্ষ সোনালি পাখিরা, হে অনাগত দিনের শক্তি,
তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়ো সেইসব অতল রাত্রিতে?
আর সেখানেই নিজেকে নির্বাসিত করো?

এ ধরনের কবিতা পূর্বে কখনো লেখা হয়নি, এমনকি বোদলেয়ারের সেই বিখ্যাত 'লো ভয়েজ' কবিতাটিকেও এর তুলনায় Ransard ধারার একটা রক্ষণশীল কবিতা বলে মনে হয়। বারো একজন বৈজ্ঞানিকের সাহসিকতায়, সুন্দর এবং কুৎসিত, সুরুচি এবং অশ্লীলতা, কল্পনা এবং বাস্তব, বিচূর্ণ পৃথিবীর এই খণ্ডাংশগুলো একত্রিত করেছিলেন একস্থানে, যেন কোনো স্বপ্নের দৃশ্য। কবিতা বলতে অতীতে যা বোঝাত এ ছিল তার বিরুদ্ধে এক বিপ্লব। পরবর্তীকালে রিলকে, গডফ্রিড বেন, এজরা পাউন্ড, এলিয়ট, এলুয়ার, অডেন, আলবার্টি প্রমুখ আধুনিক কবি তাঁদের কবিতায় যে খণ্ডাংশের মন্তাজ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অযৌক্তিকতা চর্চা করেছেন তার সূত্রপাত রাঁবোর কবিতা থেকেই। কবিতার এই বিচূর্ণীকরণ, আঙ্গিক বর্জন এবং এরকম বন্ধনহীন অলীক কল্পনাপ্রবণতা নিয়ে বিলাপ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরতার কোনো অর্থ নেই। একথা অনস্বীকার্য যে কবিতায় এ প্রবণতার আবির্ভাব অবক্ষয়েরই পরিণতি কিন্তু সেসাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একথাও সত্য যে এসকল কবিতা শিল্পের অনেক নতুন সম্ভাবনা এবং নতুন প্রকাশ পদ্ধতিকেও উন্মোচিত করেছে। কবিতার অতীত আঙ্গিককে মায়াকোভস্কিও ভেঙেছিলেন কিন্তু তাঁর কবিতাকে তিনি নিপুণভাবে বিপ্লবের বাস্তবতাকে ধারণ করবার উপযোগী করে তুলেছিলেন। তেমনি ভিন্ন আঙ্গিকে ব্রেখটও উপস্থাপন করেছিলেন অলীক কল্পনার জগৎকে, সে কল্পনা ছিল গঠনমূলক, কারণ তাঁর কাব্যিক বুদ্ধিবৃত্তি যৌক্তিকতার উপর নির্ভরশীল, অযৌক্তিকতার উপর নয়। সেটা মানসিকতার প্রশ্ন, আঙ্গিকের নয়। মায়াকোভস্কি এবং ব্রেখট শিল্পের সেই নতুন প্রকাশপদ্ধতিকে শ্রেণিসংগ্রাম এবং বিপ্লবের ভাবধারা প্রকাশের নিমিত্ত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ফলে তারা খণ্ডায়নের অর্থহীনতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুর্জ্ঞেয়করণ

সাম্প্রতিক বুর্জোয়াবিশ্বের শিল্পসাহিত্যে দুর্জ্ঞেয়করণের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। বাস্তবতাকে দুর্জ্ঞেয়তার আবরণে ঢেকে রাখাই দুর্জ্ঞেয়করণ। এ প্রবণতা মূলত বিচ্ছিন্নতারই পরিণতি। শিল্পায়িত পণ্যময় বুর্জোয়াসমাজ তার অধিবাসীদের কাছ থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, বাস্তবতা এত অনিশ্চিত হয়ে গেছে এবং সকল তুচ্ছতাই এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে শিল্পীসাহিত্যিকগণ বস্তুজগতের এই দুর্ভেদ্য বাহ্যিক আবরণকে ভেদ করতে যে-কোনো উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অসহ্য জটিল এই বাস্তবতাকে সরল করে তুলবার আশায় এবং মানুষকে পণ্যসম্পর্কের এই বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায়েই শিল্পসাহিত্যে পুরাণের আবির্ভাব। পুরাণকে ধ্রুপদী সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছিল নেহাত একটা রীতি হিসেবে। রোমান্টিকতাবাদ পুরাণকে ব্যবহার করেছে নীরস বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ আবেগ এবং যা-কিছু আতিশয্যময় এবং মৌলিক তাকে প্রকাশের উপায় হিসেবে। কিন্তু পুরাণের এ ধরনের ব্যবহার বিপজ্জনক, কারণ এ পদ্ধতি অনৈতিহাসিক মৌলিক মানবকে সমাজ-বিকশিত মানবের বিপক্ষে স্থাপন করে, শাশ্বতকে স্থাপন করে কালনিয়ন্ত্রিতের বিপক্ষে।

দুর্জ্ঞেয়করণ এবং পৌরাণিকীকরণ আসলে সচেতন কৌশলে সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহকে এড়ানোর উপায়ই বাতলে দেয়। এ প্রবণতা সামাজিক বাস্তবতা এবং আমাদের কালের সকল ঘটনা আর দ্বন্দ্বকে এক নিঃসময় অবাস্তবতায় পৌঁছে দেয়, নিয়ে যায় চিরন্তন, পৌরাণিক, পরিবর্তনহীন মৌলিক সত্তার কাছে। এতে ইতিহাসের বিশেষ ক্ষণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সত্তার সাধারণীকৃত ধারণায় বিভ্রান্ত করা হয়। সামাজিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশ্বকে উপস্থাপন করা হয় মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্বরূপে। ফলে এমন এক জগতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগন্তুক তাদের মানুষটি কোনোপ্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনবোধ করেন না বরং নিজেকে সাধারণ মানুষদের এই জগতের ঊর্ধ্বে অভিজাতদের এক জগৎ স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে নিচে তাকিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ অসহায় সামাজিক মানুষদের কুৎসিত কর্মকাণ্ডগুলো করুণার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

উদ্ভট আত্মম্ভরী উপন্যাস 'দ্য আউটসাইডার'-এর লেখক কলিন উইলসন তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন কোনো ব্যাপারেই অঙ্গীকারবদ্ধ না হন, সকল সামাজিক বাধা থেকে মুক্ত হয়ে তারা যেন কেবল নিজের 'আমিত্ব' রক্ষাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি বলেছেন একটা নতুন মানবতাবিরোধী যুগকে অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিত, কারণ আমাদের কাল ইতিমধ্যেই অতিমাত্রায় মার্কসীয় ভাবধারাকে গ্রহণ করে ফেলেছে। বইটির পরিশেষে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন—"মানুষ তার দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেছিল একজন আগন্তুক হিসেবে; সে যাত্রা তার শেষ হবে একজন সন্ন্যাসীরূপে।" উইলসনের চেয়েও মেধাবী লেখক খাঁটি পৌরাণিক সত্তাসম্পন্ন গুন্টার ব্লকার আরও সন্দেহমুক্তভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ব্লকার তার 'দ্য নিউ রিয়ালিটিজ' গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী অঙ্গীকারবদ্ধ লেখকদের ভর্ৎসনা করে বলেছেন—

"যিনি বিশ্বাস করেন যে, এ জগতের অশুভ ব্যাপারগুলোর জন্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতাই দায়ী তিনি আসলে বুদ্ধিবৃত্তির নিতান্ত শৈশবে অবস্থান করছেন। তখনই তিনি বুদ্ধিতে পরিণত হয়ে উঠবেন যখন বুঝতে পারবেন জগৎ বস্তুত প্রকৃতিগতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ, যে ত্রুটি কিছুটা হয়তো উপশম করা সম্ভব কিন্তু কখনোই বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়।"

হারমান ব্রশ বলেছেন সকল সাহিত্যই আজ পুরাণের দিকে ধাবিত। কিন্তু পুরাণ কী? সে ব্যাখ্যা দিতে ব্রশের ক্লান্তি নেই—

"পুরাণ হচ্ছে প্রারম্ভ, মানুষের কথার প্রথম ভাষারূপ, আদি প্রতীকের ভাষা, যাকে প্রতি যুগেই উচিত নতুনভাবে আবিষ্কার করা। এ হলো যুক্তিবহির্ভূত সরাসরি বিশ্বদৃষ্টি, আদি দৃষ্টি, একটা অখণ্ড দৃশ্যে সমগ্র জগতকে দেখা।"

কর্ম নয়, সত্তাই জরুরি—এ ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার প্রতিনিয়ত চলছে। গারট্রুড স্টিন বলেছেন—"ঘটনাবলি এখন আর জনগণের উপর নির্ভর করে না, মানুষ এখন কেবল অস্তিত্বের ব্যাপারে আগ্রহী।" কিন্তু সত্তা স্থবির, কর্ম গতিময়। যারা কর্মের বদলে কেবল সত্তার ব্যাপারে মগ্ন হয়েছেন, যারা পরিবর্তনশীল গতিময় সমাজ ছেড়ে পুরাণের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর নেপথ্যে রয়েছে সমাজবিপ্লবের অবচেতন ভয়। ব্রেখট লিখেছেন—"জগৎ এমন আছে বলেই এমনটি থাকবে না চিরকাল।" এ সত্যটিকে অস্বীকার করবার জন্যই বস্তুত পৌরাণিক সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রোমান্টিকতাবাদ 'মৌল আবেগ'কে পূজ্য করে তুলেছিল। পুরাণ-স্রষ্টা নয়া রোমান্টিকগণ যুক্তিহীনতাকে গ্রহণ করেছে মানুষের মৌলিক সত্তা হিসেবে। ফলে প্রকারান্তরে অসচেতনভাবে সামাজিক অযৌক্তিকতার শাসনকেই তারা সমর্থন করেছেন। ব্লাকার বলছেন—"মানুষের 'সত্তা' যেন এক অনিঃশেষ প্রতিনিধি, যেন এক আদিম বিলাপ, বাণী উচ্চারণের প্রারম্ভিক প্রয়াস, যাতে পরিস্ফুট হয়েছে মানবসত্তার রূপ গ্রহণের আদি আভাস।" আধুনিক অতীন্দ্রিয়বাদীদের এই বিলাপ, এই বাণী উচ্চারণের প্রারম্ভিক প্রয়াস বহু আগেই আরও প্রশংসনীয় সরলতায় কি সম্পন্ন হয়নি? যেমন--

"পৃথিবীতে এ সবকিছুরই একটা যথাকাল আছে—জন্ম এবং মৃত্যু, বপন এবং উৎপাটন, হত্যা এবং বাঁচানো, ভাঙা এবং গড়া, হাসা এবং কাঁদা, শোক এবং উল্লাস, পাথর সরানো এবং পাথর জড়ো করা, আলিঙ্গন করা এবং আলিঙ্গন মুক্ত হওয়া, পাওয়া এবং হারানো, সঞ্চয় এবং ত্যাগ করা, ছেঁড়া এবং সেলাই করা, নিশ্চুপ থাকা এবং কথা বলা, ভালোবাসা এবং ঘৃণা করা, যুদ্ধ এবং শান্তি।"

কিংবা 'বুক অব জব'এ—

"নারী থেকে জন্ম নেয়া এই মানুষগুলো ক্ষণস্থায়ী এবং ঝামেলাপূর্ণ। মানুষ ফুলের মতো আবির্ভূত হয় এবং ঝরে যায়, সে ছায়ার মতো পালিয়েও যায় আর ফেরে না। ...বৃক্ষের তবুও আশা আছে, তাকে কাটা হলেও আবার সে অঙ্কুরিত হবে, লুপ্ত হবে না তার শাখা। তার মূল মাটির বহু নিচে বহুদিনের পুরনো হয়ে যায়, শাখা পড়ে থাকে তবুও জলের সুগন্ধে একদিন তাতে ফুল ফুটবে, দেখা দেবে বৃক্ষের শাখা। কিন্তু মানুষের মৃত্যু হলে চিরতরেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

কোনোরকম ভানভণিতা ছাড়া এরকম স্পষ্ট ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছিল মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু, হত্যা এবং আরোগ্য, হারানো এবং প্রাপ্তির সংগীত, যাকে তারা বলে থাকেন 'মানবসত্তা'।

কিন্তু নিরন্তর পরিবর্তনশীল এ বাস্তবতা সম্পর্কে কেবল এতটুকু ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়, বলবার আরও আছে। মানুষের সত্তা জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন তাড়না আর বার্ধক্য ক্লান্তির এই শাশ্বত চক্রের চাইতেও বৃহত্তর একটা প্রসঙ্গ। মানুষ এমন এক অসম্পূর্ণ সত্তা যাকে গড়ে তোলা হয়েছে এবং এখনও যে নিজেকে গড়ছে। এই অসম্পূর্ণতা ঘুচাবার নয় তবু মানুষ নিরন্তর তার পরিপার্শ্বকে পরিবর্তিত করছে এবং সাথে সাথে নিজেও পরিবর্তিত হচ্ছে। অনেক উপন্যাস, নাটক এবং চলচ্চিত্রে মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডকে অতি সরলভাবে চিত্রিত করা হয়, সেখানে মানুষেরা সমাজের হাতের পুতুল মাত্র, তাদের নিজস্ব কোনো দ্বন্দ্ব নেই, ব্যক্তিগত স্বপ্ন বা বেদনা নেই। মানুষকে এভাবে শুধুমাত্র একটা সামাজিক সত্তার ধারক হিসেবে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিবাদ করেন তবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্যই তা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যারা মানুষকে পৌরাণিক কালে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেয় তারা মোটেও বাস্তবতার সামগ্রিকতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না বরং ভিন্নপথে তারা বাস্তবতাকে শূন্য করে নিতে চান। তারা মানুষকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে নিঃসঙ্গ, লক্ষ্যহীন, হতাশ এক প্রাণীতে পরিণত করতে চান, এমন সত্তার অস্তিত্ব বস্তুত কখনোই ছিল না।

আদিম, পৌরাণিক সেই প্রারম্ভিক পৃথিবীতে প্রবেশের এই আকুতি কার্যত দায়িত্বহীনতায় পলায়নেরই আকুতি। তবে পাশাপাশি স্বাভাবিকতাবাদের প্রতি তাদের প্রতিবাদ এবং নতুন প্রকাশভঙ্গির অন্বেষা জন্ম দিয়েছে কাফকার বাস্তবতাকে, পুরাণের আপাত রূপান্তরের সেই বিশিষ্ট পদ্ধতিটি। কাফকার পাণ্ডুলিপিগুলো রক্ষা করবার জন্য পৃথিবী অবশ্যই ম্যাক্স ব্রডের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে কিন্তু ব্রডের ভুল ব্যাখ্যার কারণে কাফকার বহু লেখা বিফলেও গেছে। কাফকা কোনো মহাশূন্য বা আদিমকালে বসে মানুষের এই মানসিক যাতনার কথা লেখেননি, লিখেছিলেন বিশেষ একটা সমাজবাস্তবতাতেই। কাফকা অস্পষ্ট এক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একজন একক মানুষের যন্ত্রণাকর সংগ্রামকে প্রকাশ করবার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন ব্যঙ্গ এবং বাস্তব মিশ্রিত স্বপ্নচেতনার চমৎকার এক আঙ্গিক। ব্রড এ ধরনের বাস্তবতার প্রতিবিম্বগুলোকে শাশ্বতের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি কাফকার বিচ্ছিন্ন রহস্যময় উপাদানগুলো থেকে এক সামগ্রিক রহস্যময়তাকে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মতে বাস্তব ও ভৌতিক এই জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে কাফকা যে নতুন প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছেন সেটা আসলে ধর্মীয় অনুভূতি ধারণ করবার এক সাংকেতিক ভাষা। এই অপব্যাখ্যার কারণেই কাফকা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়েছেন এবং বহু অতীন্দ্রিয়বাদীদেরও আকৃষ্ট করেছেন।

কাফকার প্রকাশভঙ্গির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে ব্রেখটীয় রীতির। ব্রেখট যে রীতিতে সরল উপদেশমূলক ছোটগল্পের ঢঙে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই দুই মহান লেখক ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। কাফকা ছিলেন সিদ্ধান্তহীন, তিনি ছিলেন ক্ষমতাধারীদের বিপক্ষে এবং অপমানিতের পক্ষে কিন্তু এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না যে তাঁর দলের ঐ অপমানিতেরাই জগৎকে বদলাবার ক্ষমতা রাখে। তাঁর মনের প্রতিটি নতুন আশার পেছনে ছিল নতুন কোনো ভয়, প্রতিটি উত্তরের পেছনে ছিল নতুন কোনো প্রশ্ন। কিন্তু ব্রেখটের ছিল উত্তর দেবার সাহস। তার নাটকগুলো এক একটি শিক্ষাপ্রদ নিবন্ধ। এ জগৎ যে পরিবর্তনশীল এবং জগৎ যে আরও সুন্দর ও যৌক্তিক হয়ে উঠতে পারে ব্রেখটের এ বিশ্বাস ছিল দ্বিধাহীন। সেসাথে একথাও তিনি অবশ্যই জানতেন যে সকল উত্তরই একটি নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়, তিনি জানতেন জগতে চূড়ান্ত বলে কিছুই নেই। কিন্তু এ সত্য তাঁকে কাফকার মতো অবদমিত,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহসহীন করে রাখেনি। কাফকা ছিলেন সচেতনভাবে নিঃসঙ্গ, তিনি প্রগতিতে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর ধারণা ছিল যে জগতে আসলে একই ব্যাপার ঘুরেফিরে ঘটতে থাকে। কিন্তু সকল অসঙ্গতি সত্ত্বেও একদিন যে পৃথিবীতে নতুন দিগন্ত দেখা দেবে ব্রেখটের এ বিশ্বাস ছিল প্রশ্নাতীত।

কাফকা এবং ব্রেখট উভয়েই তাঁদের লেখায় সমাজবাস্তবতাকে চিত্রিত করেছিলেন। প্রাচীন পুরাণ কাহিনী যেমন ঐতিহাসিক অতীতের সারাংশকে প্রকাশ করে তারা তেমনি ঐতিহাসিক বর্তমানের সারাংশকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের লেখায়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ক্যামু বা বেকেট ধারার লেখকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়, তাঁরা মানুষকে সমাজ পরিত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, মানুষের পরিচয়কে মুছে দিয়ে তাকে শাশ্বত সত্তা আর আকারহীন মৌলিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। একথা সত্য যে প্রতিটি মানুষই তার সামাজিক মুখোশের অতিরিক্ত একটা সত্তা। কিন্তু সেসূত্রে মানুষকে যারা মহাশূন্যের রহস্যময় লীলায় নিযুক্ত করেন, যারা মানুষের সামাজিক এবং ব্যক্তিক রূপকে পৌরাণিক কুয়াশায় ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন তারা মানুষকে অর্থহীন শূন্যতার দিকেই চালিত করেন। যে মানুষটি কোনো সমাজে বাস করে না তার কোনো আত্মপরিচয় নেই, সে যেন শূন্যতা থেকে শূন্যতায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ানো সরীসৃপ। এভাবেই দুর্জ্ঞেয় সাহিত্যে বাস্তবকে পরিণত করা হয় অবাস্তবে, মানুষকে অমানুষে।

সমাজ থেকে পলায়ন

শিল্পসাহিত্যে সমাজ বিবর্জন, পলায়নবৃত্তির একটা বিশেষ মোটিফের জন্ম দেয়, একটা শুদ্ধসত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বিপর্যস্ত সমাজ থেকে পলায়নের মোটিফ। গারট্রুড স্টিন যখন একঘেয়ে কোনো জাদুমন্ত্রের মতো পুনরাবৃত্তি করে চলেন—'গোলাপ হলো একটা গোলাপ, একটা গোলাপ, একটা গোলাপ', তখন তিনি আমাদের সামাজিক বাস্তবতা থেকে যাবতীয় যোগাযোগ ছিন্ন করে শুধুমাত্র একটা বস্তুর উপর সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতেই প্ররোচিত করেন। গারট্রুড স্টিনের সফল শিষ্য আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর প্রথম দিককার পনেরোটি গল্পের সংকলন 'ইন আওয়ার টাইম' গ্রন্থটিতে সমাজ থেকে পলায়নের কৌশল বেশ বিশুদ্ধভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। গল্পগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট প্যারাগ্রাফে আমাদের সময়ের দুর্ঘটনাগুলোর ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে—যুদ্ধ, হত্যা, নিপীড়ন, রক্তপাত, নৃশংসতা ইত্যাদি, যেগুলোকে আধুনিক জ্ঞানবিরোধীগণ নেহাত 'ইতিহাসের বিবেকহীনতা' বলে বাতিল করে দেন। গল্পগুলোর বিষয়বস্তুতে রয়েছে একধরনের আপাত ঘটনাহীনতা, সবকিছু যেন ঘটছে নিত্যকার পৃথিবীর বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে। এই 'দূর' এবং 'ঊর্ধ্বে'র সত্তাকেই সম্মান করা হয়েছে যথার্থ সত্তা হিসেবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তেমনি একটা কাব্য গুণসমৃদ্ধ গল্পে জনৈক নিঃসঙ্গ নিকে'র রাতের বেলা তাবু বাঁধবার বর্ণনা রয়েছে—

"সে তার তাঁবু সাজিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক। কোনোকিছু এখন আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তাঁবু খাটাবার এ এক চমৎকার জায়গা। সে এখন সেই চমৎকার জায়গায়। সেখানে তার নিজের তৈরি ঘরে সে বসে আছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। তাঁবুর ভেতর কিছুটা আলো।"

উপরের এই বর্ণনার সাথে 'গোলাপ হলো একটা গোলাপ, একটা গোলাপ, একটা গোলাপ'—এই বর্ণনার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এ দৃশ্যটি সমাজ থেকে পলাতক একজন মানুষের জীবনদর্শনেরই প্রকাশ। পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও তোমার তাঁবু গাড়ো, সে তাঁবুর মতো চমৎকার জায়গা আর কোথাও নেই। পৃথিবী অন্ধকার। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ো তাঁবুতে। সেখানে কিছুটা আলো।

সাম্প্রতিক বুর্জোয়াসমাজের সর্বব্যাপী প্রত্যাশার আদর্শ প্রকাশ ঘটেছে হেমিংওয়ের মনোভাবে। অসংখ্য মানুষ, বিশেষত যুবকেরা তাদের অসন্তুষ্ট জীবন থেকে আজ মুক্তি চাইছে, মুক্তি চাইছে দৈনন্দিন জীবনের শূন্যতা থেকে, বোদলেয়ার কথিত সেই একঘেয়েমি থেকে, যাবতীয় সামাজিক দায়িত্ব আর আদর্শ থেকে। বিকট শব্দে কোনো মটরসাইকেলে চড়ে তীব্র বেগে, শব্দ আর গতির নেশায় মাতাল হয়ে দূরে কোথাও তারা হারিয়ে যেতে চাইছে, হারিয়ে যেতে চাইছে ভাবনাহীন কোনো এক ছুটির দেশে, যেন আসন্ন কোনো দুর্যোগ, ভয়ঙ্কর কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়েছে তারা। এমনি শ্বাসরুদ্ধকর উদ্বিগ্নতায় পুঁজিবাদী সমাজের সমগ্র প্রজন্মটি নিজেদের কাছ থেকেই পালিয়ে বেড়ায় নিরন্তর। পালাতে চায় অজানা, অচেনা কোনো দূরদেশে, ছোট কোনো তাঁবুতে। যার বাইরে অন্ধকার, ভেতরে কিছুটা আলো।

শিল্পে সমাজ ও মানববিবর্জনের এই সমস্যাটি আরও প্রকট হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প উৎপাদনের উন্নয়নের কারণে, যার সূত্রপাত ফটোগ্রাফ এবং রেকর্ড আবির্ভাবের মাধ্যমে। এসব প্রযুক্তি সর্বসাধারণে চিত্তবিনোদনের পণ্য সরবরাহের এক বিশাল কারখানার জন্ম দিয়েছে। সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য উৎপাদিত এসব শিল্পের বর্বর চরিত্র, বিষয়বস্তুর মানবতাবিরোধী উপাদান সুবিদিত। এসব শিল্পের প্রবণতা, সাধারণের উপর এর প্রভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে গেলে ভিন্ন একটা বই লেখা প্রয়োজন। আমি এখানে কেবল দুটো বিষয়কে চিহ্নিত করব। প্রথমত, মোটা মানসম্পন্ন লেখকগণ সাধারণত এমন কিছু মডেল সরবরাহ করেন যা পরবর্তীকালে আরও স্থূল ও চটুল আকারে চিত্তবিনোদনের ঐসব কারখানাসমূহ অনুকরণ করে চলে। ফলে শিল্পব্যবসায় মানবতাবিরোধী প্রবণতাই প্রকট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, যে শিল্প দৃঢ়তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাথে সাধারণের পছন্দকে অস্বীকার করে এবং মুষ্টিমেয় বোদ্ধার পছন্দকেই কেবল গৌরবময় বলে মনে করে সে শিল্প সাধারণের চিত্তবিনোদনের সেইসব তথাকথিত শিল্পের বিপুল বন্যারোধকারী ফটকটি খুলে দেয়। শিল্পী সাহিত্যিকগণ যত সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয় ততই সাধারণের শিল্পপ্রত্যাশা পূরণের প্রবল তোড়ে জনগণের উপর নেমে আসে বর্বর, জঘন্য সেইসব শিল্পের বন্যা। সাম্প্রতিক বুর্জোয়াজগতের এই নতুন নৃশংসতা আধুনিক কতিপয় নন্দনতাত্ত্বিক কর্তৃক প্রশংসিত হয়ে মুক্ত বাণিজ্যের পথ করে নিয়েছে।

বাস্তববাদ

পুঁজিবাদী বিশ্বের সব প্রধান শিল্পীসাহিত্যিকগণই সমসাময়িক জগতের সাথে সমঝোতা গড়ে তুলতে অক্ষমবোধ করেন। ইতিপূর্বে দেখা গেছে সকল সমাজব্যবস্থারই নিজস্ব সমর্থক শিল্পীসাহিত্যিক গোষ্ঠী রয়েছে (পাশাপাশি বিদ্রোহী গোষ্ঠীরও হয়তো উপস্থিতি আছে) কিন্তু কেবলমাত্র পুঁজিবাদী যুগে এসেই দেখা গেল, সাধারণ মানের কিছু শিল্প ছাড়া সকল উঁচুমানের শিল্পই বস্তুত বিদ্রোহ, সমালোচনা আর অসন্তোষের শিল্প। পুঁজিবাদের প্রভাব মানুষকে প্রকটভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তার পরিবেশ এবং আত্মসত্তা থেকে, মানুষ মুক্ত হয়ে গেছে মধ্যযুগীয় সকল গিল্ড এবং শ্রেণির বন্ধন থেকে। ফলে মানুষের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সে অনুধাবন করেছে সমসাময়িক বিশ্বে জীবনের যথার্থ পূর্ণতা এবং স্বাধীনতার আনন্দ থেকে মানুষ কত ব্যাপকভাবে বঞ্চিত, লক্ষ করেছে কীভাবে সমগ্র জাগতিক সম্পদ বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এবং সমগ্র জগৎটা কীভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে স্থূল উপযোগিতাবাদে। এমন একটা পরিস্থিতিতে স্বভাবতই সামান্যতম আবেগ এবং কল্পনাসম্পন্ন মানুষ পুঁজিবাদের বিজয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতি জাঁ জ্যাক রুশোর আক্রমণ এবং রোমান্টিক বিদ্রোহ, এ দুয়ের মধ্যদিয়ে সেই প্রত্যাখ্যান প্রক্রিয়ার শুরু। হেগেল 'বিচ্ছিন্নকরণের শক্তিবৃদ্ধির' কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন—"যখন মানুষের জীবন থেকে ঐক্য নির্মাণকারী শক্তিসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যখন দ্বন্দ্বসমূহ তাদের পূর্বসূত্র হারিয়ে স্বাধীন হয়ে ওঠে তখনই জন্ম হয় দর্শনের।" এই একই যুক্তির ভিত্তিতে শেলি তাঁর 'ডিফেন্স অপ পোয়েট্রি' গ্রন্থে লিখেছিলেন—"মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতার নিয়মে সৃষ্ট বহির্জগতের বস্তুগত আয়োজনের ব্যাপকতাকে যখন মানবিক ক্ষমতায় আত্তীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে তখনই কবিতাজন্মের সুবর্ণকাল।" তখন সকল কবিতার মূলভাব ছিল বুর্জোয়া মুল্যবোধের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ 'আমি'। যেমন বায়রনের 'ম্যানফ্রেড' কবিতাটি—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষের সাথে কথা হয়েছে আমার
তাদের ভাবনার সাথেও হয়েছে আদান প্রদান
কিন্তু আমার প্রকৃত আনন্দ ছিল নির্জনতায়,
বরফাবৃত পাহাড়চূড়ায় দুরূহ নিশ্বাস নেয়ায়...
এই আমার সুখ, আমার এই একা থাকা...
জনতার সাথে মিলিত হবার কোনো ইচ্ছা নেই আমার
তাদের নৃপতি হিসেবেও নয়।
সিংহ বরাবরই একা এবং আমিও তাই।

কিংবা ফ্রানজ গ্রিলপার্জারের 'লিবুসা' কবিতাটি—

আত্মস্বার্থ তোমার যজ্ঞবেদী
আত্মপ্রেম তোমার প্রকৃতি...
তুমি যাত্রা করবে অজানা সমুদ্রে,
শুষে আনবে জগতের যা-কিছু প্রয়োজন তোমার
তুমি সবকিছুই গ্রাস করবে, এবং
সবকিছু গ্রাস করবে তোমাকে।

অথবা স্তাঁদালের লেখায়—

"আত্মপ্রেমের এই মরুভূমে প্রত্যেকেই আজ কেবল তার নিজের জন্য, এরই নাম জীবন। যে বস্তুকেন্দ্রিক, স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি এই বইটি (দো লা মুর) খুলবার আগের বছর এক হাজার ফ্রাঁ উপার্জন করেছেন তার উচিত তাড়াতাড়ি বইটি বন্ধ করে দেয়া বিশেষত তিনি যদি ব্যাংকার, শিল্পপতি অর্থাৎ বলতে গেলে সম্ভ্রান্ত উদ্ভাবন ভাবধারার ব্যক্তি হন।"

কিংবা হাইনে—

অবশেষে আসুন আমরা আমাদের দলিল দেখি,
কেবলই তো দানবিক, রক্তাক্ত অপরাধসমূহ
কোথাও নেই সেই পুষ্ট পবিত্রতা
নেই সক্ষম নৈতিকতা।

একজন একাকী মানুষের এই রোমান্টিক বিদ্রোহ, বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অভিজাত ও অন্ত্যজ শ্রেণির এই মিলিত প্রতিবাদই জন্ম দিয়েছে 'সমালোচনামূলক বস্তুবাদ'। বুর্জোয়াসমাজের বিরুদ্ধে নেহাত রোমান্টিক প্রতিবাদটি ক্রমান্বয়ে সে সমাজের সমালোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। রোমান্টিকতাবাদ এবং বাস্তববাদ তাই কোনোভাবেই দুটি ভিন্নমুখী ধারা নয় বরং রোমান্টিকতাবাদ, সমালোচনামূলক বাস্তববাদেরই প্রারম্ভিক

~ www.amarboi.com ~

স্তর। মূল ভাবধারার কোনো পরিবর্তন হয় না কেবল পদ্ধতিটি হয়ে পড়ে পৃথক, শীতল এবং আরও বস্তুগত।

বায়রনের অসম্পূর্ণ 'ডন জুয়ান', যা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বস্তুত রোমান্টিক প্রতিবাদ এবং বাস্তববাদী সামাজিক সমালোচনার মিশ্রণ। এটা সেই কবির শিল্পকর্ম নয় যিনি কেবল নিজের সাথেই কথা বলেন, এখানে মূল চরিত্রের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রকে এবং তাদের পরস্পরের দ্বন্দ্বকে দেখানো হয়েছে সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে। রোমান্টিক 'আমি' এখন আর মুক্ত নন। রোমান্টিক অমিতাচারকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করছে ঘৃণা। ডন জুয়ান যদিও পুরনো রোমান্টিক নায়কদের মতোই সাহসিকতা এবং জীবনতৃষ্ণায় ভরপুর কিন্তু তিনি মোটেও আর ঈশ্বর অথবা শয়তানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত নন। বরং তিনি তাঁর সকল অভিযানে পরিপার্শ্বের এই কপটতা, ভণ্ডামি আর সংকীর্ণতা ভরা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একজন জীবন্ত প্রতিবাদ, কাঙ্ক্ষিত সততা আর নিষ্কলুষ আবেগের প্রতিরূপ।

বালজাক এবং স্তাঁদাল বিপ্লব-পরবর্তী সমাজের পক্ষ নেবেন নাকি অভিজাত, অর্থবান আর পদবি-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের পক্ষ নেবেন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বায়রনের তুলনায় কম প্রস্তুত ছিলেন। বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের প্রতি বালজাকের বিতৃষ্ণা থাকলেও শেষপর্যায়ের উপন্যাসগুলোতে তিনি পুঁজিবাদের বিজয়কে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। যে মানুষেরা বারবার এই পৃথিবী থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছেন কিংবা La cousine bette-এর Wenceslaus-এর মতো সৃষ্টিমত্ত যে শিল্পীগণ নিজেদের জীবনকে বলেছেন, 'অপব্যয়ী কল্পনার এক বেশ্যার জীবন', তেমন সব ব্যক্তিদেরই তাঁর লেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র হিসেবে। বাস্তববাদী সমালোচনা এখানে রোমান্টিক প্রতিবাদে রূপলাভ করেছে, ধারণ করেছে পবিত্র আত্মসমর্পণ ও কলঙ্কিত সাফল্য, প্রতিভা ও বুর্জোয়া প্রভৃতির রোমান্টিক অ্যান্টিথিসিসকে। সবচেয়ে সাহসী এবং শক্তিমান যে উপন্যাসটি রোমান্টিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছে সেটা স্তাঁদালের Lucien Leuwen। এর সমাজবিশ্লেষণে অন্তর্দৃষ্টি এবং সমালোচনার তীব্রতা বালজাকের সকল লেখাকে অতিক্রম করে গেছে। বুর্জোয়া বিপ্লব সমাপ্ত হয়েছে, পেছনে ফিরে জ্যাকোবিন বা তরুণ নেপোলিয়ানের দিকে তাকানোর আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু সামনে? রিপাবলিকান এবং সেন্ট সাইমনিস্টদের প্রতি Lucien-এর যথার্থই সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু তাদের যুক্তিগুলো তাঁর কাছে কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে সে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছে তেমনি প্রত্যাখ্যান করেছে চতুর, রক্ষণশীল Alexis de Tocqueville-কে। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রীয় গাড়িটি রাস্তার উল্টোদিকের নর্দমায় পড়ে গেছে, আমাদের দিকে নয়। নিরঙ্কুশ ভোটাধিকার একজন নোংরা হাতের স্বৈরাচারীর মতো দেশশাসন করছে। Lucien Leuwen-এ রয়েছে মোহমুক্তির নির্মম

~ www.amarboi.com ~

পরিণতি, রয়েছে স্ববিরোধী সমালোচনা, যা একাধারে নৈতিক এবং নান্দনিক। উপন্যাস শুরু হয়েছে প্যারিসের শীতল হৃদয় থেকে Lucien-এর পলায়নের মধ্যদিয়ে। Lucien সেখান থেকে জেনেভায় গিয়ে La Nouvelle Helois-কৃত বিখ্যাত স্থানসমূহ দেখে, তারপর চলে যায় ইতালিতে যেখানে এক বিনম্র বিষণ্নতা তার অন্তরকে খুলে দেয় শিল্পের জগতে। শেষ বাক্যগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক—"বোলগা এবং ফ্লোরেন্সে তাকে যে সূক্ষ্ম আবেগপ্রবণতা এবং সংবেদনশীলতার স্তরে পৌঁছে দেয়, তিন বছর আগে হলে তাতে তার অনুশোচনা হতো। বস্তুত ক্যাপেলে পৌঁছে নিজেকে সে অন্যের সামনে একজন আবেগহীন শীতল মানুষ হিসেবে উপস্থিত হবার যোগ্য করে গড়ে তুলেছে।"

কে জানে Lucien-কে শেষে কোথায় পাঠাতেন স্তাঁদাল, তবে খণ্ডাংশের ইঙ্গিত (মার্ক্সের ভাষায়)—বুর্জোয়া ধারণার পাশাপাশি রোমান্টিক ধারণা সবসময় ন্যায়সঙ্গত বৈপরীত্যরূপে উপস্থিত।

দুর্ভাগ্যবশত শিল্পে বাস্তববাদের ধারণাটি খুব সম্প্রসারণশীল এবং অস্পষ্ট। কখনো বাস্তববাদ বলতে বস্তুগত বাস্তবতাকে স্বীকৃতিদানের মানসিকতাকে বোঝায়, কখনো শিল্পের একটা বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়, এবং প্রায়শই এ দুয়ের ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। কখনো বাস্তববাদী শিল্পী বলতে হোমার, ফিডিয়াস, সফোক্লেস, পলিক্লেটাস, শেক্সপিয়ার, মাইকেল এঞ্জেলো, মিল্টন বা এল গ্রেকোর নাম উচ্চারিত হয় আবার কখনো উল্লেখ করা হয় এমন কিছু লেখক বা চিত্রকরের নাম যাঁরা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে শিল্পচর্চা করেছেন, যেমন—ফিল্ডিং, স্মলেট থেকে টলস্টয় এবং গোর্কি পর্যন্ত; আবার জরিকো, কুর্বে হয়ে মানে, সেজান পর্যন্ত। আমরা যদি বস্তগত বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেবার মানসিকতাকে বাস্তববাদী শিল্পের লক্ষণ হিসেবে ধরে নিই তবে আমাদের এই সত্যটিও মনে রাখতে হবে যে, বাস্তবতা আমাদের চেতনা থেকে পৃথক স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বমান কোনো বাহ্যিক জগৎ নয়। আমাদের চেতনায় স্বতন্ত্রভাবে যা অস্তিত্বমান তা হলো বস্তু, আর বাস্তবতা হলো মানুষ তার অভিজ্ঞতা এবং ধারণার মাধ্যমে এই বস্তুজগতের সাথে নিয়ত যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাই। একজন চিত্রকর কোনো ল্যান্ডস্কেপের ছবি আঁকার সময় পদার্থবিদ, রসায়নবিদ আর জীববিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চললেও শিল্পীর ল্যান্ডস্কেপটি তার সত্তা থেকে পৃথক একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যমান নয়। এ দৃশ্যে শিল্পীর নিজস্ব আবেগ এবং অভিজ্ঞতার চোখে দেখা প্রকৃতির বিশেষ দৃশ্য। শিল্পী এই বস্তুজগৎকে উপলব্ধি করার ইন্দ্রিয়সর্বস্ব যন্ত্রমান নন, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি একটা বিশেষ কাল, শ্রেণি এবং জাতির প্রতিনিধিত্ব করছেন, যার রয়েছে বিশেষ ধরনের আবেগ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এসব শর্তের উপরই নির্ভর করবে কীভাবে তিনি এই ল্যান্ডস্কেপটিকে দেখবেন, অনুধাবন করবেন এবং আঁকবেন। সে কারণেই নেহাৎ মাপযোগ্য, ওজনযোগ্য কিছু গাছ, পাথর আর

মেঘের সমষ্টি ছবিতে আরও বৃহত্তর একটা বাস্তবতা তৈরি করে। এই বাস্তবতা গড়ে ওঠে অংশত শিল্পীর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। সমগ্র বাস্তবতা হলো বিষয় এবং বিষয়ীর পারস্পরিক সম্পর্কের যোগফল, তাতে কেবল অতীত নয়, ভবিষ্যৎও যুক্ত হয়, কেবল ঘটনা নয় যুক্ত হয় ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, আবেগ এবং কল্পনাও। শিল্পকর্মে বাস্তবতা এবং কল্পনার সহবাস ঘটে। বিশেষ ধারার চিত্রকলার বহু আদর্শায়িত কৃষকের চেয়ে শেক্সপিয়ার বা গোঁয়ার ডাইনিরা অনেক বেশি বাস্তব। নিখুঁত বর্ণনার স্বাভাবিকতাবাদী সাহিত্যের চেয়ে গোগল বা কাফকার স্বপ্নময় সাহিত্যে প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি অনেক যথার্থভাবে বর্ণিত। 'জীবন থেকে উৎসারিত' শত শত তথাকথিত ভদ্র নায়কের তুলনায় ডন কুইক্সোট বা সাকোপাঞ্জা আজও বহগুণে বাস্তব চরিত্র। বস্তুত আমরা যদি কোনো বিশেষ শৈল্পিক পদ্ধতির বদলে বাস্তব জগৎকে শিল্পসাহিত্য প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গিকেই বাস্তববাদ নামে অভিহিত করি তবে দেখতে পাব প্রায় সব শিল্পসাহিত্যই কার্যত বাস্তবাবাদী শিল্প (শুধু বিমূর্ত, ট্যাকিজম ইত্যাকার কিছু শিল্প ছাড়া)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাস্তববাদের ধারণাটি একটা বিশেষ শৈল্পিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখাই সুবিধাজনক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, বাস্তববাদকে যেন একটা গুণগত উত্তরণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা না হয়। সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে বাস্তববাদের আবির্ভাব, যে সমাজ পুরোহিত চালিত বদ্ধ সমাজ নয় বরং মুক্ত বুর্জোয়া সমাজ। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হয় ততই তা অধিকতর নিখুঁত হয়ে ওঠে কিন্তু শিল্পসাহিত্যের বেলায় ব্যাপারটি তেমন নয়। সময়ের সাথে সাথে শিল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ঘটে, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়, কিন্তু একথা কখনোই বলা সম্ভব নয় যে স্তাঁদাল বা তলস্তয় হোমারের চেয়ে অধিকতর নিখুঁত কিংবা জরিকো এবং কন্সটেবল, জত্তো এবং এলগ্রেকোর চেয়ে সার্থক। এমনকি একজন বিশেষ লেখকের নিজস্ব শিল্পকর্মের মধ্যেও এ ধরনের তুলনা চলে না, যেমন ইবসেনের বাস্তববাদী নাটক 'ডলস হাউস' কল্পকাহিনী ভিত্তিক নাটক 'মিপয়ার গিন্ট'-এর চেয়ে অধিকতর যথার্থ এমন বলা যায় না। একইভাবে বর্তমান সময়ের অনেক কঠোর বাস্তববাদী নাটক ব্রেখটের নীতিকথামূলক নাটকের তুলনায় মোটেও অধিকতর নিখুঁত নয়। বাস্তববাদ একটা সম্ভাব্য শৈল্পিক প্রকাশ পদ্ধতি মাত্র, একক বা একমাত্র পদ্ধতি নয়।

সমালোচনামূলক বাস্তববাদের পরিধির মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে 'সমালোচনামূলক' এবং পদ্ধতির বিচারে 'বাস্তববাদ')। এতে রয়েছে আভিজাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, যে দৃষ্টিতে ফিল্ডিং বিকাশমান বুর্জোয়াদের দেখেছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন বিপ্লব-পরবর্তী সমাজকে (বায়রন, স্তাঁদাল বা বালজাকের মধ্যেও রয়েছে সে উপাদান), তেমনই রয়েছে ডিকেন্স, ইবসেন, তলস্তয়ের সংস্কারবাদী আশা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং পরিকল্পনা। এদের সকলের মাঝেই সমাজের প্রতি সমালোচনামূলক একটা মনোভঙ্গি বিরাজমান ছিল যদিও সে মনোভঙ্গি অবজ্ঞাসূচক, ব্যঙ্গাত্মক, সংস্কারবাদী অথবা নৈরাজ্যবাদী। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিতও হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। টমাস মানের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলো (তিনি তখন রক্ষণশীল ভাবধারার লেখক ছিলেন) বিশেষ করে Buddenbrooks উপন্যাসটি তিনি লিখেছিলেন তলস্তয় এবং ফন্টেন মডেলের বাস্তববাদী ধারায় কিন্তু পরবর্তীকালে মান যখন সমাজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেছিলেন তখন তিনি শোপেনহাওয়ার এবং নিটশের প্রভাবমুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। তখনকার উপন্যাসগুলো বাস্তববাদের সাধারণ সংজ্ঞা অতিক্রম করে গেছে বহুদূর (তার চমৎকার উদাহরণ 'ডক্টর ফাউস্তাস' এবং 'দ্য হলি সিনার')। মান নিজে তার ডক্টর ফাউস্তাস উপন্যাসের সাথে জেমস জয়েসের উপন্যাসের সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। অধিকাংশ সমালোচনামূলক বাস্তববাদী লেখকের মাঝেই বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে একক রোমান্টিক প্রতিবাদের উপাদান বিদ্যমান। রোমান্টিকতাবাদের এই উপাদান শুধু স্তাঁদাল বা বালজাকের লেখাতে নয়; ডিকেন্স, ফ্লবেয়ার, দস্তয়ভস্কি, ইবসেন, স্টিন্ডবার্গ এবং হপ্টম্যানের লেখাতেও লক্ষণীয়।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ

গোর্কি প্রথম 'সমালোচনামূলক বাস্তববাদের' বিপরীতে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism)' পদটি ব্যবহার করেছিলেন। এই অ্যান্টিথিসিসটি আজ মার্কসীয় বোদ্ধা এবং সমালোচক কর্তৃক স্বীকৃত।

তবে প্রায়শই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' ধারণাটির অপপ্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। সাধারণত প্রচারধর্মীয় আদর্শবাদিতা-নির্ভর চিত্রকলা, নাটক বা উপন্যাসকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই বিভ্রান্তির কারণে আমি 'সমাজতান্ত্রিক শিল্প' পদটি অপেক্ষাকৃত যথার্থ বলে মনে করি। পদটিতে কোনো পদ্ধতি নয় বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়, এতে বাস্তববাদী পদ্ধতির বদলে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি প্রাধান্য লাভ করে। সমালোচনামূলক বাস্তববাদ এবং ব্যাপক অর্থে সকল বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্য পারিপার্শ্বিক সমাজের সমালোচনা করে থাকে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ এবং বৃহৎ অর্থে সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শিল্পীর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। এ পার্থক্য শিল্পের উদ্দেশ্যের পার্থক্য, পদ্ধতির পার্থক্য নয়। এ সত্যটিকে স্ট্যালিন তাঁর শাসনামলে শিল্পসাহিত্যের উপর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অস্পষ্ট করে তুলেছিলেন। বিশতম কংগ্রেসের পর থেকে শিল্পের ক্ষেত্রে একপাক্ষিক মার্কসীয় তত্ত্ব অনেকখানি শিথিল হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসেছে, যদিও রক্ষণশীল অংশ এখনও শক্তিশালী, তবু মার্কসীয় দর্শনের কাঠামোতেই বিবিধ শৈল্পিক ধ্যানধারণার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চলছে।

একটা উদাহরণ দেখা যাক। ইলিয়া ফ্রাডকিন নামে একজন তরুণ সোভিয়েত তাত্ত্বিক 'আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার' নামক পত্রিকায় (নং ১, মস্কো ১৯৬২) লিখেছিলেন—

"এটা বিশ্বাস করা ভুল হবে যে, ব্যক্তিপূজার দিনগুলোতে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে বলেই কোনো রক্ষণশীল ফরমুলা একটা ধ্রুব সত্যে পরিণত হয়েছে। বিস্তৃত পটভূমির ইউরোপীয় শিল্পকে কী নির্বিচারে, কত দায়সারা মুল্যায়নে নির্মমভাবে 'ক্ষয়িষ্ণু' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময়। ১৮৪৮ সালের পরবর্তী সকল শিল্পকে বিশেষত বিশ শতকের শিল্পকে বলা হয়েছিল অবক্ষয়ের শিল্প এবং নির্বিবাদে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল সকল 'মতবাদ'কে। বিশ শতকের শিল্প আন্দোলনগুলোর মূল প্রশ্নটি, বাস্তববাদ এবং অন্যান্য শিল্প-পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বৃহত্তর প্রশ্নটির সাথে জড়িত। ব্যক্তিপূজার যুগে এ ব্যাপারেও সরলীকরণের নামে বস্তুত রক্ষণশীল এবং অশ্লীল এক ফরমুলা উদ্ভাবন করা হয়েছিল। একদিকে রাখা হয়েছিল সকল বাস্তববাদী শিল্পকে যা প্রগতিশীল এবং অন্যদিকে কথিত প্রতিক্রিয়াশীল যাবতীয় বাস্তববাদ-বিরোধী শিল্প। তাই যদি হবে তাহলে কোথায় স্থান দেব সেইসব প্রশ্নাতীত মহৎ শিল্পীদের, যেমন ধ্রুপদী নাট্যকার মলিয়ে বা রসেঁ, রোমান্টিক হোল্ডারলিন বা ওয়াল্টার স্কট, পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট ভ্যানগগ বা গঁগ্যাকে? এই কঠিন সমস্যার একটা সহজ সমাধানও খুঁজে বের করা হয়েছিল। তাঁদের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল শুধু সেই অংশে যখন তাঁরা বাস্তববাদের সাথে সম্পর্কিত এবং বাস্তববাদ-বিরোধী আন্দোলন থেকে দূরত্বে অবস্থান করেছেন। কিন্তু এটিই কি সেই সমস্যাটির সঠিক সমাধান? ধ্রুপদীবাদ, রোমান্টিকতাবাদ এবং ইম্প্রেশনবাদ কি তাদের ঐতিহাসিক এবং নান্দনিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি নিজস্ব কিছু শৈল্পিক সত্যও ধারণ করে না? রসেঁর ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব কি ধ্রুপদী নৈতিক এবং মানবিক আদর্শেরই মহত্ত্ব নয়? হোল্ডারলিনের মহত্ত্ব কি বিদ্রোহী রোমান্টিকতাবাদের কাব্যিক স্বপ্নময়তার সাথে যুক্ত নয়?"

একই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ফ্রাডকিনের এই লেখার উত্তর দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র সরকারের সাংস্কৃতিক নীতিনির্ধারক জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেছিলেন, ফ্রাডকিন বিষয়টির চারপাশে বড় একটা বৃত্ত রচনা করেছেন কিন্তু কেন্দ্র স্পর্শ করেননি। তিনি লিখেছিলেন—

"লেখাটি চূড়ান্তভাবে লেখকের নেহাত কিছু ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশ। তিনি অতীতের মূল্যবোধগুলো পুনর্বিবেচনা করবার লক্ষ্যে পেছনে তাকিয়েছেন। এতে রয়েছে সেই ছোট ভুল, যার নাম অবক্ষয়...আমরা যদি ভুল করে না থাকি তবে দেখব গুরুত্বপূর্ণ রুশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখক এবং চিন্তাবিদ, যেমন সল্টিকভ শেচেদ্রিন, স্টাসভ, প্লেখানভ এমনকি ম্যাক্সিম গোর্কিও এই অবক্ষয়কে নিন্দা করেছেন এবং তাঁদের সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী শিল্পের এই অবক্ষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। ফ্রান্সে বুর্জোয়াশিল্পের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল নানাবিধ কারণে গত শতকের শেষের দিকে তা জার্মান শিল্পের উপর খুবই ক্ষতিকর এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। সোভিয়েত শিল্প-ঐতিহাসিকগণ এই অবক্ষয়ের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বিজ্ঞ শিল্পবোদ্ধার নিশ্চয়ই অধিকার আছে কোনো শিল্পকর্মকে তার রাজনৈতিক, আদর্শিক এবং শৈল্পিক গুণাবলির আলোকে বিচার করার। সেই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক নীতিমালার মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং শিল্পকে এই ক্ষতিকর পরিণতির ব্যাপারে সচেতন করে দেয় তবে তা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া বিশেষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করাও বাঞ্ছিত যা সোভিয়েত ইউনিয়নে বরিস প্যাস্তারনাকের বেলায় ঘটেছিল।”

এ উদাহরণ দুটো থেকে মার্কসবাদী মহলের প্রধান দুটি বিপরীতমুখী চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরেনবুর্গের ধারণা গেরাসিমভ থেকে পৃথক; ইতালি, ফ্রান্স এবং পোলিস কম্যুনিস্টদের সাহিত্যপত্রিকা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পত্রিকা থেকে ভিন্ন, কিংবা দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজভেস্টনির মতো অনেক আধুনিক ভাস্কর তীব্র বিরোধিতা করেছেন প্রাচীন প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পীদের। ডিক্রি জারি করে শৈল্পিক ধারণা যোগান দেয়ার বিরুদ্ধে এখন ক্রমশ জনমত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা আশা করছেন শিল্প গড়ে উঠবে কাজের প্রক্রিয়ার মধ্যে, মুক্ত আন্দোলনের মধ্যে, বহুমুখী বিতর্ক এবং আলোচনার মধ্যে। এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নতুন শিল্প, উপদেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় কাজের মাধ্যমে। অ্যারিস্টটল তাঁর নন্দনতত্ত্বের ধারণা হোমার, হেসিওড, এস্কাইলাস, সফোক্লিস প্রমুখের কাছ থেকেই নির্মাণ করেছিলেন।

আমরা যতই ব্যাপকতর প্রকাশমাধ্যমের সন্ধান পাই ততই সেখান থেকে একটা সাধারণ উপাদান বেরিয়ে আসে। ‘সমালোচনামূলক বাস্তববাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ’ এই অ্যান্টিথিসিসটি অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট হলেও এতে একটা অত্যাবশ্যকীয় সত্যেরও ইঙ্গিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে একটা পদ্ধতি হিসেবে ধরে নিলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে, কার পদ্ধতি; গোর্কির না ব্রেখটের? মায়াকোভস্কির না এলুয়ারের? মেকারেস্কোর না আরাগঁর? সলোকভের না ওক্যাসির? এদের প্রত্যেকের লেখার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সকলেই অভিন্ন। উল্লিখিত সাহিত্যিকদের সুবাদেই শিল্পসাহিত্যের জগতে নতুন এই সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তাঁরা সকলেই শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণকে অবলম্বন করেছিলেন এবং নানাবিধ অসংগত উন্নয়ন সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজকে তাঁদের জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিল্পসাহিত্যে আপসহীনভাবে বস্তুনিষ্ঠ থাকবার ইচ্ছা, সমাজকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করবার বাসনা, বাস্তবকে হুবহু বাস্তবের মতো প্রতিফলিত করবার প্রচেষ্টা কখনোই পূর্ণাঙ্গ সার্থক হয় না। ফ্রানজ কাফকা এ বিষয়ে সচেতন হয়েই লিখেছিলেন—"শুধুমাত্র একটা পক্ষই কোনো বিষয়ের বিচার করতে সক্ষম কিন্তু পক্ষ নিয়ে যে বিচার করতে অক্ষম, সুতরাং পৃথিবীতে যথার্থ বিচারের কোনো সম্ভাবনা নেই, আছে শুধু সম্ভাবনার অস্পষ্ট আলোক।" কাফকা ঠিকই বলেছিলেন যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোনো বিষয়কে বিচার করা সম্ভব হয় না এবং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মানেই সচেতন বা অবচেতনে কোনো একটা পক্ষ গ্রহণ। সুতরাং কোনো একটা পক্ষই কেবল কোনো বিতর্কের যথার্থ বিচারে সক্ষম। কিন্তু কাফকা একথাও যুক্ত করেছেন যে—'পক্ষ নিয়ে যে বিচার করতে অক্ষম'—অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ মতামতের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেন যা বৃহত্তর পরিধিতে সমাজ বাস্তবতার সাথে যুক্ত। আমরা সমকালীন সমাজের এমন একটা দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে পারি এমন কোনো দৃষ্টিকোণ যেখান থেকে বাস্তবতার ব্যাপক অংশ দৃষ্টিগোচর হবে। কাফকা, বিচারের সম্ভাবনার যে অস্পষ্ট আলোকের কথা বলেছেন সেটা সন্ধ্যার অন্তিম আলো হতে পারে, হতে পারে প্রভাতের প্রথম আলো। সুতরাং আলোর উৎসই নির্ধারণ করবে বিচারের মূল্য এবং এর সত্যনিষ্ঠতা। যেমন দেখা গেছে, স্তাঁদাল বিপ্লব-পরবর্তী বাস্তবতার যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা রোমান্টিকদের মূল্যায়নের তুলনায় অধিকতর সঠিক ছিল। কিন্তু তার কারণ শুধু এই নয় যে, স্তাঁদাল রোমান্টিকদের তুলনায় অধিক প্রতিভাধর ছিলেন, মূল কারণ হলো তিনি তখন এমন এক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন যেখান থেকে বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট এবং বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তবে তাঁর সমকালীন সবচেয়ে প্রগতিশীল লেখক হওয়া সত্ত্বেও স্তাঁদাল বাস্তবতা বিকাশের প্রক্রিয়াকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থিত করতে সক্ষম হননি এবং বরাবরই অনেকটা সচেতনভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন আত্মগত ধারণায়।

অতীত যে-কোনো যুগের তুলনায় আজ শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। রক্ষণশীল মার্কসবাদী প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে যদি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ গ্রহণ করা যায় এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে একাত্ম হওয়া যায় তবেই সে বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন সম্ভব। তবে এটা একটা সম্ভাবনা মাত্র, কারণ সমাজবিকাশকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য কেবল সমাজতন্ত্রের বিজয়ে আস্থা কিংবা সাধারণ সামাজিক নীতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে এর অভ্যন্তরীণ সকল স্ববিরোধী দ্বন্দ্বের আলোকেই উপস্থাপন করা প্রয়োজন। সেই অস্পষ্ট আলোকে সঠিক বিচার করবার জন্য চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি। সকল বস্তুনিষ্ঠতা বিপন্ন হয়ে পড়ে যদি লেখক নিশ্চিতভাবে ধরে নেন যে আগামীকাল এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরশু দিনটি তার আজকের দিনের ভাবনার সাথে যুৎসইভাবে মিলে যাবে। যদি রক্ষণশীলতার অগম্য দেয়াল লেখককে ঘিরে ফেলে তবে বাস্তবিকই তিনি অন্ধ হয়ে যান।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তথা সমাজতান্ত্রিক শিল্প ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেয়। কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তের পূর্ববর্তী সময়টিই কেবল নয়, আগাম উপাদানও অন্তর্ভুক্ত থাকে এ ধারার শিল্পের শরীরে। ঘটনা বদলায় না কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে ঘটনার মুহূর্তের বাস্তবতা বদলায়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পে অতীত উপাদানের সাথে ভবিষ্যতের উপাদান যুক্ত হয়ে একটা বিশেষ কালে অপ্রকাশিত, অসম্পূর্ণ বাস্তবতাকে প্রকাশিত এবং পূর্ণতা দান করে। শিল্পসাহিত্যে ভবিষ্যদ্বাণীর যে উপাদান প্রায়শই তিরস্কৃত হয়ে থাকে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পে সে উপাদান নতুন শক্তি এবং মর্যাদা লাভ করে। জোহানেস আর বেচার যথার্থই বলেছিলেন—

"আমরা যখন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কথা বলি এবং যখন এর সংজ্ঞা নির্ধারণের সংগ্রামে লিপ্ত হই, তখন বিষয়টি জটিল করে তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো অর্থ নেই। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ধারণা এর যথার্থ তাত্ত্বিক জন্মের বহু আগেই অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্ত হয়েছে। তাইতো আমরা শিলারের কবিতায় পাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সুর—

তোমার পাখায় ভর দিয়ে
তুমি সময়কে অতিক্রম করে যাও
আর ধীরে ধীরে তোমার নিজস্ব আয়নায়
জেগে উঠুক ভবিষ্যতের ভোর।

এবং ব্রেখট লিখেছেন—

স্বপ্ন আর সোনালি সংশয়
পাকা ধানের উজ্জ্বল সমুদ্রকে
ভরে রাখে অপার রহস্যে।
যে তুমি বপন করেছ তাকে,
কাল তোমাকে কেটে নিতে হবে তা
আজ যা তোমার বর্তমান।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের সংজ্ঞা দিতে এ দুটো দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

বেচার এখানে সমস্যাকে কিছুটা অতিসরল করে ফেলেছেন কারণ ব্রেখট যেভাবে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বাস্তবদৃষ্টিকে উপস্থাপন করেন, শিলারের চিরন্তন ইউটোপীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিতে সে প্রকাশ ঘটে না। রোমান্টিকতাবাদের কালটি ছিল সামাজিক ইউটোপিয়া আর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রাচুর্যে টইটুম্বুর। তাদের কাছে 'আজ' এবং 'পরশু' দিনটির মাঝখানে সকল কিছুই মূল্যহীন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিল্পের দায়িত্ব হলো, আজকের গর্ভ থেকে যে সংকটসংকুল পথে আগামীকালের জন্ম হয় তাকেই চিত্রিত করা। যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বমুখর জটিল কর্মপ্রক্রিয়া এবং বহুবিধ অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে তা ঐ সরল ভাবুকদের স্বপ্নের মতো সুলভ নয়।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পী শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর রচনার শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো চরিত্র বা পার্টির সকল সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডই সমর্থন করেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পী বিশ্বাস করেন সীমাহীন বস্তুগত এবং আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে একটা শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং তারা জানেন যে পুঁজিবাদকে পরাজিত করবার একমাত্র না হলেও প্রধান শক্তি হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পী তাই নিজেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের প্রক্রিয়ারই একটা অংশ বলে মনে করেন অথচ দেখা গেছে বুর্জোয়াযুগের সামান্যতম মর্যাদাবান শিল্পীও অবধারিতভাবে নিজেকে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিজয়-উল্লাস থেকে বিযুক্ত করে রেখেছেন। সমাজতান্ত্রিক শিল্পী মানুষের বিকাশের অসীম সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখেন। সেসাথে তিনি একথাও বিশ্বাস করেন যে এ বিকাশের চূড়ান্ত কোনো স্বর্গীয় পর্যায় নেই এবং একদিন সকল দ্বন্দ্বের যে নিষ্পত্তি ঘটে যাবে এমন প্রত্যাশাও তিনি করেন না—

> স্বর্ণযুগ! তুমি কখনোই আসবে না,
> পৃথিবীর মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে শুধু
> সমুদ্রেরা ফিরে যাক তাদের উৎসমূল ঝর্নাধারায়
> পৃথিবীর প্রভাতের স্বপ্নে দেখা দিক সোনালি
> ভবিষ্যতের মুখ।
> আর উজ্জ্বল কিংবদন্তিই হোক
> মানবের প্রকৃত গন্তব্য।
>
> (আর্নস্ট ফিশার)

নতুন সমাজের এই স্বীকৃতির মধ্যে সমালোচনামূলক উপাদানও থাকা প্রয়োজন। মার্কস প্রলেতারিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে যা বলেছিলেন সেকথা সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের প্রক্রিয়ার বেলাতেও সত্য—"তারা সর্বদাই আত্মসমালোচনামুখর, পুরনো পদচারণাকে যাচাই করে নতুন পথ আরম্ভ করবার জন্য তারা তাদের অগ্রযাত্রার পথে বারবারই ক্ষণিকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য থেমে নেয়।" যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ তাই সমালোচনামূলক বাস্তববাদও বটে, যা সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতি শিল্পীর স্বীকৃতি এবং তার সকর্মক ভূমিকার মাধ্যমে আরও উন্নত হয়ে ওঠে। শিল্পী তখন তার পরিপার্শ্বের জগতের বিরুদ্ধে কেবল রোমান্টিক প্রতিবাদে ব্যস্ত থাকেন না। 'আমি' এবং সমাজের মধ্যকার ভারসাম্যটি কখনোই স্থির নয়, বিরোধ এবং প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে বারবার নতুন নতুনভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পের চেয়ে পৃথক এই সমাজতান্ত্রিক শিল্পের জন্য নতুনতর প্রকাশভঙ্গিরও প্রয়োজন। ব্রেখট আঙ্গিকবাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"একথা বলা নেহাত বেকামি হবে যে, শিল্পের আঙ্গিক নির্মাণ এবং তার বিকাশের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেবার দরকার নাই। আঙ্গিকের পরিবর্তন ছাড়া সাহিত্য কখনোই নতুন বিষয়কে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন স্তরের মানুষের কাছে পৌছাতে পারবে না, আমরা এখন এলিজাবেথীয় যুগের চেয়ে ভিন্ন ধরনের বাড়ি তৈরি করি, নাটকও আমরা তেমনি ভিন্নভাবে করব। আমরা যদি শেক্সপিয়ারের নির্মাণপদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে চাইতাম তবে আমাদের হয়তো মেনে নিতে হবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল বস্তুত একজন বিশেষ ব্যক্তির (কাইজার উইলহেম) নিজেকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা থেকে, যে ইচ্ছাটির কারণ আবার তার একটা হাত অন্যটির তুলনায় ছোট ছিল বলে। কিন্তু তা হতো অবাস্তব। সেটা হতো আঙ্গিকসর্বস্বতা। আমরা যখন কেবল একটা বিশেষ আঙ্গিককে রক্ষা করবার স্বার্থে পরিবর্তিত বাস্তবতার নতুন ধারণাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতাম তা হতো পুরনো আঙ্গিককে নতুন বিষয়ের উপর চাপিয়ে দেবারই শামিল। মানবতার চোখে ছুড়ে দেয়া ধুলো মুছে ফেলাই এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ, এসময় কোনোপ্রকার কৃত্রিম পরিবর্তনকেও তার প্রতিহত করতে হবে। আমরা কখনোই আর অতীতে ফিরে যেতে পারব না, আমাদের এখন অগ্রসর হতে হবে যথার্থ পরিবর্তনের দিকে। শ্রমলব্ধ প্রকাণ্ড জগৎ এখন আমাদের চারপাশে; তাকে কী করে শিল্পীরা পুরনো শিল্পপদ্ধতিতে প্রকাশ করবেন?"

নতুন বাস্তবতা রূপায়ণে চাই নতুন পদ্ধতি। এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে সমাজতান্ত্রিক শিল্প শুধুমাত্র বুর্জোয়াশিল্পের আঙ্গিক, বিশেষত রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকের রুশ বাস্তববাদের আঙ্গিকচর্চা অব্যাহত রাখবে। রেনেসাঁ অনেক বিস্ময়কর শিল্পীর জন্ম দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেজন্য সমাজতান্ত্রিক শিল্প কি শিক্ষা নেবে না মিশর বা অজটেক ভাস্কর্য থেকে, পূর্বএশিয়ার শিল্প থেকে, গথিকশিল্প থেকে কিংবা মানে, সেজান, মুর বা পিকাসো থেকে? তলস্তয় এবং দস্তয়ভস্কির বাস্তববাদ নিঃসন্দেহে চমৎকার কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিল্পীগণ কেন শিক্ষা নেবেন না হোমার বা বাইবেল থেকে;

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেক্সপিয়ার, স্টিনবার্গ, স্তাঁদাল, গ্রুস্ত, ব্রেখট, ওক্যাসি, রাঁবো বা ইয়েটস থেকে? এটা কোনো বিশেষ আঙ্গিককে নকল করবার প্রশ্ন নয়, প্রয়োজন হচ্ছে আঙ্গিক এবং প্রকাশপদ্ধতিকে এমনভাবে শিল্পের শরীরে আত্মস্থ করে নেয়া যাতে সে শিল্প বিবিধ বাস্তবতার অসীমতাকে ধারণ করবার ক্ষমতা রাখে। যে রক্ষণশীল মতাবলম্বীগণ কেবল একটা বিশেষ আঙ্গিকে নির্মাণের গোঁ ধরেন, তারা বস্তুত মানুষের হাজার বছরের শিল্পের ইতিহাসকে সংশ্লেষণ করে নতুন আঙ্গিকে নতুন বিষয়কে প্রকাশ করবার শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে চান। সাম্প্রতিককালে এসব বিষয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে। আমি নিঃসন্দেহ যে পারস্পরিক মতভেদের সংঘাত সমাজতান্ত্রিক শিল্পকে অতীতের সকল শিল্পের তুলনায় বিষয়ে, আঙ্গিকে এবং সম্ভাবনায় আরও উন্নত এবং সাহসী করে তুলবে। রক্ষণশীলতা, ভ্রান্তি, অবরোধ এবং পশ্চাৎপদতা দেখে হতোদ্যম হবার কোনো কারণ নেই। সকল পরিস্থিতিতেই বার্টল্ড ব্রেখটের 'ইন প্রেইজ অব ডাইলেকটিক্স' আমাদের স্মরণে থাকুক—

যদি আজও বেঁচে থাকো তবে 'কখনো নয়' বোলো না কখনো
যা-কিছু নিশ্চিত, তাও সুনিশ্চিত নয়।
যা-কিছু যেভাবে আছে, থাকবে না সেভাবে চিরকাল এবং
'কখনো নয়'—ঘটে যেতে পারে, দিন ফুরাবার আগেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তরিত সাক্ষাৎকার

হেনরিক ইবসেন ৩৩৫

একাকী, বিষণ্ণ; নীতিহীন ক্রিশ্চিয়ানা; 'নারী' প্রশ্ন; সিফিলিস, মাতলামো

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ৩৪২

অবচেতন বিশ্বের কলম্বাস অমরত্ব, মনঃসমীক্ষণ; যৌনতা, প্রেম; সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণ; স্ফিংসের ধাঁধা

পাবলো পিকাসো ৩৫৩

প্রহেলিকাময়; গোয়ের্নিকা, অন্যান্য; চিত্রকলা, রাজনীতি; আমেরিকান এবং ফরাসি চিত্রকলা

মিলান কুন্ডেরা ৩৬৪

অপসৃয়মাণ ব্যক্তিমানুষ; পৃথিবীর ফাঁদ; অস্তিত্বের সংকট; উপন্যাসের চরিত্র; উপন্যাস, রাজনীতি, ইতিহাস; অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অভিযাত্রী

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি ৩৮০

'বিখ্যাত শব'; প্রথম পরিচয়; চলচ্চিত্রে শব্দ; ভালো ছবি; মনের 'আলকেমি'; স্বপ্নের চলচ্চিত্রকার; অভিনেতাদের সঙ্গে; চলচ্চিত্র, রত্নদ্বীপ

জেমস ন্যাক্টওয়ে ৩৯৯

নরকে ভ্রমণ; আলোকচিত্রের নান্দনিকতা, সাংবাদিকতা না শিল্পকলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৪১১

প্রথম পর্ব
ছেলেবেলা, নানা রঙের দিন; যৌবন, দিনবদলের প্রস্তুতি; প্রথম আক্রমণ; বিপ্লব এবং তারপর; ধর্ম, অধ্যাত্মিকতা; জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্র; কিউবায় গণতন্ত্র; বিপ্লব রফতানি; বিদেশি ঋণ

দ্বিতীয় পর্ব
ইতিহাস, অমরত্ব; সমাজতন্ত্রের পতন; স্ট্যালিন; পুনরায় চে; আমেরিকা; গণতন্ত্র; সাম্প্রতিক কিউবা; অস্তিত্বের সংগ্রাম; মানবাধিকার; পঠন-পাঠন; স্বপ্নজয়ের সংগ্রাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেনরিক ইবসেন

নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের জন্ম ১৮২৮ সালে নরওয়েতে। *ব্যান্ড* এবং *গিয়ার জিন্ট* নাটকের মাধ্যমে প্রথমে স্বদেশে খ্যাতি অর্জন করেন ইবসেন। ১৮৮০ দশকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শতবর্ষ পরেও ইবসেনের নাটক ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার নানা দেশে অভিনীত হচ্ছে। আধুনিক যুগের নৈতিকতার সংকট, বিশেষ করে নারীর সামাজিক অবস্থান তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য।

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *ডলস হাউজ*, *হেড্ডা গ্রাবলার*, *দি মাস্টার বিল্ডার*, *ঘোস্ট* ইত্যাদি।

ইবসেন ১৯০৬ সালে [illegible] করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হেনরিক ইবসেনের এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। মনে রাখা ভালো আলাপের প্রেক্ষাপট একশো বছরেরও আগের ইউরোপ। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আর এইচ শেরার্ড *দি হিউম্যানিটেরিয়ান* পত্রিকার পক্ষ থেকে। এই সাক্ষাৎকারে ইবসেনের ব্যক্তিজীবনের কিছু দুর্লভ মুহূর্ত যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি প্রকাশিত হয়েছে নাটক বিষয়ে ইবসেনের নিজস্ব কিছু ভাবনা। সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত *দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ* গ্রন্থে। আমার ভাষান্তরিত সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২২ নভেম্বর ১৯৯৬ *ভোরের কাগজ*-এর সাহিত্য সাময়িকীতে।

একাকী, বিষণ্ন

হেনরিক ইবসেনকে গত ছয় সপ্তাহ ধরে আমি প্রায় প্রতিদিনই দেখছি। যে হোটেলটাতে উঠেছি, প্রতিদিন সেখানে তিনি দুবার করে আসেন। একাই আসেন প্রতিবার। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে কোনো সঙ্গী দেখিনি। প্রতিদিন নির্দিষ্ট দুটো সময়ে গ্র্যান্ড হোটেলের ভেতরের দিকের একটি ঘরে এক গ্লাস পানীয় নিয়ে তিনি বসেন এবং নরওয়েজিয়ান পত্রিকাগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। শুধু বাইরে কেন, ভিক্টোরিয়া টেরেসে তাঁর নিজের বাড়িটিতেও তিনি এমনি একজন একাকী মানুষ। সাংসারিক জীবনে অনীহা তাঁর। কীর্তিমান একমাত্র ছেলে ডা. সাইগার্ড ইবসেনের বাড়িতেও তিনি কখনো যান না, এমনকি ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেও তিনি যাননি।

তাঁর এই বিষণ্নতা, এই অসামাজিকতার ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক ঠেকে। নরওয়েজিয়ানদের সাধারণভাবে আমুদে আড্ডাপ্রিয় বলেই জানি। এ বিষয়ে আর এক নরওয়েজিয়ান লেখককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বেশ খেপে গিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে ইবসেন তো নরওয়েজিয়ান নয় মোটেও। তাঁর জন্ম স্কচ পরিবারে। জীবন আর মানুষ নিয়ে তাঁর ঐসব বিষণ্নতা আসলে ঐ কারণেই। একজন বিদেশি এসে এই ক্রিশ্চিয়ান শহরে হতাশার ব্যবসা করছে, অথচ নরওয়েজিয়ানরা চুপচাপ রয়েছে এটা মোটেও ঠিক নয়।'

যাহোক, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবসেনের হতাশা সম্পূর্ণ আন্তরিক। তিনি বস্তুত একজন অসুখী মানুষ। তাঁর সঙ্গে অনেকবার আলাপ হয়েছে আমার কিন্তু তাঁকে হাসতে দেখেছি শুধু একবার। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম–প্যারিসের ফিগরো পত্রিকায় 'আধুনিক চিত্রকলায় ইবসেনের প্রভাব' নামের নিবন্ধটি তিনি পড়েছেন কি না। তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সাংবাদিকরা কত কী যে আবিষ্কার করতে পারে?' আলাপ করতে বসলে অধিকাংশ সময়ই তিনি নীরব থাকেন। তা ছাড়া কোনো ধরনের সাক্ষাৎকার দেয়ার ব্যাপারে তাঁর রয়েছে ভীষণ অনীহা। তাঁর সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা, সেদিন বার্লিনের একটি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে সাক্ষাৎকার আকারে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পড়ে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি সেসময় যে নাটকটি লিখছিলেন, বিভিন্ন পত্রিকায় সে সম্পর্কে নানারকম লেখা হচ্ছিল। ইবসেন আমাকে বলেছিলেন, এগুলো কোনোটিই সঠিক নয়। এক জার্মান পত্রিকা এমনকি এও লিখেছে যে, ইবসেনের আগামী নাটকের নাম নাকি 'দি স্মেল অব ক্রপস'। ইবসেন বলছিলেন, 'আমি আমার নতুন নাটক সম্পর্কে কখনোই কারো সঙ্গে কথা বলি না। প্রকাশিত হওয়ার আগে নাটকের সামান্য কোনো তথ্যও কারো জানার কথা নয়।' এ ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে সতর্ক হয়েছেন, একবার এক অতি উৎসাহী আমেরিকান প্রকাশক কোপেনহেগেনের প্রেস থেকে কম্পোজিটরকে ঘুষ দিয়ে ইবসেনের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে যায় এবং আগাম প্রকাশ করে ফেলে। এ ছাড়াও সত্যি কথা বলতে, তাঁর কোনো অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আলাপ করতেও তিনি বিশেষ আগ্রহী নন। তাঁর স্বভাব, জীবন-যাপন ইত্যাদি দেখে তাঁকে রীতিমতো মানববিদ্বেষী বলেই মনে হয়। যদিও সম্প্রতি তিনি জীবনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন, তবু বলতে হয় এ সাফল্য এল খুবই দেরিতে। প্রায় মধ্যবয়স পর্যন্ত এদেশে তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হতো না, তাঁর নাটকগুলোকে উপহাস করা হতো। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তিনি। খুব বেশিদিনের কথা নয়, যখন ভাগ্যান্বেষণে নরওয়ে ত্যাগ করার আগে এক প্রকাশকের কাছে মাত্র ১২ পাউন্ডে তিনি তাঁর একটি নাটকের স্বত্ব বিক্রি করেছেন। সংসার ও নারীসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর সুখের নয়। 'মাস্টার বিল্ডার' নাটকে তিনি তাঁর যুবক-বয়সের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছিলেন অথচ সেসব আকাঙ্ক্ষার কত সামান্যই তাঁর জীবনে বাস্তবায়িত হলো। নরওয়ের প্রেক্ষাপটে আজ ইবসেন নিঃসন্দেহে বিখ্যাত, অর্থশালী মানুষ, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই অর্থ তাঁর হাতে এল অসময়ে। তাঁর আজকের এই সুদিন তাঁর যুবক আর মধ্যবয়সের সেইসব বঞ্চনার দিনগুলোকে কি আর পুষিয়ে দিতে পারবে? একমাত্র লেখা আর অবিরাম পঠন-পাঠন ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো আনন্দ নেই। জার্মান দর্শনের একনিষ্ঠ পাঠক তিনি। একদিন কান্ট সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তাঁর লেখা আমি পড়ি প্রথমত দায়িত্ব হিসেবে। দ্বিতীয়ত, আনন্দের জন্য।'

দিনে দুবার ঘণ্টাখানেকের জন্য এই গ্র্যান্ড হোটেলে এসে বসাই তাঁর একমাত্র বিশ্রাম। এখানে বসে তিনি দিনের পত্রিকাগুলো পড়েন। পালা করে একবার ডান দিকে রাখা বিয়ারের গ্লাসে, একবার বাঁ দিকে রাখা পানির গ্লাসে চুমুক দেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা তিনি শহরের রাস্তায় হাঁটেন। তাঁর পরনে থাকে কালো আনুষ্ঠানিক ধরনের কোট আর মাথার কালো টুপিটা খানিকটা হেলানো থাকে পেছনে। দিনের বাকিটা সময় তিনি নিভৃতেই কাটিয়ে দেন তাঁর গ্র্যান্ড টেরেসের বাড়িতে। সে বাড়িতে কদাচিৎ কোনো দর্শনার্থীকে ঢুকতে দেয়া হয়। তাঁকে শহরের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কারো সঙ্গে বসে গল্প করছেন এরকম অবস্থাতেও তাঁকে দেখা দুষ্কর। বিষাদাচ্ছন্ন একটি জীবন কাটান তিনি সর্বদা।

নীতিহীন ক্রিশ্চিয়ানা

আমার মনে আছে, ক্রিশ্চিয়ানায় আসার এক মাস পর একদিন তিনি আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনো এখানে কী করছেন? এ শহরে এতদিন ধরে কী করার আছে?

আমি বলি, 'আমার কাছে তো সবকিছুই বেশ নতুন লাগছে। পর্যবেক্ষণের জন্য ক্রিশ্চিয়ানা বেশ মজার শহর।'

'তা অবশ্য ঠিক'—ইবসেন বললেন, 'ক্রিশ্চিয়ানা নিঃসন্দেহে ইউরোপের সবচেয়ে নীতিহীন শহর। সমাজকে পাঠ করতে চাইলে এর মতো মোক্ষম শহর আর ইউরোপে দ্বিতীয়টি নেই। যেমন ধরুন, বিবাহ এ শহরে নেই বললেই বলে। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে প্রথমত, বেশ্যাবৃত্তির ওপর সরকারি খবরদারি তুলে দেওয়া, যার ফলে আমাদের যুবকদের এখন খুঁজে পাবেন প্রতিবেশীর কোনো চোরাগুপ্তা ঘরে; আর দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের অনুমোদন।'

'কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি কি এখনো ততটা সহজ হয়েছে?' আমি জানতে চাই।

'হ্যাঁ, ছেলেমেয়ে যে-কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করলেই হলো, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যায়। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো কার্পণ্য করেন না। লোকের চোখে এখন বিয়ের বিভীষিকা কমে এসেছে। জার্মান, ফ্রান্সের মতো এখানে ইউনিয়ন লিবর আর দরকার নেই।'

'আপনি কি মুক্ত মেলামেশার পক্ষে?'

'আমি কোনোকিছুরই পক্ষে নই। আমার নাটক কোনো নীতিকথা প্রচার করে না। আমি জীবনকে যেভাবে দেখি সেভাবেই বর্ণনা করি মাত্র।'

'নরওয়ের জীবন?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'নিশ্চয়ই। আমি একজন নরওয়েজিয়ান নাট্যকার, আমি নরওয়ের জীবনই বর্ণনা করি। দেশ কী করে আরো ভালোভাবে চলবে, আমার নাটক তার উপায় বাৎলে দেয় না। আমি শিক্ষক নই। আমি মানুষের ছবি আঁকি মাত্র।'

'কিন্তু মানুষের ছবিও তো মানুষকে অনেক সময় শিক্ষা দেয়।'

ইবসেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, 'মাস্টারি করা আমার কাজ নয়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'নারী' প্রশ্ন

এর কিছুদিন পর আবার একদিন তাঁকে আলাপি মেজাজে পাই, সেদিন জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার কি মনে হয়, আগামীতে মূল সামাজিক প্রশ্ন হবে 'নারী' প্রশ্ন?'

তিনি হেসে বললেন, 'আগামীতে কেন, নারী কি সবসময়ই একটি প্রশ্নের ব্যাপার ছিল না, এখনো কি সেটি একটি প্রধান সামাজিক প্রশ্ন নয়? অবশ্য যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন নিকট-ভবিষ্যতে নারী-পুরুষ সামাজিকভাবে সমান অবস্থানে আসবে কি না, তাহলে বলব 'না'। নারী-পুরুষের সমতা আসতে আরো বহু বছর, শতাব্দী চলে যাবে। একরকম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই তা আসবে। ক্রমশ নারীর শারীরিক শক্তি বাড়বে, সামাজিক ক্ষমতা এবং সম্পদ বাড়বে। কয়েকজনের বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডে কিছু হবে না।'

'মেয়েরা কি রাজনৈতিকভাবেও ক্ষমতাবান হবে বলে মনে করেন?'

'আমি তা বলছি না। আমি বলছি আপনি চান বা না চান মেয়েদের নাগরিক ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। সামাজিকভাবে তারা পুরুষের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। আমেরিকায় তো ইতিমধ্যেই মেয়েরা অনেকটুকু এগিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিকভাবে তাদের যেভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি এ অবস্থা বদলে যাবে। তবে মেয়েরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবে না কি না, তারা ভোটের অধিকার পাবে কি না সেটা অন্য প্রশ্ন।'

'মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই, তবে ধীরে ধীরে। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা যে বেড়েছে তা তো চারিদিকে তাকালেই আপনি দেখতে পাবেন। সামাজিকভাবে মেয়েদের এখন আর আগের মতো তুচ্ছ করে দেখা হয় না। মেয়েরা এখন শুধু সন্তান উৎপাদন করে না, তারা পুরুষের অন্যান্য কাজেও সহযোগী বন্ধু।'

'ড. ইবসেন, 'নারী' প্রসঙ্গটির ওপর আপনার বেশ ভালো দখল আছে—আমরা ধরে নিতে পারি', আমি বলি।

'না, একটা প্রসঙ্গকে আমি বর্ণনা করেছি বলেই যে সে ব্যাপারে আমি একটা স্পষ্ট ধারণা রাখি তা ঠিক নয়,' ইবসেন বললেন।

'আগামীতে মেয়েদের অর্থনৈতিক উন্নতি কতটুকু হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'সেটা নির্ভর করবে ইউরোপের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর। তবে ইউরোপের অর্থনীতি আদৌ উন্নতির দিকে যাচ্ছে কি না, আমার সন্দেহ হয়। প্রাচ্যের সঙ্গে অচিরেই ইউরোপকে একটা কঠিন প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। মেয়েরা আগামীতে নিঃসন্দেহে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাজ করবে। অবশ্য শারীরিক শ্রমনির্ভর কাজে মেয়েরা সবসময় পিছিয়ে থাকবে, বাচ্চাদের শুশ্রূষার সময়, গর্ভকালীন সময় তাদের কাজের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যাঘাত ঘটবে। তবে মজুরির ক্ষেত্রে সমতা আসবে। এখন যেমন অনেক কারখানায়, খনিতে সমান কাজ করেও মেয়েরা পুরুষের অর্ধেক মজুরি পাচ্ছে এ অবস্থা থাকবে না।'

'স্ক্যান্ডিনিভিয়ায় মেয়েদের অবস্থা কেমন?'

'তুলনামূলকভাবে ভালো। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেক মেয়েকে লক্ষ করেছেন। এরা অধিকাংশই গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে এবং শহরে একা বাড়ি ভাড়া করে থাকছে। এই মেয়েদের আচরণে আত্মপ্রত্যয়ী ভাবও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। অবশ্য একথাও বলতে হয় ক্রিশ্চিয়ানার মতো আগাপাছতলা একটা নীতিহীন শহরে নারীর ক্ষমতা তো এমনিতেই বেড়ে যায়। যেমন এখন প্যারিসে একজন মন্ত্রীর চেয়ে একজন বেশ্যার ক্ষমতা বেশি। নারী আদর্শবাদীদের জন্য বিষয়টি অপ্রিয় হলেও এটি বাস্তব অবস্থা।'

'কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানা কি এতটাই নীতিহীন? রাস্তাঘাট তো বেশ সভ্যই দেখতে পাচ্ছি।'

'রাস্তাঘাটগুলো এমন সভ্য বলেই তো ঘরের ভেতরগুলো এতটা অসভ্য। যৌনতার কল্পনাতীত বিচিত্র দিক বিকশিত হয়েছে এখানে। লোকেরা বিয়ে করে, বিচ্ছেদ ঘটায় আবার বিয়ে করে। এ অবস্থা ফরাসি ভেন্দেলিস্তে নাটকগুলোকেও হার মানাবে।'

সিফিলিস, মাতলামো

'আমার মনে হয় বেশ্যাদের ওপর থেকে সরকারি নজরদারি তুলে দেয়ার পর থেকে এখানে যৌনরোগের প্রকোপও বেড়ে গেছে'—আমি বলি।

'হ্যাঁ, স্টকহোমের পর এখানেই সম্ভবত ইউরোপের সর্বাধিক সিফিলিস রোগী', বললেন ইবসেন।

'আচ্ছা, ঘোস্ট নাটকে', আমি বলতে শুরু করলে তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই সব পুরনো কথা বাদ দিন।' (সেখানকার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকটি মঞ্চস্থ হতে অনুমতি দেয়নি—অনুবাদক) ওরা যা ভালো মনে করেছে তা-ই করেছে।'

'মনে করা হয় যে, এই সিফিলিস মহামারীর আশঙ্কাতে, সরকারি আইনের প্রতিবাদেই আপনি নাটকটি লিখেছেন।'

ইবসেন কোনো উত্তর দেন না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, 'এই ভয়াবহ মহামারী দমন করতে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'আমি? আমি কোনো পদক্ষেপ প্রস্তাব করবার কে? এই ব্যাপারে আমার কিছু করণীয় নেই। বলা হয়েছে, সিফিলিস-আক্রান্ত মানুষের বিয়ে করা নিষেধ। কিন্তু বাহ্যিক উপসর্গ চলে যাওয়ার পর আপনি কীভাবে বুঝবেন, কে সিফিলিস রোগী কে নয়? এ ব্যাপারে পদক্ষেপ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিতে পারে ডাক্তাররা। তারা যদি কোনো নিরাময় খুঁজে পায় তবে ভালো হয়। এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরীক্ষা চালানোর জন্য নিজের শরীরে সিফিলিসের জীবাণু গ্রহণ করেছিল কিন্তু পরে সে মারা যায়। পাস্তুর কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু শুনেছি এ রোগের ওপর গবেষণা চালাতে তিনিও অসম্মতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই রোগে আক্রান্তদের ব্যাপারে তার কোনো সহানুভুতি নেই।'

'কিন্তু এই রোগের নিষ্পাপ শিকার, যেমন আপনার ঘোস্ট নাটকে সিফিলিস-আক্রান্ত বাবা-মার সন্তানটি, তাদের প্রতি নিশ্চয়ই সহানুভূতি জাগতে পারে?'

'হ্যাঁ, যারা ফিরে ফিরে আসে, ঘোস্ট নাটক এরকম একটা ধারণা দেয়।'

'নাটকটি বংশগতি-সংক্রান্ত আপনার মতবাদও প্রকাশ করে।'

'আমার মতবাদ? না, আমার কোনো মতবাদ নেই। আমি আগেও বলেছি আমার নাটক কোনো মতবাদ প্রচার করে না। আমি চারপাশে যা দেখি তা-ই প্রকাশ করি। জীবনে বংশগতির ব্যাপারটির অতিশয় গুরুত্ব আমি লক্ষ করেছি। তারই দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি শুধু।'

'বংশের দৈহিক প্রভাবের পাশাপাশি মানসিক এবং নৈতিক প্রভাবও আছে বলে কি মনে করেন?'

'নিশ্চয়ই। দুটো আসলে একই ব্যাপার।'

'কিন্তু বংশ ছাড়াও মানুষের ব্যক্তিত্ব কি শিক্ষা এবং পরিবেশ দিয়েও প্রভাবিত নয়?'

ইবসেন খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে বলেন, 'সেকথা তো আমিও জানি, আপনিও জানেন। শিক্ষা ও পরিবেশ একটি শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে দেহ গঠনে বিশেষ নয়। বংশগত সিফিলিস-আক্রান্ত রোগীকে তো শিক্ষা দিয়ে রোগমুক্ত করা যাবে না। তাকে হয়তো পাগল বা মাতাল হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।'

'মদ্যপান কি নরওয়েতে একটি বড় সমস্যা?'

'হ্যাঁ ব্যাপক সমস্যা। মদ্যপান বন্ধের জন্য নানা নিয়মকানুন করা হচ্ছে। তবে এসব বন্ধের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। রাস্তাঘাটে এখন তো আগের চেয়ে অনেক বেশি মাতাল দেখি।'

'এই মাতলামো কি দারিদ্র্যের কারণে?'

'এটা একটা চক্র। নিজের দুর্দশা ভুলবার জন্য লোকে মদ খায় আবার মদ খেয়ে সে আরো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে সার্বিক বিচারে মদ খাওয়াটা কারণ, ফলাফল নয়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

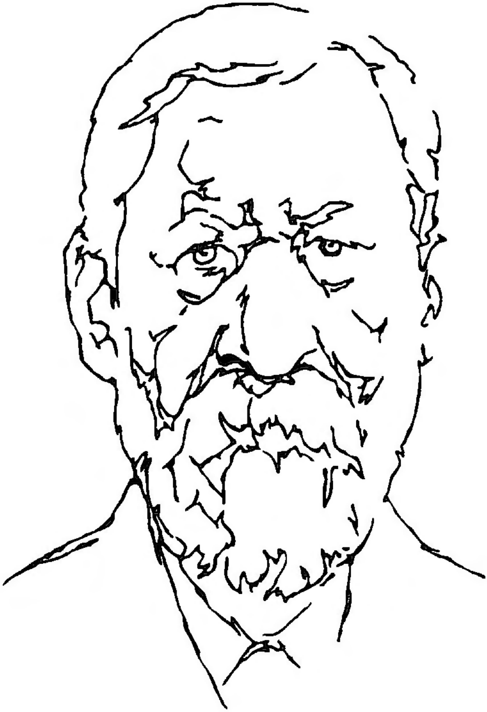

সিগমুন্ড ফ্রয়েড

চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েডের জন্ম ১৮৫৬ সালে অস্ট্রিয়ায়। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত তাঁর *দি ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিম* গ্রন্থের কারণে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হন। পরবর্তীকালে মানুষের অবচেতন মনসংক্রান্ত তাঁর তত্ত্ব, বিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০২ সালে তিনি ভিয়েনা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আজীবন মনোদৈহিক রোগের ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। ১৯৩৮ সালে 'নাজি'রা অস্ট্রিয়া দখল করলে তিনি ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। তিনি চোয়ালের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাংবাদিক জর্জ সিলভিস্টার ভিয়েরেক ১৯৩০ সালে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারে ঘরোয়া পরিবেশে প্রখ্যাত এই মনোবিজ্ঞানী শুধু মনোবিজ্ঞান নয়, আরো নানা প্রসঙ্গেও আলাপ করেছেন। সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত *দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ* গ্রন্থে। আমার ভাষান্তরিত সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর সাহিত্য সাময়িকীতে।

অবচেতন বিশ্বের কলম্বাস

'সত্তর বছর বয়স আমাকে শিখিয়েছে জীবনকে প্রসন্ন বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে।'

বলছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মনের গহিন জগতের অস্ট্রিয়ান অভিযাত্রী। গ্রিক ট্র্যাজিক বীর ইডিপাসের মতো তিনিও সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন স্ফিংসকে। স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছেন। অন্তত তাঁর মতো মানবমনের রহস্যের এতটা কাছাকাছি কেউ আসেনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্যালিলিও যা, মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েড তাই। তিনি অবচেতন বিশ্বের কলম্বাস, যিনি মনের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন।

আমাদের আলাপ চলছিল সেসেরিং নামে অস্ট্রীয় এক পাহাড়চূড়ায়, ফ্রয়েডের গ্রীষ্মকালীন আবাসে। শেষবার তাঁকে আমি দেখি ভিয়েনায় তাঁর নিরহঙ্কার বাড়িটিতে। মাঝখানের এই বছর কটিতেই দেখছি তাঁর কপালের রেখা আরো কয়টা বেড়েছে। তাঁর উদ্যম, সৌজন্য আগের মতোই আছে কিন্তু কথা বলবার সময় তাঁর খানিকটা তোতলানো আমাকে চিন্তিত করে তুলছিল। ক্যান্সারের আক্রমণের কারণে তাঁর উপরের চোয়ালে অপারেশন হয়েছে। কথা বলবার সুবিধার জন্য এসময় তিনি বিশেষভাবে তৈরি একটি যান্ত্রিক সরঞ্জাম চোয়ালের ভেতর পরতেন। ব্যাপারটা চশমা পরার মতো স্বাভাবিক হলেও এবং সেটি তেমনভাবে চোখে না পড়লেও ঐ যন্ত্রটি নিয়ে ফ্রয়েড ছিলেন বিব্রত এবং বিরক্ত।

'এই যান্ত্রিক চোয়ালটাকে আমি ঘৃণা করি, এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার সব শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কোনো চোয়াল না-থাকার চেয়ে যন্ত্রের চোয়াল থাকাও ভালো। একবারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে যেকোনো অস্তিত্ব যেমন ভালো।'

মনঃসমীক্ষণের জনক বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর সম্ভবত আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদয়, যে কারণে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবন ক্রমশ বিসদৃশ ঠেকতে থাকে। শেষে জীবনের এত সব ভার বহনের কাছে মৃত্যুটা তেমন অসহ্য বলে মনে হয় না। আমার বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? নানা সব যন্ত্রণা নিয়ে বার্ধক্য সবার কাছেই আসবে। চূড়ান্ত বিজয় ঐ বীর ঘুণপোকাটারই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আলো নিভে আসছে, সব আলো
ঝড়ের বেগে চারিদিক থেকে নেমে আসছে কম্পমান পর্দা, শেষ আচ্ছাদন।
ম্লান, পাণ্ডুর দেবদূতগণ উত্থিত হচ্ছে, বলছে,
এ নাটক করুণ মানবের,
বীর যার বিজয়ী ঘুণপোকা'

মানব-মস্তিষ্কের ওস্তাদ অনুসন্ধানী আরো বলতে লাগলেন, 'বিশ্বসংসারের এই চিরায়ত নিয়মের বিরোধী আমি নই। তা ছাড়া সত্তর বছরেরও বেশি তো বাঁচলাম। প্রচুর খেলাম, অনেক কিছু উপভোগ করলাম—স্ত্রী, সন্তানদের সঙ্গ, চমৎকার সূর্যাস্ত। বসন্তে গাছগুলোকে পাতায় পাতায় ভরে উঠতে দেখলাম কতবার। কখনো কখনো বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধুত্বের হাতও পেলাম। এমনকি দু-একবার এমন মানুষও পেলাম, যারা আমাকে প্রায় অনেকটুকুই বুঝে উঠতে পেরেছে। এর বেশি আমি আর কী চাইতে পারি, বলুন?'

অমরত্ব

আমি বললাম, 'আপনার সুনাম হয়েছে। আপনার কাজ সারাবিশ্বের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। আপনার কারণে মানুষ তার নিজের জীবনকে এখন অন্য চোখে দেখতে পাচ্ছে। আর সম্প্রতি সারাবিশ্ব একত্রিত হয়েছিল আপনার সত্তরতম জন্মদিনে আপনাকে সম্মান জানাতে, শুধু আপনার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড়া।'

'ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে স্বীকৃতি জানালে আমাকে কেবল তা বিব্রতই করত। আমার বয়স সত্তর হয়েছে বলেই আমাকে বিশেষভাবে আলিঙ্গন করবার তো কোনো কারণ নেই। খ্যাতি দেখা যাচ্ছে মানুষের মৃত্যুর পরেই আসে। অবশ্য সত্যি বলতে কি, মরণোত্তর খ্যাতি বিষয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই।'

'কিন্তু মৃত্যুর পর আপনার নাম পৃথিবীতে থাকবে কি না—এ নিয়ে কি আপনার কোনো ভাবনা নেই।'

'না, কোনোভাবেই না। এসব খুব অনিশ্চিত ব্যাপার। আমি বরং আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত। তাদের জীবন যেন কষ্টের না হয়। তাদের জীবনকে সচ্ছল করবার মতো তেমন ব্যবস্থা আমি করতে পারিনি। আমার সারা জীবনের সঞ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যুদ্ধের কারণে। যা হোক, বার্ধক্য এখনো আমার বোঝা মনে হচ্ছে না। এখনো আমি কাজ করতে আনন্দ পাচ্ছি।'

আমরা বাড়ির সামনের বাগানের উঁচু-নিচু একটি সরু পথ দিয়ে হাঁটছিলাম। তিনি পাশে ফুটে থাকা একগুচ্ছ ফুলের ওপর হাত বোলালেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'মৃত্যুর পর আমার ভাগ্যে কী জুটবে, সে ভাবনার চেয়ে এই ফুলগুলোর ব্যাপারে আমি বেশি আগ্রহী।'

'আপনি কি গভীর হতাশাবাদী তাহলে?'

'না। এইসব দার্শনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমি জীবনের এই ছোটখাটো আনন্দগুলো থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।'

'মৃত্যুর পরও কোনো এক রূপে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবার ব্যাপারটি কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'এ বিষয় নিয়ে আমি আসলে ভাবিনি। যা জন্ম নেয়, তারই মৃত্যু ঘটে। আমার বেলায় ব্যতিক্রম ঘটবে কেন?'

'আপনার কি মৃত্যুর পর আবার ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না, এই পৃথিবীতে? অন্যভাবে বললে, আপনার কি অমরতার আকাঙ্ক্ষা নেই?'

'সত্যি বলতে, না। মানুষের যাবতীয় আচরণের পেছনের স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলো যখন একজন জেনে ফেলে, তখন তার এসবের ভেতর আর ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় না। জীবন একটা বৃত্তের মতো ঘুরছে, এটা ঘুরতেই থাকবে। তা ছাড়া নিট্‌শের কথামতো যদি তেমন একটা রক্তমাংসের পুনর্জীবন সম্ভবও হয়, তাতে কী লাভ, যদি সেখানে স্মৃতি অনুপস্থিত থাকে? অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে তো তখন আর কোনো সংযোগ থাকবে না। সুতরাং আমি এইটুকু জেনেই খুশি যে, এই বিরক্তিকর বেঁচে থাকার একটা চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটবেই। নিজের অহং আর পরিবেশের মধ্যকার অবিরাম সংগ্রামই তো জীবন। একে অহেতুক দীর্ঘায়িত করবার চিন্তা উদ্ভট মনে হয় আমার।'

'আপনার সহকর্মী স্টেইনাক যে মানুষের অস্তিত্বের চক্রটিকে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন আপনি কি তার বিরোধী?'

'স্টেইনাক তো জীবনকে দীর্ঘায়িত করবার চেষ্টা করছে না। সে বরং বৃদ্ধবয়সটাকে আরো খানিকটা সহনীয় করবার চেষ্টা করছে। সে আমাদের শরীরের কোষগুলোতে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে, যাতে কোষগুলো আরো ভালোভাবে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। জীবনকে আরো দীর্ঘায়িত করবার কোনো যুক্তি নেই কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কম কষ্টে বেঁচে থাকবার চেষ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। আমি সহনীয়ভাবে সুখী। কারণ আমি ব্যথামুক্ত, কারণ জীবনের ছোটখাটো আনন্দ আমার আছে, আমার সন্তানেরা আছে, আর এই ফুলগুলো আছে।'

আমি বলি, 'বার্নার্ড শ মনে করেন, আমাদের জীবন খুবই ছোট। তাঁর ধারণা, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমরা আমাদের আয়ু বাড়াতে পাড়ি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রয়েড বলেন, 'হতে পারে। হয়তো আমরা মরতে চাই বলে আমরা মরি। যেমন একটা টেনে ধরা রাবার ভেতর থেকে আবার তার আগের জায়গায় ফিরে আসতে চায়। মানুষও তেমনি সচেতন বা অবচেতনে তার অজৈব অস্তিত্বহীনতায় ফিরে যেতে চায়। মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা আর জীবন-আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভেতর পাশাপাশি খেলা করে। মৃত্যু ভালোবাসার বন্ধু। তারা দুজনে মিলেই বিশ্ব শাসন করে। 'বেয়ন্ড দি প্লেজার প্রিন্সিপল' বইটিতে আমি সেকথাই বলতে চেয়েছি। সাইকোএনালিসিসের শুরুতে আমরা ভাবতাম ভালোবাসাই আসল কথা কিন্তু এখন জানি যে মৃত্যুও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জীবন্ত শরীরে জৈবিকভাবেই নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে। বিলুপ্তিই জীবনের শেষ উদ্দেশ্য।'

'এ তো আত্মধ্বংসের দর্শন। এ তো যৌক্তিকভাবে পৃথিবীকে আত্মহত্যার দিকেই ধাবিত করে। তাহলে?' আমি বলি।

'না, মানুষ আত্মহত্যাকে বেছে নেয় না। জীবনকে তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করতেই হবে। সাধারণভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষার চেয়ে শক্তিশালী, যদিও শেষপর্যন্ত মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষাই শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়। মৃত্যু সেই অর্থে আমাদের আকাঙ্ক্ষারই ফল। অতএব বলা যায় সকল মৃত্যুই আসলে ছদ্মবেশী আত্মহত্যা।'

মনঃসমীক্ষণ

বাগানে তখন আমাদের শীত লাগছিল। আমরা তাঁর পড়ার ঘরে গিয়ে বসলাম। টেবিলের ওপর ফ্রয়েডের চমৎকার হাতের লেখায় অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি দেখলাম।

'এ মুহূর্তে কী বিষয়ে কাজ করছেন'—আমি জানতে চাই।

'সাধারণ মানুষ, যারা মনঃসমীক্ষণ করতে চান বা করছেন, আমি তাদের পক্ষ নিয়ে একটা লেখা লিখছি। ডাক্তাররা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কাউকে এই সমীক্ষণ করতে দিতে চান না। ডাক্তারদের স্বভাবই এই। যেকোনো নতুন আবিষ্কারকে তারা শুরুতে প্রচণ্ড বাধা দেবে। শেষে ওটার ওপরই আবার একচেটিয়া দখল নিতে চাইবে।'

'সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছেন?'

'আমার অধিকাংশ ছাত্রই সাধারণ মানুষ, ডাক্তার নয়।'

'আপনি নিজে কি প্র্যাকটিস করেন?'

'নিশ্চয়ই। এ মুহূর্তে আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেস নিয়ে কাজ করছি। তা ছাড়া আপনি জানেন যে, আমার মেয়েও একজন মনঃসমীক্ষক।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ সময় মিস আনা ফ্রয়েডকে তার এগারো বছর বয়সের এক রোগীসহ দেখতে পাই।

'আচ্ছা প্রফেসর ফ্রয়েড, আপনি আপনার নিজের মনঃসমীক্ষণ করেছেন কখনো?' আমি জিজ্ঞাসা করি।

'নিশ্চয়ই। প্রতিটি মনঃসমীক্ষকেরই নিজের সমীক্ষণ করা উচিত। নিজেকে সমীক্ষণ করলেই না আমরা অন্যকে সমীক্ষণ করতে পারব! মনঃসমীক্ষক হিব্রুদের স্কেপগেটের মতো, অন্যেরা তাদের পাপের ভার তার ওপর অর্পণ করে, সেই ভারমুক্ত হবার কৌশল তো তাকে চর্চা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমার সবসময় মনে হয়, মনঃসমীক্ষণ যেন লোককে খ্রিস্টীয় বদান্যতায় প্ররোচিত করেন। মানবজীবনের এমন কোনো বিষয় নেই মনঃসমীক্ষণ যা আমাদের বুঝতে সহায়তা করে না। সবাইকে ক্ষমা করলেই তুমি সবাইকে বুঝতে পারবে, এটাই যেন মর্মকথা।'

'সম্পূর্ণ তার বিপরীত'—খেপে উঠলেন ফ্রয়েড, তাঁর মুখ কোনো হিব্রু অবতারের মতোই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। বললেন, 'সবাইকে ক্ষমা করে দিলেই সবাইকে বোঝা যায় না। মসঃসমীক্ষণ আমাদের শুধু সহ্য করতেই শেখায় না, কী এড়িয়ে চলতে হবে তাও শেখায়। এটি আমাদের জানায় কোন্ ব্যাপারকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। অশুভকে সহ্য করা কোনো জ্ঞানের লক্ষণ নয়।'

আমি সহসা বুঝতে পারলাম, যারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে, ফ্রয়েড কেন তাদের ওপর এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, রক্ষণশীল মনঃসমীক্ষকের সোজাপথ পরিত্যাগকে কেন তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর নিরপেক্ষতা তাঁর পূর্বপুরুষদেরই উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারের জন্য তিনি নিজে গর্বিত, তাঁর জাতি গর্বিত।

তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, 'আমার ভাষা জার্মান, আমার সংস্কৃতি জার্মান, আমি মেধাগতভাবে নিজেকে জার্মানই মনে করতাম, যতদিন না জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান জার্মানদের মধ্যে সেমেটিক বিরোধী সংস্কার গড়ে উঠতে দেখেছি। এরপর থেকে আমি আর নিজেকে জার্মান মনে করি না। আমি নিজেকে ইহুদি বলতেই পছন্দ করি।'

তাঁর মন্তব্যে আমি খানিকটা হতাশই হলাম। কারণ আমি ফ্রয়েডের চেতনাকে যাবতীয় জাতিগত সংস্কারের ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে দেখতে চেয়েছিলাম। অবশ্য তাঁর এই ঘৃণা, আন্তরিক ক্রোধ, তাকে বরং আরো মানবিক করে তোলে।

দুর্বলতা না থাকলে একিলিস হতো অসহ্য।

আমি বললাম, 'আমি জেনে আনন্দিত প্রফেসর, আপনার তত্ত্বেও জটিলতা আছে এবং আপনিও অমরতাকে অস্বীকার করেন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমাদের জটিলতা আমাদের দুর্বলতার উৎস, এমনকি সেগুলো আমাদের শক্তিরও উৎস'—ফ্রয়েড বলেন।

'কে জানে আমার জটিলতা কোন্‌খানে'—আমি বলি।

উত্তরে ফ্রয়েড বললেন, 'একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষণ অন্তত এক বছর সময় নেয়। দুতিন বছরও লেগে যেতে পারে। আপনি তো বছরের পর বছর সিংহ শিকারে ব্যস্ত। আপনার প্রজন্মের বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি, যারা সবাই আপনার অগ্রজ। আপনি গেছেন রুজভেল্ট, কাইজার, হাইডেনবার্গ, ব্রিয়ান্ড, ফোক, জোফ্রি, জর্জ ব্রান্ডেস, গেরহার্ট, হাউপ্তম্যান এবং জর্জ বার্নার্ড শ'র কাছে।'

'এটা আমার কাজেরই অংশ।'

'এ কাজ আপনি পছন্দ করেন। বিখ্যাত ব্যক্তিরা হলো একটি প্রতীক। আপনার জিজ্ঞাসাগুলো আপনার অন্তরেরই জিজ্ঞাসা। আপনি চাইছেন এই বিখ্যাত ব্যক্তিরা আপনার পিতার স্থান দখল করুক, আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দিক। এটা আপনার ফাদার কমপ্লেক্স।'

আমি খুব জোরালোভাবে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলাম। অবশ্য আবার মনে হলো, এ হয়তো সত্যও হতে পারে, যা আমি কখনো টের পাইনি।

ফ্রয়েড বললেন, "আপনি আপনার 'ওয়ান্ডারিং জিউ' গ্রন্থে আপনার এই জিজ্ঞাসাকে প্রসারিত করেছেন অতীতে। আপনি সবসময় মানুষ অন্বেষণ করছেন।"

আমি বললাম, 'আপনার এখানে অনেকক্ষণ থাকতে পারলে ভালোই হত, আপনার চোখে নিজেকে দেখে আমি হয়তো ভয়েই মরে যাব। তবে আমিও কিন্তু রীতিমতো দক্ষ মনঃসমীক্ষক। আমি কিন্তু আপনার অনাগত অভিপ্রায়গুলো বুঝতে পারব, অন্তত বুঝতে চেষ্টা করব।'

'রোগীর মেধা কিন্তু চিকিৎসার জন্য বাধা নয় বরং তা সুবিধাই'—ফ্রয়েড উত্তরে বললেন।

এক্ষেত্রেও ফ্রয়েড তাঁর অন্যান্য অনুগামীদের চেয়ে পৃথক। অন্যেরা রোগীর আত্মপ্রত্যয়ে বিরক্ত হন।

অধিকাংশ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের 'ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন' প্রয়োগ করেন। তারা রোগীকে তার মনে যা আসে তাই বলতে বলেন, সেসব কথা যতই উদ্ভট, অশ্লীল, অপ্রাসঙ্গিক হোক। কোনো আপাত-গুরুত্বহীন সূত্র ধরে তারা রোগীর মানসিক ড্রাগনটিকে কজা করতে পারেন। রোগীর সক্রিয় সহযোগিতা তারা পছন্দ করেন না, কারণ তাতে যদি রোগী তার অনুসন্ধানের পথটি টের পেয়ে যায় তখন অবচেতনেই সে তার গোপন বিষয়গুলো আগলে রাখবে, মানসিক শিকারি তখন পথ ভুল করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের আবেগ, চিন্তা কীভাবে তৈরি হয় এসব না জানলেই কি আমরা বেশি সুখী হতাম না? মনঃসমীক্ষণ আমাদের মনের জটিলতাগুলো খুঁড়ে বের করে জীবনের আনন্দ যেন সব চুরি করে নিচ্ছে। আমাদের সবার মনের গভীরেই যে এক-একটা বর্বর, অপরাধী পশু বসে আছে, এ খবর আমাদের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের নয়।' আমি বলি।

ফ্রয়েড উত্তরে বলেন, 'পশুদের নিয়ে আপনার এত আপত্তি কেন? আমার তো মানুষের সমাজের চেয়ে পশুর সমাজই বেশ ভালো মনে হয়।'

'কেন?'

'কারণ তারা কত সরল দেখুন। তারা অহং বা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের চাপে ভোগে না। মানুষ সভ্যতার মানদণ্ডে নিজেকে খাপ খাওয়াতে নিজের মেধা এবং মনকে কী প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রাখে দেখুন। যাদেরকে বর্বর বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে ঠিকই কিন্তু সভ্য মানুষদের মতো ছোট মনের পরিচয় সেখানে পাবেন না। সভ্য মানুষের মনের সংকীর্ণতা আসলে তার ওপর সার্বক্ষণিক সামাজিক চাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। একজন বর্বর সোজা আপনার গলা কেটে ফেলবে, আপনাকে ভাজি করে খেয়ে ফেলবে কিন্তু সভ্য মানুষদের মতো অনবরত একটু একটু করে খুঁচিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে না। মানুষের যতসব বদভ্যাস, ভীরুতা, অভক্তি সব এই জটিল সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না-পারার উপসর্গ। এসব আমাদের প্রবৃত্তি আর সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। একটা কুকুরের আবেগ দেখুন, কী সোজাসাপ্টা, সরল। হয় লেজ নাড়ানো নাহয় চেঁচানো। কুকুরের আবেগের সারল্য প্রাচীন বীরদের কথা মনে করিয়ে দেয়। দেখবেন লোকে কিন্তু কুকুরদের নাম রাখে প্রাচীন বীরদের নামে। একিলিস, হেক্টর।'

'আমার কুকুরের নামও কিন্তু অ্যাজাক্স।' আমি বলি। শুনে ফ্রয়েড হাসলেন।

আমি আরো বলি, 'ভাগ্যিস কুকুরটা পড়াশোনা জানে না। সে যদি তার ইডিপাস কমপ্লেক্স নিয়ে কিছু বলতে শুরু করত, তাহলে বোধহয় বেচারাকে তাড়িয়েই দিতে হতো। দেখুন প্রফেসর, জীবন আপনার কাছেও জটিল মনে হচ্ছে। আমার তো মনে হয় সভ্যতার এই জটিলতার জন্য আপনিও কিছুটা দায়ী। আপনার এই মনঃসমীক্ষণ আবিষ্কারের আগে আমরা তো জানতাম না আমাদের মনের ভেতর এতসব ঘোরপ্যাঁচ। মনঃসমীক্ষণ জীবনকে আরেক ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে।'

ফ্রয়েড বলেন, 'তা কেন, মনঃসমীক্ষণ জীবনকে সরল করে তোলে বরং। মনঃসমীক্ষণ আপনাকে সেই দড়িটি ছুড়ে দেয় যেটা দিয়ে আপনি আপনার অবচেতনের গোলকধাঁধা থেকে উঠে আসতে পারেন। আপাতভাবে মনে হয় যে, জীবন বুঝি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনোই জটিল ছিল না। কিন্তু প্রতিদিনই আমি, আপনি নতুন কোনো ধারণার জন্ম দিয়ে জীবনকে ক্রমশই জটিল করছি।'

'আপনার কিছু ছাত্র আপনার চেয়েও গোঁড়া। আপনার মুখ থেকে যা একবার বেরিয়েছে, সেটাকে তারা আঁকড়ে ধরে আছেন।' আমি বলি।

ফ্রয়েড বললেন, 'জীবন বদলাচ্ছে, মনঃসমীক্ষণও বদলাবে। আমরা নতুন একটা বিজ্ঞানের একেবারে প্রারম্ভিক স্তরে।'

আমি বললাম, 'তবে আমার মনে হয়, যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আপনি উপস্থাপন করেছেন তা খুবই বিস্তৃত। আপনার প্রতিস্থাপক শিশু-যৌনতা এবং স্বপ্ন-প্রতীক তত্ত্বগুলো যথেষ্ট স্থায়ী বলেই মনে হয়।'

ফ্রয়েড বলেন, 'তবুও আমি আবার বলব, আমরা একটা নতুন বিজ্ঞানের দোরগোড়ায় মাত্র। আমি মনের বিভিন্ন স্তরে ডুবে থাকা পাহাড়গুলো খুঁড়তে শুরু করেছি কেবল। আমি নিতান্ত কিছু মন্দির আবিষ্কার করেছি, অন্যেরা পুরো একটি সাম্রাজ্য পেয়ে যেতে পারেন।'

যৌনতা, প্রেম

'আপনার তত্ত্বে যৌনতা একটি বড় জায়গা দখল করে আছে।' আমি বলি।

"মহান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখেছেন, 'যদি যৌনতা না থাকত, তাহলে তো কিছুই থাকত না।' কিন্তু আমি তো আপনাকে বলেছি আমি সেসব ব্যাপারকেও সমান গুরুত্ব দিই যা 'সুখ'-এরও ঊর্ধ্বে, যেমন মৃত্যু, জীবনের ধ্বংস। এতে বোঝা যায় কেন কিছু মানুষ কষ্ট ভালোবাসে, কেন তারা জীবনের একটি সমাপ্তি চায়, কেন কবি ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন—

ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন
ভাগ্যিস, কোনো জীবন চিরকাল বেঁচে থাকে না
কোনো মৃত মানুষ আবার ফিরে আসে না
এমনকি ক্লান্ত নদীও শেষে সাগরে মেশে।"

'বার্নার্ড শও আপনার মতো চিরকাল বাঁচতে চান না। কিন্তু তিনি অবশ্য আপনার মতো যৌনতাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না।' আমি বলি।

'শ যৌনতা বোঝেন না। ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। তাঁর নাটকে সত্যিকার কোনো প্রেমের বিষয় নেই। তিনি সিজারের প্রেম নিয়ে ঠাট্টা করেন এবং ক্লিওপেট্রাকে একজন ফালতু মেয়েতে পরিণত করেন। অত্যন্ত মেধাবী, প্রজ্ঞাবান হওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্ত্বেও প্রেমের মতো মানব-কর্মযজ্ঞের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে শ-এর নাটকের কোনো শাশ্বত আবেদন নেই। এর পেছনে রয়েছে তাঁর নিজের মনস্তত্ত্ব। তিনি নিজেই তাঁর এক লেখায় তাঁর স্বভাবের যোগী ভাবটির কথা উল্লেখ করেছেন।

দেখুন, আমি হয়তো অনেক ভুলভ্রান্তি করেছি কিন্তু এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, যৌনতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি কোনো ভুল করিনি। যৌন প্রবৃত্তি এত তীব্র যে এটি সভ্যতার যাবতীয় বর্ম ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রবাদ আছে রাশানকে একটু খুঁচিয়ে দেখো চামড়ার নিচ থেকে বেরিয়ে আসবে তাতার। মানুষের যাবতীয় আবেগকে খুঁচিয়ে দেখা হোক, কোনো এক স্তরে যৌনতাকে পাওয়া যাবে। যে যৌনতার কারণেই মানবপ্রজাতির এই অব্যাহত স্রোত।'

সাহিত্যে মনঃসমীক্ষণ

'আপনার এই ধারণাটি সাহিত্যিকদের কিন্তু ভীষণ প্রভাবিত করেছে। মনঃসমীক্ষণ সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে'—আমি বলি।

'তবে মনঃসমীক্ষণের ধারণাও কিন্তু আমি আবার পেয়েছি সাহিত্য আর দর্শন থেকে। নিট্‌শে ছিলেন প্রথম মনঃসমীক্ষক। ভাবতে অবাক লাগে কত আগে আমাদের আবিষ্কারের এই ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেছিলেন। মানব-মনের দ্বৈত সত্তাকে এবং আনন্দনীতির শাসনকে তাঁর মতো কেউ চিহ্নিত করতে পারেনি। তাঁর জরথুস্ত্র বলে—

> 'আনন্দ অমরত্ব চায়,
> অনির্বাণ চায়, চায় গভীর অবিনশ্বরতা।'

মনঃসমীক্ষণ আমেরিকায় যত আলোচিত হয়েছে, অস্ট্রিয়া বা জার্মানিতে তা হয়নি, তবে হ্যাঁ, সাহিত্যে এর প্রভাব ঘটেছে অপরিসীম। নিট্‌শে ছিলেন প্রথম মনঃসমীক্ষক। টমাস মান ও তার হুগো ফন হফমানস্তালে তা স্পষ্ট। স্লিৎজলার তো কবিতায় সেই কাজ করছেন যা আমি বিজ্ঞানে করতে চাইছি। অবশ্য ডা. স্লিৎজলার একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী।'

ফ্রয়েড থামলে আমি বলি, "আপনি নিজেও তো বিজ্ঞানী এবং কবি, আমেরিকায়ও আপনার প্রভাব ব্যাপক। প্রায় যেকোনো উপন্যাস খুললেই তো এখন মনঃসমীক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রুপার্ট হুজেস, হার্ভে হিগিনস এবং অন্যেরা আপনারই ব্যাখ্যাকার হিসেবে কাজ করছেন। নাট্যকার ইউজিন ও নীল, সিডনি হাওয়ার্ডের ওপর আপনার প্রচুর প্রভাব। 'দি সিলভার কর্ড' যেমন আপনার ইডিপাস কমপ্লেক্সেরই নাট্যরূপ।"

ফ্রয়েড বলেন, 'আমি জানি। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমেরিকায় আমার জনপ্রিয়তায় আমি কিছুটা ভীত। এ ব্যাপারে আমেরিকান আগ্রহ খুবই উপরিতলের।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্রেফ পত্রপত্রিকায় পড়ে, বিষয়টাকে ভালোভাবে না-জেনে, গবেষণা না-করে একধরনের হালকা জনপ্রিয় ব্যবহার সেখানে হচ্ছে। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় দেশগুলোতে ভালো কাজ হচ্ছে। যদিও আমেরিকান ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি আমাকে সবার আগে সম্মানসূচক ডিগ্রি দিয়েছিল যখন ইউরোপে আমি রীতিমতো বহিষ্কৃত, তবু বলব আমেরিকায় সাইকোএনালিসিসের ওপর মৌলিক কাজ তেমন নেই।

আমেরিকানরা খুব চালাকি করে সবকিছুকে সাধারণ স্তরে নিয়ে আসতে পারে। তা ছাড়া আমেরিকায় এবং অস্ট্রিয়াতেও মেডিক্যাল সংস্থা এই ক্ষেত্রটিকে দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু মনঃসমীক্ষণকে শুধু ডাক্তারদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে মারাত্মক ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত। তারা মনঃসমীক্ষণের বিকাশকে বাধাগ্রস্তই করবে।'

যে-কোনো মূল্যে ফ্রয়েড সত্য বলবেন। আমেরিকায় তাঁর সবচেয়ে বেশি ভক্ত হলেও তিনি তাদের খুশি করতে কিছু বলবেন না কখনো। আপসহীন হলেও ফ্রয়েড পাশাপাশি মার্জিত স্বভাবের মানুষ, তিনি যে-কোনো পরামর্শই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তাঁর আতিথ্যের উপহার ছাড়া কোনো অতিথি কোনোদিন তাঁর ঘর ত্যাগ করেনি।

স্ফিংসের ধাঁধা

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাকে ফিরতি ট্রেন ধরতে হবে। ফ্রয়েড, তাঁর স্ত্রী আর কন্যা কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। শেষবারের মতো হাত মেলাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কিন্তু হতাশাবাদী নই। আমি পৃথিবীকে ঘৃণা করি না। কাউকে ভালোবাসার একটা উপায় হচ্ছে তাকে ঘৃণা করি বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। না, আমাকে পাঠকদের কাছে হতাশাবাদী হিসেবে দাঁড় করাবেন না। আমি হতাশাবাদী নই, যতক্ষণ আমার সন্তানরা আছে, স্ত্রী আছে, এই ফুলগুলো আছে।'

ফ্রয়েড হেসে আবার বললেন, 'ভাগ্যিস ফুলগুলোর কোনো চরিত্র নেই, সুতরাং কোনো জটিলতাও নেই। আমি আমার এই ফুলগুলো ভালোবাসি এবং আমি অসুখী নই। অন্তত অন্যদের তুলনায় বেশি অসুখী নেই।'

আমার গাড়ি চলল স্টেশনের দিকে। ধূসর চুল, খানিকটা ন্যুব্জ ফ্রয়েডের দেহ ক্রমশ আড়াল হয়ে যেতে লাগল আমার দৃষ্টি থেকে।

ফ্রয়েড, ইডিপাসের মতোই স্ফিংসের চোখের খুব গভীরে তাকিয়েছেন। যে তাঁর সামনে যায় স্ফিংস তাকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। যে তার ধাঁধার উত্তর দিতে পারে না তাকে সে নিষ্ঠুরভাবে পাহাড়ের উপর থেকে ছুড়ে হত্যা করে। তবু যাদের সে হত্যা করে তাদের প্রতি স্ফিংস যেনবা বেশি সদয়, যারা তার ধাঁধার উত্তর পেয়ে যায় তাদের চেয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

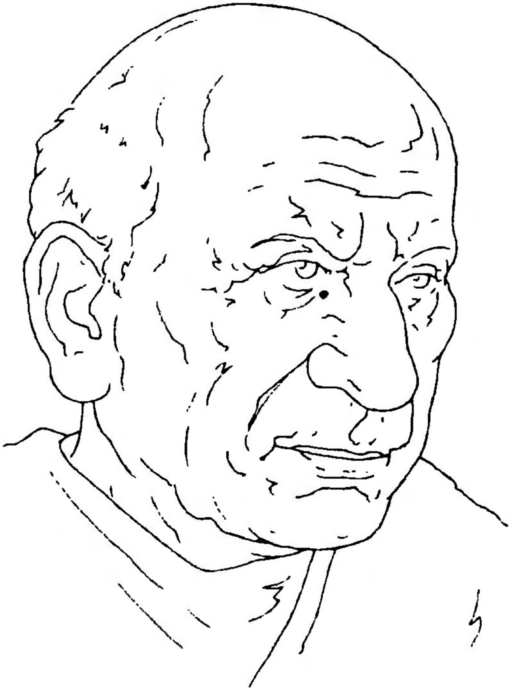

পা ব লো পি কা সো

চিত্রকর পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১ সালে স্পেনে। বার্সিলোনা এবং মাদ্রিদে পড়াশোনা করেন পিকাসো। ১৯০১ সালে তিনি প্যারিসে চলে যান। সেখানে নিউ ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকর লুত্রেক এবং দেগা দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে পারসপেকটিভ-ভিত্তিক চিত্ররীতিকে অস্বীকার করে জর্জ ব্রাকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'কিউবিজম' নামে এক নতুন ধারার চিত্রকলার সূচনা করেন।

১৯৩৭-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধের ওপর আঁকা তাঁর 'গোয়ের্নিকা' ছবিটি বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্যারিসে অবস্থান করেন এবং যুদ্ধশেষে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সারাজীবন পিকাসো ব্যাপক বিচিত্র সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পেইন্টিং ছাড়া লিপোগ্রাফ, ভাস্কর্য, সিরামিক্স ইত্যাদি মাধ্যমেও কাজ করেছেন। প্যারিসে শুধু পিকাসোর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে একটি পৃথক মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। তিনি ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিউ মাসেস পত্রিকার পক্ষ থেকে জেরোম সেকলার ১৯৪৫ সালে পাবলো পিকাসোর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। ব্যক্তি পিকাসোর নানা দিক এবং নিজের চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর মতামত এই সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত *দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ* গ্রন্থে।

প্রহেলিকাময়

গত ১০ বছর ধরে আমি এবং আমার বন্ধু পিকাসোকে নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে করতে রীতিমতো বিরক্ত। সত্যিই তাই। শেষপর্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, পিকাসো তাঁর তথাকথিত বিভিন্ন 'পিরিয়ড'-এর ছবিতে শুধু এই অস্থির, স্ববিরোধী সময়কেই প্রতিফলিত করেছেন, কিন্তু এই সময়কে বুঝতে সাহায্য করবার জন্য কখনো ছবি আঁকেননি। সমালোচকগণ, যারা চিত্রকরদের বিভিন্ন লেবেল দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, তারা পিকাসোকে নানারকম স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন—পরাবাস্তববাদী, ধ্রুপদী, বিমূর্তবাদী, প্রদর্শনবাদী এমনকি দেহকসরতবাদী হিসেবেও। এইসব বাজে বকা ছাড়া এই সমালোচকরা কখনোই পিকাসোকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। পিকাসো একটা প্রহেলিকাই রয়ে গেছেন সবসময়।

এরপর এল এক বিস্ফোরণ। তিনি আঁকলেন 'গোয়ের্নিকা' এবং এর মাধ্যমে তিনি আবির্ভূত হলেন একজন শক্তিমান প্রতিবাদী শিল্পী হিসেবে। কিন্তু ফ্রান্স এই যুদ্ধে যোগদানের আগে পর্যন্ত পিকাসোর ছবিতে এই প্রচণ্ড প্রতিবাদের কোনো প্রতিফলন ছিল না। এরপর বিপর্যয় নামল ফরাসি সেনাবাহিনীতে, জার্মান আগ্রাসনের শিকার হলো তারা। পিকাসোর নামে নানা গল্প ছড়াল তখন। বলা হলো জার্মানদের অধীনে পিকাসো বেশ ভালোই আছেন, গেস্টাপোদের সঙ্গে খেলাধুলা করছেন, ফলে তাঁর পক্ষে নির্বিঘ্নে ছবি আঁকতে বেশ সুবিধাই হচ্ছে, তিনি নাকি তাঁর ছাত্রদের আঁকা ছবিতে নিজে সই করে নাজিদের কাছে বিক্রি করছেন এইসব। এমনকি এমনও শোনা গেল যে তিনি মারা গেছেন। ১৯৪০ থেকে ফ্রান্সের মুক্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত পিকাসো ছিলেন নানা অস্পষ্টতা, রহস্যে ঘেরা এক মানুষ।

স্বাধীনতার পর অক্টোবরে এল আরেক চমকপ্রদ খবর, পিকাসো কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন।

স্বাধীনতার মাসে প্যারিসে সমকালীন ফরাসি শিল্পের এক বিশাল প্রদর্শনী হলো যেখানে একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হলো শুধুমাত্র পিকাসোর জন্য। সেখানে পিকাসোর চুয়াত্তরটি ছবি এবং পাঁচটি ভাস্কর্য স্থান পেল, যেগুলো সবই জার্মান-অধিকৃত সময়ের কাজ। এই প্রদর্শনী আমাকে বিস্মিত করল। এ সেই গোয়ের্নিকার পিকাসো। শক্তিশালী, চমৎকার জীবন আর প্রত্যাশার ছবি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি তাঁর ছবিগুলো দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে মনস্থির করলাম। এক ফরাসি তরুণ চিত্রকরের মাধ্যমে আমি তাঁর ঠিকানা যোগাড় করলাম। আমি যখন তাঁর স্টুডিওতে পৌঁছলাম তখন পাশের ঘরে আমাকে ফিসফিস করে বলা হলো, পিকাসো বাড়িতে নেই। তাঁর সেক্রেটারি বললেন, 'পিকাসোকে নিয়ে এতসব কাণ্ড হলো যে গত দুই মাস তিনি কিছু আঁকতে পারেননি। এখন তিনি স্থির হয়ে বসে কিছু কাজ করতে চান।' যাহোক, শেষপর্যন্ত আমার সেই তরুণ চিত্রকর বন্ধু পিকাসোর সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। এক শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় আমি তাঁর স্টুডিওতে পৌঁছাই এবং আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়।

শেন নদীর পাড়ে নিরহঙ্কার একটা জায়গায় চারতলা একটি দালানের উপরের দুইতলায় থাকেন পিকাসো। তাঁর স্টুডিওতে যেতে হলে দেয়ালের একটা বড় গর্ত দিয়ে ঢুকে সরু ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। গত আট বছর এটিই পিকাসোর বাড়ি এবং স্টুডিও। স্টুডিওর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বই, ছবি, ইজেল। আমি যখন অপেক্ষা করছিলাম তখন ইজেলে রাখা সম্প্রতি শেষ করা তাঁর একটা ছবি দেখছিলাম, টেবিলের উপর রাখা একটা ধাতুপাত্রে ছবি। ছবিটির উপরে টানানো একটা স্কেচ, যে স্কেচটিকেই তিনি অনুপুঙ্খ অনুসরণ করেছেন ঐ ছবিটিতে। আমি তাঁর সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জার্মানদের সঙ্গে কি পিকাসোর সমস্যা হয়েছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সবার মতো আমাদেরও অনেক কঠিন সময় গেছে। পিকাসোকে কোনো প্রদর্শনী করতে অনুমতি দেয়া হয়নি। একবার এক গেস্টাপো এসে অভিযোগ করল, পিকাসোর আসল নাম নাকি 'লিপজিগ'। পিকাসো শুধু বললেন, 'আমি পিকাসো, ব্যস্।' এরপর তারা তাঁকে বিরক্ত না করলেও সবসময় তাঁর ওপর নজর রাখত। অবশ্য এর মধ্যেই পিকাসো গোপন অন্দোলনকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগযোগ রাখতেন।"

মিনিট-দশেক পর পিকাসো উপর থেকে নেমে সরাসরি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে একনজরে দেখলেন এবং তারপর তাকালেন আমার চোখের দিকে। তাঁর পরনে হালকা বাদামি স্যুট, নীল সুতি শার্ট ও টাই, বুকপকেটে একটা উজ্জ্বল হলুদ রুমাল, ছোট কিন্তু শক্ত তাঁর হাত। আমি আমার পরিচয় দিলে পিকাসো তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর উষ্ণ, আন্তরিক হাসি, কথাবলার স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে আমি সহজবোধ করতে লাগলাম।

আমি তাঁকে বললাম তাঁর কাজ আমাকে সবসময়ই আগ্রহী করে আবার বেশ ধাঁধাতেও ফেলে দেয়, সেইসঙ্গে বললাম তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনী দেখবার পর আমি বুঝতে পারছি তিনি আসলে কী বলতে চান। তাঁর ছবিগুলো সম্পর্কে আমার নিজের ব্যাখ্যা তাঁকে জানাবার জন্য তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে এসেছি, সেকথা জানালাম। তাঁর 'দি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেইলর' ছবিটা সম্পর্কে আমি আমার ব্যাখ্যা পিকাসোকে বললাম। আমি বললাম, এই ছবিটি তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি। নাবিকের পোশাক, জাল, লাল প্রজাপতি এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে পিকাসো এই সময়ের একটা সমাধান খুঁজছেন, একটা উন্নত সমাজের অন্বেষা করছেন, নাবিকের পোশাক এই অন্বেষণে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণকেই নির্দেশ করছে। পিকাসো মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন এবং বললেন, 'হ্যাঁ, ওটা আমারই প্রতিকৃতি কিন্তু কোনো রাজনৈতিক অর্থে আমি ছবিটি আঁকিনি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'নিজেকে আপনি নাবিক হিসেবে কেন আঁকলেন?'

তিনি বললেন, 'কারণ আমি সবসময়ই নাবিকের পোশাক পরি, দেখুন।' তিনি তাঁর শার্ট খুলে ভেতরের সাদা নীল স্ট্রাইপ জামাটা দেখালেন।

'কিন্তু ঐ লাল প্রজাপতিটা কেন? আপনি কি রাজনৈতিক তাৎপর্যের কারণেই ওটার রঙ লাল করেননি'—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'ঠিক নির্দিষ্ট করে সে অর্থে নয় তবে আমার অবচেতনায় সেরকম কিছু থেকে থাকতেও পারে'—পিকাসো বললেন।

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'আপনি বলুন আর না-ই বলুন এর একটা নির্দিষ্ট অর্থ নিশ্চয়ই আছে। আপনার অবচেতনে যেটা আছে, সেটা আপনার সচেতন মনেরই চিন্তার ফল। বাস্তবতা থেকে পালানোর তো কোনো উপায় নেই আমাদের।'

তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হতে পারে এবং তা স্বাভাবিক।'

এরপর পিকাসো জিজ্ঞাসা করলেন, আমি লেখক কি না, আমি সত্যকথা জানালাম যে আমি লেখক নই, শখে ছবি আঁকি। আমি পিকাসোকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি তাঁকে নিয়ে পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখতে অনুমতি পেতে পারি কি না।

পিকাসো বললেন, 'নিশ্চয়ই। কোন্ পত্রিকায় লিখবেন?'

আমি বললাম, 'নিউ মাসেস।' তিনি হেসে বললেন, পত্রিকাটি আমার পরিচিত।

তিনি খোলা দরজার দিকে তাকালেন। আরো অনেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, 'চলুন কিছুক্ষণের জন্য উপরের স্টুডিওতে যাই।' আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরের বড় স্টুডিওতে গেলাম, যেখানে তিনি কাজ করেন। এই ঘরটি পরিচ্ছন্ন, নিচের ঘরটির মতো নোংরা, এলোমেলো নয়। আমি পিকাসোকে বললাম, 'লোকে বলছে আপনার নতুন রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে আপনি হয়ে উঠবেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পুরোধা, মানবপ্রগতিতে এর প্রভাব হবে অপরিসীম।'

পিকাসো মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গোয়ের্নিকা, অন্যান্য

আমি তাঁকে জানালাম নিউইয়র্কে বসে তাঁর ছবি, বিশেষ করে গোয়ের্নিকা নিয়ে কত আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি ছবিটির ঐ ষাঁড়, ঘোড়া, আয়ুরেখাসমেত হাত ইত্যাদির তাৎপর্যের কথা বললাম। পিকাসো আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ ষাঁড় বর্বরতার প্রতীক, ঘোড়া জনতার, হ্যাঁ, ঐ ছবিটাতে আমি প্রতীক ব্যবহার করেছি কিন্তু অন্য ছবিতে নয়।'

ঐ প্রদর্শনীর আরো দুটো ছবি সম্পর্কে আমার নিজস্ব ব্যাখ্যা আমি তাঁকে জানাই। 'একটি ছবিতে ষাঁড়, বাতি, প্যালেট এবং বই আছে, আমি বলি ষাঁড়টি নিশ্চয়ই ফ্যাসিবাদকে প্রতিফলিত করছে আর বাতিটি এর শক্তির আভা, অন্যদিকে প্যালেট এবং বই নির্দেশ করছে সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতাকে, যার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। এই ছবিটি এ দুটোর মাঝে অর্থহীন দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করছে।'

'না ষাঁড়টি ফ্যাসিবাদ নয়, বরং বর্বরতা এবং অন্ধকারকে বোঝাচ্ছে'—তিনি বলেন।

আমি বলি, এখন আমরা তাঁর ছবিতে কিছুটা পরিবর্তিত, সরল এবং সহজবোধ্য প্রতীককে খুঁজি।

পিকাসো বলেন, কিন্তু আমার কাজ প্রতীকী নয়। শুধু গোয়ের্নিকায় প্রতীকের ব্যবহার আছে। এখানে আমি ষাঁড়, ঘোড়া এসব প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছি। ঐ ম্যুরালে একটা সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত, সেজন্য ওখানে আমি প্রতীক ব্যবহার করেছি।

তিনি বলতে থাকেন, 'কেউ কেউ আমার কাজকে বলে পরাবাস্তববাদী। কিন্তু আমি কোনোদিন পরাবাস্তববাদী ছিলাম না। আমি বাস্তবতার বাইরে কোনোদিন যাইনি। আমি বাস্তবতার নির্যাসের ভেতর সবসময় থেকেছি। কেউ যদি যুদ্ধকে প্রকাশ করতে চায়, তাহলে একটি তীর আর ধনুকের মধ্যদিয়ে সেটি প্রকাশই হবে সবচেয়ে নান্দনিক, কাব্যিক, কিন্তু আমি যদি যুদ্ধকে দেখাতে চাই তাহলে আমি একটা মেশিনগানই ব্যবহার করব। এখন একটা পরিবর্তন, বিপ্লবের সময় এবং এখন ছবিও তাই আঁকা হবে বিপ্লবী ধারায়, আগের মতো নয়।' তারপর তিনি সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন আমার কথা?'

আমি তাঁকে বললাম, প্রদর্শনীতে তাঁর অনেক ছবি আমি বুঝতে পারলেও কিছু ছবি আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। আমার বাঁ পাশে ঝোলানো ছবিটার দিকে আমি তাকাই, একজন নগ্নিকা এবং একজন বাদকের ছবি, এ ছবিটি প্রদর্শনীতে ছিল, আমি ছবিটিকে দেখিয়ে বলি, 'যেমন এই ছবিটি আমি বুঝতে পারিনি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এটি নেহাতই একজন নগ্ন মেয়ে আর এক বাদকের ছবি।' তিনি বললেন, 'এটি আমি আমার নিজের জন্য এঁকেছি। অন্যেরা নগ্ন আকারগুলোকে সনাতন ধারায় প্রকাশ করে থাকে কিন্তু আমি প্রকাশ করেছি বিপ্লবী ধারায়। এই ছবির কোনো বিমূর্ত অর্থ নেই। এটি স্রেফ একটি নগ্ন মেয়ে আর এক বাদকের ছবি।'

'আপনি এমনভাবে কেন আঁকেন যে লোকে আপনার প্রকাশভঙ্গি বুঝতে পারে না'— আমি জানতে চাই।

পিকাসো বলেন, 'আমি এভাবেই আঁকি কারণ এটি আমার চিন্তারই ফসল। বহু বছর কাজের মাধ্যমেই আমি এই ফসল অর্জন করেছি, এখন যদি এক পা পিছিয়ে যাই (তিনি সত্যি সত্যি এক পা পিছিয়ে দেখালেন) তাহলে সেটি জনগণের প্রতি অন্যায় করা হবে কারণ এই ছবি আমার চিন্তারই ফসল। শুধু লোককে বোঝাবার তৃপ্তির জন্য আমি তো যেমন-তেমন ধারার ছবি আঁকতে পারি না। আমি আমার মানকে নিচে নামাতে পারি না।' তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি নিজেও ছবি আঁকেন। আপনিও জানেন যে, কোনো একটি ছবি আপনি কেন এভাবে বা ওভাবে আঁকছেন তা ব্যাখ্যা করা কত মুশকিল। আমি ছবির মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করি, কথার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করতে পারি না। আমি বলতে পারি না কেন ছবিটি আমি এইরকম করে আঁকলাম। আমি যদি একটা ছোট টেবিলের স্কেচ করতে চাই (তিনি পাশে রাখা একটা টেবিলকে ধরলেন), আমি টেবিলটার প্রতিটা খুঁটিনাটি জিনিস দেখি। এর আকার, ঘনত্ব, সবকিছু এবং তারপর সেটা আমার নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করে নিই।' তিনি পাশে রাখা তাঁর আঁকা চেয়ারের একটা বড় ছবির দিকে নির্দেশ করলেন (এ ছবিটিও প্রদর্শনীতে ছিল)। বললেন, 'দেখুন, কীভাবে আমি কাজটা করেছি, এটা বেশ মজার যে আপনি ছবিতে নিজে যা আঁকেননি, মানুষ তা দেখে। তারা বিষয়টি নিয়ে নিজেরাই নানারকম কারুকাজ করে, তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই, তারা যদি সত্যিই তা দেখে থাকে, তবে তা উৎসাহেরই কথা এবং তারা যা দেখছেন তার নির্যাস নিশ্চয়ই ছবিটিতে আছে।'

আমি পিকাসোকে বললাম, 'কবে আবার আমাদের দেখা হতে পারে?' তিনি বললেন, আমার যখন খুশি আমি চলে আসতে পারি। আমি তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম।

চিত্রকলা, রাজনীতি

এরপর যত তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব ভেবেছিলাম তত তাড়াতাড়ি সম্ভব হলো না। সপ্তাহখানেক পর আর এক শনিবার সকালে আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম। পিকাসো তাঁর শোবার ঘরেই আসতে বললেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেখানে আমি ঢুকবার আগে শুনতে পাচ্ছিলাম তিনি বন্ধুদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি উঠে এলেন এবং হাত মিলিয়ে অভিনন্দন করলেন। এবারও তিনি এত সহজ আর আন্তরিক ছিলেন যে আমার মনে হচ্ছিল তাঁকে যেন বহু বছর চিনি। আমাকে শোবার ঘরে ডেকেছেন বলে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, 'নিচতলায় আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম, তাই এখানেই এখন আমার কুকুর, কাগজপত্র, ছবি, বিছানা সবকিছুকে গুছিয়ে নিতে হচ্ছে।' কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত নড়ছিল যেমন অর্কেস্ট্রার পরিচালক তার হাত নাড়েন। ঘরটা বেশ ঠাসাঠাসি, অগোছালো বিছানা, লেখার টেবিল, হেলানো ড্রইং টেবিল, একটা শান্ত-চোখের কুকুর ঘুরছে একটা কয়লার চুলার চারপাশে। চুলায় পানির পাত্র। বিছানায় এবং টেবিলে ছড়িয়ে আছে সাত-আটটা সদ্যসমাপ্ত এচিং, উজ্জ্বল লাল, নীল আর হলুদ রঙের। বিছানার উপর পাঁচ-ছয়টা সংবাদপত্র। টেবিলের উপর জিঙ্ক প্লেট, দুটো প্রিন্ট, চমৎকার উজ্জ্বল রঙের দুটো লেবু এবং ওয়াইন পাতা। আরেকটি টেবিলে রুবেন্সের পুরনো একটি ছবি, একজন নারী এবং পুরুষ, ভালোবাসায় উদ্বেল, আরেক জায়গায় একটি ল্যান্ডস্কেপ।

আমাদের আগের সাক্ষাৎকারের বিবরণটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটি পড়লাম। লেখাটি যেহেতু ইংরেজিতে ছিল আমি তা ফরাসিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম। তিনি লেখাটার সঙ্গে একমত হলেন তবে আমার ফরাসি অনুবাদে হয়তো কোথাও গলদ হয়ে থাকবে, ফলে তিনি এক জায়গায় ভুল বুঝলেন, ভাবলেন আমি হয়তো লিখেছি তিনি ষাঁড় বলতে ফ্যাসিজমকে বুঝিয়েছেন। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'না ওটা ফ্যাসিজম বোঝায় না।'

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, হ্যাঁ তিনি বলেছেন ওটা ফ্যাসিজম বোঝায় না কিন্তু বর্বরতা এবং অন্ধকারকে বোঝায়। আমি বললাম, 'আপনি এ দুটোর একটা পার্থক্য করছেন কিন্তু সত্যিই কি এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে? বিশ্ববাসী কি জানে না ফ্যাসিজম মানেই অন্ধকার আর বর্বরতা, মৃত্যু আর ধ্বংস? প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনো পার্থক্য আছে কি?'

পিকাসো মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু আমি ঐ কথা ভেবে ছবিটি আঁকিনি, আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন তা সত্য হতে পারে। তবে আবারও বলছি, সেটা আমার ভাবনায় ছিল না।'

আমি আবার জোর দিয়ে বললাম, 'কিন্তু পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর গভীর প্রভাব তো আপনার ভেতর আছে। আপনি স্বীকার করেছিলেন যে আপনার অবচেতন মন জীবনের সঙ্গে আপনার সচেতন যোগাযোগেরই ফল, আপনার চিন্তা এবং প্রতিক্রিয়ারই ফল। একটা বিশেষ বস্তু নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে আপনার ছবিতে এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত হয়নি। আপনি সচেতনভাবে না ভেবে থাকলেও ঐ বিষয়গুলোর একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে।'

উত্তরে পিকাসো বললেন, 'হ্যাঁ আপনি যা বলছেন তা খুবই সত্য কিন্তু আমি ঠিক জানি না আমি নির্দিষ্ট কোনো কারণে ঐ উপাদানগুলো ব্যবহার করেছি। নির্দিষ্ট কিছুর রূপক সেগুলো নয়। ষাঁড় একটি ষাঁড়মাত্র, প্যালেট প্যালেটই কিংবা বাতি নিছক একটা বাতি। ব্যস্, আমার দিক থেকে এর কোনো রাজনৈতিক যোগসূত্র নেই। হ্যাঁ, অন্ধকার বা বর্বরতা হতে পারে কিন্তু ফ্যাসিজম নয়।'

তিনি ওয়াইন গ্লাস এবং লেবুর এচিংটার দিকে এগিয়ে গেলেন; বললেন, 'এই যে ছবিটাতে একটা গ্লাস আর একটা লেবু দেখছেন, এর আকার রঙ, এই লাল, নীল, হলুদ দেখছেন। এর কি কোনো রাজনৈতিক অর্থ আছে বলে মনে করেন?'

'নিছক উপাদান হিসেবে তা নেই', আমি বলি।

'ঐ ষাঁড়, প্যালেট, বাতিটির বেলাতেও ব্যাপারটা তা-ই।' তিনি বলেন। তিনি কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, 'আমি একজন কেমিস্ট, কম্যুনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট যা-ই হই না কেন, আমি যদি ছবিতে খানিকটা লাল ব্যবহার করি, তাহলেই কি তা কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডা হয়ে যাবে? আমি যদি হাতুড়ি বা কাস্তে আঁকি লোকে ভাববে আমি কম্যুনিজমকে বোঝাচ্ছি কিন্তু আমার কাছে ওগুলো স্রেফ হাতুড়ি এবং কাস্তে। এ জিনিসগুলো কী অর্থ বহন করে সেজন্য নয়, জিনিসগুলো যা তা-ই প্রকাশ করতে আমি এদের ছবিতে আনি। আমার ছবির ঐ উপাদানগুলোর কোনো অর্থ যদি আপনি নির্ণয় করেন তবে নিশ্চয়ই তা সত্য হতে পারে কিন্তু আমি নিজে কোনো অর্থ আরোপ করে উপাদানগুলো আঁকিনি, সেকথা বলতে চাই। আমার ছবিগুলোর বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছেছেন এগুলো আমার অবচেতনে থেকে থাকতে পারে। আমি ছবি আঁকার স্বার্থে ছবি আঁকি। আমি বস্তুকে বস্তু হিসেবেই গ্রহণ করি। সেটি আমার অবচেতনে থাকে। লোকেরা যখন আমার ছবি দেখে, তখন তারা নিজেদের মতো একটা অর্থ তৈরি করে নেয়। আমি ছবিগুলোর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করি না। ছবিগুলোর মাধ্যমে কোনো কিছুর প্রোপাগান্ডা করার অভিপ্রায় কিন্তু আমার নেই।'

'শুধু গোয়ের্নিকা ছাড়া'—আমি বলি।

'হ্যাঁ, গোয়ের্নিকায় আমি সচেতনভাবেই জনতার কাছে আবেদন জানিয়েছি, ঐ ছবিতে স্পষ্ট প্রোপাগান্ডা আছে।' আমি সিগারেট বের করি এবং আমরা দুজনেই ধরাই। পিকাসোর মুখে সর্বদাই সিগারেট হোল্ডার। তিনি সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে অপেক্ষা করেন আমি কিছু বলি কি না, তারপর ধীরে আবার বলতে লাগলেন, 'আমি একজন কম্যুনিস্ট এবং আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবিগুলো কম্যুনিস্ট ছবি' একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, 'কিন্তু আমি যদি একজন মুচি হতাম, কিংবা অভিজাত বা অন্য কিছু হতাম, তাহলে আমার রাজনীতিটাকে দেখানোর জন্য আমার জুতোকে এমন বিশেষ কোনোভাবে হাতুড়ি-পেটা করতাম না।'

আমি বলি, 'তারপর একজন চিত্রকরের ছবি থেকে তার চিন্তা আর পরিচয়কে পাওয়া যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে একজন সমাজসচেতন চিত্রশিল্পীকে নাজিদের বর্বরতা দেখানোর জন্য মুখ দিয়ে রক্ত-বেরুনো মানুষ, রাইফেল হাতে সৈন্য, এসব আঁকতে হবে।' আমি চুলার উপর পানির পাত্রটিকে দেখিয়ে বলতে থাকি, 'আপনি ঐ পাত্রটিকে আঁকতে পারেন; মা ও তার সন্তানদের আঁকতে পারেন, যেমন আপনি এঁকেছেন। টেবিলের চারপাশে বসে রাত্রের খাওয়ায় রত একটি পরিবার আঁকতে পারেন, আঁকতে পারেন গ্লাস, লেবু এইসব উপাদান। রঙ, আকার সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে একটা সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য আমাদের জীবনকে ঘিরে থাকুক বলে আমরা প্রত্যাশা করি। এমন একটা জীবনের জন্যই তো আমরা যুদ্ধ করছি। আমরা চাই বা না চাই সামাজিক মানুষ হিসেবে আমাদের রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করতেই হয়।'

পিকাসো আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে ঘনঘন মাথা নাড়তে লাগলেন এবং বললেন, 'নিশ্চয়ই, আপনার কথাগুলো খুবই সত্য।'

আমি তাঁকে বলি, তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ব্যাপারটি শিল্প-সাহিত্যের জগতে কী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যে সমালোচকরা তাঁকে পরাবাস্তববাদী বলে অভিহিত করেছেন, তারা এখনো চাইছেন, তিনি যেন আগের মতোই ছবি আঁকেন এবং তাঁকে উদ্ধৃত করেই সমালোচকেরা প্রমাণ করতে চাইছেন যে শিল্প এবং রাজনীতির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

পিকাসো হেসে বললেন, 'কিন্তু আমরা জানি যে সম্পর্ক একটা অবশ্যই আছে। অবশ্য আমি সচেতনভাবে সে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করি না।' আমি পিকাসোকে জিজ্ঞাসা করি এই মুহূর্তে তিনি যা বললেন সেটা কি আমি আমার নিবন্ধে ব্যবহার করতে পারি।

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

আমেরিকান এবং ফরাসি চিত্রকলা

এ সময় তাঁর কিছু বন্ধু যোগ দেন। আমরা একত্রে আমেরিকান এবং ফরাসি চিত্রকলা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করি। আমেরিকার পুরোধা চিত্রশিল্পীদের সম্পর্কে পিকাসো বিশেষ অবগত বলে মনে হলো না। আমি টমাস বেনটনসহ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম কিন্তু পিকাসো তাঁদের চিনতে পারলেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এতে প্রমাণ হয় আমাদের দুই দেশের দূরত্ব'—পিকাসোর এক বন্ধু বললেন।

আমি বলি, 'ফ্রান্সের মতো আমেরিকায় এত চিত্রশিল্পী নেই কিন্তু আমেরিকার চিত্রশিল্পীরা ফরাসি চিত্রশিল্পীদের চাইতে জনগণের সঙ্গে সম্ভবত বেশি জোরালোভাবে সম্পৃক্ত। ফরাসি চিত্রকলার এত নামডাক মূলত এর অতীতের চল্লিশ বছরের বা তার আগের চিত্রকলার জন্য। এখনকার প্রদর্শনীর ছবিগুলো দেখে আমার মনে হলো এখানকার তরুণ শিল্পীরা মূলত আত্মমুখী এবং ছবির কারিগরি বিষয়গুলোর ব্যাপারেই বেশি মনোযোগী। জীবন্ত বাস্তবের সঙ্গে এদের যোগাযোগ সামান্যই। ফরাসি চিত্রকলা এখন কৃৎকৌশল এবং স্টিল লাইফ চর্চাতেই ব্যস্ত।'

'তা ঠিক', পিকাসো বলেন, 'কিন্তু আমেরিকানরা এখনো একটা সাধারণ বোধের স্তরে আছে। ফ্রান্স সেই স্তরটা পেরিয়ে গেছে, এখন আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্তরে এসে পৌঁছেছি।'

এসময় কেউ একজন বললেন, দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। আমি পিকাসোকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আবারও আমাকে বললেন, ইচ্ছে হলেই যেকোনো সময় তাঁর ওখানে চলে আসতে। উষ্ণ হাত মিলিয়ে আমরা পরস্পরকে বললাম, 'বিদায়'।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মিলান কুন্ডেরা

বিশিষ্ট লেখক মিলান কুন্ডেরার জন্ম ১৯২১ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায়। গভীর প্রজ্ঞা, জীবনকে দেখার তীর্যক দৃষ্টি, ব্যঙ্গ ও বিষাদের সমন্বয় তাঁর সাহিত্য। ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ-আগ্রাসনের পর সেদেশে মিলান কুন্ডেরার বই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ সালে তিনি নিজ দেশ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে প্যারিসে বসবাস শুরু করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *দি জোক*, *লাইফ ইজ এলস হয়ার*, *দি ফেয়ারওয়েল পার্টি*, *দি বুক অব লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং*, *আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং*, *লাফেবল লাভস*, *ইমরটালিটি*, *স্লোনেস* প্রভৃতি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দি প্যারিস রিভিউ পত্রিকার পক্ষ থেকে ক্রিশ্চিয়ান সালমন, মিলান কুন্ডেরার এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ১৯৮৭ সালে। এই সাক্ষাৎকারে মিলান কুন্ডেরা উপন্যাস বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তাসংক্রান্ত বিস্তারিত আলাপ করেছেন। সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে মিলান কুন্ডেরার *দি আর্ট অব নভেল* গ্রন্থে।

অপস্রিয়মাণ ব্যক্তিমানুষ

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনার উপন্যাসের নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আলাপ করতে চাই। কীভাবে শুরু করব তাই ভাবছি।

মিলান কুন্ডেরা এই নিশ্চয়তা নিয়ে শুরু করা যায় যে, আমার উপন্যাসগুলো মনস্তাত্ত্বিক নয়। আরো নির্দিষ্ট করে বললে দাঁড়ায় যে, যেসব উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা হয়, আমার উপন্যাসগুলো সে গোত্রের বাইরে।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান কিন্তু উপন্যাস মাত্রই কি মনস্তাত্ত্বিক নয়? উপন্যাস কি মনের রহস্য নিয়েই নাড়াচাড়া করে না?

মিলান কুন্ডেরা আরেকটু খোলাসা করা যাক। সব যুগে, সব উপন্যাসই বস্তুত ব্যক্তিমানুষের রহস্য উন্মোচন করতে চায়। যখনই আপনি একজন কাল্পনিক মানুষ বা একটা চরিত্র সৃষ্টি করছেন, তখনই আপনি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন যে, ব্যক্তিমানুষ আসলে কী? কী করে ব্যক্তিমানুষকে ধরা যাবে? এই প্রশ্নটিই হলো উপন্যাসের ভিত্তি। কে, কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তার ওপর নির্ভর করেই আপনি বিভিন্ন যুগের উপন্যাসের ভেতরকার পার্থক্যটি নিরূপণ করতে পারবেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটি ইউরোপিয়ান কথকদের কাছে একসময় জানাই ছিল না। বোকাচ্চিও আমাদের সামনে মানুষের নেহাত কাজ, আচরণ এবং অভিযানগুলো তুলে ধরেন। তবু সেই মজাদার গল্পগুলো থেকে আমাদের একটা ধারণা জন্মে যে, মানুষ তার কাজের মাধ্যমেই এই দৈনন্দিন পৃথিবীর পৌনঃপুনিকতার বাইরে তার পা রাখে। যে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ অন্য একটা মানুষের মতোই, সেখানে কাজের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে পৃথক করে তোলে এবং একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠে। দান্তে বলেন, 'যে একটা কাজ করছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেই কাজের ভেতর দিয়ে নিজের প্রতিকৃতিকে প্রকাশ করা'। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, একটা কাজ হলো, যে কাজটি করছে তার আত্মপ্রতিকৃতি। বোকাচ্চিওর ৪০০ বছর পর দিদেরো এ ব্যাপারে সন্দেহবাদী। তাঁর জ্যাকুয়েস লা ফ্যাটালিস্তে নিজের বন্ধুর প্রেমিককে প্রলুব্ধ করে, ফুর্তিতে মাতাল হয়, তার বাবা তাকে ইচ্ছামতো পেটায়, তারপর একটা সৈন্যদল মার্চ করে গেলে, মনে বিতৃষ্ণা নিয়ে সে ঐ সৈন্যদলে নাম লেখায়। প্রথম যুদ্ধে তার পায়ে একটা বুলেট লাগে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে ভেবেছিল দারুণ প্রণয়োদ্দীপক এক অভিযান শুরু করল সে, কিন্তু পরিণতিতে বিকলাঙ্গ হয়ে শেষ করতে হলো তার অভিযান। সে কিন্তু নিজের কাজের মধ্যে আর নিজেকে চিনতে পারছিল না। ব্যক্তিমানুষ এবং তার কাজের মধ্যে একটা ফাটল দেখা গেল। মানুষ কাজের মধ্যদিয়ে তার নিজের প্রতিকৃতিকে উন্মোচন করতে চায় কিন্তু একপর্যায়ে সেই কাজের প্রতিকৃতির ভেতর আর মানুষটিকে চেনা যায় না। কাজ এবং ব্যক্তিমানুষের এই স্ববিরোধিতা উপন্যাসের এক মস্ত আবিষ্কার। কিন্তু কাজের মধ্যদিয়ে যদি ব্যক্তিমানুষকে ধরা না যায়, তাহলে কিসের মধ্যে তাকে ধরা যাবে? এই পর্যায়ে এসেই উপন্যাস বাধ্য হলো, বাহ্যিক কাজের জগতের ভেতর ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ অন্বেষার বদলে ব্যক্তির অদৃশ্য অন্তর্জগৎটিকে পরীক্ষা করতে। আঠারো শতকে রিচার্ডসন জ্ঞানতাত্ত্বিক উপন্যাসের সূচনা ঘটালেন, যেখানে উপন্যাসের চরিত্ররা তাদের অন্তর্গত চিন্তা এবং অনুভূতির কথা বর্ণনা করে।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান সেখান থেকেই কি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্ম?

মিলান কুন্ডেরা এই পদটি সম্পূর্ণ যথাযথ নয়, তবে কাছাকাছি। আমরা বরং অন্যভাবে বলি, রিচার্ডসন উপন্যাসে মানুষের অন্তর্জগৎ অনুসন্ধানের পথটি খুলে দিলেন। সেই শতাব্দীতে তাঁর উত্তরসূরি মহান লেখকগণ, গ্যাটে, ল্যাকলোস, কনস্ট্যান্ট, স্তাঁদাল প্রমুখের নাম আমরা জানি। সেই বিবর্তনেরই প্রান্তিক পরিধিতে রয়েছেন প্রুস্ত এবং জয়েস। প্রুস্ত যেখানে 'লুপ্ত সময়'কে ধরতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে জয়েস বর্তমান মুহূর্তের মতো আরো আয়ত্তাতীত একটা বিষয়কে ধরতে চেষ্টা করেছেন। মনে হতে পারে বর্তমান মুহূর্তের মতো এত স্পষ্ট, এত ধরাছোঁয়ার ভেতর বুঝি আর কিছু নেই অথচ বর্তমান মুহূর্তটিই সবচেয়ে ছলনাময়। এই সত্যটিই জীবনের যাবতীয় বেদনার মূলে কাজ করছে। এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আমাদের চোখ, কান, নাকসহ সকল ইন্দ্রিয় একঝাঁক ঘটনাকে ধারণ করে, আমাদের ভেতর বয়ে যায় সারি সারি চিন্তা আর অনুভূতি। আমাদের মন প্রতিমুহূর্তে একটা ক্ষুদ্র মহাবিশ্বকে ধারণ করে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে তা ভুলে যায় পরমুহূর্তেই। জয়েস তাঁর মস্ত মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সেই ভেসে যাওয়া মুহূর্তটিকে পাকড়াও করেছেন, থামিয়ে দিয়েছেন এবং তা দেখতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু তার পরও ব্যক্তিমানুষের স্বরূপ অন্বেষা শেষ হচ্ছে স্ববিরোধিতায়। ব্যক্তিমানুষকে খুঁজতে মাইক্রোস্কোপের লেন্সের শক্তি যতই বাড়ানো হচ্ছে ততই ব্যক্তিমানুষ এবং তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। জয়েসের সেই মস্ত লেন্সের নিচে, যে লেন্স আমাদের আত্মাকে অণু-পরমাণুতে ভেঙে ফেলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই আসলে একইরকম। তাহলে ব্যক্তিমানুষ এবং তার স্বাতন্ত্র্যকে যদি তার অন্তর্জগতের ভেতরেও ধরতে পারা না যায়, তাহলে কিসে ধরা যাবে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আদৌ কি ধরা যাবে?

মিলান কুন্ডেরা নিশ্চয়ই না। আত্ম-অন্বেষা বরাবরই একটা স্ববিরোধী হতাশায় শেষ হবে। এ অন্বেষা ব্যর্থ হবে তা আমি বলছি না। কারণ উপন্যাসের পরিধির এই ব্যাপ্তিই মানুষের জ্ঞানজগতের এক বিজয়োল্লাস, এক অসাধারণ আবিষ্কার। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগতের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকরা তার পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও নতুনভাবে ধারণা গ্রহণ করেছেন। আধুনিক উপন্যাসের তিন আত্মার কথা আমরা শুনি, জয়েস, প্রুস্ত এবং কাফকা। কিন্তু আমার কাছে তিন আত্মার উপস্থিতি নেই। উপন্যাসের ইতিহাসে আমার মতে কাফকাই মূলত এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতের স্রষ্টা; উত্তর-প্রুস্তিয়ান পরিপ্রেক্ষিত। ব্যক্তিমানুষকে ধারণ করবার কাফকার ধরণাটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। 'কে' চরিত্রটিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে, কী তার স্বাতন্ত্র্য? তার চেহারা (এ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না), তার জীবনী (তাও আমরা জানি না), তার নাম (তার কোনো নাম নেই), তার স্মৃতি, পছন্দ অপছন্দ, জটিলতা সবই আমাদের অজানা। তার আচরণ? তার কাজের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত। তার চিন্তা? হ্যাঁ, কাফকা অবিরাম 'কে'- এর চিন্তার বর্ণনা দেন। কিন্তু সেগুলো সবই তাৎক্ষণিক চিন্তা, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নেবে এই নিয়ে ভাবনা। জেরাতে যাবে, কি যাবে না? যাজকের সমন পালন করবে কি করবে না? এইসব। 'কে' যে পরিস্থিতির ফাঁদে পড়েছে সেই পরিস্থিতিতেই তার অন্তর্জগৎ নিমজ্জিত, এর বাইরের কোনো পরিস্থিতি সম্পর্কে তার চিন্তা বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, 'কে'-এর স্মৃতি, কোনো রূপক ভাবনা, অন্যদের সম্পর্কে তার ভাবনা, কিছুই না। প্রুস্তের বেলায় মানুষের অন্তর্জগতের অতিলৌকিকতা, অসীমতা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু কাফকার আনন্দ সেই গোত্রের নয়। মানুষের আচরণের পেছনে কী ধরনের অন্তর্গত তাগিদ কাজ করে কাফকা তার উত্তর খুঁজতে যান না। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নরকম একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে বাহ্যিক উপাদানগুলো এত শক্তিশালী যে মানুষের অন্তর্গত উপাদানগুলোর আর কোনো গুরুত্ব থাকছে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষের আর কী সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে? 'কে'-এর জীবনের পরিণতি কি অন্যরকম হতো যদি সে সমকামী হতো বা তার কোনো অতৃপ্ত প্রেম সম্পর্ক থাকত? না, হতো না।

পৃথিবীর ফাঁদ

ক্রিশ্চিয়ান সালমান একথাটিই আপনি আপনার *আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* উপন্যাসে বলেছেন—'উপন্যাস লেখকের জবানবন্দি নয়, এটা এই পৃথিবীর ফাঁদে পড়ে যাওয়া মানুষের জীবন নিয়ে তদন্ত'। 'ফাঁদ' বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাচ্ছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিলান কুন্ডেরা জীবনটা যে একটা ফাঁদ সেকথা আমরা সবসময়ই জানি। আমরা জন্ম নিতে চাই কি না, এটা না জিজ্ঞাসা করেই আমাদের জন্ম দেয়া হয়েছে, এমন একটা শরীরে আমাদের বন্দি করে রাখা হয়েছে যে শরীরটি আমরা নিজেরা পছন্দ করিনি এবং আমাদের জন্য আবার মৃত্যু অনিবার্য করে রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি এই অবারিত পৃথিবীতে রয়েছে পালাবার অসংখ্য পথ। একজন সৈন্য সেনাবাহিনী ত্যাগ করে পাশের একটা দেশে নতুন একটা জীবন শুরু করতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ করেই, আমাদের শতাব্দীতে পৃথিবীটা চারিদিক থেকে বন্ধ হয়ে আসছে। পৃথিবীটা একটা চূড়ান্ত ফাঁদে রূপান্তরিত হলো নির্ঘাত ১৯১৪ সালের যুদ্ধের পর থেকে, যাকে ইতিহাসে প্রথম অভিহিত করা হলো 'বিশ্বযুদ্ধ' হিসেবে। যদিও 'বিশ্ব' কথাটা ভুল, কারণ যুদ্ধ হয়েছিল শুধু ইউরোপে এবং তাও ইউরোপের পুরো অংশে নয়। তবু এই 'বিশ্ব' বিশেষণটি চমৎকারভাবে এই ভয়ঙ্কর সত্যটি সবার সামনে তুলে ধরল যে, এখন থেকে এই গ্রহে যা-কিছু ঘটবে তা শুধু একটা এলাকার ব্যাপার নয়, সারা বিশ্বের ব্যাপার, এখন থেকে আমাদের জীবন আরো বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হবে বাহ্যিক পরিস্থিতি দিয়ে, যে পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাবার পথ কারো নেই এবং এখন থেকে আরো বেশি মাত্রায় আমাদের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে আমরা হয়ে উঠব একই রকম।

কিন্তু মনে রাখবেন, আমি যখন বলছি আমার উপন্যাসগুলো তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বাইরে, তার মানে এই নয় যে আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলোর কোনো অন্তর্জগৎ নেই। আমি বলতে চাই, মানুষের মনের বাইরেও আরো কিছু প্রশ্ন, আরো কিছু রহস্য উন্মোচন আমার উপন্যাসের মূল লক্ষ্য। যেসব উপন্যাস মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করে আমি তার বিরোধীও নই। আসলে প্রুস্তের পর সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন আমাকে নস্টালজিক করে তোলে। প্রুস্তের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের প্রাচুর্য ক্রমশ আমাদের নাগালের বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে, চিরতরে, সংশোধনাতীত প্রক্রিয়ায়। গোমব্রিচ একটা মজার এবং বিচক্ষণ ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের নিজেদের ওজন নির্ভর করবে, পৃথিবীতে কত জন মানুষ আছে তার ওপর।' সেই হিসেবে ডেমোক্রিটাসের ওজন চারশত মিলিয়ন ভাগ মানবতার একভাগ, ব্রাহামের এক বিলিয়নের এক ভাগ, গোমব্রিচ নিজে দুই বিলিয়নের একভাগ। সেই হিসেবে প্রুস্তের ব্যক্তিমানুষের ওজন, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগতের ওজন, হালকা থেকে হালকাতর হয়ে আসে। আমরা সেই হালকা হওয়ার প্রতিযোগিতার এক চূড়ান্ত প্রান্তে এসে পৌঁছেছি।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনার সেই প্রথম দিককার লেখা থেকেই ব্যক্তিমানুষের এই 'আনবেয়ারেবল লাইটনেস' নিয়ে আপনার একটা আচ্ছন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন *লাফেবল লাভস* বইয়ের 'এডোয়ার্ড অ্যান্ড গড' গল্পটি। তরুণী এলিসের সঙ্গে প্রথম মিলনের পর এডোয়ার্ড এক অদ্ভুত অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়, সে মেয়েটিকে দেখে আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাবে, 'এই মেয়েটির বিশ্বাস তার ভাগ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। মেয়েটি যেন একটা শরীর, কিছু চিন্তা আর একটা জীবনপ্রণালীর আকস্মিক সমাপতন। একটা অজৈব, অযৌক্তিক, অস্থির সমাপতন', তেমনি 'দি হিচহাইকিং গেম' গল্পটির শেষ স্তবকে মেয়েটি তার নিজের পরিচয় নিয়ে এতই বিচলিত যে সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—'আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি আমি...।'

মিলান কুন্ডেরা *দি আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* উপন্যাসে টেরেজা আয়নায় নিজেকে দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে—যদি প্রতিদিন তার নাকটা এক মিলিমিটার করে বাড়তে থাকে, তাহলে কেমন দাঁড়াবে ব্যাপারটা? তাকে সম্পূর্ণ অচেনা দেখাতে কত দিন লাগবে? আর তাঁর চেহারা যদি টেরেজার মতো না দেখায় তাহলে তখনো কি সে টেরেজাই থাকবে? এই 'আমি' ব্যাপারটার শুরু বা শেষ কোথায়? লক্ষ করুন, সে আত্মার অপরিমেয় অসীমতায় অবাক হচ্ছে না, অবাক হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ এবং তার পরিচয়ের অনিশ্চয়তায়।

অস্তিত্বের সংকট

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনার উপন্যাসে অন্তর্গত স্বগতোক্তি একেবারেই অনুপস্থিত।

মিলান কুন্ডেরা জয়েস, ব্লুমের মাথায় একটা মাইক্রোফোন বসিয়েছিলেন। অন্তর্গত ভাবনার ঐ অসাধারণ গোয়েন্দাগিরিকে ধন্যবাদ, এর মাধ্যমে আমরা নিজের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। কিন্তু না, আমি ঐ মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করতে জানি না।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান *ইউলিসিস* উপন্যাসের পুরোটা জুড়েই রয়েছে অন্তর্গত স্বগতোক্তি। স্বগতোক্তিই উপন্যাসটির রচনা-কাঠামোর ভিত্তি। আপনার লেখালেখির ক্ষেত্রে দার্শনিক ধ্যানই কি সেই ভূমিকাটি পালন করে থাকে?

মিলান কুন্ডেরা 'দার্শনিক' শব্দটি এক্ষেত্রে আমার যথাযথ মনে হয় না। 'দর্শন' একটা বিমূর্ত জগৎ থেকে তার চিন্তাগুলো গঠন করে। সেখানে কোনো চরিত্র থাকে না, প্রেক্ষাপট থাকে না।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনি *দি আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* উপন্যাসটি শুরু করেছেন নিট্‌শের 'পৃথিবীতে ফিরে আসা' ধারণাটির ওপর আলোচনার মাধ্যমে। এটাও কি চরিত্রহীন, প্রেক্ষাপটহীন একটা বিমূর্ত পরিস্থিতিতে দার্শনিক চর্চা নয়?

মিলান কুন্ডেরা মোটেও না। আসলে ঐ আলোচনার মাধ্যমে উপন্যাসের প্রথম লাইন থেকেই সরাসরিভাবে একটা চরিত্র অর্থাৎ টমাসের অবস্থানটিকে পাঠকের সামনে তুলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে তার সমস্যাকে, যে পৃথিবীতে আর 'ফিরে আসার' কোনো সম্ভাবনা নেই, সেখানে তার অস্তিত্বের 'লাইটনেস'কে। দেখুন আমরা আবার সেই প্রশ্নে এসে দাঁড়িয়েছি ; তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বাইরে আর কিছু আছে কি? অথবা অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তিমানুষকে বোঝার অমনস্তাত্ত্বিক উপায় কী? আমার উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষকে বোঝা মানে ব্যক্তির অস্তিত্বের সমস্যার সারকে উপলব্ধি করা, অস্তিত্বের গোপন সংকেতগুলোকে উপলব্ধি করা। আমি যখন *আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* লিখছিলাম তখন অনুধাবন করলাম যে এক-একটা চরিত্রের অস্তিত্বের সংকেত মূলত নিহিত আছে কিছু কিছু শব্দের ভেতর। যেমন টেরেজার কিছু শব্দ—শরীর, আত্মার, মাথা ঝিম ধরা, দুর্বলতা, প্রশান্তি, স্বর্গ। টমাসের ক্ষেত্রে, হালকাভাব, ওজন। 'ভুলবোঝা শব্দসমূহ' পর্বে আমি কতগুলো শব্দ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফ্রানজ এবং সাবিনার অস্তিত্বের সংকেতগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছি। যেমন নারী, বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসভঙ্গ, সংগীত, অন্ধকার, আলো, কুচকাওয়াজ, সৌন্দর্য, দেশ, সমাধি, শক্তি। পৃথক ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকেতে এই শব্দগুলো পৃথক অর্থ বহন করে। নিশ্চয়ই অস্তিত্বের সংকেতকে কোনো বিমূর্ত অবস্থার মধ্যে রেখে বিচার করা হয়নি, তা প্রকাশিত হয়েছে চরিত্রের কাজ এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। *লাইফ ইজ এলসহয়ার* উপন্যাসের তৃতীয় পর্বটি লক্ষ করুন, নায়ক লাজুক জারোমিল তখনো কুমার। একদিন সে যখন একটা মেয়ের সঙ্গে হাঁটছে তখন মেয়েটি তার মাথা জারোমিলের কাঁধের উপর রাখে। এতে তার খুব সুখ বোধ হতে থাকে, এমনকি শারীরিকভাবেও সে উত্তেজিত বোধ করে। এই ছোট ঘটনাটির জায়গায় এসে আমি একটা বিরতি দিই এবং মন্তব্য করি 'এই মুহূর্ত পর্যন্ত জারোমিলের জীবনে সুখের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা হলো তার কাঁধে একটা মেয়ের মাথাকে পাওয়া।' এরপর থেকে আমি জারোমিলের যৌন প্রকৃতিটিকে বোঝাবার চেষ্টা করি। 'তার কাছে একটা মেয়ের মাথা মেয়েটির শরীরের চেয়ে বেশি অর্থ বহন করে।' তার মানে এই নয় যে, শরীরের ব্যাপারে সে উদাসীন; 'একটা মেয়ের শরীরের নগ্নতা সে আকাঙ্ক্ষা করে না বরং সে আকাঙ্ক্ষা করে শরীরের নগ্নতা দ্বারা আলোকিত একটা মেয়েমুখ। সে একটা মেয়ের দেহকে অধিকার করতে চায় না, সে একটা মেয়ের মুখ অধিকার করতে চায়, যে মেয়েটি ভালোবাসার প্রমাণস্বরূপ তাকে তার দেহ সমর্পণ করবে।' আমি এই প্রবণতার একটা নাম দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমি 'অভিমান' শব্দটি নির্বাচন করেছি। এরপর আমি এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। অভিমান ব্যাপারটি কী? আমি বেশকিছু উত্তরও দিতে চেষ্টা করেছি, 'জীবন যে মুহূর্তে মানুষকে ঠেলে বয়োপ্রাপ্তির সীমানায় এনে দাঁড় করায় তখনই তার মধ্যে জন্ম নেয় অভিমান। সে উদ্বিগ্নতার সঙ্গে শৈশবের সুবিধাগুলোর কথা অনুধাবন করতে থাকে, যা সে শৈশাবস্থায় অনুধাবন করেনি।' তারপর আবার বলেছি—'অভিমান বয়োপ্রাপ্তি দ্বারা সঞ্চারিত ভয়'। এরপর রয়েছে আরো একটা সংজ্ঞা, 'অভিমান হলো এমন একটা ছোট্ট জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একে অন্যের প্রতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিশুর মতো আচরণ করব বলে মেনে নিয়েছি।' লক্ষ করুন, জারোমিলের মনের ভেতর কী ঘটছে তা আমি বলছি না বরং আমার নিজের মনের ভেতর কী ঘটছে আমি তাই দেখাচ্ছি। আমি আমার তৈরি জারোমিলকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছি এবং তারপর ধাপে ধাপে তার আচরণের ভেতরে ঢুকে সেগুলো বুঝবার চেষ্টা করছি। সেই আচরণগুলোর নাম দিচ্ছি, তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং উপন্যাসে টেরেজা টমাসের সঙ্গে থাকে কিন্তু তার ভালোবাসা তার সম্পূর্ণটুকু শক্তি দাবি করে এবং একদিন হঠাৎ সে আর এগিয়ে যেতে পারে না, তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে 'আরো নিচে', যেখান থেকে সে এসেছে। আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করি, 'মেয়েটির কী হয়েছে?' আমি উত্তর পাই, মেয়েটির মাথায় ঝিম ধরেছে। কিন্তু মাথা ঝিম ধরা বলতে কী বোঝায়? আমি একটা সংজ্ঞা খুঁজতে চেষ্টা করি এবং বলি, 'মাথা ঝিম ধরা হলো পড়ে যাবার অদৃশ্য, উন্মত্ত ইচ্ছা'; পরমুহূর্তে নিজেকে শুধরে আমি সংজ্ঞাটিকে আরেকটু ধারালো করি, 'মাথায় ঝিম ধরা হলো দুর্বলতার একটা ঘোর। মানুষ সেই মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং হাল ছেড়ে দেয়। দুর্বলতার মদে মাতাল হয়ে ওঠে সে। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে ইচ্ছা হয় তার, রাস্তার মোড়ে সবার সামনে পড়ে যেতে ইচ্ছা হয়, যেতে ইচ্ছা হয় নিচে, আরো নিচে।' মাথায় ঝিম ধরা হলো টেরেজাকে বুঝে উঠবার একটা চাবি। এই চাবি দিয়ে আমাকে কিংবা আপনাকে বোঝা যাবে না। যদিও আমরা দুজনেই জানি এ ধরনের একটা ব্যাপারের সম্ভাবনা আমাদের দুজনের ক্ষেত্রেই রয়েছে, এটা অস্তিত্বেরই একটা সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বুঝবার জন্য, মাথায় ঝিম ধরা ব্যাপারটাকে বুঝবার জন্য, আমাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে টেরেজাকে, একজন 'পরীক্ষামূলক ব্যক্তিমানুষকে'।

তবে কিছু বিশেষ মুহূর্তেই যে কিছু জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটেছে তা নয়, পুরো উপন্যাসটিই একটা দীর্ঘ জিজ্ঞাসা। ধ্যানী জিজ্ঞাসা (জিজ্ঞাসু ধ্যান) হলো আমার সব উপন্যাসগুলোর কাঠামোগত ভিত্তি। *লাইফ ইজ এলসহয়্যার* উপন্যাসটি লক্ষ করুন। উপন্যাসটির নাম প্রথমে দিয়েছিলাম *দি লিরিকাল এজ*। বন্ধুরা নামটাকে নীরস, রুচিহীন মনে করল, ফলে তাদের চাপে শেষ মুহূর্তে নামটা বদলালাম। অবশ্য আমি বোকামি করেছি। আমি মনে করি একটা উপন্যাসের মূলভাবের ওপর ভিত্তি করে সেটার নামকরণ করাই ভালো। *দি জোক*, *দি বুক অব লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিং*, *দি আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং*; এমনকি *লাফেবল লাভস*, এই নামটিকেও মজাদার প্রেমের গল্প-সংকলন অর্থে নেয়া উচিত নয়। আসলে প্রেমের ব্যাপারটার সঙ্গে সবসময় একটা গাম্ভীর্য যুক্ত থাকে, কিন্তু *লাফেবল লাভস* হলো গাম্ভীর্যমুক্ত প্রেম, যেটা আধুনিক মানুষের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। আবার *লাইফ ইজ এলসহয়্যার* প্রসঙ্গে আসা যাক। এই উপন্যাসটি কতগুলো প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে। গীতধর্মিতা কী? যৌবন কী করে বস্তুত একটা গীতধর্মিতার কাল?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গীতধর্মিতা/বিপ্লব/যৌবন এই ত্রিকোণ ভাবনার অর্থ কী? এবং কবি কাকে বলে? আমার মনে আছে উপন্যাসটি শুরু করবার আগে আমার নোটবইয়ে এ প্রসঙ্গে একটা আনুমানিক সংজ্ঞা লিখে রেখেছিলাম : কবি হচ্ছে একজন যুবক, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য যার মা তাকে এমন এক পৃথিবীর পথ দেখিয়ে দিয়েছে, যে পৃথিবীতে সে প্রবেশ করতে পারছে না। লক্ষ করুন, সংজ্ঞাটি সমাজতাত্ত্বিক, নান্দনিক বা মনস্তাত্ত্বিক নয়।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান সংজ্ঞাটি প্রপঞ্চবাদী।

মিলান কুন্ডেরা : বিশেষণটা মন্দ না কিন্তু আমি এটা ব্যবহারের বিরোধী। আমি সাহিত্যের অধ্যাপকদের সত্যিই খুব ভয় পাই, যাদের কাছে শিল্প নেহাত কিছু দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক ধারণার বাহনমাত্র। উপন্যাস কিন্তু ফ্রয়েডের আগেই অবচেতনার চর্চা করেছে, মার্কসের আগেই শ্রেণীসংগ্রামের চর্চা করেছে এবং যে-কোনো প্রপঞ্চবাদীর আগে চর্চা করেছে প্রপঞ্চবাদ (মানব-অস্তিত্বের সারসত্তার অনুসন্ধান)। প্রুস্তের রচনায় কী অসাধারণ প্রপঞ্চবাদী বর্ণনা রয়েছে অথচ তিনি কোনোদিন কোনো প্রপঞ্চবাদীকে চিনতেন না।

উপন্যাসের চরিত্র

ক্রিশ্চিয়ান সালমান : তাহলে সংক্ষেপে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ব্যক্তিমানুষকে ধরবার নানা পথ আছে। প্রথমত, তার কাজের মাধ্যমে, তারপর তার অন্তর্জগতের মাধ্যমে। আর আপনার ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে, ব্যক্তিমানুষকে ধরা যাবে তার নিজস্ব অস্তিত্বের সংকটের নির্যাসের মাধ্যমে। নানাভাবে আপনার লেখায় এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন মানব-অস্তিত্বের নির্যাসকে অনুধাবনের আপনার এই গোঁয়ের কারণেই আপনি আপনার লেখায় বর্ণনাত্মক কৌশল একরকম বাতিলই করেছেন। আপনি আপনার চরিত্রদের চেহারার বিশেষ কোনো বর্ণনাই দেন না। তা ছাড়া আপনি যেহেতু মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বেশি আগ্রহী, ফলে আপনি চরিত্রের অতীত বর্ণনার ক্ষেত্রেও রীতিমতো কৃপণ। আগাগোড়া এই বিমূর্ত বর্ণনার কারণে আপনার চরিত্রগুলো কি কম জীবন্ত হয়ে ওঠার ঝুঁকি বহন করে না?

মিলান কুন্ডেরা একই প্রশ্ন কাফকা এবং মুসিলের ক্ষেত্রেও করুন। এমনকি মুসিলের বেলায় এ প্রশ্ন উঠেও ছিল। কিছু অতি উর্বর মস্তিষ্ক অভিযোগ তুলে বলেছেন মুসিল সত্যিকার কোনো ঔপন্যাসিকই ছিলেন না। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর মেধার প্রশংসা করলেও তাঁর শিল্পের প্রশংসা করেননি।

এডোয়ার্ড রোডিতির কাছে মুসিলের চরিত্রগুলোকে মনে হয়েছে প্রাণহীন, তিনি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন প্রুস্তকে মডেল করবার জন্য। তিনি বলেছেন, দিওতিমার তুলনায় মাদাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারদুরিন কত জীবন্ত, বাস্তব। আসলে দুই শতকের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা কিছু অলঙ্ঘনীয় মানদণ্ডের সৃষ্টি করেছে। যেমন (১) একজন লেখকের উচিত তার চরিত্র সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য দেয়া—তার চেহারা, কথা বলার ভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদি। (২) লেখকের উচিত পাঠককে চরিত্রের অতীত সম্পর্কে জানতে দেয়া, কারণ অতীতেই নিহিত আছে চরিত্রের বর্তমান আচরণের বীজ। (৩) চরিত্রগুলোর চূড়ান্ত স্বাধীনতা থাকতে হবে অর্থাৎ লেখক তাঁর লেখায় উপস্থিত হয়ে পাঠককে বিরক্ত করবেন না, যে পাঠক লেখার মায়াময় জগতে ডুবে যেতে চায় এবং গল্পকেই বাস্তবতা বলে গ্রহণ করতে চায়। উপন্যাস এবং পাঠকের মধ্যকার এই সন্ধি মুসিল ভেঙে ফেলেছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরো অন্যান্য লেখকরাও। ইসকের চেহারা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি কিংবা ব্রচের বিখ্যাত চরিত্রগুলো সম্পর্কে? কিছুই না। ইসক সম্পর্কে এইটুকুমাত্র জানি যে তার বড় বড় দাঁত আছে। 'কে'-র শৈশব সম্পর্কে কতটুকু জানি আমরা, কতটুকু জানি স্কুইক সম্পর্কে? সেই সঙ্গে মুসিল, ব্রচ বা গোমব্রিচ কেউই উপন্যাসে সরাসরি উপস্থিত থাকতে কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করেননি। উপন্যাসের চরিত্র একটা কাল্পনিক সত্তা। সে কোনো জীবন্ত সত্তাকে অনুকরণ করে না। সে একজন পরীক্ষামূলক মানুষ। ডন কুইক্সোটকে একজন জীবন্ত মানুষ ভাবা রীতিমতো অসম্ভব। অথচ আমাদের স্মৃতিতে তার মতো জীবন্ত চরিত্র আর কে আছে?

দেখুন, উপন্যাসের কাল্পনিক জগতে পাঠকের হারিয়ে যাওয়া, বা বাস্তবতার সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারগুলোকে আমি মোটেও অবজ্ঞা করছি না। কিন্তু সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে আমি অপরিহার্য মনে করি না। আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখন আমি প্রথম *দি ক্যাসল* পড়ি। সেই সময় আমার প্রতিবেশী এক আইস হকি খেলোয়াড়কে আমি খুব পছন্দ করতাম। আমি 'কে'-র চেহারা মনে করতাম ঐ হকি খেলোয়াড়টির মতো। এখনো 'কে'-র চেহারা আমার কাছে তার মতোই। আমি বলতে চাচ্ছি এভাবেই পাঠক তার কল্পনা দিয়ে লেখকের কল্পনাকে সম্পূর্ণ করে। টমাসের গায়ের রঙ কি শ্যামলা না ফর্সা? সে কি ধনী না গরিব? আপনার মতো ভেবে নিন।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান কিন্তু এ নিয়ম যে আপনি সব ক্ষেত্রে মেনেছেন তা নয়। *দি আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং*-এ টমাসের অতীত বলতে বিশেষ কিছু নেই কিন্তু টেরেজার বেলায় তার নিজের শৈশব এমনকি তার মায়ের শৈশবের কথাও বলেছেন।

মিলান কুন্ডেরা উপন্যাসটিতে একটা বাক্য আছে দেখবেন, 'তার পুরো জীবন তার মায়ের জীবনেরই ধারাবাহিক একটা অংশ। যেমন বিলিয়ার্ড টেবিলে বলটির গতি খেলোয়াড়ের হাতের গতিরই একটা অংশ।' আমি যদি তার মায়ের কথা বলে থাকি সেটা টেরেজা সম্পর্কে তথ্য দেয়ার জন্য নয় বরং বলেছি কারণ তার মা-ই হচ্ছে তার জীবনের মূলভাব, কারণ 'সে তার মায়ের জীবনেরই ধারাবাহিক অংশ' এবং সেখানেই তার কষ্টের ভিত্তি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা এও জানি যে তার স্তনের আকার ক্ষুদ্র এবং স্তনবৃন্তের চারপাশের বৃত্তটি 'অতি বিস্তৃত এবং অতি ঘন কালো' যেন 'কোনো আদি শিল্পীর আঁকা গরিবের পর্নোগ্রাফি', এই তথ্য অপরিহার্য কারণ টেরেজাসংক্রান্ত একটা মূলভাব হলো শরীর। পক্ষান্তরে তার স্বামী টমাসের শৈশব, বাবা-মা পরিবার সম্পর্কে আমি কিছুই বলিনি। তার শরীর, তার চেহারা আমাদের কাছে অচেনা থেকে যায়, কারণ তার অস্তিত্বের সংকটের নির্যাস রয়েছে অন্যত্র। তাকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য ঐসব তথ্যের প্রয়োজন নেই। কারণ একটা চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলবার অন্যতম উপায় হলো সেই চরিত্রের অস্তিত্বের সংকটের গভীরে প্রবেশ করা। যার অর্থ, সেই চরিত্রটিকে যেসব পরিস্থিতি, যেসব বিষয়, যেসব শব্দ গড়ে তোলে সেগুলোর গভীরে যাওয়া, এর বেশি কিছু নয়।

উপন্যাস, রাজনীতি, ইতিহাস

ক্রিশ্চিয়ান সালমান তা হলে উপন্যাস, আপনার ধারণায় অস্তিত্ববিষয়ক শৈল্পিক ধ্যান, যদিও আপনার উপন্যাসগুলো সবসময় এই অর্থে বিবেচিত হয়নি। আপনার উপন্যাসে প্রচুর রাজনৈতিক ঘটনা আছে যা এই উপন্যাসগুলোর সামাজিক, ঐতিহাসিক বা আদর্শগত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে প্ররোচিত করে। অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনই যখন আপনি উপন্যাসের প্রধান বিবেচনা বলে মনে করছেন, সেক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত আপনার আগ্রহকে কী করে এর সঙ্গে সমন্বিত করেন?

মিলান কুন্ডেরা হাইডেগার অস্তিত্বের একটা খুব পরিচিত সূত্র দিয়েছেন 'পৃথিবীতে বেঁচে থাকা', পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ী এবং বিষয়ের সম্পর্ক নয়, চিত্রকলার এবং চোখের সম্পর্ক নয়, এমনকি মঞ্চের এবং অভিনেতার সম্পর্কও নয়। মানুষ ও পৃথিবী একে অন্যের সঙ্গে বাঁধা, যেমন শামুক তার খোলসের সঙ্গে বাঁধা। পৃথিবী মানুষেরই অংশ, পৃথিবী যখন বদলায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলায়। বালজাকের পর থেকে সাহিত্যে পৃথিবীর একটা ঐতিহাসিক চরিত্র দাঁড়াল এবং চরিত্ররা দিনক্ষণ নির্দিষ্টকালে বসবাস করতে শুরু করল। উপন্যাস বালজাকের এই উত্তরাধিকারকে কখনোই অস্বীকার করতে পারবে না। এমনকি গোমব্রিচ, যিনি আপাত সত্যকাহিনী বলার যাবতীয় নিয়ম ভেঙে অদ্ভুত, অসম্ভব সব গল্প আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও সেই উত্তরাধিকারের বাইরের নন। তাঁর উপন্যাস একটা নির্দিষ্ট দিনকালেই প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই রচিত। কিন্তু দুটি ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। একদিকে রয়েছে সেইসব উপন্যাস যা মানব-অস্তিত্বের ঐতিহাসিক ব্যাপ্তিকে চর্চা করে আর অন্যদিকে রয়েছে সেসব উপন্যাস যা 'একটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকেই' ব্যাখ্যা করে, একটা বিশেষ মুহূর্তের সমাজকে বর্ণনা করে, যা একটা উপন্যাসায়িত ইতিহাসচিত্র। ফরাসি বিপ্লব, মেরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এন্টোনেট, ১৯১৪ সাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ খামার, ১৯৮৪ ইত্যাদি-সংক্রান্ত উপন্যাসগুলোর কথা আমরা জানি। এগুলো সবই অ-উপন্যাসিক জ্ঞানকে উপন্যাসের ভাষায় এনে জনপ্রিয় করে তোলা। কিন্তু আমি বারবার বলেও ক্লান্ত হব না যে, উপন্যাসের একমাত্র কাজ হচ্ছে সেই কথা বলা, যা একমাত্র উপন্যাসেই বলা সম্ভব।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান কিন্তু উপন্যাস ইতিহাস-বিষয়ে বিশেষ কী বলতে পারে? কিংবা আপনি ইতিহাসকে কীভাবে ব্যবহার করেন?

মিলান কুন্ডেরা এ ব্যাপারে আমার কিছু নীতি আছে। প্রথমত আমি সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহার করি, যেমন একজন মঞ্চ-নির্দেশক অভিনয়ের জন্য অপরিহার্য অল্পকিছু জিনিস দিয়ে একটা বিমূর্ত সেট তৈরি করেন, আমি তেমনিভাবেই ইতিহাসকে ব্যবহার করি।

দ্বিতীয়ত, আমি ইতিহাসের সেইসব উপাদান শুধু ব্যবহার করি, যা আমার চরিত্রগুলোর অস্তিত্বগত অবস্থানকে উন্মোচিত করে। যেমন *দি জোক*-এ লুদভিক দেখছে, তার বন্ধু এবং সহকর্মীরা কত সহজে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পক্ষে হাত তুলে রায় দিচ্ছে এবং তার জীবনকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। সে নিশ্চিত তার বন্ধুরা এইরকম সহজ ভঙ্গিতে তার ফাঁসির পক্ষেও ভোট দেবে। ফলে তার কাছে মানুষের সংজ্ঞা হলো 'একটা সত্তা যা যেকোনো পরিস্থিতিতে তার প্রতিবেশীর মৃত্যুর পক্ষে মত দিতে পারে।' সুতরাং লুদভিকের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু ইতিহাস বর্ণনা করা (পার্টির ভূমিকা, সন্ত্রাসের রাজনৈতিক ভিত্তি, সামাজিক সংগঠন) আমাকে আকৃষ্ট করে না এবং আমার উপন্যাসে আপনি তা পাবেন না।

তৃতীয়ত, ইতিহাস সমাজের ইতিহাসের কথা লেখে, মানুষের কথা লেখে না। তাই আমার উপন্যাসে ইতিহাসের এমন সব ঘটনা থাকে, যা প্রায়শই ইতিহাসবিদরা ভুলে গিয়ে থাকেন। যেমন ১৯৬৮তে চেকোস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের পরের বছরগুলোতে সরকারিভাবে সংগঠিত উপায়ে ব্যাপক কুকুর হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনা অনেকেই ভুলে গেছেন এবং একজন ইতিহাসবিদের কাছে এই ঘটনা নেহাতই গুরুত্বহীন কিন্তু এই ঘটনার নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। *দি ফেয়ারওয়েল পার্টি* উপন্যাসে এই একটা ঘটনার মাধ্যমে আমি সে সময়কার ঐতিহাসিক আবহাওয়াটি তুলে ধরেছি। আরেকটি উদাহরণ, *লাইফ ইজ এলসহয়ার* উপন্যাসের একটা সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইতিহাস ঢুকে পড়ে একটা অশোভন, মলিন আন্ডারওয়্যারের রূপে। ঐ অশোভন আন্ডারওয়ারটি দেখা যাওয়ার ভয়ে, জারোমিল তার জীবনের চমৎকারতম যৌন মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েও কাপড় খুলতে সাহস পেল না বরং পালিয়ে এল। অশোভনতা! আরেকটি ভুলে যাওয়া ঐতিহাসিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়। অথচ কম্যুনিস্ট শাসনাধীনে থাকতে বাধ্য একজন নাগরিক জানে, ব্যাপারটা তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

তবে আমার চতুর্থনীতি এগিয়ে গেছে আরেকটু দূরে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জন্য শুধু নতুন অস্তিমান অবস্থারই জন্ম দেবে না, ইতিহাস ব্যাপারটিকেই একটা অস্তিমান অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন *আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং*-এর আলেকজান্ডার ডুবেককে রাশান সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে, অপহরণ করে, তার জেল হয়, তাকে হুমকি দেয়া হয় এবং তাকে বাধ্য করা হয় ব্রেজনেভের সঙ্গে কথা বলতে, তারপর সে প্রাগে ফিরে আসে। সে রেডিওতে বক্তব্য রাখে কিন্তু সে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, হাঁপায়, একটা বাক্যের মাঝে দীর্ঘ অস্বস্তিকর বিরতি দেয়। আমার কাছে ইতিহাসের এই ঘটনাটি (যদিও ঘটনাটি সবাই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, কারণ ঘণ্টা-দুয়েক পরে, রেডিওর টেকনিশিয়ান ঐ অস্বস্তিকর বিরতিগুলো কেটে দেয়) যে ধারণাটি উন্মোচন করে তা হলো 'দুর্বলতা'। 'দুর্বলতা' অস্তিত্বের একটা পর্যায়।

যে মানুষ তার চেয়েও শক্তিশালী কারো মুখোমুখি, সে দুর্বল। এমনকি তার যদি ডুবেকের মতো দৌড়বিদের শরীরও থাকে। টেরেজা এই দুর্বলতাকে বহন করতে পারে না, সে বিরক্ত, অপমানিত বোধ করে এবং দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু টমাসের বিশ্বাসঘাতকতার সামনে দাঁড়িয়ে তার অবস্থা, ব্রেজনেভের সামনে দাঁড়ানো ডুবেকের মতোই, প্রতিরোধহীন, দুর্বল। এবং আমরা আগেই আলাপ করেছি মাথা ঝিম ধরা বলতে কী বোঝায়, 'নিজের দুর্বলতার ঘোরে আচ্ছন্ন হওয়া, পড়ে যাওয়ার অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা', টেরেজা সহসাই উপলব্ধি করে, সে দুর্বলদের দলেরই একজন, দুর্বলদের শিবিরের একজন, সে একটা দুর্বলদের দেশের অধিবাসী এবং তাকে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে কারণ বস্তুত এরা দুর্বল এবং তারা কথার মাঝখানে হাঁপায়।' এই দুর্বলতার ঘোরেই সে টমাসকে ত্যাগ করে এবং ফিরে আসে প্রাগে, যা একটা 'দুর্বলদের শহর', এখানে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটি প্রেক্ষাপট নয়, বরং মঞ্চসজ্জা, যার সামনে মানবিকতার নানা অবস্থা উন্মোচিত হচ্ছে, সেটা নিজেই একটা মানবিক অবস্থা, অস্তিমানতার একটা বিকাশোন্মুখ অবস্থা। তেমনি *দি বুক অব লাফটার অ্যান্ড ফরগেটিংস*-এ প্রাগের বসন্তকে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়নি বরং বর্ণনা করা হয়েছে অস্তিমানতার একটা মৌলিক অবস্থা হিসেবে। মানুষ (এক প্রজন্মের একদল মানুষ) একটা কাজ করে (বিপ্লব), কিন্তু সে কাজ তার হাত ফসকে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তার অবাধ্য হয়ে ওঠে (বিপ্লব উন্মত্ত হয়ে ওঠে, হত্যা করে, ধ্বংস করে), মানুষ তার সেই অবাধ্য কাজটিকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য, বশে আনার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে (একটা নতুন প্রজন্ম বিপ্লবের বিরোধিতা করে, সংস্কারবাদী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন শুরু হয়) কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। যা একবার আমাদের হাত ফসকে গেছে তা আর ফিরবার নয়।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান : যা মনে করিয়ে দেয় জ্যাকুয়েস লা ফাটালিস্তের পরিস্থিতিকে, যে কথা আপনি শুরুতে বলছিলেন।

মিলান কুন্ডেরা কিন্তু এটা একটা যৌথ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনার উপন্যাসগুলো বুঝবার জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার ইতিহাস জানা কি জরুরি?

মিলান কুন্ডেরা না। যা জানা দরকার উপন্যাসেই তা বলা আছে।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান উপন্যাস পাঠ করে কি ইতিহাসের কোনো জ্ঞান অর্জন হয় না?

মিলান কুন্ডেরা ইউরোপের ইতিহাস আমাদের কাছে আছে। ১০০০ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের সবার একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা আছে। আমরা সবাই এর অংশ, একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে দাঁড় করালে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় আচরণ এর গুরুত্বটিকেই প্রকাশ করে মাত্র। স্পেনের ইতিহাস না-জেনেও আমি ডন কুইক্সোট বুঝতে পারি। তবে এটা বুঝবার জন্য ইউরোপের সাধারণ কিছু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা জানা থাকা প্রয়োজন, যেমন মধ্যযুগের নাইটদের কথা, প্রেম-সম্পর্কের কথা, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পরিবর্তনের সময়টির কথা।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান *লাইফ ইজ এলসহয়ার* উপন্যাসে রাবোঁ, কিটস, লেরমেনটভ এবং এমন আরো অনেক কবিদের জীবনীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মিলিয়ে জারোমিলের জীবনকে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রাগে মে মাসের প্রথম কুচকাওয়াজকে মেলানো হয়েছে প্যারিসে মে ১৯৬৮-এর ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে। অর্থাৎ আপনি আপনার নায়কের জন্য এমন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করছেন, যা ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত। যদিও আপনার উপন্যাসের স্থান প্রাগ। এর তুঙ্গ হলো ১৯৪৮-এর কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময়।

মিলান কুন্ডেরা আমার কাছে এটা সংক্ষিপ্তাকারে ইউরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাস।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান ইউরোপীয় বিপ্লব? ঐ আমদানি করা উদ্দীপনা, তাও আবার মস্কো থেকে?

মিলান কুন্ডেরা ব্যাপারটি যতই অনির্ভরযোগ্য হোক, ঐ উদ্দীপনা বিপ্লব হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। এর যাবতীয় বাগাড়ম্বর, মায়া, আত্মপ্রচার, কর্মকাণ্ড, অপরাধ মিলিয়ে ঐ ব্যাপারটাকে আজ আমি দেখি ইউরোপীয় বিপ্লবের ঐতিহ্যের একটা ঘনীভূত প্যারোডি হিসেবে। ইউরোপীয় বিপ্লবের ধারাবাহিক এবং অদ্ভুত পরিণতি হিসেবে।

~ www.amarboi.com ~

যেমন উপন্যাসটির নায়ক জারোমিল ভিক্টর হুগো এবং রাবোঁর ধারাবাহিক পরিণতি, ইউরোপীয় কবিতার এক অদ্ভুত পরিণতি। *দি জোক* উপন্যাসে জারোস্লাভ পুরাতন জনপ্রিয় শিল্পকে বহন করে চলে, এমন একটা যুগে যখন শিল্প উধাও হতে বসেছে। *লাফেবল লাভস* এর ডক্টর হ্যাভেল, এ যুগের ডন জুয়ান, যে যুগে ডন জুয়ানত্ব রীতিমতো অসম্ভব। *দি আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* ইউরোপীয় বামপন্থীদের কুচকাওয়াজের শেষ বিষণ্ন সুর এবং টেরেজা বোহেমিয়ার দূর গ্রামে বসে, তার জনজীবন থেকেই শুধু নিজেকে সরিয়ে নেয় না, নিজেকে সরিয়ে নেয় 'প্রকৃতির প্রভু এবং দখলদার এই মানুষের যাত্রাপথ থেকেই'। এই চরিত্রগুলো শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসেরই রূপ দেয় না, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ব্যক্তি-ইতিহাসকেও রূপ দেয়।

অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অভিযাত্রী

ক্রিশ্চিয়ান সালমান   অর্থাৎ আপনার উপন্যাসগুলো আধুনিক যুগের শেষ অঙ্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যে কালকে আপনি বলছেন 'চূড়ান্ত স্ববিরোধিতার কাল'।

মিলান কুন্ডেরা : তা বলতে পারেন। কিন্তু এখানে কোনো ভুল-বোঝাবুঝির সুযোগ যেন না থাকে, আমি যখন *লাফেবল লাভস*-এ হ্যাভেলের কথা লিখেছি তখন ডন জুয়ানত্ব হারিয়ে যাওয়ার যুগে ডন জুয়ানকে বর্ণনা করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি একটা মজার গল্প লিখছিলাম শুধু। চূড়ান্ত স্ববিরোধিতাসংক্রান্ত এইসব ভাবনা উপন্যাস লেখার আগে আমার থাকে না বরং উপন্যাসগুলো থেকেই এসব ভাবনার জন্ম হয়। আমি যখন *আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং* লিখছিলাম তখন আমি উদ্দীপ্ত ছিলাম এর চরিত্রগুলো নিয়ে, যে চরিত্রগুলো কোনো-না-কোনোভাবে পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আমি তখন দেকার্তের সেই বিখ্যাত সূত্রের পরিণতির কথা ভাবছিলাম, 'মানুষ হবে প্রকৃতির প্রভু এবং দখলদার'। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অলৌকিক সব আবিষ্কারের পর প্রকৃতির এই কথিত প্রভু ও দখলদার হঠাৎ উপলব্ধি করছে যে তার দখলে আসলে কিছুই নেই, সে মোটেও প্রকৃতির প্রভু নয় (প্রকৃতি এই গ্রহ থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ), সে ইতিহাসেরও প্রভু নয় (ইতিহাস তার হাত ফসকে যাচ্ছে), এমনকি সে তার নিজেরও প্রভু নয় (সে তার আত্মার অযৌক্তিক শক্তি দিয়ে চালিত)। এখন ঈশ্বর যদি না থাকে এবং মানুষও যদি প্রভু না হয়, তাহলে কে প্রভু? এই গ্রহ যেন এক প্রভুহীন শূন্যতার মধ্যদিয়ে চলছে। এই হচ্ছে সেই অসহ্য হালকা অস্তিত্ব।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান : কিন্তু বর্তমান সময়কে এইভাবে একটা বিশেষ সময়, গুরুত্বপূর্ণ সময় বা শেষ সময় হিসেবে দেখার এই প্রবণতা কি একধরনের অহঙ্কারী আত্মকেন্দ্রিকতা নয়? ইউরোপ কি এমনই বহুবার ভাবেনি যে সে একটা চূড়ান্তকাল, গ্রহণকাল অতিক্রম করছে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিলান কুন্ডেরা ঐ যাবতীয় চূড়ান্ত স্ববিরোধিতাগুলোর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই আছে যেটা শেষ? একটা ব্যাপার যখন আগে থেকেই তার নিশ্চিহ্ন হবার ঘোষণা দেয় তখন আমরা অনেকেই তা শুনি এবং সম্ভবত দুঃখ প্রকাশ করি। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব যখন অন্তিমে এসে পৌঁছেছে তখন আমাদের চোখ অন্যত্র। মৃত্যু তখন আমাদের কাছে অদৃশ্য। বেশ অনেকদিন হলো আমাদের মন থেকে নদী, পাখি, মেঠোপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আগামীতে যখন পুরো প্রকৃতিটাই আমাদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, কে লক্ষ করবে? অক্টাভিও পাজ, রেনে কারের উত্তরাধিকারী কোথায়? সেই মহান কবিরা এখন কোথায়? তারা কি অদৃশ্য হয়ে গেছেন, নাকি তাদের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাচ্ছি না। একসময় সেইসব কবিবিহীন ইউরোপ কল্পনাও করা যেত না, সেই ইউরোপে যেভাবেই হোক আজ ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু মানুষের কাছে কবিতার প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে যায়, সে কি টের পাবে যেদিন কবিতাই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে? একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরণে সবকিছু শেষ হবে না, হয়তো শেষ হবে গাঢ় নৈঃশব্দে।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান মেনে নেয়া গেল। কিন্তু একটা কিছুর শেষ হচ্ছে বলে যদি আমরা ধরে নিই, তা হলে আরেকটা কিছুর শুরু হচ্ছে বলেও তো ধরতে পারি।

মিলান কুন্ডেরা নিশ্চয়ই।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান কিন্তু কী শুরু হচ্ছে? আপনার উপন্যাসে তো তার কোনো নিশানা দেখা যায় না। আপনি কি তাহলে ইতিহাসের অর্ধেকটুকু শুধু দেখছেন না?

মিলান কুন্ডেরা তা হতে পারে। কিন্তু সেটা খুব গুরুতর কিছু নয়। তবে উপন্যাস ব্যাপারটা কী সেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যে ঘটনা ঘটে গেছে ইতিহাসবিদ আপনাকে তা জানায়। অন্যদিকে রাসকলনিকভের অপরাধ কোনোদিনও দিনের আলো দেখে না। উপন্যাস বাস্তবতার চর্চা করে না, অস্তিত্বের চর্চা করে। যা ঘটে গেছে তা অস্তিত্ব নয়, অস্তিত্ব হলো মানবিক সম্ভাবনা, যা-কিছু মানুষের পক্ষে হওয়া সম্ভব, যা-কিছু করা সম্ভব। মানবিক সম্ভাবনাগুলো আবিষ্কারের মাধ্যমে উপন্যাস এই অস্তিত্বেরই ম্যাপ আঁকে। কিন্তু আবার অস্তিত্ব মানে হলো 'এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা'। সুতরাং চরিত্র এবং পৃথিবী দুটোকেই সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখতে হবে। কাফকাতে তা স্পষ্ট। কাফকার পৃথিবীর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই, এটা পৃথিবীরই এক চরম, অভূতপূর্ব সম্ভাবনা। এটা সত্য যে আমাদের বাস্তব জীবনের পেছনেই এই সম্ভাবনাকে আবছাভাবে দেখা যায় এবং সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ বলে প্রতীয়মান হয়। এ কারণেই কেউ কেউ কাফকাকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলে আলোচনা করেন। যদিও তাঁর উপন্যাসে এই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ব্যাপারটি না থাকলেও বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। কারণ এই উপন্যাসগুলো আমাদের অস্তিত্বেরই একটা সম্ভাবনাকে ধারণ করেছে (মানুষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং পৃথিবীর সম্ভাবনা) এবং তার মাধ্যমে আমাদের দেখতে সাহায্য করেছে আমরা কী, আমরা কী করতে পারি।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনার নিজের উপন্যাসগুলো কিন্তু একেবারে বাস্তব পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে।

মিলান কুন্ডেরা ব্রচের *স্লিপওয়াকার* উপন্যাসত্রয়ের কথা ভাবুন, যা ৩০ বছরের ইউরোপীয় ইতিহাসকে ধারণ করেছে। ব্রচের কাছে এই ইতিহাস অবিরাম মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ইতিহাস। চরিত্রগুলো এই প্রক্রিয়ার খাঁচায় বন্দি এবং এমন একটা জীবন গ্রহণে বাধ্য, যা এই অবক্ষয়িত মূল্যবোধের সঙ্গেই খাপ খায়। ব্রচ তাঁর নিজের এই ইতিহাস বিচারে বিশ্বস্ত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর যে সম্ভাবনা দেখছেন, বাস্তবেও পরিণতিতে তা-ই ঘটবে বলে ভেবেছেন। কিন্তু আমরা নাহয় ধরে নিই যে তিনি ভুল করেছিলেন এবং এই অবক্ষয়ের পাশাপাশি আরো একটা প্রক্রিয়া চলছিল যা ইতিবাচক, যেটা ব্রচ দেখতে পাননি। তাতে কি উপন্যাস হিসেবে দি স্লিপওয়াকারের গুরুত্ব কিছু কমে? না। কারণ অবক্ষয় এই মানব-বিশ্বের অনিবার্য একটা সম্ভাবনা। এই প্রক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে ছিটকে পড়া মানুষকে বোঝা, তার আচরণ, তার মনোভাবকে বোঝাটাই জরুরি। ব্রচ অস্তিত্বের এক অজানা সীমানাকে আবিষ্কার করেছেন। অস্তিত্বের সীমানা মানে অস্তিত্বের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিল কি না, তা গৌণ।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান তাহলে আপনার উপন্যাসের এই চরম স্ববিরোধিতার কালকে বাস্তবতা হিসেবে নয় বরং সম্ভাবনা হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত?

মিলান কুন্ডেরা হ্যাঁ, ইউরোপের সম্ভাবনা। ইউরোপের সম্ভাব্য পরিণতি, মানুষের সম্ভাব্য পরিণতি।

ক্রিশ্চিয়ান সালমান আপনি যদি বাস্তবতার বদলে সম্ভাবনাকেই ধরতে চেষ্টা করে থাকেন, সেক্ষেত্রে কেন বিশেষ করে প্রাগের দৃশ্য এবং প্রাগের ঘটনাবলিকেই আপনি গ্রহণ করছেন?

মিলান কুন্ডেরা কোনো একটা এলাকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে যদি লেখক মানব-বিশ্বের দৃষ্টিগোচর সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করেন তাহলে তিনি তো সেটাকেই যথাযথভাবে বর্ণনা করবেন, যদিও উপন্যাসের মূল্য নির্ধারণে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ততার ভূমিকাটি গৌণ। ঔপন্যাসিক ইতিহাসবিদ নন, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নন, তিনি অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অভিলাষী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি

রুশ চলচ্চিত্রকার আন্দ্রেই তারকোভ্স্কির জন্ম ১৯৩২ সালে মস্কোতে। তাঁর বাবা ছিলেন সে দেশের বিখ্যাত কবি আরসেনি তারকোভস্কি। তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অল ইউনিয়ন স্টেট সিনেমাটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করেন। ১৯৬১ সালে তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র *ইভান্স চাইল্ডহুড*-এর মাধ্যমে তিনি একজন ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রকার হিসেবে আবির্ভূত হন। পরবর্তীকালে তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহের গভীর প্রতীকী এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্রামোদীদের আকর্ষণ করে। তিনি বহু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তৎকালীন সোভিয়েত প্রশাসনের সঙ্গে মতদ্বৈধর কারণে তিনি ১৯৭৯ সালে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন। স্বদেশের বাইরে তিনি ইতালি এবং সুইডেনে পৃথক দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রের ব্যতিক্রমী ভাষা সৃষ্টির জন্য তারকোভস্কি আজ ব্যাপকভাবে আলোচিত। তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *ইভানস চাইল্ডহুড*, *আন্দ্রেই রুবিলভ*, *সোলারিস*, *মিরর*, *স্টকার*, *নস্টালজিয়া*, *স্যাক্রিফাইস*। তিনি চলচ্চিত্রের তত্ত্ব বিষয়ে *স্কাল্পটিং ইন টাইম* নামে একটা বইও রচনা করেছেন। তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৬ সালে অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

আন্দ্রেই তারকোভস্কি, সুইডেনে যখন তাঁর শেষ চলচ্চিত্র *স্যাক্রিফাইস* নির্মাণ করেছিলেন তখন তাঁর দোভাষী ছিলেন লায়লা আলেকজান্ডার। ক্যান্সারে তারকোভস্কির অকালমৃত্যুর পর লায়লা আলেকজান্ডারের লেখা এই স্মৃতিচারণমূলক রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় *সোভিয়েত ফিল্ম* পত্রিকায় ১৯৮৯ সালে। এই লেখায় উল্লিখিত তারকোভস্কির কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পীমানস এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনাসমূহ। আমার এই ভাষান্তরটি প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা *লুক থ্রু*-র জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায়।

‘বিখ্যাত শব’

আজ ১৯৮৮ সালের পয়লা এপ্রিল, এই এপ্রিল ফুলের দিনে একটা চিঠি পেলাম তারকোভস্কির বোন মারিনা তারকোভস্কায়ার কাছ থেকে। মারিনা অনুরোধ করেছে আমি যেন তার ভাইয়ের স্মৃতিচারণ করে কিছু লিখি।

তারকোভস্কি আমাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, ‘তুমি যদি কখনো আমার সম্পর্কে লেখো তখন তোমার লেখায় দয়া করে আমাকে একজন দুর্বোধ্য, খেয়ালি পরিচালককে পরিণত কোরো না। ঐ কথাগুলো জীবনে বহুবার শুনেছি। বিশেষ করে মস্কোতে আমাকে নিয়ে এ ধরনের কথা তো খুব চালু আছে।’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, ‘আমি যে আপনার সম্পর্কে লিখব এমন কথা আপনি ভাবছেন কেন?

তিনি বলতেন, ‘একটু অপেক্ষা করেই দেখো। লিখতে তোমাকে হবেই। আমি মারা গেলে লোকে নির্ঘাত তোমার কাছে জানতে চাইবে তারকোভস্কির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, এ আমি নিশ্চিত বলে দিলাম।’

তাই তো দেখছি আজ! আমাকে সত্যি তাঁর সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে। লিখতে বলা হয়েছে তাঁর সঙ্গে কাজ করার এবং তাঁর জীবনের শেষ দুই বছর তাঁর সঙ্গে কাটানোর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

তাঁর এসব দৈব ঘোষণাগুলোকে আমি তখন একধরনের অস্বস্তিকর ঠাট্টা হিসেবেই ধরে নিতাম। বলতাম—‘কী যে বলেন আপনি! আপনার সামনে এখন কতগুলো চমৎকার ছবির পরিকল্পনা, হেমলেট, দি ফ্লাইং ডাচম্যান, হফমানিয়া, রুডল্ফ স্টেইনার, সেন্ট অ্যান্থোনি আর আপনি কিনা বলছেন অলক্ষুনে মরার কথা।’

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মরতে তো একদিন হবেই, নাকি?' তিনি বলতেন। আমি আলাপটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নিয়ে বলতাম, 'তা তো বটেই, মরতে তো আমাদের হবেই।'

তারপর কী অদ্ভুত ঠাট্টাই যেন, ১৯৮৫-এর ক্রিসমাসের ঠিক আগে আন্দ্রেই যখন স্টকহোমে তাঁর শেষ সপ্তাহটি কাটাচ্ছেন, আমরা একদিন কেরোলিন্সকা হাসপাতাল থেকে বেরুলাম। জানা গেল, আন্দ্রেইয়ের রোগ মামুলি ব্রঙ্কাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া নয়, আরো জটিল কিছু, যদিও স্পষ্ট করে আমাদের কিছুই জানানো হলো না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনি আবার আমাকে বলতে লাগলেন, মুখে বিষণ্ন হাসি, 'দেখো লিখতে গিয়ে আমাকে দেবতা বানিয়ে তুলো না। 'বিখ্যাত শব'-এ পরিণত কোরো না আমাকে। তিনি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন, বড় অকালে মৃত্যু হলো তাঁর। তিনি এইরকম ছিলেন, সেইরকম ছিলেন কিন্তু ছিলেন একেবারে অন্যরকম। এসব কথা লিখো না, এসব অন্যেরা লিখবে। তুমি একেবারে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যেমন বুঝেছ, চিনেছ, সে কথাটিই লিখবে। কাউকে বা কোনো কিছু বিচার করতে গিয়ে কখনো নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা কোরো না। কখনোই না।'

একটু হেসে নিয়ে তিনি আবার বলতেন, 'তোমার প্রতি এটা আমার একটা উপদেশও বলতে পারো। যদি শিল্প-সাহিত্যে কোনো কাজ করতে চাও, তাহলে কখনো নৈর্ব্যক্তিক হবার চেষ্টা কোরো না। 'আমি' কথাটাকে ভয় পেয়ো না কখনো।'

৪ঠা এপ্রিল, যেদিন আন্দ্রেইয়ের জন্মদিন, বেঁচে থাকলে যেদিন তাঁর ৫৬ বছর পূর্ণ হতো, সেদিন থেকে আমি শুরু করলাম আমার লেখা। কাকতালীয়ভাবে এ বছর এদিনটা আবার 'ইস্টার ডে' (যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান পর্ব)। আমি লিখছি তাঁর কথামতো 'আমি' সর্বনামটিকে স্মরণে রেখেই।

আমি ৪ঠা এপ্রিল হেলসিংকির ক্যাথিড্রালে গিয়ে যাজককে আন্দ্রেইয়ের নামে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলাম। যাজক জানালেন এইরকম প্রার্থনাগুলো তারা ইস্টারের দিন করেন না; তবে, তারা রুশ অর্থডক্স চার্চে 'ঈশ্বরের দাস' আন্দ্রেইয়ের নামে প্রার্থনা করতে পারেন 'রডিস্তা' অনুষ্ঠানে (স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠান)। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তারকোভস্কির কোনো চলচ্চিত্র দেখেছেন কি?' তিনি জানালেন তিনি *স্যাক্রিফাইস* দেখেছেন। বললেন, 'আন্দ্রেই তারকোভস্কি খুব বিশাল আত্মার মানুষ। অন্যের জন্য দুঃখভোগ করেছেন তিনি, কষ্ট দিয়েছেন নিজেকে। আমরা নিশ্চয়ই তাঁর জন্য প্রার্থনা করব আমাদের চার্চে।' যাজক আমাকে এবং আমার বন্ধুদের এক টুকরো ইস্টার কেক এবং একটা করে লাল-রঙ-করা ডিম পরিবেশন করলেন, আশীর্বাদ করলেন আমাদের সকলকে। আমি নিঃশব্দে একটা মোমবাতি জ্বালালাম। আমার মনে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিড় করতে লাগল আন্দ্রেইয়ের স্মৃতি, মনে পড়ল মারিনা, তাদের বাবা আর আন্দ্রেইয়ের ছেলেদের কথা। সবাই কী ভালোই না বাসত ওকে!

প্রথম পরিচয়

আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮১ নভেম্বরে মস্কোতে। তখন শুধু একটা বিকেল আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। সেই সময় আমি মস্কো শহরে ঘুরছিলাম ট্যুরিস্ট হিসেবে আর আন্দ্রেই তখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইতালি যাওয়ার। ঠিক হলো আমরা মায়াকোভস্কি স্কয়ারে দেখা করব।

ফোনে বললাম, 'আমরা পরস্পরকে চিনব কেমন করে, আপনার কোনো ছবিও তো আমার কাছে নেই।'

'ভয় নেই আমিই চিনে নেব তোমাকে'—তিনি বলেছিলেন। যদিও সে চত্বরে সেদিন অসংখ্য মানুষের ভিড় ছিল, আমি কিন্তু মুহূর্তে চিনে ফেলেছিলাম আন্দ্রেইকে। তিনি কিছুটা দেরি করে এসেছিলেন, ক্ষমা চাইলেন সেজন্য। এরপর তিনি আমাকে একটা সিনেমা দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেলেন 'ডোম কিনো' সিনেমাহলটিতে। হলের গেটে দাঁড়ানো মানুষটি বাধা দিল আমাদের ভেতরে যেতে।

আন্দ্রেই বেশ অপমানিত হলেন কিন্তু শান্তকণ্ঠে শুধু বললেন, 'নিজের দেশের চলচ্চিত্রকারদের চিনবার সময় কি আপনাদের এখনো হয়নি?' ঘটনাটিতে আন্দ্রেই বিব্রত হয়েছিলেন।

পরে সুইডেনে বসবাসের সময় প্রায়ই হাসতে হাসতে তিনি বলতেন, 'মনে আছে ওরা কেমন আমাকে ডোম কিনোতে ঢুকতেই দিচ্ছিল না?'

বিরাট হলটিতে প্রচুর লোকসমাগম ছিল সেদিন। মাত্র দু-একজনের সঙ্গে কেবল তাঁকে নিস্পৃহ শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখলাম।

ইতালিতে গিয়ে ছবি করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তাঁকে, তিনি জানালেন। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভিসা দিতে এবং তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাইরে যেতে অনুমতি দিতে বারবারই অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল।

তিনি বলছিলেন, 'বৃষ্টির পর যেমন দেদার ব্যাঙের ছাতা গজায়, তেমনি নিত্য সব সমস্যা গজিয়ে ওঠে এখানে।'

হাসছিলেন তিনি কিন্তু সে হাসির পেছনে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম চাপা ক্রোধ, তিক্ততা আর হতাশাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই প্রথম দেখায় তাকে খুব ক্লান্ত একজন মানুষ বলে মনে হয়েছিল আমার। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে আমার আসল বন্ধুত্বটি গড়ে ওঠে ইতালিতে, যখন রোমে তিনি *নস্টালজিয়া* ছবিটির শুটিং করেছেন।

রোমে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা আমার বেশ মনে আছে। দিনটি ছিল ১৯৮২ সালের ২১শে মে। খুব গরম ছিল সেদিন। আন্দ্রেইয়ের প্রিয় এলাকা পিয়াযা নাভোনের এক কাফেতে বসেছিলাম আমরা। ইতালি আর রোম বলতে তিনি তখন অজ্ঞান, বিশেষ করে 'তাসমানি' ছিল তার দারুণ পছন্দের জায়গা। *নস্টালজিয়া*র কাজ তখন শুরু হয়েছে কেবল, খুব ফুরফুরে মন তার। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডোনাতেরা বাগলিভো, যিনি ইতালিতে তারকোভস্কির ভ্রমণ এবং কাজের ওপর একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করছিলেন। পরবর্তীকালে অন্য একসময় তারকোভ্‌স্কি আমাকে বলেছিলেন, তাঁকে নিয়ে যে ডকুমেন্টারিগুলো হচ্ছে (মোট তিনটি) সেগুলোর কোনোটিই তেমন শিল্পগুণে সমৃদ্ধ নয়। অথচ এখন তাঁর মৃত্যুর পর সেই ডকুমেন্টারিগুলোর জন্য লোভী চলচ্চিত্র পরিবেশকগণ কী আকাশছোঁয়া দামই না হাঁকছেন।

মে'র ঐ দিনটিতে আমরা নানাবিধ গুপ্তবিদ্যা নিয়ে আলাপ করছিলাম।

আন্দ্রেই তাঁর ইতালির সহকর্মীর কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ হলো লাস্ট্রেগা, যার অর্থ 'ডাইনি'।' আমি খেপে উঠতেই আন্দ্রেই অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তুমি কি ডাইনিদের বিরুদ্ধে নাকি?' রুশ ভাষায় ডাইনিকে বলা হয় 'ভেদমা' যে শব্দের মূল ক্রিয়াপদ 'ভেদাত' যার অর্থ জানা, সচেতন হওয়া কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা। তাই যদি হয়, তাহলে আমি ডাইনি তো বটেই. গভীর আগ্রহে পড়াশোনা করছি জোতির্বিদ্যা আর অতীন্দ্রিয়বাদের ওপর. কম্পিউটারে কুষ্ঠি বিচার করছে, একেবারে আধুনিক ডাইনিই বটে।

তিনি হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'তুমি হলে গুপ্তবিদ্যাবিশারদ ডাইনি, অবশ্য তুমি হচ্ছ ভালো ডাইনি।'

'তাই নাকি'—আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, যাক অন্তত এটুকুর জন্য ধন্যবাদ।

তিনি বললেন, 'ঈশ্বর তোমাকে মন্দ ডাইনিদের কাছ থেকে রক্ষা করুন, সবসময় এড়িয়ে চলবে ওদের।' তিনি কি ঠাট্টা করছিলেন আমার সঙ্গে? আমি আজও জানি না।

স্যাক্রিফাইস ছবিটার প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল 'দি উইচ'। কিন্তু এ নামে আগেই একটা ছবি ছিল, তা ছাড়া সুইডিশ বা ইংরেজি দুই ভাষাতেই ডাইনিদের জন্য যে শব্দ রয়েছে, তাতে রুশ ভাষার সেই জ্ঞানার্জনের গূঢ়ার্থটি নেই, যে গূঢ়ার্থটি আন্দ্রেইয়ের মতে ছবিটির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। তারকোভ্‌স্কির এই শেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবি স্যাক্রিফাইসের প্রথম সংস্করণে দেখানো হয়েছিল ছবির প্রধান চরিত্র আলেকজান্ডার দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। এ অসম্ভব কোনো সমাপতন নয়। একজন খাঁটি শিল্পী যেমন তার নিজের পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন তেমনি অনেক সময় প্রত্যক্ষ করতে পারেন সমগ্র মানবজাতির পরিণতিকেও।

শেষবারের মতো ইতালিতে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তিনি তখন তাঁর ছবির সম্পাদনার কাজ শেষ করছেন। প্রচুর কাজ তবু তাঁকে বেশ তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। সবসময় হাসি-ঠাট্টা করতেন তারকোভস্কি। তাঁর আচরণে একটা শিশুসুলভতাও ছিল। তিনি কখনো হয়তো তাঁর সহকর্মীর ঘাড়েই চড়ে বসতেন, সেখান থেকে চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাতেন—'তাহলে দেখা হবে শিগগির

আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে আমার সত্যিকার কাজ শুরু হয় ১৯৮৪-এর সেপ্টেম্বরে। টেলিফোন বেজে উঠল, 'আমি তারকোভস্কি বলছি, তোমার সঙ্গে কি দেখা হতে পারে?'

'অবশ্যই, কখন?' আমি বলি।

'যদি সম্ভব হয় তো এখনই।' বললেন তারকোভস্কি।

আন্দ্রেই স্টকহোমে থাকতেন প্রোডাকশন ম্যানেজার কাটিনকা ফারাংগোর ফ্ল্যাটে। সেই ফ্ল্যাটেই আমাদের ঘটল আরো এক স্মরণীয় সাক্ষাৎ। আন্দ্রেই তাঁর বাবা আরসেনি তারকোভস্কির কবিতা পড়তেন প্রায়ই। তাঁর বাবার লেখা 'প্রথম সাক্ষাৎ' কবিতার প্রথম লাইনগুলো আমার মনে আছে—

> 'প্রতিবার আমাদের সাক্ষাৎ ছিল
> একটা একটা উন্মোচন
> এপিফেনি যেমন'
> (এপিফেনি, যিশুর কাছে প্রাচ্য-দেশীয় জ্ঞানীদের আগমনের উপলক্ষে অনুষ্ঠান)

আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে প্রতিবারের সাক্ষাতে এমনি মনে হতো প্রতিবারই নতুন কোনো দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। এ অভিজ্ঞতা শুধু আমার নয়, সকলেরই হয়েছে, যারা কথা বলেছেন তাঁর সঙ্গে।

চলচ্চিত্রে শব্দ

পুরো সন্ধ্যা আমরা আলাপ করেছি শব্দ নিয়ে। আমি আর কোনো চলচ্চিত্রকারকে জানি না, যিনি এত যত্নের সঙ্গে ছবিতে শব্দ ব্যবহার করেন, এত তীক্ষ্ণ যার শ্রবণশক্তি, মানবিক মনোজগতের গভীরে যার অন্তর্দৃষ্টি। তারকোভ্স্কির কাছে দৃশ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল শব্দ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি বলতেন, 'অনেক মামুলি শব্দ যা প্রথম শুনে নেহাত আটপৌরে বলে মনে হয় তাও দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে যেতে পারে স্মরণীয় কোনো দৃশ্যের মতোই। মেঝের উপর গড়িয়ে যাওয়া একটা পয়সার মৃদু শব্দ, বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানোর খসখস শব্দ, গাছ কাটার শব্দ, কাদায় পা ডুবে যাওয়ার শব্দ, ঝরা পাতার উপর হেঁটে যাবার শব্দ, ঝরনার কুলকুল শব্দ ইত্যাদি সাধারণ শব্দগুলোও প্রয়োগ করতে পারলে দর্শকের স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে থাকতে পারে। দৃশ্যকে অনুসরণ করাই কেবল শব্দের কাজ নয়, অনেক সময় শব্দই দৃশ্যের ব্যঞ্জনাকে অনেক বিস্তৃত করে তুলতে পারে।'

শব্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পছন্দ করতেন। আমরা মেঝের উপর বিভিন্ন তরল পদার্থ ঢালতাম, যেমন—দুধ, পানি, কোকাকোলা এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করতাম শব্দগুলো কখনোই একরকম হচ্ছে না।

তারকোভস্কি বলতেন, 'শব্দ শুনতে শেখো। বুঝতে শেখো যে, পানির নিজস্ব একটা শব্দ আছে, তেমনি দুধেরও আছে নিজস্ব শব্দ। আমরা খুব মনোযোগের সঙ্গে এসব লক্ষ করি কি? অথচ চলচ্চিত্রের জন্য তা কত জরুরি। পানির কথা ধরো। কত অফুরন্ত শব্দ তার। সহজ খাঁটি সংগীত যেন। অনেক সময় জ্বলন্ত আগুনের শব্দ একটা পূর্ণাঙ্গ সিম্ফোনি হয়ে উঠতে পারে। কখনো কেবল একটা জাপানি বাঁশির সুর। বিচ গাছ আর পাইন গাছ একইরকমভাবে পোড়ে না। পোড়ার সময় তাদের গন্ধ আলাদা, শব্দ আলাদা। যেমন রঙের প্রচুর বৈচিত্র্য, তেমনি বৈচিত্র্য আছে শব্দেও।'

লিখতে লিখতে ভাবছি সত্যিই আন্দ্রেইয়ের মতো কেউই এতকিছু শেখায়নি আমাকে। শুধু ছবি সম্পর্কে নয়, আন্দ্রেই পুরো পৃথিবীকেই নতুনভাবে দেখতে এবং শুনতে শিখিয়েছেন আমাকে। কত নগণ্য আটপৌরে ব্যাপারের আড়ালেও কত বিচিত্র রহস্য লুকিয়ে থাকে তা দেখার চোখ খুলে দিয়েছেন তিনি।

তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বুঝলে, সবচেয়ে সুন্দর আর রহস্যময় হলো সারল্য।'

ভালো ছবি

তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্রের মতো সুযোগ পেলেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'ভালো ছবি কীভাবে তৈরি করা যায়?'

এ প্রশ্ন করলেই প্রতিবার উনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতেন, 'এই একটা ব্যাপার যা আমি কোনোদিনও শেখাতে পারব না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো শেখানো যায় না, অন্যের উপর চাপিয়েও দেয়া যায় না। তবে তুমি যদি খুব ভালো ছাত্র হও, তাহলে অন্তত শিখতে পারবে কী করে খারাপ ছবি বানাতে না হয়। সৃষ্টি করা বেঁচে থাকার মতোই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা ব্যাপার। ভালোভাবে বেঁচে থাকা কাউকে শিখিয়ে দেয়া যায় না। হয়তো তাকে খারাপভাবে না-বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেয়া যায়। এসব কথা চমৎকারভাবে লেখা আছে বাইবেলে, বাইবেল পড়ো।' এবং আমরা বাইবেল পড়তাম প্রায়ই।

মনের 'আলকেমি'

আমার বাড়ি ফিরবার সময় হয়ে গিয়েছিল। ফিরবার আগে আন্দ্রেই জানতে চাইছিলেন আগামী কয় মাস আমি ব্যস্ত আছি কি না। অক্টোবরে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় যাওয়ার আগে আমার কোনো ব্যস্ততা ছিল না, তাঁকে জানালাম। একথা তারকোভস্কি কেন জিজ্ঞাসা করলেন তা বুঝতে পারলাম পরদিন সকালে। সকালে সুইডিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে টেলিফোনে জানানো হলো, আমি যেন অচিরেই এসে তারকোভস্কির সঙ্গে কাজে যোগ দিই। পরে আমি লক্ষ করেছি তারকোভস্কি কখনই কাউকে সরাসরি কোনো বিষয়ে অনুরোধ করেন না। তারকোভস্কির সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন শুধু আমার একার নয় অনেকেরই। কিন্তু আমার বেলায় তা যে কখনো সম্ভব হবে ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে একবার তাঁর প্রযোজক আনা লেনা উইবোমের সঙ্গে আলাপ হবার পর সে আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম। আনা লেনা আমাকে বলেছিলেন তারকোভস্কি নাকি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে তিনি দোভাষী হিসেবে একজন পুরুষকে নেয়ারই পক্ষপাতী কারণ তাঁর কাজের ধরনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কোনো মহিলার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হবে।

তাঁর ছবির শুটিং হতো ধলপ্রহরে। সবাইকে ঘুম থেকে উঠতে হতো ভোর ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে, যাতে সেই 'জাদুর প্রহর'টিকে ধরা যায়। এই কড়া নিয়মেই সর্বদা তাঁর আউটডোর শুটিংগুলো চলত। এ নিয়মে একজন পুরুষের টিকে থাকাও ছিল দুঃসাধ্য।

আমি দেখা করলাম প্রডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে। তিনি শুরু করলেন তার অভিযোগ—'কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ পেশাদারি দোভাষীদের এনে দিচ্ছি আর উনি একে একে প্রত্যেককেই বাতিল করছেন। ভীষণ অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আমরা হয়তো কাউকে ডাকছি, ঠিকমতো বেতন দিয়ে যাচ্ছি, দুএক দিন কাজও চলছে তিনি হঠাৎ করে বলে বসলেন যে, সে লোকের সঙ্গে তার মনের 'আলকেমি' মিলছে না, তাদের মধ্যে সঠিক যোগাযোগটি ঘটছে না। একথা আমরা অবশ্যই বুঝি যে দোভাষীই হচ্ছেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহকারী, দোভাষীর ওপর তাঁর একশত ভাগ আস্থা থাকা প্রয়োজন কিন্তু আমরা আর কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি বলুন, কোথায় পাওয়া যাবে তার সেই মানুষ? কাজ একদম এগুচ্ছে না। শেষপর্যন্ত উনিই আমাকে রিং করতে বললেন। যাক, এখন বলুন আমরা কি আপনার ওপর শেষ ভরসা করতে পারি?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই পারেন', আমি জবাব দিলাম। 'তবে দুটো বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে। প্রথমত, আমি কোনো পেশাদার দোভাষী নই, দ্বিতীয়ত, এত অল্প সময়ের নোটিশে আমার পক্ষে তো পুরুষ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

খুব হাসলেন ম্যানেজার, বললেন—'এখন তাঁর ঐ 'আলকেমি' কতদিন কাজ করবে সেটাই দেখবার, অবশ্য আপনি তো চলচ্চিত্রেরই লোক, সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

প্রযোজকদের যে বেশ ভালো পয়সা খসেছে তা বুঝতে পাচ্ছিলাম। এরকম লাগামহীন পরিচালকের পেছনে পয়সার থলি ধরে থাকা মোটেও সহজ কোনো ব্যাপার নয়।

ইতিমধ্যে সপ্তাহখানেক কেটে গেছে। পুরো সপ্তাহের প্রতি সকালে তারা আমাকে টেলিফোন করেছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানিয়েছেন, তারকোভস্কি আবার তাঁর সাম্প্রতিক দোভাষীটিকেও বাতিল করেছেন, তারা আমাকে সবিনয় অনুরোধ করে বলেছেন, আমি যেন সত্বর এসে তাদের এই কঠিন সমস্যা থেকে রক্ষা করি। অক্টোবরে আমার ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল হলো, আমাকে যেতে হলো লন্ডনে অভিনেতার খোঁজে। ডেভিড গর্দাডকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর সহযোগিতায় আমরা পেয়ে গেলাম থিয়েটারের রেনেসাঁ পুরুষ সুসান ফ্লিটউডকে, যাকে তারকোভস্কি পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, 'আনন্দদায়ক ব্যতিক্রমী এক বিস্ময়।'

প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে এল। এদিকে আমার আর আন্দ্রেইয়ের মধ্যে সেই 'আলকেমির' যোগাযোগ ঘটা সত্ত্বেও দলের মধ্যে তখনো একজন পুরুষ দোভাষীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা চলছিল। তারকোভস্কি বারবারই বলছিলেন একজন মহিলার পক্ষে এ কাজ খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তাঁর দলে প্রায় সকলেই ছিলেন মহিলা—তাঁর নির্বাহী প্রযোজক, প্রডাকশন ব্যবস্থাপক, সহকারী পরিচালক, শিল্পনির্দেশক, সকলেই এর আগে বার্গম্যানের চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। একমাত্র আমিই ছিলাম সেই মাফিয়া দলের বাইরে। আমি সুস্থিরভাবে প্রবল একাগ্রতায় কাজ করবার চেষ্টা করছিলাম।

তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন 'তুমি পারবে না হে। আমার আসলে দশজন দোভাষী দরকার।' এসব কথায় সবচেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত তাঁর অর্থ বিভাগটি। অবস্থা এমন হতো যেন কবুতরের খাঁচায় বিড়াল ঢুকেছে। তাঁর প্রযোজিকা আনা লেনা উইবোম তখন বলতে শুরু করতেন—'মানে বুঝতেই তো পারেন সুইডেন নেহাত ছোট একটা দেশ। আমাদের কি আর আমেরিকার মতো সম্পদ আছে? ওখানে আপনি লিমুজিন গাড়িতে চড়ে দশজন সহকারী নিয়ে স্রেফ একটা গরুর ছবি তুলতে যেতে পারেন। ওরা ওসব পারে। সেদিক থেকে আমরা খুবই ছোট একটা দেশ।' আন্দ্রেই তখন হালকা মেজাজে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলে উঠতেন, 'না, ঐ গরুর ছবি তো আমি একাই তুলতে পারব, দশজনের কী দরকার, গরুটা শুধু গুঁতো না-মারলেই হলো।'

প্রস্তুতিপর্বের শেষপর্যায়ে একদিন আমরা খবর পেলাম কোনো এক অদৃশ্য কারণে জাপানি সহ-প্রযোজকরা এ ছবিতে আর টাকা দেবেন না, আমরা সকলে খুব হতোদ্যম হয়ে পড়লাম তখন। এসময় আন্দ্রেই প্রায়ই একটা টেবিলের উপর চুপচাপ বসে থাকতেন আর একখণ্ড কাগজ নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তেন। আন্দ্রেই যখন মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়তেন তখনই এ কাজটি করতেন। দুবার আমি তাঁকে এরকম বসে বসে কাগজ ছিঁড়তে দেখেছি। এইবার, যখন জাপানিরা তাঁকে অর্থ দিতে অস্বীকার করল এবং আরেকবার *স্যাক্রিফাইস* ছবির সেই বাড়ি পুড়িয়ে ফেলার দৃশ্য শ্যুটিঙের বিপর্যয়ের সময়, যখন ইংরেজ 'স্পেশাল এফেক্ট' দল এবং পুরো ক্যামেরা ইউনিট উভয়ের ব্যর্থতায় চমৎকার একটা দৃশ্যের পুরো শুটিং নষ্ট হয়ে যায়। (পরে অবশ্য আবার তা তোলা হয়)। দুবারই তিনি শুধু বলেছিলেন, 'এ হতেই পারে না।'

এমন অসাড়, অসহায় অবস্থায় স্রেফ কান্না পায়। নিরুপায় হয়ে আমার ঠিকানার খাতা থেকে নাম্বার নিয়ে ডেভিট গদার্ডের কাছে ফোন করলাম আর আন্দ্রেইকে বলতে লাগলাম, 'দেখবেন এ কাণ্ডের জন্য ঐ জাপানিগুলো নিশ্চয়ই একদিন অনুতাপ করবে।'

আবার ডেভিট গদার্ডকে বড় এক ধন্যবাদ তাঁর সহযোগিতা, ধৈর্য এবং উৎসাহের জন্য। গদার্ড বললেন, 'এক্ষুনি চ্যানেল ফোরের জেরেমি আইজাকসকে রিং করুন এবং তারকোভস্কির নাম উল্লেখ করে যা হয়েছে বিশদ করে বলুন, দ্বিধা করবেন না।' তখন জেরেমি ছিলেন চ্যানেল ফোরের প্রধান। তাঁকে কিছুই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হলো না, খুব সহজে এবং চকিতে ঠিকঠাক হয়ে গেল সব, তিনি বললেন, 'সমস্যা তো? তার মানে টাকা লাগবে। তারকোভস্কি জানেন কি ঠিক কত টাকার দরকার? বোধ করি তিনি জানেন না, যাক আমরা লাখ পর্যন্ত যেতে পারি, ঠিক আছে আমরা দেখছি কী করা যায়। তারকোভস্কিকে শুভেচ্ছা।' তারকোভস্কি পরবর্তী সময়ে প্রায়ই ওদের উদাহরণ দিয়ে বলতেন, 'দেখলে তো চ্যানেল ফোরের কাণ্ড, দ্যাখো কী চমৎকার এই জেরেমি আইজাকস, এই হলো যোগ্যতা।'

আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এরপর থেকে আন্দ্রেই আমাকে বলতেন তার 'ব্যক্তিগত প্রযোজক'।

তিনি বলতেন, 'আসলে চলচ্চিত্র নির্মাণের নিয়মটাই এই। চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ফেলা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে একজনের পারদর্শিতা হয়তো অপরিহার্য কিন্তু তা সমগ্রকে ভুলে গিয়ে নয়। তাই এক্ষেত্রে নিয়মটা হওয়া উচিত, 'সকলে একটার জন্য এবং প্রত্যেকের জন্য একটা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই সন্ধ্যায় একটা পার্টি হলো আমাদের। আন্দ্রেই ঘোষণা করলেন, এখন তিনি আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। তাঁর আস্থায়, তাঁর প্রশংসায় কী যে আনন্দ হলো আমার, মনে হলো যেন পাখা গজিয়েছে আমার শরীরে। সেই থেকে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম একে অপরের। আমার সঙ্গে আন্দ্রেইয়ের কাজ কেবল অফিসিয়াল ঐ নয় ঘণ্টাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমরা প্রায়ই বিকেলে বেরিয়ে যেতাম বিভিন্ন জায়গায়, কোনো রেস্তোরাঁয়, কখনো সিনেমায়। আমার আর একটা কাজ ছিল তাঁকে বাইরের পৃথিবীর খোঁজ খবর দেওয়া, সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংবাদগুলো পড়ে শোনানো। এ যে আমার জন্য কত আনন্দের ব্যাপার, একথা বারবার বললেও আন্দ্রেই সবসময় আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতেন উনি নাকি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন।

চমৎকার গল্প বলতে পারতেন আন্দ্রেই। খুব উৎসাহের সঙ্গে আমাদের শোনাতেন তাঁর ছেলেবেলার গল্প। মাকে খুব ভালোবাসতেন আন্দ্রেই, মা'র গল্প করতেন, গল্প করতেন বাবার, সন্তানদের, বোন মারিয়ার, মস্কোর জীবনের আর তাঁর গ্রামের। তাঁর মন জুড়ে ছিল রাশিয়া। রাশিয়ার সেই চমৎকার বৃষ্টি তিনি যে হারাচ্ছেন সেকথা স্মরণ করতেন সবসময়। তাঁর বর্ণনায় তিনি আমাকে এত মোহিত করে রাখতেন যে মনে হতো আমিও যেন তাঁর সঙ্গে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছি, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছি, তাঁর কুকুরটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তিনি রেস্তোরাঁয় বসে অনবরত ভদকা আর সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

তিনি বলতেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিলাম। খুব রাগী আর গোঁয়ার ছিলাম। যত বুড়ো হচ্ছি তত শান্তশিষ্ট হয়ে যাচ্ছি।' তাঁর ছবির প্রতিটি দৃশ্যের মতোই তাঁর গল্পগুলো ছিল অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ভরা।

স্বপ্নের চলচ্চিত্রকার

সকালে উঠেই আন্দ্রেই আমার কাছে জানতে চাইতেন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের খবর। বলতেন, 'তা আকাশে আজ কী ঘটছে, বলো তো? চাঁদটা কোথায়? আর আমার আগামীকালের ভাগ্য কেমন?'

তিনি এমনভাবে এসব কথা বলতেন যে বোঝা যেত তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে মোটেও উৎসাহী নন, বরং কিছুটা ভীতও। আমরা দুজনই ছিলাম মীন রাশির জাতক। এ রাশির লোকদের অনুভবক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ হয়, এদের কল্পনার বিশাল এক জগৎ থাকে তার [illegible] প্রা[illegible] হয় দৈব স্বপ্নদ্রষ্টা। আন্দ্রেই অবশ্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বলতেন, 'এরা আসলে মীন রাশির ঐ প্রতীকটার মতোই, দ্বিধাবিভক্ত। আমরা সবকিছু করতে চাই, আমরা একবার এদিকে সাঁতরে যাই, আবার ওদিকে সাঁতরে যাই, অবশেষে দেখি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি। এদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো কোনো একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা। আমরা আসলে মাছেরই মতো মৌন, আমরা যতটুকু অনুভব করি তা প্রকাশ করতে পারি না।'

কখনো কখনো তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'এসবে ভয় করে না তোমার? এই জাপানি দৃশ্যের ওপর থেকে পর্দাটা সরিয়ে ফেলা আসলে অন্যায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার দরকারটাই বা কী?' আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম আসলে জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিবিধ গুপ্তবিদ্যায় আমার আগ্রহ মোটেও ভবিষ্যৎকে জানবার জন্য নয়, আমি আসলে জানতে চাই বর্তমানকেই, জানতে চাই ঠিক এখনই কী ঘটে চলেছে আমার মধ্যে, আমার কাজ, আমার আচরণে কোনো মহাজাগতিক প্রভাব ক্রিয়াশীল রয়েছে কি না।

রুশ লেখক ইভান বুনিন যেমন বলেছেন—'আমি' প্রকৃতিরই একটা অংশ। প্রকৃতিতে যা-কিছু ঘটছে তার একটা প্রভাব পড়ছে আমার ওপরও। জীবন, তাকে যেভাবেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, এর অস্তিত্বের স্বরূপ কেবল এই গ্রহের ওপরই নির্ভরশীল নয়, তা এই গ্রহের সীমা ছাড়িয়েও ব্যাপ্ত। তা ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সাধারণের প্রতি অনেক সহনশীল হতে শিখিয়েছে।

আন্দ্রেই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতেন, আমার অনেক কথা মেনে নিলেও ভবিষ্যৎবিষয়ক আমার ধারণাকে সবসময় বিরোধিতা করতেন। আমি তখন বলতাম, 'তাহলে স্বপ্ন সম্পর্কে আপনি কী বলেন। আপনি তো প্রায়ই বলেন আপনার অনেক স্বপ্নই সত্য হয়ে যায়।'

তিনি বলতেন, 'সেটা সত্যি কিন্তু স্বপ্ন অন্য ব্যাপার, স্বপ্ন হলো এক রহস্যময় সত্য। সে সত্য আমাদের অস্তিত্বের অর্ধেক অংশে প্রচ্ছন্ন থাকে। চিন্তা করে দেখো আমাদের জীবনের অর্ধেকটাই আমরা ঘুমিয়ে কাটাই, জেগে উঠে ছুটি কাজে, ছবি বানাতে। কেমন অদ্ভুত।'

নানাবিধ স্ববিরোধিতা ছিল তাঁর মধ্যে। একদিকে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন জীবন ও মৃত্যুবিষয়ক নানা ভাবনায়, আগ্রহী ছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নৃতত্ত্ব, প্যারাসাইকোলজি ইত্যাদি বিষয়ে, তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন একবার এক মাসের জন্য জার্মানির এক অ্যানথ্রোপোসফিক্যাল ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন।

আবার প্রায় বলতেন, 'বেশি জানাটা আসলে ঠিক নয়, বেশি জানবার চেষ্টার মধ্যে একটা ধ্বংসাত্মক অন্যায় ব্যাপার আছে। ঈশ্বরের যাবতীয় রহস্যে মানুষের অত নাক গলানো উচিত নয়।'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারকোভ্স্কি ছিলেন এমন একজন অসাধারণ চলচ্চিত্রকার, যিনি এমনকি তাঁর স্বপ্নকেও চলচ্চিত্রের পর্দায় তুলে আনতেন। একটা উদাহরণ দিই।

এক রোববার আন্দ্রেই আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'আগামীকাল প্রযোজকদের সঙ্গে মজাদার একটা লড়াই হতে যাচ্ছে। গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি যে স্বপ্নটাকে চলচ্চিত্রায়িত করতে চাই। আমাদের খুব ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাপারটাকে মোকাবিলা করতে হবে যাতে আনা লেনা তার টাকার থলির ফিতেটা একটু ঢিলে করে।'

স্বপ্নে তিনি দেখেছেন, তিনি একটা সোফাতে শুয়ে আছেন মৃত অবস্থায়। অনেক লোক সোফার চারিদিকে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। তিনি তখন তাঁর মাকে দেখতে পাচ্ছেন আয়নায়, চমৎকার শাদা পোশাক পরিহিত তার মা যেন কোনো দেবী। এরপর তিনি দেখলেন হুবহু ফ্রয়েড-বর্ণিত একটা দৃশ্য। একজন নগ্ন মহিলা একটা মোরগের পেছনে দৌড়াচ্ছে। পুরো দৃশ্যটি তিনি এমনভাবে দেখেছেন যেন স্লো-মোশনে ছবি দেখছেন। এরপর তিনি দেখলেন তাঁর পায়ের কাছে একটা মেয়ে বসে আছে, তাঁর মনে হলো মেয়েটিকে তিনি চেনেন কিন্তু মেয়েটি মুখ ঘোরাতে দেখলেন অচেনা একজনকে।

নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও আন্দ্রেই অবশেষে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর অর্থবিভাগকে রাজি করাতে, যাতে তার ঐ স্বপ্নদৃশ্যটি চলচ্চিত্রায়িত করবার খরচ বহন করে। খরচ কমাতে পুরো ফিল্ম ইউনিটটিকে একস্ট্রা অভিনেতা-অভিনেত্রীতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত সম্পাদনার সময় ঐ দৃশ্যের শুধু একটা অংশ রেখেছিলেন আন্দ্রেই। তবু এর আবেদন একই রকম, কারণ দৃশ্যটি একটা মাত্র দীর্ঘ শটে ধারণ করা হয়েছিল এবং আলোকসম্পাত ছিল ব্যতিক্রমী, ত্রিছান্দিক সোনাটা ধ্বনির আঙ্গিকে।

স্টিনবার্গ তাঁর একপর্যায়ের নাটককে বলতেন 'লাস্ট সোনাটা'; তাঁর 'ঘোস্ট সোনাটা' নাটকে তিনি ত্রিছন্দে বিঠোফেনের ২নং ডি-মাইনর পিয়ানো সোনাটা ব্যবহার করেছেন। আমি যখন ঐ স্বপ্নদৃশ্যটি পর্দায় দেখি তখন আমার মনে হয় এ যেন তারকোভস্কি ও নিকাউটের 'আলোর সোনাটা'। দৃশ্যটি দিনের আলোর টেম্পোতে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে সরে যায় রাতের আলোর টেম্পোতে এবং আবার ফিরে আসে দিনের আলোয়। পুরো দৃশ্যটি মিখাইল লোৎজাইলেস্কির তৈরি আন্দ্রেইয়ের ওপর ডকুমেন্টারিতে রয়েছে। জার্মান টিভি প্রযোজক এবো ডেমান্ট যিনি 'ইন সার্চ অব লাস্ট টাইম' নামে তারকোভস্কির উপর ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন, তিনি ঐ স্বপ্নদৃশ্য দেখে বলেছিলেন, এটাই এ ছবির সবচেয়ে অনুকরণীয় এবং দৈব এক দৃশ্য, এ দৃশ্যে তিনি যেন নিজেরই পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করছেন।

আজ অনেকেই বলেন যে তারকোভস্কি আসলে জানতেন যে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ, এটা সত্য নয়। ১৯৮৫ পর্যন্ত, তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে পর্যন্ত তিনি জানতেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না তিনি কতটুকু অসুস্থ। কিন্তু এর কী ব্যাখ্যা করব আমি? যখন *স্যাক্রিফাইস* ছবিটির অ্যাপিক্যালিপটিক (ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিতপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ) দৃশ্য চিত্রায়িত করা হচ্ছিল তখন ক্যামেরাটি যেখানে বসানো হয়েছিল তার কয়েক মিটার দূরেই তিন মাস পর সুইডিস প্রধানমন্ত্রী ওলাফ পামেকে হত্যা করা হলো।

ইংমার বার্গম্যান তাঁর আত্মজীবনী 'লেটারনা ম্যাজিকা'তে লিখেছেন ডকুমেন্টারি ছাড়া আর সব চলচ্চিত্রই বস্তুত মানুষের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে। সেজন্যই তাঁর কাছে তারকোভস্কি শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্রকার। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্বপ্নের জগতে পদচারণা করেন। তিনি আরো লিখেছেন তারকোভস্কি তাঁর স্বপ্নকে নাটকীয়তা দান করতে পারেন, শিল্পে যা সবচেয়ে কঠিন কাজ। 'সারা জীবনে আমি যে ঘরের দরজায় কেবল কড়া নেড়েছি, সেই ঘরেই তিনি কী আত্মপ্রত্যয়ে, কত নির্দ্বিধায় প্রবেশ করেছেন'—বলেছেন বার্গম্যান। বলেছেন—'আমার কাছে তারকোভস্কি মহত্তম, কারণ তিনিই চলচ্চিত্রের জন্য সঠিক ভাষাটি নির্মাণ করেছেন, যে ভাষা জীবনকে প্রতিবিম্বরূপে ধারণ করে, ধারণ করে স্বপ্নরূপে।'

আমি যখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, অন্যদের সঙ্গে তারকোভস্কির পার্থক্যটা কোথায়, কী তার বৈশিষ্ট্য, আমি তখন আবিষ্কার করি যে তিনিই হলেন একমাত্র চলচ্চিত্রকার যিনি স্বপ্নকে চলচ্চিত্রায়িত করতে পারেন।

তিনি বলতেন, 'তুমি আমার স্বপ্নকে স্বপ্নে দেখবে।' বাস্তবিকই আমরা তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নে দেখি।

কী তাঁকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে তোলে? তাঁর বিস্ময়কর উন্মুক্ততা, অন্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত স্বপ্ন এবং কল্পনাগুলোকে সমবায় করবার প্রবল ইচ্ছা। তিনি তাঁর শিল্পকর্মের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং আন্তরিক। জীবন-অন্বেষায় তিনি ছিলেন শিশুর মতোই পবিত্র এবং বিশ্বস্ত। তিনি এমন সব প্রশ্ন করতে ভয় পেতেন না, যা হয়তো মানুষের জ্ঞানেরও অতীত। অথচ সেগুলো এমন সব প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসিত হওয়া উচিত। সেসব প্রশ্ন আন্তরিকতায়, সাহসে বন্ধনহীন। অনেক পরিচালক নিজেদেরকে তাঁদের চলচ্চিত্র থেকে লুকিয়ে রাখেন, ফলে দর্শকের মন রয়ে যায় তাঁদের নাগালের বাইরে।

তারকোভস্কি বলতেন, 'তোমাকে নিজের মতো হতে হবে। তোমার একথা বলবার সাহস থাকতে হবে যে এই হলাম আমি এবং আমি এরকমই। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ কারণ আমরা সবাই জনপ্রিয় হতে চাই।' তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সৃষ্টিকে অনুকরণ কোরো না, সৃষ্টিকর্তাকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করো। সৃষ্টি করাই শিল্পীর কাজ।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভিনেতাদের সঙ্গে

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়, অভিনেতাদের প্রতি আন্দ্রেইয়ের ব্যবহার কেমন ছিল। অনেকেই মনে করেন তিনি প্রধানত ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করতেন, তা ঠিক নয়। অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি প্রচলিত ধারার না হলেও তাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, অনুরাগ কেবল টেবিলের চারপাশে বসে সংলাপ পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

আন্দ্রেই প্রায়ই বলতেন, ‘চলচ্চিত্র হলো একটা রহস্য, এমনকি পরিচালকের কাছেও তা রহস্য। একটা পূর্ণাঙ্গ সমাপ্ত চলচ্চিত্র সবসময়ই পরিচালকের কাছে একটা ধাঁধা। এজন্যই এটা কৌতূহলোদ্দীপক। চলচ্চিত্র জীবনের মতো, ভালোবাসার মতো। জীবন যেমন রহস্যময় এক পরম বিস্ময়। কেন যে আমরা বেঁচে থাকি আর কেনই বা ভালোবাসি আমরা তা ঠিক করে ব্যাখ্যা করতে পারি না। ঘৃণা কেন করি তা হয়তো অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি কিন্তু কেন ভালোবাসি তা বুঝে উঠতে পারি না। শুধু এটুকু বুঝি যে এ ছাড়া জীবন অর্থহীন।’

আন্দ্রেই নির্দ্বিধায় আলাপ করতেন ভালোবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা, অলৌকিকতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে, এ-ই তাঁর বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমা দেশে মানুষ এসব বিষয়ে আলাপ এড়িয়ে যেতে চায়, তারা বরং আবহাওয়া কিংবা তাদের সম্প্রতি কেনা জিনিসটি নিয়ে আলাপ করতে বেশি পছন্দ করে। আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে তাঁর অভিনেতাদের অদৃশ্য একটা যোগাযোগ ঘটে যেত, অদৃশ্য একটা শাসন বলবৎ থাকত তাদের উপর। তাঁর অভিনেতাগণ ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা তো হতোই না বরং তিনি একধরনের সুবিধা বোধ করতেন। অভিনেতারা সাধারণত তাদের নিজের আয়ত্তাধীন দক্ষ ভঙ্গিতে অভিনয় করতেই পছন্দ করে থাকেন কিন্তু আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে তাদের এ ব্যাপারটা চলত না। আন্দ্রেই অভিনেতাদের কাছ থেকে একটা ষষ্ঠ অনুভূতি দাবি করতেন।

তিনি বলতেন, ‘হয় তুমি তোমার কাজটির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ একাত্ম হও, নয়তো অন্য পরিচালক দ্যাখো।’

দি স্যাক্রিফাইস ছবিটির শুটিং স্পটে কেবল সুইডিশ এবং রুশ ভাষাই শোনা যেত না, শোনা যেত ইংরেজি, ফরাসি, ইটালিয়ান এমনকি আইসল্যান্ডিক। কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা ছিল না। আন্দ্রেই তাঁর অভিনেতাদের সঙ্গে খুব বেশি একটা কথা বলতেন না, তিনি বরং চাইতেন অভিনেতাগণ যেন নিজের অবচেতন মন এবং সহজ প্রবৃত্তির প্রতি অধিক মনোযোগী হন, তিনি চাইতেন তারা সবকিছু গভীরভাবে অনুভব করুক।

তিনি বলতেন, ‘অভিনেতাদের হতে হবে স্পঞ্জের মতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ অভিনেত্রী সুসান ফ্লিটউডকে নিয়ে আমার কিছু স্মৃতি মনে পড়েছে। সুসান, আলেকজান্ডারের স্ত্রী এডেলেইডের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ভূমিকাটি ছিল বেশ দুরূহ। স্বাভাবিকভাবেই সুসান বেশ সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং আন্দ্রেইকে নানাবিধ জটিল প্রশ্ন করে চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট হতে চাইতেন। আন্দ্রেই তাকে ডাকতেন 'আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল' বলে। সুসান ইংরেজ মঞ্চ অভিনয়ে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিনেত্রী। আন্দ্রেই সবসময় আগে থেকে বুঝতে পারতেন তাঁর কোনো অভিনেতা, কখন কী ধরনের সমস্যায় পড়বেন।

আন্দ্রেই আমাকে বলতেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি সুসান মনে-মনে আমাকে বেশ একটা ইন্টেলেকচুয়াল ধরনের প্রশ্ন করতে প্রস্তুত হচ্ছে। ওকে বলো তার চরিত্রটিকে অত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই, ওকে অনুভব করতে হবে, সেটাই আসল।'

তিনি বলতেন, 'এডেলেইড চরিত্রটা আমি সৃষ্টি করেছি। আমি লেখক এবং একই সঙ্গে একজন পুরুষ। তুমি অভিনেত্রী এবং একজন মহিলা। আমার চেয়েও তুমি বেশি জানো ঐ চরিত্রটির কী অনুভূতি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। যদি এক মুহূর্তের জন্যও তোমার উপর আমার সন্দেহ থাকত তাহলে ঐ চরিত্রটিকে আমি তোমার উপর ছেড়ে দিতাম না। আমি জানি ঐ চরিত্রটির প্রতি তুমি সযত্নে সঠিক আচরণটিই করবে।' আমি মনে করি অভিনেতার প্রতি পরিচালকের সবচেয়ে বড় সৌজন্য তাকে বিশ্বাস করা।

তিনি বলতেন, 'তাদের জানিয়ে দিন আমি তাদের একশো একভাগ বিশ্বাস করি।'

এজন্যই অভিনেতা নির্বাচন আন্দ্রেই এবং তাঁর দলের জন্য ছিল সবচেয়ে জটিল এবং কষ্টকর একটা কাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজারখানেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি আমাদের দেখতে হয়েছে এবং আলাপ করতে হয়েছে ডজনখানেকের সঙ্গে।

আন্দ্রেই তাঁর অভিনেতাদের বলতেন, 'আপনার এবং আমার মধ্যে একটা রহস্য থাকা প্রয়োজন। আপনার এমন মনে করা চলবে না যে পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অভিনেতাকে সবসময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হবে। সবকিছু তার কাছে অপ্রত্যাশিত, অদেখা, উত্তেজনাকর হতে হবে, তার অবস্থাটা হবে ঠিক একজন প্রেমিকের মতো।'

তিনি অভিনেতাদের কখনো পুরো চিত্রনাট্যটি শোনাতেন না।

বলতেন, 'শেষ দৃশ্যে আপনি যে মারা যাচ্ছেন সেকথা যদি আপনি প্রথম দৃশ্য থেকেই জেনে যান তাহলে কী করে আর আপনার পক্ষে আন্তরিক অভিনয় সম্ভব? প্রথম এবং শেষ দৃশ্যের মাঝের অভিনয়টা হবে ফাঁকি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলচ্চিত্র, রত্নদ্বীপ

আন্দ্রেই বলতেন, 'শুটিং করাটা আমার কাছে একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। আমি পছন্দ করি নতুন ছবি আবিষ্কার করতে, চিত্রনাট্য নিয়ে ভাবতে, লোকেশন খুঁজতে।' শুটিঙের সময় তিনি বলতেন, 'এসব বাদ দিয়ে আমি যদি তাসমানির কোনো ফুলের বাগানের মালি হতাম, তাও বরং ভালো হতো।'

বলতেন, 'পরিচালক হলো দর্জির মতো। নতুন একটা পোশাকের কথা চিন্তা করা, নতুন কোনো স্টাইল নিয়ে ভাবা, সেটা আঁকা, এর রঙ, উপাদান ঠিক করা, সেটাকে কাটা, তার সঙ্গে মিলিয়ে হ্যাট, জুতা, গ্লাভস, বুচ, ফুল নির্বাচন করা বেশ উত্তেজনাকর একটা কাজ। কিন্তু বসে বসে বোতাম লাগানো, ভাঁজগুলো সেলাই করা, মার দেয়া এগুলো খুব ক্লান্তিকর। ছবির শুটিং-পর্বটা বোতাম লাগানোর মতোই দর্জির কাজ।'

ছেলেবেলায় একবার তিনি 'বাখ' হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন দ্বিতীয় আর একজন 'বাখ' হওয়া যায় না তখন তিনি হতাশ হয়ে একজন সুরকার হতে চাইলেন, তারপর হতে চাইলেন চলচ্চিত্রকার।

আবার শুটিঙের সময় তিনি হতে চাইলেন ফুলবাগানের মালি। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, 'আপনি যদি মালি হতেন তাহলে দেখা যেত ছ' মাস কি এক বছর পরই আপনার আবার ছবি তৈরি করতে ইচ্ছা হতো।'

তিনি বলতেন ছ'মাস বলছ কেন, 'ইচ্ছে হতো এর আগেই।'

আসলে তিনি চলচ্চিত্রের প্রেমে মত্ত থাকতেন, থাকতেন মোহগ্রস্ত। চলচ্চিত্র পরিচালনা তাঁর কাছে নেহাত একটা কাজ কিংবা পেশা ছিল না, এটাই ছিল তাঁর জীবন।

আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল প্যারিসে। আমি, নিকভিস্ট, আনা লেনা যখন প্যারিসে গেলাম তখন আন্দ্রেই তাঁর বিছানা থেকে উঠে বসতে পারেন না। আমরা *স্যাক্রিফাইস* ছবির সমাপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ কপিটি তাঁকে দেখাতে এনেছিলাম।

পর্দায় যেইমাত্র ছবি দেখা গেল চঞ্চল হয়ে উঠলেন আন্দ্রেই। মুহূর্তে একজন মৃত্যুপথযাত্রী শয্যাশায়ী রোগী আবেগপ্রবণ, অস্থির হয়ে উঠলেন। ছবি দেখে আমাদের নানারকম নতুন নির্দেশ, উপদেশ, মতামত দিতে লাগলেন। আমাদের কাছে কেমন অচেনা লাগছিল তাঁকে, শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

ফরাসি ডকুমেন্টারি নির্মাতা ক্রিস মার্কার আমাদের এই পর্বটি চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। আমি জানি না তিনি একজন মরণাপন্ন লোকের ক্রমে প্রাণবন্ত, আশাবাদী, আত্মপ্রত্যয়ী একজন মানুষের রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটিকে ধারণ করতে পেরেছেন কি না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দ্রেই উজ্জ্বল রঙের একটা রুমাল বেঁধেছিলেন মাথায়। ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আমাকে বেশ একজন জলদস্যুর মতো দেখাচ্ছে, তাই না?'

সত্যিই তাঁকে এক রত্নদ্বীপসন্ধানী জলদস্যুর মতোই দেখাচ্ছিল, যার রত্নদ্বীপ ঐ চলচ্চিত্র। আন্দ্রেই তাঁর ছেলে আন্দ্রেওশাকে ডাকলেন, বিছানার পাশে তাকে বসিয়ে হাত চেপে ধরলেন তাঁর।

আন্দ্রেওশা ছবিটা দেখেছিল প্রথমবারের মতো। দেখছিলাম বিছানার উপর করুণ এক যুগল, স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, অচেনা দেশে। আন্দ্রেওশা নিশ্চল তাকিয়ে ছিল পর্দার দিকে, বুঝতে পাচ্ছিল না কিছুই। আমরা সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। মর্মস্পর্শী এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল সেখানে। চলচ্চিত্রনির্মাতা মৃত্যুপথযাত্রী বাবা, তাঁর পুত্রকে উপহার দিচ্ছেন তাঁর সৃষ্টি, তাঁর চলচ্চিত্র। ছেলেকেই তিনি উৎসর্গ করেছেন চলচ্চিত্রটি।

আমার মনে হচ্ছিল, এ যেন হেমলক পানের পর সক্রেটিসের অন্তিমলগ্নের সেই দৃশ্য, চারিদিকে তার বিষণ্ন, বেদনায় ম্লান শিষ্যরা বসে, সক্রেটিস বলে চলেছেন শুভবোধ আর নৈতিকতার কথা, শাশ্বত সত্য আর মানবিক কল্যাণের কথা; ক্রমে বিষে নীল হয়ে আসছে তার শরীর, তিনি জানাচ্ছেন সে অনুভবের কথাও।

শেষবারের মতো আমি আন্দ্রেইকে দেখি ১৯৮৬-এর ১৯ মার্চ। সেসময়টায় তিনি হঠাৎ এতটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন যে আমরা বেশ কিছুদূর হেঁটেও বেড়ালাম। আন্দ্রেইয়ের ফরাসি প্রযোজক আনাতোলে ডম্যানের একটা প্রাক-প্রদর্শনীর আমন্ত্রণে এসেছিলেন তিনি। উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে, ঠাট্টা করছিলেন, কথা বলছিলেন। অনেক সমস্যা সত্ত্বেও ঐ সময়টাই তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুখী, নিশ্চিন্ত।

বলেছিলেন, 'আন্দ্রেওশার ঐ জাদুর দ্বীপটা দেখা উচিত। কী যে ছেলেটা আমার, ওর সুইডেন দেখা উচিত, বিশেষ করে গটল্যান্ড। ওর হেলসিংকিও দেখা উচিত, হেমলেটের জন্মস্থান।'

বিশ্বাস করা হোক বা না হোক সব দেশেরই নিজস্ব কিছু সংস্কার থাকে। রাশিয়ায় বলা হয় ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিদায় জানানো অশুভ। আমি যখন আন্দ্রেইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ দুজনেই আমরা একসঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে আমরা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। দুজনেই হেসে উঠলাম একসঙ্গে এবং একসঙ্গে কোরাসেই বলে উঠলাম, 'আমরা বুড়োদের মতো হয়ে গেলাম। অবশ্যই আমাদের আবার দেখা হবে, আমরা কুসংস্কার মানি না।'

'নিশ্চয়ই দেখা হবে আবার।' আমি পুনরায় বললাম কিন্তু অজানা এক বিষণ্নতায় ছেয়ে রইল আমার মন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দ্রেইয়ের মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়। তাঁর এক বন্ধু আমাকে তাঁর ক্লিনিকের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে ক্লিনিকের কর্তব্যরত নার্সটি আমাকে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল আমার জীবনের একাধারে সবচেয়ে অদ্ভুত, ট্র্যাজিক, বিষণ্ন এবং সবচেয়ে আন্তরিক একটা কথোপকথন।

আমি তাঁর কণ্ঠ চিনতে পারছিলাম না, কেবল তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিই ছিল আগের মতো। তিনি বলছিলেন, 'কিছুতেই আর মনোযোগ দিতে পারছি না, স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলছি, যেন এক কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে বাস করছি।'

আমি তাঁকে কী এক আনন্দের কথা যেন শোনাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কথাগুলো কেমন অর্থহীন, বেখাপ্পা, বেমানান শোনাচ্ছিল।

আন্দ্রেই বলছিলেন, 'গটল্যান্ড দ্বীপের ঐ চমৎকার স্ট্রবেরিগুলোর কথা মনে আছে তোমার? আচ্ছা ওগুলো কি বার্গম্যানের ছবির ঐ একই স্ট্রবেরি? তুমি কি জিজ্ঞাসা করেছ তাঁকে?'

আমি মনে-মনে দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁর হাসিমুখ, গত গ্রীষ্মের স্মৃতিচারণ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন তিনি।

'দেখা করতে এসো ' এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

তারকোভ্স্কি যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন তখন যেন ঈশ্বরাবিষ্ট থাকতেন এবং তাঁর চলচ্চিত্রকে তিনি একটা পবিত্র অর্ঘ্যের মতো নিবেদন করতেন দর্শকের সামনে।

এ আমার সৌভাগ্য যে একজন মহান শিল্পী এবং মহান আত্মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। অন্তহীন ভালোবাসায় আর কৃতজ্ঞতায় প্রণাম জানাই আন্দ্রেই তারকোভ্স্কিকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জেমস ন্যাক্টওয়ে

বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত এবং সম্মানিত ফটোগ্রাফার জেমস ন্যাক্টওয়ের জন্ম ১৯৪৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে। বিশেষ করে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, খরা বিষয়ক আলোকচিত্রকে তিনি এক অনন্যসাধারণ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে তিনি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন মানবতার চরম দুর্ভোগের মুহূর্তগুলো। তিনি দীর্ঘদিন *টাইম ম্যাগাজিন*-এর ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন। নানা দেশে অগণিতবার তার আলোকচিত্রেরও প্রদর্শনী হয়েছে, আলোকচিত্রের ওপর রয়েছে তাঁর একাধিক বই। তিনি আলোকচিত্রের জন্য মোট পাঁচবার 'রবার্ট কাপা' স্বর্ণপদক পেয়েছেন, যা এর আগে কোনো আলোকচিত্রী পাননি। ২০০০ সালে প্রকাশিত তাঁর *ইনফার্নো* বইটি বহুল আলোচিত। *ইনফার্নো* বইটির ওপর ভিত্তি করে ন্যাক্টওয়ের সাক্ষাৎকার নেন ডগলাস ক্রুকস্যাক। সাক্ষাৎকারটি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল *কাউন্টার ফটো* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ২০০৪-এ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নরকে ভ্রমণ

ফটোজার্নালিস্ট জেমস ন্যাক্টওয়ের সাম্প্রতিক বই *ইনফার্নো* যথার্থ অর্থেই ঢাউস (১১ বাই ১৫ ইঞ্চি, সোয়া দুই ইঞ্চি মোটা) এবং ভারী। ১২৫ ডলার দামের বইটি কালো কাপড়ে মোড়ানো, যার ৪৮০ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে বিশাল, জাজ্বল্যমান, অসাধারণ ৩৮২টি শাদা-কালো আলোকচিত্র। বলা বাহুল্য, এগুলোর কোনোটিই কথিত অর্থে দৃষ্টিনন্দন নয়। বরং এ যেন জনৈক গাইডের তত্ত্বাবধায়নে নরক-ভ্রমণ করে আসা—অন্তত গত বছর-দশেকের নরক যা তৈরি হয়েছে রুমানিয়া, সোমালিয়া, ভারত, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, জায়ার, চেচনিয়া এবং কসভোয়।

বইটি শুরু হয়েছে দান্তের *ইনফার্নোর* সেই এপিটাফ দিয়ে, 'চলো, তোমাদের এক বিষাদাচ্ছন্ন নগরে নিয়ে যাই, চলো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে।' তারপর সন্ত লুকের চমৎকার এবং সংক্ষিপ্ত একটা ভূমিকা পেরিয়ে আমরা ন্যাক্টওয়ের সঙ্গে ঢুকে পড়ি *ইনফার্নোর* বিভীষিকাময় অভিযানে। ছবিগুলো বাস্তবিকই হৃদয়বিদারক, অদ্ভুত, অসাধারণ। যাবতীয় দুঃসংবাদের সমাহার এ বইটি।

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় ন্যাক্টওয়ের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলাপ করি তাঁর *ইনফার্নো* সম্পর্কে, জানতে চাই মানবিক দুর্দশার এই দলিল রচনার অভিজ্ঞতাকে। তিনি সেইসব বিরল মানুষদের একজন, যিনি তাঁর কাজের বাইরে ব্যক্তিগত বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে আগ্রহী নন। রীতিমতো মিশনারিদের স্পৃহা নিয়ে তাঁর যাবতীয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে তাঁর কাজে। 'আমি চাই না, লোকে আমার ব্যাপারে কৌতূহলী হোক। বরং চাই তারা কৌতূহলী হোক আমার ছবির চরিত্রগুলোর ব্যাপারে'—তিনি বলছিলেন। শুরু হলো আমাদের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব।

প্রশ্ন শুরুতে বইটিকে নিরেট বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা যাক। আপনি বলেছেন যে বইয়ের অধিকাংশ ছবি আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রকাশিত, যেমন *টাইম*। এখন এগুলো মোড়কবন্দি হয়েছে এই প্রকাণ্ড, অভিজাত, ব্যয়বহুল, কফি টেবিল বইয়ে। ফটো-সাংবাদিকতার এই ইমেজগুলোকে এভাবে উপস্থাপন করা কি সর্বসাধারণের জন্য এগুলোকে যতটা সম্ভব সহজলভ্য করার আপনার যে প্রাথমিক পরিকল্পনা, তার বিরোধী নয়?

উত্তর মোটেও না। এই ছবিগুলোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাগুলো যখন ঘটেছে তখন এগুলোকে বহুলপ্রচারিত পত্রপত্রিকায় ছাপানো। আমি চেয়েছি এই ছবিগুলো মানুষের প্রাত্যহিক আলাপের অংশ হয়ে উঠুক, এ ছবিগুলো মানুষকে সচেতন করুক, জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখুক এবং এ অবস্থা পরিবর্তনে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করুক। আর এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এগুলো একটা আর্কাইভ হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উঠুক, এগুলো স্থান করে নিক মানুষের যৌথ স্মৃতিতে, যাতে মানুষ কোনোদিনই এসব ঘটনা ভুলে না যায়। *ইনফার্নো* বইটি প্রকাশের উদ্দেশ্য এই দ্বিতীয়টি। দর্শককে একটা নির্মম বাস্তবতার মধ্যে নিমজ্জিত করা এই বইটির উদ্দেশ্য। দর্শকের ওপর বইটির একটা বস্তুগত প্রভাবও পড়ুক, আমরা তা চাইছিলাম; যে কারণে বইটির এই বিশাল আকার করা হয়েছে। বইটি সত্যিই বিদঘুটে। এটাকে নিয়ে রীতিমতো মুশকিলে পড়তে হয়, ঠিক কোথাও রাখা যায় না। বইটির আকার ইত্যাদি নিয়ে আমরা বিস্তর আলাপ করছি। আমরা ছবিগুলো নিয়ে ছোটখাটো, শস্তা কোনো বই করতে চাইনি, যা চাইলেই আপনি ভুলে যেতে পারবেন, ছুড়ে ফেলে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন : ছবিগুলো দেখলে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর ওপর গড়ে তোলা নরক। গত এক দশক ধরে পৃথিবীর মানুষের ওপর যে বীভৎস বিপর্যয়গুলো ঘটে গেছে, এগুলো তারই দলিল। আমি এই ক্যামেরার পেছনের মানুষটির কথাও ভাবছিলাম—অর্থাৎ আপনি। ভাবছিলাম ছবিগুলোকে আমরা যদিও শাদা-কালোতে দেখছি, আপনি তো দেখেছেন রঙিন। যাদের ছবি আপনি তুলেছেন তাদের ভয়াবহ দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন করা সমীচীন কি না জানি না, তবু জানতে ইচ্ছে করে এ ছবিগুলো তুলতে কেমন লেগেছে আপনার?

উত্তর আপনি ঠিক বলেছেন, এ ছবি তুলতে গিয়ে আমাকে যা সহ্য করতে হয়েছে তা যাদের ছবি আমি তুলেছি তাদের যা-কিছু সহ্য করতে হয়েছে তার তুলনায় নেহাতই নগণ্য। আমার কেমন লেগেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন কেন নয়?

উত্তর কারণ আমি নেহাত সংবাদবাহক মাত্র। আমি চাই না, লোকে আমার ব্যাপারে কৌতূহলী হোক। আমি চাই লোকে আমার ছবির ভেতরের মানুষগুলোর ব্যাপারে কৌতূহলী হোক। ক্যামেরা বিষয়ে যা-কিছু জ্ঞান, তাকে ব্যবহার করতে চাই সেইসব মানুষের সেবায়, যাদের ছবি আমি তুলেছি। আমি চাই না এমন কোনো ছবি তুলতে, যা দেখে মানুষ বলবে, 'কী চমৎকার একটা ছবি' কিংবা, 'কী দারুণ কম্পোজিশন'। আমি চাই আমার ছবির মানুষগুলোর জীবনে যা ঘটেছে তা দর্শকের মনে একটা শক্তিশালী আবেগজাত, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুক। আমার অবস্থান এখানে স্বচ্ছ।

প্রশ্ন ঐসব নৃশংস পরিস্থিতির মধ্যে বারবার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটিকে আপনি কী করে সামাল দেন?

উত্তর একটা ল[illegible] থাকলে তা [illegible] যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন সেই লক্ষ্যের বোধ আপনি কী করে অর্জন করলেন?

উত্তর ব্যাপার হচ্ছে, প্রথমত, এ ধরনের কাজ করার জন্যই, যুদ্ধের ছবি তোলার জন্যই। এই সংগ্রাম এবং সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যই আমি ফটোগ্রাফার হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছে, এটাই আমার জন্য যথার্থ কাজ। আমার কাছে ফটোগ্রাফি নিছক ফটোগ্রাফির জন্য নয়, এটা সামাজিক সচেতনতার একটা মাধ্যম। আর এর মাধ্যমেই আমার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পরিতৃপ্ত হয়।

প্রশ্ন সম্পাদকের কাছ থেকে কখনো বাধা পেয়েছেন? কোনো সম্পাদক কি কখনো বলেছেন, 'এ ছবিটা অতিমাত্রায় বীভৎস, এ ছাপানো যাবে না।'

উত্তর আমি যে সম্পাদকের সঙ্গে কাজ করেছি তারা কেউই আমার ছবি ফিরিয়ে দেননি। একটা ঘটনাকে আমি যেভাবে উপস্থাপন করেছি এর বাইরে কেউ আমাকে অন্য কোনো অনুরোধ করেননি। তবে আপনি যা বলবেন তা বিবেচনার দাবি রাখে; মানুষ আমাকে কতটুকু নিতে পারে? কতটুকু সহ্য করতে পারে মানুষ? মানুষকে কৃতিত্ব দিতেই হয় কারণ মানুষ এই কঠিন সত্য, এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পেরেছে এবং এর একটা ন্যায্য, কার্যকরী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পেরেছে। আমি মনে করি, ধারণা ভুল যে পৃথিবীতে সত্যিকার যা হচ্ছে মানুষ তাঁর মুখোমুখি হতে পারে না। মানুষ ঠিকই পারে। আমি মনে করি, মানুষ জানতে চায়। মানুষ অবিশ্বাস্যরকম বেদনাদায়ক, গভীরভাবে ট্র্যাজিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চায়। অতিসাধারণ, দেখতে সহজ ইমেজ ছাপালে বরং তা ভুল বার্তা দেয়। তা নেহাত এক নকশায় পরিণত হয়। পৃথিবীর কোথাও যদি এমন বাজে কিছু ঘটতে থাকে, যা বস্তুত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, তাহলে তাকে ক্ষোভ এবং বেদনার সঙ্গেই প্রচার করা উচিত, যা মানুষের ওপর একটা প্রভাব ফেলবে, তাদের নাড়া দেবে, ক্ষুব্ধ করবে এবং জাগিয়ে তুলবে তাদের আটপৌরে জীবন থেকে। পৃথিবীতে কোথাও যদি ক্ষমার অযোগ্য কিছু ঘটতে থাকে, তাহলে মানুষের তা জানা উচিত, এ নিয়ে ভাবা উচিত এবং পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করা উচিত।

আলোকচিত্রের নান্দনিকতা

প্রশ্ন আপনি নিজেকে শিল্পীর চাইতে ফটোজার্নালিস্ট ভাবতেই বেশি পছন্দ করেন। আপনি চান না, লোকে আপনার ছবি দেখে বলুক, বাহ্, কী চমৎকার কম্পোজিশন!

উত্তর হ্যাঁ, ঠিক।

প্রশ্ন : তবুও আপনার বই ওলটাতে ওলটাতে আমি অনেক জায়গায় থমকে গেছি ছবিটির অপরূপতায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই সম্বিত পেয়ে মনে হয়েছে যে আমি তো আসলে একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুঃস্বপ্নের ছবি দেখছি। যেমন রুয়ান্ডায় তোলা আপনার ছবিটি। ছবিটিতে প্রথম যা আমার চোখে পড়ে, তা হলো হৃৎপিণ্ডের আকারে প্রকাণ্ড গাছের পাতাগুলো। এ যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ যা আসতে পারত উয়েন বুলক, অ্যাডওয়ার্ড ওয়েস্টন বা এলিয়ট পোর্টারের ক্যামেরা থেকে—এই ছিল আমার প্রথম অনুভূতি। কিন্তু তারপর আমি দেখি সেই অপরূপ গাছটির নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা লাশ।

উত্তর : ট্র্যাজিক মুহূর্তমাত্রই যে অসুন্দর তা ঠিক নয়, জীবনের অসংখ্য স্ববিরোধিতার এটাও একটা, যা শিল্পসাহিত্যের অন্যতম একটা থিম। সম্ভবত এজন্যই ইমেজগুলো মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আমি মানুষে মানুষে পারস্পারিক সম্পর্কের নান্দনিক মুহূর্তগুলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করি। আপনি যদি বইটির ছবিগুলো দেখেন, তাহলে দেখবেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার ইমেজ, তারা একজন আরেকজনকে আলিঙ্গন করছে, একজন আরেকজনকে ভালোবাসায় স্পর্শ করছে, এভাবেই একটা চরম দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে তারা ফুটিয়ে তুলছে মানবিক সৌন্দর্য। *ইনফার্নো* বইটির এইটাই হচ্ছে আশার দিক। নিজের দুঃখকে অতিক্রম করে অন্যের দিকে হাত বাড়ানোর এই ইমেজ আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন একটা ছবির কথা মনে পড়ছে, সম্ভবত ছবিটি আপনি রুমানিয়ার এতিমখানায় তুলেছিলেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা শিশু তার চেয়ে সামান্য বড় আরেকটা শিশুকে বাটি থেকে তুলে খাওয়াচ্ছে।

উত্তর হ্যাঁ, আমি রুমানিয়ার একটা এতিমখানায় গিয়েছিলাম, যেখানে বাচ্চাদের অমানবিক অবস্থায় রাখা হয়েছে। অনেক বাচ্চার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না, একই বিছানায় কয়েকজন বাচ্চা একসঙ্গে থাকত, প্রস্রাব-পায়খানায় মাখামাখি করে। ওদের দেখাশোনা করবার জন্য কোনো লোক ছিল না, যারা ছিল তাদেরকে নেহাত বাচ্চাদের পাহারাদার বলা যেতে পারে। সংখ্যায় তারা খুবই কম।

ফলে বলতে গেলে বাচ্চারাই বাচ্চাদের দেখাশোনা করত। আপনি যে বাচ্চাটির কথা বলছেন, ছোটটির একটা বড় ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছিল; ওর হাঁটুটা উল্টোদিকে ঘোরানো, ফলে সে তার পা ব্যবহার করতে পারত না, হাঁটত হাতের উপর ভর দিয়ে। কিন্তু ছেলেটা ছিল ভীষণ চটপটে আর প্রাণচঞ্চল। সে ঐ এতিমখানার অন্য ছেলেমেয়েদের, যাদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ তাদের দেখাশোনা করত। ওদের খাইয়ে দিত।

প্রশ্ন : আমি জানি যে আপনি নিজ উদ্যোগে রুমানিয়ায় গিয়েছিলেন এবং ঐ প্রজেক্টটি করেছিলেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তর তা ঠিক।

প্রশ্ন আপনি এ ব্যাপারে খোঁজ পেলেন কী করে?

উত্তর ১৯৯৮ সালে চসেস্কুর পতনের পর এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে বেশকিছু প্রাথমিক রিপোর্ট ছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তসঞ্চালনের কারণে এতিমখানার বাচ্চাদের এইডস-এ আক্রান্ত হবার ঘটনা নিয়ে বেশকিছু সাংবাদিক রিপোর্ট করেছিলেন। ভয়াবহ সেসব রিপোর্ট! চসেস্কুর পতনের ঠিক পরপর রুমানিয়ায় যাওয়ার একটা সুযোগ ছিল। কদিনের জন্য সেখানে সরকার বলে কিছু ছিল না, কোনো জবাবদিহিতা ছিল না, গোপন পুলিশের লোকেরা নিজেরাই সব লুকিয়ে ছিল। ফলে কিছু সময়ের জন্য বেশ একটা মুক্ত অবস্থা ছিল, যখন একজন সাংবাদিক হিসেবে দেশটার ভেতরে ঢুকে স্বৈরশাসনের উত্তরাধিকার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ছিল। আমি এ ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলাম, বিশেষ করে এইডস মহামারীর ব্যাপারে।

আমি রুমানিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সারা দেশজুড়েই ছোট ছোট দ্বীপের মতো এইসব ভয়াবহ এতিমখানাগুলোকে খুঁজে পাই। এগুলো স্বাভাবিক বাচ্চাদের এতিমখানা নয় বরং যেসব বাচ্চাকে শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী মনে করা হতো, তাদেরই ঐ বিদঘুটে জায়গায় রাখা হয়েছিল। আমি বেশ সহজেই তখন এসব এতিমখানায় ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি এমন সব জিনিস দেখছি, যা অধিকাংশ রুমানিয়ানরাও জানত না।

প্রশ্ন বইটিতে সোমালিয়ায় তোলা একটা ছবি রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন লোক একটা পাত্র থেকে পানি নিয়ে টাইলস ফ্লোরে শোয়া আরেক হাড়-জিরজিরে মানুষকে ধুয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এ ছবিটা সম্পর্কে বলুন।

উত্তর ওটা একটা মৃতদেহকে গোসল করানোর ছবি। সোমালিয়া মুসলিম রাষ্ট্র। দেশের চরম বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যেও লোকেরা তাদের ধর্মীয় আচারগুলো পালন করে গেছে। দুর্ভিক্ষে মৃতদের এক জায়গায় আনা হতো, যেখানে কিছু স্বেচ্ছাসেবী স্থানীয় লোক মৃতকে গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে নিয়ে যেত গণকবরে।

প্রশ্ন আপনি যে এসব ছবি তুলেছিলেন কেউ কি বাধা দিয়েছিল, প্রতিবাদ করেছিল?

উত্তর না। আসলে *ইনফার্নো*র সব ছবিই খুব কাছ থেকে তোলা। আমার ছবির যারা বিষয়, তাদের ঘনিষ্ঠ পরিবেশেই আমি ছবি তুলতে পছন্দ করি। স্থানীয় লোকজনের অনুমোদন ছাড়া এসব ছবি তোলা কিছুতেই সম্ভব হতো না আমার পক্ষে।

প্রশ্ন স্থানীয় লোকের এই গ্রহণযোগ্যতা আপনি কীভাবে অর্জন করেছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তর : আমি যখন মানুষের মধ্যে যাই, আমি তাদের সমীহ করি, শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি। আমি আমার ভাবভঙ্গি, কথা বলা, ক্যামেরা ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। তারা যে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার যে সমবেদনা আছে এবং আমি যে তাদের সম্মান করি, সেটা যাতে তারা বুঝতে পারেন, সে ব্যাপারে আমি সচেতন থাকি। তাছাড়া আমি যেখানে যাই, সেখানে লোকে বোঝে যে আমি তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব, তাদের কথা পৌঁছে দেব বহির্বিশ্বে, যা অন্যভাবে তারা পারত না। ফলে তারা এই ছবির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং অংশগ্রহণ ছাড়া এসব ছবি কিছুতেই তুলতে পারতাম না।

প্রশ্ন আরেকটা দুর্দান্ত ছবি আছে বসনিয়ার। দেখা যাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে, সামনে দুজন মানুষ সম্ভবত একটা মৃতদেহ নিয়ে কিছু একটা করছে। আপনি যখন ছবিটি তুলছিলেন কী হচ্ছিল সেখানে?

উত্তর ভেঙে যাওয়া স্তম্ভটি আসলে সার্বিয়ান শেলিংয়ে ধসে পড়া একটা মসজিদের মিনার। বসনিয়া যুদ্ধের একটা প্রধান কেন্দ্র ব্রেকো শহরের একটা গ্রামের ছবি এটা। মৃত মানুষটি এই গ্রামের একজন সৈন্য। বসনিয়াও মুসলিম দেশ। ভ্রাম্যমাণ মর্গের মাধ্যমে তাকে গ্রামে এনে ঐ মসজিদের সামনে রাখা হয়েছিল, কবর দেবার আগে গোসল করাবার জন্য। আমি ঐ গ্রামে সপ্তাহ দুই ছিলাম এবং সেসময় ঘটে যাওয়া গ্রামের সব ঘটনার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রায় প্রতিদিন কোনো-না-কোনো মৃতদেহ আসত সেখানে এবং গ্রামের লোকেরা জড়ো হতো যুদ্ধে মৃত তাদের আত্মীয়-পরিজনকে চিহ্নিত করতে। ধীরে ধীরে ঐ গ্রামের তরুণ প্রজন্ম একরকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : কাজ করতে গিয়ে আপনি কি কখনো কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছেন বা আঘাত পেয়েছেন?

উত্তর বারকয়েক সামান্য আঘাত পেয়েছি। সব ক্ষেত্রেই আমি খুবই সৌভাগ্যবান ছিলাম। ভয়ঙ্কর আঘাত হতে পারত এবং কয়েক ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুরও আশঙ্কা ছিল। এযাবৎ ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনি ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরা নামিয়ে বরং জড়িয়ে পড়েছেন আপনার সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনায়?

উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। তবে প্রায়ই, যেমন—একজন আহত সৈনিকের ক্ষেত্রে যখন তাঁর বাহিনী বা দলের লোকই সাহায্য করছে, সেখানে আমার সাহায্যটি বাহুল্য। আমার কাজ ঘটনাটি রেকর্ড করা এবং প্রচার করা। মূলত সেখানেই আমি আমার ভূমিকাকে সীমিত রাখি। তবে যেখানে এমন পরিস্থিতি হয় যে, আমি ছাড়া সাহায্য করবার আর কেউ নেই কিংবা যেখানে একজন আহতকে নিরাপদ জায়গায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেবার মতো যথেষ্ট লোক নেই, সেখানে অবশ্যই আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। একবার হাইতিতে আরেকবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি ক্ষিপ্ত ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন মানুষকে বাঁচিয়েছিলাম। ভিড়ের লোকেরা ওদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। ইন্দোনেশিয়ায়ও একবার এমন একজনকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি, লোকে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। যখন আমি নিশ্চিত হই যে আমার কোনো একটা চেষ্টা ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, আমি তখন আমার ক্যামেরা নামিয়ে রাখি।

প্রশ্ন বইটির সবচেয়ে বীভৎস ছবিগুলো রুয়ান্ডার ১৯৯৪-এর গণহত্যার সময় তোলা। একটা ছবি, যেটা সম্ভবত সেই চার্চে তোলা, যেখানে গ্রামবাসী গণহত্যায় মৃতদের দেহাবশেষ রেখেছে স্মারক হিসেবে। এই ছবিটিতে চার্চের সামনে একটা কঙ্কালসার দেহ দেখা যাচ্ছে, যার ঠিক উপরেই যিশুর মূর্তি।

উত্তর হ্যাঁ, ওটা তাঞ্জেনিয়ার সীমান্তে নায়ারাবুইয়ের একটা চার্চ। তখনো চার্চটি স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। যুদ্ধও আসলে তখন শেষ হয়নি। ফলে সমাধি বা স্মারকের ব্যাপারে তখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আমার ধারণা, এরপর থেকেই চার্চটি একটা সমাধিস্থল হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

প্রশ্ন মৃতদেহ ঠাসা রুয়ান্ডার ঐ চার্চের মতো জায়গায় যখন আপনি যান, তখন কী ঘটতে থাকে আপনার মনে? ঐ নারকীয় দৃশ্যের মধ্যে আপনি উপস্থিত হন, ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করেন এবং ছবি তুলতে শুরু করেন। ঐরকম একটা পরিস্থিতিতে কী করে আপনি সক্রিয় থাকেন? আমরা অনেকেই হয়তো ঐ পরিস্থিতিতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতাম, ভেঙে পড়তাম।

উত্তর আমার কাজ এক জায়গায় গিয়ে সেখানে ভেঙে পড়া নয়। আমি যদি কোনো ইমার্জেন্সি রুমের ডাক্তার হতাম, তাহলে আমি হয়তো মুষড়ে পরতাম। বাঁচা গেছে যে সে-ধরনের কাজ করার মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক জগতে আছে। আমি আমার রাগ, ক্ষোভ, অবিশ্বাস, হতাশাকে আমার কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, ওটাই আমার প্রশিক্ষণ। আবেগ যদি আমাকে পঙ্গু করে দেয়, তাহলে তো আমার সেখানে যাওয়াই উচিত নয়, কারণ তা হবে অর্থহীন। আমি সেখানে যাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে এবং আবেগকে ব্যবহার করি আমার ছবিতে।

প্রশ্ন : কিছু কিছু ছবিকে মনে হয় একেবারে বাইবেলীয়, একেবারে ধ্রুপদী ধর্মীয় চিত্রকলা যেন। যেমন জায়ারে তোলা গণকবরের ছবিটি। স্তূপীকৃত হয়ে আছে মৃতদেহ, তাদের ঢেকে আছে ধুলা-ময়লা, দেখতে অগুস্ত রঁদার 'গেট অব হেল' বা সিস্টিন চাপেলের ছাদের ম্যুরালের মতো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তর হ্যাঁ, ওটি জায়ারের একটা গণকবর, যেখানে লোকে এত দ্রুত কলেরায় মারা যাচ্ছিল যে, তাদের বুলডোজার দিয়ে এভাবে গণকবর দিতে হয়েছিল। আমার কাছে ওটা বাস্তবিকই ছিল নরকের দরজা। নরকেরই বাসিন্দা হয়ে উঠেছিল তারা।

প্রশ্ন ওটাকে নরকে ঢুকবার দরজার চেয়ে, নরক থেকে বেরিয়ে আসবার দরজা বলাই সমীচীন।

উত্তর তা ঠিক। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে শুধু আমার নয়, আমার অন্য সহকর্মীদের ছবিগুলোর সঙ্গেও আছে ধ্রুপদী বা বাইবেলীয় মোটিফের মিল। মা মৃত শিশুর জন্য কাঁদছে, গণকবর বা একজন আহত মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যজন-- এসব ইমেজের সঙ্গে কখনো মিল আছে রঁদার গেট অব হেল বা ক্রুশ থেকে নামানোর ধর্মীয় ইমেজের। কেউ যদি ভাবে যে আমরা ধ্রুপদী চিত্রকলার সঙ্গে মিলিয়ে ওসব ছবি তুলেছি তাহলে তা হবে অদ্ভুত, অযৌক্তিক ভাবনা। আসল ব্যাপার হচ্ছে সেইসব রেনেসাঁ বা ধ্রুপদী চিত্রকর বা ভাস্করগণ বাস্তব জীবন থেকেই ওসব শিল্পকর্ম করেছেন। একজন মৃত শিশুর জন্য একজন মা যেভাবে কাঁদে, তা চিরন্তন। বাস্তব জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ইমেজই তার পরে ব্যবহার করেছেন বাইবেল বা ধ্রুপদী প্রেক্ষাপটে। অতীতের সেইসব শিল্পী যা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমার বিশ্বাস, আমরা সেই একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি এখন। এগুলো সবই জীবনের চিরন্তন প্রতীক। আমি মনে করি, এইসব ইমেজকে ধ্রুপদী বা বাইবেলীয় স্বর্গীয় দৃশ্য হিসেবে এঁকে সেই শিল্পীরা বস্তুত এই মর্তের সাধারণ মানুষের জীবনকেই মহত্ত্ব দিয়েছেন।

সাংবাদিকতা না শিল্পকলা?

প্রশ্ন একটু আগে আমরা যে বিষয়টি আলাপ করেছিলাম সে প্রসঙ্গে আবার আসতে চাই। আমরা বলছিলাম যে একই সঙ্গে একটা ইমেজ বীভৎস এবং নান্দনিক হতে পারে, একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে সৌন্দর্য। সেই সূত্রে জানতে চাই, যারা এই বৈপরীত্যকে সাংবাদিকতার প্রয়োজন নয় বরং শিল্পকলার পরিপ্রেক্ষিতে চর্চা করেন, তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? ধরা যাক, ফটোগ্রাফার জোয়েল পিটার উইটকিন কিংবা প্রয়াত ব্রিটিশ শিল্পী ফ্রান্সিস বেকন। এঁদের কাজ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর পিটার উইটকিনের কাজ খুবই অস্বস্তিকর। তা ছাড়া তিনি তো ওসব স্থানে যান না বরং স্টুডিওতে ঐসব পরিস্থিতি তৈরি করেন। ফলে তার ব্যাপারটি ভিন্ন। দীর্ঘদিন তাঁর কাজ অনুমোদন করতে আমার বেশ সমস্যা হয়েছে। আমার মনে হয় না আমি ঠিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারি উনি কী করতে চাইছেন। আমি সত্যি আঁতকে উঠেছিলাম, যখন শুনেছিলাম যে তিনি সত্যিকার মৃতদেহ এবং দেহাবশেষ এনে ঐ পরিস্থিতিগুলো তৈরি করেন। আমি এটা ঠিক মেনে নিতে পারিনি।

তবে এখন আমি বুঝতে পারি, উইটকিন সম্ভবত আমাদের বলতে চাইছেন যে, যে প্রভুদের আমরা সদাশয় বলে মনে করি, তারা আসলে তা নন। সম্ভবত তারা নিজেরাই নিষ্ঠুর, যে শক্তি আমাদের এ বিশ্বকে চালাচ্ছে তা নিষ্ঠুর, বর্বর; তারা নিজেরাই বিকৃতি আর যন্ত্রণার শিকার। এটা যে আমার বিশ্বাস তা নয়, তবে এটা একজন শিল্পীর চর্চার বিষয় হতেই পারে। আমি নিজে যেসব দৃশ্য দেখেছি তাতে এ বিষয় নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবি রাখে। তবে বলা বাহুল্য যে উইটকিন মোটেও বাস্তব মানুষের ট্র্যাজেডি নিয়ে কাজ করছেন না।

প্রশ্ন *ইনফার্নোতে* চেচনিয়ায় তোলা চারটি ছবি নিয়ে একটা সিকোয়েন্স আছে, যা শুরু প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ ধরা একটা রক্তাক্ত হাতের ছবি দিয়ে। এর নিচে আছে ফার টুপি পরা দুজন লোকের ছবি, যার একজন L&M সিগারেটের একটা কার্টন ঢোকাচ্ছে তার কোটে।

উত্তর *ইনফার্নোতে* এরকম বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি গল্পের ভেতর গল্প বলেছি।

প্রশ্ন কোনো-কোনোটি রীতিমতো সিনেম্যাটিক, কোনো চলচ্চিত্রের স্টিলের মত।

উত্তর তা ঠিক। একটা বিস্মৃত প্রেক্ষাপটে আমি শুধু একটা চরিত্রের ওপর ফোকাস করেছি এবং তাকে অনুসরণ করে গেছি। অভিজ্ঞতাটি অনেকটা সিনেমার মতো, যেখানে আপনি একটা ঘটনা উন্মোচিত হতে দেখছেন কয়েকটি ফ্রেমে। ঐ বিশেষ ছবিটিতে যে মৃতলোকটিকে দেখছেন তিনি একটা অভিযান শেষে ফিরছিলেন কিছু সরঞ্জামাদি নিয়ে যাবার জন্য। তিনি যখন বাইরে খোলা জায়গায় এসেছিলেন তখন একটা রাশান মর্টার শেলে তার দেহ উড়ে যায়। তার এক প্রতিবেশী মহিলা তাকে উদ্ধার করে। দ্বিতীয় ফ্রেমে আপনি সেই উদ্বিগ্ন মহিলাকে দেখতে পাবেন, যাকে আরো কয়জন পুরুষ সান্ত্বনা দিচ্ছে। এর পরপর ঐ মৃতলোকটির কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়া সিগারেটের কার্টনগুলো একজন ঝাড়ু দেয়। শেষ ফ্রেমে দেখা যায় মৃতলোকটিকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রাখা হয়েছে, তার টুপি নেই, ব্যাগ নেই, সে পড়ে আছে, তাকে ভুলে গেছে সবাই।

প্রশ্ন এবং আপনি ঠিক ঐ সময়টাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন?

উত্তর ঠিক তাই। ওরা যেন আমাকে দেখতেই পায়নি। অথচ আমি ওদের পাশেই ছিলাম, ওরা স্রেফ আমাকে উপেক্ষা করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন জায়ারের কলেরা মহামারীর সময় তোলা ছবিগুলোতে বেশ অনেকগুলো ইমেজ রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ট্রাক্টর দিয়ে অসংখ্য মৃতদেহকে ঠেলে নেয়া হচ্ছে গণকবর দেয়ার জন্য, পাশে মুখোশ পরা ত্রাণকর্মীরা। আপনি জাতিসংঘ, রেডক্রস এদের সঙ্গে এমনি অনেক পরিস্থিতিতে গেছেন, এদের ত্রাণকর্মীরা এই বীভৎস পরিস্থিতিকে সামাল দেবার চেষ্টা করেন। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাণকর্মীদের মানসিক অবস্থা কেমন দাঁড়ায়?

উত্তর জায়ারের গোমার গণকবর দেয়ার ব্যাপারটি পরিচালনা করে ফরাসি সেনারা। আমার ধারণা, তারা শুধু আদেশ পালন করেছিল মাত্র এবং তাদের উর্ধ্বতন অফিসার তাদের যা করতে বলছিল তা-ই করে যাচ্ছিল। তবে ত্রাণকর্মীদের মধ্যে একটা প্রেরণা কাজ করে। তারা তাদের কাজের গুরুত্বটি বোঝে এবং মনোযোগের সঙ্গে তারা সে কাজটি করে।

প্রশ্ন একটা ছবিতে দেখেছি ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে একটা জুতা, যার ভেতরে জমেছে পানি—যদিও আপাতভাবে খুবই সাদামাটা, আটপৌরে ছবি, তবু এটাই এ বইটির সবচেয়ে চমকপ্রদ, শক্তিশালী ছবি।

উত্তর ঐ ছবিটা কসোভায় তোলা। এটা খুবই ব্যক্তিগত, তাৎক্ষণিক, সহজাত একটা ইমেজ। এটা আমি যে অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছিলাম তার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া। ঐ যে জুতা, যার মধ্যে জমে আছে পানি, আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন যে সেই পানিতে পাতার ছায়া, সেই জুতাটি আমার কাছে ধরা দিয়েছিল প্রতিদিন যে ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হচ্ছিলাম আমি তার একটা স্মারক হিসেবে। চমৎকার একটা জুতা, যেটা একসময়ে পায়ে দিত একজন জীবন্ত মানুষ কিন্তু সেই জুতার গহ্বরে এখন জমে আছে পানি। কারণ মানুষটি বোমায় উড়ে গেছে, জুতাটিকে অদ্ভুত এক প্রতীক মনে হয়েছে আমার।

প্রশ্ন দুই পৃষ্ঠা ছড়ানো একটা ছবি আছে রুয়ান্ডার, তাতে কেবল স্তূপীকৃত অসংখ্য চাকু আর ছোরা। বিশেষ করে এই ছোরাগুলোর প্রেক্ষাপট জানবার পর ছবিটি দেখলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

উত্তর হাজার হাজার স্তূপীকৃত ছোরা, চাকুর ঐ দৃশ্য ছিল অভূতপূর্ব। এগুলো দিয়েই রুয়ান্ডায় গণহত্যা চালানো হয়, হাজার হাজার মানুষকে খুব কাছে থেকে এই আদিম অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়। ব্যাপক শ্রমসাধ্য ব্যাপার, এজন্য প্রয়োজন হয় প্রবল মনোবল এবং বিপুল সাংগঠনিক তৎপরতা। ঐটি আমার বোধগম্যতার বাইরে।

আমি জানি, এটা ঘটেছে এবং আমি এর সব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেছি, তবু আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারি না। কী করে এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। ছোরা-চাকুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবি আপনাকে চমকে দেয় কারণ ঐ ছবি প্রমাণ করে গণহত্যার ব্যাপকতা এবং আপনি জানেন যে ঐ অস্ত্রগুলো দিয়েই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

প্রশ্ন আপনার ছবি সম্পর্কে আপনি কি আর কিছু বলতে চান?

উত্তর হ্যাঁ, একটা ব্যাপার সবার বোঝা দরকার, এইসব দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকরা কীভাবে কাজ করেন সেটা নিয়ে সম্ভবত একটা ভুল ধারণা আছে। যেমন ধরা যাক, দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে; ব্যাপারটা এমন নয় যে আমরা ফটোসাংবাদিকরা কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িতদের ছবি তুলে সেখান থেকে চলে আসি এবং তাদের কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করি না। আমরা সবসময়ই ছবি তুলি কোনো খাদ্যকেন্দ্রে, যেখানে ইতিমধ্যেই কোনো সংগঠনের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা যখন ছবি তুলছি তখন দুর্ভিক্ষপীড়িতদের যতটা সম্ভব সাহায্য করা হয়েছে। তখন যদি এমন হতো যে আমি এমন কোনো দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের মুখোমুখি হয়েছি যে তখনো কোনো সাহায্য পায়নি, যে কোনো খাদ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেনি বা খুঁজে পায়নি, তাহলে আমি নিঃসন্দেহে নিজে তাকে খাদ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতাম। আমি মনে করি, যেকোনো সাংবাদিকই তা করতেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো

কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর জন্ম ১৯২৬ সালে হাভানায়। তাঁর বাবা ছিলেন স্প্যানিশ, মা কিউবান। বাবা কিউবায় আখ-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ক্যাস্ট্রো হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। স্বৈরশাসক বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে ক্যাস্ট্রো তাঁর নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯৫৯ সালে এক সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্যাস্ট্রো মাত্র ৩৩ বছর বয়সে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। আমেরিকার মতো কট্টর পুঁজিবাদী একটা দেশের সীমানার অত্যন্ত কাছে থেকেও ক্যাস্ট্রো বহুবছর কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা অব্যাহত রেখে বিশ্বরাজনীতির বহুলআলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। সর্বোপরি সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ব্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিপর্যয় ঘটার পরও ক্যাস্ট্রো তাঁর দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটুট রাখবার সংকল্প ঘোষণা করে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কিংবদন্তি এই নেতার রাজনীতির বাইরেও বিপুল আগ্রহ রয়েছে সাহিত্য, সংগীত ও খেলাধুলায়।

ফিদেল ক্যাস্ট্রোর দুটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের অনুবাদ করেছি যা এখানে উপস্থাপন করছি দুটি পৃথক পর্বে।

এই সাক্ষাৎকার দুটিতে ফিদেল ক্যাস্ট্রো বহু বিচিত্র বিষয়ে আলাপ করেছেন। কথা বলেছেন তাঁর ছেলেবেলা, যৌবন, বিপ্লবের প্রস্তুতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংগীত, যৌনতা, সমাজতন্ত্রের পতন, ল্যাটিন আমেরিকা ও পশ্চিমা রাজনীতির নানাবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে। সাক্ষাৎকার দুটি ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক *সময়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৯৩-৯৪ সালে। উল্লেখ্য, দুটি সাক্ষাৎকারেরই নির্বাচিত অংশ এখানে অনূদিত হয়েছে।

প্রথম পর্ব

এই পর্বে রয়েছে ফ্রেই বেত্তোর সঙ্গে কথোপকথন। ফ্রেই বেত্তো ব্রাজিলীয় যাজক। ব্রাজিলের সামরিক শাসনের সময় একজন সাংবাদিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। এই কথোপকথন হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপর্যয় তখনো ঘটেনি। ফ্রেই বেত্তোর আলাপের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল ধর্ম-প্রসঙ্গ। সেসময়ের প্রেক্ষাপটে একজন সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে ধর্ম-প্রসঙ্গে খোলাখুলি আলাপের ব্যাপারটি ছিল যুগান্তকারী। এ ছাড়াও ফ্রেই বেত্তো কথা বলেছিলেন ক্যাস্ট্রোর ব্যক্তিজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের বিবিধ প্রসঙ্গে। এই কথোপকথন *ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যান্ড রিলিজিয়ন, টকস উইথ ফ্রেই বেত্তো* নামে পাবলিকেশনস অফিস অব দি কাউন্সিল অব স্টেট, হাভানা কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে।

ছেলেবেলা, নানা রঙের দিন

ফ্রেই বেত্তো : আপনার পারিবারিক ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক। আপনি তো একটা খ্রিস্টান পরিবারেই জন্মেছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার জন্ম কোনো ধার্মিক পরিবারে কি না, সেটা জানতে চাচ্ছেন? আমি বলব, প্রথমত, আমি একটা ধার্মিক দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। দ্বিতীয়ত, আমি জন্মগ্রহণ করেছি একটা ধার্মিক পরিবারে। আমার মা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন। আমার বাবা অবশ্য ততটা ধার্মিক ছিলেন না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো আপনার মায়ের বাড়ি কি গ্রামে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ।

ফ্রেই বেত্তো তিনি কি কিউবান?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, একটা কৃষক পরিবারের মেয়ে তিনি।

ফ্রেই বেত্তো আপনার বাবা?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার বাবাও ছিলেন কৃষক। স্পেনের গেলিসিয়ার অত্যন্ত গরিব এক কৃষক পরিবারের ছেলে তিনি। তবে আমার মাকে ঠিক সেভাবে ধার্মিক বলা যায় না, কারণ এ বিষয়ে তাঁর কোনো বিশেষ পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণ ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো তিনি কি বিশ্বাসী ছিলেন ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সেই। এখানে বলে রাখি, আমার মা কিন্তু লিখতে-পড়তে শিখেছেন অনেক পরে, বড় হয়ে।

ফ্রেই বেত্তো কী নাম তাঁর?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো লিনা।

ফ্রেই বেত্তো আর বাবার?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যাঞ্জেলো। আমার মা নিরক্ষরই ছিলেন। তিনি বলতে গেলে নিজের চেষ্টাতেই লিখতে-পড়তে শিখেছেন। তিনি তাঁর কোনো শিক্ষকের কথা আমাদের বলেননি কখনো। কখনো স্কুলেও যাননি। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিজেই তিনি লিখতে-পড়তে শিখেছেন। তিনি স্কুল বা চার্চ থেকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা পাননি। আমার ধারণা তাঁর ধার্মিকতা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্যেরই একটা ব্যাপার, আমার নানিও অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন।

ফ্রেই বেত্তো তাঁরা ধর্মকর্ম কি বাড়িতেই শুধু করতেন না চার্চেও যেতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আসলে চার্চে যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন ঘটত না, কারণ আমি যেখানে জন্মেছিলাম সেখানে কোনো চার্চ ছিল না। ছিল অনেক দূরে।

ফ্রেই বেত্তো আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওরিয়েন্ট প্রদেশের উত্তর-মধ্য অঞ্চলে, নাইস উপসাগরের কাছে।

ফ্রেই বেত্তো শহরটার নাম কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, ওটা কোনো শহরই ছিল না। দেখছেন না কোনো চার্চ ছিল না সেখানে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো সেটা কি একটা খামার অঞ্চল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, খামার।

ফ্রেই বেত্তো কী নাম?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিরান। অল্প কয়টা দালান ছিল। আমাদের একটা বাড়ি ছিল সেখানে, তার সংলগ্ন ছিল কয়টা অফিস। বাড়িটার স্থাপত্য ছিল স্প্যানিশ ধরনের। হয়তো অবাক হচ্ছেন কিউবাতে কেন স্প্যানিশ বাড়ি। মনে আছে নিশ্চয়ই, বলেছিলাম, আমার বাবা ছিলেন গালিসিয়ার স্প্যানিশ। আমাদের বাড়ির নিচে গরু আর শুয়োর পালা হতো। উঁচু উঁচু খুঁটির উপর গালিসিয়ার স্থাপত্যে তৈরি হয়েছিল আমাদের বাড়িটি।

ফ্রেই বেত্তো উঁচু খুঁটির উপর কেন? বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি, বাবা বাড়িটা খুঁটির উপর বানালেন কেন? বন্যা বা মাটি সরানোর ব্যাপার তো ছিল না। কোনো কোনো খুঁটি ছয় ফুটেরও বেশি উঁচু ছিল। বাড়ির নিচের মাটি ছিল উঁচু-নিচু; তাই খুঁটিগুলোর উচ্চতাও একেক রকম ছিল। ছোটবেলায় এটা নিয়ে খুব ভাবতাম; খুঁটিগুলোর কী কাজ? পরে বুঝেছি এটা বাবার গালিসিয়ান সংস্কৃতির প্রতি রক্তের টানেরই একটা নিদর্শন। আমি যখন ছোট, আমার মনে আছে গালিসিয়ান রীতিমাফিক আমাদের বাড়ির নিচে গরুরা সব ঘুমাত। ২০ থেকে ৩০টা গরু ছিল আমাদের। সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যায় তারা বাড়ির নিচে চলে আসত। তাদেরকে ওইসব খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো, দুধ দোয়ানো হতো।

ফ্রেই বেত্তো আপনার মা কি সাধু-সন্তদের মূর্তি রাখতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, সে বিষয়ে আমি বলছি। তার আগে আমাকে স্প্যানিশ রীতিনীতি বিষয়ে আরেকটু বলতে দিন। বাবা তাঁর নিজ দেশের ঐতিহ্য ধরে রাখবার জন্যই ওইরকম বাড়ি বানিয়েছিলেন। তিনি একটা কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন এবং পড়াশোনা করবার কোনো সুযোগ পাননি। মায়ের মতো তিনিও পড়াশোনা শিখেছিলেন নিজেরই চেষ্টায়। বাবা খুব গরিব এক গালিসিয়া কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কিউবার শেষ স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমার বাবা একজন স্প্যানিশ সৈন্য হিসেবে এখানে এসেছিলেন যুদ্ধ করতে। বাবা তখন তরুণ, এমনি অনেক তরুণকে তখন স্প্যানিশ সেনাবাহিনী ধরে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিউবায় যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি স্পেনে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে থাকবার সময় কোনো কারণে কিউবাকে হয়তো তার ভালো লেগেছিল। এই শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি স্পেন ত্যাগ করে কিউবায় উঠেছিলেন একেবারে শূন্যহাতে, এখানে তার পরিচিতও কেউ ছিল না। আমেরিকান নাগরিকরা তখন মোটা টাকা খাটাতে শুরু করেছিল কিউবাতে। কিউবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে ভালো জমিগুলো তারা কিনে নিচ্ছিল এবং বনগুলো ধ্বংস করে সেখানে আখের চাষ শুরু করেছিল। বিশাল চিনির কল বসাতে শুরু করেছিল। আমার বাবা তেমনি একটা চিনির কলে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন।

ফ্রেই বেত্তো স্বাধীনতাযুদ্ধ, কোন্ সময়টার কথা বলছেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবার শেষ স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৮৯৫ সালে এবং শেষ হয়েছিল ১৮৯৮তে। স্পেন আসলে একরকম হেরেই গেল যুদ্ধের ভেতর আমেরিকানদের সুবিধাবাদী অনুপ্রবেশের কারণে। আমেরিকা সৈন্য পাঠাল এবং ক্রমান্বয়ে পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন, আরো কিছু দ্বীপ এবং কিউবাকেও দখল করল। তবে কিউবাকে তারা কখনই স্থায়ীভাবে দখল করতে পারেনি। কারণ কিউবা সবসময় প্রতিরোধ করেছে, বীরের মতো বহু বছর যুদ্ধ করেছে তারা, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। আমেরিকা আবার খুব খোলামেলাভাবে কিউবাকে দখল করতে চায়ওনি, কারণ কিউবার স্বাধীনতার ব্যাপারে ল্যাটিন আমেরিকাসহ সারাবিশ্বের একটা সমর্থন ছিল। আমি তো প্রায়ই বলি, কিউবা ছিল উনিশ শতকের ভিয়েতনাম।

বলছিলাম বাবার কথা। বাবা স্পেন ছেড়ে এসে এখানে চিনির কলে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে স্পেন থেকে আরো কিছু মানুষ কাজের জন্য আসে। বাবা তাদের একত্রিত করেন এবং একটা আমেরিকান ফার্মে কাজ জুটিয়ে দেন। বাবা ঐ লোকদের নিয়ে বিভিন্ন জঙ্গল কেটে, কলে জ্বালানি সরবরাহ করতে থাকেন এবং পরিচ্ছন্ন জমি আখচাষের উপযোগী করেন। সম্ভবত ঐ স্পেনীয় দলের নেতা হিসেবে ধীরে ধীরে বাবা বেশ মুনাফা করতে শুরু করেন। আমার বাবা দারুণ কর্মঠ, উদ্যোগী মানুষ ছিলেন এবং তার চমৎকার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল। আমি তা দেখেছি। কিউবায় বাবার প্রথম দিনগুলো সম্পর্কে খুব বেশিকিছু জানি না। যখন সেটা জানবার সুযোগ ছিল তখন আজকের মতো জানবার জন্য এত কৌতূহল ছিল না। তা ছাড়া আপনি এখন আমার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করছেন বাবার সঙ্গে আমি অবশ্য তা করতে পারতাম না।

ফ্রেই বেত্তো আপনার বাবা কবে মারা গেলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো অনেক পরে, আমার বয়স তখন ত্রিশ। '৫৬তে মারা যান তিনি।

ফ্রেই বেত্তো আমি ভেবেছিলাম, ১৯৫৯-এ বিপ্লবের সময় আপনি ৩০-এর নিচে ছিলেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার বয়স তখন বত্রিশ। ১৯৫৯-এর আগস্টে আমি তেত্রিশে পড়ি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো আপনার বাবা যে সময়টায় মারা যান সে দিনগুলোতে আপনি কী করছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার বাবা মারা গেলেন ২১ অক্টোবর ১৯৫৬। আমার বয়স ৩০ বছর পূর্তির ঠিক দুমাস পর। আমি তখন সবে মেক্সিকো অভিযান থেকে ফিরছি। আমার বয়স যখন ২৬ তখন আমরা মনকাডা গ্যারিসন আক্রমণ করি। আমার ২৭তম জন্মদিন আমি পালন করেছি জেলে।

ফ্রেই বেত্তো আর আপনার মা মারা গেলেন কবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৬ আগস্ট ১৯৬৩। কিন্তু আমরা বোধ হয় বিষয় থেকে বেশ দূরে চলে গেছি। এবার আপনার প্রশ্নে আসা যাক।

আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ির কথা আলাপ করছিলাম। আমার বাবা-মা, আমার বাড়ির কথা আপনাকে বললাম। আপনি জানতে চাইছিলেন আমাদের পরিবারে ধার্মিকতার কথা। আমি বলেছি, আমার বাবার ঠিক কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিল কি না, বলতে পারব না, তাঁকে কোনো ধর্মকর্ম করতে আমি দেখিনি। তবে আমার মা নিঃসন্দেহে খুব ধার্মিক ছিলেন, যেমন ছিলেন আমার নানি।

ফ্রেই বেত্তো তিনি কি রবিবারের প্রার্থনায় যেতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওই যে বললাম, আমাদের গ্রামে কোনো চার্চ ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো আপনাদের বাড়িতে বড়দিন কীভাবে পালিত হতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রথাগতভাবেই। ওদিন একটা পার্টি হতো আমাদের বাড়িতে, যেটা চলত একেবারে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। একটা ধর্মীয় ছুটির দিনও ছিল সম্ভবত ২৮ ডিসেম্বর। ওই দিন লোকে একজন আরেকজনকে বোকা বানাত। কোনো একটা চালাকি করে অন্যকে বোকা বানিয়ে মজা করে লাফিয়ে বলত, 'হাবা, হাবা'। ওটাও ক্রিসমাস উৎসবের একটা অংশ ছিল।

ফ্রেই বেত্তো আমাদের ব্রাজিলে এরকম একটা দিন পালন করা হয় পয়লা এপ্রিলে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : এখানে সেটা হয় বছরের শেষে। ক্রিসমাস পালন করা হতো সপ্তাহ জুড়ে, 'পবিত্র সপ্তাহ' হিসাবে। আমাদের জায়গাটা কোনো শহর ছিল না তা তো বলেছি। দালান ছিল গুটিকয়। আমাদের তো ছিল কাঠের বাড়ি। তার নিচে গরু, শূকর, হাঁস, মুরগি। বাড়ির একটু দূরেই ছিল একটা কসাইখানা। একদিকে ছিল একটা গোলাঘর, আর পাশে ছিল কামারশালা। আমার বাড়ি থেকে ৫০/৬০ গজ দূরে ছিল ছোট একটা পাবলিক স্কুল। তার উল্টোদিকে ছিল একটা বেকারি। আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধুলোকাদায় ভরা যে রাস্তাটা মিউনিসিপাল শহরের দিকে গেছে ওটাকেই সবাই বলত হাইওয়ে। রাস্তার পাশে ছিল আমাদের একটা মনোহারি দোকান। দোকানটার সামনে ছিল ঘন পাতাওয়ালা একটা গাছ। দোকানটার উল্টোদিকে ছিল পোস্টঅফিস আর টেলিগ্রাফ অফিস।

ফ্রেই বেত্তো দোকানটার মালিক কি আপনারাই ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, তবে ঐ পোস্টঅফিস বা স্কুলের মালিক আমরা ছিলাম না, ওগুলো জনসাধারণের সম্পত্তি। বাকি যা-কিছুর কথা বললাম, সেগুলোর মালিক ছিল আমারই পরিবার। আমি যখন জন্মেছি আমার বাবা তখন বেশ সম্পদের মালিক, রীতিমতো বিত্তবান মানুষ।

ফ্রেই বেত্তো আপনার জন্ম কবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আগস্ট ১৩, ১৯২৬। সময়টা যদি জানতে চান, তাও বলতে পারি, আমি জন্মেছিলাম রাত দুটোর দিকে। আমার এই বিপ্লবী কাজকর্ম, এই গেরিলা জীবনের সঙ্গে ওই জন্মের সময়টার বোধ হয় একটা প্রভাব আছে, কী বলেন? মানুষের জীবনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব কি আছে? যা হোক, আমি ওরকম সময়ই জন্মেছিলাম মা আমাকে বলেছেন। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন রাত দুটোর সময় আমি গেরিলার মতোই প্রথম পৃথিবীতে এসেছিলাম।

ফ্রেই বেত্তো রীতিমতো চক্রান্ত।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, চক্রান্তই।

ফ্রেই বেত্তো অন্তত ওই ২৬ সংখ্যাটির কিন্তু আপনার জীবনের ওপর বেশ প্রভাব আছে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমার জন্ম ১৯২৬-এ। আমি যখন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলাম তখন আমার বয়স ২৬, আমার জন্মতারিখ ১৩, যা আবার ২৬-এর অর্ধেক। বাতিস্তা ক্যু করল '৫২তে, যা ২৬-এর দ্বিগুণ। তাই তো, ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হচ্ছে, ২৬ সংখ্যাটার মধ্যে বেশ একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

ফ্রেই বেত্তো মনকাডায় আক্রমণ হল ২৬ জুলাই, সেটা তো জন্ম দিল ২৬ জুলাই আন্দোলনের।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমরা ফিরে এলাম ১৯৫৬তে, ২৬ আর ৩০ যোগ করলে ৫৬। বেত্তো, আর না-এগুনোই ভালো। আপনার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো আমি দিইনি। আপনাকে আমার বাড়ির বর্ণনা দিচ্ছিলাম। আর একটু বলি, শুনুন। আমাদের বাড়ির ১০০ গজ দূরে একটা খোলা জায়গা ছিল, যেখানে মোরগ-লড়াই হতো। ষাঁড়ের লড়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয় মোরগের লড়াই। স্পেনে অবশ্য দুটোই হয়। আমি প্রতি রবিবারই ওই মোরগ-লড়াই দেখতাম। মোরগ-লড়াই প্রেমিকরা সব সেখানে জড়ো হতো, কেউ কেউ তাদের সব টাকাপয়সা খোয়াত ওখানেই। হারলে বিমর্ষ হয়ে বাড়ি ফিরত আর জিতলে তখনই সেগুলো মদ খেয়ে উড়িয়ে দিত।

ওই দিকটাতেই খুব গরিবদের একটা পাড়া ছিল, পামগাছের পাতার তৈরি সব ঘর। ঐ পাড়ায় থাকত প্রধানত দেশান্তরি হাইতিরা, তারা আখের জমিতে কৃষকের কাজ করত। এই শতকের শুরুর দিকে তারা কিউবাতে এসেছিল এবং অত্যন্ত কষ্টকর এক জীবন যাপন করেছে। হাইতিয়ানদের আসা থেকে বোঝা যায় কিউবাতে তখন কাজের লোক কম ছিল।

খামারের প্রধান ফসল ছিল আখ। তারপর গরু। ছিল কলাক্ষেত, আলুক্ষেত, নারকেলসহ নানারকম ফলের বাগান। ১০/১২ হেক্টর জুড়ে একটা লেবুবাগান ছিল বাড়ির সঙ্গে। আখের ক্ষেতগুলো ছিল বেশ খানিকটা দূরে রেললাইনের ধার দিয়ে। ওই রেলেই আখ সব মিলে যেত। আমার যখন বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, ইতিমধ্যে আমাদের পরিবার অনেক জমির মালিক। আমার বাবার কত জমি ছিল জানেন? তা প্রায় ৮০০ হেক্টরের মতো হবে।

ফ্রেই বেত্তো কিউবান হেক্টর কি ব্রাজিলিয়ান হেক্টরের মতোই?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : এক হেক্টর হলো ১০ হাজার বর্গমিটার। এ ছাড়াও, আমার বাবা তার আরো কিছু জমি অন্যকে লিজ দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমি ছিল তাঁর।

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, ব্রাজিলে এ কিন্তু বিশাল জমির ব্যাপার।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তবে, যে জমিগুলো তিনি লিজ দিয়েছিলেন, সেগুলো সবই পাহাড়ি। ঘন পাইনবনে ঢাকা ৭০০/৮০০ ফুট উঁচু পাহাড়। সেখানকার মাটি সব লাল, মাটিতে নিকেলসহ অন্যান্য ধাতু। ওইসব জায়গা আমার খুব প্রিয় ছিল, কারণ জায়গাটি ছিল ঠাণ্ডা, শান্ত। আমার বয়স যখন এগারো, আমি তখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওই দিকটায় যেতাম। পাহাড়ের উপর উঠতে ঘোড়াগুলোর খুব কষ্ট হতো কিন্তু উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘাম ঝরা বন্ধ হয়ে যেত, গা শুকিয়ে যেত মুহূর্তে। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বইত সে চূড়ায় পাইনগাছের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ছোট ছোট ঝরনার পানি ছিল বরফ-শীতল, মিষ্টি, ওটা ছিল আমার বাবার লিজ দেয়া এলাকা।

ফ্রেই বেত্তো : অতএব বোঝা যাচ্ছে আপনার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক থেকে একজন ভূস্বামী হয়েছিলেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো গেরাসিয়াতে যেখানে আমার বাবা জন্মেছিলেন, তার একটা ছবি আমার কাছে আছে। দশ ফুট বাই ছয় ফুটের ছোট একটা বাড়ি। এক রুমের বাড়ি। সেখানেই ভাগ করে নেয়া থাকার ঘর আর রান্নাঘর। সম্ভবত কিছু পশুও পালা হতো সেখানে। তাদের কণা পরিমাণ জমিও ছিল না। কিউবাতে এসে তিনি ৮০০ হেক্টর জমি কিনেছিলেন এবং প্রবীণ স্বাধীনতাযোদ্ধাদের লিজ দিয়েছিলেন এর চেয়েও বেশি পরিমাণ জমি। স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রবীণ যোদ্ধারা কী করে এই ১০ হাজার হেক্টর জমির মালিক হলো সেটার ওপর গবেষণা হওয়া দরকার। প্রচুর জমি তখন পড়ে ছিল, আর দামও ছিল খুবই কম। সে কারণে বোধহয় তারা জমিগুলো কিনেছেন। কিন্তু আমি ভাবি, সেই পরিমাণ টাকা বা সম্পদও-বা তারা পেলেন কোথায়? ওইসব জমিতে যে আখ হতো, সেগুলোর বিক্রির একটা অংশ তারা পেতেন। তারা হাভানায় থাকতেন এবং ঐ টাকায় অন্য ব্যবসা করতেন। আমি এও জানি না, তাদের ওই জমির মালিকানা বৈধ ছিল, না অবৈধ ছিল।

ওই খামার অঞ্চলে দুই ধরনের জমিই ছিল; এক, যে জমিগুলোর মালিক ছিলেন আমার বাবা, অন্যগুলো তিনি লিজ দিয়েছিলেন। আমার বাবা কয়েক শত কৃষক পরিবারকে ছোট ছোট জমি দিয়েছিলেন, যাতে তারা নিজেরা চাষাবাদ করে খেত। এ ছাড়া 'সাবকোলোনাস' নামে একদল ক্ষুদ্র আখচাষি ছিল। তাদের অবস্থা খানিকটা ভালো ছিল। আমার বয়স যখন এগারো, তখন ঐ এলাকায় এক হাজারের মতো লোকের বসবাস ছিল। আপনাকে এসব বললাম আমার জন্মস্থান এবং শৈশবের বেড়ে ওঠার পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য। ওই এলাকায় কোনো চার্চ ছিল না, সেটা তো আগেই বলেছি।

ফ্রেই বেত্তো কোনো ধর্মযাজক কি কখনো ওই গ্রামে যাননি?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বছরে একবার একজন যাজক আসতেন ব্যাপ্টাইজ করার জন্য। আমাদের ঐ অঞ্চলটা ছিল মাইয়ারি মিউনিসিপালের অধীনে। ৩৬ কিলোমিটার দূরের ঐ শহর থেকে বছরে একবার যাজক আসতেন আমাদের ওখানে।

ফ্রেই বেত্তো আপনি কি ওখানেই ব্যাপ্টাইজড হয়েছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, আমি ব্যাপ্টাইজড হয়েছিলাম সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে, আমার জন্মের অনেক পরে।

ফ্রেই বেত্তো তখন আপনার বয়স কত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো পাঁচ-ছয় হবে। আমার ব্যাপ্টিজমের গল্প শোনবার আগে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমাদের ওখানে কোনো চার্চ ছিল না, যাজক ছিল না, ধর্মীয় কোনো

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। আপনি জানতে চাইছিলেন ওখানে যে শতাধিক পরিবার থাকত, তারা বিশ্বাসী ছিল কি না। আমি বলব তারা নিয়মমাফিক ব্যাপ্টাইজড হতো। আমার মনে আছে, যারা ব্যাপ্টাইজড হতো না তাদের 'ইহুদি' বলা হতো। আমি তখন ঠিক বুঝতাম না ইহুদি বলতে কী বুঝায়। তখন চার-পাঁচ বছর বয়স আমার। কেন যেন আমার মনে হতো ইহুদি কালো রঙের, কর্কশ স্বরের একটা পাখির নাম। কেউ যখন ইহুদি নিয়ে কোনো আলাপ করত আমি ভাবতাম, বোধ হয় ওই পাখিটা সম্পর্কে আলাপ করছে।

ওখানে যে স্কুলটা ছিল সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ছোট স্কুল, ১৫/২০ জন মাত্র ছাত্র। ওখানে কোনো নার্সারি স্কুল ছিল না বলে বাবা-মা আমাকে ওই স্কুলেই পাঠিয়ে দিতেন আমার বড় ভাই এবং বোনের সঙ্গে। আমি ছিলাম তৃতীয় সন্তান। আমার মনে আছে, আমার বোন আমাকে একেবারে সামনের বেঞ্চটায় বসিয়ে দিত, আমি চুপচাপ বসে ব্ল্যাকবোর্ডটা দেখতাম আর শিক্ষক সেখানে দাঁড়িয়ে কী কী বলছে বুঝবার চেষ্টা করতাম। সম্ভবত ওখানেই আমি প্রথম লিখতে পড়তে শিখি। তখন আমার বয়স কত? চার কি পাঁচ। ধর্ম বিষয়ে কোনো শিক্ষা দেয়া হতো না। জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা এসব বিষয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো হতো। সেটা ছিল একটা পাবলিক স্কুল।

ধর্মবিষয়ে ওখানকার পরিবারদের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ছিল। তারা সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করত, সেইসঙ্গে বিশ্বাস করত নানা ধরনের সাধু-সন্তদের। প্রত্যেকের নিজস্ব সন্ত ছিল, সে অনুযায়ী তার নাম রাখা হতো। যার যার নিজস্ব একটা সন্ত দিবসও ছিল, সেদিনটা তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ এপ্রিল ছিল আমার সন্ত দিবস। কারণ আমার সন্তের নাম ছিল ফিদেল।

ফ্রেই বেত্তো আমি তো জানতাম ফিদেল মানে 'যার বিশ্বাস আছে'।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আমার নামের ওই অর্থও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মিলবে। কারো ধর্মীয় বিশ্বাস থাকে, কারো অন্য কোনো বিশ্বাস। আমি সবসময় আমার ভেতর দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যয় আর আশাবাদ লালন করি।

ফ্রেই বেত্তো আপনার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে এদেশে তো বিপ্লবই ঘটত না।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তবে আমার নাম রাখার ব্যাপারে ওসব ভাবনা-চিন্তা ছিল না। বরং ব্যাপারটা হাস্যকরই। আমার আসলে কোনো নামই ছিল না, আমার যে গডফাদার হওয়ার কথা তার নাম অনুসারেই আমার নাম রেখে দেয়া হলো ফিদেল। কিন্তু আপনাকে আমার ওই এলাকা সম্পর্কে বলা এখনো শেষ হয়নি।

ফ্রেই বেত্তো আপনার মায়ের ব্যাপারটায় আমাদের কিন্তু ফিরে আসতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিশ্চয়ই, তার আগে ওই অঞ্চলের ধর্মীয় পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলি। বলছিলাম ওই কৃষক পরিবারদের সকলেরই ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল এবং সকলেরই নিজস্ব সন্ত ছিল। আমি যখন ছোট। মনে আছে, আত্মা আর ভূত নিয়ে অনেক গল্প শুনতাম। মানুষের প্রচুর কুসংস্কারও ছিল। কোনো মোরগ যদি বাড়ির পাশে পরপর তিনবার ডাকত, তাহলে সবাই দারুণ অমঙ্গলের আশঙ্কা করত। রাতে পেঁচা যদি কোনো বাড়ির উপর দিয়ে যায় এবং ঘর থেকে তার পাখার শব্দ আর ডাক যদি কেউ শোনে, তবে সবাই নিশ্চিত থাকত যে বাড়িতে বিপদ আসন্ন। এমনি আরো অনেক বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল সবার মনে। বলতে গেলে আমি একটা প্রায় আদিম সমাজেই জন্মেছিলাম, যেখানে সবার মনে ঠাসা ছিল কুসংস্কার, আত্মা, ভূত-প্রেত ইত্যাদি। এ অবস্থা সব পরিবারেই ছিল, ছিল আমাদের পরিবারেও। আমার মা ছিলেন ক্যাথলিক খ্রিস্টান, তাঁর বিশ্বাসগুলো ছিল ক্যাথলিক চার্চ-মোতাবেক।

ফ্রেই বেত্তো আপনার মা কি তাঁর সন্তানদের প্রার্থনা করা শিখিয়েছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : মা আমাকে প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না, অবশ্য আমি সাড়ে চার বছরেই পাবলিক স্কুলে চলে গিয়েছিলাম। তবে মার প্রার্থনা আমি শুনতাম।

ফ্রেই বেত্তো আপনার মা কি সন্তদের মূর্তি রাখতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, অনেক সন্তের মূর্তি তিনি রাখতেন। সেন্ট জোসেফ, যিশু, ম্যাডোনা আরো অনেকের। সেন্ট ল্যাজারাস ক্যাথলিক চার্চ অনুমোদিত সন্ত না হলেও তার মূর্তিও তিনি রাখতেন। আমার মা অত্যন্ত একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন, সন্তদের মূর্তির নিচে মোমবাতি জ্বালাতেন। তাদের কাছে তিনি নানারকম জাগতিক ব্যাপারের সমাধান চাইতেন, পরিবারের কারো সমস্যা হলে তার নামে তিনি সন্তদের কাছে শপথ করতেন, নানারকম জিনিস মানত করতেন। আমার নানি ও খালারাও খুব ধার্মিক ছিলেন। আমার নানা-নানি তখন বাড়ির খুব কাছের একটা গ্রামে থাকতেন। আমার এক খালা বাচ্চা হবার সময় মারা যান। আমার সে দৃশ্যটা এখনো মনে আছে। ভয়ানক কান্নাকাটি হচ্ছিল। সেটাই ছিল মৃত্যু সম্পর্কে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার নানাও কিন্তু খুব দরিদ্র ছিলেন। আমার নানার একটা গরুর গাড়ি ছিল, যা দিয়ে তিনি আখ বহনের কাজ করতেন। সেটাই ছিল তার পেশা। আমার মায়ের ধার্মিকতা এসেছিল পুরোপুরি তার পরিবার থেকেই।

আমার মনে আছে, ১৯৫৯-এ বিপ্লবের পর একদিন আমি বাড়ি গিয়েছি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমার নানিও ছিলেন সেখানে। নানির কী যেন অসুখ করেছিল। ঘর ভরা ছিল নানা সাধু-সন্তের মূর্তিতে। আমি যখন আত্মগোপন করে ঝুঁকিপূর্ণ সংগ্রাম করছি, আমার মা ও নানি মিলে সন্তদের কাছে প্রচুর মানত করেছেন, আশীর্বাদ চেয়েছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি সফল হয়েছি, এতে তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছিল। বিপ্লবের পর আমি যখনই মা-নানা-নানির কাছে যেতাম, তখনই অত্যন্ত আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের কথা শুনতাম। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণার সঙ্গে আমি মোটেও একমত ছিলাম না; কিন্তু আমি কখনোই তাদের সঙ্গে তর্ক করতাম না। কারণ আমি দেখতাম, ওই বিশ্বাস তাদেরকে কী প্রচণ্ড শক্তি, সাহস আর স্বস্তি দিয়েছে। ওই বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভূত একান্ত নিজস্ব একটা ব্যাপার, যা তাদের সত্তারই অংশ। তবে আমার বাবাকে কোনো ধর্মকর্ম করতে দেখিনি। তিনি বরং ব্যস্ত থাকতেন প্রতিদিনের সংগ্রাম, তার সংগঠন নিয়ে বা দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে। তাকে ধর্ম নিয়ে কোনো আলাপ করতে শুনিনি।

এই ছিল আমার ছোটবেলার ধর্মীয় পরিবেশ। সেই অর্থে বলা যায়, আমার জন্ম একটা খ্রিস্টান পরিবারেই। বিশেষ করে আমার মা ও নানির দিক থেকে। আমার ধারণা, আমার স্প্যানিশ দাদা-দাদিও যথেষ্ট ধার্মিক ছিলেন। যদিও তাদের আমি কখনো দেখিনি।

ফ্রেই বেত্তো আপনি আপনার ব্যাপ্টিজম এবং আপনার নাম রাখা নিয়ে বলছিলেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমার নাম যে কেন ফিদেল রাখা হলো সে ঘটনাটা বেশ মজার। শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষ্ঠান ছিল। গ্রামে মানুষের আয়ু ছিল খুবই কম। সবসময়ই মরার ভয়। ধর্মপিতাকে মনে করা হতো দ্বিতীয় পিতা। কারো বাবা মারা গেলে ধর্মপিতাই তার দেখাশোনা করত। পরিবারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত কাউকে সন্তানের ধর্মপিতা করা হতো, সাধারণত চাচারাই ধর্মপিতা হতেন। আমার বোন এবং ভাই রেমনের ধর্মপিতা সম্ভবত আমাদের কোনো চাচা।

আমার ধর্মপিতা করা হয়েছিল বাবার এক বন্ধুকে। অত্যন্ত ধনীব্যক্তি ছিলেন তিনি। বাবাকে তিনি বিভিন্ন সময় টাকাপয়সা ধার দিতেন। তিনি ছিলেন আমাদের একধরনের পারিবারিক ব্যাংক। লোকে তাকে কোটিপতি বলত। তখনকার দিনে একজন কোটিপতি মানে বিরাট ব্যাপার। তখন মানুষ দিনে এক ডলার বা পেসো আয় করত। আমার বাবারও অর্থ ছিল কিন্তু কেউ তাকে কোটিপতি বলত না। তো, বাবার এই কোটিপতি বন্ধুকেই নির্বাচন করা হয়েছিল আমার ধর্মীয় পিতা হিসেবে। তিনি খুব ব্যস্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। থাকতেন সান্টিয়াগো ডু কিউবায়। আমাদের বাড়িতে আসার সময়ই তিনি পেতেন না। ফলে আমার নামকরণ অনুষ্ঠানটাও আটকে ছিল আমার চার-পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। ওদিকে লোকে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত, 'ও একটা ইহুদি'। তখন কারো ব্যাপ্টিজম না হলেই তাকে ইহুদি বলা হতো। আমি তখনো ইহুদি কথাটার অর্থ জানতাম না, তবে ব্যাপারটা খারাপ কিছু তা বুঝতাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শেষে আমার এক শিক্ষিকা আমাকে নিয়ে গেলেন সান্টিয়াগো ডু কিউবায় তার বাড়িতে। সেই মহিলা আমার বাবা আর মাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আমি খুব মেধাবী ছাত্র, আমার সান্টিয়াগোতে গিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। বাবা-মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন সান্টিয়াগোতে। আমি নির্ঝঞ্ঝাট, নিশ্চিন্ত একটা জীবন থেকে গিয়ে পড়লাম নিতান্ত গরিব একটা পরিবেশে এবং আমার প্রথম ক্ষুধা আর না-খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতা হলো।

ফ্রেই বেত্তো গরিব পরিবেশ কেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কারণ যে শিক্ষিকার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, তারা ছিলেন অত্যন্ত গরিব। তিনি ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সেটা তখন তিরিশের আকালের সময়—১৯৩১, ১৯৩২ সাল। সেসময় কেউই নিয়মিত বেতন পেত না। বাড়িতে ছিল শিক্ষিকার বাবা আর দুই বোন। ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকতাম আমরা। ঐ বাড়ি কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাবা তখন ৪০ পেসো করে পাঠাতেন ঐ শিক্ষিকার কাছে, আমাদের খরচ বাবদ। ওখানে আমি আর আমার বড় বোন থাকতাম। শিক্ষিকার বেতন নিয়মিত ছিল না এবং কিছু সঞ্চয় করতেও চাইতেন; ফলে খাবারের জন্য খরচ বরাদ্দ থাকত কম। প্রথমে আমরা পাঁচজন ছিলাম খাওয়ার লোক, পরে ছয়জন হলাম কারণ রেমনকেও বাবা পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। আমাদের ছোট একটা বাটিতে অল্প কিছু ভাত, শিম, কিছু আলু আর কলা দেয়া হতো। শুধু দুপুরে আর রাতে আমরা খেতাম। মনে আছে ঐসব খাবার আমার দারুণ সুস্বাদু মনে হতো। আসলে তখন ভীষণ ক্ষুধার্ত থাকতাম বলেই অমন মনে হতো।

পরে ঐ শিক্ষিকার এক বোন বিয়ে করলেন সান্টিয়াগোতে হাইতির কনসালকে। এদিকে তখন আমার নামকরণ করা হয়নি। যেহেতু বাবার কোটিপতি ব্যস্ত বন্ধুকে আর ধরা গেল না, শেষে ঐ হাইতির কনসালকেই করা হলো আমার ধর্মপিতা। আমার বয়স তখন পাঁচ। কনসালের স্ত্রী, আমার শিক্ষিকার বোন খুব অমায়িক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজাতেন। এভাবেই কাকতালীয় ঘটনায় শেষে নির্ধারিত হলো আমার ধর্মপিতা।

ফ্রেই বেত্তো তাহলে ওই কোটিপতি ভদ্রলোক বাতিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, কোনো কোটিপতি নয়, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্রতম দেশ হাইতির কনসাল হলেন আমার ধর্মপিতা আর মেস্টিজো, তার স্ত্রী আমার ধর্মমাতা।

ফ্রেই বেত্তো তারা কি বেঁচে আছেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, তারা মারা গেছেন অনেক আগেই। আমার মনে আছে, একদিন বিকেলে মাথায় পবিত্র পানি ছিটিয়ে তারা নামকরণ অনুষ্ঠান করলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপরই যেন আমি একজন স্বাভাবিক মানুষ হলাম। কিন্তু আমার নাম রাখবার সময় তারা স্মরণ করলেন সেই কোটিপতিকে। যেহেতু ওনাকেই আমার প্রথম ধর্মপিতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাই তারা তার নামটাই আমার সঙ্গে যুক্ত করলেন। কোটিপতির নাম ছিল ডন ফিদেল পিনো সান্টোস। তো, এভাবেই আমার নামের সঙ্গে ফিদেল যুক্ত হয়ে গেল।

ফ্রেই বেত্তো সেই কনসালের কী নাম ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো লুই হিকর্ট।

ফ্রেই বেত্তো তাহলে আপনার নাম লুই ক্যাস্ট্রোও হতে পারত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, হতে পারত। ইতিহাসে অবশ্য অনেক বিখ্যাত লুই আছে, তাই না? কিন্তু যার নামে আমার নাম রাখা হলো, সত্যি বলতে কি, যদিও মৃত ব্যক্তি নিয়ে কিছু বলা সমীচীন না তবু বলি, ঐ কোটিপতি ছিলেন মহাকৃপণ এক ব্যক্তি। উনি আমাকে কোনোদিন কোনো উপহার দিয়েছেন বলে আমার মনে পড়ে না। তিনি আমার বাবাকে ঋণ দিতেন নির্দিষ্ট সুদে। পরে উনি রাজনীতিবিদও হয়েছিলেন এবং তিনি সবসময় যখন যে পার্টি ক্ষমতায় থাকত তাকে সমর্থন দিতেন। তিনি নির্বাচনেও দাঁড়াতেন। মনে আছে, বাবা তাকে সমর্থন করেছিলেন। নির্বাচনের সময় আমাদের বাড়িতে প্রচুর টাকাপয়সার ছড়াছড়ি হতো। বাবা তার বন্ধুর সমর্থনে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। বুঝতেই পারছেন, বাড়ি থেকেই তখন আমি গণতন্ত্রের একটা চেহারা সম্পর্কে পাঠ নিচ্ছি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, ভূস্বামী হিসেবে আমার বাবা এলাকার অধিকাংশ ভোট নিয়ন্ত্রণ করতেন। কারণ লোকজন তখন লেখাপড়া প্রায় জানতই না। গ্রামে একটা কাজ পাওয়া, কারো জমি চাষ করতে পারা ছিল তাদের জন্য বিরাট একটা সুযোগের ব্যাপার। আমার বাবা এভাবে বহু লোককে গ্রামে কাজ দিতেন, ফলে তারা বাবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় বাবার মনোনীত প্রার্থীকেই অবধারিতভাবে ভোট দিত। সেই কোটিপতি, যার আমার ধর্মপিতা হওয়ার কথা ছিল, সেবার ভোটে জিতেছিলেন। জিতেছিলেন বাবার মতো এমনি কিছু লোকেরই সহায়তায়।

এ ছাড়া নির্বাচনের সময় গ্রাম থেকে কিছু চটপটে বাকপটু মানুষকে নেয়া হতো যারা তাদের প্রার্থীর হয়ে প্রচারণা চালাত, বিনিময়ে প্রার্থী তাদের টাকা দিতেন। এ ধরনের কিছু পেশাদার লোক সবসময় গ্রামে থাকত যারা বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে, যেমন মেয়র, প্রাদেশিক গভর্নর, সিনেটর, কাউন্সিলম্যান ইত্যাদি নির্বাচনের সময় তৎপর হয়ে উঠত। টিভি, রেডিওর নির্বাচন প্রচারণা তো তখন ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেসময়কার নির্বাচন প্রচারণার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমার বয়স তখন সম্ভবত ১০, ইতিমধ্যেই রাজনীতির অনেককিছুই আমার দেখা হয়ে গেছে। একটা নির্বাচনের সময়কালটা আমার মনে পড়ছে। আমি যে ঘরে ঘুমাতাম, সেবার সেখানে একটা সিন্দুক রাখা হয়েছিল। সেই সিন্দুকটা আমার জন্য মহা এক সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জানেন তো, বাচ্চারা একটু ঘুমাতে পছন্দ করে কিন্তু আমার ঘুমাবার জো ছিল না। সেই ভোর পাঁচটা থেকে সেই ঘরে লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হতো। কে যেন ঘরে ঢুকত আর ক্যাচ ক্যাচ শব্দে সিন্দুকটা খুলত কিছুক্ষণ পরপরই। আসলে এই সিন্দুক থেকে টাকা বের করে সেই পেশাদার নির্বাচন-প্রচারকদের দেয়া হতো ভোর থেকেই। আর আমার বাবা এসব করতেন একেবারে নিঃস্বার্থভাবে, স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে। কারণ আমার একটা কোনো দৃষ্টান্ত মনে পড়ে না যে সেই লোক আমার বাবার কোনো সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন কিংবা প্রচারণার জন্য কোনো তহবিল দিয়েছেন। বাবা নিজের পকেট থেকেই সব করতেন। বালক বয়সে রাজনীতির ঐ চেহারা আমি দেখেছি।

আর ওদিকে আমার আসল ধর্মপিতা সেই হাইতিয়ান কনসাল ছিলেন নিতান্তই দরিদ্র এবং বহু সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৩৩-এর এক বিপ্লবে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তারা বেশকিছু জাতীয়তাবাদী ধরনের আইন তৈরি করেছিলেন। সেসময় বহু কিউবান ছিল বেকার, অভুক্ত। কারণ দেখা যেত যে সব দোকান বা কারখানা ছিল স্পেনীয়দের, তারা শুধু স্পেনীয়দেরকেই সেখানে চাকরি দিত। ফলে কিউবানরা চাকরির জন্য জোর দাবি তুলেছিল। একদিক থেকে দাবিটা হয়তো ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু এ দাবি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ব্যাপারটা এমন নির্মমতায় পরিণত হয়েছিল যে বহু লোকেরই চাকরি কেড়ে নেয়া হয়েছিল, যারা বিদেশি হলেও ছিল অতীব দরিদ্র এবং তাদের বেঁচে থাকার আর কোনো উপায়ও ছিল না। ভাবতে এখনো আমার মন বিষণ্ন হয়ে যায়, তখন এভাবে কত যে হাইতিয়ানদের বিতাড়িত করা হয়েছিল, যারা বহু বছর ধরে কিউবায় বাস করছিল। সেই হাইতিয়ানরা স্রেফ দুর্ভিক্ষতাড়িত হয়ে বহু বছর আগে চলে এসেছিল কিউবাতে। এখানে তারা আখচাষি হয়েছে, সীমাহীন কষ্ট আর দুর্ভোগ সহ্য করেছে। তাদের মজুরি এত কম ছিল যে তাদের একরকম ক্রীতদাসই বলা যায়। আমার ধারণা, উনিশ শতকের ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রার মান ওই হাইতিয়ানদের তুলনায় যথেষ্ট ভালো ছিল।

ফ্রেই বেত্তো খাদ্য আর স্বাস্থ্যের দিক থেকে বলছেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ক্রীতদাসদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করা হতো ঠিক, কিন্তু তাদের খাবারও দেয়া হতো, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা হতো যাতে তারা কাজ করতে পারে। কিন্তু ওই হাজার হাজার হাইতিয়ান খাবার পেত শুধু কাজ জুটলে। অন্য সময় তারা মরল না বাঁচল কেউ খোঁজও রাখত না। ১৯৩৩-এর তথাকথিত বিপ্লবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবাদের নামে আসলে হাজার হাজার হাইতিয়ানকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল নির্মমভাবে। কী হয়েছিল তাদের পরিণতি? তাদের মধ্যে কতজন শেষপর্যন্ত বেঁচে ছিলেন? আমার মনে আছে, আমি দেখতে গিয়েছিলাম কী করে দোতলা এক জাহাজ বোঝাই হাইতিয়ানরা তাদের দেশে ফিরে যাচ্ছে। কী করুণ সে দৃশ্য! পরে আমার সেই ধর্মপিতা হাইতির কনসালও তার চাকরিটা হারালেন। তার উপার্জনের আর কোনো উপায় থাকল না। শেষে তিনিও হাইতিতে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

ফ্রেই বেত্তো   এবার আপনার স্কুলজীবনের কথা কিছু বলুন, স্কুলে ভর্তি হলেন কত বছর বয়সে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   একটু ভেবে দেখতে হবে। তখন আমার বয়স ছয় কি সাত। সে এক লম্বা কাহিনী। আপনাকে আগেই বলেছি, খুব ছোট বয়সেই আমাকে সান্টিয়াগো ডু কিউবায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনেক অভাব আর কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়েছে সেইসব দিন। পুরো একটা বছর কেটেছে এইভাবে, তারপর অবস্থা কিছুটা ভালো হতে শুরু করে। একসময়ে আমার বাবা-মা আমার সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন, ওই যে আমি এক শিক্ষিকার বাড়িতে থাকতাম সেই শিক্ষিকার উপর খুবই বিরক্ত হন। তাঁরা আমাকে বিরানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অবশ্য পরে বাবা-মার সঙ্গে সেই শিক্ষিকার যথেষ্ট বাদানুবাদ হয় এবং শেষে একটা বোঝাপড়া হয়। শেষপর্যন্ত আমাকে সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে থেকে যেতে হয়। বছরদুয়েক ছিলাম সেখানে।

সেসময় আমাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়নি। আমাকে তখন পড়াতেন আমার ধর্ম-মা। আমার ধর্মপিতা হাইতিতে ফিরে গেলেও ধর্ম-মা কিউবাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে শেখাতেন অঙ্ক, যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ। একেবারে অন্তর দিয়ে সেসব আমি শিখেছি তখন। আমার মনে হয় না আমি কোনোদিন সেগুলো ভুলব। কখনো কখনো আমি কিন্তু প্রায় ক্যালকুলেটরের মতোই তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ করতে পারি।

ফ্রেই বেত্তো   হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা আমিও লক্ষ করেছি।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   আমার কিন্তু পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কয়েকটা খাতা আর নোটবই দেয়া হয়েছিল। ওখানে আমি বর্ণমালা পড়তে শিখি, লেখা কিছুটা হয়েছিল ওখানে। তবে সব মিলিয়ে ওখানে আমার তেমন কিছু লাভ হয়নি। দুটি বছর একরকম অপচয়ই বলা যায়। তবে একমাত্র যে দরকারি উপকারটি সেখানে হয়েছিল তা হলো, একটা সমস্যাজর্জরিত, কঠিন, কষ্টকর জীবনের অভিজ্ঞতা। আমার ধারণা, আমি একরকম শোষিতই হয়েছিলাম সেখানে। কারণ আমার বাবা যে টাকা শিক্ষককে পাঠাতেন তাতে আমার আরো ভালো থাকার কথা। ওই বাড়িতে দুবছর কাটানোর পর আমাকে স্কুলে পাঠানো হলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো কোন্ স্কুলে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো লা সালে স্কুল। বাড়ির কাছেই স্কুল। আমি ভোরে স্কুলে যেতাম, দুপুরে বাড়িতে ফিরতাম লাঞ্চ করতে, তারপর আবার যেতাম। আমার সেই হাইতিয়ান ধর্মপিতা তখনো বাড়িতে ছিলেন। আমি ভর্তি হয়েছিলাম ফার্স্ট গ্রেডে। যদিও আমি অনেক আগেই লিখতে এবং পড়তে শিখেছিলাম, তবু শুধু শুধু আমাকে তাঁরা দু বছর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিল। নইলে আমি তখন থার্ড গ্রেডে থাকতে পারতাম। তবে ওই স্কুলে ভর্তি হওয়াটা আমার জন্য ছিল একটা বড় উত্তরণ। আমি একটা নিয়মবদ্ধ জীবনের মধ্যে চলতে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা আমি প্রথমবারের মতো পাই শিক্ষক, ক্লাসরুম এবং খেলার জন্য বন্ধু, পাই একটা উন্নত পরিবেশ। বাড়িতে বসে একা একা খাতায় অঙ্ক কষার চেয়ে এ ছিল অনেক ভালো। এ অবস্থার অবশ্য ছেদ পড়ে একপর্যায়ে আমার এক বিদ্রোহে। জীবনের প্রথম বিদ্রোহ।

ফ্রেই বেত্তো বিদ্রোহের কী কারণ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আসলে ওই বাড়িতে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। একটু এদিক-ওদিক হলেই আমাকে ওরা প্রায়ই চড়-থাপ্পড় মারত, বলত পাঠিয়ে দেবে। শেষে একদিন আমার মনে হলো এখানে থাকার চেয়ে বরং বোর্ডিং স্কুলে যাওয়াই ভালো।

ফ্রেই বেত্তো কে ভয় দেখাত আপনাকে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার ধর্ম-মা, ধর্মপিতা, ওই শিক্ষিকা, সবাই।

ফ্রেই বেত্তো তো আপনি কীভাবে বিদ্রোহটা করলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওই বাড়িতে সবাই ফরাসি বলত। ফরাসি শিক্ষাটা তাদের কীভাবে হয়েছিল, আমি ঠিক জানি না। তারা কোনো ফরাসি স্কুলে পড়েছিলেন কি না, কিংবা ফ্রান্সে গিয়েছিলেন কি না, কে জানে? তবে তাঁরা চোস্ত ফরাসি বলতেন এবং ফরাসি কায়দামাফিক চলতেন। যেমন একটা নিয়ম ছিল, কোনো বাচ্চা ছেলে কারো কাছে কিছু চাইতে পারবে না। ফরাসি শিক্ষামাফিক এটা সম্পূর্ণ নিষেধ। আমি যদি ওই বাড়িতে আমার বয়সী কোনো ছেলেমেয়ের কাছে কোনো প্রয়োজনীয় কিছু চাইতাম, দারিদ্র্য আর স্বার্থপরতায় অভ্যস্ত ছেলেগুলো আমার দিকে তাকিয়ে বলত, 'তুমি ভিক্ষা চাইছ, আমি বলে দেব কিন্তু।'

ওই বাড়ির কতগুলো নিয়মকানুন ছিল। এটা করা যাবে না, ওটা করতে হবে। কড়া সব আইন। মার্জিত ভাষায় কথা বলতে হবে। গলার স্বর কখনো উঁচু করা যাবে না। আমি এসবের সমালোচনা করছি না। তবে আমি ওর মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সবসময় মনে হতো আমাকে না-খাইয়ে রাখা হচ্ছে। এর মধ্যে অনেক ছোটখাটো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘটনাই রয়েছে, যা আপনাকে বলা হলো না। তো, এইভাবে একদিন স্কুল থেকে ফিরে আমি সচেতনভাবে ওই বাড়ির নিয়মকানুন সব ভাঙতে শুরু করলাম, যাতে আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি খুব উঁচুস্বরে কথা বলতে শুরু করলাম। যা যা বলা নিষেধ সেগুলো জোরে জোরে বলতে লাগলাম। তখন আমার বয়স সম্ভবত সাত। সেই ছিল আমার প্রথম বিদ্রোহ।

ফ্রেই বেত্তো তারপর তারা কি আপনাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, তা তো বটেই এবং আমারও বেশ ফুর্তি হলো। কারণ আমার কাছে বোর্ডিং মানেই স্বাধীনতা।

ফ্রেই বেত্তো বোর্ডিং স্কুলে আপনি কত বছর ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বছর চারেক। ফার্স্ট গ্রেডের দ্বিতীয় ভাগে ভর্তি হই, সেকেন্ড এবং থার্ড গ্রেড সেখানে শেষ করি। পরীক্ষার ফল ভালো হওয়াতে আমাকে একেবারে থার্ড গ্রেড থেকে ফিফথ গ্রেডে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে আমি যে দু বছর নষ্ট করেছিলাম তার কিছুটা পুষিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

ফ্রেই বেত্তো আপনার ঐ স্কুলে কি ধর্মীয় শিক্ষা ছিল? সেখানে কি স্বর্গ-নরক, পাপের শাস্তি, ঈশ্বর এসব নিয়ে খুব বলা হতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দেখুন, আমি অল্পবয়সেই তিন-তিনটা স্কুল বদলেছি। সেসময়কার সবগুলো কথা আমার মনে করাও বেশ মুশকিল। ধরুন, প্রথমে যখন সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে এলাম তখনকার কথা মনে আছে। আমি আমার পরিবার, বাড়ি, প্রিয় জায়গাগুলো, যেখানে আমি খেলতাম, দৌড়াতাম সেসব ছেড়ে এসেছিলাম। এসেছিলাম এমনকিছু লোকের মধ্যে যারা আমার আত্মীয় নন। অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি। বস্তুগত সমস্যা, মানসিক সমস্যা। তবে মজার অভিজ্ঞতা ছিল ওইসব সমস্যার সমাধানের উপায় বের করার চেষ্টা। ওই পরিবারের নিয়মকানুনের মধ্যে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার ঠিক ধর্মীয় কোনো সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল ভিন্ন। আমি স্রেফ আবেগ আর প্রবৃত্তি দিয়েই ওই অবস্থার বিরোধিতা করেছিলাম। তারপর বোর্ডিং স্কুলে এসে আমার বস্তুগত অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। ক্লাসের পর খেলতে পারতাম, প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন গ্রামে বা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতাম। বেশ ফুর্তিতেই ছিলাম। সেখানে অন্যান্য ক্লাসের সঙ্গে ধর্মীয় ক্লাসও ছিল এবং নিত্যদিনের কাজের অংশের মতো প্রার্থনাও ছিল। ধর্ম ব্যাপারটাকে খুব আলাদা করে কিছু শিক্ষা দেয়া হয়নি। ধর্মীয় শিক্ষাটাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো ধরুন, পাপ, পাপের শাস্তি এসব বলে আপনাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা হতো না? স্বর্গ-নরকের ভাবনা আপনার ভেতর জাগত না?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এসব ভাবনা কিন্তু তখনো তেমন মাথায় আসেনি। এসেছে আরো পরে। সেসময় ধর্মটা আমি পড়েছি কিউবার ইতিহাস পড়ার মতোই। পৃথিবীর সৃষ্টির কথা যেসব বলা হতো, সেগুলো সব সত্য বলেই ধরে নিতাম। ওইসব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতাম না। ঐ সময় আমি বেশি ব্যস্ত ছিলাম খেলাধুলা, সমুদ্রসৈকত, প্রকৃতি, স্কুলের অন্যান্য পড়া এসব নিয়ে। ধর্ম নিয়ে তখন সত্যিই আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। যেমন ক্রিসমাস আমার কাছে ছিল দারুণ মজার একটা ব্যাপার। কারণ ক্রিসমাস মানেই ছিল পনেরো দিনের ছুটি। শুধু ছুটি না, ক্রিসমাস মানেই উৎসব, চকোলেট, বিস্কুট, খেলনার ছড়াছড়ি। ছুটিতে কিছুদূর ট্রেনে গিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরতাম। সেসময় আমাদের বাড়িতে গাড়ি যেত না, বিদ্যুৎ ছিল না। বাড়িতে ফিরে নদীতে সাঁতার, জঙ্গলে হাঁটা, পাখি শিকার এসব। সুতরাং ক্রিসমাস, নববর্ষ, ইস্টার, পবিত্র সপ্তাহ এসব ছিল আমার জন্য মহাআনন্দের সময়, ধর্মীয় কোনো ব্যাপার তার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারটা ভাবনায় আসে আরো পরে, আমি যখন যাজক স্কুলে।

ফ্রেই বেত্তো যাজক স্কুলে কখন ভর্তি হলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি যখন ফিফথ গ্রেডে তখন যাজক স্কুলে ভর্তি হই। তবে তার আগে লা সালে বোর্ডিং স্কুলে আমার জীবনের বিদ্রোহের গল্পটা শোনাই। ব্যাপারটা হয়েছিল ওখানকার এক ব্রাদারের সঙ্গে। বোর্ডিং স্কুলের পড়াশোনা, পরিবেশ সব ভালোই ছিল, কিন্তু ওখানকার কিছু শিক্ষকের অভ্যাস ছিল ছেলেদের চড়-থাপ্পড় মারা। এ ব্যাপারটাই ছিল আমার ভীষণ অপছন্দের। একদিন আমার ক্লাসেরই এক ছেলের সঙ্গে আমার একটু মারামারি হয়, এই বয়সের ছেলেদের মধ্যে যা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই নিয়ে একজন ব্রাদার আমার দুইগালে প্রচণ্ড চড় মারে। আমি তখন থার্ড গ্রেডে। ওই চড়টা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আবার একদিন আমি যখন ফিফথ গ্রেডে, সেই ব্রাদার আবার আমাকে চড় মারে। প্রথমবার আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু এবার আমি ভীষণ খেপে উঠি, সেই ব্রাদারের সঙ্গে প্রবল তর্ক শুরু করে দিই এবং আমি ওই স্কুল ত্যাগ করারও সিদ্ধান্ত নিই।

এ ছাড়াও ওখানে আমি স্বজনপ্রীতির নানারকম ব্যাপার দেখতে পাই। টাকার দৌরাত্ম্য যে কতটুকু, সেটাও আমি ওখানে দেখি। আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারতাম, স্কুলের কিছু ব্রাদার আমাকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি যত্ন করছে। আমাকে এবং আমার পরিবারকে তারা বেশি খাতির করত। কারণ সবাই জানত আমার বাবা প্রচুর জমির মালিক এবং ধনী ব্যক্তি। টাকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং আচরণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্থক্যটা আমি তখন লক্ষ করেছিলাম, আমি তখন ফিফথ গ্রেডে, নেহাত ছোট নই। অনেক কিছু বোঝার বয়স হয়েছে। তখন ওইরকম কড়া শারীরিক শাস্তি আমাকে খুবই ক্ষুব্ধ করেছিল। ওই স্কুল ছেড়ে আমি যাজক স্কুলে চলে আসি।

ফ্রেই বেত্তো আপনার যাজক স্কুলটার নাম কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওটার নাম ছিল কলেজিয় ডু ডোলারেস। একেবারে বড়লোকদের অভিজাত স্কুল।

ফ্রেই বেত্তো আপনি কি শুরু থেকেই ওখানকার হোস্টেলে থাকতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, হোস্টেলে উঠবার আগে বেশ কিছুদিন আমাকে মহড়া হিসেবে আরেকজনের বাড়িতে থেকে স্কুল করতে হয়েছে।

ফ্রেই বেত্তো কার বাড়িতে থাকতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার বাবার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেও আমার নতুন সব অভিজ্ঞতা। সৌহার্দ্যের নমুনা হিসেবে বন্ধুর ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখে পড়ানোর এরকম রেওয়াজ তখন ছিল। কিন্তু আসলে এর পেছনে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য এসব কিছু ছিল না, ছিল নানারকম অর্থনৈতিক ধান্দাবাজি। সত্যিকার উদার, ভালো মানুষের পক্ষে কোনো বন্ধু পাওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার তখন। আশ্চর্য এক সময় সেটা। সবাই স্বার্থপর। যে যেই কাজটা করুক তার পেছনে একটা লোভ কাজ করত। লোকজনের মধ্যে মমতা, বিনয়, সহমর্মিতা এসব খুব দুর্লভ ছিল।

ফ্রেই বেত্তো সে সমাজটাকে কি তারা খ্রিস্টীয় সমাজ বলে মনে করত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : সে তো আজকাল বহু লোকই নিজেদের মহাখ্রিস্টান বলে প্রচার করে আর কাজ করে চলে সব পৈশাচিক, অমানবিক। পেনোচেট, রিগান, বোথা এরাও তো নিজেদের খ্রিস্টান বলে দাবি করে। আমার পরিচিত সেই পরিবারদের আর কী দোষ দেব? নিয়মিত প্রার্থনা ইত্যাদি ঠিকই চলত। তাদের পাশাপাশি ঠিকই থাকত স্বার্থপরতা, অসদাচরণ। আর আমি যে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছিলাম, যতই সে আমার বাবার বন্ধু হোক, আমি তো আর তার সন্তান ছিলাম না। বাবা-মার মতো যত্ন তাই স্বভাবতই পেতাম না। তারাও আমার ওপর নানারকম কড়া আইন জারি করেছিল। বারবার স্কুল পরিবর্তন করে আমার মধ্যে যে একটা মানসিক সংকট ছিল সেটা তারা লক্ষ করতেই চায়নি, তারা সবসময় আমাকে ক্লাসে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ার জন্য চাপ দিত। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর না পেলে সপ্তাহ শেষে আমার জন্য বরাদ্দ পাঁচ সেন্ট আমাকে দেয়া হতো না। ঐ পাঁচ সেন্ট পেলে আমার মনে আছে আমি আইসক্রিম কিনতাম, কমিক বই কিনতাম। তখন আর্জেন্টিনা থেকে 'চড়ুই' নামে একটা মজার কমিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেরুত। ওই পয়সা দিয়ে আমি কতগুলো গল্পের বইও কিনেছিলাম। একটার নাম মনে আছে 'যেমন বাপ তেমন বেটা'। যা হোক, কিন্তু ক্লাসে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ার জন্য অমন জোরাজুরি আমার মোটেও পছন্দনীয় ছিল না। বেশি নাম্বার পাওয়ার জন্য এই তাগাদার পেছনে আসলে কাজ করেছে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন। আগেই বলেছি, ওটা ছিল উচ্চবিত্তদের স্কুল। ওই স্কুলে পড়া একটা সামাজিক মর্যাদা বলে গণ্য হতো। সেখানে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া আরো নামডাকের ব্যাপার। আমি ভালো করলে নাম হতো ঐ ব্যবসায়ীর। কারণ সে-ই তো আমার অভিভাবক। এইভাবে আমি ব্যবহৃত হয়েছি, নানা মানসিক চাপের মধ্যে থেকেছি। আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না। আমার বয়স তখন এগারো বছর।

লা সালে স্কুলে ব্রাদারের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর বাবা তো আমাকে আর শহরে পড়তে পাঠাতেই চাননি। পরে অনেক বাগবিতণ্ডা করে প্রথমে আমি মাকে রাজি করাই, শেষে মা-বাবাকে রাজি করান, অবশেষে আমাকে আবার সান্টিয়াগো ডু কিউবায় পাঠানো হয়, সেই ব্যবসায়ীর বাড়ি। আমি যে শিক্ষকদের রুঢ় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম সেটা বোধ হয় এইজন্য যে, আমার ভেতর তখন একটা ন্যায়-অন্যায় বোধ জেগে উঠছিল, একটা আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হচ্ছিল। এরপর ব্যবসায়ীর বাড়িতে আমার সমস্যার কথা তো আপনাকে বলেছি। অবশ্য ওখানে আমি একজন কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষিকা পেয়েছিলাম, তার কথা আমার এখনো মনে পড়ে। তার নাম প্রফেসর জ্যাভার। এই মহিলা আমাকে সব ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন, তিনি আমাকে পড়বার জন্য ছক কেটে সময় ভাগ করে দিতেন। এই মহিলার কাছ থেকে আমি একটা শৃঙ্খলার মধ্যে কীভাবে কাজ করতে হয়, তা শিখেছি, জীবনের একটা উন্নত, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য স্থির করতে শিখেছি।

এর মধ্যে আমি হাসপাতাল গেলাম আমার অ্যাপেন্ডিক্স কাটতে। তখন সবাই এমনিতেই হাসপাতালে গিয়ে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন করে আসত। কিন্তু আমার ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। তিন মাস আমাকে হাসপাতালে থাকতে হলো। ক্লাসের পড়ায় অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। এরপর আমি স্কুলের হোস্টেলে চলে যেতে মনস্থির করলাম। আমি নানাভাবে ওই বাড়িতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে লাগলাম, যাতে ওরা আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। শেষে সিক্স গ্রেডে উঠবার পর তারা আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়। ওখানে যাবার পর আমি ক্লাসে বেশ ভালো রেজাল্ট করতে থাকি। সপ্তম গ্রেডে উঠে আমি ক্লাসের প্রথম তিনজনের মধ্যে চলে আসি। অবশ্য আমি পড়ার বাইরে অন্য ব্যাপারগুলোতেও খুব উৎসাহী ছিলাম। খেলাধুলা আমার দারুণ প্রিয় ছিল আর পছন্দ করতাম গ্রামে ঘুরতে আর পর্বতারোহণ। আমি বেশি খেলতাম বাস্কেটবল, বেসবল আর ফুটবল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো স্কুলে তখন ফুটবল খেলা হতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো খুবই হতো এবং আমি তো নিয়মিতই খেলতাম।

ফ্রেই বেত্তো ভলিবল খেলতেন না?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ভলিবলও খেলতাম। তবে আমার বেশি প্রিয় ছিল ফুটবল। তারপর বাস্কেটবল আর বেসবল। আমি প্রায় সব খেলাই খেলতাম, খেলাধুলা সব সময়ই আমার প্রিয় বিষয় ছিল। এই স্কুলের অনেক ব্যাপারই বেশ ভালো ছিল। নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার ব্যাপারে এখানে খুব জোর দেয়া হতো। ছাত্রদের চরিত্র গঠন এবং আত্মিক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়া হতো। আমি ঐ যাজক স্কুলে শুধু ধর্ম-বিষয়ে শিখিনি, মানুষের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে উন্নত রাখবারও শিক্ষা পেয়েছি। আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই তারা খেলাধুলা আর পর্বতারোহণকে উৎসাহ দিত। পর্বতারোহণ আমার আরেকটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। কত দুর্গম পাহাড় আমি একা একা আরোহণ করেছি। বিপজ্জনক হলেও আমাকে তারা কখনো নিরুৎসাহিত করেনি। ছাত্রদের মধ্যে তারা সাহস-উদ্দীপনা দেখলে আনন্দিতই হতেন, একে তারা আত্মিক উন্নতির নমুনা হিসেবেই মনে করতেন।

ফ্রেই বেত্তো তারা তো স্বপ্নেও ভাবেনি যে, তারা আসলে এক ভবিষ্যৎ গেরিলাকেই ট্রেনিং দিচ্ছেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো স্বপ্নে তো আমিও ভাবিনি যে আমি তখন গেরিলা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার মনে আছে, কোনো একটা পাহাড় দেখলেই ওটার চূড়ায় ওঠার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। এক-একটা পাহাড় আমার কাছে এক-একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হতো, চূড়ায় পা রাখাটা আমার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন হতো, বাসে করে সব ছাত্র আর শিক্ষক কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে গেলাম। আমি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা বেছে তাতে উঠতে শুরু করতাম। ছাত্ররা বাসে আমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত। আমি পাহাড়ের চূড়াটা স্পর্শ করে তারপর নেমে আসতাম। শিক্ষকরা কখনো রাগ করতেন না, বরং আমার অভিযানপ্রিয়তা, উদ্দীপনাকে প্রশংসা করতেন।

বলা বাহুল্য, ওই স্কুলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে আমি কখনোই একমত ছিলাম না। কিন্তু ওই স্কুলে পড়ার কারণে আমি অনেক দিক থেকেই উপকৃত হয়েছি। বুঝতেই পারছেন এইভাবে নানা কিছুর প্রভাবে আমার কৈশোরের চরিত্রগঠন প্রক্রিয়া চলছিল।

ফ্রেই বেত্তো আপনার স্কুলজীবনের ধর্মশিক্ষা নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম। স্কুলে কি আপনাদের প্রতিদিন প্রার্থনায় বসতে হতো?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, প্রতিদিনই নাশতার আগে সেটা করতে হতো। ব্যাপারটা আসলে খুবই যান্ত্রিক ছিল। প্রতিদিন একইভাবে শত শতবার মেরি আর প্রভুর নাম জপ করে একজন বালকের মনকে বিশেষ উন্নত করা যায় বলে আমার মনে হয় না। লিখিত কিছু গৎবাঁধা কথা একশোবার বিড়বিড় করে উচ্চারণ করাকে কি প্রার্থনা বলা যায়? এতে বরং কণ্ঠনালির কিছু ব্যায়াম হয়। ধর্মশিক্ষার এই পদ্ধতিকে আমি মোটেও উপযোগী মনে করি না।

ফ্রেই বেত্তো ক্লাসে কি বাইবেল নিয়ে আলাপ হতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, বাইবেল আমাদের পাঠ্যসূচিতেই ছিল। বাইবেল অবশ্য আমার বেশ মজাই লাগত। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে জমজমাট গল্প, মহাপ্লাবনের বর্ণনা কিশোর-মনের জন্য বেশ উপভোগ্যই ছিল। তবে মনে পড়ছে বাইবেলের একটা কাহিনী শুনতে শুনতে তখনই আমার খুব খটকা লেগেছিল। নূহ একবার কী কারণে প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। সেটা দেখে তার এক পুত্র তাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা-মশকরা করছিল। নূহ ভীষণ রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন, ঐ পুত্রের উত্তরসূরিরা সব কালো হয়ে জন্মাবে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, কালো হয়ে জন্মানো একটা শাস্তি, একটা অভিশাপের ফল। কোনো ধর্মের পক্ষে এ ধরনের শিক্ষা দেওয়া খুবই অন্যায়।

ফ্রেই বেত্তো আমিও আপনার সঙ্গে একমত। এবার বলুন, আপনি তো গরিব ঘরের সন্তান নন, কিন্তু গরিবদের প্রতি আপনার সহানুভূতিটা গড়ে উঠল কীভাবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাহলে আমাকে আবার সেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে হয়। আপনাকে আগেই বলেছি আমাদের পরিবার থাকত গ্রামে, গরিবদের মধ্যে। আমার আশপাশে ছিল নগ্নপায়ের ছেলেমেয়েরা, ওদের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব ছিল। আমি দেখেছি ওদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, দেখেছি কীভাবে একটা সাধারণ রোগের প্রকোপ ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা পরিবার। এসব নিয়ে ওই বয়সেই নিশ্চয়ই এত চিন্তাভাবনা করিনি, তবে ঐ জীবনটার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিল সব গরিব ঘরেরই ছেলে। ছুটিতে যখন বাড়িতে আসতাম, ওদের সঙ্গেই নদীতে, জঙ্গলে বেড়াতাম, খেলতাম। আমার আলাদা কোনো শ্রেণি ছিল না। আমাদের ওই গ্রামে আলাদা কোনো বুর্জোয়া বা সামন্তসমাজ ছিল না। সেখানে বিশ থেকে ত্রিশ জন ভূস্বামী ছিল, যারা অবশ্য সবসময় একসঙ্গে থাকত। কিন্তু আমার বাবা ওদের থেকে পৃথক থাকতেন। বাবার কোনো কোনো বন্ধু আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন, কিন্তু আমরা কখনো কারো বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার বাবা-মা সাধারণত বাড়িতেই থাকতেন। ফলে আমি বাইরের মানুষ বলতে বাবার খামারে কাজ করা ওই গরিব মানুষদেরই দেখতাম। আমি হাইতিয়ানদের কুঁড়েঘরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেতাম। হাইতিয়ানদের বাড়িতে ওদের সঙ্গে বসে একবার খাওয়ার জন্য আমি বেশ বকা খেয়েছিলাম। আমাকে ঠিক সামাজিকতার প্রশ্নে বকা দেয়া হয়নি, বকা খেয়েছিলাম স্বাস্থ্যগত প্রশ্নে। আমার বাবা-মার শ্রেণির কোনো অহমবোধ ছিল না। তাদের ঠিক ভূস্বামী মানসিকতাও ছিল না।

আমার ভেতর নৈতিকতার ধারণা এসেছে আমার স্কুল এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে, আমার পরিবার থেকেও। খুব ছোটবেলা থেকেই আমাকে বলা হয়েছে কোনোভাবেই মিথ্যাকথা বলা যাবে না। আমার স্কুলের শিক্ষকরাও তাই বলেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মার্কসীয় দর্শন বা নৈতিক আদর্শ থেকে বলেননি, বলেছেন ধর্মীয় নৈতিকতার দিক থেকে। তাঁরা আমাকে শিখিয়েছেন কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা ভুল। আমাদের সমাজে এইভাবে ধর্মীয় আবহ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে সবাই নৈতিকতার শিক্ষা পায়। যদিও তাতে অনেক অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাও থাকে। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে ভুলশুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা জন্ম নিতে থাকে এবং বেশকিছু তথাকথিত নৈতিকতাকে আমি ভঙ্গ করতে থাকি। ছোটবেলা থেকেই আমার যেমন নৈতিকতার শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তেমনি নৈতিকতা ভঙ্গের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তথাকথিত নৈতিকতার নামে মানুষের অনেক অনৈতিক কাজ আমি দেখেছি।

যৌবন, দিনবদলের প্রস্তুতি

ফ্রেই বেত্তো আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের রাজনীতির কথা বলুন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেছি ১৯৫০ সালে। বলতে গেলে এই সময়ের মধ্যেই আমি আমার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করি। শুধু চিন্তাগত অর্থে নয়, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ সম্পর্কেও আমার একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরপরই আমি একটা প্রতিবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত হই, এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিল।

ফ্রেই বেত্তো সেটা কি অর্থোডক্স পার্টি?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, প্রকাশ্যে সে দলের নাম ছিল কিউবান পিপলস পার্টি। এ দলের বিপুল সমর্থকগোষ্ঠী ছিল। অনেক সৎ, বোদ্ধা ব্যক্তিরা এ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ দল মূলত বাতিস্তা সরকারের দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাত। আরো অনেক তরুণের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমিও এ দলে যোগ দিয়েছিলাম, যদিও বিপ্লবী আদর্শ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই তখন আমার গড়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার পরও এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দলের সঙ্গে আমার দৃঢ় সম্পর্ক ছিল, যদিও আমার নিজস্ব চিন্তাভাবনা তখন আরো অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আমার আরো কয়েকটা কোর্স করবার ইচ্ছা ছিল। রাজনীতিতে পুরোপুরি নিয়োজিত হবার আগে আমি নিজেকে আরো খানিকটা প্রস্তুত করে নিতে চেয়েছিলাম। বিশেষ করে, রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর আমার আরো পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল। একটা শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার জন্য আমার সাধারণ আইন, কূটনৈতিক আইন এবং সমাজবিজ্ঞান এই তিনটি বিষয়ে পাস করা খুব জরুরি ছিল। বিষয়গুলো পাস করবার জন্য আমি জোর চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। আমি তখন নিজের পয়সাতেই চলতাম। প্রথম কয়েক বছর আমাকে বাড়ি থেকে টাকা পাঠানো হতো, কিন্তু শেষের দিকে বাড়ি থেকে টাকা আনার চিন্তা বাদ দিতেই হলো। ইতিমধ্যে আমি আবার বিয়েও করেছিলাম। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার একটা উপায়ই আমার ছিল, বিদেশে একটা শিক্ষাবৃত্তি যোগাড় করা। আর বৃত্তি পেতে হলে ঐ তিনটি বিষয়ে পাস করা আমার জন্যে প্রয়োজন ছিল। বৃত্তি আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। আর মাত্র দুটো কোর্স শেষ করলেই আমার প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হতো। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। বাস্তবতা আমাকে অস্থির করে তুলল এবং মাঠে নামতে বাধ্য করল। বৃত্তির বদলে আমি বরং আমার বৈপ্লবিক চিন্তাচেতনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর থেকে আমার সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যন্ত আট বছর অতিবাহিত হয়েছে। আপনাকে আগেই বলেছি আমার কোনো গুরু ছিল না। এত অল্প সময়ে একেবারে নিজের মতো করে শূন্য থেকে এরকম একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সত্যিই কম ব্যাপার নয় কিন্তু। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে মার্তির ধারণাকে মিলিয়ে ক্রমাগত সংগ্রাম করে গেছি।

আমি তখন দেখেছি কিউবান কম্যুনিস্টরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। নানা প্রতিক্রিয়াশীলতা তাদের আচ্ছন্ন করে আছে। যত কিছুই করুক, তারা ছিল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিউবান শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টরা যথেষ্ট কাজ করেছিল, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে কোনো সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুতরাং আমি নতুন একটা বৈপ্লবিক কৌশলের কথা ভাবতে লাগলাম। আমি চাইলাম শুধু, একটা শ্রেণি নয়, জনগণের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকা সকল অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট মানুষকে এই বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে—যে মানুষগুলোর হয়তো স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই, কিন্তু যারা একটা পরিবর্তন চান এবং বস্তুত যারা জনগণের সবচেয়ে বৃহৎ অংশ। আমি বলেছিলাম, 'অকলঙ্কিত, বিদ্রোহী সাধারণ মানুষই হচ্ছে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের অবশ্যই বিপ্লবের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ধাপে ধাপে।' কিন্তু এক রাতে কিছু কথা দিয়েই তো আর জনগণের মধ্যে সচেতনতাকে জাগিয়ে তোলা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে, সাধারণ মানুষই হচ্ছে আসল শক্তি। যদিও সে মানুষেরা তখন দ্বিধাগ্রস্ত বা সাম্যবাদের নামে ভীতসন্ত্রস্ত। তারা রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, পত্রিকা, বইয়ের নানা ভ্রান্ত রাজনৈতিক প্রচারণায় বিভ্রান্ত।

সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকে তখন মানবজাতির জন্য অভিশাপ হিসেবে প্রচার করা হতো। ছোটবেলা থেকেই সবাই শুনত যে সমাজতন্ত্র মানুষের ঘরবাড়িসহ ব্যক্তিগত যা-কিছু আছে সব কেড়ে নেয়, কৃষকদের নিজের জমি আর নিজের থাকে না, তারা পরিবার ভেঙে দেয়—এমন আরো নানা কিছু। মার্কসের সময় বলা হতো কম্যুনিস্টরা মেয়েদের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত করে। এভাবে বিভিন্ন সময়েই মানুষকে কলুষিত করার জন্যই অদ্ভুত সব বিষয় তারা আবিষ্কার করেছে। কিউবাতেও বহু মানুষ কম্যুনিজমের বিরোধী ছিল। তারা ঠিক জানতই না কম্যুনিজম ব্যাপারটা আসলে কী। কিন্তু আমি দেখতাম মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য আর প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগছে। এই ভোগ শুধু বৈষয়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থেও। একজন কষ্ট পাচ্ছে শুধু এজন্য নয় যে তার প্রয়োজনীয় ৩০০০ ক্যালরির বদলে সে পাচ্ছে মাত্র ১৫০০ ক্যালরি। মানুষের আরো অন্যরকম কষ্ট রয়েছে। সেটা সামাজিক বৈষম্যের কষ্ট, এই কষ্ট মানুষকে ক্রমাগত হীন, ক্ষুদ্র করে তোলে। সে ভাবতে থাকে সে কিছু নয়, সে সমাজের জন্য নিষ্প্রয়োজন, তার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই। সেইসঙ্গে আমি এও লক্ষ করি, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। সমস্যার সঠিক ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই, তারা বিভ্রান্ত। কিউবান পিপলস পার্টি, যার কথা আগে বলছিলাম, তারা জনগণের এই অসন্তোষটাকে ধারণ করত, কিন্তু এজন্য তারা কখনো সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদকে দোষারোপ করত না। এ প্রসঙ্গে আমি বলব, এর কারণ আমাদের একটা তৃতীয় ধর্ম শেখানো হয়েছিল, সেটা হলো মহান আমেরিকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার ধর্ম। সে আর এক বৃত্তান্ত।

ফ্রেই বেত্তো মার্কসবাদে আপনার উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা জানতে চাই। ১৯৫৩তে আপনারা যখন মনকাডা গ্যারিসন আক্রমণ করলেন, আপনি কি তখন মার্কসবাদকে আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, ততদিনে আমার ভেতর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ভিত বেশ ভালোভাবেই গড়ে উঠেছে।

ফ্রেই বেত্তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই কি এই আদর্শের সঙ্গে আপনার পরিচয় ঘটল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অবস্থাতেই আমি মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে শুরু করি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো সেটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার পর?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আসলে বিভিন্ন বিপ্লবী সাহিত্য পড়তে গিয়েই মার্কসবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। ছাত্র হিসেবে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়তে পড়তে আমি নিজে থেকেই একটা বিকল্প সুষম অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা কল্পনা করতাম, যেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর খুব কাছাকাছি। সত্যি কথা বলতে কি, মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করবার আগেই আমি মনে মনে সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছিলাম। আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল একজন ইউটোপিয়ান কম্যুনিস্ট হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক বছরগুলোতে আমি একে একে বিভিন্ন বিপ্লবী আদর্শ, কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের কিছু লেখা এসবের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। সত্যি বলতে কি, কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোতে যে সহজ, স্পষ্ট এবং সোজাসুজি ভাষায় আমাদের সমাজকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা আমার ওপর বিপুল একটা প্রভাব ফেলেছিল।

তবে ইউটোপীয় বা মার্কসীয় কম্যুনিস্ট হবার আগে আমি ছিলাম হোসে মার্তির একনিষ্ঠ অনুসারী। সেই হাইস্কুল থেকেই আমি মার্তির ধ্যানধারণার অনুসারী ছিলাম। আমরা সবাই তখন তাকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করতাম। সেইসঙ্গে আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল স্বাধীনতার জন্য কিউবার জনগণের দীর্ঘদিনের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি। আমার দেশের ইতিহাস খুবই উদ্দীপক। এতে ছড়িয়ে আছে বিস্তর সাহসিকতা, আত্মমর্যাদা আর বীরত্বের উদাহরণ। আমি যখন বীরযোদ্ধা জেনারেল আন্তোনিও মাসেওর অগণিত যুদ্ধজয়ের কাহিনী শুনি, আমি যখন কিউবার পক্ষে যুদ্ধে যোগদানকারী সেই দুই ডোমেনিকান, ইগনাসিও আগ্রামন্তে আর ম্যাক্সিমো গোমেজের গল্প শুনি, এক স্প্যানিশ নাগরিকের কবর অপবিত্র করবার অভিযোগে ১৮৭১-এর সেই যে নিষ্পাপ মেডিকেল ছাত্রটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, তার কথা যখন আমার মনে পড়ে, গর্বে, বেদনায় বুক আমার ভরে ওঠে। এদেশের পিতা মার্তি আর কার্লোস ম্যানুয়েল ডো সেসপেডেসের কথা আমরা স্মরণ করি। সুতরাং আপনি যে বাইবেলের ইতিহাসের কথা বলছিলেন তার পাশাপাশি এদেশেরও নিজস্ব একটা পবিত্র ইতিহাস আছে।

আপনাকে বলছি, মার্কসবাদী হওয়ার আগে আমি মার্তির অনুসারী ছিলাম। মার্কস এবং মার্তি দুজনের নামই শুরু হয় 'ম' দিয়ে, দুজনের মধ্যে মিলও রয়েছে বিস্তর। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত মার্তি যদি মার্কসের মতো পরিবেশে থাকতেন তাহলে তিনি ঐ একই আদর্শে পৌঁছাতেন এবং একই রকম কর্মকাণ্ড করতেন। মার্কসের প্রতি মার্তির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মার্কস যেহেতু দুর্বলের পক্ষ নিয়েছেন সেহেতু তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধা দাবি করেন'। মার্কসের মৃত্যুর পর মার্তি চমৎকার একটা লেখা লিখেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি মনে করি মার্তির চিন্তার ভেতর এমন কিছু মহান এবং চমৎকার ব্যাপার রয়েছে যে, কেউ একজন তাঁর ধ্যানধারণাকে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গ্রহণ করে অনায়াসেই একজন মার্কসবাদীতে পরিণত হতে পারেন। যদিও তিনি সমাজের শ্রেণিবিভাজনের কোনো ব্যাখ্যা দেননি, তবু তিনি সবসময়ে প্রাণপণে দাঁড়িয়েছেন দরিদ্রের পক্ষে, তীব্র সমালোচনা করেছেন শোষণের।

আমি যখন প্রথম কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো পড়লাম, বস্তুত তখনই ব্যাপারগুলো আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চারিদিকে অগণিত ঘটনার অরণ্যকে আমি তখন স্পষ্টভাবে বুঝে ওঠতে পারছিলাম, সবকিছুর জন্য তখন মনে হচ্ছিল মানুষের নৈতিকতা বা ব্যক্তিগত আচরণই দায়ী নয়, এর বাইরে আরো শর্ত রয়েছে। আমি মানুষের সমাজ গড়ে উঠবার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি বুঝে উঠতে শুরু করলাম, নিত্যদিন যে বৈষম্য চোখের সামনে দেখি তার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তাছাড়া শ্রেণিবৈষম্য বুঝবার জন্য তো আর ম্যাপ, মাইক্রোস্কোপ বা টেলিস্কোপ লাগে না। আপনার চোখের সামনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একদল না-খেয়ে আছে আর একদলের ঘর ভরে আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসে। এ ব্যাপারটা আমার চেয়ে বেশি কে আর জানবে বলুন। কারণ, আমি এই দুটো অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই পার হয়েছি, বলতে গেলে দুটো পরিস্থিতিরই শিকার হয়েছি।

বাবার কথা আপনাকে বলেছি। তিনি যদিও একজন ধনী ভূস্বামী ছিলেন, ভূস্বামীদের মতোই ছিল তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস, তিনি তাঁর স্বার্থ এবং শ্রমিকদের স্বার্থের পার্থক্য সম্পর্কে যদিও সচেতন ছিলেন, তারপরও তাঁর শ্রমিকদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। কোনো সাহায্যের আশা নিয়ে কেউ কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত না। আমার বাবার জমির চারপাশে ছিল আমেরিকান মালিকদের হাজার হাজার হেক্টর জমি। সেসব মালিক থাকত নিউইয়র্কে আর তাদের ম্যানেজাররা এসব জমি দেখাশোনা করত। এসব ম্যানেজার অত্যন্ত কঠোর এবং নির্মমভাবে কৃষি-শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এসব জমি যথেষ্ট উর্বর ছিল না বলে সেখানে একবারের বেশি ফলন হতো না; পাশাপাশি আমার বাবার জমিতে দু-তিনবার করেও ফলন হতো। ফলে ঐ আমেরিকান মালিকদের জমির কাজ ফুরিয়ে গেলে সব শ্রমিক এসে ভিড় করত আমার বাবার কাছে। বাবা তাদের সবার জন্যই কিছু-না-কিছু কাজের ব্যবস্থা করতেন। আমার ছুটির সময় বাবা আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে যেতেন। আমি সেখানে দেখতাম কীভাবে শুধুমাত্র সেই দিনের খাবার যোগাড়ের জন্যে, একটা কোনো কাজ পাবার আশায় শীর্ণ, বুভুক্ষ অসংখ্য মানুষ সারাদিন বসে আছে। প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্যকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ট্রাক্টরের অধিকারী পরিবারকে যেমন দেখেছি, পাশাপাশি তেমন পরিবারও দেখেছি, যাদের স্রেফ কিচ্ছু নেই। মানুষ যে দুই ভাগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভক্ত, একদল যে আরেক দলকে শোষণ করছে, একথা আমাকে অন্যের কাছ থেকে বুঝে নিতে হয়নি। আমার চোখের সামনেই আমি তা স্পষ্ট দেখছিলাম।

কারো ভেতর যদি বিদ্রোহের খানিকটা লক্ষণ থাকে, খানিকটা নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা থাকে, সেইসঙ্গে সে যদি কোনো আদর্শের সংস্পর্শে এসে এই জগৎকে বুঝবার একটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে, তাহলে তার ভেতর একটা আশ্চর্য রাজনৈতিক বোধোদয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে আমার বেলাতেও তাই ঘটেছে। মার্কসীয় ধ্যানধারণা আমাকে জয় করে নিয়েছিল। নিমেষে আমার চারপাশের ঘটনাবলি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমি সত্যিই একটা দিব্যদৃষ্টি পেয়ে গিয়েছিলাম।

ফ্রেই বেত্তো কিউবার রাজনীতিতে তখন আমেরিকার প্রবল প্রভাবের কথা বলছিলেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, সরকারিভাবে তখন অব্যাহতভাবে প্রচার করা হতো যে, আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, আমেরিকা আমাদের বন্ধু, সে অতীতে আমাদের সাহায্য করেছে, এখনো করছে।

ফ্রেই বেত্তো প্রচুর আমেরিকান পর্যটকও তো তখন কিউবাতে আসত।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, তা আসত বটে। কিন্তু আমি বলছি আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির কথা। আমাদের বলা হতো, আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯০২ সালের ২০ মে-তে, যেদিন আমেরিকা একটা সংশোধিত সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের একটা নয়া-ঔপনিবেশিক প্রজাতন্ত্র হস্তান্তর করে, যে সংবিধানে কিউবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকারও তারা সংরক্ষিত রাখে। চার বছর আমাদের দেশ দখল করে রাখার পর প্লাত সংশোধনীর মাধ্যমে আমেরিকা কিউবার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এই কুখ্যাত অধিকারটি আদায় করে নেয়। এভাবেই নানা উপায়ে ক্রমশ আমাদের জমি, খনিজ, ব্যবসা, অর্থনীতি সব দখল করে নিতে থাকে।

ফ্রেই বেত্তো এ প্রক্রিয়াটি কখন থেকে শুরু হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো শুরু হয় ১৮৯৮ সালে এবং চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯০২ সালের ২০ মে, ওই হাস্যকর প্রজাতন্ত্রটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তখন থেকেই তারা কিউবার সমস্ত সম্পদের ওপর অধিকার স্থাপন করতে থাকে। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার বাবা ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি নামে বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানির একজন কর্মী হিসেবেই প্রথম কিউবাতে এলেন। পাঠ্যবইগুলোতে তখন আমেরিকান জীবনের বিপুল প্রশংসা করা হতো। সীমাহীন ভুল তথ্য দেয়া হতো। কী করে আপনি এই পাহাড় পরিমাণ ভুল, এই মিথ্যাকে ভাঙবেন? আমার মনে আছে মানুষ কী দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করেছে, অথচ তারা জানত না কিছুই। তারা ছিল বিভ্রান্ত কিন্তু সংগ্রাম করতে প্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল। একটা কোনো পথ পেলেই তারা অদম্য সাহসে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাই তাদের ধীরে ধীরে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়েই এদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল।

এই ধারণা আমি গড়ে তুলি কিউবার ইতিহাস, কিউবার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, এদেশের জনগণের মানসিকতা এবং মার্কসবাদ চর্চার মাধ্যমে।

ফ্রেই বেত্তো অর্থোডক্স পার্টির বামঘেঁষা অংশের সঙ্গেই কি আপনি যুক্ত ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো অনেকেই জানত, আমি কোন্ ধারায় চিন্তাভাবনা করছি। ওরা আমাকে কম্যুনিস্ট ভাবত, কারণ আমি সবকিছু সবার কাছে খোলামেলাভাবে, অকপটে ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে আমি কখনোই সেসময়কার আশু গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করতাম না। আমি দারিদ্র্য, অন্যায়, বেকারত্ব, নিম্ন মজুরি, রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সর্বব্যাপী শোষণের কথা বলতাম। বিপ্লবের দিকে যাত্রা শুরু করার জন্য এইগুলিই ছিল যথোপযুক্ত বিক্ষোভের ক্ষেত্র। আমাদের জনগণ তখন এই বিক্ষোভকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

আগেই বলেছি তখনকার কম্যুনিস্ট পার্টি বেশ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং শ্রমিকদের মধ্যে তাদের ভালো কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও তারা ছিল বৃহত্তর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার চিন্তা যে সঠিক, তা কোনো কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্যকে বোঝাতে সক্ষম হতাম না। সে চেষ্টাও আমি করিনি। আমি শুধু আমার মতামত সবসময় তাদের জানাতাম। তাদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমি প্রায় সব বইই তখন '৩ কার্লোস রোডের' কমিউনিস্ট পার্টির সেই অফিস থেকে ধার করে পড়তে আনতাম। কিন্তু একটা ভাবনা সবসময়ই আমাকে তাড়িত করত। সেটা হলো, সুপ্ত বৈপ্লবিক বিশাল সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৫২'র ১০ মার্চ বাতিস্তার অভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেই আমি এ চিন্তার চর্চা করি।

ফ্রেই বেত্তো যে দলটা মনকাডা গ্যারিসন আক্রমণ করেছিল, তারা কি অর্থডোক্স পার্টির বাম অংশটির সদস্য ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এরা ওই পার্টির তরুণ অংশ। এদের আমি চিনতাম। এদের চিন্তাভাবনার সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। অভ্যুত্থানের সময়টায় আমি ওদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করি।

ফ্রেই বেত্তো আলাদা কোন্ নামে তাদের সংগঠিত করেছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি আসলে একটা সামরিক দল তৈরি করতে চাইছিলাম। স্বতন্ত্র কোনো বিপ্লবী পরিকল্পনা তখনো আমি গড়ে তুলিনি। যদিও আমি ১৯৫১ থেকেই একটা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা করছিলাম তবু সেটা উপস্থাপনের জন্য আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। অভ্যুত্থানের পরপরই আমি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তাব করতে থাকি।

ইতিমধ্যেই দলের ভেতর আমার একটা রাজনৈতিক শক্তিও গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী নির্বাচনে জিতবার জন্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দল ছিল অর্থডোক্স পার্টি। আমি জানতাম একমাত্র হাভানা প্রদেশ ছাড়া এই পার্টির নেতৃত্ব সব জায়গায় ছিল ভূস্বামী এবং বুর্জোয়াদের হাতে। শুধু হাভানায় এই পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন কিছু সৎ সম্মানিত রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। হাভানায় এই পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালীও ছিল। ৮ হাজার সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলটিতে যোগ দিয়েছিল। এই দলের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে, পার্টির প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর। সরকারি এক মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে শেষে আত্মহত্যা করেন এই সংগ্রামী নেতা। তিনি এক সরকারি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, সেই মন্ত্রী অবৈধ অর্থ দিয়ে গুয়েতেমালায় প্রচুর সম্পত্তি করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেননি। ফলে, অপমানে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পার্টি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়লেও সেটাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দল।

আমি জানতাম, এই দল পরবর্তী নির্বাচনে জিতবে। কিন্তু এর পরিণতি হবে হতাশাব্যঞ্জক। ফলে আমি ভাবলাম এ সময়টাতে আমাকে বরং সকল রাজনৈতিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে এবং দ্বিতীয় ধাপে বিপ্লবী কৌশলে ক্ষমতা দখল করতে হবে। মার্কসবাদ আমাকে এই বিষয়টি শিখিয়েছে যে, কোনো পরিবর্তন আনতে হলে প্রথাগত রাজনীতির মধ্যদিয়ে তা হবে না; ক্ষমতা দখল করতে হবে। বিপ্লবের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আমি কিছু বিষয়কে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবছিলাম, যেমন আইনসংক্রান্ত প্রশ্ন, সেটাই পরে মনকাডা প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটা কোনো সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল না, কিন্তু তা বিপুল মানুষের সমর্থন পেয়েছিল এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্যে এটা খুবই প্রয়োজনীয় ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে আমি দ্রুত হাভানার গরিব জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে সক্ষম হই। পাশাপাশি আমি অর্থোডক্স পার্টির সঙ্গেও কাজ করতে থাকি। পার্টিতে আমার কোনো নেতৃত্বের পদ ছিল না, কিন্তু পার্টির ভেতর আমার বেশ বড় একটা সমর্থক-গোষ্ঠী ছিল।

কিন্তু বাতিস্তার অভ্যুত্থানের পর সব পরিস্থিতি বদলে গেল। আমার পরিকল্পনা বদলাতে হলো। আমি ভাবলাম সবার আগে দেশকে এই বর্বর সামরিক স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করে পূর্বের সংসদীয় গণতন্ত্রের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি তখন নিজে থেকে অর্থোডক্স পার্টির সাধারণ তরুণ সদস্যদের পৃথকভাবে সংগঠিত করতে লাগলাম। আমরা বাতিস্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করতে লাগলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি জানতাম, সাধারণ মানুষের সমর্থন আমরা পাব, সেইসঙ্গে পূর্বতন সংসদের সব দলের সমর্থনও।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি প্রথম যোদ্ধাদল গঠন করে ফেললাম। আমি প্রথমত একটা সাংকেতিক সংবাদপত্র এবং কয়েকটি গোপন রেডিও স্টেশন স্থাপন করলাম। আবেল সান্তা মারিয়া, জেসাস মনটানে, নিকো লপেজ এবং আরো ক'জন মিলে আমরা ছোট সেই প্রথম দলটা গঠন করেছিলাম। সেখানেই ক্রমশ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে থাকে হাভানা এবং আর্তেমিসার বিভিন্ন শ্রেণির লোক, বিশেষ করে দরিদ্রশ্রেণির।

আমি সে দলের সার্বক্ষণিক পেশাদারি কর্মীতে পরিণত হলাম। সেসময় একমাত্র আমিই ছিলাম সে দলের পেশাদার কর্মী। গ্যারিসন আক্রমণের কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে যোগ দেয় আবেল। সুতরাং আমরা মাত্র এই দুজনেই দলটাকে সংগঠিত করি। মনকাডা আক্রমণটি সংগঠিত করতে আমাদের মাত্র ১৪ মাস সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ১২০০ সদস্য। আমি এই ১২০০ সদস্যের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে তাদের সংগঠিত করেছি। আপনি কি জানেন এর জন্য আমাকে কত কিলোমিটার ঘুরতে হয়েছিল? চল্লিশ হাজার। আমাকে ঘুরে ঘুরে এদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে, সংগঠিত করতে হয়েছে। কত অগণিতবার এই যোদ্ধাদের সঙ্গে আমার মত বিনিময় করতে হয়েছে, তাদের বিভিন্ন নির্দেশ দিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে গাড়িটা আমি এজন্য ব্যবহার করতাম, সেটার বিল পরিশোধ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কারণ আমি ছিলাম পেশাদার রাজনৈতিক কর্মী। আমার কোনো আয়ের উৎস ছিল না। আবেল এবং মনটানে সেসব বিল শোধ করত।

এভাবেই আমরা কিছু সৎ, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল তরুণদের নিয়ে একটা সুশৃঙ্খল দল গঠন করতে লাগলাম। আমরা শুধু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেয়ার কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিল না। আমরা শুধু অন্যান্য দলের সহযোগী ভূমিকা পালন করতে চাইছিলাম, তার বেশিকিছু নয়। দেশে তখন অনেক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু ক্রমশই আমাদের অভিজ্ঞতা হলো যে, তারা সবই কপট ও ভণ্ড। ফলে আমাদের নিজেদের মতো করে নতুন পরিকল্পনা করতে হলো। তারপরই তো বদলে গেল সবকিছু।

প্রথম আক্রমণ

ফ্রেই বেত্তো আপনাদের মনকাডা আক্রমণের কাহিনীটা শোনা যাক। কতজন আপনারা সে আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১২০ জনের মতো হবে।

ফ্রেই বেত্তো কতজন সদস্য আক্রমণে মারা গিয়েছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সেটা পরে বলছি। আগে আপনাকে আক্রমণের কাহিনীটা বলি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ছোট একটা দল নিয়ে আমরা গ্যারিসনের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করব। আকস্মিক আক্রমণের সুযোগে আমরা বন্দিদের মুক্ত করব। আমাদের কিছু সদস্য পজিশন নিয়েছিল গ্যারিসনের কাছের কোর্ট, হাসপাতালসহ বিভিন্ন বিল্ডিঙে। বাকি ৮০/৯০ জন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মূল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। কথা ছিল, আক্রমণের আগে আমরা একটা বাড়িতে একত্রিত হব। মূল কমান্ড দলের গাড়িটি নিয়ে আমি রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু জায়গাটি আমাদের অনেকের অপরিচিত হওয়ায় আমাদের কিছু কিছু গাড়ি পথ ভুল করে ফেলেছিল। তা ছাড়া তখনই ঘটে গিয়েছিল একটা দুর্ঘটনা। গ্যারিসনে পৌছবার আগেই হঠাৎ একদল টহল সৈন্যের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। তখন সেখানে কোনো টহল থাকবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন ছিল রোববার এবং তখন ছিল কার্নিভালের সময়। ফলে হঠাৎ করেই বিশেষ একটা টহল সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়েছিল। ফলে গ্যারিসনে যাবার আগেই সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে গ্যারিসনের সব সৈন্যও সজাগ হয়ে পড়েছিল। তাতে করে আমাদের আকস্মিক আক্রমণের পুরো পরিকল্পনাটিই ভণ্ডুল হয়ে যায়। আমাদের সামান্য অস্ত্র আর এই সীমিত লোকবল নিয়ে ঐ বিশাল সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই করা তখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের দল হয়ে পড়ে ছত্রভঙ্গ। আমাদের একটামাত্র গাড়ি গ্যারিসনের অদূরে দরজায় পৌছাতে সক্ষম হয় এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। কেউ কেউ হাসপাতালটাকে গ্যারিসন ভেবে সেখানে আক্রমণ চালায়। শেষে আমি হাসপাতালে গিয়ে তাদের ফিরিয়ে আনি এবং পিছু হটতে বাধ্য হই। আমাদের কিছু অনভিজ্ঞতার কারণে আমাদের প্রাথমিক আক্রমণটি এভাবে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতায় দলের অনেক সদস্যই হতাশ হয়ে পড়ে, অনেকে ইউনিফর্ম খুলে ফেলে।

ফ্রেই বেত্তো আপনারা কি ইউনিফর্ম পরা ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমরা সবাই আমাদের ইউনিফর্ম পরা ছিলাম। সদস্যদের হতাশ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, বুঝতেই পারছেন সবাই নেহাতই বেসামরিক লোক এবং এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রত্যেকেরই প্রথম। তার পরও একটা দল ছিল, যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। আমরা একটা ছোট দল পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম এবং সেখান থেকে নতুন আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা নিতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল ২২ অটোমেটিক রাইফেল এবং ১২ গেজ সেমি-অটোমেটিক শটগান এবং ভারী শেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের পরিকল্পিত আক্রমণের জন্যে এসব অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট ছিল। আমরা যখন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছি ইতিমধ্যে সৈন্যরা পুরো জায়গা ঘেরাও করে ফেলেছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল বসিয়েছে। আমাদের এক বন্ধুর বন্দুক থেকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাওয়াতে সে গুরুতরভাবে জখম হলো। তার চিকিৎসার জন্য আরো কয়জন সদস্যসহ তাকে পাঠাতে হলো। ফলে আমাদের দলটি হয়ে গেল আরো ছোট। যারা রয়ে গেল তাদের অনেকেই শরীরে ছোটখাটো আঘাত বয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম সবাই খুবই ক্লান্ত এবং পরবর্তী আরেকটি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা কারোরই নেই। আমি সবাইকে আপাতত সান্টিয়াগো ডু কিউবাতে ফিরে যাবার জন্য বললাম। কিন্তু ফিরে যাওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না। সেনাবাহিনী সবাইকে ধরতে শুরু করেছিল। মনকাডায় যারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল, যারা বিভিন্ন বিল্ডিঙে পজিশন নিয়েছিল তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ল। যারা পালাতে সক্ষম হয়েছিল তাদেরকে পরে শাদা পোশাক পুলিশ বিভিন্ন হোটেল, বাড়ি থেকে গ্রেফতার করল। কাউকে কাউকে ওরা ধরল গ্রাম থেকে।

ফ্রেই বেত্তো আপনাদের কতজন সদস্যকে ওরা মেরে ফেলেছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রাথমিক ঐ লড়াইয়ে আমার জানামতে ২ থেকে ৩ জন মারা গিয়েছিল। কিন্তু সোমবারই বাতিস্তা ঘোষণা দিল ৭০ জন বিদ্রোহী মারা গেছে। আমরা আক্রমণে অংশই নিয়েছিলাম ১২০ জন, সেখান থেকে যুদ্ধে ৭০ জন মারা যাবার প্রশ্ন ওঠে না। তবে রোববার বিকেলের মধ্যে ওরা আমাদের অসংখ্য সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে। পুরো এক সপ্তাহ ধরে তারা ধরপাকড় চালায় এবং নৃশংস অত্যাচারের পর হত্যা করে।

কিন্তু এই ঘটনা সান্টিয়াগো ডু কিউবার জনগণের মধ্যে বিপুল গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সবাই দেখছিল যাকেই ধরে নেয়া হচ্ছে তাকেই হত্যা করা হচ্ছে। বিক্ষুব্ধ জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে শহরের আর্চ বিশপ পেরেজ সেরান্টেসের সঙ্গে দেখা করে এর প্রতিবাদ জানাতে বলে। আর্চ বিশপ মানবিকতার প্রশ্নে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বাতিস্তা সরকার সৈন্যদের মধ্যে নানারকম মিথ্যা রটনা প্রচার করে থাকে। তারা প্রচার করে যে আমরা সান্টিয়াগো ডু কিউবার হাসপাতালে ঢুকে সৈন্যদের গলা কেটে দিয়েছি। আসলে যা হয়েছিল আপনাকে তা বলেছি। আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়াতে কেউ কেউ ভুল করে হাসপাতালকে গ্যারিসন ভেবে গুলি চালায়। এতে একজন প্যারামেডিক মারা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারটাকে ওরা অতিরঞ্জিত করে সৈন্যদের মনে ঘৃণা জন্মাবার জন্য প্রচার করেছে যে আমরা সৈন্যদের গলা কেটে দিয়েছি। এই মিথ্যাকে অনেক সৈন্যই তখন বিশ্বাস করেছিল। সৈন্যদের উসকে দেবার জন্যে ওরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরো বলেছিল যে, এটা সেনাবাহিনীর জন্য খুবই অপমানের ব্যাপার যে কিছু সাধারণ ছেলে-ছোকরা তাদের বিরুদ্ধে এভাবে অস্ত্র ধরবার সাহস পায়।

সৈন্যরা তাই বিপুল উদ্দীপনায় সন্দেহজনক যাকেই পাচ্ছিল ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর মেরে ফেলছিল। এইরকম অবস্থায় জনগণের বিক্ষোভে আর্চ বিশপসহ শহরের আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সরাসরি উদ্যোগে বেশকিছু বন্দির জীবন রক্ষা পায়। আর্চ বিশপ তখন খুবই ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাদের মধ্যে যারা গুরুতর আহত, আমরা তাদেরকে আর্চ বিশপের মাধ্যমে যথাস্থানে পৌঁছে দেব। এ ব্যাপারে একজন সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের আর্চ বিশপের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেন। ঠিক হয় আমরা আমাদের কর্মীদের শহরে একটা বাড়িতে রেখে আসব এবং আর্চ বিশপ ভোররাতে এসে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। পরিকল্পনামতো আমি এবং আরো দুজন নেতা ৭/৮ জন কমরেডকে নিয়ে সেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিই। ঐ বাড়িতে পৌঁছাবার দুই কিলোমিটার আগেই আমরা তিনজন, অন্যান্য কমরেডদের কাছ থেকে বিদায় নিই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল সারা রাত হেঁটে আমরা সান্টিয়াগো ডু কিউবার উপকূলে পৌঁছে সেখান থেকে নতুনভাবে আবার কমরেডদের সংগঠিত করব।

কিন্তু সেনাবাহিনী বিষয়টি জেনে ফেলেছিল। তারা সম্ভবত আর্চ বিশপের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকের টেলিফোন আলাপ টেপ করে রেখেছিল এবং ভোররাতের আগেই শহরের চারিদিকে টহল বাহিনী মোতায়েন করেছিল। আমরা তা জানতাম না। আমরা তখন দু কিলোমিটারের মতো দূরে। সেই সময় একটা মারাত্মক ভুল করলাম। আমরা তিনজনই ছিলাম প্রচণ্ড রকম ক্লান্ত। পাহাড়ের ভেতর খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার চিন্তা করলাম আমরা। আমরা বনের মধ্যে একটা জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। আমাদের সঙ্গে বালিশ-কম্বল কিছুই ছিল না। কুঁড়েঘরটা ছিল খুবই ছোট। চার মিটার লম্বা আর তিন মিটার প্রস্থ। ওটা হয়তো কোনো ভাঁড়ার ঘর ছিল। বাইরে তখন ভীষণ ঠাণ্ডা আর কুয়াশা। ভোর হবার আগ পর্যন্ত আমরা এ কুঁড়েঘরে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওখানে শুয়ে আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। অথচ তখন পথে নেমে গেছে টহলদার সৈন্য। ভোররাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে হতভম্বের মতো দেখলাম আমাদের তিনজনের বুকের ওপর তাক করে আছে অসংখ্য বন্দুক।

ফ্রেই বেত্তো কিন্তু আপনারা কুঁড়েঘরে যে ওইভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন, বাইরে কেউ গার্ড ছিল না?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না। আমরা ছিলাম তিনজন এবং তিনজনই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমরা একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেছে তবু ওরা আমাদের ধরতে পারেনি। আমরা শত্রুর শক্তিকে খাটো করে দেখেছিলাম। আমরা একটা ভুল করেছিলাম এবং ধরা পড়ে গিয়েছিলাম ওদের হাতে। ওরা নিশ্চয়ই আর্চ বিশপের সঙ্গে আমাদের টেলিফোনের আলাপ টেপ করেছিল। ফলে ওরা বিভিন্ন দিকে পাঠিয়েছিল আর্মি পেট্রোল। যার কারণে ধরা পড়তে হলো আমাদের। ঐ কুঁড়েঘরে আমাদের তিনজনকে সৈন্যরা বন্দি করল। কয়েকজন সৈন্য প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠে ওখানেই আমাদের গুলি করে মেরে ফেলতে চাইল।

কিন্তু সেই সময় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটল। সৈন্যদের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ লেফটেন্যান্ট ছিলেন, নাম সারিয়া, তিনি সম্ভবত ঐ দলের নেতা ছিলেন, তাকে ততটা মারমুখো মনে হচ্ছিল না। সৈন্যরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল, ওরা আমাদের মেরে ফেলবার ছুতো খুঁজছিল। সবাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাইফেল তাক করে হুকুমের অপেক্ষা করছিল। সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করল। আমরা নিজেদের নাম পাল্টে ভিন্ন নাম বললাম। আমি নিশ্চিত, প্রাথমিক অবস্থায় কেউ আমাকে চিনতে পারেনি।

ফ্রেই বেত্তো আপনি কি কিউবায় তখন যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠেছেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, কিউবায় আমি তখন মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু কেন যেন সৈন্যরা সেসময় আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি। তবু তারা আমাদের মেরে ফেলতে উদ্যত ছিল। আমরা যদি আমাদের আসল নাম বলতাম তাহলে তারা গুলি করতে আর এক মুহূর্তও দেরি করত না। সৈন্যদের সঙ্গে ওখানে আমাদের খানিকটা কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। কারণ ওরা আমাদের খুনি বলে গালাগালি করছিল। ওরা বলছিল আমরা ওখানে সৈন্যদের হত্যা করার জন্য ওত পেতে আছি, বলছিল ওরা লিবারেশন আর্মির অনুসারী। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, আমি ওদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম। বললাম, তোমরা আসলে স্প্যানিশ আর্মির অনুসারী। আসল লিবারেশন আর্মি হলাম আমরা। এতে সৈন্যরা আরো খেপে গেল। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমাদের হত্যা করা হচ্ছে। বেঁচে যাবার সামান্যতম কোনো সম্ভাবনা আছে বলে তখন মনে হয়নি আমার। সুতরাং আমি তর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সেসময় হঠাৎ সেই কৃষ্ণাঙ্গ লেফটেন্যান্ট বলে উঠলেন, 'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না'—তিনি সৈন্যদের শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'গুলি কোরো না, বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না।' লক্ষ করুন লেফটেন্যান্টটি কী বললেন। তিনি আবার বললেন, 'বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না।' আমরা একটা দুর্লভ সুযোগ পেয়ে গেলাম। সৈন্যরা আমাদের তিনজনকে একত্রে বাঁধল এবং হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কিছুদূর হেঁটে যাবার পর আমি লেফটেন্যান্টকে কাছে ডাকলাম এবং কানে কানে বললাম, 'আপনার কাছে সত্য গোপন করব না, আমি ফিদেল ক্যাস্ট্রো।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কাউকে কিছু বলবে না, কিছুতেই কাউকে বলবে না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা আরো কিছুদূর হেঁটে গেলাম। হঠাৎ ৭০০/৮০০ মিটার দূরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাটিতে শুয়ে পজিশন নেয়।

ফ্রেই বেত্তো কতজন সৈন্য ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ১২ জনের মতো হবে।

ফ্রেই বেত্তো সেই লেফটেন্যান্টের বয়স কত হবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ৪০/৪২ বছরের মতো। আমি যখন দেখলাম সৈন্যরা চারিদিকে ছড়িয়ে পজিশন নিয়েছে, ভাবলাম আমাদের গুলি করবার জন্যই ওরা পজিশন নিয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। লেফটেন্যান্ট আমার কাছে এলেন। আমি বললাম, 'আমি মাটিতে শোব না, ওরা যদি আমাদের গুলি করতে চায় তাহলে এই দাঁড়ানো অবস্থাতেই করুক।' লেফটেন্যান্ট তখন বললেন, 'তোমরা খুব সাহসী ছেলে, খুব সাহসী।' এবারও আমাদের গুলি করা হলো না। কল্পনা করে দেখুন। হাজারে একটা এমন সুযোগ মেলে। কিন্তু আমরা যে পুরোপুরি বেঁচে গেলাম তা তখনো বলতে পারি না। লেফটেন্যান্ট শুধু এ যাত্রায় আর একবার আমাদের বাঁচালেন।

ফ্রেই বেত্তো তারপর?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আর্চ বিশপের সঙ্গে যে দলটার মিলিত হওয়ার কথা, তারাও ধরা পড়েছিল হাইওয়েতে। গোলাগুলি হচ্ছিল সেখানেই। আমাদের সবাইকে বন্দি করে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট একটা ট্রাক খুঁজছিলেন। ট্রাক পাওয়া গেলে তিনি বন্দিদের ট্রাকের পেছনে ওঠালেন এবং আমাকে বসালেন ট্রাকের সামনে ড্রাইভার এবং তাঁর মাঝখানে। পথে এক মেজর আমাদের ট্রাক থামালেন। নাম পেরেজ চাওমন্ট। হিংস্রতার জন্য নামজাদা সে অফিসার। বহু মানুষকে হত্যা করেছেন। সেই মেজর বন্দিসহ ট্রাকটাকে গ্যারিসনে নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমাদের লেফটেন্যান্ট তার সঙ্গে তর্ক করলেন এবং তার নির্দেশ না মেনে ট্রাকটিকে নিয়ে গেলেন সান্তিয়াগো ডু কিউবার জেলে। ট্রাক গ্যারিসনে ঢুকলে আমাদের সেদিন স্রেফ কিমা বানানো হতো।

ওদিকে সান্তিয়াগো ডু কিউবার সকলেই জেনে গিয়েছিল যে আমরা ধরা পড়েছি এবং আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য চারিদিকে সোচ্চার দাবি উঠছিল। এদিকে জেলে আমাদের জেরা করতে এসেছিল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তখন আমাদের প্রতি একধরনের শ্রদ্ধাও লক্ষ করেছি। তারা আমাদের ঐ সাহসী আক্রমণে চমৎকৃত হয়েছিল। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা অপরাধবোধও কাজ করছিল, কারণ ইতিমধ্যে তারা ৭০/৮০ জনকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করেছিল যা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো   সে বন্দিরা সবাই কি আপনার দলের সদস্য ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   হ্যাঁ, যাদের আমাদের আগে ধরা হয়েছিল। আমাদের আক্রমণকারী দলের সামান্য কয়জন কেবল তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, বাকি অধিকাংশকেই তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বন্দি করতে সক্ষম হয়। জনসাধারণের দাবির মুখে এবং আর্চ বিশপসহ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির অংশগ্রহণের কারণে বন্দিদের মাঝে কিছু সদস্যের শেষপর্যন্ত জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু আমাদের তিনজনের ঐ দলটি যে বেঁচে গেলাম তা শুধু ঐ লেফটেন্যান্টের জন্যই।

ফ্রেই বেত্তো   বিপ্লবের পর সেই লেফটেন্যান্টের কী হল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   আমাদের হত্যা না-করার জন্য সেই লেফটেন্যান্টকে তখন অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি জেল খাটলাম, জেল থেকে মুক্ত হলাম, নির্বাসনে থাকলাম, অগণিত অভিযান পরিচালনা করলাম, অবশেষে সেই গেরিলা সংগ্রামে সংগঠিত হলো ঐতিহাসিক বিপ্লব। বিপ্লবের পর আমরা সেই লেফটেন্যান্টকে পুনরায় সেনাবাহিনীতে আমন্ত্রণ জানালাম। তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দিয়ে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা গার্ডের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। কিন্তু দুঃখজনক, ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট বয়স্ক এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লবের মাত্র ৮/৯ বছর পরই তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে মারা যান।

তিনি সম্ভবত একসময় ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন। ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। তিনি নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটিতে আমাকে দেখেছিলেন। তিনি একজন বিবেকবান, সম্মানিত মানুষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে তিনি তাঁর বিবেচনাবোধকে স্থির রেখেছিলেন। তিনি সৈন্যদের বলেছিলেন, 'বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না।' এই চমৎকার কথাটি তিনি কোথায় পেয়েছিলেন তাঁকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠল না। আমি ভেবেছিলাম তিনি আরো কিছুদিন বাঁচবেন।

আমি এখনো দেখতে পাই সেই দৃশ্য। তিনি সৈন্যদের বলছেন, 'গুলি কোরো না, বিশ্বাসকে হত্যা করা যায় না।' তিনি আমাকে বলছেন. 'কাউকে বলবে না, কিছুতেই কাউকে বলবে না।' মনে পড়ে সেই দৃশ্য—সৈন্যরা সব মাটিতে পজিশন নিয়ে আছে, আমরা দাঁড়িয়ে। তিনি বলছেন, 'তোমরা খুব সাহসী ছেলে, খুব সাহসী।' পেড্রো সারিয়া নামের এই বিরল মানুষটির কাছে আমাদের অশেষ ঋণ।

ফ্রেই বেত্তো   সে যাত্রায় প্রাণে রক্ষা পেলেও আপনাকে তো জেলে যেতে হলো। জেলে সম্ভবত আপনি বাই[illegible] ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো পয়লা আগস্টের দিকে আমার কারাভোগ শুরু হলো।

ফ্রেই বেত্তো পরে সাধারণ ক্ষমার জন্য সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপেই তো মুক্ত হলেন আপনি?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, জনগণের ব্যাপক দাবির মুখেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়েছিল। সমস্ত বিরোধীদল, নাগরিক সংগঠন, সামাজিক সংস্থা, প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সকলেই সেই দাবি তুলেছিলেন। জনগণের দাবির পাশাপাশি সাধারণ ক্ষমার পেছনে আরো কিছু কারণ ছিল। সরকার যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তাতেও জনমনে বিপুল ক্ষোভের বিষয়ে জানত শুধু সান্তিয়াগো ডু কিউবার জনসাধারণ; দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ তখনো এ বিষয়ে বিশেষ জানত না। কিন্তু জেলে বিচারের সময় আমরা সোচ্চারে সেসব তথ্য প্রচার করতে থাকি। প্রেসের ওপর তখন কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমাকে বিচারের সময় অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হতো। আদালতে আমরা বলেছিলাম যে, আমরা বিদ্রোহ করেছি এবং আমাদের সকল কর্মকাণ্ড নৈতিক এবং যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করি। আমরা ঘোষণা করি যে, আমরা যা-কিছু করেছি তার জন্য আমরা গর্বিত। পরে আমরা আমাদের বক্তব্য গোপন প্রচারপত্রে প্রকাশ করতে থাকি। দেশের সব মানুষ ধীরে ধীরে সরকারের বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু সরকার ভাবে, তাদের শক্তি ইতিমধ্যে সুদৃঢ় হয়েছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কোনো কোনো বিরোধীদল নির্বাচনী প্রহসনে যোগ দেয়। বাতিস্তা ভাবেন তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে এবং তিনি তাঁর ক্ষমতাকে ন্যায়সঙ্গত করে নিতে চান। তাঁর সরকারকে নির্বাচিত সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একটা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সেই নির্বাচনে তিনি নিজেও প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। কিন্তু নানারকম চাপের মুখে অনেক বিরোধীদল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কোনো কোনো দল তাঁকে সমর্থনও জানায়। বাতিস্তা তাঁর সরকারকে একটা আইনগত আবরণ দেয়ার চেষ্টা করেন।

কিউবার ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্বাচনের আগে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হয়। সুতরাং, এ ব্যাপারটাও একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। আমি বলব, আমাদের মুক্তির পেছনে বেশ কয়টা বিষয় কাজ করেছে : জনগণের দাবি, আমাদের গোপন প্রচার, সরকারের বর্বরতা প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং সরকারকে একটা আইনানুগ আবরণ দেয়ার জন্য বাতিস্তার ইচ্ছা। কিন্তু বাতিস্তা বেঁচে যাওয়া ২০ জন কমরেডের এই ছোট দলটিকে খাটো করে দেখছিলেন। ভেবেছিলেন শক্তি, সম্পদ হারিয়ে ইতিমধ্যে আমরা নিঃস্বই হয়ে গেছি। সুতরাং তিনি আমাদের মুক্ত করে দিলেন।

ফ্রেই বেত্তো আপনাকে কি আলাদাভাবে একটা নি[illegible]টিকে রাখা হয়েছিল?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, জেলে ঢুকবার মাসতিনেক পর থেকে আমাকে বিচ্ছিন্নভাবে একটা নির্জন ঘরে আটকে রাখা হয়। আমাদের জেলটা যে দ্বীপে ছিল, বাতিস্তা একবার সেখানে গেলেন একটা খুব অল্প কিলোওয়াটের পাওয়ার প্লান্ট উদ্বোধন করতে। ব্যাপারটা হাস্যকর, কারণ এর আগে কয়েক হাজার কিলোওয়াটের অনেক পাওয়ার প্লান্ট চালু হয়েছে কিন্তু সেগুলো উদ্বোধনের কোনো অনুষ্ঠান কখনো হয়নি। যাহোক, বাতিস্তার আগমন উপলক্ষে জেল-কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মানসূচক অভ্যর্থনা দেবার ব্যবস্থা করে। আমরা এর প্রতিবাদ করি। বাতিস্তা যেদিন আসবেন, আমরা সেদিন অনশন করি।

আমাদের এক বন্ধু আলমেইডা উপরে জানালায় উঠে বাতিস্তাকে পাওয়ার প্লান্টে ঢুকতে দেখে। প্লান্টটা ছিল জেলের খুবই কাছে। আমরা বাতিস্তার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি এবং বেরিয়ে এলেই জেলের ভেতর থেকে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠি আমাদের 'জুলাই ২৬ সংগীত'। বাতিস্তা প্রথমে ভেবেছিলেন এটা বুঝি তার অভ্যর্থনারই অংশ, ভেবেছিলেন সবাই বুঝি তাঁর প্রশংসা-সংগীতই গাইছে। তিনি বেশ খুশি হয়ে ভালোভাবে শুনবার জন্য অন্যদের চুপ করতে বলেন। সবাই চুপচাপ হয়ে গেলে আমরা আরো জোরে গাইতে লাগলাম 'কিউবাকে পঙ্কে নিক্ষেপকারী হে বুভুক্ষু স্বৈরাচারী'। হ্যাঁ, বাতিস্তার মুখের ভাব নিমেষেই বদলে গেল। রেগে গেলেন তিনি।

আলমেউডা জানালা দিয়ে সব দেখছিল, তারপর পুলিশ এল, তবু আমরা উচ্চকণ্ঠেই গাইতে লাগলাম। অবশেষে পুলিশ আমাদের অন্য একটা বদ্ধ ঘরে আটক করল। আমাকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে নির্জন একটা ঘরে আটকে রাখা হলো। তারপর থেকেই আমি ঐ ঘরেই ছিলাম। এভাবে আমার ২২ মাসের কারাভোগের ১৯ মাসই আমি সেই ঘরে বিচ্ছিন্নভাবে একা আটক অবস্থায় ছিলাম। শেষের দিকে ওরা অবশ্য রাউলকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিল।

ফ্রেই বেত্তো এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন। আপনার গেরিলা ইউনিফর্মে একটা ক্রস দেখেছি। ওটা কেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আসলে সান্টিয়াগো ডু কিউবার বহু মানুষ আমাকে নানারকম উপহার দিত সেই সময়। বয়স্করা, বাচ্চারা সবাই। একটা ছোট্ট মেয়ে সেই গেরিলাযুদ্ধের সময় আমাকে চমৎকার আবেগপূর্ণ একটা চিঠির সঙ্গে ওই ক্রসসহ চেইনটি পাঠিয়েছিল। আমাকে তখন সেটা খুবই অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই তখন সেটা আমি পরতাম। যদি বলেন এর পেছনে কি কোনো বিশ্বাস কাজ করেছে? আমি বলব, না। ওই মেয়েটির আন্তরিকতাকে সম্মান জানানোর জন্যই আমি মালাটি পরতাম। তবে হ্যাঁ, আমাদের আন্দোলনে অনেক ধর্মযাজকও যোগ দিয়েছিলেন। এটা আমাদের মধ্যে কোনো সংস্কার ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো আমি [illegible] আপনার [illegible] আপনাকে দিয়েছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, সে সময় মায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন কোনো যোগাযোগই ছিল না। আমার মাকে তখন কড়া নজরে রাখা হতো। তবে হ্যাঁ, মা সেসময় ঈশ্বরের কাছে আমার মুক্তির জন্য প্রতিদিনই বিস্তর মানত করতেন।

বিপ্লব এবং তারপর

ফ্রেই বেত্তো আপনাদের ক্ষমতাগ্রহণের পর দেশের জনগণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের সব স্তরের জনগণই আমাদের ক্ষমতাগ্রহণ এবং বাতিস্তার পতনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি উচ্চবিত্তের একটা অংশ যারা বাতিস্তার আমলে প্রচুর অবৈধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল তারাও। বিপ্লবের পর আমরা নির্বাচন করেছিলাম এবং শতকরা ৯৫ ভাগ সমর্থন পেয়েছিলাম। জনগণ সাত বছর ধরে বাতিস্তার রক্তক্ষয়ী স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি চাইছিল। বিপ্লব তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। তবে সমস্যা শুরু হলো বিপ্লবী আইন প্রণয়নের পর থেকে।

ফ্রেই বেত্তো সেটা কীরকম?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো যেমন অবৈধভাবে যা-কিছু দখল করা হয়েছে তার সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, এ আইন কার্যকরী হবে শুধু সেই সম্পত্তিগুলোর বেলায়, যেগুলো ১০ মার্চ ১৯৫২-র বাতিস্তার অভ্যুত্থানের পর দখল করা হয়েছিল। সময়টা আমরা এভাবে বেঁধে দিয়েছিলাম, কারণ এর পূর্ববর্তী সরকারের বহু দল পরবর্তী সময়ে বাতিস্তা-বিরোধী আন্দোলনে আমাদের সহযোগিতা করেছিল। সময়টাকে যদি আমরা এভাবে নির্দিষ্ট না করে দিতাম, তাহলে আমাদের সহযাত্রী বহু দলের লোকই এর আওতায় পড়ে যেত। এতে আমরা দুর্বল হয়ে পড়তাম এবং বিভেদ সৃষ্টি হতো। তাই বাতিস্তার অভ্যুত্থানের আগে যারা সম্পত্তি দখল করেছিল, তাদের আমরা ক্ষমা ঘোষণা করেছিলাম। নইলে ঠগ বাছতে গা উজাড় হবার আশঙ্কা ছিল।

দ্বিতীয়ত, বাতিস্তার সময় যারা হত্যাসহ নানারকম নৃশংসতার সঙ্গে জড়িত ছিল, আমরা তাদের বিচারের ব্যবস্থা করেছিলাম। বাতিস্তার আমলে তারা বহু মানুষকে হত্যা করেছিল। অকথ্য অত্যাচার করেছিল। মনে রাখবেন সেসময় নিপীড়নের কৌশল তত উন্নত ছিল না। পরে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে যে অত্যাচার তারা চালিয়েছে, সেটা তুলনামূলকভাবে ছিল সূক্ষ্মতর কৌশলে। কারণ ইতিমধ্যে সিআইএ এবং আমেরিকান সেনাবাহিনী ভিয়েতনাম যুদ্ধের মাধ্যমে অত্যাচার এবং নিপীড়নের কলাকৌশলের ব্যাপারে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছে। মানুষকে নিপীড়ন এবং হত্যা করার

~ www.amarboi.com ~

যাবতীয় শিল্প আমেরিকানরাই সবাইকে শিখিয়েছে। হত্যা করে লাশকে বেমালুম গুম করে দেয়ার কৌশল এর আগে মানুষের জানা ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো : ব্রাজিলের ডান মিত্রিওনেও তার সেনাবাহিনীকে ঐসব কৌশল শেখানোর জন্য ব্যবহার করত ভিক্ষুকদের।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বাতিস্তার সময় নিপীড়নের কৌশলগুলো ততটা উন্নত হয়নি। তারা হত্যা করেছে অসংখ্য ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক। একবার বাতিস্তার সেনাবাহিনী এক গ্রামে ঢুকে চৌষট্টিজন নিরীহ কৃষককে একাধারে হত্যা করে। এই উৎসাহ তারা বোধ হয় পেয়েছিল নাজিদের কাছ থেকে।

সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় আমাদের দখলকৃত ছোট্ট মুক্ত অঞ্চলে বিপ্লবের আগেই আমরা কিছু কিছু যুদ্ধবন্দির বিচার করেছিলাম। সেটা ন্যুরেমবার্গের মতো ছিল না, কারণ ন্যুরেমবার্গের বিচারের আগে এ বিষয়ে কোনো আইন ছিল না। আমি বলছি না যে, ন্যুরেমবার্গের বিচার ভুল ছিল, কিন্তু নিয়মমাফিক বিচারের আগে সে-বিষয়ে আইন থাকা বাঞ্ছনীয়। সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় যুদ্ধবন্দিদের বিচারের আগে আমরা তাই আইন প্রণয়ন করে নিয়েছিলাম। বিপ্লবের পর দেশের বিচার বিভাগ আমাদের সেই আইন গ্রহণ করে নিয়েছিল। সেই আইন অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হয়।

কিন্তু এসময় কিউবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও প্রচার শুরু হয়, বিশেষত আমেরিকায়। তারা বুঝতে পারে, এটা কোনো সাধারণ নিরীহ বিপ্লব নয়। অবশ্য এ প্রচার কিউবার অভ্যন্তরে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। অবৈধ দখলকারীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং হত্যাকারীদের বিচার করার আইন বিষয়ে আমরা গণভোটের আয়োজন করি, জনগণ তাতে বিপুল সমর্থন জানায়। এরপর আমরা কিছু অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করি। বিদ্যুৎ বিল আমরা অর্ধেক করে দিই। এটা অনেকেরই দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এ ছাড়া টেলিফোন কোম্পানিসহ বেশকিছু বিদেশি কোম্পানিকে বাতিস্তা যে সুযোগসুবিধাগুলি দিয়েছিল, আমরা তা বাতিল করে দিই। এতে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আমাদের একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এরপর আমরা বাড়িভাড়া নীতি ঘোষণা করি। দেশব্যাপী বাড়িভাড়া শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনা হয়, বাড়িভাড়া দিয়ে একসময় তারা বাড়িটির মালিক হতে পারবে, সে নিয়মও চালু করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে খুশি হয়। এভাবেই আমরা 'নগর পুনর্বিন্যাস আইন' শুরু করি। এর সঙ্গে আমরা আরো কিছু ব্যবস্থা নিই। আমরা যেকোনো রকম শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ ঘোষণা করি এবং আগে যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে, তাদের জন্য পুনরায় চাকরির ব্যবস্থা করি।

আমরা সমুদ্রসৈকতে খেলাধুলা এবং বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা করি। সমুদ্রসৈকত এবং বিভিন্ন ক্লাব শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য আগে উন্মুক্ত ছিল। আমরা তা সর্বসাধারণের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য উন্মুক্ত করে দিই। দেশের শ্রেষ্ঠ সৈকতগুলো ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং অধিকাংশ হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিছু কিছু পার্ক ছিল, যেখানে শ্বেতাঙ্গরা একদিকে বসত আর কৃষ্ণাঙ্গরা অন্যদিকে। সব জায়গায় শ্বেতাঙ্গদের সুযোগ-সুবিধা ছিল। আমরা এসব বৈষম্য দূর করবার চেষ্টা করি। কিন্তু এসব দূর করা সহজসাধ্য ছিল না। বহুদিনের বুর্জোয়া সংস্কৃতি চর্চায় এসব সংস্কার তৈরি হয়েছিল। সুতরাং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এসব পরিবর্তনের চেষ্টা করলে সমস্যা বরং বাড়ত। আমরা নিয়মিত আলোচনা, প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তনগুলি আনতে চেষ্টা করি।

আমাদের দেশে যে এত ব্যাপক জাতিগত বৈষম্য বিরাজ করছিল, তা দেখে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই। এ বিষয়ে বলবার জন্য আমাকে বেশ কয়েকবার টেলিভিশনের পর্দায় আসতে হয়। কাজে, শিক্ষায়, বিনোদনে মানুষে মানুষে বৈষম্য জিইয়ে রাখা যে অন্যায়, এটা বোঝাবার জন্য আমাদের প্রচুর শ্রম ব্যয় করতে হয়। আমরা শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারটাকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করি। আমাদের বিরুদ্ধে প্রচুর মিথ্যা প্রচারণা চলতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই বিপ্লবের কারণে সুবিধাভোগী শ্রেণি বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

কৃষি-সংস্কার আমরা আরো খানিকটা পরে করি। প্রাথমিক ওইসব নিয়মকানুনের মধ্যদিয়েই ধনবান, আমেরিকান এবং বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আমাদের বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশের প্রায় সব ভালো জমিগুলো ছিল আমেরিকান কোম্পানির দখলে। এক্ষেত্রে আমরা শুরুতেই বিশেষ চরম কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করিনি। আমরা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ বেঁধে দিয়েছিলাম ৪০০ হেক্টর। খুব সংগঠিত খামারগুলোর জন্য আমরা ১২০০ হেক্টর পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছিলাম। আমি জানি না চীনা বিপ্লবের সময় কোনো ভূস্বামীর ৪০০ বা ১২০০ হেক্টর জমি ছিল কি না। কিন্তু আমাদের দেশের জন্য এটা ছিল যথেষ্ট বৈপ্লবিক নীতি, কারণ এখানে বহু আমেরিকান কোম্পানি ছিল, যাদের দুই লক্ষ হেক্টর জমিও ছিল।

এই নীতিমালাগুলোর প্রভাব আমার নিজের পরিবারের ওপরও পড়ে। আমার পরিবারকে তাদের জমির অর্ধেকটুকু ছেড়ে দিতে হয়। সব মিলিয়ে হাজারখানেক কোম্পানি এই নিয়মের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা বিপ্লব যে ঘটেছে, সুবিধাভোগী শ্রেণি বেশ ভালোভাবেই তা টের পেতে থাকে। আমেরিকানরা ভালোভাবেই টের পায় যে, কিউবায় একটা নতুন ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এইসব পরিকল্পনা সেই ১৯৫১ থেকে আমার মাথায় ঘুরছিল। কৃষি-সংস্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল এই সমস্ত কর্মসূচি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না। কারণ কিউবায় এর আগেও বিভিন্ন সরকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, যার কোনোটাই শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকাংশ ধনীব্যক্তি কল্পনাই করতে পারেনি আমেরিকা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরের আমাদের এই দেশে আমেরিকার পরাক্রমশালী প্রভাব অতিক্রম করে কোনোদিন কোনো বিপ্লব ঘটতে পারে। তারা ভেবেছিল, এটা কিছু তরুণ বিদ্রোহীর সাময়িক উত্তেজনামাত্র। এরকম বিদ্রোহ কিউবায় আগেও হয়েছে এবং সময়মতো তা দমন করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে যুক্ত বিভাগগুলো কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, এটা ভিন্ন ধরনের একটা সরকার। তারা বুঝল এ সরকার সত্যিই সততা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে দেশ চালাতে চাইছে, এরা বাস্তবিকই আমেরিকার কোনো হস্তক্ষেপই অনুমোদন করছে না। সাধারণ মানুষ দেখল সরকার যথার্থই তাদের সমস্যাগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

তবে অধিকাংশ জনগণের বিপ্লবের প্রতি সংগ্রামী অংশগ্রহণের চাইতে মূলত একটা সাধারণ নৈতিক সমর্থন মাত্র ছিল। প্রথম বিপ্লবী নীতিমালা ঘোষণার পরপরই আমরা বেশকিছু সমর্থন হারাই। আমাদের প্রতি জনগণের সমর্থন ৯৫% থেকে ৯০% ভাগে নেমে আসে। অবশ্য এই ৯০ ভাগের সমর্থন আরো গভীর হয়ে ওঠে। তারা ক্রমশ বিপ্লবের প্রতি আরো বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

যে সংস্কারগুলোর কথা আপনাকে বলছিলাম—বর্ণবৈষম্য বিলোপ, শ্রমিকদের পুনর্বহাল, কর কমানো, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি জনগণের ভেতর কার্যকর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এসময় শ্রমিকদের মধ্যে নানারকম দাবিদাওয়া শুরু হয়। চিনিকলের শ্রমিকরা চতুর্থ শিফটের জন্য দাবি তোলে। এর আগে আমাদের মিলে কাজের তিনটা শিফট ছিল। যেহেতু দেশে প্রচুর বেকার শ্রমিক ছিল তাই এ দাবি বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। এসময় আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করতে হয়। সবাই চতুর্থ শিফটের পক্ষে ছিল। রাতের পর রাত আমার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এভাবে কাজের শিফট বাড়িয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমি বোঝাই যে আমাদের জাতীয় আয় বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তা ছাড়া তখনো অধিকাংশ মিলকারখানাই ছিল ব্যক্তিমালিকানাধীন। এ নিয়মে সে মুহূর্তে কিছুতেই মালিকদের রাজি করানো যেত না, এতে একটা ব্যাপক বিরোধ সৃষ্টি হতো। চিন্তাচেতনায় আমি সমাজতান্ত্রিক হলেও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নের বাস্তব অবস্থা তখন ছিল না। শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক অবস্থান থেকে একটা বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যতটা সহজ, মালিক-শ্রমিকের স্বার্থের এই জটিল অবস্থানটা বোঝানো ততটা সহজ নয়। এসব পরিস্থিতিতে আমি একেবারে সরাসরি শ্রমিকদের সঠিক বাস্তব অবস্থাটার কথা জানিয়েছি। কোনো বাগাড়ম্বরতা দিয়ে পরিস্থিতিকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করিনি। এসব পরিস্থিতিতে সত্যনিষ্ঠ থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার মনে আছে বিপ্লবের পরপর প্রচুর মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। সৌজন্যের খাতিরে আমি সবার সঙ্গেই দেখা করতাম। দেখা করতে আসত শিল্পপতি সমিতির সভাপতি, ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, এমন সব নানা সমিতির সভাপতি। কিন্তু দুই-তিন সপ্তাহ পর আমি খেয়াল করলাম, এটা একটা অর্থহীন কাজ হচ্ছে। আমার দিন কেটে যাচ্ছে এসব হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতেই। এ ছাড়া এসব সভাপতিদের কাজ হচ্ছে নতুন কোনো সরকার এলেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু আমার তো প্রচুর কাজ পড়ে রয়েছে। তা ছাড়া আমি তখন সরকারি কোনো পদও বহন করতাম না। আমি ছিলাম বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর প্রধান।

ফ্রেই বেত্তো আরাতিয়া তো তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, তিনি তখন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচারপতি। বিপ্লবের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না কিন্তু তিনি বেশ কজন বিপ্লবীকে বিচারে বেকসুর খালাস করে দিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের প্রতি এই সহানুভূতির কারণে আমরা তাকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করি। তা ছাড়া ক্ষমতা দখল যে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেটা প্রমাণের জন্যও আমরা তাঁকে প্রেসিডেন্ট করি। কিন্তু সমস্যা হলো তাঁর কোনো বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল না, চিন্তাভাবনা ছিল ঘোলাটে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে কেন্দ্র করে একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমেরিকান কোম্পানি এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। সরকারের মধ্য থেকেই বিপ্লবী নীতিমালাগুলোর বিরোধিতা করতে শুরু করেন। এতে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। আমি শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলি। আরাতিয়া ভেবেছিলেন, জনগণ বুঝি তারই পক্ষে আছে। কিন্তু ৯০ ভাগ জনগণই ছিল বিপ্লবী নেতৃত্বের পক্ষে। তিনি ভাবলেন, দেশের ক্ষমতা বুঝি তারই হাতে। বিপ্লবী নেতৃত্ব এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হতে লাগল। এই সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে আমরা কঠিন সংকটে পড়ে গেলাম। আমরা কি তাকে বহিষ্কার করব, না অভ্যুত্থান ঘটাব? এর মধ্যে আমাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হলো। মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি বললাম আমি গ্রহণ করতে পারি, আমাকে বিপ্লবী নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষমতা দিতে হবে। এ শর্ত তারা মেনে নিলেন। এরপর আমি বিপ্লবী নীতিমালা ঘোষণা করতে থাকি। একপর্যায়ে অনিবার্যভাবেই এসব নীতিমালাকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ শুরু হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সরকারে একটা অচলাবস্থা তৈরি হয়। বিভিন্নভাবে আমি এর সমাধানের চেষ্টা করি। উত্তেজনার বশে যাতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া না হয়, সেজন্য আমি অনেক চিন্তাভাবনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশেষে আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিই এবং যথার্থই আমি পদত্যাগ করি। পরদিন সংবাদপত্রে সে খবর প্রকাশিত হয়।

ফ্রেই বেত্তো সেটা বিপ্লবের কত দিন পর?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সম্ভবত বিপ্লবের মাস-পাঁচেক পর।

ফ্রেই বেত্তো অর্থাৎ ১৯৫৯-এ ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ ১৯৫৯-এ, বিপ্লবের বছরেই। আমি যখন টেলিভিশনে জনগণের কাছে আমার পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করছি, প্রেসিডেন্ট আরাতিয়া তখন তাঁর প্রাসাদে। তিনি সাংবাদিকদের প্রাসাদে ডেকে তাঁর স্বপক্ষে মতামত দিতে লাগলেন। আমি তাঁকে আহ্বান করলাম টেলিভিশনে জনগণের সামনে পরস্পর আলোচনা করতে। কিন্তু জনসমক্ষে মুখোমুখি আলোচনা করতে রাজি হলেন না তিনি। ফলে জনগণের চাপে বলতে গেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। মন্ত্রিপরিষদের সমর্থনে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী একজন সম্মানিত কমরেডকে পরে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তারপর কিছুদিন সরকারি কোনো কাজকর্মে আমি আর নিজেকে যুক্ত করিনি, কারণ আমি পুনরায় আর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলাম না। কারণ আমি চাইনি, এটা মনে হোক যে আমি সমস্যা সমাধানের একটা কৌশল হিসেবে সাময়িক পদত্যাগ করেছিলাম। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম বলপ্রয়োগ করে কিছু করায় আমরা বিশ্বাসী নই। আমি বিপ্লবকে অস্বীকার করিনি। বরং পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে আমার পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় বলপ্রয়োগের চেয়ে পদত্যাগই আমি শ্রেয় মনে করেছি। সমস্যার সমাধান করেছে জনগণই। সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান দিতে পারে জনগণই। প্রধানমন্ত্রী পদে ফিরে যাবার জন্য নানা মহল থেকে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। আমি অনেক দিন সে চাপ ঠেকিয়ে রাখি। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে এ দাবি অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব হয় পড়ে। শেষে আমি আবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং সেই থেকে আমি সরকারপ্রধান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি।

ফ্রেই বেত্তো সে সময় বিভিন্ন সমিতি, সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আপনাকে বলছিলাম প্রথমদিকে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে দিতেই আমার সব সময় নষ্ট হচ্ছিল। একবার দুজন নেহাতই বালক এসে বলল, আমার সাক্ষাৎকার নিতে চায়। আমি বললাম, এরা কারা? আমাকে জানানো হলো এরা একজন সভাপতির ভাতিজা। আমি শেষে বললাম, 'বেশ, তাহলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সভাপতিদের ভাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েই আমাকে দিন কাটাতে হবে?' আসলে তাদের নানা ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল। তা ছাড়া এটা একটা বেশ সামাজিক আলোচনার বিষয় হয়েও দাঁড়াত। পরদিন পত্রিকায় বড় বড় করে লেখা হতো 'অমুকের সঙ্গে ক্যাস্ট্রোর সাক্ষাৎ'। আমি ব্যাপারটায় অত্যন্ত বিরক্তবোধ করতে লাগলাম। শেষে একদিন আমি বললাম, 'এখন আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাই, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে চাই, এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে সময় ব্যয় করতে চাই না, যাদের আমার দেখা করা ছাড়া করণীয় কিছু নেই।' তারপর থেকে আমি আমার কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করি। এসব নিয়ে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। তবে কিছু কিছু সমস্যা তৈরি হতে থাকে বিপ্লবী নীতিমালা প্রণয়নের পর থেকে, যা আপনাকে বলছিলাম। বিশেষ করে নগর-সংস্কার এবং কৃষি-সংস্কার নিয়ে।

ফ্রেই বেত্তো স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করা নিয়েও বোধ হয় সমস্যা হয়েছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো স্কুল জাতীয়করণ করার নীতি প্রথমদিকেই ঘোষিত হয়নি। আমরা সব ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের কথা চিন্তা করিনি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল দেশব্যাপী গণশিক্ষার একটা প্রচারাভিযান শুরু করার এবং সব শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার। বিভিন্ন নীতিমালা ঘোষণার পাশাপাশি আমরা বাড়ি, রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এসবও নির্মাণ করেছিলাম। শিক্ষকদের জন্য নতুন ১০ হাজার পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের।

স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিনের মধ্যেই বুর্জোয়া এবং ধনিকগোষ্ঠী বিপ্লবের বিরোধিতা করতে শুরু করল। সেইসঙ্গে তাদের সহযোগী যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল, তারাও বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান শুরু করল। এসময় চার্চের সঙ্গেও আমাদের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তারা চার্চকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিউবায় অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকার দেশের মতো চার্চ তেমন জনপ্রিয় ছিল না। চার্চে সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের কোনো অধিকার ছিল না। আমাদের দেশের সত্তর ভাগ মানুষই থাকে গ্রামে কিন্তু গ্রামে কোনো চার্চ ছিল না। হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শহর ছাড়া কিউবার কোনো গ্রামে কোনো চার্চ ছিল না। আমার শৈশবের গ্রামটির কথা আপনাকে বলেছি, সেখানেও কোনো চার্চ ছিল না। কিউবায় ধর্মশিক্ষা দেয়া হতো মূলত ধর্মীয় নীতিমালা দ্বারা চালিত ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলোতে। সেসব স্কুলে সাধারণত ধনীব্যক্তিদের সন্তানরাই পড়ত। সুতরাং ধর্মচর্চা ব্যাপারটা প্রধানত অভিজাতশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বংশপরম্পরায় ধনীরাই বিভিন্ন চার্চের বিশপ হতেন। সুতরাং বুর্জোয়াশ্রেণি চার্চের সংঘবদ্ধ কাঠামোটিকে আমাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু কিউবার জন্য সুবিধাজনক ব্যাপারটা ছিল এই যে, দরিদ্র মানুষের মধ্যে ধর্মের বিশেষ কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব ছিল না। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস যে ছিল না, তা নয়, সাধারণ মানুষ সেন্ট লেজারাসের নামে নিয়মিত মোমবাতি জ্বালাত, ব্যাপ্টাইজের কথা প্রচলিত ছিল। তবে এসবের পেছনে বিশেষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা

ফ্রেই বেত্তো   তাহলে আপনি স্বীকার করবেন শুধু অভিজাতশ্রেণির নয়, কিউবার সাধারণ মানুষের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনার একটা ব্যাপক প্রভাব ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : তা তো বটেই। মানুষের মধ্যে ব্যাপক আধ্যাত্মিকতা ছিল, নানারকম বিশ্বাস ছিল। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, কিছু আফ্রিকান ধর্মবিশ্বাস যা ক্যাথলিকের সঙ্গে এসে মিশেছিল। দেখুন, আমার মনে হয় ইতিহাসে সব মানবজাতির মধ্যেই কোনো-না-কোনো ধর্মীয় চেতনার প্রভাব থাকে। কলম্বাস যখন এদেশে এসেছিলেন তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তলোয়ার আর ক্রুশ। তলোয়ার দিয়ে তিনি তাঁর জয় করবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ক্রুশের মাধ্যমে সেই অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের তখন নিজস্ব ধর্ম ছিল। কর্টেস স্পেন থেকে মেক্সিকো এসে ধর্মের ব্যাপক বিস্তার দেখেন এমনকি তা স্পেনের চেয়েও বেশি। আমি বলব অজটেকরা স্প্যানিশদের চেয়েও ধার্মিক। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এখানে এসেছে এবং বলেছে ইন্ডিয়ানরা বর্বর। অজটেকরাও যদি স্পেনে যেতে পারত, তাহলে তাদের কাছেও অমন গ্রীষ্মের গরমে মোটা কাপড় পরা যাজকদের দেখে বর্বর মনে হতো, ওদের কাছেও হয়তো স্প্যানিশদের ধর্মবিরোধীকে পুড়িয়ে মারা প্রথাকে নিষ্ঠুর মনে হতো। অজটেকরা কোনো মানুষকে কখনো কোনো উদ্দেশ্যে বলি দেয় না। কারণ মৃত্যুকে তারা একটা মহান পবিত্র সুযোগ মনে করত। ঈশ্বরের উদ্দেশে মৃত্যুবরণ করাকে তারা সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করত। অজটেকদের মতো এত ধর্মবিশ্বাসী জাতি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্মকে উপলক্ষ করেই তারা বানিয়েছে পিরামিড, উপাসনালয়। সুতরাং যদি ধার্মিক বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে অজটেকরা স্প্যানিশদের চেয়ে বেশি ধার্মিক ছিল। তেমনি পেরুজয়ী পিজারোর চেয়ে সেখানকার আদিবাসী ইনকারা অনেক বেশি ধার্মিক ছিল। পিজারোর মন যত-না বাইবেলের দিকে ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সোনার খনির দিকে। মূর্তিপূজার জন্য তারা ওদের তিরস্কার করেছে অথচ তারা নিজেরা পূজা করেছে সোনাকে। ইনকারা ঈশ্বরের নামে নরবলি দিত বলে তারা তাদের ভর্ৎসনা করেছে অথচ তারা ঐ সোনা উত্তোলনের নামে কত অগণিত আদিবাসীকে হত্যা করেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং কে ধার্মিক আর কে ধার্মিক নয়, সহজে আপনি তা বলে দিতে পারেন না। তথাকথিত উন্নত জগৎ থেকে যারা এ অঞ্চল জয় করতে এসেছে, তারা আদৌ ধার্মিক ছিল কি না, সেটাই আমার সন্দেহ।

আপনি ভারত, চীন, আফ্রিকার ইতিহাস দেখুন, দেখবেন মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রভাব এবং তা কত নিখাদ। হয়তো আপনার কাছে সেসব ধর্মের রূপগুলো অদ্ভুত মনে হবে। কিংবা হয়তো মনে হবে বর্বর। সুতরাং মানবজাতির ইতিহাসে সব জাতিরই অনিবার্য একটা ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষাৎ মিলবেই। সেভাবে কিউবাতেও অবশ্যই সাধারণ মানুষের নিজস্ব ধরনের ধর্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমাদের ছিল না কোনো সংগঠিত, নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃঙ্খল ধর্ম। বিভিন্ন বিশ্বাস মিলিয়ে একধরনের ধর্মচর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেখানে চার্চের তেমন ভূমিকা ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো আপনি বলছিলেন চার্চের প্রভাব ছিল মূলত অভিজাতশ্রেণির মধ্যে এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলোতে। সে স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের প্রশ্নেই সম্ভবত দ্বন্দ্ব বাধল।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো চার্চের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব বাধল সেটা আসলে শ্রেণির সঙ্গে দ্বন্দ্ব। চার্চ ছিল ধনীদেরই দখলে সুতরাং তারা সব যাজক, বিশপদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিল। কিন্তু অন্যান্য ক্যাথলিক চার্চ, মধ্যবিত্তের এবং দরিদ্রের চার্চগুলো আবার এদের বিরোধিতা করল। তারা বিপ্লবকে সমর্থন জানাল। একদল ক্যাথলিক, বিশেষত মহিলারা মিলে বিপ্লবের পক্ষে একটা দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলে। এদের মধ্যে থেকেই কয়েকজন পরে 'কিউবান মহিলা পরিষদ' গঠন করে।

আপনি স্কুলগুলো জাতীয়করণের কথা বলছিলেন। প্রাইভেট স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের কোনো নীতি আমরা প্রথমে ঘোষণা করিনি, সে ইচ্ছাও আমাদের আপাতত ছিল না। আমরা বরং তখন পৃথক রাষ্ট্রীয় স্কুল করার পরিকল্পনা করছিলাম, বিশেষভাবে গরিব অভিভাবকদের জন্য। কিন্তু একপর্যায়ে সেসব অভিজাত প্রাইভেট স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ প্রতিটি স্কুল তখন প্রতিবিপ্লবের এক-একটা আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। প্রাইভেট স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল একটা পরিস্থিতির কারণে, কারণ স্কুলগুলো তখন সবরকম বিপ্লববিরোধী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল বোমাবাজি, চোরাগোপ্তা আক্রমণসহ নানা সিআইএর কার্যকলাপ, পাশাপাশি ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধ। এমতাবস্থায় এ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, আমি ছোটবেলায় শুনতাম সমাজতন্ত্র এলে চার্চগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে, যাজকদের হত্যা করা হবে, নানদের ধর্ষণ করা হবে, বিশপদের ফাঁসিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঝোলানো হবে। বিপ্লবের পর কিউবায় কি চার্চ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল? যাজক বা বিশপদের অত্যাচার করা হয়েছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সত্যকথা বলতে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং চার্চের দ্বন্দ্ব একটা ঐতিহাসিক সত্য। ইতিহাসে এ নিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। কখনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কখনো চার্চের পক্ষ থেকে। লক্ষ করবেন, ধর্ম-আন্দোলনকারীরা নিজেরাও বিস্তর রক্তক্ষয় ঘটিয়েছে। কিউবার কথা বলবার আগে সেই ইতিহাসটা লক্ষ করা যাক। রোম রাজ্যে খ্রিস্টবাদ পত্তনের নামে হত্যা করা হয়েছিল কয়েক লক্ষ মানুষকে। ফরাসি বিপ্লবেও চার্চ এবং বিপ্লবীদের মধ্যে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ফরাসি বিপ্লব উদ্ভূত হয়েছিল একটা সংসদ থেকে যে সংসদে ছিল অভিজাত, যাজক এবং মধ্যবিত্ত। বহু যাজক সেসময় মধ্যবিত্তের পক্ষ নিয়েছিলেন। ফলে উভয় পক্ষের আঘাতে সেসময় অনেক যাজককে জীবন দিতে হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের কালের ধ্রুপদী বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লবও ছিল রক্তক্ষয়ী। আমাদের কালের দ্বিতীয় মহান সামাজিক বিপ্লব বলশেভিক বিপ্লবেও এরকম পরিস্থিতিই ঘটেছিল। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই তবে আমার ধারণা, এখানেও চার্চ এবং বিপ্লবীদের সংঘাতে অনেক যাজককে জীবন দিতে হয়েছে। ম্যাক্সিকান বিপ্লব এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসও রক্তক্ষয়েরই ইতিহাস। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলব, কিউবার বিপ্লব একটা ব্যতিক্রম। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি কোনো যাজক বা বিশপকেই এখানে হত্যা করা বা অত্যাচার করা হয়নি। আমরা যখন সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় ছিলাম, এ বিষয়ে আমরা আইন তৈরি করেছিলাম। আমরা কঠোরভাবে ঘোষণা করেছিলাম কোনো মানুষকেই হত্যা বা অত্যাচার করা যাবে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা শুধু যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করিনি; আমরা জানতাম, যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমাদের হাতে বন্দি শত্রুপক্ষের কোনো সৈন্যকে আমরা হত্যা বা অত্যাচার করিনি। এমনকি আমাদের কোনো গোপন তথ্য দেয়ার জন্যও তাদের ওপর জবরদস্তি করিনি। বাতিস্তা সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের আন্দোলন, আমরা কিছুতেই সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে পারি না। অনেকেই বুঝতে চায় না নৈতিকতা একটা বিপ্লবের সবচেয়ে মৌলিক শর্ত। নৈতিকতা মানুষের আত্মিক অস্ত্র। আমরা আমাদের বিপ্লবে এই নৈতিকতাকে কঠোরভাবে মেনে চলেছি। বিপ্লব-বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে অনেক প্রচারণা চালায় কিন্তু তারা বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত একটাও হত্যাকাণ্ড বা সন্ত্রাসের উল্লেখ করতে পারেনি। আমাদের এই অবস্থা জনমনে আমাদের সম্মানকে বৃদ্ধি করেছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু কখনোই মাত্রা ছাড়িয়ে নয়। একটা সময় ছিল যখন কিউবায় বিপ্লব-বিরোধী ৩০০টি সংগঠন ছিল। সেসময় সেসব সংগঠনের অনেক সদস্য আমাদের হাতে ধরা পড়ত। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা কোনো সন্ত্রাসী সিদ্ধান্ত নিইনি। কোনোরকম বলপ্রয়োগ না করে বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সৃষ্টির জন্য আমরা সেই কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আমরা মনে করি, তার ফলাফল আমরা পাচ্ছি। সুতরাং আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন বিপ্লবের পর কোনো যাজককে হত্যা বা অত্যাচার করা হয়েছিল কি না, তার উত্তরে আমি নিশ্চিত করে বলব—না, কখনোই নয়।

ফ্রেই বেত্তো তখন চার্চ কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, কিউবায় কখনোই কোনো চার্চ বন্ধ ছিল না, এখনো নাই। শুধু একপর্যায়ে কিছু কিছু যাজক, বিশেষত, স্প্যানিশ যাজকরা যারা বিপ্লবের উগ্র বিরোধিতা শুরু করেছিলেন আমরা তাদের দেশ ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলাম। তাদের পদ গ্রহণের জন্য আমরা অন্য যাজকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

ফ্রেই বেত্তো আচ্ছা একথা কি সত্য যে, কোনো খ্রিস্টবিশ্বাসীকে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে দেয়া হয় না।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, সেটা সত্য।

ফ্রেই বেত্তো তা হলে এটা একটা মূলত অবিশ্বাসীদের পার্টি। অদূর ভবিষ্যতে এ পার্টির কি অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে? কোনো বিশ্বাসী খ্রিস্টান যদি বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পার্টিতে যোগ দিতে চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেয়ার কি সম্ভাবনা আছে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের পুরো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটাকে আপনাকে লক্ষ করতে হবে। আসলে কারা পার্টির সদস্য হবে না হবে—তা বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আপনাকে বলছি, বিপ্লবের পর সমস্ত অভিজাত এবং ধনিকশ্রেণি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করে। তারা চার্চকে এই বিরোধিতার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আমেরিকা সব দিক থেকে এদের বিপুলভাবে সাহায্য করতে থাকে। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে পার্টির সদস্য নিয়োগে আমাদের কঠোর নীতি পালন করতে হয়। আমরা চার্চের সঙ্গে সম্পর্কিত বা ঈশ্বরবিশ্বাসী কাউকে আমাদের দলে যোগদান নিষিদ্ধ করি। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা নিতে হয়। ক্যাথলিক বলে আমরা তাদের বাতিল করিনি, বাতিল করেছি তাদের ভেতর প্রতিবিপ্লবের সমূহ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই। ক্যাথলিকমাত্রই যে প্রতিবিপ্লবী ছিল, সেটা আমরা বলছি না। আমরা এও বলিনি যে পার্টিতে যোগ দিতে হলে তাকে নাস্তিক বা ধর্মবিরোধী হতে হবে। একটা সংকটময় মুহূর্তকে মোকাবিলা করার জন্য, পার্টির ভেতর আদর্শগত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমঝোতা তীব্র করতে গিয়ে আমরা শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদেরই দলে একত্রিত করতে চেয়েছি।

ফ্রেই বেত্তো কমরেড, এবার বলুন যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দেখুন, ধর্ম আর চার্চের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা আপনাকে বলেছি। তবে হ্যাঁ, সেই ছোটবেলা থেকে যিশু আমাদের কাছে খুব পরিচিত একটা নাম। কিন্তু আপনাকে আমি বলেছি, কখনোই আমার ভেতর কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। আমার সব শ্রম, মেধা আমি ব্যয় করেছি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। তবে সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যিশু কখনোই আমার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং যিশুর অনেক বিপ্লবী ভাবনাকে আমি আমার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। বক্তৃতায় আমি যিশুর অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। যেমন যিশুর সেই কথাটি 'সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে একটা উটও হয়তো চলে যেতে পারে কিন্তু একজন ধনীলোক কোনোদিন স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।' যিশু সব সময় গরিবদের পক্ষে ছিলেন। যিশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে আমি প্রায়ই বলতাম, যিশু গরিবদের খাওয়ানোর জন্য তার অলৌকিক ক্ষমতায় রুটিকে দ্বিগুণ করে দিয়েছিলেন, আমরা বিপ্লবের মাধ্যমে সে কাজটাই করতে চাচ্ছি। আমরাও বহুগুণ বাড়িয়ে দেব মাছ আর রুটির পরিমাণ; বাড়িয়ে দেব স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কারখানা, গবেষণা কেন্দ্র সবকিছু। ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টবাদ ছিল মূলত দাস, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিতদেরই ধর্ম। প্রাথমিকভাবে একটা বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যদিয়েই প্রসারিত হয়েছিল খ্রিস্টবাদ। সেসময় রোমান রাষ্ট্র দ্বারা সীমাহীন দুর্ভোগ এবং অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে খ্রিস্টানদের। কম্যুনিজমের ইতিহাসও তা-ই, এটা শোষিতদের আদর্শ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছে, কম্যুনিস্টদের তেমনি সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন দুর্ভোগ এবং অত্যাচার। খ্রিস্টবাদের এই বৈপ্লবিক প্রেক্ষাপটকে আমি সব সময়ই উল্লেখ করি। তবে ঐতিহাসিক পালাবদলে এর ব্যাখ্যা হয়তো ভিন্ন হবে। যিশুর উল্লেখ আমার জন্য আরো প্রাসঙ্গিক হয় যখন পুঁজিবাদ ধর্মকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন বক্তৃতায় তখন আমি প্রায়ই বাইবেল উদ্ধৃত করে বলতাম, 'যে গরিবকে প্রতারণা করে সে যিশুকেই প্রতারণা করে।'

ফ্রেই বেত্তো কমরেড, মার্কস এক জায়গায় বলেছেন, 'ধর্ম জনগণের জন্য আফিমস্বরূপ।' আপনিও কি তা বিশ্বাস করেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, কতগুলো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যদিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গড়ে উঠেছে। আমরা সবাই জানি, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কীভাবে সমাজ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে, সমাজের ভেতর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কীভাবে একটা অমানবিক শোষণ প্রক্রিয়া, আধিপত্যবাদ দানা বেঁধে উঠেছে। সেইসঙ্গে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, একপর্যায়ে বিভিন্ন ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে এইসব আধিপত্য, শোষণ, দমন প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে। আপনি নিজেকে একজন বিপ্লবীর স্থানে কল্পনা করুন, যে এই সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চায়। কল্পনা করুন চারপাশে কীভাবে আপনাকে চেপে বসে আছে এই ভূস্বামীর দল, বুর্জোয়ার দল, বড় ব্যবসায়ীর দল এবং এই চার্চ, যারা যেকোনো পরিবর্তনকে ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারি, মার্কস কোন্ পরিস্থিতিতে এই কথাটি বলেছিলেন। মার্কস যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠন করেছিলেন তখন তার প্রথম সম্মেলনে বহু খ্রিস্টান যোগ দিয়েছিল। বহু খ্রিস্টান প্যারি কম্যুনে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছিল। মার্কস শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই খ্রিস্টানদের কথা স্মরণ করেছেন। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, লেনিন যখন বলশেভিক পার্টি তৈরি করছেন, সেখানে খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তিনি কোনো বাধা দেননি। আসলে মার্কসের এই ভাষ্যটি একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। তার মানে এই নয় যে, এর প্রাসঙ্গিকতা এখন নেই। বহু দেশে এখনো ধর্ম রাষ্ট্রের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার নিকারাগুয়াসহ ল্যাটিন আমেরিকান অনেক দেশে ধর্ম এবং বিপ্লব একই সঙ্গে চলছে। সুতরাং মার্কসের একথা চূড়ান্ত কোনো বেদবাক্য নয়, স্থানকালভেদে এটা বিবেচনা করতে হবে।

আমি মনে করি না, ধর্ম একটা আফিম। তবে ধর্মকে অবশ্যই আফিম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটা নির্ভর করবে কে এটা ব্যবহার করছে, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তার ওপর। ধর্ম জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত একটা বিষয়। আসল কথা হচ্ছে, আমরা মানুষে মানুষে এই বৈষম্য, বিভেদ দূর করতে চাই, আমরা সম্পদ, সুযোগ, সম্মানের একটা সমবণ্টন চাই। সভ্যতা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে যে উন্নয়ন অর্জন করেছে আমরা তার ওপর সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। একজন কেউ ধর্মীয় অনুভূতি থেকে এইরকম আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছাতে পারে। আমাদের তাতে আপত্তি নেই। সেও এসে শরিক হতে পারে এই সংগ্রামে।

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, বিপ্লবের জন্য কি ভালোবাসা প্রয়োজন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিশ্চয়। বৃহত্তর অর্থে ভালোবাসাই তো আসল কথা। সামাজিক অর্থে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মূল চালিকাশক্তিই তো হলো ভালোবাসা। ফরাসি বিপ্লবের কথা ভেবে দেখুন। তাদের তিনটি মূল স্লোগান ছিল—স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু সেখানে স্বাধীনতা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেখানে স্বাধীনতা বলতে বোঝানো হয়েছে বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা, কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের স্বাধীনতার কথা সেখানে বলা হয়নি। ফরাসি বিপ্লবীরা তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকা যখন স্বাধীন হয়েছে তখনো সেখানে দাসপ্রথা বহাল তবিয়তে ছিল। স্থানীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ানদের হত্যাসহ নানা বর্বরতা তখন নির্বিচারে চলেছে। সুতরাং ফরাসি বিপ্লব মূলত বুর্জোয়াদের স্বাধীনতার কথা বলেছে। সেখানে সাম্য বলতে কিছু ছিল না, যতই এ নিয়ে দার্শনিক কথা বলা হোক না কেন। নিউইয়র্কের রাস্তা দিয়ে যখন একজন কোটিপতি এবং ভিক্ষুক হেঁটে যায় তখন এদের মধ্যে শুধুমাত্র পরাবাস্তবিক সাম্যের কথাই কল্পনা করা সম্ভব। তাছাড়া একজন কোটিপতি, ভিক্ষুক আর কৃষ্ণাঙ্গ দাসের মধ্যে কোনো ভ্রাতৃত্ব হতে পারে বলেও আমি মনে করি না। সেটা আদিভৌতিক কল্পনামাত্র।

তাই আমি মনে করি, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যেই স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে। ধর্মে প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার যে কথাটি বলা হয় আমি মনে করি সমাজতান্ত্রিক সমাজেই তার যথার্থ চর্চা করা সম্ভব।

সুতরাং আমি মনে করি, মানুষে মানুষে ভালোবাসার ধারণাটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং সাম্যবাদী সমাজে তাকে উন্নততর করে তোলা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক সমাজ পূর্ণ সাম্যের নিশ্চয়তা দেয় না। এ সমাজে পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় মানুষের সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে আরো বিকশিত করার সুযোগ ঘটে মাত্র। কিউবার দিকে তাকান, আগে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ছিল শুধু ধনীর সন্তানদের, এখন প্রত্যেকটি শিশু স্কুলে যেতে পারে এবং তার যত দূর ইচ্ছা পড়বার সুযোগ আমরা সৃষ্টি করেছি। একজন সাধারণ কৃষক, শ্রমিকের সন্তান দেশের শ্রেষ্ঠ স্কুলে পড়তে পারে। এটা কোনো আদিভৌতিক কল্পনা নয়, আপনি চোখ মেলে তাকালেই তা দেখতে পাবেন।

তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে পারিশ্রমিক এবং সম্পদের বণ্টন হয় মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী। তাতে কেউ হয়তো অধিক শক্তিশালী, অধিক প্রতিভাধর বা বুদ্ধিমান বলে অধিক পারিশ্রমিক পায়। এতে সম্পদের সমবণ্টন বজায় থাকে না। যার প্রকৃত সুযোগ ঘটতে পারে সাম্যবাদী সমাজে, যেখানে বণ্টন হবে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী। মার্কস তাঁর 'ক্রিটিক অব গোথা' প্রোগ্রামে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন। সুতরাং মানুষে মানুষে ভালোবাসার যে কথা আমরা বলছি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের মাধ্যমে তার যথার্থ ক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছে মাত্র।

ফ্রেই বেত্তো : সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের কথাও নিশ্চয়ই বলে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিশ্চয়ই আমরা মানুষের চূড়ান্ত বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যই সংগ্রাম করছি। যে মানুষগুলো দীর্ঘদিন একটা অবদমন, শোষণ, দাসত্বের মধ্যে ছিল তাদের ভেতর আমরা আত্মমর্যাদা, সম্মানবোধ জাগিয়ে তুলছি। আর যে সমাজ শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভক্ত, যে সমাজের মূলে রয়েছে ভয়াবহ শোষণ প্রক্রিয়া, যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিশ্চয়তাও নেই সেখানে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগও নেই।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো মার্কসবাদীদের একটা বিষয়ে আমরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা দ্বিধায় পড়ে যাই। আপনি মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা বলছেন আবার শ্রেণিঘৃণা এবং শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলছেন। খুব গভীর আত্মিক অর্থে মানুষের প্রতি ঘৃণা এবং ভালোবাসা কি পাশাপাশি চলতে পারে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দেখুন, সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ক্রমশ কিছু মানুষ কিছু গোষ্ঠী যখন সম্পদ, জমি কুক্ষিগত করতে লাগল তখনই শ্রেণির উদ্ভব ঘটল। সমাজের ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যদিয়েই শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে। ঐতিহাসিকভাবে শ্রেণিবিভাজন একটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে গ্রিক এবং রোমান রাজ্যে। যদিও তাদের গণতন্ত্রকে আদর্শ নমুনা হিসেবে বলা হয়ে থাকে।

আমরা শুনতাম এথেন্সবাসীরা তাদের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মুক্ত আলোচনার জন্য উন্মুক্ত জনসমাবেশে মিলিত হতো। শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে বলতাম, বাহ্ গণতন্ত্রের কী চমৎকার উদাহরণ! কিন্তু পরে গবেষণায় দেখা গেল আসলে এথেন্সের অল্প কয়জন অভিজাত অধিবাসী এ ধরনের সমাবেশে উপস্থিত থাকত। আপনিই বলুন, একটা উন্মুক্ত স্থানে শতশত মানুষ মিলে কোনো আলোচনা করছে, এটা ভাবা যায়? এজন্য অন্তত পক্ষে একটা মাইক্রোফোন বা লাউডস্পিকার তো দরকার।

আমি যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাড়িতে একজন বইবিক্রেতা আসতেন। উনি খুবই সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একাধারে স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান এবং ইংরেজি জানতেন। অত্যন্ত প্রতিভাধর ব্যক্তি তিনি। উনি আমাকে গ্রিক এবং রোমানদের অনেক গল্প শোনাতেন। সেই সময়কার দুই বিখ্যাত বাগ্মী ডেমোসথেনেস এবং সিসেরোর কথা উনি আমাকে বলতেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন, ডেমোসথেনেস নাকি তোতলা ছিলেন, বক্তৃতার সময় তিনি জিহ্বার নিচে একটা পাথর রেখে সেই ত্রুটি শুধরে নিয়েছিলেন। উনি আমাকে ডেমোসথেনেসের বক্তৃতার কিছু বই দিয়েছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর যে কয়টা বই বেঁচে গিয়েছিল এগুলো তারই অংশ। উনি আমাকে সিসেরোর বইও দিয়েছিলেন। আমি খুবই আগ্রহের সঙ্গে সেসব বই পড়তাম। আমি তখন হাইস্কুলের ছাত্র। এসব বই পড়ে আমি বক্তৃতার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েছিলাম। আলভারেজ নামের সেই লোকটিই আমাকে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীর হেন বাগ্মী নেই, যাদের বক্তৃতা নিয়ে আমি পড়াশোনা করিনি। কিন্তু পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে সেসব বক্তৃতা খুবই আলঙ্কারিক এবং এতে শুধু শব্দেরই নানা কারিগরি। আমি নিজে বক্তৃতার ক্ষেত্রে বরং উল্টো রাস্তাটাই ধরেছি। আজকের দিনের এই উত্তপ্ত সমস্যা নিয়ে ডেমোসথেনেসের ভাষায় তো আর বক্তৃতা দেয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলে না। তবে ছোটবেলায় আমি গ্রিক এবং রোমান সমাজের বেশ ভক্ত ছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে জানতে পেরেছি সে সমাজের গণতন্ত্রের আসল রূপ। কিছু অভিজাত এক জায়গায় বসে সব সিদ্ধান্ত নিত। তাদের নিচে ছিল বিশাল সাধারণ জনতা, আরো নিচে ছিল অগণিত দাস। এই হলো এথেনিয়ান গণতন্ত্র। সে সমাজে স্পষ্ট শ্রেণি ছিল এবং তারা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। রোমেও তাই ছিল। সেখানেও ছিল শ্রেণি, পেট্রিসিয়ান, প্লেবিয়ান আর দাস। সিজারদের ছিল সশস্ত্র সেনাদল যারা দেশব্যাপী চালাত দমনমূলক কর্মকাণ্ড। সেখানে শ্রেণিতে শ্রেণিতে অব্যাহত দ্বন্দ্ব ছিল। মধ্যযুগে এল অভিজাত, বুর্জোয়া আর ভূমিদাস শ্রেণি। সেখানও অনিবার্য শ্রেণিদ্বন্দ্ব। ফরাসি বিপ্লবের পর এই দ্বন্দ্ব পর্যবসিত হল বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্বে। সুতরাং শ্রেণির উদ্ভব যখন থেকে, শ্রেণিসংগ্রামও অনিবার্যভাবে তখন থেকেই শুরু। অতএব আপনি বুঝতে পারছেন শ্রেণিসংগ্রাম মার্কস বা মার্কসবাদীদের আবিষ্কৃত কোনো বিষয় নয়। সমাজে যে শ্রেণি বিরাজ করছিল মার্কস শুধু তাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সুতরাং শ্রেণি বিষয়ে কাউকে দোষারোপ করতে চাইলে মার্কসকে নয়, করা উচিত ইতিহাসকে। আপনি শ্রেণিঘৃণার কথা বলছিলেন। না, মার্কসবাদীরা শ্রেণিঘৃণায় প্ররোচিত করে না। মার্কসবাদীরা সমাজে বিরাজমান শ্রেণিসংগ্রামের কথা সকলকে জানায় মাত্র। ঘৃণা ওই শ্রেণিবিভাজনের মধ্যেই নিহিত থাকে। ঘৃণা জন্ম নেয় এক শ্রেণি দ্বারা অন্য শ্রেণিকে শোষণ, বঞ্চনা, দমন, পীড়নের মধ্যেই, সুতরাং এটা ঘৃণায় প্ররোচিত করার প্রশ্ন না, একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার প্রশ্ন।

মার্কসবাদীরা কারো বিরুদ্ধে নতুন করে ঘৃণার জন্ম দেয় না, বরং বিরাজমান সামাজিক ঘৃণাকে ব্যাখ্যা করে কেবল। আমাদের চিন্তাবিদ মার্তি সারাজীবন স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কিন্তু কখনো বলেননি, এসো আমরা ওদের ঘৃণা করি। বলেছেন, এসো আমরা সংগ্রাম করি। তিনি লিখেছেন, চাবুকের তীক্ষ্ণ আঘাত, তিরস্কারের তীব্র ভাষা কিংবা শেকলের ঝনঝনানি আমাকে ঘৃণা করতে শেখায়নি, শিখিয়েছে সংগ্রাম করতে। এটা আত্মিক অর্থে গভীর মানবিক বাণী। মার্তি স্প্যানিশদের ঘৃণা করতেন না, তিনি ঘৃণা করতেন স্প্যানিশদের সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে। মার্কসবাদীরাও তাই করে। তারা কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা করে ব্যবস্থাকে, যে ব্যবস্থা ওই ব্যক্তি বা শ্রেণিকে সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাস করি একজন ব্যক্তিমানুষ নানা বিচিত্র শর্তের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। সেখানে যেমন সামাজিক শর্ত থাকে তেমনি অনেক শারীরবৃত্তিক শর্তও থাকে। এমনকি সেখানে নানা জেনেটিক ব্যাপারও থাকতে পারে। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা করা তো কাজের কথা নয়। আমাদের সংগ্রাম অন্যায়ভাবে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে। যখন কোনো ব্যক্তি এই অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তখন আমাদের সংগ্রাম তার বিরুদ্ধেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো ঘৃণা বা প্রতিশোধস্পৃহা থেকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমরা কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেব? ইতিহাসের বিরুদ্ধে? তাদের কোনো শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যের বিরুদ্ধে? সুতরাং আমরা মানুষের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বিপ্লব করিনি, করেছি একটা ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা নিয়ে। আপনাকে আগেই বলেছি কোনো প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেফতার করেও আমরা তার প্রতি ঘৃণা ছুড়ে দিইনি। সমগ্র বিপ্লবের পেছনে খুব গভীর অর্থে ঘৃণা নয়, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই কাজ করেছে আমাদের। সুতরাং শ্রেণিঘৃণা বলতে ব্যক্তি-মানুষের প্রতি ঘৃণা বোঝায় না, বোঝায় একটা অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা।

জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্র

ফ্রেই বেত্তো আবার কিউবার রাজনীতির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। শুরুতে আপনাদের আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী ধারার, সেটিকে ক্রমান্বয়ে সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বলুন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এখানে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমাদের সব কর্মকাণ্ড যে আগে থেকে ছক কাটা, হিসাব-নিকাশ করা ছিল, তা ঠিক নয়। তবে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সামাজিক বিপ্লব সম্পাদনের জন্য করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের মৌলিক ধারণা ছিল। আমরা মূলত নির্ভর করেছি জনগণের ওপর। জনগণের মধ্যে আমাদের সেসব ধারণা আমরা পৌঁছে দিয়েছি এবং বস্তুত জনগণই আন্দোলনের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের যে বিপ্লবী নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তা জনগণের মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিপ্লবের শুরু থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে এ সরকার তাদের সরকার—কিউবার ইতিহাসে এর আগে যা কখনোই ঘটেনি। স্পেনীয়রা এ দেশ দখল করেছিল, তারা এখানে শহর গড়ে তুলেছিল তাদের নিজেদের জন্য। এখানকার আদিবাসীরা সকলে ছিল দাস, নয়তো খনি-শ্রমিক অথবা তাদের ব্যবহার করা হতো নদী থেকে সোনা তোলার কাজে। হত্যা করে, দেশ থেকে বিতাড়িত করে স্প্যানিশরা নানাভাবে কিউবার এই আদিবাসীদের নির্মূল করে। এরপর তারা আফ্রিকা থেকে ধরে আনে দাসদের, যারা কিউবার এই তপ্ত সূর্যের নিচে আখ আর কফিক্ষেতের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে।

আজ আমরা যাদের 'কিউবান' জাতি বলছি তাদের সবারই পূর্বপুরুষ হয় সেই স্প্যানিশরা, অথবা তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট আদিবাসীরা কিংবা সেইসব আফ্রিকান দাসেরা। এ দেশ একটা পর্যায় পর্যন্ত শাসন করেছে স্প্যানিশরা, তারপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমেরিকানরা এবং ১৯৫৯ পর্যন্ত এদেশের শাসনক্ষমতায় সবসময় ছিল ভূস্বামী বা ধনবান ব্যক্তি। রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। বিপ্লবের পর যখনই আমেরিকা কিউবাকে হুমকি দিতে শুরু করল, জনগণ সে হুমকি মোকাবিলার জন্য সংগঠিত হতে লাগল এবং অস্ত্র হাতে তুলে নিল। এর আগে অস্ত্র শুধু থাকত পেশাদার সেনাবাহিনীর হাতে, যে সেনাবাহিনী শুধু ক্ষমতাসীন শাসকদের আজ্ঞা পালন করত মাত্র। তাদের অস্ত্র ব্যবহার হতো কেবল ধর্মঘট, মিছিল এবং শ্রমিকদের আন্দোলন ঠেকাবার জন্য। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষই এক-একজন সৈন্য, সংগঠক, নীতিনির্ধারকে পরিণত হলো। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক ফরাসি একনায়ক বলেছিল, 'আমিই রাষ্ট্র'। কিউবার বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিল, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগল, তখন সেও নিঃসন্দেহে বলতে পারত—'আমিই রাষ্ট্র'।

বিপ্লবের পর যে নীতিমালাগুলো আমরা প্রণয়ন করেছিলাম, যার কথা আপনাকে আগেই বলেছি, বস্তুত এই নীতিমালা বাস্তবায়নের পদক্ষেপের মাধ্যমেই আমরা জনগণের সাধারণ সচেতনার মানকে উন্নত করেছিলাম, তাদের সমস্যার গভীরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম এবং ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলাম। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিপ্লবের সাফল্যের অনেক আগে থেকেই। আপনাকে আগেই বলেছি বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে বাতিস্তা-বিরোধী আন্দোলন করছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ক্রমান্বয়ে আমাদেরকে বিপ্লবের নেতৃত্বের স্থানে নিয়ে আসে। আমাদের মূল দলটি তৈরি করেছিলাম আমি, রাউল আর আবেল। আমি ছিলাম কমান্ডার-ইন-চিফ। সত্যি বলতে কি, আমি প্রথমে ছিলাম এই তিন-সদস্যের সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ। ১৯৫৭তে আমরা যখন প্রথম যুদ্ধ করলাম তখন আমরা ছিলাম মাত্র ২৭ জন। অবশ্য ১৯৫৯ সালে আমরা ৩ হাজার সদস্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। আন্দোলনে আমাদের সাফল্য সবচেয়ে বেশি হলেও আমরা সম্ভাবনাময় একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে কাজ করতাম। আমরা পাহাড়ে অবস্থান করে গেরিলাযুদ্ধ করলেও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল আন্দোলনকারী দলের সঙ্গে আলোচনা করতাম। এটা লক্ষণীয় ব্যাপার, আমরা চাইলেই সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু বিপ্লবের সাফল্যের এটাও একটা কারণ যে, আমরা শুরু থেকেই ক্ষমতাচর্চার ব্যাপারটা পরিহার করেছি। এক্ষেত্রেও আমরা জনগণের ওপর নির্ভর করছি। আন্দোলনের প্রক্রিয়াতেই ক্রমশ জনগণের বিপুল সমর্থনে আমরা নেতৃত্বে চলে এসেছি।

তবে এ নিয়েও প্রচুর দ্বন্দ্ব ছিল। আমাদের নিজেদের দলেই তৈরি হয়েছিল বিভেদ—একদল যারা পাহাড়ে গেরিলাযুদ্ধ করছে, আরেক দল যারা শহরে চোরাগোপ্তা যুদ্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করছে। কাদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, ঝুঁকি বেশি, এই নিয়ে বিভেদ ছিল। আমি বলেছি, হ্যাঁ আমরা যারা পাহাড়ে যুদ্ধ করেছি তাদের বিস্তর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে, পাহাড় ডিঙাতে হয়েছে। কিন্তু যারা শহরে ছিল তারাও ঝুঁকি বহন করেছে প্রতিদিন। আমরা দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু তাদের প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়েছে এককভাবে। সুতরাং দু পক্ষের ঝুঁকি এবং আত্মত্যাগ দুধরনের। দ্বন্দ্ব ছিল অন্যান্য ছোট দলগুলোর সঙ্গে যৌথ সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও। আমাদের দলের অনেকেরই তাতে মত ছিল না। কিন্তু আমি এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আন্দোলন ঘনীভূত হতে থাকলে আমি প্রধান প্রধান দলগুলো নিয়ে একটা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলি। তখন প্রধান দলগুলো ছিল পিপলস সোসালিস্ট পার্টি, পুরাতন কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্রদের বিপ্লবী ডিরেকটরেট। এখানেও ছিল নানা বাধা। বিভিন্ন দলে আমেরিকানদের ষড়যন্ত্রের শিকার কিছু ব্যক্তি ছিল। বারবারই নেতৃত্বের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কিন্তু আমি প্রাণপণে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। ১৯৫৯ সালে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল বস্তুত যৌথ নেতৃত্বেই। কিন্তু আমাদের দলটিই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আমাদের প্রতিই ছিল জনগণের শতকরা ৯০ ভাগের সমর্থন। মূলত ১৯৬৫তে এসে সবক'টি দল মিলে একটি দল গঠিত হয়। ১৯৬১ থেকেই আমরা সমাজতান্ত্রিক ধারার সূচনা করতে থাকি। সে কথা পরে বলছি।

আমরা যখন এক এক করে আমাদের বিপ্লবী নীতিমালা প্রণয়ন করছিলাম, আমেরিকা তখন আমাদের বিরুদ্ধে নানারকম পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে, যেমন অর্থনৈতিক অবরোধ, সমুদ্রবন্দর অবরোধ ইত্যাদি। আমরা আমেরিকান শিল্পকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে এর জবাব দিই। ওরা আমাদের চিনি আমদানির কোটা কমিয়ে দেয়। জবাবে আমরা ওসব চিনিকল জাতীয়করণ করে নিই। ওদের বাধাকে আমরা আমাদের মতো করে প্রতিরোধ করতে থাকি। মিল-কারখানা জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলত আমেরিকান প্রতিরোধেরই কারণে।

এরপর শুরু হয় সমাজতন্ত্রবিরোধী এক ব্যাপক প্রচারণা। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রচারণা বেশ প্রভাব ফেলে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নানা মিথ্যা রটনায় জনগণকে আতঙ্কিত করে তোলা হয়। তারা প্রচার করে, এই সরকার নাকি সন্তানদের পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, যাতে তারা দেশ ত্যাগ করতে না পারে। গুজব ছড়ায় যে ওই সন্তানদের ধরে নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হবে। কী অবিশ্বাস্য সব কথা! কিন্তু অনেক মানুষই তা বিশ্বাস করে, কারণ এসব কথা যুক্তিতে নয়, আঘাত করে প্রবৃত্তিকে। পরে আমি নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক সলোকভের *ধীরে বহে ডন* বইটা যখন পড়ি তখন জানতে পাড়ি যে, এ ধরনের প্রচারণা বলশেভিক বিপ্লবের সময়ও প্রচুর হয়েছিল। সুতরাং এ পরিস্থিতি কিউবার জন্যই নতুন কোনো বিষয় নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফ্রেই বেত্তো খ্রিস্টানদেরও প্রাথমিক পর্বে বলা হতো তারা নাকি মানুষের মাংস খায়।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, এটা একটা পুরোনো রেওয়াজ। রুশ বিপ্লব তো বটেই, ফরাসি বিপ্লবেও নিশ্চয়ই এরকম গুজব ছড়ানো হয়েছিল।

আমাদের বিরুদ্ধে এখানে ক্রমাগত গুজব ছড়াত আমেরিকা। সেইসঙ্গে ওরা তাদের সব দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। যেকোনো কিউবান আমেরিকায় যেতে চাইলেই তারা তাদের সাদরে ডেকে নিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক এদের প্রচুর বেতন দিয়ে তারা আমেরিকায় নিয়ে যেতে লাগল। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। যারা যেতে চাইল আমরা তাদের বাধা দিলাম না। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যারা রয়ে গেল এদের মধ্য থেকেই আমরা নতুন করে দক্ষ পেশাজীবী তৈরি করে নেব। যারা যাবার তারা যাক।

ফ্রেই বেত্তো এভাবে কতজন দেশত্যাগ করল সে সময়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। সে সময় আমাদের দেশে মোট ডাক্তার ছিল ৬ হাজার। এর মধ্য থেকে ৩ হাজার জন অর্থাৎ পুরো অর্ধেক ডাক্তারই দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু আজ জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে কিউবা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। অর্ধেক ডাক্তার নিয়ে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য কর্মসূচি শুরু করেছিলাম, আজ আমাদের ডাক্তারসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। হ্যাঁ, আমেরিকাই আমাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তারা ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারণায় জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছিল। অধিকাংশ মানুষের স্পষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস না থাকলেও বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল। আমরা ধীরে ধীরে যথেষ্ট সময় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা আমাদের দেশে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি। তবে একটা কথা বলতেই হয় যে আমেরিকার নানাবিধ প্রতিরোধের কারণে আমাদের সেই প্রক্রিয়ার গতিটা বরং ত্বরান্বিত হয়।

আমেরিকা আরো প্রচার করে যে আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কোনোটাই পালন করছি না। মনকাডা বিচারপর্বে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তা পরে 'ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে' এই নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা যদি কেউ পড়ে তাহলে আমাদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই জানতে পারবে। এটা সত্য যে সেসময় আমরা ধারণা করিনি, আমেরিকা এত ব্যাপকভাবে আমাদের বিরোধিতা করবে, আমাদের চিনির কোটা বন্ধ করে দেবে। ফলে বেশকিছু প্রতিশ্রুতি সে পর্যায়ে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের জন্য একটা শিক্ষা। আমরা হাতে হাতে শিক্ষা পেলাম সাম্রাজ্যবাদ কোনোপ্রকার সমাজবিপ্লবকে বিন্দুমাত্র ছাড়ও দেবে না। তবে সেসময় আমাদের নীতিমালায় কঠোর থাকার সিদ্ধান্তও সঠিক ছিল। আমরা যদি ভয় পেতাম, পিছিয়ে আসতাম তাহলে আমাদের আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যা বলছিলাম, তাতে মনে হতে পারে, আমেরিকার ক্রমাগত বিপ্লববিরোধী প্রতিরোধের কারণেই আমরা কিউবায় সমাজতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তনে বাধ্য হলাম। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজতন্ত্র অনেক আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। আমরা জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল প্রতিরোধ এবং আগ্রাসনের কারণে আমরা সত্বর সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে আমাদের নীতিনির্ধারণে বাধ্য হই। অতএব বলা যায় আমেরিকার বিরোধিতা কিউবায় সমাজতন্ত্রের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। আমেরিকার পক্ষ থেকে নানারকম প্রতিরোধ অবরোধ তো অব্যাহত ছিলই। ওরা সরাসরি আমাদের ওপর আক্রমণ করল ১৯৬১-এর ১৬ এপ্রিল। ওরা আকাশপথে বোমা নিক্ষেপ করল আমাদের বিমানবন্দরে, সম্বল মাত্র গুটিকয় যুদ্ধবিমানের ওপর। আমাদের জলসীমায়ও প্রবেশ করল ওদের নৌবহর। আমি সারারাত কমান্ড ঘাঁটিতে জেগে রইলাম। রাউল ছিল ওরিয়েন্টে। কোনো সংকট উপস্থিত হলেই আমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ করে নিতাম। আলমেইডাকে পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় অঞ্চলে, চে ছিল পশ্চিম অঞ্চলে, আমি থাকলাম হাভানায়। সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, এই বুঝি আমেরিকা কিউবাকে দখল করে নেয়। আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। সেসময় আমাদের সংগঠনও তেমন মজবুত হয়ে ওঠেনি। তবু আমাদের যা সামর্থ্য আছে, তাই নিয়েই সবাই সতর্ক রইলাম। আমার কমান্ড ঘাঁটির উপর বেশ কিছু বিমানকে আমি উড়তে দেখলাম। শেষে সেসব বিমানঘাঁটির ওপর মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণ করল। আমাদের বেশকিছু যোদ্ধা মারা গেল।

সেসময় একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল। আমাদের এক যোদ্ধা বোমার আঘাতে মারাত্মক আহত রক্তাক্ত অবস্থায় তার নিজের রক্ত দিয়ে এক বাড়ির দরজায় আমার নাম লিখেছিল। তারপরই সে মারা গিয়েছিল। সেই রক্তেলেখা দরজাটি এখনো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এটা খুবই বড় একটা ব্যাপার। এ থেকে জনতার অন্তর্গত প্রেরণাটিকে বোঝা যায়। একজন মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ নিজের রক্ত দিয়ে তার একটা প্রিয় নাম লিখে প্রতিবাদ করছে। সাধারণ জনতার এই প্রেরণাই আসলে সব বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের বিপ্লবকে। আমেরিকার এই আক্রমণে জনগণ প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৬ এপ্রিল মৃত যোদ্ধাদের স্মরণে হাজার হাজার জনতা একত্র হয়। এই জনতার অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র, বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সদস্য। এদের সবাই প্রায় হয় কৃষক, শ্রমিক অথবা ছাত্র। এই সমাবেশেই বস্তুত আমি প্রথম আমাদের সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম বলে ঘোষণা দিলাম।

সেদিন রাতেও তারা আবার আমাদের বিমানবন্দরে আক্রমণ করে। আমাদের বিমান ৮টি, আর পাইলট ৭ জন। পাইলটের চেয়ে বিমান বেশি ছিল। আমাদের গুটিকয় বিমান

~ www.amarboi.com ~

দিয়েই আমরা ১৭ তারিখের সকালের মধ্যে উপকূলে এগিয়ে আসা ওদের জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। এরপর তারা 'বে অব পিগস'-এ আক্রমণ চালায়। সেখানে আমাদের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। সে অন্য ইতিহাস। অতএব ১৬ এপ্রিলের পর থেকে 'বে অব পিগস'-এ জনতা যেমন আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তেমনি যুদ্ধ করতে শুরু করেছে সমাজতন্ত্রের জন্য। এভাবেই বাতিস্তার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে পরিণত হয়। 'বে অব পিগস'-এ হাজার হাজার জনতা অমিত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে অথচ মাত্র তিন মাইল দূরের উপকূলে তখন অপেক্ষা করছে আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ, ক্রুইজার। ১০০ জন সে যুদ্ধে মারা যায়, কিন্তু আরো হাজার জন সেখানে প্রস্তুত ছিল মৃত্যুর জন্য। জনতার এই বিপুল প্রতিরোধের কারণে আমেরিকা তার এই আক্রমণকে আর কোনো রাজনৈতিক যৌক্তিকতায় দাঁড় করাতে পারেনি। তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এগিয়ে চলে আমাদের সংগ্রাম।

কিউবায় গণতন্ত্র

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, কিউবার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অনেকেই প্রশংসা করে, কিন্তু তারা বলে কিউবায় কোনো গণতন্ত্র নেই, যেমন আছে আমেরিকায় কিংবা পশ্চিম ইউরোপে। তারা বলে ভোট দিয়ে সরকার পরির্বতনের ক্ষমতা কিউবার জনগণের নেই। এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ বিষয়ে আমরা দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না পাঠকের ততক্ষণ ধৈর্য থাকবে। আমার স্পষ্ট মত হচ্ছে, গণতন্ত্রের নামে যেসব দেশের কথা আপনি বললেন সেগুলো স্রেফ ভাঁওতা, ভণ্ডামির দেশ। কিছুদিন আগে এক আমেরিকান প্রফেসর আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেও একথা বলছিল। সে বলছিল লোকে নাকি ভাবে, আমি একজন বর্বর একনায়ক। এর উত্তরে আমার কীইবা বলার থাকতে পারে বলুন? আমি বললাম, তাহলে তো একনায়কের সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রথমত একনায়ক হচ্ছে যে একাই সব সিদ্ধান্ত নেয় এবং যে ডিক্রি জারি করে শাসন করে। সেক্ষেত্রে আপনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বরং একনায়ক বলতে পারেন। এমনকি আপনি পোপকেও একনায়ক বলতে পারেন, কারণ তিনি ডিক্রি জারি করে শাসন করেন। তিনি একাই বিভিন্ন জায়গার রাষ্ট্রদূত এবং বিশপ নিয়োগ করেন। এসবই পোপের একার সিদ্ধান্ত অথচ পোপকে কেউ কখনো একনায়ক বলবার কথা চিন্তাই করে না।

কিউবায় কোনো মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত বা কারো নিয়োগের ব্যাপারেই আমার কোনো হাত নেই। শুধু আমার ক্ষেত্রে কেন, রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ে কারোরই এখানে এককভাবে কোনো

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত নেয়ার বা ডিক্রি জারি করার সুযোগ নেই। আমাদের সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যৌথ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি আমার মতামত এবং যুক্তি নির্বাহী কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করি মাত্র। এইটুকুই আমার অধিকার এবং সত্যি এর একটুও বেশি অধিকার আমি চাই না।

আর বর্বরতা? আমি, আমাদের দল, এদেশে বিপুল মানুষ পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করলাম অন্যায়, বৈষম্য, ক্ষুধা, অপরাধ আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, এটা কি বর্বরতা? প্রকৃত বর্বর হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা এইসব দারিদ্র্য আর অসত্যের জন্য দায়ী। বর্বর এ ব্যবস্থার স্বার্থপরতা, শোষণ। বর্বর হলো সাম্রাজ্যবাদ, যে নির্বিবাদে ঘটায় লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যু। কতজন মারা গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে? দেড় কোটি না দুই কোটি? কতজন মারা গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে? তাও পাঁচ কোটি হবে। এ ছাড়াও বেঁচে রইল কত অন্ধ, পঙ্গু। কত শিশু এতিম হলো, কত বিপুল সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কারা এই বর্বরতার জন্য দায়ী? সাম্রাজ্য এবং বাজার দখলের জন্য যাদের লড়াই। আমরা যারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলাম তারাই কিনা বর্বর হলাম? আমেরিকা ভিয়েতনামে কয়েক লাখ মানুষ হত্যা করেছে, সেই ছোট দেশটিতে অগণিত বোমা ফেলেছে, যে দেশটি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল। সেই আমেরিকাকে আপনি গণতান্ত্রিক বলবেন?

রিগ্যান যেবার প্রেসিডেন্ট হলেন সেবার মাত্র ৩০ ভাগ লোক ভোট দিয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম এবং এরকম একটা নির্বাচনের মাধ্যমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এমন ক্ষমতাবান হন যে ক্ষমতা রোমান সম্রাটেরও ছিল না। একজন রোমান সম্রাট খুব বেশি হলে দুই গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ বাধিয়ে একে অপরকে হত্যা করার দৃশ্য দেখতে পারতেন বা সিংহের সঙ্গে ক্রীতদাসের লড়াই উপভোগ করতে পারতেন। কিংবা উন্মাদ নীরো রোম শহরে আগুন লাগিয়ে বসে বেহালা বাজাতে পারতেন। কিন্তু একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যেকোনো সময় নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধিয়ে সারা পৃথিবীকেই ধ্বংস করে দিতে পারেন। সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে; ধনী, গরিব, কোটিপতি, ভিক্ষুক, তরুণ, বৃদ্ধ, মহিলা, পুরুষ, কৃষক, ভূস্বামী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক সবাইকে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সত্যিই মুহূর্তে ধূলিসাৎ করতে পারেন এই পৃথিবীতে। অবশ্য পৃথিবী যখন ধ্বংস হতে থাকবে আমার মনে হয় না তিনি তখন নীরোর মতো বেহালা বাজাবার সুযোগ পাবেন, কারণ তেলাপোকারা তাকে খুব বিরক্ত করবে। শুনেছি তেলাপোকারা নাকি পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকেও নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চাইলে এই পৃথিবীকে তেলাপোকাদের পৃথিবীকে পরিণত করতে পারেন। শুনেছি প্রেসিডেন্টের কাছে নাকি গোপন সংকেত দেয়া একটা ব্রিফকেস আছে। সেখানে কোনো সংকেত টিপে দিলেই নাকি বেধে যাবে যুদ্ধ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এসময়ের সম্রাটেরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতীতের সম্রাটদের চেয়ে কত বেশি ক্ষমতাবান। এবং একেই এরা বলে গণতন্ত্র। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো যাদের কথা আপনি বললেন, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, স্পেন যারা খুব গণতন্ত্রের কথা বলে তারা সবাই আবার ন্যাটোর সদস্য এবং বস্তুত ওই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটিরই অংশীদার। সেইসঙ্গে ঐ সবকটি দেশেই ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ বেকার। এই হলো তাদের গণতন্ত্রের নমুনা।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি ইউরোপের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। ইউরোপ আর সেই মধ্যযুগীয় পর্যায়ে নেই, যখন তারা ভিন্নমতালম্বীদের পুড়িয়ে মারত। নেই পূর্বেকার ঔপনিবেশিক চরিত্র। কিন্তু ইউরোপ এখন নতুন চরিত্র ধারণ করেছে। এখন সে আবির্ভূত হয়েছে নয়া সাম্রাজ্যবাদীরূপে। ইউরোপ ঠিক কিসের এত গর্ব করে আমি বুঝে উঠতে পারি না। গত দুটো বিশ্বযুদ্ধে তারা যে ধ্বংসলীলা ঘটিয়েছে তাকেও কি তারা তাদের গৌরবজনক কীর্তি মনে করে? শত শত বছর ধরে সারা বিশ্বব্যাপী যে দাসত্ব, শোষণ, নিপীড়ন তারা চালিয়েছে কই সে-বিষয়ে তো তাদের কোনো স্পষ্ট, সৎ, নির্মোহ সমালোচনা দেখি না। বরং সেই শোষণ অব্যাহত রাখার ব্যাপারেই তাদের আগ্রহ দেখি। তাদের যা-কিছু অগ্রগতি আজ দেখা যাচ্ছে সবকিছুর পুঁজিই তো জুগিয়েছে তৃতীয় বিশ্ব। যে বৈভব আজ তারা গড়ে তুলেছে তার সবটুকুই অর্জিত হয়েছে ওদের উপনিবেশগুলোর সোনা, ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে। মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে রক্তপাতের ইতিহাস।

সেই ইউরোপ কী করে গণতন্ত্রের বড়াই করে, আমি বুঝি না। তারা আমাদের বলে কিনা অগণতান্ত্রিক, যে আমরা তাদের পূর্বতন দাসমাত্র, যারা তাদের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা থেকে কোনোমতে বেঁচে গেছি, সংগ্রাম করেছি, নিজেদের আজ স্বাধীন করেছি। আমাদের সম্পদ, আমাদের ফসল, আমাদের শ্রম আজ আমাদের। আমরা আর দরিদ্র, মূর্খ, রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক নই। আমরা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী সবাই মিলে দেশে একটা বিপ্লব সংঘটিত করেছি, আর তারা এখন তুলেছে গণতন্ত্রের দোহাই।

এটা কিছুতেই বলা যাবে না যে পশ্চিমা সরকারগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সমর্থনপুষ্ট। রিগ্যানের কথা আপনাকে বলছিলাম। প্রথম নির্বাচনে শুধুমাত্র ৫০% ভোটার ভোট দিয়েছিল। নির্বাচনে তিনজন প্রার্থী ছিল অর্থাৎ ৩০%-এরও কম ভোটে রিগান প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল। দেশের অর্ধেক লোক ভোটই দেয়নি। দ্বিতীয় নির্বাচনে এই হার ছিল আরো কম। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, ইতালির প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী, এমনি পশ্চিমা সব দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন না।

যারা চার বছরের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করল, এই চার বছরে তাদের আর কিছু বলবার নেই। এরপর প্রেসিডেন্ট একাই সিদ্ধান্ত নেবে, মিলিটারি বাজেট কী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে, তারকাযুদ্ধ কীভাবে ঘটবে, কোথায় কী অস্ত্র কিনতে হবে, ব্যবহার করতে হবে, কোন্ আন্তর্জাতিক বিষয়ে কোন্ দেশের পক্ষে-বিপক্ষে যেতে হবে, কোথায় সৈন্য পাঠাতে হবে। এর জন্য তিনি কারো সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শের জন্যই দায়বদ্ধ নন। তিনি স্রেফ একা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারেন, কারো সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলাপ আলোচনা না-করেই।

আমাদের দেশে কোনো মৌলিক বিষয়েই কখনো যৌথ আলোচনা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। ৯৫% ভোটার আমাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১,৫০০ লোকের মধ্যে আমাদের একটা ভোট-অঞ্চল। গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় ১,০০০ লোক নিয়ে সেখানকার পাড়ায় পাড়ায় মিলেই অঞ্চলে প্রার্থী প্রস্তাব করে। তাদের মধ্যকার নির্বাচিত ব্যক্তিই সেই ভোট-অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের দেশে ১১,০০০ ভোট-অঞ্চল আছে অর্থাৎ প্রতি ৯১০ জন মানুষের একজন প্রতিনিধি আমাদের সরকার-কাঠামোতে রয়েছে। এই প্রতিনিধিরা কখনো পার্টি কর্তৃক প্রস্তাবিত হন না। তাদের নাম প্রস্তাব করে তাদের প্রতিবেশীরাই। এক-একটা অঞ্চলে দুই থেকে আটজন প্রার্থী থাকে। কেউ যদি মোট ভোটের অর্ধেক যোগ এক ভাগ ভোট পেতে ব্যর্থ হয়, তাহলে দ্বিতীয় আরেকটি নির্বাচন হয় শুধু প্রথমপর্বের সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত দুইজনের মধ্যে। এভাবেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিরা নির্বাচন করেন মিউনিসিপ্যাল প্রতিনিধিদের, মিউনিসিপ্যাল প্রতিনিধিরা নির্বাচন করেন রাষ্টীয় প্রতিনিধিদের। আমাদের জাতীয় সংসদের অর্ধেকেরও বেশি প্রতিনিধি এসেছেন তৃণমূল পর্যায় থেকে। আমিও জাতীয় সংসদের একজন প্রতিনিধি, অবশ্য আমি তৃণমূল পর্যায় থেকে আসিনি, আমাকে নির্বাচিত করেছে সান্তিয়াগো ডু কিউবার মিউনিসিপ্যাল সদস্যরা।

যারা তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সত্যি বলতে তারা জনগণের দাস। কারণ তার অঞ্চলের জনগণের জন্য তাকে প্রচুর কাজ করতে হয় অথচ এজন্য তিনি কোনো বিশেষ ভাতা পান না। তিনি তার স্বাভাবিক পেশায় থেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর জনগণের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তার কাজের জন্য। এলাকার জনগণ চাইলে যেকোনো মুহূর্তে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন যদি না থাকত, তাহলে বহু আগেই বিপ্লবী সরকারের পতন ঘটত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপ্লবের প্রতি এই সমর্থনকে বিবেচনায় রেখেই আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। যে যা-ই বলুক বিপ্লবের কাছে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ এদেশের জনগণ। কারণ তারা তাদের জীবনের পরিবর্তনকে দেখতে পাচ্ছে। জনগণ স্পষ্টভাবেই অনুভব করে সরকার-পরিচালনায় তারও একটা দায়িত্ব আছে, অধিকার আছে, ক্ষমতা আছে। কিউবার জনগণ যথার্থই বলতে পারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আমিই রাষ্ট্র', যে কথা আপনাকে আগেও বলেছি। বিপ্লবটি যদি সত্যিকার বিপ্লব হয়, এর পেছনে যদি সত্যিকার সৎ পুরুষ এবং মহিলা জড়িত থাকে এবং তারা যদি কাজের প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত সংঘটিত ভুলগুলোকে শুধরে নিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে সে বিপ্লবের পেছনে জনগণের সমর্থন থাকবেই।

সুতরাং এদেশের গণতন্ত্র নিয়ে পশ্চিমারা যেসব কথা বলেছে সেগুলো স্রেফ মিথ্যাচার। সমাজে চরম বৈষম্য টিকিয়ে রেখে গণতন্ত্রের কথা ওঠেইবা কীভাবে? সব গালগল্প, কল্পনা। তারা যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলে, তখন তারা আসলে গণমাধ্যমকে দখলে রাখার স্বাধীনতার কথা বলে। কোনো বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে আপনি কখনো আমেরিকার সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা, যেমন ওয়াশিংটন পোস্ট বা নিউইয়র্ক টাইমসে লিখতে দেখবেন না। আমেরিকার কোনো কম্যুনিস্টের কথা আপনি কোনোদিন শুনবেন না। তাদের কোনো খবর পত্রিকায় থাকবে না, রেডিওতে কোনোদিন তাদের কোনো কথা শোনা যাবে না। টেলিভিশনে ভুলেও কোনোদিন তাদের চেহারা দেখা যাবে না। দুটো দল কেমন বেশ পালাবদল করে সরকার গঠন করে যাচ্ছে। যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, গণমাধ্যমে তাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। স্বাধীনতা শুধু তাদের জন্যই বরাদ্দ যারা পুঁজিবাদের সমর্থক। তারাই জনগণের মতামতকে তৈরি করে। এরই নাম নাকি গণতন্ত্র?

এর চেয়ে আমাদের নিজেদের তো সৎ বলেই মনে হয়। এখানে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন গণমাধ্যম নেই। ছাত্রদের, কৃষকদের, মহিলাদের, বিভিন্ন সংগঠনের, পার্টির প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রকাশনা আছে। বিভিন্নভাবে জনগণের অবিরাম গঠনমূলক সমালোচনায় যৌথ নেতৃত্বেরই আমাদের সরকার চলে। আমাদের নিজস্ব ধরনের গণতন্ত্র।

আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আমি রাষ্ট্রের কোথাও কাউকে নিয়োগ দিই না। আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি শুধু আমার মতামত জানাতে পারি মাত্র। আমি সে ক্ষমতা চাই না। বাস্তবিকই আমার একার সিদ্ধান্তে এখানে কোথাও কিছু হতে পারে না। আমি আপনাকে আমার গভীর বিশ্বাস থেকে বলতে পারি, পশ্চিমা পুঁজিবাদী ঐসব প্রতারক, শোষক দেশের চাইতে আমাদের দেশ হাজার গুণ বেশি নিষ্কলুষ এবং গণতান্ত্রিক।

বিপ্লব রফতানি

ফ্রেই বেত্তো   কমান্ডার, কিউবা কি অন্য দেশে বিপ্লব রফতানিতে বিশ্বাস করে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   এ বিষয়ে আমি আগেও অনেকবার বলেছি। একটা ব্যাপার হলো, যে বিশেষ পরিস্থিতি এবং শর্তগুলোর জন্য একটা দেশে বিপ্লবের আবহ গড়ে ওঠে সেই

~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতি কোথাও রফতানি করা তো অসম্ভব। আপনি ৩৬০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ কীভাবে রফতানি করবেন? ৩০ থেকে ৫০ হারে বেড়ে যাওয়া ডলারের সুদ আপনি কীভাবে রফতানি করবেন? আইএমএফ-এর শর্তগুলো আপনি কীভাবে রফতানি করবেন? কী করে আপনি রফতানি করবেন তৃতীয় বিশ্বের দুর্ভোগ আর দারিদ্র্যকে? এসব শর্ত বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি করে। এগুলোকে রফতানি করা যায় না। আমি সবসময়ই বলে আসছি আমেরিকা এবং আইএমএফ নীতিমালা এবং বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো ল্যাটিন আমেরিকা এবং তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় দুর্ভোগের কারণ। আমি মনে করি বিপ্লব রফতানির ব্যাপারটি একটা সরলীকৃত বাস্তববর্জিত ধারণা। আপনি চিন্তা, ধারণা, মতামত এসবের চর্চা করতে পারেন এবং তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে পারেন। আজকের পৃথিবীর প্রায় সব চিন্তারই জন্ম হয়েছে এক জায়গায় এবং তা প্রসারিত হয়েছে অন্যত্র।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধারণা এসেছে ফরাসি দেশ থেকে এবং তা ছড়িয়েছে সারাবিশ্বে। খ্রিস্টবাদ অজটেক ইনকাদের বিশ্বাস নয়, সেটা এসেছে অন্য স্থান থেকে। আজ লক্ষ-কোটি মানুষ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এমনকি যে ভাষায় আমরা কথা বলি তার উৎসও এদেশে নয়। সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে আজ আমরা মেক্সিকো থেকে শুরু করে পাটাগোনিয়া পর্যন্ত এক ভাষায় যোগাযোগ করতে পারি। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা যে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইংরেজিতে কথা বলে, এ ভাষা কি এতদঞ্চলে জন্ম নিয়েছে? না, তাদের আমদানি করা হয়েছে। রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক ধারণার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই। এসব ধারণাও এভাবে বিশ্বময় প্রসারিত হয়। শুধু ধারণার কথাই বা বলি কেন। আমাদের দেশে কফি তো এসেছে অন্য অঞ্চল থেকে, আবার আমাদের টমেটো বা বেয়াড তামাক ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের অন্যপ্রান্তে। ল্যাটিন আমেরিকার ঘোড়া, গরু আর শূকরগুলো অথবা আমাদের প্রাত্যহিক খাবারের অনেক কিছুই এসেছে অন্য মহাদেশ থেকে।

হ্যাঁ, এটাই ইতিহাসের সত্য যে, একটা নতুন আদর্শ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়ায়। তাই বলে একটা বিপ্লবকে অন্যদেশে বসিয়ে দেয়ার ধারণাটা বালখিল্যতা। প্রতিক্রিয়াশীলরা নতুন কোনো আদর্শকে সবসময়ই ভয় পায়। নইলে চারিদিকে এত সমাজতন্ত্রবিরোধী, মার্কসবাদবিরোধী, সাম্যবাদবিরোধী প্রচারণা কেন? নতুন বিশ্বাসকে অন্যদেশে প্রসারিত করা যেতে পারে কিন্তু বিপ্লব রফতানির ধারণাটি উদ্ভট চিন্তামাত্র।

কোনো দেশের বিপ্লবের প্রতি আপনার সহানুভূতি এবং নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে, কখনো কখনো আর্থিক সহায়তার জন্যও কেউ এগিয়ে আসতে পারে, যেমন ঘটেছিল কিউবার ক্ষেত্রে, কিন্তু কেউ কি কিউবায় বিপ্লব রফতানি করছে? না, বিপ্লব ঘটাবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য কিউবাকে আগে কেউ একটা পয়সাও দেয়নি, একটা অস্ত্রও দেয়নি। শুধু চূড়ান্ত পর্বে কিছু রাইফেল আমরা পেয়েছিলাম, যখন বলতে গেলে যুদ্ধ শেষ। রাইফেলগুলো পাঠিয়েছিল সদ্য ক্ষমতায় আসা ল্যাটিন আমেরিকার একটা গণতান্ত্রিক সরকার। পুরো বিপ্লবটি সংগঠিত হয়েছিল সম্পূর্ণ আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির ভিত্তিতে। আমরা আমাদের বিপ্লবের অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের জানাতে পারি, তাই বলে আমরা তো অন্য একটা দেশে আন্দোলনের জন্ম দিতে পারি না। বিপ্লব বা আন্দোলন শুধু অভ্যন্তরীণ শর্তসাপেক্ষেই গড়ে ওঠে। তাই কেউ যখন বিপ্লব রফতানির কথা বলে আমার তখন খুব হাসি পায়।

বিদেশি ঋণ

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, আপনার বইয়ে প্রথম অংশে তৃতীয় বিশ্বে বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে আপনি যে-প্রস্তাব রেখেছেন সে-বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করুন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি মূলত ল্যাটিন আমেরিকার কথা বলেছি। ল্যাটিন আমেরিকা অত্যন্ত কঠিন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি। এ অবস্থা তিরিশের মন্দার সময়ের চেয়েও খারাপ। সেই ভয়াবহ মন্দার সময়ও আমাদের রফতানি আয় ও ক্রয়ক্ষমতা এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। তখন আমাদের জনসংখ্যাও ছিল এখনকার চার ভাগের এক ভাগ। আমাদের জনসংখ্যা চার গুণ বেড়েছে, সমস্যাও বেড়েছে কয়েক গুণ। ল্যাটিন আমেরিকায় এখন বিশাল শহর গড়ে উঠেছে। যেমন মেক্সিকো সিটি, অগণিত যার সমস্যা। মেক্সিকোর পরিবেশবিজ্ঞানীরা আমাদের জানাচ্ছেন, এই শহরে ২০ লাখ বেকার রয়েছে, রয়েছে ৫ লাখ অপরাধী। প্রতিদিন ৬০০-৭০০ লোক গ্রাম থেকে শহরে আসে। তারা বলেছেন সেখানে বনাঞ্চল সব উজাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় বাস, ট্রাক, গাড়ি, মিল কারখানা থেকে ৫০০ টন বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। তারা বলছেন, শহরের বাতাসে অক্সিজেন কমে আসছে বিপজ্জনক মাত্রায়। আর মাত্র ১৪ বছরে এ শহরের জনসংখ্যা হবে তিন কোটি ৪০ লাখ এবং তাদের বাতাসে তখন কোনো অক্সিজেন থাকবে না। ৬০ লাখ লোক প্রতিদিন শহরের রাস্তায় মলত্যাগ করে। এমনকি তারা এও হিসাব করে দেখিয়েছেন এই মলের পরিমাণ বিশ হাজার টন, যা শহরবাসীর চোখ, নাককে ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে আসছে। মোট কথা তারা বিস্তর গবেষণা করেছেন এ বিষয়ে। অন্যান্য শহরের অবস্থাও এইরকমই।

তিরিশের দশকে আমাদের অবস্থা এরকম ছিল না। সেইসঙ্গে ছিল না ৩৬ হাজার কোটি ডলারের ঋণ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেনেডি তার সময়ে যেকোনো সামাজিক বিদ্রোহ এবং বিপ্লব ঠেকানোর জন্য দুই হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের কথা বলেছিলেন। সেসময়ের তুলানায় আমাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, সমস্যা চর্তুগুণ বেড়েছে। এখন আমাদের প্রতিবছর শুধু সুদ হিসেবে ফেরত দিতে হবে চার হাজার কোটি ডলার আর মূল্যমান বৃদ্ধির জন্য আরো এক হাজার কোটি ডলার। মোট পাঁচ হাজার কোটি ডলার। সেইসঙ্গে বাণিজ্যের অসমনীতির কারণে আমাদের ঘাড়ে বর্তায় আরো ২০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ অঙ্ক বলে দিচ্ছে আমাদের মতো পৃথিবীর অনুন্নত এই অঞ্চল প্রতিবছর শিল্পোন্নত দেশগুলোর হাতে সাত হাজার কোটি ডলার তুলে দিচ্ছি। যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র এক হাজার কোটির মতো। অর্থাৎ ছয় হাজার কোটি ডলার আমাদের লোকসান। এটা নৈতিক, রাজনৈতিক সব অর্থেই অত্যন্ত অযৌক্তিক। আমরা অঙ্ক করে দেখিয়েছি, এটা পরিশোধযোগ্য নয়। এটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক যেকোনোভাবেই পরিশোধ করা অসম্ভব। তাই আমি বলেছি এই ঋণ বাতিল—মূল পুঁজি, সুদ সব।

এক্ষেত্রে আমি ঋণের ঐতিহাসিক এবং নৈতিক দিকটির ব্যাখ্যা করেছি। আমি মনে করি এযাবৎ উন্নত দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর যা করেছে তা অনৈতিক। আমাদের দেশগুলো শত শত বছর ধরে লুণ্ঠিত হয়েছে। তাদের শিল্প-কারখানাগুলো তৈরি হয়েছে আমাদের মানুষদেরই জীবনের বিনিময়ে, আমাদের সম্পত্তি ডাকাতি করে। আমাদের কাছ থেকে যা চুরি করা হয়েছে তার পরিমাণ তাদের দেয়া ঋণের চেয়ে শতগুণ বেশি। নৈতিক দিকটা নাহয় বাদই দিলাম, অর্থনৈতিক বিবেচনাতেও এই ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। এটা অসম্ভব। সত্যি বলতে, তাদের ঋণ শোধ করতে হলে আমাদের দেশের সব মানুষকে মেরে ফেলতে হবে।

কী ছিল এইসব বৈদেশিক ঋণের চুক্তিতে? একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে এসব ঋণের সিংহভাগই তারা নানা ছলেবলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদেরই দেশে। সুতরাং আমি বলব, আমাদের এখন শুধু এই ঋণের চুক্তির বাতিলের সংগ্রামই নয়, সংগ্রাম করতে হয় সেইসব অসম বাণিজ্যনীতি, বাণিজ্য অবরোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যা এসব দেশকে ঋণ নিতে বাধ্য করে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতির জন্য।

আমার সহজ কথা হলো এ ঋণ আমাদের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। কীভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে? এ বিষয়ে এখনো আমরা কোনো স্পষ্ট পথ তৈরি করতে পারিনি। আমি মনে করি, এ সংগ্রাম করার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, সেইসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশ যারা এই বৈদেশিক ঋণের শিকার, তাদের [illegible] সংগ্রাম করতে হবে। এ সংগ্রামের জন্য আমাদের যথেষ্ট শক্তি প্রয়োজ[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা এমন কোনো প্রস্তাব করিনি, যাতে ঋণদানকারী ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যবসা দেউলিয়া অবস্থায় পড়ে যায়। আমরা বলেছি তারা তাদের সামরিক ব্যয়ের মাত্র ১২ ভাগ, যার বর্তমান মূল্য বছরে এক ট্রিলিয়ন ডলার, যদি অন্য খাতে বণ্টন করে, তাতে তাদের ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা যদি এই সংগ্রামে জিততে পারি, জিততে আমাদের হবেই—কারণ এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং আমরা যদি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে এই ঋণসমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সামরিক ব্যয় ৩০ ভাগ কমিয়ে আনা যাবে। যদিও তার পরও তাদের হাতে ৭০ হাজার কোটি ডলার থাকবে অস্ত্র বানানোর জন্য, যা দিয়ে বেশ ভালোভাবেই পৃথিবীর সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে।

এর মানে এই নয় যে, উন্নত দেশের সাধারণ মানুষদের তখন বেশি কর দিতে হবে বা ব্যাংকে আমানতকারীরা তার টাকা হারাবে। বরং আমি মনে করি, এতে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যাই সমাধান করা যাবে। ঋণ মওকুফের কারণে তৃতীয় বিশ্বের আরো ৩০ হাজার কোটি ডলার ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, এতে শিল্পোন্নত দেশে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্পোন্নত দেশের প্রধান সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। সেসব দেশে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ বাড়বে, রফতানি বাড়বে, তাদের বহু মানুষের কাজের সুযোগ পেলে তাদের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। বিদেশে বিনিয়োগের চেয়েও তাদের লাভ বেশি হবে।

আমি বলেছি এ সমস্যা সমাধান না হলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তো ধ্বংস হবেই, উন্নত দেশগুলোও নিমজ্জিত হবে গভীর সংকটে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হবে, তা বিপ্লবের আকার ধারণ করবে। সামরিক, বেসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লবী উত্থান ঘটবে। কারণ এটা এমন এক সমস্যা, যার সমাধান না করে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যাবে না। একজন আমাকে বলেছিলেন, বিপ্লবী হিসেবে এই বিপ্লবের সম্ভাবনায় আমার তো খুশি হবারই কথা। কিন্ত আমি বলেছি, না। আমি এই সমস্যার একটা সুশৃঙ্খল সমাধান আশা করি। আমি চাই না, একটা নিয়ন্ত্রণহীন বিস্ফোরণ। এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচটা বিচ্ছিন্ন বিপ্লবের চেয়ে আমি মনে করি একটা নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতিমালার জন্য সংগ্রাম করে এই সমস্যার সমাধান করা জরুরি। কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা না হলে বিপ্লবের পরও সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। ঋণের চুক্তি বাতিল এবং নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অনেক কম রক্তক্ষয় আর কষ্টভোগের বিনিময়ে আমরা আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।

এজন্যই আমি যৌথ আন্দোলনের আহ্বান করছি। তবে প্রতিটি দেশ তার নিজের মতো কিছু পদক্ষেপও অবশ্যই নিতে পারে। অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপগুলো বাতিল করে যৌথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আন্দোলন হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব ধরনের পরিস্থিতি থাকে। তবে চূড়ান্তভাবে ভুক্তভোগীদের একসঙ্গেই এ বিষয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

আমি মনে করি এটাই আমাদের বর্তমান সময়ের সবচেয় বড় সমস্যা। যিনি বর্তমানে এই সংকটটি সম্পর্কে সচেতন নন, আমি মনে করি, তিনি নিজেকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন বলেও দাবি করতে পারে না।

চে গুয়েভারা

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, এবার আমার শেষ প্রশ্ন। এ প্রশ্ন আপনার দুই সহকর্মী সম্পর্কে। একজন আর্নেস্টো চে গুয়েভারা, অন্যজন কামিলো সিয়েনফুগোস। এই দুই বিপ্লবী সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের অশেষ শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল রয়েছে। এ দুজন সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাই।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : অল্প কথায় এদের সম্পর্কে বলা খুব কঠিন। চে সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, তার ছিল অসাধারণ ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক সততা, অসাধারণ নৈতিক সততা।

ফ্রেই বেত্তো চে'র সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, তখন আপনার বয়স কত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো জেল থেকে বেরিয়ে যখন মেক্সিকো গেলাম সেখানেই চে'র সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেটা ১৯৫৫ সাল। চে মেক্সিকোতে ইতিমধ্যেই আমাদের কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সে তখন গুয়েতমালা থেকে ফিরেছে, সেখানে সে সিআইএ এবং আমেরিকার নানা হস্তক্ষেপকে প্রত্যক্ষ করেছে, দেখেছে নানা অপরাধ আর বিশৃঙ্খলা। এর কিছুদিন আগেই সে আর্জেন্টিনা থেকে ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছে। মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে সে বলিভিয়াসহ বেশ কয়টা দেশ ঘুরে বেড়ায়, এই ভ্রমণে তার সঙ্গী ছিল গ্রানাডো নামে তার এক গবেষক ডাক্তার বন্ধু। তারা দুজন আমাজন পর্যন্ত গিয়েছিল, সেখানে তারা কুষ্ঠরোগীদের এক হাসপাতালে কাজ করে। এই দুই ডাক্তার সেখানে অনেকটা মিশনারিদের মতো কাজ করেছে।

ফ্রেই বেত্তো চে কি আপনার চেয়ে ছোট ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, সম্ভবত সে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। আমার জানামতে ওর জন্ম ১৯২৮ সালে। চে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছিল, পাশাপাশি সে নিজের উদ্যোগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করছিল। সে পড়াশোনা করতে ভালোবাসত, তার ছিল আত্মপ্রত্যয়। তার জীবন, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে ধীরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধীরে বিপ্লবী করে তুলেছিল। আমার সঙ্গে যখন চে'র দেখা হয় ততদিনে সে একজন যথার্থ বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে চে ছিল অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার অধিকারী। কোনোকিছুকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার অসাধারণ গুণ ছিল তার। এটা খুবই দুঃখজনক যে তার চিন্তাভাবনাগুলোকে লিখে রেখে যাবার আগেই তার মৃত্যু হলো। চমৎকার লিখত সে। খুবই অভিব্যক্তিময় ছিল তার লেখা, অনেকটা হেমিংওয়ের মতো। লেখাতে ঠিক জায়গায়, ঠিক শব্দটি ব্যবহারের অপূর্ব দক্ষতা ছিল তার। এর সঙ্গে চে'র ছিল ব্যতিক্রমী অনেক মানবিক গুণ, গভীর সহমর্মিতা, নিঃস্বার্থপরতা, সাহসিকতা। তবে প্রথম যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমি তাকে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আর্জেন্টেনীয় উদ্যমী তরুণ হিসেবেই চিনতাম। তার সঙ্গে আমার অল্প কিছুক্ষণ কথা হয় এবং আমাদের সংগ্রামে তার অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমি সম্মত হই। সে আর্জেন্টিনা থেকে এসেছিল বলে তাকে চে ডাকা হতো।

ফ্রেই বেত্তো আপনারা কি তাকে চে বলে ডাকতেন, না তিনি নিজেই চে নামে পরিচয় দিতেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : কিউবানরা তাকে চে বলে ডাকত। অন্য কোনো আর্জেন্টেনীয় হলেও তাকে চে বলেই ডাকা হতো, কারণ আর্জেন্টেনীয়রা একে অন্যকে চে বলেই সম্বোধন করে। কিন্তু চে গুয়েভারার খ্যাতি এবং সম্মান এতই ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে, চে শব্দটি তার নামেরই সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

সে একজন ডাক্তার ছিল এবং ডাক্তার হিসেবেই সে প্রথম আমাদের দলে যোগ দেয়, যোদ্ধা হিসেবে নয়। যদিও তার গেরিলা প্রশিক্ষণ ছিল। সে ছিল খুবই পারদর্শী শুটার। সে খেলাধুলা খুবই পছন্দ করত। সে প্রতি সপ্তাহে পপোকাটেপেটল পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করত। পারত না, কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেত। তার হাঁপানি ছিল। তা সত্ত্বেও সে প্রচুর পরিশ্রম করতে পারত।

ফ্রেই বেত্তো তিনি কি আপনার মতো রান্নাতেও পারদর্শী ছিলেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : এ ব্যাপারে আমি বোধ হয় চে'র চেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলাম। চে'র চাইতে ভালো বিপ্লবী হয়তো আমি ছিলাম না, ওর চাইতে ভালো বাবুর্চি ছিলাম, এটা নিঃসন্দেহে দাবি করতে পারি।

ফ্রেই বেত্তো মেক্সিকোতে চে সবাইকে মাংস রেঁধে খাওয়াতেন, শুনেছি।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আর্জেন্টেনীয় রোস্টের ব্যাপারে তার বেশ দুর্বলতা ছিল। কিন্তু ওগুলো ভালো রান্না করা যায় একেবারে গ্রামের ভেতর। মেক্সিকোতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সময় আমরা ভাত, শিম, স্প্যাগেটি ইত্যাদি খাবারের ওপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চালাতাম। ওটা ছিল আমার দফতর, যদিও চে' মাঝে মাঝে আসত। তবে এ ব্যাপারে আমি তখন আমার পেশাগত সম্মান বেশ ভালোই রক্ষা করেছি বলতে হয়। যাহোক, যা বলছিলাম, চে দলে স্থান দখল করে নিয়েছিল তার মানবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি দিয়ে; পরবর্তীতে যুদ্ধে তার সামরিক দক্ষতা, সাহসিকতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়ে। মাঝে মাঝে সে এত দুঃসাহসিক হয়ে উঠত যে আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরতে হতো। তার পরিকল্পিত অনেক অভিযানকে অনেক সময় আমি বাধা দিয়ে স্থগিত করে রেখেছি। রণক্ষেত্রে সে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে যুদ্ধ করত। ছোট ছোট দলে সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর চে'কে আমি কৌশলগত অভিযানগুলোর জন্য হাতে রাখতাম। অপেক্ষাকৃত তরুণ সাহসী যোদ্ধাদের তখন পাঠাতাম ছোট দলের নেতৃত্ব নিয়ে সরাসরি যুদ্ধ করতে। এতে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা আমাদের হাতে থাকত। চে'র ছিল অপরিসীম ধৈর্য, নৈতিক দৃঢ়তা। সে ছিল একনিষ্ঠ পরিশ্রমী এবং অত্যন্ত দায়িত্ববান। সে ছিল সবার কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। সহযোদ্ধাদের সে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে অন্যদের যে উপদেশ দিত নিজে তা কঠোরভাবে পালন করত। আমি বলব ল্যাটিন আমেরিকায় তার প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ ছিল চে গুয়েভারা। বেঁচে থাকলে সে যে কী অসাধারণ সাফল্য অর্জন করত তা কল্পনাও করা যায় না।

মেক্সিকোতে সে যখন আমাদের দলে যোগ দিল সে তখন আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে কিউবার বিপ্লবের সাফল্যের পর সে তার নিজ দেশে ফিরে যাবে অথবা ল্যাটিন আমেরিকার অন্য কোনো দেশে ফিরে গিয়ে নতুন কোনো বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। বিপ্লবের পর চে বেশ অনেক বছর কিউবায় ছিল, সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। একপর্যায়ে চে বলল, 'আমি এখন নতুন একটা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিতে চাই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।' যদিও এতে আমার যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল, তবু আমি তাকে অন্য একটা দেশে যেতে বাধা দিইনি। কারণ চে ঐ দায়িত্বকেই তখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছে। চে'র নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, তার নিজস্ব যুক্তিবোধ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের প্রায়ই তুমুল তর্ক হতো কিন্তু সবই হতো একটা ভারসাম্য এবং ঐক্যের মধ্যে, কারণ চে'র ছিল কঠোর শৃঙ্খলাবোধ।

চে যখন কিউবা ছেড়ে চলে গেল তখন গুজব উঠেছিল যে চে'র সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছে। চে তখন ছিল আফ্রিকায়, একটা আন্তর্জাতিক মিশনে। সে লুলুম্বার অনুসারীদের সঙ্গে কাজ করছিল, জায়ারেতে, আগে যার নাম ছিল বেলজিয়ান কঙ্গো। সেখান থেকে সে দক্ষিণ আমেরিকা, তানজানিয়া হয়ে আবার ফিরে এসেছিল কিউবায়। নিজেকে সে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করছিল। কিউবা থেকে কঙ্গো যাবার সময় সে আমাকে

~ www.amarboi.com ~

একটা বিদায়ী চিঠি লেখে। চিঠিটা আমি জনসমক্ষে আনতে না চাইলেও পরে আনতে বাধ্য হই। সে কিউবায় ফিরে সিয়েরা মিয়েস্ত্রার একটা স্বেচ্ছাসেবী দলকে ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় সংগ্রামে তার সঙ্গী হবার জন্য নিয়ে যেতে চায়। আমি অনুমতি দিয়েছিলাম। সেই দলটিকে কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে সে দক্ষিণ আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। সে শুধু বলিভিয়া নয়, তার নিজের দেশসহ আরো কয়টি দেশে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। আমি যখন নিশ্চিত হই যে সে বলিভিয়াতে পৌঁছেছে এবং সংগ্রাম শুরু করেছে তখনই আমি চিঠিটা প্রকাশ করি।

সত্যি বলতে কি, চে যদি কোনো ক্যাথলিক হতো, হতো কোনো চার্চের অনুসারী, তাহলে সে নিশ্চয়ই একজন মহান ঋষিতে পরিণত হতো। আপনি অপর একজন যোদ্ধার কথা বলেছিলেন—কামিলো। কামিলোও খুব জনপ্রিয় ছিল তখন। সে ছিল আদর্শ একজন কিউবান, বুদ্ধিমান, উদ্যমী, সাহসী। খুব অল্প বয়সে সে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। বাতিস্তাবিরোধী আন্দোলনে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আমি মেক্সিকোতে যখন দলকে সংগঠিত করছি তখন কামিলো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৫৭-র ১৭ জানুয়ারি আমরা মাত্র ২২ জন মিলে সেনাবাহিনীর একটা ইউনিটের সঙ্গে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছিলাম কামিলো ছিল তার অন্যতম যোদ্ধা, সে যুদ্ধে আমাদের দলের প্রায় সবাই মারা গিয়েছিল, আমরা বেঁচেছিলাম মাত্র কজন। কামিলো অসমসাহসিকতায় যুদ্ধ করেছিল এবং সেবা করেছিল আহতদের। একজন মহান যোদ্ধা হিসেবে সে যুদ্ধে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছিল।

কামিলোর চরিত্র চে'র চেয়ে ভিন্নরকম ছিল। কামিলো চে'র মতো অত প্রজ্ঞাবান ছিল না, অত গভীর চিন্তাভাবনা করত না। সে ছিল কাজের মানুষ। সবসময় হাসিখুশি, ফুর্তিতে থাকত। তার স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনা ছিল, বুদ্ধিমত্তা ছিল, কিন্তু চে'র মতো তপস্বী ভাবটা তার ছিল না। যুদ্ধে সে খুব সাহসিকতা, উদ্যম এবং দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিত। কামিলোর মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল। তার ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সে দাড়ি রেখেছে ঠিক অ্যাপোসটেলেসের মতো। আদর্শ কিউবার গুণও তার ছিল, ছিল আন্তরিক, সাহসী।

যেকোনো দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে সে সবসময় প্রস্তুত ছিল। চে'র মৃত্যুভয় ছিল কিন্তু কামিলোর কোনো মৃত্যুভীতি ছিল না। যত ঝুঁকিপূর্ণ কাজই হোক কামিলো তা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত।

সে শত্রুকে কোনো সুযোগ দিত না। সে ছিল যেন জন্মগত গেরিলা। বিপ্লবের পরপরই হিউবার্ট মাটোস, সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশে কামাগুয়েতে একটা প্রতিবিপ্লব আয়োজন করে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাদের আত্মসমর্পণ করানোর জন্য,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলাম কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, তারা আমার কথা শুনবে। কিন্তু কামিলো সোজা সেখানে চলে গিয়েছিল আমার আগেই এবং সবাইকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। এভাবে সে ঝুঁকি নিয়ে গাড়িতে, প্লেনে, হেলিকপ্টারে যত্রতত্র যাতায়াত করত। কামিলো ছিল আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান।

ফ্রেই বেত্তো তখন তার বয়স কত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কামিলো আমার এক বছরের ছোট ছিল। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ২৭ বছর। কামাগুয়েতে প্রতিবিপ্লবী দমনের পর সে একটা ছোট প্লেন নিয়ে হাভানায় ফিরে আসছিল। সেদিন খুব ঝড়-বাদলের দিন ছিল। কেউ ওই আবহাওয়াতে যাত্রা করার সাহস পেত না, কিন্তু কামিলোর স্বভাবই ছিল ঝুঁকি নেয়া। তখন আমাদের রাডার ব্যবস্থাও উন্নত ছিল না। পাইলটদের অনিশ্চিতের মধ্যেই যাত্রা করতে হতো। কামিলো রওনা দিয়েছিল কিন্তু পৌঁছাতে পারেনি। পথে নিখোঁজ হয়েছে। সে সময় আমাদের যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না বলে আমরা প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়তাম। কামিলোর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে গোটা দেশের জনগণের মনে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। আমরা আকাশ, সমুদ্র এবং স্থলপথে ব্যাপক খোঁজাখুজি করলাম। আমি নিজে বহু জায়গায় গেলাম কিন্তু ওকে পাওয়া গেল না। কামিলো নিখোঁজ হবার সংবাদ নিয়েও প্রতিবিপ্লবীরা গুজব ছড়াল, তারা বলল মতবিরোধের কারণে আমরা নাকি গোপনে কামিলোকে হত্যা করেছি। কিন্তু জনগণ সত্যটা জানত। তারা জানত আমাদের নৈতিকতা, সততার কথা। কামিলোকে স্মরণ করতে গিয়ে আমি আমার দেশের মানুষকে বলেছিলাম, কামিলোর সংক্ষিপ্ত জীবন আমাদের সামনে মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনাকেই তুলে ধরে। আমি বিশ্বাস করি কিউবার জনগণের মধ্যে লুকিয়ে আছে এমনি হাজারো কামিলো, যেমন আর্জেন্টিনার জনগণের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজারো চে। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মধ্যেও সুপ্ত আছে এমনি অজস্র কামিলো আর চে।

ফ্রেই বেত্তো কমান্ডার, আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাকে এত দীর্ঘ সময় দেয়ার অপরিসীম উদারতার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ধন্যবাদ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে এই পর্বের কথোপকথনটি টমাস বোর্জের সঙ্গে ১৯৯২ সালে। ইতিমধ্যে বিশ্বারজনীতির ব্যাপক পটপরিবর্তন ঘটে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পতন ঘটেছে। অথচ কিউবা তখনো তাদের সমাজতান্ত্রিক নীতিতে অটল। এই নতুন প্রেক্ষাপটে টমাস বোর্জ কথা বলেছেন ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে। ইতিহাস, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, কিউবা, আমেরিকার রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, নরনারীর সম্পর্ক বিবিধ বিষয়ে কথা হয়েছে এ সাক্ষাৎকারে।

টমাস বোর্জ নিকারাগুয়ার সান্দানিস্তা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৭১-৯০ সাল পর্যন্ত তিনি নিকারাগুয়ার অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সেদেশের বিশিষ্ট কবি এবং ক্যাস্ট্রোর দীর্ঘদিনের বন্ধু। তাঁদের এই কথোপকথনটি ১৯৯২ সালে প্রথম কিউবাতে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে ভারতের ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কর্তৃক *ফেস টু ফেস উইথ ফিডেল ক্যাস্ট্রো, এ কনভারসেশন উইথ টমাস বোর্জ* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ইতিহাস, অমরত্ব

টমাস বোর্জে ফিদেল, তোমাকে ঘিরে এখন উজ্জ্বল আলোর বন্যা। তুমি তা গ্রহণ করেও নিয়েছ, তুমি এও জানো ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে তোমার মতো কেউ আর এমন ঐতিহাসিক বিষয় নয়। তোমার অমরত্ব একরকম নিশ্চিত। কেমন লাগে ভাবতে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমারও একটা ছোট ভূমিকা দেয়া উচিত। প্রথমত, আমি তোমার কথাগুলো বেশ কৌতূহল নিয়ে শুনছিলাম। সন্দেহ নেই তুমি বেশ চমৎকারভাবে কথা বলতে পারো, খুব কাব্যিকভাবে। আমি তোমার প্রকাশভঙ্গির দক্ষতায় সবসময় মুগ্ধ হই। বলা হয়, কবিরা জন্ম নেয় আর বক্তা তৈরি হয়। আমি নিজেকে ছোটখাটো একজন বক্তা হিসেবে তৈরি করেছি বলা যায়। কিন্তু তুমি বক্তা হিসেবেও আমার চেয়ে ভালো। তুমি একাধারে জন্ম-কবি এবং বক্তা। আমি কবি নই, নেহাত একজন বক্তামাত্র। যাহোক, তোমার সদয় বাক্যগুলোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, কথাগুলো হয়তো সত্য।

তুমি তখন কথাপ্রসঙ্গে বলছিলে, সাংবাদিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তোমার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার অবস্থানটা বোধ হয় তোমার চেয়েও কঠিন। আসলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধার সম্পর্ক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গড়ে উঠেছে, তাতে এ সাক্ষাৎকারে তোমার চেয়ে আমার ভূমিকাটা কঠিন। যখন কোনো বিরুদ্ধপক্ষের সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার নেয় আমি তাদের সঙ্গে বিস্তর তর্ক-বিতর্ক করি, তাদের বিভিন্ন আক্রমণ প্রতিহত করি বিপুল শক্তিতে, কিন্তু একজন বন্ধু যখন আমার সাক্ষাৎকার নিতে বসে তখন তো আর আমি তেমন আচরণ করতে পারি না, এমনকি তুমি যদি আমাকে ওদের চেয়েও কঠিন প্রশ্ন করো, তাতেও আমার পক্ষে অমন আচরণ করা খুব কঠিন হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের প্রশ্ন নেই, আমি কথা বলি তাদের নিতান্ত একজন সাংবাদিক ভেবে নিয়ে। কিন্তু তোমার বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম, তুমি একাধারে সাংবাদিক এবং বন্ধু। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, আমার জন্য চ্যালেঞ্জটা কিন্তু তোমার চেয়েও কঠিন।

তবে অভিজ্ঞতাটা বেশ ভালোই হবে। আমি যথাসাধ্য তোমার উত্তরগুলো দেয়ার চেষ্টা করব এবং আমার বিশ্বাস, এ ধরনের একটা সাক্ষাৎকারের একটা উপযুক্ত পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারব। এ ধরনের কিছু সাক্ষাৎকার আমি অবশ্য আগে দিয়েছি, যদিও তারা আমার ঘনিষ্ঠ কেউ নয়। যেমন ফ্রেই বেত্তো আমার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন, অবশ্য সেখানে প্রসঙ্গটা ছিল ভিন্ন। তিনিও আমাকে অনেক কঠিন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তুমিও যে আমাকে নেহাত সহজ প্রশ্ন করবে না, তা বুঝতে পাচ্ছি। তবে আমি সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।

টমাস বোর্জ অমরত্ব ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে, তাই না, যেমন ভালোবাসা, এই প্রসঙ্গটিও এত কুহেলির শিকার যে এ-বিষয়ে না-ভাবাই ভালো।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। তুমি জানতে চাইছিলে, কেউ যখন বুঝতে পারে ইতিহাসে তার একটা স্থান দাঁড়িয়ে গেছে, তখন তার কেমন অনুভূতি হয়। এর উত্তর দেয়া কঠিন। বিষয়টা নিয়ে যে আমি ভাবিনি, তা নয় কিন্তু খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি। হ্যাঁ, সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে আমার হয়তো ছোটখাটো একটা স্থান আছে, তবে ইতিহাস বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু বিবেচনাও রয়েছে।

আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, সত্য ইতিহাস কি যথার্থই বেঁচে থাকে? কারণ ইতিহাস এত বিচিত্র ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল যে সত্য ইতিহাসের স্থায়িত্ব নিয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই দুষ্কর। আমার মনে হয়, কোনো ব্যক্তি বা জনতার যথার্থ বস্তুগত একটা ইতিহাস সৃষ্টি করা সম্ভব নয় বরং তার বা তাদের জীবনের ঘটনাসমূহের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভবমাত্র। ইতিহাস আমার খুব প্রিয় বিষয়, সত্যি বলতে, আমি যখন থেকে যুক্তি দিয়ে ভাবতে শিখেছি তখন থেকেই। আমার তো মনে হয়, ইতিহাস সকলেই পছন্দ করে। আমার মনে হয় না, এমন কোনো শিশু আছে, যে গল্প পছন্দ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না। তুমি যদি কোনো বাচ্চাকে বলো, 'এসো তোমাকে একটা গল্প শোনাই'—সব কাজ ফেলে সে তোমার গল্প শুনবে।

ডেমোসথেনেস নাকি একবার এক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ একটা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ তখন মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলেন না। তখন তিনি বললেন, 'আপনারা একটু লক্ষ করুন, কারণ আমি এখন আপনাদের একটা গল্প শোনাব।' অমনি সবাই মনোযোগী হয়ে উঠল। এতে বোঝা যায়, ইতিহাস সবাই পছন্দ করে; হয়তো উপস্থাপনার আঙ্গিকের ভিন্নতায়। আমিও পছন্দ করি। আমার সারাজীবনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি যখন যেখানে সম্ভব ইতিহাস পড়েছি। সেই তরুণ বয়সে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন, বিপ্লবের আগে, জেলে, নির্বাসনে যেখানেই থেকেছি এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা হাতে যখন যা সময় পেয়েছি, আমি ব্যয় করেছি পড়াশোনায়। আমি সবধরনের বই পড়ি কিন্তু আমার বিশেষ পছন্দ ছিল ইতিহাসসংক্রান্ত বইগুলো। সেজন্যই বলছিলাম, যে ইতিহাস আমরা জানি তাতে আমরা যথার্থ ঘটনার নিকটবর্তী হই মাত্র। এটা হলো প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস সচরাচর নিরপেক্ষ থাকে বলে আমার মনে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়।

প্রাচীনকালের বিভিন্ন ব্যক্তির ইতিহাস যখন আমি পড়ি, আমি জানতে চেষ্টা করি এসব তথ্যের উৎস কোথায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখি উৎস মাত্র একটা। অল্প কয়জন গ্রিক এবং রোমান ইতিহাসবিদ মিলে কেবল সেসময়ের বর্ণনা দিচ্ছেন। এটা খুবই দুঃখের যে যিশুর জন্মের আগে যে বিশাল লাইব্রেরি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তাতে প্রাচীন ইতিহাসের বহু বই নষ্ট হয়ে যায়। সেসব বই থেকে হয়তো প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যই আমরা পেতাম।

ইতিহাসের সব যুগে যারাই ইতিহাস লিখেছেন সকলেই ইচ্ছামতো তাতে যোগ করেছেন নানা কল্পকাহিনী আর নিজেদের মনগড়া নানা বিষয়। সুতরাং ইতিহাসের যথার্থতা সম্পর্কে তুমি মোটেও নিশ্চিত হতে পারো না।

টমাস বোর্জ ইতিহাসের যথার্থতার প্রতি এই অবিশ্বাসের ব্যাপারটি কি সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকেও প্রভাবিত করেছে বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকেও প্রভাবিত করেছে। আমি আমাদের নিজস্ব সিয়েরা মিয়েস্ত্রা পাহাড়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারটি লক্ষ করছি। আমার কাছে এ-সংক্রান্ত প্রচুর দলিলপত্র, নথি এবং বিভিন্ন লেখা রয়েছে। সেইসঙ্গে আমার স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছে সেসময়কার অগণিত ঘটনা, বিশেষ করে এ-সংক্রান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৌলিক চিন্তা এবং ধারণাগুলো। সেসময়কার ঘটনা নিয়ে আমার অনেক কমরেডের লেখা আমি পড়েছি। এ বিষয়ে আমার নিজের মতামতগুলো জানানোর সুযোগ এখনো হয়নি। তবে যে লেখাগুলো পড়েছি তার অনেকগুলোই বেশ চমৎকার কিন্তু এই কৌতূহলোদ্দীপক লেখাগুলোতেও আমি লক্ষ করি, আমাদের যুদ্ধের পেছনের সামগ্রিক ধারণা এবং যেসব মৌলিক চিন্তাধারা দিয়ে ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে। যারা লিখেছেন তারা সেসব ঘটনার কথাই লিখেছেন, যেসব ঘটনার সঙ্গে তারা নিজেরা সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তারা সেসব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, প্রতিদিন কী ঘটত সেটি লিখেছেন, কী খবরাখবর তখন তারা শুনতেন তা লিখেছেন, প্রতিদিন ঘটনাসমূহের সম্পর্কে নিজস্ব মতামতও দিয়েছেন। কিন্তু সবকিছুর ভেতরেই একটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

যেমন কমরেড জুয়ান আলমেইডা, তিনি নেতৃত্বের খুব কাছাকাছি ছিলেন, চমৎকার কিছু লেখা লিখেছেন আমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে। তিনি যুদ্ধের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে লেখাটি লিখেছেন, ফলে এতে প্রচুর তথ্য রয়েছে। আমি তাঁর লেখাগুলো আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি কিন্তু আমি এও লক্ষ করেছি, তিনি গভীর বিশ্বাসে এমন অনেক কথাই বলেছেন, যা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত।

সেইসঙ্গে আমি এও লক্ষ করেছি, যখনই কেউ কিছু লিখতে বসেন তখনই তিনি শুধু তার নিজের অভিজ্ঞতা এবং ঘটনাটিতে তার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতেই মনোযোগী হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমাদের সেই যুদ্ধের ৩০ বছর পরও যারা সেই যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত ছিলাম এবং প্রধান সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলাম, তারা কেউই যখন যথার্থ যা ঘটেছিল সে বিষয়ে আমাদের মতামতগুলো লিখে রাখিনি, তখন হয়তো এ বিষয়ে অসম্পূর্ণ ধারণাগুলোই ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবে।

আজ থেকে ৪০, ৫০ বা ১০০ বছর পর কোনো ঐতিহাসিক যদি কিউবার যথার্থ ইতিহাস খুঁজতে যায় তখন সে কী পাবে? ঘটনার কতটুকু কাছে তারা আসতে পারবে, কতটুকু দূরেই বা সে থাকবে? আমি সেই ইতিহাসের কথা বলছি, যা সত্যকে যথাসাধ্য বস্তুগত সত্যতায় প্রতিফলিত করে।

টমাস বোর্জ তুমি তোমার বক্তব্যগুলো কবে লিখছ তাহলে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : দ্যাখো, আশপাশের অবস্থা দেখে মনমেজাজ যেভাবে বিগড়ে থাকছে কী বলব, তবে কিছু লোক আছেন যাঁরা ইতিহাসের খুঁটিনাটি তথ্যগুলো সংগ্রহ করছেন, আর্কাইভে কাজ করছেন। তাঁরা সব বিষয়েই আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, আমি হয়তো তাদের এ-সংক্রান্ত মৌলিক কিছু ধারণা দিতে পারি মাত্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি ঠিক করেছি, প্রথমত আমাদের আক্রমণ বিষয়ে লিখব। শুরু করব শত্রুর আক্রমণ এবং আমাদের প্রতিআক্রমণের দিনগুলো থেকে। আমাদের জন্য সেগুলো ছিল চূড়ান্ত মুহূর্ত। অনেকগুলো খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আমি সেসব যুদ্ধের কথা বলতে পারি। সেসব কথা শুধু আমার ভাষ্য হবে না, আমাদের পুরো দলের ভাষ্য হবে, কারণ ইতিমধ্যে তারা এ বিষয়ে বিস্তর দলিল সংগ্রহ করেছেন। আমি সেসব যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তের বর্ণনা দিতে পারব, যুদ্ধের কৌশলগুলো সম্পর্কে বলতে পারব। কোনো বিশেষ কৌশল কেন ওই বিশেষ মুহূর্তে নেয়া হয়েছিল, তাও ব্যাখ্যা করতে পারব। আমি বলতে পারব, কেন ওই বিশেষ যুদ্ধে আমরা অংশ নিয়েছিলাম। মোট ২৫ মাস ওই যুদ্ধ চলেছিল, আমি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে ওই যুদ্ধে ছিলাম। অবশ্য না, শুধু একটা দিন ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাইরে ছিলাম। সেদিন আমি বিরয়ানে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন প্রায় পুরো অঞ্চলই আমাদের দখলে। আমি দুটো জিপ এবং ১২ জন লোক আর কিছু মেশিনগান নিয়ে গিয়েছিলাম বিরয়ানে। ওই একটা দিনই আমি আমার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

টমাস বোর্জ এই তথ্যটা কিন্তু এই প্রথম আমরা শুনলাম, ফিদেল।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এটা এখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। রাতে গাড়ি চালিয়ে মায়ের কাছে গিয়েছিলাম, সারাটা দিন তার সঙ্গে কাটিয়ে পরদিন রাতে আবার গাড়ি চালিয়ে ফিরেছিলাম। সেটা ছিল ২৪ ডিসেম্বর। ফিরে এসে আমি বেশ কয়টা অপারেশনে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের পেছনে বেয়ামো সেনাবাহিনী ছিল কিন্তু আমরা ওদের পরাজিত করেছিলাম। আমাদের যুদ্ধের ইতিহাস খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। মাত্র ১৫ জনের একটা দল নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম এবং সেই দলকে ক্রমশ বৃদ্ধি করে মাত্র ২৪ মাসের মধ্যে ৮০ হাজার সৈন্যের বাতিস্তা সেনাবাহিনীকে আমরা পরাজিত করেছিলাম। আমাদের এই ছোট সশস্ত্র দল গঠন, এর বিকাশ এবং পরবর্তীতে জয়লাভ সত্যিই খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ ব্যাপারটি আমাকে প্রচুর চিন্তার খোরাক দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্পেনের বিরুদ্ধে কিউবার স্বাধীনতা-যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচুর বই পড়ি, সেখান থেকে আমি মামবি সেনাবাহিনী এবং মামবি নেতাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি, তাদের কাছ থেকে আমি যুদ্ধের অনেক কৌশল শিখেছি।

তবে তোমার প্রথম প্রশ্নে আবার ফিরে আসি, মাঝে মাঝে আমরা 'ইতিহাস' কথাটা এমনভাবে ব্যবহার করি, যেন আমরা ধরে নিই যে ইতিহাস আমাদের সত্য বলেই প্রমাণ করবে। আমি নিজে, সেই মনকাডা গ্যারিসন মামলায় আসামি হিসেবে আদালতে বলেছিলাম, 'ইতিহাস আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে।' আমার এই ভাষ্য ভবিষ্যতের প্রতি আমার আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ, নিজের চিন্তাভাবনার প্রতি আমার আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। আমার বক্তব্যে এ-ই প্রকাশ পায় যে আমি বিশ্বাস করেছি, আমি যে বিষয়টির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পক্ষে লড়ছি সেটা খুবই সম্মানজনক। আদালতে আমার সেই বক্তব্যে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে আমাদের এই কথাগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হবে, আমরা যা বলছি তার সবই একদিন বাস্তবে পরিণত হবে। ভবিষ্যতে লোকে জানবে, কোথায় কী ঘটেছিল। আমরা কী করেছি, আমাদের প্রতিপক্ষ কী করেছে। আমাদের কী উদ্দেশ্য ছিল আর আমাদের প্রতিপক্ষেরই বা কী উদ্দেশ্য ছিল। সবাই একদিন জানবে, কে ছিল সঠিক—আমরা নাকি ওই বিচারকেরা, যারা আমাদের বিচার করছিলেন, যারা অসৎভাবে সংবিধানের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে অবজ্ঞা করে এক বর্বর স্বৈরশাসককে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন? আমি বিচারকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম, কারণ আমার গভীর বিশ্বাস ছিল যে আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের জয় একদিন হবেই। এ বিশ্বাস আমার এখনো আছে যে মানবতার ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক যে দাবি তার অগ্রযাত্রা জয়ের পথেই।

টমাস বোর্জ তাহলে কথাটা কি এই দাঁড়াচ্ছে যে, যথার্থ ইতিহাসটা কখনোই লিখিত হবে না?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, আমি আদালাতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রতি যে আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছি, তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে যথার্থ ইতিহাস একদিন নিশ্চিতই লিখিত হবে।

কারণ আমরা যে সময়টাতে বাস করছি সেখানে ইতিহাসের বিরুদ্ধে এক চৌকশ বিজ্ঞান তৈরি হয়ে আছে, প্রচারণা আর বিজ্ঞাপণের বিজ্ঞান, মিথ্যা তথ্য আর অপবাদের বিজ্ঞান। এ থেকে আমাদের বিপক্ষ দলই তাদের সুবিধাটা লুটে নিচ্ছে।

টমাস বোর্জ কিউবার বিপ্লব বিষয়েও তো প্রচুর মিথ্যা প্রচারণা হয়েছে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, কিউবার বিপ্লব বিষয়ে যত মিথ্যা প্রচারণা হয়েছে আমার মনে হয় না ইতিহাসের কোনো কালে আর কোনো বিষয়ে এতটা হয়েছে।

আমাদের বিরোধীরা সময়ের আগেই ইতিহাস রচনা করে ফেলতে চেয়েছে, ঘটনার আগেই তারা সিদ্ধান্ত এবং কাহিনী তৈরি করে নিয়েছে। আমাদের শক্তির চেয়ে বহুগুণে বেশি শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীরা চালিয়েছে তাদের মিথ্যা প্রচারণা। সত্যি বলতে কি, সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করবার সহজাত ক্ষমতা যদি মানুষের না থাকত তাহলে বোধ হয় আমরা রক্ষা পেতাম না। তা না হলে কিউবার বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের এত ব্যাপক মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মানুষের কী করে এর প্রতি এমন সমর্থন থাকে? এখন সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই অপপ্রচার তো আরো তুঙ্গে উঠেছে। বলতে গেলে বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদের এখন একটাই মাত্র শত্রু, সেটা হলো কিউবা। এতদিন সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক শক্তি এবং কৌশল ব্যবহার করেছে, এখন তার সবটুকু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করছে একমাত্র কিউবার বিরুদ্ধে। তার পরও এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

টমাস বোর্জ ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিক বলেই মনে হয়, কী করে সেটা সম্ভব হচ্ছে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কী করে সম্ভব হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা পেতে হলে তো তোমাকে এদেশের প্রতিটা মানুষের সঙ্গে এক এক করে কথা বলতে হবে। হয়তো সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করার যথেষ্ট বিবেচনা, যথেষ্ট প্রবৃত্তি তাদের আছে। আজ পৃথিবীর বহু মানুষ, বহু বুদ্ধিজীবী আদর্শের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন কিন্তু তার পরও ল্যাটিন আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশেও এমন অনেক লোক রয়েছেন, যারা সমুদ্র পরিমাণ মিথ্যা আর অপপ্রচারের মধ্যে থেকেও খানিকটা সত্য দেখতে পান। যারা মানবতার শত্রু, মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতির শত্রু, সেইসব চরম শোষক, লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের বীরোচিত সংগ্রামের মূল্যকে বিবেচনায় রাখতে ভুলে যাননি।

কে জানে, কত দিন পর আমাদের উত্তরসূরিরা যথার্থ সত্যের ওপর ভিত্তি করে কিউবার বিপ্লব এবং এর নেতৃত্বের ব্যাপারে নিরপেক্ষ মতামত রাখতে সক্ষম হবে। এইরকম প্রতিক্রিয়াশীলতার ঢেউ যদি খুব দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত থাকে, তাহলে ইতিহাসও সেই তরঙ্গেই লিখিত হবে। শোষক আর আগ্রাসনকারীরাই ইতিহাস লিখবে। অবশ্য অনিবার্যভাবে আরো একটা তরঙ্গ একদিন আসবে, প্রগতির তরঙ্গ, মানবতার পক্ষে সময়কে পরিবর্তন করবার তরঙ্গ এবং তখন আবার ইতিহাস লিখিত হবে যথার্থ সত্যের ওপর ভিত্তি করে। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, ঘটনা কী ঘটেছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা কীভাবে ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, সেটা।

এখানে তোমাকে আমি আমার একটা ভাবনার কথা বলব। আমি সত্যিই গভীরভাবে বিশ্বাস করি, একজন যথার্থ বিপ্লবী, যথার্থ যোদ্ধা—যিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত; তিনি কখনোই খ্যাতি বা শুধু ইতিহাসে তাঁর স্থানের কথা ভাবতে পারেন না।

টমাস বোর্জ তবে এমন অনেকেও আছেন, যারা ইতিহাস নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকেন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : হ্যাঁ, অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন যারা খ্যাতি এবং ইতিহাস বিষয়ে রীতিমতো আচ্ছন্ন ছিলেন। যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনি তার প্রতিটি বক্তৃতায়, বিবৃতিতে, চিঠিতে তার নিজের মহত্ত্ব এবং ইতিহাসে তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। নেপোলিয়ন একজন বিপ্লবী ছিলেন, তিনি তার সেনাবাহিনীর সাহায্যে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকে সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার সাম্রাজ্য, সিংহাসন, এসব বিষয়ে বেশি সচেতন হয়ে উঠলেন, অভিজাতদের সঙ্গে যোগসাজশে এক নতুন ধরনের আভিজাত্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গড়ে তুললেন। তবে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শকে প্রসারের ক্ষেত্রে ইতিহাসে তার ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

বলিভারও ইতিহাস বিষয়ে খুব চিন্তাভাবনা করতেন, যদিও তিনি নেপোলিয়নের মতো ছিলেন না এবং আমার ধারণায় তিনি নেপোলিয়নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বলিভার সম্পর্কে আমি অনেক পড়েছি। তার অভিজ্ঞতা, সাফল্য, ব্যর্থতা সম্পর্কে পড়তে আমার কখনোই ক্লান্তি আসে না। বলিভারের প্রতি আমার একটা গভীর সহানুভূতি রয়েছে, যে সহানুভূতি ইতিহাসের আর কোনো ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার নাই। তিনিও ইতিহাসে তার ভূমিকার ভাবনায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি সবসময় ভাবতেন উত্তরসূরিরা তাকে কীভাবে বিচার করবে এই নিয়ে।

আমাদের এই সময়ে, যখন ইতিহাসে কারো ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও আগের চেয়ে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া সম্ভব, তখন কোনো বিপ্লবীর পক্ষে ইতিহাসে তার ভূমিকা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করা কিছুতেই সমীচীন নয়। বিপ্লবীর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। তাকে তার আদর্শের জন্য যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের সম্পর্কে ভাবনার আচ্ছন্নতা তার আচরণে খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। সত্যি বলতে কি, আজকের যুগে খ্যাতির জন্য, উত্তরাধিকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করার কোনো অর্থ আমি দেখি না। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই স্বার্থপর মনে হয়।

টমাস বোর্জ তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইতিহাসে তোমার ভূমিকা বিষয়টিতে তুমি তেমন ভাবিত নও।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তোমাকে যেভাবে বললাম আমি সেভাবেই ভেবে এসেছি সবসময়। অন্যেরা আমাকে নিয়ে কী ভাববে, এই ভাবনায় নিজেকে ক্লান্ত করে তোলার কোনো কারণ আমি দেখি না। এ যেন এমন যে আমি 'বে অব পিগস'-যুদ্ধ করছি আমার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বা আমার আদর্শের জন্য নয় বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের নতুন ইতিহাস সৃষ্টির জন্য। রক্ত দিয়ে কি একজন ব্যক্তির খ্যাতির মূল্য দিতে হয়?

আমার মনে আছে, আমরা যখন সিয়েরা মিয়েস্ত্রার সেইসব ভয়াবহ যুদ্ধগুলো লড়ছি, তখন একজনও এক মুহূর্তের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত খ্যাতি বা ইতিহাস সৃষ্টির কথা ভাবিনি। নেতা হিসেবে আমার কথা বলতে পারি, অন্যের আত্মত্যাগের বিনিময়ে নিজের ভাবমূর্তি এবং খ্যাতিকে বাড়ানো আমার কাছে ভয়ঙ্কর অন্যায় একটা ভাবনা বলে মনে হয়।

টমাস বোর্জ অনেকেই বলে আফ্রিকায় কিউবার সামরিক উপস্থিতির মূল লক্ষ্য ছিল খ্যাতি অর্জন।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমাদের আন্তর্জাতিক মিশনগুলোর কথা আমার মনে আছে। অ্যাঙ্গোলাও এতে অন্তর্ভুক্ত। সেখানে যারা ছিল তারা খুবই ঝুঁকির মধ্যে ছিল, অনেক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কঠিন অপারশেন তারা পরিচালনা করেছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত আমাদের খ্যাতি অর্জনের স্বার্থে সেখানে কাউকে জীবন দিতে হয়নি। অ্যাঙ্গোলায় আমরা গিয়েছিলাম শুধু তাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে, তাদের ওপর বিদেশি আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং আমরা বড় কিছু যুদ্ধ ওদের সঙ্গে করতে পারতাম। সামরিকভাবে ওদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার সুযোগও আমাদের এসেছিল কিন্তু তাতে প্রচুর প্রাণহানি ঘটত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বহুবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্ষমতা প্রদর্শন থেকে বিরত থেকেছি। আমরা বরং আমাদের শত্রুদের দুর্বলতা বুঝে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছি, আত্মসমর্পণের পথ করে দিয়েছি। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চেয়ে এই সমাধানটিকেই আমরা উপযুক্ত মনে করেছি। আমি মনে করি মানুষ যে যথার্থ সৎ উদ্দেশ্যটি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, ইতিহাসের কোনো প্রভাবেই তার সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে আসা উচিত নয়।

ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, উত্তরসূরিদের মধ্যে তাদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অনেক কিছু করেছেন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই যিশুর জন্মের পর গত ২ হাজার বছরে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে, যারা শুধু ইতিহাসে স্থান করে নেবার জন্য কাজ করেছেন। আমি সেসব নেতা, রাজনীতিবিদদের কথা ভাবি, যারা অনেক বড় বড় সব কাজ করেছেন কেবলই খ্যাতি অর্জন এবং ইতিহাসে স্থান করে নেবার জন্য। কেউ কেউ নিজেদের চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যে মনুমেন্ট গড়েছেন। যেমন মিশরের পিরামিড বা মন্দিরগুলো। সব ফারাওই বিশাল একেকটি পিরামিড বা মন্দির বানিয়েছেন পৃথিবীতে নিজের একটা চিহ্ন রেখে যাবার জন্য। আমি মাঝে মাঝে ভাবি এইসব বিরাট যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত ফারাওদের কী অনুভূতি হতে পারে, যদি তারা জানতে পারে যে তাদের মমিগুলো ধরেবেঁধে এখন সাজিয়ে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামের দেয়ালে। তবু মিশরের মিউজিয়ামে নয়, নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিসের মতো দূরদেশের মিউজিয়ামে। আমার মন খারাপ হয়ে যায় যখন হাজার হাজার সেইসব ক্রীতদাসের কথা ভাবি, যাদের এই বিশাল জিনিসগুলো বানাতে গিয়ে জীবন দিতে হয়েছে। তারপর হাজার বছর পেরিয়ে গেল। কী রইল শেষপর্যন্ত? মানুষের কাছে রয়ে গেল ওই চিরস্থায়ী কীর্তি তৈরির পেছনে তিক্ত, করুণ ইতিহাস আর সেইসব কীর্তিমানের দেহ শোভা পেতে লাগল দূরদেশের কোনো মিউজিয়ামের বাক্সে। ইতিহাসে নিজেকে চিরস্থায়ী করবার জন্য এমন অনেক মনুমেন্ট, বিশাল অট্টালিকা মানুষ করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এমন কীর্তি। কিন্তু শেষপর্যন্ত যা রয়ে গেল তা হল সেইসব কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, ইট, কাঠ, পাথরের কিছু টুকরো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ জানে না কে-ই বা এসব কীর্তি গড়েছে, কার নির্দেশেই বা গড়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসকে যদি তুমি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করো, তাহলে দেখবে যারাই উত্তরকালে নিজেদের প্রভাব বিষয়ে বেশি মাতামাতি করেছে তারা স্রেফ নিজেদের বোকাই বানিয়েছে। আমি বলব বরং ইতিহাসে খুব সাধারণ, ছোটখাটো একটা ভূমিকা নিয়ে থাকা, এমনকি ইতিহাসে অপরিচিত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ একজন ব্যক্তির যথার্থ ক্ষমতা সম্পর্কে যদি তোমার ধারণা থাকে, তাহলে তুমি দেখবে, বিশাল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা এতই ক্ষণস্থায়ী, এতই ছোট যে তাকে বিশাল করে তুলবার কোনো মানেই হয় না, তিনি যতই প্রতিভাধর, বুদ্ধিমান, ক্ষমতাবান হন না কেন।

টমাস বোর্জ   ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা বিষয়েও বিস্তর কথা আছে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   আমি প্রতিদিনই সাধারণ মানুষকে পর্যবেক্ষণ করি এবং তাদের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখি। আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত, প্রতিভাবান ব্যক্তি দেখি। ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় এইসব মানুষের ভূমিকার ব্যাপারে আমি সবসময়েই সচেতন। তুমি যদি সৎভাবে লক্ষ করো তাহলে দেখবে, ইতিহাস এসব সাধারণ মানুষের প্রতি খুবই অন্যায্য ব্যবহার করেছে, অশোভনভাবে সবসময়েই অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছে নেতা আর দলপতিদের প্রতি। বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে উপেক্ষা করেছে এইসব হাজার হাজার মানুষের ভূমিকাকে—বস্তুত যাদের সাহায্যেই সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হয়েছেন মর্যাদাবান, খ্যাতিবান। এই ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকেই আমরা বিভিন্ন বিখ্যাত স্থান দখল করার খেলো ধারণা থেকে বিরত থেকেছি। তবে যে কাজটা সকলে করেছে, তার ফলাফলকে সংরক্ষণ করা আমার সবসময়ই জরুরি মনে হয়েছে। যে কাজটা সকলে করল সেটাই যদি হারিয়ে যায় তাহলে আর রইল কী? সুতরাং টমাস বুঝতেই পারছ, এভাবে যিনি ভাবছেন তিনি ইতিহাসে তার সম্মানিত আসনকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে মনোযোগী হতে পারেন না। আমি বরং মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আরো হাজারবার ভাবনায় ব্যস্ত থাকব।

এ প্রসঙ্গে মার্তির একটা চমৎকার কথা আছে। বহু কারণে আমি মার্তিকে সমর্থন করি, এ উক্তিটিও তার একটা। মার্তির চিন্তা, তার লেখা আমাকে সীমাহীন আনন্দ দেয়। তিনি বলেছেন, 'জগতের যত বিজয়গৌরব সব একটা শস্যের দানার মধ্যে পুরে রাখা যাবে'— কী অসাধারণ চিন্তা! কী বিনয়! এই হলেন মার্তি। শুধু ইতিহাসে তার ভূমিকার আলোচনা করে তাকে চেনা যাবে না। তিনি সবসময়ই কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। বিপ্লবের ভাবনায় মগ্ন ছিলেন।

আর সবশেষে তোমাকে এও মনে রাখতে হবে, ওই যে ঝলমলে আলো, সেও একদিন নিভে যাবে, সূর্যও একদিন আর আলো দেবে না, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যেভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা এগুচ্ছি তাতে আমার মনে হয় না সেদিন খুব দূরে। পৃথিবী নামের এই গ্রহটা থেকে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর পরিবেশ, আবহাওয়া সম্পর্কে যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে মানুষের বসবাস করার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। নক্ষত্ররা আমাদের থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে এবং অন্য কোনো তারকায় গিয়ে মানুষের বসবাসের সুদূর কোনো সম্ভাবনাও আমি দেখছি না। আমরা জানি, তারারাও মানুষের মতো জন্ম নেয়, বাঁচে, মরে যায়। আমাদের এই সূর্যের আলো যেদিন নিভে যাবে, পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাসও সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ধরা যাক, সে মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ বেঁচে রইল। তারপর কোন্‌টা ইতিহাস, কে রইল সেই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করার জন্য? সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটি আমাদের থেকে চার আলোকবর্ষ দূরে এবং সেটাও ক্রমশ আরো দূরে সরে যাচ্ছে। পদার্থবিদ্যার সূত্র থেকে তুমি সহজেই বুঝবে যে অন্য কোনো নক্ষত্রে স্থানান্তরিত হওয়া মানুষের পক্ষে কতই অসম্ভব। আমি মনে করি, অন্য কোনো গ্যালাক্সিতেও যথেষ্ট উন্নত, বুদ্ধিমান প্রাণ হয়তো ছিল বা আছে। যেভাবে আমাদের গ্রহে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে, গণিত প্রমাণ করছে সেই একই রকম পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এক লক্ষ কোটি গ্যালাক্সি, লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের কোথাও-না-কোথাও ঘটেছে। তবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যতটুকু আমরা জানতে পারি, তাতে এতটুকু বুঝতে পারি, আমাদের এই পৃথিবীতে কী ঘটেছিল, তা অন্য কোনো গ্রহের উন্নত বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী বিচার-বিশ্লেষণ করতে আসবে তেমন সম্ভাবনাও নেই। তাহলে কথাটি কী দাঁড়াল? তোমার এই ইতিহাস, এই মহান কীর্তি দেখার জন্য কেউ আর কোথাও থাকবে না। সবকিছু উধাও হয়ে যাবে মহাশূন্যে।

সুতরাং কোনোকিছুতেই আমি জাহির করবার কিছু দেখি না। ব্যক্তি হিসেবে আমাদের ভূমিকা খুবই সীমিত এবং আমাদের উচিত ওই সীমাবদ্ধ ভূমিকাটিকেই সঠিকভাবে পালন করা। একজন বিপ্লবী হিসেবে আমি আমার জীবনকে এভাবেই দেখি।

এ বিষয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম, ক্ষমা কোরো। আসলে তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে বলেই, এ বিষয়ে আমার ভাবনা খানিকটা বিস্তারিতভাবে বললাম।

সমাজতন্ত্রের পতন

টমাস বোর্জ   কিউবা যেন বিপ্লবী ভাবনা আর চর্চার এক অভেদ্য শিলাখণ্ড। সন্দেহাতীতভাবে সমাজতন্ত্রের ধস নেমে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কিন্তু আবার সন্দেহাতীতভাবেই সমাজতন্ত্র বেঁচে আছে কিউবাতে। মন্টেস্কু বলেছিলেন, কোনো একটা ঘটনার আশপাশে গড়ে ওঠা হইচই হট্টগোলটাই হলো ইতিহাস। কিন্তু এখন যেসব ঐতিহাসিক ব্যাপার ঘটছে, সেগুলো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর নিছক হই-হট্টগোলের বিষয় নয়, নির্জলা সত্য। ফিদেল তোমার কি মনে হয় না, এসবই এখন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ কথা সত্য টমাস, এতসব ওলটপালটের মধ্যে কিউবার বিপ্লবের এভাবে বেঁচে থাকাটা খুবই উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা। তুমি ঠিকই বলেছ, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যখন ধস নেমেছে, আমরা তখন আমাদের মতাদর্শে স্থির থেকে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আজ আমরাই সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, কিউবাই এখন একমাত্র অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, সমাজতন্ত্র সাফল্যের সঙ্গে বিরাজ করছে কোরিয়ায়, চীনে, ভিয়েতনামে। যদিও কিউবাই পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, তবু সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য কিউবা। কিউবাকে ধ্বংস করবার জন্যই ওরা ওদের সব অস্ত্র তাক করে আছে। হ্যাঁ, যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন ঘটেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিয়েই কিউবার এগিয়ে যাওয়ার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকে নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলা যেতে পারে।

এটা সত্যিই ব্যতিক্রমী ঘটনা, কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত যা করছি সেটাই শেষ কথা নয়। আমাদের সাফল্য নির্ভর করবে ভবিষ্যতে আমরা কী করব, আমরা কতটুকু আমাদের আদর্শে দৃঢ় থাকতে পারব, আমরা আমাদের সার্বভৌমত্বকে কতটুকু রক্ষা করতে সক্ষম হব—এসবের ওপর।

এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি তা গুরুত্বপূর্ণ, আমরা আশা করি, সামনে ঝুঁকি এলেও আমরা আমাদের কর্মকান্ডের প্রতি সৎ থাকতে পারব। আমাদের সম্পর্কের চূড়ান্ত ধারণাটি তখনই নির্ধারিত হবে। আজ সন্ধ্যায় তুমি দেখেছ কত অসংখ্য ল্যাটিন আমেরিকান নাগরিক এসে আমাদের সাহস দিয়ে গেছে। তারা যেন বলছে, 'শক্ত থাকুন, সংগ্রাম করুন।' বহু মানুষ আমাদের চিঠি লিখে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা কতটুকু দৃঢ় থাকতে পারব এবং সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব, সেটা ভবিষ্যৎই বলবে; কিন্তু আমি আশাবাদী।

টমাস বোর্জে আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস কিউবা পারবে, আমরা আশাবাদী। আমরা কি ধরে নিতে পারি কিউবার মাধ্যমেই পৃথিবীতে আবার ঘটবে সমাজতন্ত্রের পুনরুত্থান?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার মনে হয় কিউবাতে আমরা এমন কিছু আদর্শকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছি, যার মূল্য এই ক্রান্তির সময়ে খুবই ব্যাপক। এটা এমন এক সময়, যখন সবাই দ্বিধান্বিত, সুযোগসন্ধানী, যখন রাজনীতিবিদরা তাদের আখের গোছাতে ব্যস্ত, যখন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের দেবতুল্য ক্ষমতাবান করে তুলতে সচেষ্ট। এর আগে কোনো দিন মানুষ প্রতিক্রিয়াশীলদের এত বিপুল ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে দেখেনি। তার মানে এই নয় যে, এটাই চূড়ান্ত অবস্থা। কারণ প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘিরে আছে অসংখ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৈপরীত্য। কিন্তু আমি মনে করি, এটাই সময়, এখনই যাবতীয় প্রগতিশীল মূল্যবোধকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করা, সকল প্রগতিশীল ব্যক্তি, গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবীর কর্তব্য। এ কর্তব্য তাদের যারা মানুষের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চান।

যা-কিছু ঘটুক না কেন, ভিন্ন একটা সময় একদিন আসবেই। এ মুহূর্তে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রবল তরঙ্গের মধ্যে আছি, তবে প্রগতির একটা প্রচণ্ড তরঙ্গও অনিবার্যভাবে আসবে আবার। এখন প্রতিক্রিয়াশীলতার তুঙ্গে আছি কিন্তু আমরা থাকি বা না থাকি আরেকটি প্রগতিশীল বিপ্লবী তরঙ্গও নিশ্চিতভাবে জেগে উঠবে। আমি যখন 'বিপ্লবী' শব্দটি ব্যবহার করছি তখন আমি এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে বোঝাচ্ছি, সেসব উদ্দেশ্য অর্জনের উপায়টিকে বোঝাচ্ছি না।

আমার সবসময় মনে হয়, পতাকা বা এ ধরনের প্রতীকগুলোর একটা মূল্য আছে। আমরা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, তবু আমাদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এটাই মূল্যবান। আমরা যদি বিচ্ছিন্ন দ্বীপটির পতাকাটিকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করতে পারি, সেটাও একটা বড় মূল্য হবে। মূল্য হবে আমরা যদি সর্বস্ব দিয়ে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে পারি। আমরা জিতব কারণ এদেশের লাখ লাখ নারী-পুরুষ যারা তাদের আদর্শের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত, তাদের এত সহজে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।

সুতরাং এখন আমরা যা করছি ভবিষ্যতের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে একথাও সত্য যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণটা আমাদের ওপরই শুধু নির্ভর করছে না। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত বোধ করি যখন আমাদের ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমরা এই ভেবে গর্ববোধ করি যে, অগণিত পীড়িত, বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত মানুষের এই পৃথিবীতে আমরা এখনো একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজের জন্য লড়ছি। এসব ভাবনা আমাদের সংগ্রামে উদ্দীপনা জাগায়। আমরা আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট। আমরা এযাবৎ যা-কিছু করেছি এবং যা-কিছু করতে প্রস্তুত আছি সেগুলো রয়েছে একদিকে আর অন্যদিকে আছে ভবিষ্যৎ। আমি মনে করি এ সবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টমাস বোর্জ কিছুদিন আগে তুমি সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্র বিষয়ে না হলেও বিশেষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে বলেছিলে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। মিখাইল গর্বাচেভকে কি তোমার সেই গুপ্তঘাতকদের একজন বলে মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, গর্বাচেভকে আমি ঠিক সেভাবে বর্ণনা করতে চাই না। আমি তাকে সমাজতন্ত্র ধ্বংসের পরিকল্পনাকারী একজন গুপ্তঘাতক মনে করি না।

আসলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মবিধ্বংসের এক অবিশ্বাস্য উদাহরণ। নিঃসন্দেহে এই আত্মবিধ্বংসের জন্য সেদেশের নেতা, সরকারি কর্মকর্তা দায়ী। এই ধ্বংসযজ্ঞে কেউ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যোগ দিয়েছে না-জেনে, কেউ জেনেশুনে। আসলে সেখানে যে লাগামহীন ব্যাপারগুলো চলছিল তাতে এর ধ্বংস হওয়া ছাড়া বিকল্প কিছু ছিল না। আমরা সেই শুরু থেকে সোভিয়েত ইউনিয়েনের এই লাগামহীন কাণ্ডগুলো লক্ষ করে আসছি। আমি মনে করি না গর্বাচেভ এই ধ্বংস প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে যোগ দিয়েছেন। আমার নিশ্চিত ধারণা, তিনি সমাজতন্ত্রকেই উন্নত করার জন্য সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহুবার কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে, আমি তাঁকে খানিকটা বুঝতে পেরেছি বলে মনে করি। তিনি আমাদের খুবই বন্ধু ছিলেন। তিনি যত দিন ক্ষমতায় ছিলেন আন্তরিকভাবেই তাঁকে কিউবার বিষয়গুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে দেখেছি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা-কিছু ঘটেছে সেখানে নিঃসন্দেহে তার ভূমিকা রয়েছে।

টমাস বোর্জ গরবাচেভের *পেরেস্ত্রোইকা* বইটা কি তুমি পড়েছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো গরবাচেভের বহুল প্রচারিত এই বইটি আমি যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। আমি তার প্রত্যাশাগুলোকে বুঝে উঠবার চেষ্টা করেছি। আমার সবসময় মনে হয়েছে, তিনি খুব তাড়াহুড়ো করে সবকিছু করছেন। তিনি রাতারাতি অসংখ্য সমস্যা সমাধান করতে চাইছেন। তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের পদক্ষেপগুলো নিতে পারেনি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত করে একে আরো উন্নত করে তোলা খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই বলে একে ধ্বংস করা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কাছে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, কারণ একমাত্র তারাই সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখত। সুতরাং সোভিয়েতেরা যা-কিছু ভুল করে থাকুক-না কেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে যতই ত্রুটি থাকুক-না কেন, তারা বিশ্বরাজনীতিতে খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। সোভিয়েতের এই ভূমিকাটি সংরক্ষণ করা খুবই প্রয়োজন ছিল যেকোনো মূল্যে।

টমাস বোর্জ : কিন্তু ফিদেল, সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা তো এক কথা নয়।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমরা ভেবেছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দেশে সমাজতন্ত্রের উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে সেগুলো মঙ্গলজনক, কিন্তু তাই বলে আমরা তো সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের পক্ষে কখনোই ছিলাম না। এ তো শুধু সোভিয়েত ইউনিয়েনে সমাজতন্ত্রের ধ্বংস নয়, পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নেরই ধ্বংস। আমরা কিছুতেই এর সমর্থন করতে পারি না, করিনি, কারণ আমরা জানতাম, এতে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ঘটনা এমনকি আমেরিকার মিত্রদের মধ্যেও একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে গেল। গরবাচেভের বইটি পড়ে কিন্তু আমার মনে হয়নি যে তিনি এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা পরিণতি চেয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি কম নয়, বেশি সমাজতন্ত্রই চেয়েছিলেন। তিনি বারবার বিভিন্নভাবে একথাটি বলেছেন, তার একথাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা বল্গাহীন প্রক্রিয়া চলছিল, এই ভারসাম্যহীনতার জন্য যেমন সোভিয়েত সরকারি কর্মকর্তারা দায়ী, তেমনি সরকার-প্রধান হিসেবে গরবাচেভের ওপরও এর দায়িত্ব বর্তায়। তবে এখানে এককভাবে আমি কাউকে দায়ী করতে চাই না, যৌথভাবে সকলেই এখানে দায়ী। তারা সকলে মিলে অগণিত ভুল করে গেছে বারবার, যার পরিণতিতে যেমন সমাজতন্ত্র ভেঙেছে তেমনি ভেঙেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তুমি যদি একটা দেশের মূল্যবোধকে একে একে ধ্বংস করতে শুরু করো, তাহলে সেদেশের পরিণতি তো এমনই হবে।

সোভিয়েতে এমন এক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যা সেখানকার পার্টির অধিকারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল অথচ সেই পার্টিই ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। লেনিন পার্টিকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠা ছিল অভূতপূর্ব এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ ছিল সোভিয়েত জনগণের এক আশ্চর্য সাফল্য।

রাষ্ট্রের অধিকারকেই যদি ধ্বংস করা হয়, তাহলে তার পরিণতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। আমার মনে হয় না গরবাচেভ এসব মূল্যবোধ, পার্টি, রাষ্ট্র সব এভাবে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ভাঙন একটা প্রক্রিয়ারই পরিণতি যার সূত্রপাত ঘটেছিল পেরেস্ত্রোইকার মাধ্যমে। যে পেরেস্ত্রোইকা কিনা সমাজতন্ত্রের ত্রুটিগুলোকেই অতিক্রম করতে চেয়েছিল, সমাজতন্ত্রকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আরো উন্নত পর্যায়ে।

টমাস বোর্জ   যে নেতিবাচক প্রক্রিয়া চলছে তাতে কি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিচিত ইতিহাসটি বদলে যাবে বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন একটা উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রক্রিয়া। সেখানে সমস্যাকে বিশ্লেষণ, সমালোচনা করার তো আর সুযোগ রাখা হয়নি। স্রেফ সোভিয়েতের যাবতীয় মূল্যবোধ, মেধা, ইতিহাসকে বাতিল এবং ধ্বংস করা হয়েছে। এমন একটা অবস্থা কল্পনাও করা যায়নি। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, গরবাচেভ এবং তার সঙ্গীরা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টিরই পরিকল্পনা করেছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হতে পারে, এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না নিয়ে তারা যে কর্মকাণ্ডগুলো শুরু করেছিলেন সেটাই ছিল তাদের মারাত্মক ভুল।

গরবাচেভ তার বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন—'অনেকে মনে করেন ধীর প্রক্রিয়ায় আমাদের সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত। কিন্তু না, সঠিক উপায় হচ্ছে এই মুহূর্তে সমস্যার সমাধান করা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এভাবেই সঠিক পথ মনে করে অনেক ভুল কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আর একবার যখন ভ্রান্ত প্রবণতাগুলো অর্গলমুক্ত হয়েছে, শুরু হয়ে গেছে নানাবিধ সুবিধাবাদী প্রক্রিয়া। এইসব প্রবণতা ক্রমশ সমাজতন্ত্রকে ভাঙনের দিকে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েতের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমেরিকা এবং তাদের মিত্রশক্তি এই ধ্বংসপ্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। এমনকি পশ্চিমারা রাজনৈতিক পরিভাষাকেও বদলে দিয়েছে। যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের পক্ষে কথা বলেছে, তাদেরকেই ওরা উল্টো বলেছে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আর যারা পুঁজিবাদের পক্ষে এমনকি আধুনিক পুঁজিবাদ নয়, আদিম পুঁজিবাদের পক্ষে যে অর্থনীতি সেখানে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে, তার পক্ষে কথা বলেছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের পক্ষে কথা বলেছে, তাদেরকে বলা হয়েছে 'প্রগতিশীল' এবং 'বামপন্থি'। খুব সচেতনভাবে মোড় ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে সব ধারণার।

পশ্চিমারা এই প্রচারণা অব্যহত রেখেছে কারণ তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিতে চেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এই প্রক্রিয়া এত অতিমাত্রায় করেছে যে এখন এর পরিণতি নিয়ে ওরা নিজেরাই ভীত হয়ে পড়েছে।

টমাস বোর্জ তোমার কি মনে হয় কোনো উপায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই ভৌগোলিক ভাঙনকে রোধ করা যেত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আমি বলব, সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে কখনোই ভাঙতে পারত না, যদি ভাঙার কাজটা সোভিয়েতরা নিজেরাই শুরু না করত, যদি-না সেদেশের নীতিনির্ধারক রাজনীতিবিদরা এবং সরকার নিজেরাই ভাঙনের কাজটি শুরু করে দিত। সেখানে সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, একে হত্যা করা হয়েছে। আমি সেটাই বলতে চাই।

সত্যিকারের কী কী ঘটেছে আমরা এখনো তা সঠিকভাবে জানি না। অনেকে বলছেন, পোল্যান্ডের পরিবর্তনকে খুব সচেতন পরিকল্পনার মাধ্যমে ঘটানো হয়েছিল। পুরো সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনকেই দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে।

টমাস বোর্জ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্য থেকে কারা এই পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছে, তোমার কোনো ধারণা আছে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো যারা আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ, সিআইএ-র সঙ্গে মিলে সমাজতন্ত্রের এই ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছে তাদের নাম এখনো জানা যায়নি কিন্তু জানা যাবে একদিন, কারণ তথ্য কোনোদিন গোপন থাকে না। তাদের নাম জানতে ২০, ২৫, ৪০, ৫০ বছর লাগতে পারে, কিন্তু জানা একদিন যাবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এখন চারিদিকে শুধু অনিশ্চয়তা, কঠিন দ্বন্দ্ব দেখে কষ্ট হয়। মন তিক্ত হয় যখন ভাবি যে এই ধ্বংসযজ্ঞ বোধ হয় আরো গভীরে প্রবেশ করবে। আমি জানি না, যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে যুক্ত ছিল, সে সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে কী করে তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে। ৭০ বছর ধরে কারো সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে হঠাৎ করে সেটা ভেঙে দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। যে মানুষগুলো নিজেদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল এই ভাঙনের ফলে তারা যে কী কঠিন যন্ত্রণা আর দুর্যোগের মধ্যে পতিত হলো, তা ভাবা যায় না।

যে দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোনোভাবে অর্থনৈতিক বা সামরিক সম্পর্কে যুক্ত ছিল বা প্রজাতন্ত্রগুলো সোভিয়েতের ওপর নির্ভরশীল ছিল, এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যেও যে ক্রমশ ভাঙন ধরবে না, তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো না। এই ভাঙন প্রক্রিয়া মানবতাকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করবে আর সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পথকে সুগম করবে, আমেরিকাকে করে তুলবে সব ক্ষমতার নিয়ন্তা। তবে এই নতুন পরিস্থিতিতে আমেরিকা আর তার মিত্রদের মধ্যকার দ্বন্দ্বটি কোথায় গিয়ে গড়ায় সেটা আমাদের দেখবার বাকি আছে।

এটা ইতিহাসের নিয়ম। এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নেই। স্বার্থের প্রশ্নে মিত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসের পর পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, এখন অনিবার্যভাবেই প্রধান পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হবে। শুরু হবে নতুন একটা ইতিহাস। আমরা জানি না আমাদের সামনে কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, জানি না মানবতার জন্য আরো দুর্দিন আসছে কি না।

এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পুঁজিবাদের পরিচয় ঘটবে, তাদের পরিচয় ঘটবে পুঁজিবাদের সবচেয়ে খারাপ রূপের সঙ্গে, পরিচয় ঘটবে নয়া উদার নীতিবাদের সঙ্গে। ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ডের অভিজ্ঞতা হবে তাদের। তারা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার অভিজ্ঞতা সমবায় করবে। নতুন এক ইতিহাসের জন্ম হচ্ছে, যখন শেষ কথাটি আর কারোই জানা নেই। দেখা দিচ্ছে আরো পশ্চাৎপদ নানা প্রবণতা। অবশ্য এসব প্রবণতা আর মাটি পাবে না একদিন, তখন আবার তাদের পেছনে ফিরতে হবে নির্ঘাত।

টমাস বোর্জ সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা এবং এর মিত্রদেশগুলো এই পরিস্থিতিতে খুবই পুলকিত হবে। তবে এইমাত্র যা বললে তার নিদর্শনও মেলে। কিছুদিন আগে ইউরোপীয় একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে গোপনে বলছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবনায় তিনি এখন খুবই স্মৃতিভারাক্রান্ত বোধ করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আশির দশকের শেষদিকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দেখেছি এসব প্রশ্নে ন্যায়বিচারের জন্য সোচ্চার হতে। এখন তাও এমন স্তিমিত হয়ে গেল কেন? এদের কি আবার সক্রিয় করে তোলা যাবে বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, এ বিষয়ে অনেক কিছুই করা যায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে তুমি বোধ হয় প্রধানত জাতিসংঘের কথাই বলছ। হ্যাঁ, ১০ বছর আগে জাতিসংঘের একটা কার্যকর ভূমিকা ছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, পরিবেশ, শিশু, নারী এসব ক্ষেত্রে তারা কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। কিন্তু ক্রমেই জাতিসংঘ, বিশেষ করে এর নিরাপত্তা পরিষদ আমেরিকার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বকে এখন তার মূল্য দিতে হচ্ছে। বহুকিছুই ঘটেছে এর প্রভাবে। শুধু সমাজতন্ত্রের পতন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনই নয়, উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক অঘটনই ঘটেছে এজন্য। আমি মনে করি, ইরাক কিছু মারাত্মক ভুল করেছে; যে কারণে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তার আধিপত্য বিস্তারের এবং পৃথিবীর প্রভু হয়ে বসার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে এবং নিরাপত্তা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পেয়েছে।

সুতরাং অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের যে কার্যকরী ভূমিকা ছিল, এখন আর তা নেই। এখন তারা সাম্রাজ্যবাদীর একচ্ছত্র আধিপত্যকেই সহায়তা করছে। এর কাঠামোটিও অগণতান্ত্রিক। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদেরই কেবল ভেটো দেয়ার ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতা আমেরিকা অসংখ্যবার ব্যবহার করেছে। আমি সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না, কিন্তু আমেরিকা অগণিতবার তার নিজের এবং মিত্রদের স্বার্থেই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে।

তবে তুমি ঠিকই বলেছ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার যে কার্যকরী ভূমিকা কিছুকাল আগেও ছিল এখন তা নেই। বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখেই ব্যাপারটা ঘটছে।

টমাস বোর্জ : ফিদেল, সাম্প্রতিকপরিস্থিতিতে তুমি নতুন কোন্ দ্বন্দ্বগুলো প্রত্যক্ষ করছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বোর্জ, তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন করছ, আমার বেশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আসলে এ বিষয়টা নিয়ে আমি খুব বিস্তারিতভাবে ভাবার সুযোগ পাইনি। বিশেষ করে, এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমাকে আমার বিভিন্ন ব্যবহারিক দায়িত্বে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে এ বিষয়টিকে একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করবার সময়ই আমি পাচ্ছি না।

তবুও আমি বলব, এখন প্রথম এবং প্রধান দ্বন্দ্ব হবে তৃতীয় বিশ্ব এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে। দ্বন্দ্বটা দ্বিমুখী হবে, যদিও বস্তুত তা একই দ্বন্দ্ব। একটা হবে তৃতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্ব এবং সাধারণ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে এবং অন্যটি তৃতীয় বিশ্ব এবং বিশেষভাবে আমেরিকার নেতৃত্বের সঙ্গে। এ ছাড়া দ্বন্দ্ব দেখা দেবে বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে। যেমন আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপীয় জোটের মধ্যে। এ দ্বন্দ্বগুলো খুবই তীব্র হবে এবং নিঃসন্দেহে তা বিশ্বে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বর্তমান অবস্থায় প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলো এবং ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলো পৃথিবীর সীমিত অর্থনৈতিক সম্পদের জন্য তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। সেইসঙ্গে পশ্চিমারা প্রাক্তন কম্যুনিস্ট দেশগুলোকে তাদের বলয়ে আনার চেষ্টা করছে। আগে তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে যে অসম বাণিজ্য চুক্তি করত, এখন সে চুক্তি করছে তাদের সঙ্গে। আগে সেসব সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে চুক্তি এবং তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে চুক্তি এক ছিল না। এসব অসম চুক্তির মাধ্যমে এখন সাম্রাজ্যবাদীরা আরো ব্যাপক সুবিধা নিতে চাইবে। অনেকেরই এখন টাকা প্রয়োজন, তৃতীয় বিশ্ব, প্রাক্তন ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশ এবং প্রাক্তন সোভিয়েত দেশগুলো সবাই এখন আমেরিকার কাছে টাকা চাইছে। কিন্তু গত বছর আমেরিকায় ৪০০ বিলিয়ন ডলারের স্মরণাতীতকালের রেকর্ড পরিমাণ বাজেট ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

সুতরাং এসব পরিস্থিতি একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করবেই ভবিষ্যতে। তার নিদর্শন এখনই পাওয়া যাচ্ছে, ক্রমশই তা আরো তীব্র আকার ধারণ করবে।

স্ট্যালিন

টমাস বোর্জ ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা মনে করেন, সমাজতন্ত্রের আজকের এই সংকটের মূল আয়োজক হলেন যোসেফ স্ট্যালিন, তোমার কী ধারণা?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি স্ট্যালিন মারাত্মক কিছু ভুল করলেও, তার অসাধারণ কিছু সাফল্যও রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবে স্ট্যালিনের কাজ ছিল খুবই জরুরি এবং বিপ্লবের পরবর্তীকালে যুদ্ধগুলোতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিদেশী আগ্রাসন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তিনি রক্ষা করেছেন। এ সবই ইতিহাস। তিনি শিল্পোন্নয়নেও ভূমিকা রাখেন, তিনি পুরো সোভিয়েত ইউনিয়নকেই পুনর্গঠিত করেন।

টমাস বোর্জ : অনেকেই বলেন যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়ের পেছনে স্ট্যালিনের কোনো ভূমিকা নেই।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দ্যাখো টমাস, আমি অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের ভূমিকা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে আসছি। সুতরাং আমার মন্তব্যের পেছনে একটা বাস্তব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিত্তি আছে ধরে নিতে পারো। আমি মনে করি, সোভিয়েত ইউনিয়নে যা-কিছু ঘটেছে সেজন্য স্ট্যালিনকে দোষারোপ করা ইতিহাসের খুবই ভাসাভাসা একটা ব্যাখ্যা হবে। একজন মানুষ, একা এ ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে না। একইভাবে শুধুমাত্র স্ট্যালিনের জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি হয়েছিল বলাও খুব বোকামি। অগণিত বীরোচিত মানুষের শ্রমেই গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, যারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, বহু মানুষের জীবনে এনেছিল শান্তি।

অক্টোবর বিপ্লবের জন্য যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কৃতিত্ব দিতে হয়, তাহলে দিতে হবে লেনিনকে। অন্য যেকোনো নেতার তুলনায় লেনিনের মেধা ছিল অনন্যসাধারণ। এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্ভাগ্য যে তারা বিপ্লবের পর লেনিনকে খুব অল্প সময়ের জন্য পেয়েছিল। লেনিনের বেঁচে থাকা দরকার ছিল আরো ১০, ১৫, ২০ বছর। আমরা যারা লেনিনের ওপর পড়াশোনা করেছি, যারা তাঁর চিন্তা এবং প্রতিভা সম্পর্কে পরিচিত, তারা জানি যে বিপ্লবের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ভ্রান্ত প্রবণতাগুলো ছিল লেনিন তা শুধরে নিতে পারতেন। আমি বলব লেনিনের অনুপস্থিতি, চিন্তা এবং মেধার ক্ষেত্রে এই শূন্যতাই পরে জন্ম দিয়েছে যাবতীয় সংকট।

আমি তোমাকে বলেছি যে স্ট্যালিনকে আমি বিভিন্নভাবে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছি। প্রথমত, আমি স্ট্যালিনের আইন ভঙ্গের প্রবণতাকে খুবই নিন্দা করি; তিনি ক্ষমতার অসম্ভব অপব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্ট্যালিন সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছেন তাঁর কৃষি কার্যক্রমে। তিনি দীর্ঘদিন ছোট ছোট খামার এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জমির সামাজিকীকরণের চেষ্টা করেননি। বেশ কয়েক বছর খাদ্য উৎপাদন পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তিগত জমাজমির ওপর, ফলে একসময়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদন নিঃশেষ হয়ে যাবার পর পুরো খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থাই পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। আরো অনেক আগে জমির সামাজিকীকরণ এবং ক্রমশ একে উন্নত করে তোলা প্রয়োজন ছিল। আমি মনে করি, স্ট্যালিন হঠাৎ করে নিপীড়নমূলকভাবে যৌথ খামারের যে কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তা অর্থনৈতিক এবং মানবিক উভয় দিক থেকে ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঐটাই ছিল স্ট্যালিনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। এ প্রসঙ্গে আমি আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। প্রথমত, আমরা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো ভূমিসংস্কারনীতি গ্রহণ করিনি। আমরা অংশীদার কৃষক, বর্গাচাষি, ভোগদখলকারী এবং যারা জমিতে কাজ করছে তাদের জমির মালিকানা দিয়েছি, আমরা বড় বড় জমিগুলোকে ভাগ করে ফেলিনি, খণ্ড খণ্ড করিনি। সেটা করতে গেলে আমরা নির্ঘাত আমাদের চিনি-শিল্পকে ধ্বংসের মুখে দিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা যদি ভূমি পুনর্গঠন করতে গিয়ে হাজার হাজার ছোট খামার গড়ে তুলতাম, তাহলে আমাদের দেশবাসীকে না-খাইয়েই রাখতে হতো।

তবে একথাও সত্য যে, অন্যের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা খুব সহজ। হয়তো সোভিয়েতদের আর কোনো বিকল্প ছিল না। সে সময় সোভিয়েতে যে দারিদ্র্য, সম্পদের অভাব, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাসহ বিপুল সমস্যা বিরাজ করছিল, তাতে হয়তো ঐ ধরনের কৃষি নীতিমালা গ্রহণ করাটাই অনিবার্য ছিল। আমি স্বীকার করি, প্রয়োজনই তাদের ঐ পথ গ্রহণে বাধ্য করেছে। তবে তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ বাধ্যতামূলক যৌথ খামারে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জোর-জবরদস্তি আমার কাছে কিছুতেই যৌক্তিক মনে হয় না। আমরা এখানে ভূ-সম্পত্তির বড় বড় এককগুলোকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করিনি। যে যতটুকু জমিতে কাজ করেছে আমরা তাকে সে জমির স্বত্ব দিয়ে দিয়েছি, পাশাপাশি বৃহৎ মাত্রায় কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাও বজায় রেখেছি। পৃথিবীতে কিউবার মতো ছোট আর কোনো দেশ মাথাপিছু এত পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি করে না। যদিও আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে তবু গত ১৫ বছর ধরে আমরা ৪ কোটি মানুষের সমপরিমাণ খাদ্য প্রতিবছর রপ্তানি করছি। আমরা যদি যৌথ খামারের নীতিতে জমিকে অমন ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ফেলেতাম, তাহলে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না।

কিউবা মাথাপিছু কত খাদ্য রপ্তানি করে, এ তথ্য অনেকেই জানে না। দ্বিতীয়ত, আমরা সেসব কৃষকের জমির স্বত্ব দিয়েছি, যারা মালিক হওয়া সত্ত্বেও কখনো কোনো দলিল হাতে পায়নি। ছোট জমির উৎপাদন কম এ ব্যাপারে আমরা ভালোভাবেই অবগত; তবু আমরা বাধ্যতামূলক যৌথ খামারের কোনো নীতি গ্রহণ করিনি। অথবা খুবই ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট কৃষকদের সম্মিলিত উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় এনেছি। গত ১০ বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে আমাদের ৫০ ভাগ ছোট কৃষক যৌথ উৎপাদনের আওতায় এসেছে। বাকি ৫০ ভাগ এখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদন করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি করছি না। আমরা জানি, হয়তো ১০০ হেক্টরের কোনো ছোট জমিতে আধুনিক সেচযন্ত্র বা বিমান বা নানা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব নয়, তবু আমরা ওই ৫০ ভাগ কৃষককে যৌথ খামারে আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করছি না। আমরা তাদের সবরকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি। আমরা মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সবসময়ই শ্রদ্ধা করে এসেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। যারা যৌথ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এসেছে তারা দীর্ঘদিনের একটা ধারাবাহিক কার্যক্রমের পর স্বেচ্ছায় এসেছে।

একটা দেশে যেখানে অধিকাংশ মানুষ কৃষক এবং যুগ যুগ ধরে তাদের নিজস্ব জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছে সেখানে হঠাৎ করে জোর-জবরদস্তিতে তাদের জমিগুলো কেড়ে নিয়ে যৌথ খামার তৈরি করলে তার পরিণতি কী দাঁড়ায় দ্যাখো। আমি মনে করি সেটাই ছিল স্ট্যালিনের সবচেয়ে বড় ভুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টমাস বোর্জ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক নেতৃত্বের প্রশ্নে আসা যাক আবার। সেখানে স্ট্যালিনের ভূমিকা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি মনে করি, যুদ্ধের প্রাক্কালে স্ট্যালিনের কূটনীতি ছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। স্ট্যালিনের আন্তর্জাতিক কূটনীতির উদ্দেশ্য স্পষ্টই বোঝা যায়। এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে তিনি হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। কেন? বিভিন্ন দলিলপত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমাশক্তি পুঁজিবাদী দেশগুলো হিটলারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়ে দিতে চেয়েছিল। ইতিহাস এ-ও প্রমাণ করে যে জার্মান সমাজের এতে সমর্থন ছিল, তারা নাৎসিবাদকে সমর্থন করেছিল সমাজতন্ত্র ধ্বংসের একটা উপায় হিসেবে। হিটলার গোঁড়া জাত্যাভিমানী হওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, কারণ নিজেকে সে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক নম্বর যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। সবাই তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসের অন্যতম উপায় হিসেবেই বিবেচনা করত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৩ বছর। আমি তখন ভীষণ আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়তাম। সেই স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই আমি গোগ্রাসে সংবাদপত্র পড়তাম। স্পেনের গৃহযুদ্ধ হলো ১৯৩৬-এ, আমার বয়স তখন ১০। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেসব খবরের কথা। মনে হয় যেন এইমাত্র পড়ছি। আমার বাবার খামারে অনেক স্প্যানিশ কাজ করত, তারা লিখতে পড়তে জানত না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল রিপাবলিকান, অধিকাংশ প্রবৃত্তিগতভাবেই ছিল রিপাবলিকান আবার কেউ কেউ সমর্থন করত ফ্রাঙ্কোকে। যাহোক, আমি তাদেরকে সংবাদপত্রগুলো পড়ে শোনাতাম। যেমন আমি আমাদের বাড়ির বাবুর্চিকেও নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে শোনাতাম। সে ছিল গেলিসিয়ার এক কৃষক-সন্তান, অশিক্ষিত এবং ঘোর রিপাবলিকান। সামন্তবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ যেন তার রক্তেই প্রবাহিত হতো। আস্তরিয়া, টিরুয়েল, এবরো এসব অঞ্চলের যুদ্ধের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে এবং বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমি প্রতিদিন নিয়মিত সংবাদপত্র পড়তাম। এছাড়া সেসময়কার সামরিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন বই তো পড়তামই। আমি সেই ১৩ বছর বয়স থেকে গত ৫০ বছর ধরে নিয়মিত এসব পড়াশোনা করছি। আমি তখন এসব বিষয়ের রাজনৈতিক এবং সামরিক বিশ্লেষণ করতাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পশ্চিমা শক্তিগুলো হিটলারকে ক্রমাগত উৎসাহ যুগিয়ে এসেছে, যতক্ষণ না সে একটা দানবে পরিণত হয়েছে। একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে পশ্চিমা শক্তিরাও হিটলারের সঙ্গে খুবই দুর্বল আচরণ করেছে, যার ফলে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করতে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমত, সে অধিকার করেছে সার্বিয়া, যেখানে তার সৈন্য পাঠাবার কথা ছিল না, এমনকি পরবর্তীতে হিটলার এবং মুসোলিনি স্পেনও আক্রমণ করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জার্মান পাইলট এবং বোমারুরাই গোয়ের্নিকাকে ধ্বংস করেছে, মাদ্রিদের ওপর বোমা ফেলেছে, হাজার হাজার স্পেনীয়কে হত্যা করেছে। জার্মান এবং ইতালির আগ্রাসী নীতি যুদ্ধে গতি নির্ধারণ করেছে। স্পেনে কোনো ইংরেজ, ফরাসি বা আমেরিকান বিমানযুদ্ধ করেনি, যদিও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ব্রিগেড কাজ করেছে। স্পেনকে যে একমাত্র দেশটি সাহায্য করেছে সেটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ ঐতিহাসিক তথ্য তো অস্বীকার করা যাবে না যে স্পেনের অধিকাংশ অস্ত্র বা বিমান আর ট্যাঙ্ক এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই। সোভিয়েতের সাধ্যের মধ্যে যা-কিছু ছিল সবই তারা দিয়েছে। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনি যখন তাদের আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছিল তখন অন্য দেশগুলো কী করছিল? পৃথিবীর বুক থেকে স্প্যানিশ রিপাবলিককে যখন হিটলার আর মুসোলিনি মুছে ফেলছিল, পশ্চিমা শক্তিরা তখন কী করছিল? জার্মানদের সশস্ত্র হয়ে ওঠাকে প্রতিরোধ করতে কী করেছিল পশ্চিমা শক্তি?

তারপর হিটলারের সৈন্য এক-এক করে তার অধিকার লঙ্ঘন করে ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো দখল করেতে লাগল। জার্মানরা অস্ট্রিয়া দখল করল, দখল করল চেকোস্লোভাকিয়া। আরো এগিয়ে অধিকার করল হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া। পশ্চিমারা কী করেছে তখন? তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে একা একপাশে ফেলে রেখেছে। নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভয় পেয়েছে তখন। তারা দেখেছে হিটলারের আগ্রাসনকে কেউ প্রতিরোধ করছে না এবং হিটলার আরো উদ্যমে প্রয়োগ করছে তার আগ্রাসী নীতি। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই স্ট্যালিন ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় তিনি এমন একটা কাণ্ড করলেন, যাকে আমি সবসময়ই সমালোচনা করব। কিছুটা সময় নেয়ার জন্য হিটলারের সঙ্গে আঁতাত করা ছিল স্ট্যালিনের ঘোর অসততা।

আমাদের দীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে এবং কিউবার এতদিনের বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা কোনো সুবিধা নেয়ার জন্য কখনো কারো সঙ্গে আঁতাত করিনি। আমি মনে করি, এটা স্ট্যালিনের একটা মারাত্মক ভুল। অবশ্য এজন্য আমি স্ট্যালিনকে একা দোষারোপ করব না। কারণ পশ্চিমা শক্তির কূটনীতিই স্ট্যালিনকে ঐ অবস্থায় যেতে বাধ্য করেছে। ইতিমধ্যে তিনি মলোটভ রিবেনট্রপ সন্ধি করে ফেলেছেন, যখন জার্মানরা ডানজিগ করিডোর দাবি করছে, পোল্যান্ড দাবি করছে। যখন থেকে আমার রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে সোভিয়েতের এই সন্ধি ভুল।

আমার মনে হয়েছে প্রস্তুতির সময় বাড়াতে গিয়ে এই চুক্তি বরং সময় আরো কমিয়ে দিয়েছে। হিটলার যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করল, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আর উপায় থাকল না। কী হলো পরিণতিতে? একের পর এক হিটলারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জয়। হিটলার নরওয়ে আক্রমণ করল, তারপর বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স। ইউরোপে হিটলারের শক্তি বাড়তেই লাগল এবং সুযোগ বুঝে মুসোলিনি ঢুকল যুদ্ধে। প্রতিমাসে দ্বিগুণ পরিমাণ শক্তিধর হয়ে উঠতে লাগল হিটলার, অস্ত্রে, জনসম্পদে, প্রাকৃতিক সম্পদে। হিটলার হয়ে উঠছিল সোভিয়েতের ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষ। স্ট্যালিন এবং হিটলারের মধ্যে শুরু হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হিটলার যতই পূর্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ততই বোঝা যাচ্ছিল যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু সেসময়ে স্ট্যালিনের কার্যকলাপে আদৌ কি প্রজ্ঞার পরিচয় ছিল? তিনি বললেন, 'যেখানে রুশ জনগণ আছে আমি তাদের রক্ষা করব, আমি জার্মানদের প্রবেশ করতে দেব না, আমি সেই সীমানা রক্ষা করব।' এখানেও স্ট্যালিন আরেকটি ভুল করলেন। পোল্যান্ড যখন আক্রান্ত হলো তিনি সেখানে সৈন্য পাঠালেন সেই সীমানা রক্ষা করার জন্য; কারণ সেখানে নাকি ইউক্রেইন বা রুশ জনগণ আছে।

এর চেয়ে ভালো কূটনীতি কী হতে পারত? আমরা যদি এ পরিস্থিতিতে পড়তাম, তাহলে আমি নিশ্চিত যে আমরা অন্য নীতি গ্রহণ করতাম। আমরা কখনোই আগ বাড়িয়ে অন্য একটি দেশের সীমা অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতাম না বরং আশা করতাম, তারা এসে আমাদের কাছে বিপদ থেকে রক্ষা করার আমন্ত্রণ জানাক। নীতিগত প্রশ্নে এটি ঠিক নয়। আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, ফিনল্যান্ডের ছোট যুদ্ধটিও ছিল আরেকটা বড় ভুল। আদর্শের প্রশ্নে, আন্তর্জাতিক নীতির প্রশ্নে। তিনি একটার পর একটা ভুল করে গেছেন এবং যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য তেমনি সমাজতন্ত্রের জন্য প্রচুর দুর্নাম কুড়িয়েছেন। তিনি সমাজতন্ত্রের মিত্রদের একটা সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেই দিনগুলোতে বিশ্বের তাবৎ সমাজতন্ত্রীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ নিতে গিয়ে একধরনের হারিকিরিই করছে। আমি বলছি না যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করাটা ভুল হয়েছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু এর আগে কোনোদিনই কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে একথাগুলো এভাবে বলিনি।

আমি মনে করি সেসবই ছিল মারাত্মক ভুল, নীতিগত ভুল, যে ভুল করা কিছুতেই উচিত হয়নি। কিন্তু কিউবার বিপ্লবের ইতিহাসে এ ধরনের ভুল নেই। আমরা নীতির প্রশ্নে সবসময়ই অনড় ছিলাম। আমেরিকার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ থাকা সত্ত্বেও আমরা কোনো কারণেই অর্থনৈতিক কোনো পদক্ষেপ নিইনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে কর্মকাণ্ডগুলোর কথা আমি বললাম, এগুলো রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও বিরোধী। এটা ঠিক যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এক বছর নয় মাস নিজেদের অস্ত্রে সজ্জিত করার সুযোগ পেয়েছে কিন্তু হিটলারও এদিকে দশগুণ বেশি শক্তিতে নিজেদের অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। প্রচুর রাজনৈতিক এবং নৈতিক মূল্য দিয়ে

~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েতরা তাদের সামরিক শক্তি বাড়িয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু একই সময়ে হিটলারও হয়ে উঠেছিল দশগুণ বেশি শক্তিধর।

হিটলার যদি সোভিয়েতের সঙ্গে ১৯৪১-এর জুনে যুদ্ধে না গিয়ে ১৯৩৯-এ যুদ্ধে যেত, তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হতো। তখন সোভিয়েতের সেইসব সাহসী সেনা কর্মীদের মুখোমুখি হয়ে, যারা অক্টোবর বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, সেইসঙ্গে সাহসী সোভিয়েত জনতার মুখোমুখি হয়ে, হিটলারের পরিণতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতোই হতো। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন হিটলারকে পরাজিত করতেও পারত। সুতরাং স্ট্যালিনের সেই চুক্তিকে আমি সবসময় অত্যন্ত ভুল একটি সিদ্ধান্ত বলে বিবেচনা করি।

পরিশেষে স্ট্যালিনের চরিত্র। সবকিছুর ব্যাপারে তাঁর ঘোরতর সন্দেহের কারণেও তিনি অগণিত ভুল করেছেন। যেমন তিনি জার্মান ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে তাঁর সেনাবাহিনীতে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী শোধন প্রক্রিয়া চালালেন, যাতে যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি বলতে গেলে সেনাবাহিনীর শিরশ্ছেদ করলেন। তিনি আরো একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন ১৯৪১-এর জুনে, যখন জার্মানরা তাদের হাজার সৈন্য, ট্যাঙ্ক, বিমান এনে জড়ো করেছিল তাদের সীমান্তে। জার্মানদের এত স্পষ্ট আগ্রাসী আচরণ সত্ত্বেও স্ট্যালিন ভাবলেন, এগুলো কিছুই না, নিছক উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াসমাত্র। তিনি উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলেন। কোনো সৈন্য পাঠালেন না সীমান্তে। এমন একটি স্পষ্ট আগ্রাসনের হুমকি থাকলে যেকোনো দেশই একটা প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তার লক্ষ-কোটি শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, বিমান, ট্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করল না, কোনো পর্যায়ক্রমিক যুদ্ধপ্রস্তুতির ঘোষণাও দেয়া হলো না। স্ট্যালিন ভাবলেন কোনো প্রস্তুতি না দিয়ে হিটলারকে একধরনের ধোঁকা দেবেন। কিন্তু এ ধরনের হেঁয়ালি করাটা আমার কাছে খুবই উদ্ভট হয়েছে। ফলে দাঁড়াল কী? এত কিছুর ভুলের পর হিটলার আচমকা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আঘাত করে বসল ১৯৪১-এর ২২ জুন, সম্ভবত শনি কি রোববার। কয়েক লাখ সৈন্য নিয়ে একটি দেশ কি 'আচমকা' আরেকটি দেশকে আক্রমণ করতে পারে? কিন্তু হিটলার তা করেছিলেন একটি অপ্রস্তুত দেশের ওপর। সেনাকর্তারা, সৈন্যরা, বৈমানিকরা আক্রমণের দিন মাত্র আদেশ পেয়েছিলেন।

এটা আমার কাছে সবসময়ই খুবই স্পষ্ট যে, সে মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়োজন ছিল একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং তাদের উচিত ছিল বিমানগুলোকে পিছনে হটিয়ে রাখা। তারা যখন প্রতিরক্ষামূলক কৌশলই গ্রহণ করল, তারা যখন আক্রমণের পরিকল্পনাই বাতিল করে দিল তখন তাদের উচিত ছিল বিমানগুলো নিরাপদ স্থানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরিয়ে রাখা, বিভিন্ন সম্পদ কৌশলগত বিন্দুগুলোতে এনে জড়ো করা এবং সেনাবাহিনীকে চূড়ান্ত সচেতন করে রাখা। তাহলে হিটলার এভাবে আর আকস্মিক আক্রমণ করতে এবং প্রথম আঘাতেই এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে পারত না। যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ খানিকটা বিলম্বিত হওয়ার সুযোগ ছিল, যখন তারা প্রস্তুতি নিতে পারত। ১৯৪১-এ তারা যদি সেটি করতে পারত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে হিটলারের সৈন্যবাহিনী সোভিয়েত সীমার ভেতরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাহলে তারা আর এত সোভিয়েত সেনাকে ঘিরে ফেলতে পারত না, এত মানুষকে বন্দি করতে পারত না, প্রথম দিনেই বলতে গেলে সোভিয়েতের সবকটা বিমান ধ্বংস করতে পারত না এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহে এত বিপুল ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা কিছুতেই মস্কো, কিয়েভ বা স্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। সোভিয়েতের মতো বিশাল একটি দেশের জনগণ যদি প্রস্তুত থাকত, তাহলে ওরা কিছুতেই এতদূর অগ্রসর হতে পারত না। আমার বিশ্বাস তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিত, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বার্লিনে নয়, পর্তুগালেই শেষ হয়ে যেত।

টমাস বোর্জ স্ট্যালিনের কৃতিত্ব কোন্ ক্ষেত্রে বলে তুমি মনে করো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, স্ট্যালিনের কৃতিত্ব তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, পার্টির একতার প্রশ্নে লেনিনের কাজগুলোকে জোরদার করতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়নও একটা বড় সাফল্য। এটা অর্জন করা যথেষ্ট একটা কঠিন ব্যাপার ছিল এবং সোভিয়েতের অস্তিত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে শিল্পায়নের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তিনি সাইবেরিয়াসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করেছিলেন। তবে এসব শুধু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, এটা তাঁর নিজস্ব দলটির কৃতিত্ব। কিন্তু মানুষ শুধু ব্যক্তি স্ট্যালিনকে নিন্দা বা প্রশংসা করছে, আসলে এসব নিন্দা বা প্রশংসার কাজ তো অনেকগুলো মানুষের মিলিত সমর্থন এবং প্রচেষ্টার ফল।

আমি মনে করি, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর তিনি বরং সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভালো নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রাথমিক কিছু মুহূর্তে তিনি খুবই দ্বিধায় কাটিয়েছিলেন, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। মিকোয়ান আমাকে স্ট্যালিনের যুদ্ধশুরুর মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। স্ট্যালিন খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, কারণ তিনি যা-কিছু ধরে নিয়েছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছিল। তিনি আকস্মিকভাবেই জানতে পারলেন হিটলার তার সীমান্তে শুধু উত্তেজনাই সৃষ্টি করছে না, ব্যাপক ক্ষতিও সাধন করে ফেলেছেন। তিনি কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন কিন্তু তারপরই

~ www.amarboi.com ~

তিনি একজন দক্ষ সামরিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। সেসময়কার কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনার জন্য তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, আর কারো ক্ষমতা বা দায়িত্ব ছিল না। তখন থেকে তিনি সোভিয়েতকে রক্ষার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। জুকভসহ সোভিয়েতের অন্যান্য সকল মেধাবী সেনাপতিরাই সে-কথা স্বীকার করেছেন।

সময় একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন স্ট্যালিনের সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে, তাকে কেবলই দোষারোপ করা হবে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী একটা দেশ ছিল।

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমেরিকা যখন পারমাণবিক অস্ত্রের নেতৃত্ব নিয়ে ফেলেছে তার মাত্র চার বছরের মধ্যে সোভিয়েত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে। তার অল্প কিছুদিনের মধ্যে তারা থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রও তৈরি করেছে। মহাকাশ গবেষণাতেও তারা ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। শিল্পে এবং খাদ্য উৎপাদনে তারা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। বেশ কয়েক বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন ২০০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা বছরে মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মিলিয়ন টন গম উৎপাদন করত। আমি সেসব আর বলছি না কিন্তু আমরা জানি সোভিয়েত ইউনিয়ন খুবই ধনী একটা দেশ ছিল। তাদের বিপুল সম্পদ ছিল কাঁচামালে, শিল্পে, বিজ্ঞানে। তারা সুপার পাওয়ার ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এভাবে সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার পেছনে স্ট্যালিনের কি ভূমিকা ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং সোভিয়েতের যা-কিছু খারাপ শুধু তার জন্যই স্ট্যালিন দায়ী একথা বলা কি ঠিক? এটা ইতিহাসের খুবই খণ্ডিত মূল্যায়ন। তাহলে লেনিনকেই সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করতে হয়, কারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত তিনিই করেছেন। এভাবে কতজনকে তুমি দোষারোপ করবে? শেষে তো ঈশ্বরকেই দোষারোপ করতে হবে কারণ তিনি লেনিনকে আরো ১৫/২০ বছর বাঁচিয়ে রাখলেন না।

এসব নিয়ে আমি কৌতুক করতে চাই না, যদিও কৌতুক করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, যারা উত্তরাধিকার-সূত্রে এমন একটা শক্তিশালী দেশ পেয়েছিল, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যা বহু চেষ্টা করেও হিটলার পারেনি। তারা দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে, যে দেশটি যুদ্ধে তার দুই কোটি নাগরিককে হারিয়েও একত্রিত ছিল। ইতিহাসের ধারায় এই দায় একদিন তাদের ওপর বর্তাবেই কেননা তাদের কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বন্দুকের একটা গুলি না ছুড়েই নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে।

বাস্তব মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের স্ট্যালিনের সাফল্য এবং ব্যর্থতাগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সোভিয়েতের ধ্বংসের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকাকেই পর্যালোচনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল মানবজাতির এক নতুন অভিজ্ঞতা। নির্ভুল কোনো বিপ্লব ইতিহাসে নেই, কোনো বিপ্লবী আন্দোলনই ভুল করতে ভোলেনি। ফরাসি বিপ্লব, ল্যাটিন আমেরকিার বিপ্লবসহ ধ্রুপদী বিপ্লবের কথা চিন্তা করো। কিছুটা নৃশংসতা, অনৈতিকতা সব ক্ষেত্রেই ছিল।

আমি একসময় বলেছিলাম, কিউবার বিপ্লবের কৃতিত্ব এই যে—ইতিহাসে সংঘটিত সব বিপ্লবের তুলনায় আমাদের ত্রুটি যথেষ্ট কম। সেই জারের আমলে ত্রুটিমুক্ত বিপ্লবের কথা কি ভাবা যায়? অসম্ভব। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যাতে যেমন প্রচুর ত্রুটি ছিল, তেমনি সাফল্যও ছিল। তাদের অস্তিত্বই পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মানবতাকে ফ্যাসিস্টদের হাতে বন্দি হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে, তারা চীনের মতো দেশে আন্দোলনে সাহায্য করেছে, পৃথিবীর বহু মানুষকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে সুযোগ দিয়েছে।

আমরা যারা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়তে চাই না, তাদের জন্য সোভিয়েত ইউয়িনের অস্তিত্ব ছিল স্বস্তি এবং প্রেরণার উৎস। কিন্তু সোভিয়েত ধ্বংসের কারণে সে সুযোগ আজ বিলুপ্ত।

পুনরায় চে

টমাস বোর্জ অনেকে বলেন, কিউবাতে একপর্যায়ে চে'র চিন্তাধারার প্রতি গুরুত্ব কমে এসেছিল কিন্তু এখন তা আবার গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে তোমার কী বক্তব্য?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দ্যাখো টমাস, আমরা সবসময়েই চে'র চিন্তাধারাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের এই সমস্যা বা পেরেস্ত্রোইকা আবির্ভাবের অনেক আগেই আমি যখন কিউবাতে বিভিন্ন সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম তখন আমার মনে সবসময় চে'র চিন্তাধারা জাগরূক ছিল। আমার মনে আছে চে'র মৃত্যুবার্ষিকীতে, সম্ভবত ২০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি এই পরিবর্তন এবং চে'র চিন্তাধারার সম্পর্কে বিস্তর বলেছিলাম। আমি যখন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় দেখছিলাম তখন আমার চে'র প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যাচ্ছিল কারণ আমার মনে আছে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের ঘোর বিরোধী ছিলেন চে। আমাদের একজন অর্থনীতিবিদ কমরেড চে'র সকল লেখা এবং বক্তৃতা একত্র করে সংকলিত করেছেন। এই সংকলটির গুরুত্ব অপরিসীম এবং তা অধ্যয়নের দাবি রাখে। কারণ আমি মনে করি পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র নির্মাণই যে সেইসব দেশে একটা বিচ্ছিন্নতার প্রভাব ফেলেছে আজ তা স্পষ্ট। তুমি সমাজতন্ত্রের পতন বিষয়েও প্রশ্ন করছিলে। আমি তো মনে করি চে সেই ৬০ দশকের গোড়াতেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর বর্তমান সমস্যাগুলোর স্পষ্ট পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তিনি সেসব পদ্ধতিকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করেছিলেন। আমরা একসময় আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকেই ধার করেছিলাম। কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যথেষ্ট সম্মানের আসনে আসীন। বিপ্লবের পরবর্তী কিছু বছরে আমাদের নানা ভুলের সময়টাতে আমরা মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং ইউরোপীয় দেশের সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের পদ্ধতিটিকেই অনুসরণ করেছিলাম। তবে সোভিয়েতে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সমাজতন্ত্র নির্মাণের পদ্ধতিতেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পুঁজিবাদী অর্থে, আয়-ক্ষমতার ওপর নির্ভর না করেও যে পদ্ধতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলেছে তার সঙ্গে ছোটখাটো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা তাদের মতো করেই কাজ করছিলাম। ফলাফলের জন্য আমরা ১০ থেকে ১১ বছর অপেক্ষা করেছি এবং পরিণতিতে আমরা অনেক বিকৃতি এবং বিচ্যুতি পেয়েছি। তখন আমি ঐ পদ্ধতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি এবং নতুন করে চিন্তা করেছি। তখন আমি সবসময় চে'র কথা স্মরণ করেছি, মনে করেছি বহুদিন আগেই চে'র এসব পদ্ধতি প্রত্যাখ্যানের কথা। আজকের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে তাই চে'র চিন্তা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

সংশোধন প্রক্রিয়ার সময় আমি তাই চে'র পুস্তকের ব্যাপক প্রকাশ এবং প্রচার করি। কিন্তু সেটাকে আবার নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করতেও বারণ করি। কারণ অনমনীয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব বা রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারাকেই গ্রহণ করা উচিত না। সারাজীবনই আমি বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমাদের সংগ্রাম করা উচিত যেন কোনো মেধাবী রাজনীতিবিদ বা বিপ্লবীর চিন্তাধারা একটা অনড় বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত না হয়। কারণ সব চিন্তাধারাই একটা নির্দিষ্ট স্থান, কাল এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। ফলে লেনিন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন ভিন্ন একটা পরিস্থিতি এবং সময়ে সেই পদ্ধতি উপযুক্ত নাও হতে পারে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, চে'র চিন্তাধারা অনড় কোনো সিদ্ধান্ত নয়। একটা বিশেষ সময়ের মেধাবী ভাবুক তাঁরা। তাঁদের চিন্তা তখনই ব্যবহারযোগ্য যখন তুমি তাঁদের চিন্তাগুলোকে অনড়, অচল সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা না করছ। তা না হলে তুমি তাঁদের বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক এবং বিপ্লবী প্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে একটা ধর্মবিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা যখন দেখছিলাম সোভিয়েতসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ভিন্নপথ অবলম্বন করছে তখন আমরা আরো ব্যাপক আকারে চে'র চিন্তাগুলোকে প্রচার করতে লাগলাম। আমরা লক্ষ করছিলাম, তারা চে'র চিন্তাধারা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল এবং তারা আরো ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী পদ্ধতিগুলো অবলম্বনের জন্যই অগ্রসর হচ্ছিল। সমাজতন্ত্রকে উন্নত করতে গিয়ে তারা আরো বেশি পরিমাণে এমন বিষ ঢোকাচ্ছিল যা গোপনে তাকে হত্যাই করছিল। পরিশেষে তা-ই ঘটল।

কিউবাতে আমরা সে ভুলগুলো করিনি। আমরা সংশোধন প্রক্রিয়ার সময় খুবই সচেতন ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। তখন আমরা যা করেছি এখন আবার আমরা তা করতে পারি না। কিন্তু আমরা যথেষ্ট নিয়মমাফিক এবং ধৈর্যের সঙ্গে এখনো বিভিন্ন সংশোধন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি। একটা ভুল হয়ে গেলে এক, দুই, তিন বছর লেগে যায় তা শোধরাতে। আমরা বলেছি যে আমাদের পুরাতন এবং নতুন ভুলগুলো শুধরে ফেলতে হবে। কিন্তু ভুলের জন্ম সেই পুঁজিবাদী যুগে, কিছু ভুল তৈরি হয়েছে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যেই। আমরা এর মধ্যে অনেক কিছুই শুধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংশোধন বা পেরেস্ত্রোইকার কথা ওঠার আগেই আমরা কিউবাতে সে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলাম। পেরেস্ত্রোইকা সংশোধনের একটা শুভ উদ্যোগ হিসেবেই আর্বিভূত হয়েছিল, তবে এর অশুভ ভ্রান্তিগুলোও আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম।

শ্রম থেকে যে অর্থ উপার্জিত নয়, তারা সে উপার্জন বন্ধ করে দেবে—এরকম একটা কথা দিয়েই প্রথম পেরেস্ত্রোইকা-প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিল তারা। আমরা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলাম। কারণ আমরাও ফটকাবাজ, চোর, ঘুষখোরদের অবৈধ উপার্জনের ঘোর বিরোধী ছিলাম। মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণা, বাস্তবসম্মত হোক বা না হোক, আমরা খুবই সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। তারা যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলছিল, আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। তাদের পরিকল্পনায় অনেক চমৎকার বিষয় ছিল, কিন্তু আমি তোমাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পেরেস্ত্রোইকার অনেক আগেই কিউবাতে সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় সংশোধনের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল বলেই সোভিয়েত ইউনিয়নে তারা পেরেস্ত্রোইকা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। কিন্তু তারা পার্টি, সোভিয়েত, এমনকি সমাজতন্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কথা তো বলেনি। কে ভাবতে পেরেছে এমন অবস্থা? তারা সমাজতন্ত্রকে উন্নত করতে চেয়েছিল, ধ্বংস নয়।

কিউবার সংশোধন প্রক্রিয়ার সময় আমার সর্বদাই মনে হয়েছে অন্য একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা আমাদের জন্য খুবই ভুল হয়েছে।

টমাস বোর্জ : আজকাল [illegible] কথাটা বেশ শোনা যাচ্ছে। কী অর্থ প্রতিফলিত করে এই শব্দ?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এখন তো পৃথিবীকে আরো বেশি আদর্শায়িত করবার চেষ্টা চলছে। ওরা সবখানেই পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া উদারনীতিবাদের আদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। যেখানেই যে আদর্শের সঙ্গে মিলছে না সেখানে সেই মানচিত্র বদলে দিচ্ছে তারা। সুতরাং ওটা একটা ফাঁকা বুলিমাত্র।

বহুবছর আগেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ঘোষিত হয়েছিল, যার অর্থ ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন। শান্তি এবং সহযোগিতার প্রশ্নে এই নীতিকে যদি 'আদর্শবর্জন' বলা হয়, তাহলে এটা তো নতুন কিছু নয়। বিপ্লবী আন্দোলনে এই নীতি দীর্ঘদিন ধরেই চর্চিত হচ্ছে। আমি জানি না, এটা কী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আদর্শবর্জনের নামে তারা পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের বিপক্ষে যা তার সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করছে।

টমাস বোর্জ তুমি কি মনে করো নয়া উদারনীতিবাদ নিছক একটা অর্থনৈতিক মতবাদ, নাকি এটা বর্তমান অবস্থা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে একটা রাজনৈতিক প্রকল্প?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ মতবাদ শুধু বর্তমানকে টিকিয়েই রাখতে চায় না, এ অবস্থাকে আরো বর্বর এবং অসাধু করে তুলতে চায়। তারা এমন একটা ব্যবস্থা করতে চায়, যাতে সমগ্র পৃথিবী আমেরিকা এবং বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলোর পদানত থাকে।

বিশ্বনেতৃত্বের পর্যায়ে এসে সাম্রাজ্যবাদেরই নতুন আদর্শ হল নয়া উদারনীতিবাদ। তারা তাদের ধ্যানধারণা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ আমেরিকা নিজে এসব ধারণার চর্চা করে না। তারা তৃতীয় বিশ্বকে বাজেট-ঘাটতি রাখতে নিষেধ করে অথচ তাদের নিজেদের বাজেট-ঘাটতি ৪০০ বিলিয়ন ডলার। যে কারণে আজ তারা সারা পৃথিবী থেকে অর্থ শুষে নেয়ার মেশিনে পরিণত হয়েছে। তারা বলে বাণিজ্যঘাটতি থাকা চলবে না অথচ তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যঘাটতির দেশ। তারা বলে প্রতিরক্ষা নীতি বাতিল করতে হবে অথচ তাদের মতো প্রতিরক্ষা আর কারো নেই। তারা বলে কৃষি বা শিল্পে ভর্তুকি দেয়া চলবে না অথচ তারাই প্রথমে ভর্তুকি দেয়া শুরু করেছে। তারা মুক্তবাজারের বিরুদ্ধে কোনো বাধার বিপক্ষে অথচ তারা এই বাজারকে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে।

আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এসব নীতি কী প্রমাণ করে? এ যেন একই নিয়মে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আর কিন্ডারগার্টেন একটা দলের মধ্যে ফুটবল খেলা। তারা বলছে ৫০ মিটার দূর থেকে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নকেও গোল করতে হবে আবার কিন্ডারগার্টেন দলকেও গোল করতে হবে। এটা সমীচীন হতো যদি বলা হতো চ্যাম্পিয়ন দল ৫০ মিটার দূর থেকে গোল করবে আর কিন্ডারগার্টেন দল ২০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেন্টিমিটার দূর থেকে গোল করবে। অর্থাৎ দুদলের জন্য দুরকম নিয়ম হওয়া দরকার ছিল। এখন তারা সবার জন্য একটাই নিয়ম চালু রেখেছে, মুক্তবাজার আর অরক্ষিত জাতীয় শিল্প। অর্থাৎ আমেরিকা আমাদেরকে বলছে, তোমরা তোমাদের দেশের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে নিজেদেরকে আমেরিকার পুঁজিগ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তোলো। তারপর আমেরিকা কী করবে? চড়া সুদের মাধ্যমে, বিনিয়োগ থেকে চড়া মুনাফার মাধ্যমে, ডলারের মানের ঊর্ধ্বগতিতে, অসম বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে, শস্তায় আমাদের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনে অনেক বেশি দামে আমাদের কাছেই সেসব দ্রব্য বিক্রি করবে। এভাবে তারা শুরু করেছে লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানটি নিয়ে তারপর তারা আহ্বান করছে প্রতিযোগিতার। এই লুটের প্রক্রিয়া আরো বহুগুণ বেড়ে যায় যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ওদের চাপানো নীতিগুলো মেনে নেয়।

সংলাপের পরিস্থিতিও অসম। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মহাপরাক্রমশালী আমেরিকার পক্ষ হয়ে দুর্বল, সমস্যাজর্জরিত দেশগুলোর সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করতে আসে। সমতার প্রেক্ষাপটে কখনো আলোচনা হয় না। এ ধরনের নীতিই ল্যাটিন আমেরিকার ওপর আমেরিকা চাপাচ্ছে। এসব জনগণের কীইবা ভবিষ্যৎ আছে? কিন্তু এ পরিস্থিতি বহনযোগ্য নয়। সময় প্রমাণ করবে এটা একটা অসহ্য পরিস্থিতি এবং তখন পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক এই সুসময় আর থাকবে না। কোটি কোটি অধিবাসীর দেশগুলো এত সহজে এ ভাগ্য মেনে নেবে না।

কোটি কোটি মানুষের জীবন এভাবে অবহেলিত এবং নিঃশেষিত হতে পারে না। ল্যাটিন আমেরিকার বস্তিগুলোতে নারী-পুরুষ, বেকারদের কী অবস্থা শুনলে তোমার বুক ভেঙে যাবে। কী হবে তাদের শিক্ষার, কী হবে সেসব শিশুর যারা প্রতিদিন গৃহহীন হয়ে রাস্তায় আশ্রয় নিচ্ছে? কী হবে তাদের স্বাস্থ্যের, যাদের জীবনে চিরপরিচিত কলেরার সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে উন্নত দেশ থেকে আগত এইডস রোগ?

এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে ল্যাটিন আমেরিকার অধিবাসীরা এখন বাস্তবিকই মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমি রাজনীতিবিদদের কথা বলছি না। বলছি পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, শিক্ষকদের কথা। আমি এসব পেশাজীবী ব্যক্তিদের অনেক সভায় উপস্থিত থেকেছি। তারা যে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছে তা ৩০ বছর আগে আমাদের বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ের চেয়েও ভয়াবহ এবং হতাশাব্যঞ্জক। এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। উন্নত পুঁজিবাদের দেশের এসব কর্মকাণ্ড ল্যাটিন আমেরিকায় এক বিশাল টাইমবোমার জন্ম দিচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে চিন্তা শুরু না করে কি সেই বোমা বিস্ফোরণের অপেক্ষা করতে থাকব? আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা যদি দাসে পরিণত হতে না চাই, তাহলে সকল প্রগতিশীল ব্যক্তির এখন এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা শুরু করা উচিত। তাদের জন্য আবার এক নতুন আবিষ্কার এবং জয়ের ইতিহাস সৃষ্টি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে। এত মানুষকে তো আর মাছির মতো মেরে ফেলা যাবে না? আশা করি আমরা লক্ষ-কোটি নতুন 'ইন্ডিয়ান'রা পুরানো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেব না।

আমেরিকা

টমাস বোর্জ এই যে আমেরিকায় ৫০০ বছর পূর্তি উৎসব হলো, কেউ বলে আমেরিকা আবিষ্কারের উৎসব, কেউ বলে দুটি সংস্কৃতির মিলনের উৎসব, আরো অনেকে অনেক কিছু বলে। এ বিষয়ে তোমার কী মত?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : দ্যাখো টমাস, এই যে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা অবতরণের ৫০০ বছর পূর্তি উৎসব হচ্ছে, আমি এর বিরুদ্ধে নই, আমি ঐতিহাসিক গুরুত্বকেও খাটো করে দেখছি না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এই উৎসবটিকে নেহাত তথাকথিত আবিষ্কারের স্মৃতিচারণ উৎসবে পরিণত করা উচিত নয়, প্রয়োজন পুরো ঘটনাটির বিশ্লেষণাত্মক স্মৃতিচারণ।

বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলম্বাসের অসাধারণ প্রতিভাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না। সমুদ্রযাত্রায় স্বল্প অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কলম্বাস তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতায় এবং অসীম সাহসিকতায় সত্যিই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া সব মানুষকেই আমাদের আজকের যুগের ধ্যানধারণা দিয়ে বিচার করা সঠিক নয়। কলম্বাস ছিলেন তাঁর যুগের মানুষ। তিনি তলোয়ার এবং ক্রুশ হাতে আমেরিকায় অবতরণ করেছিলেন, সেখানকার সবকিছু দখল করেছিলেন, ক্রীতদাস নিয়েছিলেন কিন্তু তবুও তাকে আমাদের যুগের নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা উচিত হবে না। আমি কলম্বাসকে একজন বৈজ্ঞানিক এবং অত্যন্ত সাহসী মানুষ হিসেবে প্রশংসা করি।

ঐতিহাসিক তথ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে এই 'আবিষ্কার' আমেরিকার আদিবাসীদের ক্ষতির কারণ হয়েছিল, আদিবাসীরা বিতাড়িত হয়েছিল। আমরা তো ভুলতে পারি না যে, ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড, নির্মম শোষণ প্রক্রিয়া ঘটেছে সেখানে, সেইসঙ্গে সেই আদিবাসীদের মধ্যে ইউরোপ থেকে রপ্তানি হয়েছে অনেক ঘাতক রোগ।

এই 'আবিষ্কার' আধুনিক দাসব্যবস্থারও সূচনা করেছে। ৩০০ বছর ধরে সেখানে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষদের জোর করে ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করানো হয়েছে কৃষিতে, খনিতে।

আমার বেশ মজা লাগে, যখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ১২ অক্টোবর ১৪৯২ সালের এই ঘটনাটিকে 'আবিষ্কার' বলে চিহ্নিত করে। 'আবিষ্কার' কথাটি যে অবজ্ঞার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বরে বলা হয়, আমরা তা অনুমোদন করতে পারি না। কারণ তারা তখন এমন এক সংস্কৃতি 'আবিষ্কার' করেছিল যা ছিল অত্যন্ত মেধাবী এবং উন্নত। তারা ভুলে যায় যে সেখানকার টেনোকটেটিলান শহরটি তৎকালীন ইউরোপসহ পৃথিবীর যেকোনো শহরের সমকক্ষ। এমনকি রাষ্ট্রকাঠামো সবচেয়ে বিকাশ লাভ করেছিল সেখানকার ইনকা সাম্রাজ্যে। তবে তা সত্ত্বেও কলম্বাস তার এই যাত্রার মাধ্যমে তার সময়ের পৃথিবীর চিন্তাকেই বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ব্যাপারটিকে যদি আবিষ্কারই বলতে হয়, তাহলে বলা উচিত আমেরিকা এবং ইউরোপ উভয়ে উভয়কে আবিষ্কার করেছে। সেইসঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছিল ইউরোপীয় বিজেতাদের নৃশংসতা এবং বর্বরতাও।

কেউ কেউ এই ঘটনাকে দুটি সংস্কৃতির 'মিলন' বলে খানিকটা সাধুবাদ দিতে চান কিন্তু আমার কাছে এই বক্তব্যটিকেও যথার্থ মনে হয় না। কারণ আসলে যা ঘটেছিল তা হলো একটি সংস্কৃতির ওপর আরেকটি সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়া, সামরিক কৌশলে অগ্রসর একটি জাতি দ্বারা অপর একটা জাতি ধ্বংস হওয়া। এটা বস্তুত ছিল আমেরিকায় ইউরোপের অনধিকার প্রবেশ।

একথাও সত্য যে সামাজিক অনাচার এবং রোগ ছাড়াও আমেরিকানরা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে ভালো জিনিসও পেয়েছিল। যেমন আমরা স্প্যানিশ আমেরিকানরা পরস্পরের যোগাযোগের জন্য সাধারণ একটা ভাষা হিসেবে স্প্যানিশকে পেয়েছি। স্প্যানিশরা আমাদের এখানে কিছু সামাজিক সংগঠনের নীতিমালা এবং আইন নিয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে তারা এনেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, যা পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছে উন্নত স্পেনীয় আমেরিকান সংস্কৃতি। আজ যে এ অঞ্চলে আমরা আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ সমন্বয় গড়ে তুলতে পারছি সেটা আমাদের সকলের স্পেনীয় ঔপনিবেশিক ভিত্তির কারণে।

আরো একটা ব্যাপার, অ্যাংলো সাক্সান ঔপনিবেশিকরা যা করেনি স্প্যানিশরা তা করেছিল, তারা আদিবাসী এবং আফ্রিকানদের সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিল, যার ফলে জন্ম নিয়েছে আমাদের আজকের অনেক জাতি।

সুতরাং এই উৎসবের সময় আদিবাসী আমেরিকান সমাজের প্রতিনিধিদের বক্তব্যও আমাদের মনোযোগের সঙ্গে শোনা উচিত। এভাবে পুরো ঘটনাটির ভালো এবং খারাপ দিককে সঠিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমেই এই স্মৃতিচারণ উৎসব যৌক্তিক হয়ে উঠতে পারে।

পুরো ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক বিষয় সুতরাং পুরো ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নির্মোহতা দিয়েই বিচার করতে হবে। বলাবাহুল্য এখানে কোনো একটা বিশেষ দেশের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের কোনো ব্যাপার নেই। যেমন কিউবার কিছু শত্রু তাদের স্বার্থে জনগণের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্প্যানিশদের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইউরোপীয় অন্য কোনো জাত্যাভিমানী দেশ না হয়ে স্প্যানিশরা যে আমাদের এখানে উপনিবেশ গড়েছিল, তাতে আমি বরং খুশি। কারণ সে কারণেই আমরা এমন একটা চমৎকার মিশ্র জাতি পেয়েছি। কিউবানরা স্প্যানিশদের অনেক জাতীয় চরিত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। যেমন বিপ্লবী চেতনা এবং যোদ্ধা মনোভাব। এই চরিত্রগুণের কারণেই আমরা দীর্ঘদিন ধরে উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদসহ তৃতীয় বিশ্বের যাবতীয় সংকটগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হচ্ছি। আমাদের দেশকে শাসন করার আমেরিকার যে ইচ্ছা, তাকে ঠেকাতে, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিকভাবে আমাদের ১০০ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়।

একথা ভুলে যাবার উপায় নেই যে উত্তর গোলার্ধে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য আমাদের এই অঞ্চলের দেশগুলোতে দীর্ঘদিন শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েছে, আমাদের বিভক্ত করে রেখেছে। সুতরাং যা-কিছু আমাদের দেশগুলোর ঐক্যের বোধকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করছে, আমাদের বিভাজন নিরসনে সহায়তা করছে, আমরা সাদরে তা গ্রহণ করছি।

অতএব, এই ৫০০ বছর পূর্তি উদযাপন তখনই সফল হতে পারে, যদি এটা আমাদের ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক ঐক্য অনুধাবনে সহায়তা করে। এই ঐক্যের বোধ আমাদের চারপাশে একটা বর্ম তৈরি করবে, যা আমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। তাহলে আমরা আমাদের ঐক্য এবং পরিচিতি নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আমাদের স্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

৫০০ বছর আগে একটা সংস্কৃতি তারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল; আজ তারা আর একটা জীবনধারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। পৃথিবীকে যখন কেবলই বিভক্ত করা হচ্ছে, যখন মানুষকে ঐতিহাসিক সচেতনতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তখন আমাদের এই ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে তাদের ঐক্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; সমন্বয়ের এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে হবে, আমাদের সঙ্গে নিতে হবে সেইসব নীরব আদিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ, দরিদ্র মানুষদের যাদের আজ হটিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, যাদের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন জোসে মার্তি এবং আর একবার তাদের গড়ে তুলতে হবে ইতিহাসস্রষ্টা হিসেবে। সুতরাং ৫০০ বছর উদ্‌যাপন যেন রঙ মেখে সত্য ঘটনাকে ঢেকে না রাখে। কিছু মানুষ আজকে আবারও আমাদের 'আবিষ্কার' এবং জয় করতে চায় কিন্তু সে বিপদ ঠেকানোর জন্য আজ যেন আমাদের হাতে আদর্শের অস্ত্র থাকে। আমরা এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসবে উদ্দীপনায় যেন সেই ত্রুটিপূর্ণ ইতিহাসটি বিস্মৃত না হই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, আমরা এখনো নয়া উপনিবেশের কবলে আছি, উন্নত বিশ্ব ক্রমাগত আমাদের সম্পদ লুট করছে, পরিবেশ বিনষ্ট করছে, অসম বাণিজ্যচুক্তি এবং ঋণের মাধ্যমে আমাদের শোষণ করছে।

আমরা এখন মিলিয়ন আদি 'ইন্ডিয়ান'। আগের চাইতে সংখ্যায় বেশি, কর্মক্ষমতাও বেশি। ৩০০ বছর ধরে যে সোনা স্প্যানিশরা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে, তার চেয়েও বেশি সম্পদ এখনো আমাদের রয়ে গেছে। আমাদের এই ল্যাটিন আমেরিকান জনগণের জন্য সেই ৫০০ বছর পূর্তি উৎসবটি হবে সবচেয়ে আনন্দের, যেদিন আমাদের কোনো বৈদেশিক ঋণ থাকবে না, যখন আমরা কারো সঙ্গে অসম বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ থাকব না এবং আমাদের উন্নয়নের সম্ভাবনা বিকশিত হবে।

সুতরাং টমাস, এ বিষয়ে এই হলো আমার সাধারণ মতামত। বিষয়টি নিয়ে আরো দীর্ঘক্ষণ আলাপ করা যেতে পারে, তবে সংক্ষেপে আমার মূল বক্তব্য হলো, এই ৫০০ বছর পূর্তিকে শুধু উৎসব হিসেবে নয়, সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিয়েই পালন করা উচিত।

টমাস বোর্জ আমেরিকার রাজনীতিতে অদূর ভবিষ্যতে কোনো পরিবর্তন ঘটবে বলে কি তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওখানকার রাজনীতির ধরনটা তো তুমি জানো। বস্তুত ওখানে একটা পার্টিই দুটো ভাগ হয়ে দুটো ভিন্ন নাম নিয়ে রাজনীতি করছে, মূলত তাদের রাজনীতির ধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য একই। দুটো দলই আসলে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হয়ে এক শতাব্দী ধরে ক্ষমতা ভাগাভাগি করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমি স্বীকার করছি সেখানেও রাজনীতিতে মেধাবী, যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। এটা অসম্ভব নয় যে হয়তো কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি কখনো আমেরিকার রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এর মূল গতিধারাকে বদলে ফেলতে পারবেন। রুজভেল্টের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছিল। রুজভেল্টকে আমি যথার্থ মেধাবী রাষ্ট্রনায়ক মনে করি। তিনি আমেরিকার পুঁজিবাদকে একেবারে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও হিটলারের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে তিনি দক্ষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যদিও আজকের আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তার চেয়েও আগ্রাসী।

টমাস বোর্জ তুমি কেনেডিকেও মেধাবী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে বিবেচনা করবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কেনেডিকে নিঃসন্দেহে একজন বুদ্ধিমান, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে, কিন্তু একজন মেধাবী রাষ্ট্রনায়কের পরিচয় দেবার সুযোগ তিনি পাননি। অল্পবয়সেই তো তিনি মারা গেলেন। কেনেডির অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণাবলি ছিল, কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতায় গেলেন তখন তিনি যথেষ্ট অনভিজ্ঞ। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই অন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্বারা এবং আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। পিগস উপসাগরীয় আগ্রাসন তার একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তিনি প্রগতির জন্য সমঝোতার নীতি নিয়েও বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন, এতে দরিদ্র জনগণের কিছু উপকার হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তারা ভয় পেয়েছিল কিউবার বিপ্লবকে। তিনি যে কিউবাতে সরাসরি অনুপ্রবেশের পরিকল্পনাটি বাতিল করেছিলেন, এটাও ছিল তার বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত। কারণ তা হলে আমাদের তো বটেই আমেরিকাকেও প্রচুর ঝামেলার মুখোমুখি হতে হতো। তিনি পিগস উপসাগরীয় আগ্রাসনের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যদিও এর মূল পরিকল্পনা ছিল আইসেন হাওয়ার এবং নিক্সনের। তিনি কিউবার ব্যাপারে আগ্রাসী মনোভাব নিয়েছিলেন, ফলে আমাদের রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। ফলে অক্টোবরে মিসাইল সংকটটি ঘটেছিল। এজন্য তিনিই দায়ী। অবশ্য তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি শান্তির পক্ষে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তিনি একজন মেধাবী রাষ্ট্রনায়ক হয়ে বেড়ে উঠছিলেন। কেনেডি এমন এক সময় মারা গেলেন যখন আমেরিকার সমাজে তার সম্মান গগনচুম্বী। কেনেডি বেঁচে থাকলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গঠনমূলক কিছু করতে পারতেন। তাঁর একটা ভুলের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে একটা বড় ভুল করেছিলেন যেটা শুধরাবার সময় তিনি পাননি। কেনেডি বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে এটুকু বিচার আমি করতে পারি।

টমাস বোর্জ কেনেডির ওপর চলচ্চিত্র তৈরি হবার পর তাকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন তার হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে। কেনেডির হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তোমার কী মনে হয়? কারা তার হত্যাকারী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ডালাসে কেনেডিকে গুলি করা হয়েছে। এ খবরটা যখন পেলাম, আমি তখন জা ডানিয়েল নামে এক ফরাসি সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। সে কিছুদিন আগেই ওয়াশিংটনে কেনেডির সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে এসেছে। কেনেডি ডানিয়েলের সঙ্গে অক্টোবরের মিসাইল সংকটের করুণ পরিণতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছিলেন এবং তিনিই ডানিয়েলকে আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে আলাপের ফলাফল তাকে জানাতে বলেছিলেন। কেনেডি নিশ্চয়ই কিছু একটা ভাবছিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছেও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছিল। আমি ডানিয়েলকে বলেছিলাম, 'চলুন আমরা শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে নিরিবিলিতে আলাপ করি।' তখন সম্ভবত দুপুর। আমরা আলাপ করছিলাম, এ সময় খবর এল। কেনেডির মৃত্যুতে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। কেনেডি আমাদের প্রতিপক্ষ ছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেউ গুলি করে হত্যা করলে যে-কেউ দুঃখ পাবেন। তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা নৃশংস। তা ছাড়া তাকে এমন সময় হত্যা করা হয়েছিল, যার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুদিন আগেই তিনি শান্তির পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এমনকি তিনি আমার কাছে একজন সাংবাদিক পাঠিয়ে সমঝোতার সূত্রপাতও করেছিলেন। কেনেডি আমাদের প্রতিপক্ষ ছিলেন কিন্তু আমরা অবশ্যই স্বীকার করব তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান প্রতিপক্ষ। কেনেডি কিউবার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই করেছেন কিন্তু আমি সবসময় বলেছি কেনেডির হত্যাকাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে আমি কষ্ট পেয়েছি। তুমি কি আমার সে সময়কার অনুভূতি জানতে চাও?

টমাস বোর্জ না, আমি তোমার এখনকার ভাবনা জানতে চাচ্ছি।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আমি সেসময়কার অনুভূতি বলছি। বেশ কিছু বিষয় আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লেগেছে তখন। টেলিস্কোপ বসানো রাইফেল দিয়ে গুলি করার বিষয়টি অদ্ভুত। অসওয়াল্ড যেখানে ছিল বলা হচ্ছে, এত দূর থেকে একটা চলন্ত গাড়িতে বসে থাকা কেনেডিকে কী করে এমন নিখুঁতভাবে গুলি করা সম্ভব? টেলিস্কোপিক রাইফেল ব্যবহারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, কারণ ১৯৫৬তে ওই রাইফেল দিয়ে আমি অন্যদের ট্রেনিং দিতাম। আমি রাইফেলগুলোকে অভিযানের আগে ৫০০ মিটার দূরের টার্গেটকে আঘাত করার উপযোগী করে নিয়েছিলাম। হাজার হাজারবার আমি ঐ রাইফেল দিয়ে গুলি করেছি। ১৯৬৩তে সেগুলো খুবই নিকট অতীতের কথা, ফলে ঐ রাইফেল দিয়ে, অতদূর থেকে চলন্ত টার্গেটে আঘাত করা অসম্ভব মনে হয়েছিল আমার। কেনেডির দেহে তিনটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এত দ্রুত তিনটি আঘাত করাও অসম্ভব। এ কাজটা একটা স্বাভাবিক অটোমেটিক রাইফেলে করা আরো সহজ ছিল। টেলিস্কোপিক রাইফেল সবসময় স্থির জিনিসকে গুলি করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং তার বেশ কঠিন কৌশল আছে। চলন্ত গাড়িতে ওই রাইফেল ব্যবহারের কথাটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তা ছাড়া হত্যাকারী বলে যাকে গ্রেপ্তার করা হলো সেও নিহত হলো পুলিশস্টেশনের ভেতর, এ ব্যাপারটিও সন্দেহজনক। অসওয়াল্ডের ব্যক্তিগত জীবনও কৌতূহলোদ্দীপক। সে সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকত এবং সেখানকার একজন মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে কি গুপ্তচর ছিল? সেটাও আমাদের স্পষ্ট করা হয়নি। আমরা এও আবিষ্কার করি অসওয়াল্ড নামের এক লোক মেক্সিকোতে আমাদের অ্যাম্বেসিতে এসেছিল কিউবাতে আসার ভিসার দরখাস্ত নিয়ে। সে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাবার পথে কিউবাতে অস্থায়ী ভিসা চেয়েছিল। সন্দেহজনক বলে সেখানকার দূতাবাস তাকে আসতে দেয়নি। কিন্তু অসওয়াল্ড কিউবাতে কেন আসতে চেয়েছিল? তাকে যদি কিউবাতে আসতে দেয়া হতো, তারপর সে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেত এবং ফিরে গিয়ে কেনেডিকে হত্যা করত, তাহলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াত? সেসময় আমি সেটাই ভাবছিলাম। আমি অপেক্ষা করছিলাম তারা কী তদন্ত করে, দেখবার জন্য। তারপর তারা বিখ্যাত ওয়ারেন তদন্ত করল। সে তদন্ত তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বুদ্ধিজীবী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাংবাদিক সবাই মেনে নিলেন। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠজনরা এই তদন্ত রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন, কারণ সেখানে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু কেউ করেনি। তবে আমি যার প্রমাণ দিতে পারব না তেমন কিছু আমি বলব না। তুমি যে চলচ্চিত্রটির কথা বললে আমি সেটা দেখিনি, তবে দেখব।

কেনেডি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যদি নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসে আমি অবাক হব না, কারণ তখনই আমার বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে অনেক গোপন তথ্যও আছে। আমেরিকার সরকার ঘোষণা করেছে তাদের কাছে গোপন কিছু তথ্য আছে যা তারা কেনেডির মৃত্যুর ১০০ বছর পর প্রকাশ করবে। কী সেই তথ্য যেগুলোকে ১০০ বছর গোপন রাখতে হবে? আমেরিকার সরকারের দায়িত্ব এই রহস্য উন্মোচন করা।

টমাস বোর্জ আমাদের দেশের লেডি অব ফাতেমার গোপন কথার মতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো লেডি অব ফাতেমার গোপন কথার ব্যাপারটি কী?

টমাস বোর্জ আমাদের লেডি অব ফাতেমা তিনটি রাখাল বালককে দেখা দিয়ে নাকি এমন এক গোপন কথা বলেছিলেন, যা ১০০ বছরের আগে প্রকাশ করা যাবে না। লোকে বলে ফাতেমা নাকি সমাজতন্ত্রের পতনের কথা বলেছিলেন। পোপের কাছে যেসব গোপন তথ্য আছে, এটাও নাকি তার মধ্যে একটা। এখন আবার আমেরিকা গোপন তথ্যের কথা বলছে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ডাইনিরা অবশ্য এমন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, ধর্ম যদিও পারে না। তবে টমাস, আমেরিকার সরকারের কাছে সত্যিই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এটা ভালো যে এসব বিষয় নিয়ে এখন আলাপ হচ্ছে। কারণ এসব রহস্য এখনো ঘোচেনি।

গণতন্ত্র

টমাস বোর্জ তোমার কাছে গণতন্ত্রের অর্থ কী, ফিদেল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সংক্ষেপে বললে লিঙ্কনের কথাটিই বলতে হয়, গণতন্ত্র হলো জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের সরকার। আমার কাছে গণতন্ত্র হলো জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটা সরকার, যারা জনতার মাধ্যমে, জনতার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছে এবং জনতার স্বার্থেই নিয়োজিত। আমার কাছে গণতন্ত্র মানে প্রতিটা নাগরিকের স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদার নিরাপত্তা। আমার কাছে গণতন্ত্র মানে ভ্রাতৃত্ব এবং সকল নারী-পুরুষের সমান অধিকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুঁজিবাদী বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এসব উপাদান নেই। যে দেশে যাবতীয় সুযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে আর অগণিত মানুষ রয়েছে বঞ্চিত সেখানে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না। একজন ভিক্ষুকের সঙ্গে একজন কোটিপতির কী ধরনের ভ্রাতৃত্ব হতে পারে? গণতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী দেশগুলো সেই এক পুরোনো গল্প, পুরোনো ফন্দির কথাই শুধু শোনায়। আসলে ওরা এমন এক ব্যবস্থা করেছে, যাতে সব সম্পদ, সব প্রচারমাধ্যম নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর বাকিরা অধিকার পাওয়ার কথা তো দূরের, অধিকারের কথা বলার সুযোগও যেন না পায়।

লোকে আদর্শ হিসেবে গ্রিসের ধ্রুপদী গণতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এথেন্সে সেসময় ৪০ হাজার ছিল নাগরিক আর ৯০ হাজার ক্রীতদাস। এদের মধ্যে ৩৫ হাজার ক্রীতদাস কাজ করত কারখানায় এবং কৃষিতে ২০ হাজার মহিলা ক্রীতদাসী কাজ করত বাড়িতে, ১০ হাজার শিশু বিভিন্নরকম ফরমায়েশ খাটত আর ২৫ হাজার ক্রীতদাস কাজ করত খনিতে। এথেন্সের প্রতিটি স্বাধীন নাগরিকের দুইয়ের অধিক ক্রীতদাস ছিল। এমনকি তৎকালীন বহুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ, দার্শনিকেরাও ক্রীতদাস রাখতেন। আমি তাদের নিন্দা করছি না। কারণ তারা তাদের সময়েরই ফসল। আসলে দাসেরা ছিল এমন এক মানুষ, যাকে অনায়াসে বেচাকেনা বা হত্যা করা যায়।

আমি বেশ অবাক হয়েই ভাবি আজ সাম্রাজ্যবাদ যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে তার সঙ্গে সেই গণতন্ত্রের আদৌ কোনো তফাৎ আছে কি? সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের বাস্তবিক চেহারা জঘন্য। সেখানে নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। টাকা না থাকলে আমেরিকায় কেউ রাজনীতি করার কথা ভাবতেও পারবে না। নির্বাচনী প্রচারণার সময় সেখানে ১০০, ২০০, ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয় শুধু বিজ্ঞাপনে। যেভাবে কোকাকোলা বা কোনো সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেয়া হয় একইভাবে দেয়া হয় নির্বাচনী বিজ্ঞাপন। এ কেমন ধারার গণতন্ত্র?

সত্যি বলতে, আমি মনে করি না, আদৌ আমাদের একটার বেশি পার্টির দরকার আছে। বিশেষ করে কিউবার মতো দেশে যেখানে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হলো ঐক্য। আমাদের সবটুকু শক্তির ঐক্যবদ্ধতা। যে কারণে আমরা এতদিন আমেরিকায় অবিরাম হুমকির মুখে টিকে আছি। দেশের মানুষ যদি ১০ ভাগে ভাগ হয়ে যেত এটা সম্ভব হতো? যে ব্যাপারটাকে গণতন্ত্র বলা হচ্ছে সেটা আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা প্রয়োগের হাতিয়ার মাত্র। আমার কাছে গণতন্ত্রের অর্থ ভিন্ন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের কিউবার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এথেন্স যে গণতন্ত্রের শীর্ষস্থান ছিল একথা তুমি বলতে পারো না কারণ এথেন্স ছিল একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজ। একজন দ্বারা অন্যের শোষিত হওয়ার অবস্থা যেখানে অব্যাহত আছে সেখানে গণতন্ত্রের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যতদিন মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাজ করছে, ততদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

টমাস বোর্জ অন্য দেশের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারটা তুমি কীভাবে দ্যাখো? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য দেশের প্রতি আনুগত্যও কি দূর করা উচিত? অন্যদেশের ওপর নির্ভরশীল একটা দেশ কি গণতান্ত্রিক হতে পারে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো না, সে দেশ গণতান্ত্রিক হতে পারে না। এমনকি যে দেশে সামাজিক বৈষম্য, বেকারত্ব, চিকিৎসা, শিক্ষার অভাব রয়েছে সেখানেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। যে দেশের ব্যাপক মানুষ প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডিই পেরুতে পারে না, সেখানে তুমি কীভাবে গণতন্ত্রের কথা বলো? আমি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা বলছি। সেখানকার মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম কোনো অধিকারই তো নেই। এসব দেশের মানুষদের পক্ষে সরকার গঠনে যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ অসম্ভব। এখানে বাস্তবিক যা ঘটে তা হলো একটা স্থায়ী গৃহযুদ্ধে এসব দেশের সমাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে সরকার-বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। ফলে তারা কখনোই তাদের মূল সমস্যাগুলোই সমাধান করতে পারে না। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ সেসব দেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রাখে।

টমাস বোর্জ এটা বলা হয় যে, বহুদলীয় রাজনীতি জনতাকে বিভক্ত করারই একটা কৌশল।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো অন্তত আমার দেশের ক্ষেত্রে আমি তো এ বক্তব্যকে সত্য বলেই মনে করি। ল্যাটিন আমেরিকার ২০০ বছরের ইতিহাসের আমি তো এই বহুদলীয় ধারণার কোনো সাফল্য দেখছি না। এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার বর্তমান এই ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমি তো এ-ধারণার ব্যর্থতাই শুধু দেখছি। আমি মনে করি, যদি সম্ভব হয় এসব দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটা ঐক্য গঠন করা উচিত।

টমাস বোর্জ ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ধারায় কি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ইউরোপের পরিস্থিতির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরিস্থিতির তুলনা চলে না। তারা ধনী, উন্নত, তারা সারা বিশ্বকে শোষণ করে, লুট করে বেশ একটা জোরদার রাজনৈতিক কাঠামো, জীবনযাত্রার ভালো একটা মান গড়ে তুলেছে। আজকে তারা যে মানের জীবন যাপন করছে, এই স্বাচ্ছন্দ্য তো তারা অর্জন করেছে তৃতীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের সব ঔপনিবেশিক এবং নয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলো লুট করেই। তারা তাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই বিপুল সম্পদের কিছুটা বিলিয়ে দিয়ে একধরনের সামাজিক শান্তি বজায় রাখার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছে। তারা যে সরকার গঠন করেছে সেটাকে একদলের শাসন না বললেও একশ্রেণির শাসন বলা যেতে পারে। নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে, পারস্পরিক কিছুটা মতভেদের সুযোগ রেখে তারা একটা শাসকশ্রেণি গড়ে তুলেছে এবং এরা এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যাতে কোনো কিছুই আর তাদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়। তাদের সরকারের সদস্যরা ধনী এবং তারা শান্তিতেই থাকে, কেউ তাদের বিশেষ বিরক্ত করে না। ইউরোপীয় পরিস্থিতি তৃতীয় বিশ্বের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষভাবে কিউবার কথা চিন্তা করো। সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমাগত আক্রমণ, অবরোধ, হুমকির মুখে অস্তিত্বরক্ষার জন্য আমাদের কী অবিশ্বাস্য শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে।

তা ছাড়া এখন ইউরোপের নাগরিকরা তো আর কোনো পরিশ্রমের কাজই করে না। সেসব কাজ সেখানে তাহলে কে করে? করে আফ্রিকান, আলজেরিয়ান, টার্কি আর এশিয়ানরা। এরাই সব বাড়িনির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে ক্ষেতে ফসল লাগানোর কঠিন কাজগুলো করে। এ এক নতুন ধরনের দাসপ্রথা, সেই গ্রিক যুগের মতো বর্বর না হলেও এক নতুন ধারার ক্রীতদাস প্রথা।

এই ব্যবস্থার মধ্যে তারা মতপার্থক্যের সুযোগও রেখেছে কিন্তু মতপার্থক্য অবশ্যই এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেই। প্রচারমাধ্যম, অর্থ, সম্পদ, শক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার করে এরা এই একচেটিয়া ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে।

শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই শোষণব্যবস্থা বলবৎ আছে। জাতিসংঘের দিকে তাকালেই পশ্চিমা ধারার গণতন্ত্রের একটা নমুনা তুমি পাবে। প্রায় ১৮০টি স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এ সংখ্যা নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে, কিন্তু ভেটো দেয়ার ক্ষমতা আছে শুধু পাঁচটি দেশের।

যদি সবগুলো দেশ মিলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো একটা বিষয়ে একমত হয় তবুও ভেটোর ক্ষমতাধারী একটা মাত্র দেশ সেটাকে নাকচ করে দিতে পারে। একে এরা বলে গণতন্ত্র। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটা গণতন্ত্রের নমুনা হতে পারে? ব্যাপারটা যদি জনসংখ্যার দিক থেকে দেখা যায়, তাহলে লক্ষ করে দ্যাখো, মাত্র ৫ কোটি অধিবাসীর একটা দেশের ভেটো দেয়ার অধিকার আছে অথচ ৮০ কোটি জনতার দেশ ভারতের সেই অধিকার নেই, ১৫ কোটি অধিবাসীর দেশ ব্রাজিল কিংবা ১০ কোটি অধিবাসীর দেশ নাইজেরিয়ার সে অধিকার নেই। ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যাও ১০ কোটির উপর অথচ তাদের ভেটো দেয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকেও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা দ্যাখো, জাপানের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তারা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয়, তাদের ভেটো দেয়ার অধিকারও নেই। জার্মানির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, জাতিসংঘের এক প্রাগৈতিহাসিক সুবিধাবাদিতার নীতি বিরাজ করছে। আমি তাই সবসময় বলি, গণতন্ত্র নিয়ে কিছু বলবার আগে জাতিসংঘের ভেতরে গণতন্ত্র আনো।

জাতিসংঘের কাঠামোতে পরিবর্তন এনে এটাকে আরো গণতান্ত্রিক করা উচিত, যাতে সেটা যথার্থই পৃথিবীর সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। আমেরিকা ক্রমশই জাতিসংঘের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে এবং পৃথিবীর ওপর এদের আধিপত্য কায়েমের জন্য জাতিসংঘকে ব্যবহার করছে। এ বিষয়গুলো এখন লক্ষ করা দরকার।

টমাস বোর্জে রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের চর্চা ছিল না বলেই কি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর এই পতন ঘটল বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আসলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বিরাজ করছিল একটা কৃত্রিম সমাজ ব্যবস্থা। কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে ওগুলোর জন্ম হয়নি। তার পরও আমি মনে করি পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষের এমন অনেক অধিকার ছিল, যা পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ছিল না। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেসব দেশে অনেক মানবিক সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো পতনের মূল কারণ এসব সমাজ প্রতিষ্ঠার পেছনে বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না। সেইসঙ্গে সেখানে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ছিল অগণিত ভুলভ্রান্তি, নেতা আর জনতার মধ্যে ছিল পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান। হয় জনগণের সঙ্গে নেতাদের কখনো কোনো সম্পর্কই ছিল না অথবা একসময় সে সম্পর্ক থাকলেও তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তাদের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল ভুল, অবহেলা। তারা উন্নয়নের জন্য পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিল। চে বহু আগে এই পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে গেছেন। সেখানে ভোগবাদই আদর্শ হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, নীতি সব ভুলে গিয়ে সর্বব্যাপী এক ভোগবাদে মেতে উঠেছিল। টমাস, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সান্দানিস্তা সরকার যখন আমেরিকার আগ্রাসনের মুখে কঠিন সময় অতিবাহিত করছে, তখন ইউরোপীয় সেইসব সমাজতান্ত্রিক দেশের একটাও নিকারাগুয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। তাদের আন্তর্জাতিক সচেতনতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, মার্কসবাদের এই মূল আদর্শ থেকেই তারা বিচ্যুত হয়েছিল। সেখানে ব্যাপক সামাজিক বৈষম্যও দেখা দিয়েছিল। পশ্চিমাদের বিজ্ঞাপনের তোড়ে পুরো দেশ ভোগবাদে আকৃষ্ট হয়েছিল। এসব নানা কারণ মিলে সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিল, ফলে সাম্রাজ্যবাদ তার উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ পেয়েছে। যেসব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের নীতি মানতে সম্মত হয়েছে, তাদের ওরা সাহায্য করেছে। এসব দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় আমেরিকার ষড়যন্ত্র করতে সুবিধা হয়েছে।

ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভাঙনের কারণ গণতন্ত্রের অভাব নয়, এর কারণ বিপ্লবী সচেতনতা, বিপ্লবী নীতি এবং যথার্থ বিপ্লবী পদ্ধতির অভাব। যদি গণতন্ত্রের অভাবই একটা দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙনের কারণ হয়, তাহলে পুঁজিবাদী দেশগুলো তো অনেক আগেই ভেঙে যেত; কারণ পুঁজিবাদ গড়েই উঠেছে জবরদস্তির ওপর ভিত্তি করে। এখনো সর্বত্র ঐ জবরদস্তি ব্যবস্থাই চলছে। ছাত্ররা যদি প্রতিবাদে রাস্তায় নামে, শ্রমিক, বস্তিবাসীরা যদি মিছিল করে, তাহলে তাদের ওপর নেমে আসে পুলিশ বাহিনী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে আছে সূক্ষ্ম পর্যায়ের, সুসংগঠিত জবরদস্তির ওপর।

বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর আমাদের দেশে গত ৩০ বছরে ছাত্র, জনতা কারো ওপর এরকম শক্তিপ্রয়োগের নজির নেই। আমাদের করতে হয়নি কারণ এখানে সরকার এবং জনতার মধ্যে একটা বন্ধন আছে, সমঝোতা আছে। কেন আমাদের এখানে সম্ভব হলো আর ইউরোপীয় দেশগুলোতে সম্ভব হলো না? কেন ঐসব দেশ থেকে প্রতিদিন খবর আসে রাস্তায় নেমেছে পুলিশ, কাঁদানে গ্যাস, কুকুর? তুমি বলো কোন্ ব্যবস্থায় অধিক ভ্রাতৃত্ব, একতা? আর কোন্ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হয় নির্যাতনের মাধ্যমে? এসব বিবেচনা করে তুমি ওসব দেশকে কিছুতেই গণতান্ত্রিক বলতে পারো না।

টমাস বোর্জ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এমনকি অনেক প্রগতিশীল নেতাও বলছেন কিউবাকে আরো গণতান্ত্রিক করা উচিত। অর্থাৎ আমার ধারণা, তারা বলতে চাইছেন, কিউবাতে যারা এই ব্যবস্থার প্রতি একমত পোষণ করেন না, তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো দ্যাখো টমাস, একথা সত্য যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর ব্যাপক ভাঙনের এই আঘাতের পর সর্বত্রই প্রগতিশীল আন্দোলনে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সুবিধাবাদিতার সুযোগ ঘটেছে। অনেক সাবেক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাষ্ট্র এখন উল্টো রাস্তা ধরতে চাইছে। সেইসঙ্গে এও সত্য যে, অনেকেই আমাদের দেশের সরকার কাঠামো, সংবিধান, নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবে কিছুই জানেন না।

আমি বলছি না যে আমাদের ব্যবস্থাটিই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। সেইসঙ্গে আমাদের ওপর সর্বকালের সর্বাধিক চাপ এবং ঝুঁকির এই বর্তমান মুহূর্তে কোনো আদর্শগত ভুলকে সামাল দেয়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই। আমাদের দেশে এখন একটা আদর্শ পরিস্থিতি বিরাজ করছে এরকম ভান করে দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা ছেলেখেলাও করতে পারি না। আমরা আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের সঙ্গে কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে আমরা তার বিরোধিতা করি না। কিউবাতে সংগ্রাম মূলত দুই দলের মধ্যে। একদিকে কিউবার জনতা, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ। এর মাঝামাঝি তৃতীয় কোনো অবস্থান নেই। হয় তুমি বিপ্লবের পক্ষে নয়তো তুমি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। আমাদের জনগণের মধ্যে যারা প্রতিবিপ্লবী, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ধারক, আমরা তাদের সহায়তা করতে পারি না। সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা হোক, এমন কোনো কাজই আমরা করব না।

কথা হচ্ছে, আমাদের বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক অবরোধ আছে, আমেরিকার যে অবিরাম হুমকি আছে, অপপ্রচার আছে, আগে আমাদের সেগুলোর সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হতে দাও, তারপর আমরা, যারা ভিন্নতর রাজনৈতিক ফর্মুলার কথা বলছেন তাদের কথা শুনব। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যখন আমাদের আদর্শের পক্ষে জীবন-মরণ লড়াই হচ্ছে, সেই রণক্ষেত্রের মাঝখানে ওসব শোনার সময় আমাদের নেই। যারা আমাদের বিপ্লব, আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চায় তাদের কথা বলবার সুযোগ তৈরি করে দেয়ার মতো বোকা আমরা নই। ব্যাপারটাকে আমরা এভাবেই দেখি। আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে প্রতিবিপ্লবীদের কথা বলার সুযোগ আমরা দেব না কারণ এ মাধ্যমগুলো এদেশের জনগণের।

কিউবার মতো আর কোনো দেশে সরকার এবং জনগণ এত ঘনিষ্ঠ আছে বলে আমি মনে করি না। এ দেশের জনতা বলতে পারে 'আমিই রাষ্ট্র'। কারণ জনগণের ক্ষমতা আছে, তারা সশস্ত্র, তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে। সশস্ত্র জনতার এই শক্তি ছাড়া কিউবার সরকারের আর কোনো শক্তি নেই।

লক্ষ করো, আমাদের প্রতিটি মানুষের শুধু ভোট দেয়ার অধিকার নেই, ব্যক্তিগতভাবে অস্ত্র রাখারও অধিকার আছে কৃষকের, শ্রমিকের, ছাত্রের সবার। কল্পনা করে দ্যাখো তো ইউরোপের কোনো দেশে যদি কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রের হাতে অস্ত্র থাকত তাহলে কী হতো? ঐ দেশের শোষিত মানুষের হাতে যদি অস্ত্র থাকত কী হতো? এজন্যই আমি বলছি, কিউবার মতো আর কোনো দেশে সরকার জনগণের এত ঘনিষ্ঠ নয়। এখানকার জনগণের হাতের এই অস্ত্রই প্রমাণ করে এদেশের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব। প্রমাণ করে একটা ন্যায়সঙ্গত সমাজতান্ত্রিক ধারার সমাজেই একমাত্র গণতন্ত্র সম্ভব।

টমাস বোর্জ লোকেরা সংস্কার এবং প্রতিরক্ষার দ্বন্দ্বের কথা বলে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কী ধরনের দ্বন্দ্ব?

টমাস বোর্জ তোমরা তো কিছু সংস্কারের কথা বল[illegible] দে[illegible] প্রতিরক্ষাকে বিপন্ন না করে কতটুকু পরিবর্তন সম্ভব?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমরা জনগণের শক্তিকে বাড়াবার চেষ্টা করছি।

টমাস বোর্জ এ ব্যাপারে তোমরা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো যেমন, আমরা হাভানায় ৯৩টি 'পিপলস কাউন্সিল' গঠন করেছি। হাভানার জনসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন, এখানে ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে। আমরা মিউনিসিপালের মূল কেন্দ্র থেকে দূরে প্রান্ত অঞ্চলে কাউন্সিলগুলো গঠন করেছি। এই কাউন্সিলগুলোর ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। এই কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা সকলেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই কাউন্সিরের প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। এই কাউন্সিল মিউনিসিপালের শিল্প এবং বাণিজ্য অঞ্চলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমাদের সামাজিক কাঠামোর উন্নতির প্রশ্নেই এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি আমরা গড়ে তুলেছি।

আমরা জাতীয় সংসদের সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনেরও ব্যবস্থা করছি। তার মানে এই নয় যে আগে আমাদের সংসদ সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতিটি অগণতান্ত্রিক ছিল। বরং তখন নির্বাচন পদ্ধতিটি সরাসরি ছিল না। জনগণ মিউনিসিপালে সংসদের সদস্যদের নির্বাচন করত। এই সদস্যরা প্রাদেশিক সদস্যদের নির্বাচন করত এবং তারপর প্রাদেশিক সদস্যরা, জাতীয় সদস্যদের নির্বাচন করত। এ পদ্ধতি এখন পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন জনগণ সরাসরি জাতীয় সংসদের সদস্যদের নির্বাচিত করে।

টমাস বোর্জ : কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য নয়, এমন কেউ কি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিশ্চয়ই। আমাদের জাতীয় সংসদে অনেক সদস্য আছেন, যারা পার্টির সদস্য নয়। আসলে কিউবায় প্রার্থী মনোনয়ন বিষয়ে বহির্বিশ্বে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। পার্টি এখানে কখনো নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়ন দেয় না। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জনগণ তাদের অঞ্চলে দুই থেকে আটজন প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয়। তাদের মধ্য থেকে একজন ভোটে নির্বাচিত হয়। প্রতি নির্বাচনী এলাকার জনগণের নিজস্ব একটা সম্মেলনের মাধ্যমে তারা তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করে, সে প্রার্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই মনোনয়নের ব্যাপারে পার্টির কোনো ভূমিকা নেই। মনোনীত প্রার্থীর মধ্যে যিনি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবেন, তিনিই ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধি হবেন। যদি ৫০ শতাংশের কম ভোট পান, তাহলে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত দুজনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন হবে।

এ ব্যবস্থা বহুদলীয় নির্বাচনের চেয়ে গণতান্ত্রিক বলে আমি করি। বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনগণ নয়, পার্টি প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। সুতরাং, নির্বাচনের আগেই তুমি অঙ্ক করেই বলে দিতে পারো, কে জিতবে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রার্থী মনোনয়ের ক্ষেত্রে পার্টির

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছু বলার নেই। ফলে কেউ বলতে পারে না কে জিতবে। আর কোন্ দেশে এ ব্যবস্থা আছে বলো?

তা ছাড়া, আমরা সংবিধান সংশোধন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগের মতো আর জাতীয় সংসদের সদস্যদের নির্বাচন করতে পারবেন না বরং তারা কেবল প্রার্থীদের মনোনীত করবেন, যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন সরাসরি জনগণের ভোটে। জাতীয় সংসদের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পার্টির কোনো হস্তক্ষেপ নেই। প্রার্থী মনোনীত করছেন বিভিন্ন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে জনগণ। জনগণ তাদের প্রতিনিধি হিসেবে যে-কাউকে নির্বাচিত করতে পারে এবং প্রতিনিধিরা যে-কাউকে মনোনীত করতে পারে। এই পদ্ধতিতেই জনগণের শক্তি বাড়ানো এবং গণতন্ত্রকে দৃঢ় করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি এই পদ্ধতি নিয়ে অনেকগুলো কমিশন গবেষণাও করছে। এভাবেই আমরা নির্বাচনের ক্ষমতা পার্টি নয়, জনগণের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এর চেয়ে উন্নততর গণতন্ত্রের চর্চা কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পাচ্ছি। যেভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার সমর্থন ছিল বলে তা টিকে আছে।

জনগণ স্বাভাবিকভাবে যোগ্যতম প্রার্থীকেই নির্বাচিত করে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ যোগ্য প্রার্থীই পার্টির সদস্য। তবে পার্টির বাইরেও রয়েছেন অনেক ভালো, মেধাবী ব্যক্তি—জনগণ যাদের নির্বাচিত করেন। যে মেধাবী ব্যক্তি পার্টিতে তার শ্রম নিয়োগ করেন তিনি হয়তো খানিকটা বাড়তি ত্যাগ স্বীকার করেন।

সাম্প্রতিক কিউবা

টমাস বোর্জ বর্তমান পরিস্থিতিতে কিউবা তার নীতিতে অটল রয়েছে। দেখা যাচ্ছে কিউবা তার সামরিকখাতের ব্যয়ও কমায়নি। তাতে মনে হচ্ছে, কিউবা আমেরিকার কাছ থেকে একটা সামরিক আগ্রাসনের আশঙ্কা করছে। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার সঙ্গে কিউবার কোনো সংলাপের কি সম্ভাবনা আছে? যদি এ ধরনের কোনো সংলাপ হয়, সেক্ষেত্রে তোমার এজেন্ডা কী হবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এটা সত্যি যে আমরা আমাদের সামরিক খাতের ব্যয় কমাইনি। আমাদের কোনো উপায় নেই। বিশাল এক শক্তির সামনে আজ আমরা একা, আমাদের নিজস্ব শক্তি ছাড়া আজ আমাদের আর কোনো সম্বল নেই। এ অবস্থায় আমাদের প্রতিরক্ষার দিকে নজর না দিলে সেটা হবে চরম বোকামি এবং আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুতরাং এ পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষাকে আমাদের অগ্রাধিকার দিতেই হবে, এই আত্মত্যাগটুকু আমাদের করতেই হবে।

হ্যাঁ, ভয়ের কারণ তো আছেই, অতীতে যেকোনো কালের চেয়ে এখন ভয়ের কারণ বেশি। কারণ আমেরিকা এখন ভাবতে শুরু করেছে যে এ পৃথিবীটা তাদেরই সম্পত্তি। নিজেদের শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রের ওপর তাদের এখন এক অদ্ভুত অন্ধ, উন্মাদনাপূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে। যেকোনো দেশের ওপর অবলীলায় তারা তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারে বলে তারা ধারণা করছে। কিউবার মতো ছোট্ট একটা দেশ তাদের চোখের সামনে এভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্তে অটল থাকবে, সেটা নিশ্চয়ই আমেরিকার কিছুতেই পছন্দ হবার কথা নয়। সুতরাং আমাদের কোনো সংলাপ হবার আগে আমেরিকার নেতাদের চিন্তাচেতনার একটা পরিবর্তন হওয়া জরুরি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেরকম কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

আমেরিকা ভেবেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমরা খুবই নাজুক অবস্থায় পড়ে গেছি, সুতরাং এখন তারা যেকোনোভাবে আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে পারবে, তার মানে আমি একথা বলতে চাইছি না যে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অনেক আমেরিকাবাসীই এখন কিউবার প্রতি আমেরিকান সরকারের বিরূপ আচরণ, অর্থনৈতিক অবরোধ এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। অর্থনৈতিকভাবে কিউবাকে এভাবে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্র করে এদেশের লাখ লাখ মানুষের দুঃখভোগকে বাড়িয়ে তোলার কী অর্থ থাকতে পারে? আমেরিকার জন্য যে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের হুমকি ছিল সেটা তো ধ্বংসই হয়ে গেছে তবুও কেন এমন আচরণ, বহু সাধারণ আমেরিকাবাসী এখন এসব জানতে চাচ্ছে। কারণ নেহাত উন্মাদ না হলে কেউ এমন আচরণ করে না। এসব আচরণ আমেরিকার জন্য মোটেও গৌরবজনক নয়। এতে বরং কিউবারই লাভ হচ্ছে। আমেরিকা যত কিউবার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, ততই ল্যাটিন আমেরিকা এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশসহ সারাবিশ্বই কিউবার প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে। আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের বোঝা উচিত কিউবার প্রতি তাদের এসব পদক্ষেপ মোটেও তাদের মর্যাদা বাড়াচ্ছে না। আমেরিকা কি একটা দীর্ঘস্থায়ী গণ্ডগোল বাধিয়ে রাখতে চায়? কিন্তু কিউবা তো কোনোদিন আত্মসমর্পণ করবে না। আমাদের অগণিত মানুষ যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সুতরাং আমেরিকা যতই কিউবার ওপর আঘাত হানবে ততই কিউবার বিপ্লব আর বিপ্লবীদের মর্যাদা বাড়বে।

আমেরিকাকে তার নীতি বদলাতে হবে। অবশ্য আমরা আশা করছি না এখনই তারা এই বদল ঘটাতে পারবে, কত দিন লাগবে সেটা বলাও দুষ্কর। তবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে চালাক সিদ্ধান্তটি হবে কিউবা বিষয়ে নীতিমালা পরিবর্তন করা। অবশ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিউবার বুক থেকে বিপ্লবী চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার স্বপ্ন তারা সহজে ত্যাগ করবে না। এক্ষেত্রে তাদের দুটো পথ খোলা আছে। এক, কিউবার দিকে আগ্রাসী পদক্ষেপ অব্যহত রাখা। দুই, কিউবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শান্তি রক্ষা করা এবং কিউবার রাজনীতিকে প্রভাবিত করার ভিন্নপথ অবলম্বন করা। আমরা অবশ্য তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত না হয়ে প্রস্তুত হচ্ছি তাদের আগ্রাসনকে মোকাবিলার জন্য। কারণ গত ৩০ বছর ধরে আমরা ওটাতেই অভ্যস্ত। অবশ্য তাদের প্রস্তাবের জন্যও আমরা প্রস্তুত আছি। কারণ আমাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রস্তাব দিয়ে ভিন্নপথে আমাদের প্রভাবিত করবার পরিকল্পনাও আমেরিকার থাকবে। সুতরাং নানারকম হিসাব-নিকাশ করে আমেরিকা যদি দেখে আমাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই তাদের জন্য লাভজনক এবং সেজন্য তারা যদি সংলাপের প্রস্তাব দেয়, সেটাকে গ্রহণ করতেও আমরা প্রস্তুত আছি।

তুমি এজেন্ডার কথা বলছিলে। এজেন্ডা অনেক কিছুই হতে পারে। প্রথম কথা, আমরা কোনো নীতি বিসর্জন দিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নই। আমেরিকার এবং কিউবার পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে আলাপ হতে পারে কিন্তু প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি তাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক অবরোধের প্রসঙ্গ ছাড়াও, গুয়েনটানামো নৌঘাঁটি বিষয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি। ঐ ঘাঁটিটি আমাদের অঞ্চলে, কিন্তু সেটা তারা দখল করে রেখেছে। সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে আমরা যেকোনো বিষয়েই আলোচনা করতে পারি। তবে এজেন্ডা নিয়ে এত তাড়াহুড়োর দরকার আছে বলে মনে হয় না কারণ খুব নিকট-ভবিষ্যতে সংলাপের কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না।

টমাস বোর্জ : আমেরিকায় যে কিউবান জনগোষ্ঠী আছে, তারা কি এই সংলাপের ক্ষেত্র তৈরিতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমেরিকায় যে কিউবানরা আছে তাদের অধিকাংশই প্রতিবিপ্লবী। তারা কিউবার বিপ্লবকে ঘৃণা করে। তবে এমন অনেকেই আছে, যারা তাদের মতো নয়, তারা কিউবার প্রতি আমেরিকার বৈরিতার বিরোধিতা করে। তাদের আত্মীয়স্বজন কিউবাতে আছে, তারা চায় সকলে নিরাপদে থাকুক। কিছু স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী লোক আছে, যারা প্রবাসী কিউবানদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু আমি এও জানি, অনেকেই এখন আর তাদের পছন্দ করে না। এ ধরনের মানুষেরা একদিন কিউবাকে শাসন করলে কী অবস্থা দাঁড়াবে, এটা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু বিপ্লব আমাদের মানুষদের প্রস্তুত করেছে, তারা আর কাউকেই সুযোগ দেবে না তাদের শাসন করার জন্য। তারা কিউবাকে আর একটা পোর্টোরিকোতে পরিণত হতে দেবে না, যে পোর্টোরিকো এখন পরিণত হয়েছে ড্রাগ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তির বড় আখড়ায়। প্রবাসী কিছু অদ্ভুত লোকজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনও পরিকল্পনা করছে কীভাবে তারা এদেশ দখল করে, দেশের জমি, ফ্যাক্টরি ইত্যাদিকে ভাগবাটোয়ারা করবে। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে তাদের ওই ইতর অভিপ্রায় পূরণের আগে একে একে আমাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। তবে এ ধরনের মানুষজন ক্রমশই তাদের সমর্থন হারাচ্ছে যদিও তাদের সম্পদ আছে আর আছে সন্ত্রাসী পথ। অবশ্য আমেরিকায় কিউবান প্রবাসী গোষ্ঠী মোটেও একই চরিত্রের একটা জনগোষ্ঠী নয়। তাদের মধ্যে যেমন স্বার্থান্বেষী মানুষ রয়েছে, তাদের বিরোধীও আছে।

টমাস বোর্জ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি আছে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে 'প্যারালাল লাইফ' নামে একটা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা অচিরেই সারা পৃথিবীতে প্রদর্শিত হবে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ছবিটা কোথায় তৈরি হয়েছে ?

টমাস বোর্জ ভেনিজুয়েলায়, এটা কিউবান-ভেনিজুয়েলান-স্প্যানিশ যৌথ প্রযোজনা।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো ছবিটার সঙ্গে তুমি কি জড়িত?

টমাস বোর্জ আমি চিত্রনাট্য নির্বাচনের জুরি বোর্ডে ছিলাম। আমি এই ছবিটিকে ভোট দিয়েছিলাম। ছবিটি হাভানা ফিল্ম উৎসবে পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটি সত্যিই ব্যতিক্রমধর্মী।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি ছবিটি দেখিনি। গত কয়েক মাসে আমি কোনো ছবি দেখার সময় পাইনি।

টমাস বোর্জ ছবিটা এখনো বাইরে কোথাও দেখানো হয়নি। আমরা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম সে প্রসঙ্গেরই চমৎকার ছবি এটা। এখন সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে দেখা যাচ্ছে এই দেশদ্রোহী দল গোপনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আঁতাত করতে চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তারা কতটুকু সফল হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তারা সেরকম দেশদ্রোহী সংঘবদ্ধ দল হিসেবে গড়ে উঠেছে বলে আমি মনে করি না। তারা সব শেকড়ছাড়া মানুষ। এদেশের মানুষের ওপর তাদের কোনো প্রভাব নেই। তুমি তো এখানকার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র সকলকেই দেখেছ। আমাদের জনগণের শ্রেষ্ঠ অংশ নিঃসন্দেহে বিপ্লবের পক্ষে। যদিও তাদের অনেক অভিযোগ আছে, সমালোচনা আছে তবুও যখনই তাদের বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে একটা পক্ষ নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, তারা তখন নির্দ্বিধায় বিপ্লবেরই পক্ষ নেয়। শত্রুপক্ষের সেরকম নানা ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ আরো গভীর হচ্ছে। যদিও জনগণের একটা অংশ নিশ্চয়ই ঐসব কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিতও হচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেশে প্রতিবিপ্লবকে উসকে দেবার জন্যে প্রতি সপ্তাহে ৫০০ ঘণ্টার রেডিও অনুষ্ঠান প্রচার করে আমেরিকা। কোনো একটা দেশের বিরুদ্ধে প্রচারমাধ্যমের এত দানবীয় ব্যবহারের নজির ইতিহাসে নেই। আমেরিকা এখন তার গোয়েন্দা বিভাগ, তথ্য বিভাগের পেছনে অসংখ্য বিলিয়ন ডলার খরচ করছে শুধু কিউবার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য।

টমাস বোর্জ তোমরা কি আমেরিকায় কোনো রেডিও সম্প্রচার করো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো খুব সম্প্রতি আমরা একটা রেডিও সম্প্রচার করেছি, বাধ্য হয়েই। তবে প্রচারের জন্য নয়, ওদের টেলিভিশন সিগন্যাল বন্ধ করার জন্য। তারা রেডিও মার্তি এবং টেলিভিশন মার্তি এই বিভ্রান্তিকর নাম দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে তথ্য পাঠাবার জন্য সিগন্যাল চালু করেছিল। আমরা এই সিগন্যালে বাধা দেয়ার জন্য রেডিও সম্প্রচার করেছি।

তবে আমেরিকাতে বেতার-তরঙ্গ পাঠানোর অধিকারও আমাদের আছে। আমাদের কথা আমেরিকার শ্রোতাদের শোনানোর অধিকার আমাদের আছে, যেমন ওরা আমাদের শ্রোতাদের ওদের কথা শোনাচ্ছে। যদিও এভাবে আমরা এযাবৎ তাদের আগ্রাসনের জবাব দিইনি, তবে পরিস্থিতি বাধ্য করলে আমরা তা করব। তার উপায়, অধিকার এবং প্রতিজ্ঞা আমাদের আছে।

অস্তিত্বের সংগ্রাম

টমাস বোর্জ : অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কিউবার যে সংগ্রাম, সে সম্পর্কে আলাপ করা যাক। তোমাদের বর্তমান অবস্থা কীরকম, কী পদক্ষেপ তোমরা নিচ্ছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তোমার প্রশ্ন একটা হলেও, বিষয়টি ব্যাপক। তবু সাক্ষাৎকার যাতে অনন্তকাল না চলে, সেজন্য সংক্ষেপে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের সংস্কার প্রক্রিয়ায় আমরা অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মসূচি পরিচালনা করছি। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৯৮৬ সাল থেকে এবং আমরা যথার্থই আমাদের সম্পদ এবং মানবশক্তিকে আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারছি।

যদিও আমাদের সম্পদ ইতিমধ্যে কমে এসেছে তবু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করছি। ১৯৮৬-৮৭-৮৮ সালের দিকে আমাদের ব্যাপক মুদ্রা-সংকট দেখা দেয়, তবু সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যবসা অব্যাহত থাকায় সেখান থেকে আমাদের উল্লেখযোগ্য উপার্জন হতো। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাসস্থান সমস্যা সমাধানে আমরা ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি, চাকরিজীবী মায়েদের জন্য অনেক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র খুলেছি, স্কুল থেকে নানা কারণে বাদ পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি স্কুল খুলেছি। আমরা ইট, বালু, সিমেন্ট, টাইলস, স্টিল বার ইত্যাদি গৃহনির্মাণ সামগ্রীর শিল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। এ সময় আমরা আরো বিশেষ কিছু পরিকল্পনাও নিয়েছি, যেমন—খাদ্য পরিকল্পনা, পর্যটন, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাসিউটিক্যাল, মেডিকেল যন্ত্রপাতির শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি।

১৯৮৭-৮৮-৮৯ ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেল, পতন শুরু হলো সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের। ১৯৮৯-এর ২৬ জুলাই কামাগুয়ে ভাষণে আমি সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম, যা অনেককেই অবাক করেছিল তখন। আমি বলেছিলাম—

স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ এবং বুশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংকট দেখে শূন্যে প্রাসাদ তৈরি করতে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে একটা সংকটের মুখে পড়েছে, সেটা আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। সাম্রাজ্যবাদ আশা করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়েনের বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, এ ছাড়াও নানা অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে, সাইবেরিয়া, ডনেটস্ক এবং অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার খনি-শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেছে। এইসব খবরে সাম্রাজ্যবাদীরা খুব উৎফুল্ল।

আমাদের এই বিপ্লবের বার্ষিকীর দিনে, এমন একটা ক্রান্তিকালে, আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় যৌক্তিকভাবে সবকিছু ভাবতে হবে। আমরা কি আমাদের এগিয়ে যাওয়ার এই মহান উদ্যোগকে বন্ধ করে দেব? না, কখনো না। আমরা কি বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকব? না, তাও না। আমরা কি উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকব। না, কখনো না।

ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চাইতে, এখন আমাদের আরো বেশি বাস্তবমুখী হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে যে, আমাদের বিপ্লব নিয়ে তারা যেন কল্পনার জাল না বোনে, তারা যেন না ভাবে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংকটকে আমাদের বিপ্লব মোকাবিলা করতে পারবে না। যদি কাল কিংবা কোনোদিন এমন সংবাদও শুনতে হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এমনকি যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেও যায়, যা আমরা আশা করি ঘটবে না, যদি ঘটে, তবুও কিউবা এবং কিউবার বিপ্লব মাথা উঁচু করে তাদের সংগ্রাম অব্যহত রাখবে।

মনে রেখো, সোভিয়েতের ভাঙনের আড়াই বছর আগে আমি একথা বলেছিলাম স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যাবতীয় কর্মসূচি একটা চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাকে আমাদের খাদ্য পরিকল্পনার কথা বলছিলাম। এটা ছিল একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে এটা শেষ হওয়ার কথা ছিল। একটা পর্যায় ছিল আমাদের পানি-প্রকল্পের সংস্কার। কিন্তু এই প্রকল্প আর বাস্তবে রূপ নেয়নি। একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল আমাদের শহর-সংস্কারের পরিকল্পনা। শহরে গৃহ তৈরি হচ্ছিল কিন্তু রাস্তা তৈরি হচ্ছিল না, স্কুল তৈরি হচ্ছিল না। আসলে এগুলো হচ্ছে পুঁজিবাদী নিয়ম, ভাবা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এ নিয়ম চলবে।

টমাস বোর্জ নির্মাণ প্রকল্পে সংস্কার প্রক্রিয়া কি তখনই শুরু হয়েছে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমরা ঐসব পদ্ধতির চরম ব্যর্থতা লক্ষ করছিলাম। আমরা নীতিমালার সংস্কার করে নতুন সমন্বিত প্রকল্প হাতে নিই। আমরা বিশেষ কিছু ব্রিজ নির্মাণের কাজ হাতে নিই। এটা ছিল আমাদের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে আমরা শ্রমিকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করি। কাজের মাত্রা দ্বিগুণ, তিন গুণ এমনকি চার গুণও বেড়ে যায়। আমরা অসম্পূর্ণ গৃহগুলো সম্পূর্ণ করার কাজ শুরু করি। বাইরে থেকে আমদানি করা পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রকল্প নিতে গিয়েই আমাদের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

টমাস বোর্জ এরপর সেইসব আশু সমস্যার কী ধরনের সমাধান তোমরা করলে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষা করে একটা প্রকল্প নেয়া হয়েছিল, যা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা তা বদলে সমন্বিত স্বার্থের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলোর সংস্কার করি। আমরা প্রকল্পগুলো এমনভাবে ঢেলে সাজাই যাতে কোনো একক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের চেয়ে দেশের সামগ্রিক স্বার্থই প্রধান হয়। ১৯৭৫ থেকে যে পদ্ধতিগুলো চলছিল সেগুলোর নানা দিক আমরা বদলে ফেলতে শুরু করি।

আমরা বাঁধ নির্মাণ ও সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের পানি উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করি। আমরা আমাদের দেশেই নানা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি নির্মাণ শুরু করি। আমাদের এই প্রক্রিয়া যখন পূর্ণ উদ্যমে চলছে; সে সময়টাতেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই পতনের পরিস্থিতিটা শুরু হলো।

টমাস বোর্জ কী হলো তখন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হাভানার অনেক প্রকল্প আমরা ইতিমধ্যে শেষ করে আনতে পেরেছিলাম। আমরা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, পলিক্লিনিক, পারিবারিক চিকিৎসকদের অফিস বাসস্থান নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উন্নয়ন এসব প্রায় সমাপ্ত করতে পেরেছিলাম।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পতনের পর আমরা অত্যন্ত মনঃকষ্ট নিয়ে 'শান্তিকালীন বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। বহু বছর আগে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন রিগ্যান, সমুদ্র অবরোধের মাধ্যমে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, তখন আমরা 'যুদ্ধকালীন বিশেষ ব্যবস্থা' গ্রহণ করেছিলাম। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আমাদের টিকে থাকার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম তখন। যুদ্ধকালীন অস্তিত্ব রক্ষার মতো শান্তিকালীন অস্তিত্ব রক্ষার নানা পরিকল্পনাও আমরা গ্রহণ করি। যে রসদ আমাদের হাতে আসত, তা অর্ধেক হয়ে যায়। সুতরাং যুদ্ধ না হলেও সেটা ছিল একটা বিশেষ সময়।

আমরা কী করেছিলাম? আমরা যেমন দৃঢ় সংকল্প বজায় রেখেছিলাম তেমনি এগিয়ে যাবারও অঙ্গীকার করেছিলাম। যেসব প্রকল্প সে মুহূর্তে আমাদের জন্য অপরিহার্য ছিল না, আমরা সেগুলো বাতিল করি। আমরা সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি, গৃহনির্মাণ, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, কিছু বিশেষ স্কুল, ইউনিভার্সিটি নির্মাণ বাতিল করে দিই।

আমরা জানতাম, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতি আছে, তাতে এসব ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। তবে সামাজিক কর্মসূচিগুলো বাতিল করে দিলেও বিদ্যমান স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ক্ষেত্রের মান আমরা নেমে যেতে দিইনি। গৃহনির্মাণ প্রকল্প স্থগিত থাকলেও কৌশলগত স্থানে গৃহনির্মাণ অব্যাহত থাকে, যেমন—কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য গৃহনির্মাণ। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কর্মসূচির বিভিন্ন দিককে সীমিত করে আনবার সিদ্ধান্ত নিই, যদিও অপরিহার্য দিকগুলোর কাজ অব্যাহত রাখি। যেমন আমরা বিভিন্ন গৃহসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ রাখি। আমাদের যখন পর্যাপ্ত বিদ্যুৎই নেই তখন টিভি, এয়ারকুলার সরবরাহ করে লাভ কী?

১৯৯১ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা ছিল। তারা প্রতি টন ৫০০ রুবল দরে আমাদের কাছ থেকে চিনি নিত এবং আমাদের ১০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করত। কিন্তু আমরা আমাদের কোটা কমিয়ে আনতে বাধ্য হই, গৃহসামগ্রী ক্রয় স্থগিত রাখি। আমরা গুরুত্ব অনুসারে কর্মসূচিকে সাজাই। আমরা বাইওটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, মেডিকেল যন্ত্রপাতির শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখি। আমাদের খাদ্য কর্মসূচিকে আমরা সর্বাগ্রে রাখি। খাদ্য কর্মসূচিকে সহায়তা করবার জন্য সীমিত মাত্রায় বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের কাজও অব্যাহত রাখি। ঐ পর্যায়ে সেগুলো ছিল আমাদের কৌশলগত স্তম্ভ।

টমাস বোর্জ তোমরা কখন থেকে বিদেশি পুঁজি এবং প্রযুক্তির ব্যাপক অংশগ্রহণ আহ্বান করলে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমরা বহির্বিশ্বের সম্পদ অনুসন্ধানের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করি। যেসব ক্ষেত্রে আমাদের পুঁজি, প্রযুক্তি, বাজার কোনোটিই নেই, সেসব ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভর করি, যেমন পর্যটন। এ ছাড়াও আমরা কিছু সংগঠন তৈরি করেছিলাম, যাতে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি অংশীদাররা তাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাজার, প্রযুক্তি, পুঁজি নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেখানে যতদূর সম্ভব আমরা আমাদের নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করছি, পাশাপাশি আমরা বিদেশি পুঁজির জন্যও দ্বার উন্মুক্ত করেছি। তবে আমরা অনেক বিবেচনা, বিশ্লেষণের পর এক একটা বিদেশি বিনিয়োগকে অনুমোদন করেছি। বাস্তব অবস্থা এই যে, আমাদের যথেষ্ট পুঁজি এবং বিদেশি বাজার ছিল না।

টমাস বোর্জ যেমন, পেট্রোলিয়াম।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, পেট্রোলিয়াম একটা উদাহরণ। তেল উত্তোলনের জন্য পুঁজি বা প্রযুক্তি কোনোটিই আমাদের নেই, ফলে এক্ষেত্রে বিদেশিদের ওপর নির্ভর করতেই হয়েছে। অতীতে একবার আমরা সোভিয়েতের সহায়তায় তেল উত্তোলন করেছিলাম কিন্তু এখন যেহেতু সেই সুযোগ নেই, আমাদের বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে একই অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে আমরা বিদেশি পুঁজিকে আহ্বান করতে দ্বিধা করিনি; কারণ কোথায় আমাদের থামতে হবে তা আমরা ভালোভাবেই জানি। যেমন আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বা চিনির কারখানায় আমাদের বিদেশি পুঁজির প্রয়োজন নেই। আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকেই আহরণ করতে চেষ্টা করি। বিদেশি বিনিয়োগের প্রতিটি কেস আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের সম্পদের ওপর নির্ভর করি। কিন্তু যেমন পর্যটন, যাতে কিছু অংশে রয়েছে আমাদের পুঁজি, বাকিটা বিদেশি পুঁজি। বাইওটেকনোলজিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য আমরা সম্পূর্ণ আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরা সম্পূর্ণ আমাদের সম্পদ দিয়েই করেছি। আমাদের শুধু অস্তিত্ব রক্ষা করলেই চলবে না, আমাদের উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও অব্যাহত রাখতে হবে।

টমাস বোর্জ সম্পদ বিতরণের ব্যাপারে তোমাদের পরিকল্পনা কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নীতিগতভাবে আমি বলেছি, দেশের সম্পদে সবার অধিকার থাকা উচিত। কোনো নাগরিকই যেন বেকার না থাকে। তার জন্য কাজের ব্যবস্থা না করতে পারলে, তাকে যেন বাতিল করা না হয়। তার জন্য একটা সাহায্যের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এর সঙ্গে আমেরিকা এবং ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ডের সামাজিক বৈরিতার নীতির পার্থক্য রয়েছে, যা লাখ লাখ নারী-পুরুষকে চরম দারিদ্র্যে ফেলে দেয়। আমরা সামাজিক বৈরিতার বদলে সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছি। বাজারে অনেক উদ্বৃত্ত টাকার প্রবাহ রয়েছে। কিন্তু সেটা আমাদের জনগণকে বিশেষ প্রভাবিত করে না, কারণ সকলের জন্য নির্দিষ্ট দরে নিত্যব্যবহার্য জিনিস বরাদ্দ আছে। ভবিষ্যতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে তখন আমরা বাজার থেকে উদ্বৃত্ত টাকা তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করব। ল্যাটিন আমেরিকার যে-কোনো দেশের চাইতে আমাদের সম্পদ অত্যন্ত সীমিত কিন্তু এই সীমিত সম্পদ নিয়েই আমরা যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছি, তা রীতিমতো অলৌকিক। আমরা এখনো কোনো স্কুল, হাসপাতাল, মেডিক্যাল সার্ভিস বন্ধ করিনি, কাউকে চাকরিচ্যুত করিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা গ্রাজুয়েটদের আমরা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক, টেকনিশিয়ানদের প্রস্তুত রেখেছি।

যেকোনো দেশের চাইতে অনেক কঠোর ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। তবু আমরা এই কঠিন অবস্থা মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছি। কীভাবে? আমাদের জনগণের সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। তুমি নিজেই তোমার ভ্রমণে তা দেখেছ।

মানবাধিকার

টমাস বোর্জ কিউবায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আরো অন্যান্য দেশে অভিযোগ উঠেছে। আসলে তোমার দেশের পরিস্থিতি কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো মানবাধিকার নিয়ে আমার কী ভাবনা? আমি খুব স্থির-মস্তিষ্কে নিরপেক্ষভাবেই বলতে চাই, আমি নিশ্চিত, পৃথিবীর আর কোনো দেশ কিউবার চেয়ে বেশি মানবাধিকার সংরক্ষণ করে না।

কিউবার কোনো শিশু ভিক্ষা করে না, বাড়ির অভাবে ফুটপাতে ঘুমায় না। পৃথিবীর বাকি উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে লাখ লাখ শিশু ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে বা ফুটপাতে আগুন গিলে ফেলার মতো নানারকম সব ম্যাজিক দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আর কোনো দেশ আমাদের মতো মানবাধিকার সংরক্ষণ করছে, বলো?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, এমনকি উন্নত দেশেও লক্ষ করো, কত অগণিত অসুস্থ শিশু কোনো চিকিৎসা পাচ্ছে না, কত শিশু কোনো শিক্ষা পাচ্ছে না। কত দেশে শিশু কেনাবেচা হচ্ছে, শিশুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেনাবেচা হচ্ছে, নানাভাবে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন হচ্ছে। এমন একটা ঘটনাও তুমি কিউবাতে পাবে না। আর কোনো দেশ কি পেরেছে, এইটুকু মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে? পৃথিবীর বহু দেশে শিশুমৃত্যুর হার ১০০ শতাংশের উপরে। ল্যাটিন আমেরিকায় শিশুমৃত্যুর গড় হার ৬০। অথচ কিউবার মতো অনুন্নত দেশে দুই দশকে আমরা এই শিশুমৃত্যুর হার ১০.৭-এ নামিয়ে আনতে পেরেছি। এযাবৎ আমি শুধু শিশুদের কথা বললাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহু দেশের পথে পথে রয়েছে লাখ লাখ ভিক্ষুক, মেয়েরা সেখানে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করছে, কিশোর-কিশোরীরা নেশা করছে। কিউবায় তুমি কোনো ভিক্ষুক, বেশ্যা, নেশাখোর পাবে না। আমরা বিপ্লবের মাধ্যমে সবার জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছি। আর কোনো দেশ কি পেরেছে এই মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে?

যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের গড় আয়ু ৪০, ৪৫, ৫০ বা ৫৫, সেখানে বিপ্লবের পর আমরা আমাদের গড় আয়ু ৭৫ বছরের বেশি করতে সক্ষম হয়েছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ যুবক বেকার, বৃদ্ধদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। আমরা সবার জন্যই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য পৃথিবীর সব দেশেই লক্ষণীয়। কিন্তু কিউবায় কারিগরি শক্তির প্রায় ৬০ ভাগ আসে মহিলাদের কাছ থেকে। এখানে মহিলাদের কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অবারিত সুযোগ রয়েছে। আর কোনো দেশ কি এই মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে?

আমরা জাতিগত বৈষম্য দূর করেছি। এদেশের যেকোনো নাগরিকের, যেকোনো ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত রয়েছে। সব দেশেই কিন্তু সাধারণ নাগরিক সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তারা নির্বোধ বলে বিবেচিত হয়। তারা কিছু না-বুঝে অন্যের প্রভাবে ভোট দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রতিটি নাগরিককে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রত্যেকেই দেশের রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, সাংস্কৃতিক বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কোনো একটাতে যুক্ত থাকে। আর কোনো দেশ কি এর চেয়ে বেশি মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে পেরেছে?

গত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে এদেশে সাধারণ মানুষের ওপর বল প্রয়োগের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোনো শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-আন্দোলন দমনের প্রয়োজন পড়েনি। গত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পুলিশকে কারো ওপর চড়াও হতে হয়নি, কোনো টিয়ার গ্যাস, গুলি চলেনি, যেসব ঘটনা নিত্যদিন ঘটছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোয়। মানবাধিকারের প্রতি এই সম্মানের উদাহরণ কি আর কোনো দেশে আছে?

আমরা একটা অন্যরকম পরিবেশে থাকি। বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সবার মধ্যে একটা সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের এত ব্যাপক বৈষম্য নেই যে, একদল না-খেয়ে মারা যাচ্ছে আর অন্যদল বেশি খেয়ে শরীরে কোলেস্টেরল বাড়িয়ে হার্টঅ্যাটাকে মারা যাচ্ছে। এখানে নাগরিকরা জানে যে রাষ্ট্রের কাছে তার মূল্য আছে, তার জাতীয় গৌরব আছে। আমরা নীতিগতভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা নিয়েছি, আর কোনো দেশে কি তার উদাহরণ আছে?

টমাস বোর্জ তার [illegible] কিন্তু প্রতিনিয়ত কিউবায় মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের [illegible]চারিত হচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, কিউবাকে যথেচ্ছ কলঙ্কিত করা হচ্ছে। তারা এমনও বলছে, এখানে মানুষের ওপর শারীরিক নির্যাতন, অত্যাচার করা হয়। এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা না করে বরং তোমার উচিত সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করা।

আমি কাউকে আঘাত না করে বলতে চাই, আমাদের বিপ্লবের একটা নির্দিষ্ট চরিত্র আছে, যার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই আছে। এদেশের মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতনকে ঘৃণা করতে শিখেছে। এই শক্তিই আমাদের সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছে, আমাদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে।

আমি জানি না পৃথিবীর কোনো যুদ্ধের ইতিহাসে আছে কি না, যেখানে বন্দিদের নির্যাতন, হত্যা করা হয়নি, শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে জবানবন্দি দিতে বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু আমাদের ২৫ মাসের যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি। আমরা বরং সব যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দিয়েছি। আমরা কেন যুদ্ধে জিতলাম? আমাদের ঐ মানবিক রণনীতির কারণেই। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এসব কথাকে আদর্শবাদী বলে মনে হতে পারে, কারণ যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বর্বরতার সুযোগ থাকে। সবচেয়ে বড় কথা, গত ৩৩ বছরে আমরা এই নীতিতে অটল থেকেছি। আমাদের এখানে কাউকে হত্যা করা হয়নি, কোনো বন্দির ওপর নির্যাতনের নজির নেই।

বিপ্লবের নিষ্কলুষ ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে একে ধ্বংস করাই সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য। যারা এসব করছে তারাও ভালোভাবে জানে যে এসব সত্য নয়। হত্যা, গুম-খুন-সন্ত্রাস এসব তো ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু গত ৩৩ বছরে আমাদের দেশে এসব ঘটনার নজির নেই। এ তো রীতিমতো ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

এ সবই বাস্তব সত্য। এমন কিছু ঘটলে মানুষ জানত এবং তা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করত না। কিউবার মানুষ বিপ্লবী। এদেশের মানুষ বরং আমাদের সমালোচনা করেছে আমরা যথেষ্ট কঠোর হইনি বলে। জনমতে আমাদের ব্যাপারে যদি কোনো ক্ষোভ থাকে, তবে কঠোরতার জন্য নয়, কঠোরতার অভাবের জন্য।

আমাদের দেশের বাইরে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য নানারকম প্রচার চলছে। কিন্তু কিউবাতে এমন কাউকে কি তুমি পাবে যে—এমন অভিযোগ তুলেছে, শুধু প্রতিবিপ্লবী, সিআইএ এজেন্ট এবং সাম্রাজ্যবাদের কিছু অনুচর ছাড়া।

শুধু দেশের ভেতর নয়, আন্তর্জাতিক মিশনগুলোতেও কিউবা এই মানবিক নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়ার যুদ্ধে আমাদের যে সৈন্যরা অংশ নিয়েছে তারা কঠোরভাবে এই নীতি মেনেছে। কোনো বন্দিকে তারা হত্যা বা অত্যাচার করেছে

~ www.amarboi.com ~

বলে রিপোর্ট আসেনি। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশে কিউবান কর্মীরা কাজ করছে। ১০ হাজারেরও বেশি কিউবার ডাক্তার আন্তর্জাতিক মিশনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করেছে। বহু কিউবান শিক্ষক পৃথিবীর অন্য দেশের শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছে। কয়টা দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মানবিক অবদান রাখছে?

জাতিসংঘে লক্ষ করো, কিউবার ভূমিকা প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে স্বীকৃত হচ্ছে। যখনই কোনো গোপন ভোট হচ্ছে, কিউবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাচ্ছে কিন্তু প্রকাশ্য ভোট হলেই নানা স্বার্থের কারণে ফলাফল হচ্ছে অন্যরকম। মানুষ বস্তুত কিউবার মানবিক নীতিমালাকে স্বীকৃতি দেয়। সত্য আবিষ্কার এবং স্বীকৃতি দেয়া মানুষের মহত্তম প্রবৃত্তি।

তবে, আমরা ঐসব মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত বা হতাশ নই। আমরা আমাদের আগের নীতিমালাই অব্যাহত রাখব। এখন আমাদের প্রয়োজন দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখা এদেশের জনগণের সমর্থন।

টমাস বোর্জ যথেষ্ট আন্তরিকভাবেই অনেকে চিন্তা করেছেন যে কিউবা বিপ্লব-বিরোধীদের ক্ষেত্রে এতটা কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না-করলেও পারত। সবার ক্ষেত্রে না হলেও আমি অন্তত একজনের ব্যাপারে জানি, যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তোমার কাছে শুনতে চাই ।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রথমত, এর সঙ্গে অন্য একটা প্রসঙ্গ জড়িত, সেটা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে কি থাকবে না, সেই প্রশ্ন। আমার মনে হয় না মৃত্যুদণ্ড কেউ পছন্দ করে। অনেকেই, যাদের মধ্যে কিউবার বন্ধুও রয়েছেন, এ ব্যাপারে তাদের মতামত আমাদের জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের পার্থক্য করে নিতে হবে কারা সৎ উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে কথা বলছে, কারা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে।

দীর্ঘদিনের আইনের ভিত্তিতে শুধু মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সমাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা আইনের অস্ত্রকে ব্যবহার করে থাকি। আমাদের এখানে যেমন সাধারণ অপরাধ আছে, প্রতিবিপ্লবী অপরাধও আছে। কখনো কখনো প্রতিবিপ্লবী অপরাধ, সাধারণ অপরাধের চেয়েও জঘন্য। আমরা এই অপরাধগুলো থেকে কীভাবে আমাদের রক্ষা করব? 'ডেথ স্কোয়াড' তৈরি করে মানুষকে হত্যা করে গুম করে দেব? আমরা তা করিনি, আমরা আইনের পথেই ব্যবস্থা নিয়েছি।

প্রতিবিপ্লবীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডাদেশ আমরা রহিত করতে পারতাম কিন্তু একপাক্ষিকভাবে আমরা তা পারি না, কারণ আমরা সার্বক্ষণিক আমেরিকার হুমকির মুখে আছি। যেখানে নানা হুমকিতে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে আমরা একপেশেভাবে নিজেদের নিরস্ত্র করে ফেলতে পারি না। এদেশের মানুষের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধের বিরুদ্ধে নেয়া চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে স্থগিত করতে পারি না। বিশেষ করে, যখন প্রতিবিপ্লবীদের বলা হচ্ছে বিপ্লব অচিরেই ধসে পড়বে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য মাস-কয়েকের জেলের বেশি কিছু হবে না।

মিয়ামি থেকে ডিনামাইট হাতে আমাদের জনসভায় বোমা ফাটাতে যারা এখানে এসেছিল, যাতে আমাদের বহু লোকের মৃত্যু ঘটত, তার প্রতি সদয় হবার কোনো কারণ আমি দেখি না। এরকম তিনজন এসেছিল। আমাদের কোর্ট পুরো বিষয়টিকে তদন্ত করেছে এবং এদের মধ্য থেকে শুধু একজনকে চরম শাস্তি দিয়েছে, যে পুরো ঘটনার জন্য প্রধানত দায়ী। যাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে সে কে? একজন দাগী আসামি, যে অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল এবং যাকে পরবর্তীতে প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসীর কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়।

সরকার এদের ক্ষমা করলে কী লাভ হতো? এতে এরকম অ্যাডভেঞ্চারকেই উৎসাহিত করা হতো। ইতিমধ্যে এরকম আরো গোটা-দশেক অভিযান ঘটে যেত। সেই ধরনের মানুষেরা এই অভিযান চালাত যাদেরকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে কিউবার পতনের আর অল্প কিছুদিন বাকি, বলা হয়েছে, মানুষহত্যার মাধ্যমে এই পতনকে ত্বরান্বিত করতে পারলে তারা অচিরেই পুরস্কৃত হবে। এদেরকে ক্ষমা করলে জাতির কাছে কী জবাব আমরা দিতাম? এদের ক্ষমা করার পক্ষে আমাদের কোনো যুক্তি নেই। যারা দেশের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এইরকম ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে, তারা যেন না ভাবে যে, সরকার তাদের ক্ষমা করবে।

এর কিছুদিন পর ওয়াটার স্পোর্ট কেন্দ্রের ঘটনাটা ঘটে। ঐ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না, তাতে অনেক সময় লাগবে। শুধু এটুকু বলব, ৩৫ দিন ধরে ২৩ বছর বয়সী এক যুবকের কষ্ট আমি দেখেছি। যিশু নাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টা ক্রুশবিদ্ধ ছিলেন কিন্তু এই যুবককে ৩৫ দিন ক্রুশবিদ্ধ রাখা হয়। আমেরিকানদের দ্বারা নিয়োজিত জনাচারেক খুনির সংঘটিত এই ঘটনায় শুধু সেই যুবকই বেঁচে গিয়েছিল। খুনিরা যখন ঐদেশে ফিরে গিয়েছিল, ওদের বীরের মর্যাদায় স্বাগত জানানো হয়েছিল। এই ঘটনা জনতাকে ক্রোধান্বিত করে তোলে, কোর্ট দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। যে খুনিরা মানুষকে বেঁধে জবাই করেছে তাদের প্রতি কি আমাদের সদয় হওয়ার কোনো কারণ আছে?

আর মৃত্যুদণ্ডের কথা যদি বলো, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় আমেরিকায়। এদের মধ্যে কি সবাই সাধারণ অপরাধী? এদের মধ্যে কি এমন অনেক বেকার নিরাপত্তাহীন মানুষ নেই, যারা জীবন বাঁচাতে অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে? এর পেছনে কি রাজনৈতিক দায়িত্বের ব্যাপার নেই? আমেরিকায় যাদের ইলেকট্রিক চেয়ার,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্যাস চেম্বার বা মৃত্যু-ইনজেকশন দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যেও রয়েছে সাধারণ এবং রাজনৈতিক অপরাধীর পার্থক্য। অনেক অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতিমালার। এটাও বেশ মজার যে আমেরিকায় মৃত্যুদণ্ড প্রধানত দেয়া হয় কৃষ্ণাঙ্গ এবং অভিবাসনকারীদের। শেতাঙ্গ মৃত্যুদণ্ডের খবর তুমি খুব কমই পাবে। এই অবস্থায় আমাদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে যারা জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছে, তাদের প্রতি আমরা ব্যবস্থা নিলেই কেন এত প্রচারণা? আমি তোমাকে বলছি, কিউবার সরকারি কাউন্সিল এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। কারণ আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন।

টমাস বোর্জ   অনেকের মতে কিউবায় যৌনতার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতিমালা রয়েছে। সমকামিতা, অবাধ প্রেম নিয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : সাংবাদিকতা বাদ দিয়ে তুমি তো এখন দেখেছি যাজকের মতো প্রশ্ন শুরু করলে। তবু তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব।

তুমি যৌন বৈষম্যের কথা বলছ। আমি আগেও একবার বলেছি এক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি। আমরা নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার কঠোর সংগ্রামে অনেকটুকু সফল হয়েছি। যদিও আমি স্বীকার করব এখনো আমাদের সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিকতা বিরাজ করছে। এর পেছনে রয়েছে বহু শতাব্দীর প্রভাব। এটা একটা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, কোনো দেশে এর প্রভাব তীব্র। তবে আমি জানি না সমাজের নানা ক্ষেত্রে কিউবা নারীর অধিকার যতটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে আর কোনো দেশ পেরেছে কি না। তবে আমাদের আরো পথ অগ্রসর হতে হবে।

আমি অস্বীকার করব না, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব সমকামিতার ওপর রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সমকামিতার প্রশ্নে কোনো আতঙ্ক নেই। আমি এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মত দিইনি। যথার্থ মানবিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই বিষয়টি দেখতে চাই। কখনো কখনো বিষয়টির খুব করুণ পরিণতি ঘটে। বাবা-মা যখন জানতে পারেন তাদের ছেলে সমকামী, তখন এমন প্রতিক্রিয়া তারা দেখান, যার পরিণতি হয় করুণ। আমি বিষয়টিকে অক্ষয় মনে করি না। এটা একধরনের প্রাকৃতিক প্রবণতা এবং বিষয়টিকে সেভাবেই দেখা উচিত। এ ব্যাপারে পরিবারের মানসিকতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমি সমকামীদের বিরুদ্ধে কোনো অবদমন, অত্যাচার পক্ষে নেই।

টমাস বোর্জ   একজন সমকামী কি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হতে পারবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আমি স্বীকার করি এসব নিয়ে নানা সংস্কার আছে। তবে আমরা এই সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। যেমন পার্টিতে বহু বছর নারী ও পুরুষের আচরণগত

~ www.amarboi.com ~

বিধিমালায় পার্থক্য ছিল। নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো নারী পার্টি-সদস্যের স্খলন হলে পার্টিতে সেটা নিয়ে প্রচুর আলাপ হতো অথচ এরকম স্খলন পুরুষের বেলায় ঘটলে সেটাকে তত সমস্যার ব্যাপার বলে মনে হতো না। এসব আসলে বহু বছরের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবেরই সংস্কার। এসব সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখনো হচ্ছে।

তোমার অবাধ প্রেমসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়নি। অবাধ প্রেম বলতে তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছ, আমি জানি না। তবে এর অর্থ যদি হয় প্রেমের স্বাধীনতা, তাহলে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

টমাস বোর্জ   আচ্ছা ঈশ্বরবিশ্বাসীরাও কি পার্টি-সদস্য হতে পারে, ফিদেল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   নানারকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমাদের আরো অনেক সংগ্রাম করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের ক্ষেত্রেও আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। পার্টিতে এই সংগ্রামে জয়ী হতে আমাদের প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে, বিশেষ করে তরুণ গোষ্ঠীদের একথা বোঝাতে খুবই বেগ পেতে হয়েছে যে, একজন যাবতীয় বিপ্লবী এবং দেশপ্রেমিক চেতনা থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মবিশ্বাসী বলে তাকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে বাধা দেয়াটা অযৌক্তিক।

পঠন-পাঠন

টমাস বোর্জ   পাঠক হিসেবে তোমার সুনাম আছে। তুমি শুধু সরকারি রিপোর্টই পড়ো না, নিয়মিত সহিত্যের বইও পড়ো। এই মুহূর্তে কোন্ বইটা পড়ছ, কোন্ বইটা সম্প্রতি শেষ করলে আর কোন্ বই আগামীতে পড়বে ভাবছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   টমাস, সারা জীবনেই আমি যতটা সম্ভব বই পড়েছি। এখন আমার প্রায়ই দুঃখ হয় বইপড়ার যথেষ্ট সময় আমি পাই না। লাইব্রেরিতে গেলে নতুন নতুন বইয়ের লিস্ট দেখলে এখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবি, যদি এই বইগুলো পড়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম।

সব ধরনের বই আমি পড়ি। ইতিহাসের বই আমার খুবই পছন্দের। আমি কিউবার ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনী প্রচুর পড়েছি। পৃথিবীর ধ্রুপদী সব জীবনীগ্রন্থ বোধ হয় আমি সবই পড়েছি। সিনিয়র হাইস্কুলে উঠে আমি সাহিত্য পড়তে শুরু করি, বিশেষ করে ধ্রুপদী এবং স্প্যানিশ সাহিত্য। স্বাভাবিকভাবে ধ্রুপদী সাহিত্য হিসেবে বাইবেল পড়েছি। আমার কথাগুলো কেউ বিশ্লেষণ করলে দেখবে, আমি প্রচুর বাইবেলীয় টার্ম ব্যবহার করি, কারণ আমি বারো বছর একটা ধর্মীয় স্কুলে পড়েছি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাজকরা ছিলেন আমার শিক্ষক, সেখানে মূলত স্প্যানিশ সাহিত্য পড়তে দেয়া হতো। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে আরো পরে। তবে সত্যি বলতে, আমি যখন জেলে ছিলাম তখনই প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পেয়েছি। ১৯৫৩-৫৫ এই দুই বছর আমি জেলে ছিলাম, তখনই আমি পড়াশোনার যথেষ্ট সময় পাই।

কিউবার ইতিহাস সবসময় আমাকে টানে। যারা এদেশীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, তাদের কথা আমি সেখানে জানতে পারি। বিশেষ করে মার্তির লেখা আমার পছন্দের। মার্তি আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। ২০০০ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে সংকলিত তাঁর লেখার এমন কোনো অংশ নেই, যা আমি খুঁটিয়ে পড়িনি। এরপর আমি পড়ি আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক বীরদের জীবনী, ম্যাক্সিমো গোমেজ, কার্লোস ম্যানুয়েল ডু সেসপেডেস, ইগনাসিও আগারামনতে এবং আন্তানিও মাসেওর জীবনী। আমার প্রথম রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ আমি পাই কিউবার ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। কিউবার স্বাধীনতা-যুদ্ধসংক্রান্ত যেকোনো বই পেলে এখনো আমি মত্ত হয়ে পড়ি।

এরপর পড়েছি নানারকম সাহিত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র হিসেবে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক সাহিত্য পড়তে শুরু করি, বিশেষ করে রাজনৈতিক অর্থনীতি। যদিও আমাদের মূলত পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কেই পড়ানো হতো তবু সেখানে অর্থনীতির সব ধ্রুপদী ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময়েই আমি বিস্তর মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের লেখাগুলো পড়ি। এর আগে আমি যখন পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়ছিলাম, তখন আমি ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠি। পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটাকে আমার উদ্ভট, নৈরাজ্যবাদী এবং বিশৃঙ্খল মনে হয়। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন পড়ার আগেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি একটা উন্মাদ ধারণা এবং নিজের মতো করে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব গঠন করতে থাকি। যদিও আমি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলাম এবং খেলাধুলা করতাম, তবু অর্থনীতির জটিল পরীক্ষাগুলোতে আমি সর্বোচ্চ নম্বরই পেতাম।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে নিজের মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে করতেই আমি মার্কসীয় এবং লেনিনীয় ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই এবং ক্রমশ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণারই অনুসারী হয়ে উঠি; সেটাই আমার পরবর্তী জীবনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য আমি সব বিষয়েই পড়েছি, এখনো পড়ছি। যেমন, বলিভার-সংক্রান্ত যাবতীয় বই আমি পড়েছি। আমি তার দারুণ ভক্ত। বলিভার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা চরিত্র, কী অসম সাহসিকতায় সব প্রতিকূলতা তিনি অতিক্রম করেছেন! আমি কার্থেজের হানিবাল সম্পর্কেও অনেক পড়েছি, ইতালিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর সব অভিযান সম্পর্কে পড়েছি। এ ছাড়া আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন—এঁদের মতো ইতিহাসের বিখ্যাত সব চরিত্র সম্পর্কে যেখানে যা পেয়েছি পড়েছি।

ইতিহাসের সব চরিত্রের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে বলিভার ও মার্তি। বলিভারের প্রতিভা ছিল যুদ্ধ আর রাজনীতিতে, তিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু মার্তি তা ছিলেন না। মার্তি হলেন চিন্তার রাজ্যের বলিভার। ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ডকে একতাবদ্ধ করতে বলিভারের ভূমিকা অসাধারণ।

আর নানা দেশের বিপ্লব সম্পর্কে বই তো পড়েছিই—ফরাসি বিপ্লব, বলশেভিক, ম্যাক্সিকান, চীনা বিপ্লব। জেলে থাকতে আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়াশোনা করি। সেখানে আমরা একটা স্কুলও গড়ে তুলি, যাতে দর্শনের ওপর আমরা পাঠ নিই। বিশ্বসাহিত্যও পড়েছি। জেলে দিনে ১৪/১৫ ঘণ্টা আমি নিয়মিত পড়তাম। বাকি সময় নানা মেনিফেস্টো লিখতাম লেবুর রসের তৈরি অদৃশ্য কালি দিয়ে। ঐ কাগজগুলোতে আগুনের তাপ দিলেই রেখাগুলো ফুটে উঠত।

বাতিস্তার জেল পরিদর্শনের সময় একদিন আমি একটা বিদ্রোহ সংগঠিত করি। তাতে আমাকে অন্য কয়েদিদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। আমি মাস-কয়েক একটা নির্জন কক্ষে থাকার পর রাউলকে ওরা আমার সঙ্গে থাকার জন্য পাঠায়। তখন এই অবস্থান আমার জন্য অনেকটা সহনীয় হয়। এই সময়ই আমি দস্তয়ভস্কির বিভিন্ন উপন্যাস পড়ি, যদিও জেলে বসে *দি হাউস অব দি ডেড* পড়াটা খুব বুদ্ধির পরিচয় না। এসময় আমি রোমা রোলায় এত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে রান্নার চুলা থেকে তৈরি বাতি মশারির বাইরে রেখে মাঝরাত পর্যন্ত পড়তাম।

এরপর মেক্সিকোতে, সিয়েরা মিয়েস্তা পাহাড়ে সবসময় আমার হাতে বই থাকত। এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে লেখা যাবতীয় বই আমি পড়ি। একসময় আমি কৃষি-বিষয়ে অনেক বই পড়তে শুরু করি, চাষাবাদ, ফসল, পশুপালনসংক্রান্ত শ'খানেক বই আমি পড়েছি। ল্যাটিন আমেরিকার ২৫০ থেকে ৩০০টি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের একটা তালিকা আমাদের কাছে ছিল, যার অনেকগুলো আমি পড়েছি। এগুলো আমরা সারা দেশে ছাপিয়ে বিতরণ করতে চাই, যাতে ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাস, সাহিত্য, বাস্তবতার পরিচয় সবাই পায়।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, সম্প্রতি আমি কী পড়াশোনা করছি। গত রাতে একটা ছোট উপন্যাস পড়ছিলাম, নাম *পারফিউম*, লেখক প্যাট্রিক সুসকাইন্ড। একটা অন্য ধরনের বিষয়ের খুব মজার একটা উপন্যাস। বইটা আরো ৩০ পৃষ্ঠা বাকি আছে, বইটা যে কীভাবে শেষ হবে, আমি এখনো বুঝতে পারছি না। আমি উপন্যাসের ঐ জায়গায় আছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমার বই

~ www.amarboi.com ~

যেখানে ফরাসি অভিজাততটি তার রগচটা মেয়েকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পারফিউম-প্রস্তুতকারী গ্রেনোলির বিপজ্জনক কাজকর্ম থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

আমি গার্সিয়া মার্কেজের সবকটা বই পড়েছি এবং আরো কিছু ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্যিকের লেখাও পড়েছি, যদিও প্রচুর পড়া বাকি রয়ে গেছে। ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যের ওপর অক্টোবর বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে আমি প্রাচীন রোম, গ্রিস, চীন এবং অজটেকের ওপর কিছু বই পড়ছিলাম। পাশাপাশি নতুন করে পড়ছি বার্নাল ডিয়াজ ডেজ কাস্তিলোর লেখা স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে ম্যাক্সিকান ইন্ডিয়ানদের বীরগাথা। আমি এ বইটার মাঝামাঝি আছি। যতই পড়ছি, মুগ্ধ হচ্ছি তাদের বীরদের কাহিনীগুলোতে। টেনোটিলানের ঘটনাটি তো অনন্যসাধারণ। উন্নত জাতির কামান, বন্দুকের মতো উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্রের বিরুদ্ধে অজটেকেরা যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। আমি অবাক হই, অজটেকদের নিয়ে এখনো যথেষ্ট বই লেখা হয়নি, ছবি তৈরি হয়নি দেখে।

তো, সেই অর্থে এই মুহূর্তে আমি আসলে তিন-চারটা বই একসঙ্গে পড়ছি। আরেকটা উপন্যাস পড়ব বলে রেখে দিয়েছি—ব্রাডবেরির *ডেথ ইজ এ লোনলি বিজনেস*। আসলে কখন কোন্ অবস্থায় আছি, তার ওপর নির্ভর করে কোন্ বই আমি পড়ব। কখনো কখনো চারপাশের সমস্যা ভুলে থাকার জন্য কিছু বই পড়ি। উপন্যাস এক্ষেত্রে খুব সহায়ক। সুসকাইন্ডের বই থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি। পারফিউম সম্পর্কে কত কিছুই যে এই বইটা থেকে জানলাম! হ্যাঁ, আরো একটা জীবনী আমার হাতে আছে *সুলেমান দি ম্যাগনিফিশেন্ট*। সুলেমান ইউরোপে অটোমান আগ্রাসন চালায় এবং সেখানকার বড় বড় সব শাসকদের ভয় পাইয়ে দেয়, যেমন—প্রথম ফ্রান্সিস, পঞ্চম ক্যালোস, ইংল্যান্ডের রাজা, অষ্টম হেনরি।

আমি প্রায়ই মিশর এবং গ্রিসের ইতিহাস পড়ি। গ্রিক দার্শনিকদের লেখা আমাকে মুগ্ধ করে। হেরাডিটাস, প্লুটার্ক, টাইটাস, লিডিয়াস, জেনোফেন, সুটোনিয়াস এদের আমি পছন্দ করি। আমি আসলে একেবারে শুধু একটা নয়, বেশ কয়টা বই একসঙ্গে পড়ি।

টমাস বোর্জ বইগুলো কোথায় আছে তার ওপরও নির্ভর করে নিশ্চয়ই?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি সাধারণত বাড়িতেই পড়ি। দিনের সব কাজ শেষে আমি বই নিয়ে বসি। দিনের বেলায় আমি সংবাদপত্র পড়ি। সব সংবাদপত্র তো আমি পড়তে পারি না। আমার সহকর্মী [illegible] আমার জন্য নির্বাচন করে দেন। তার পরও পত্রিকার বড় স্তূপ [illegible]। অনেক সময় রাতের বেলায় ওগুলো আমার হাতে এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৌঁছায়। তখন ওগুলো আমি পরদিন সকালে পড়ার জন্য সরিয়ে রেখে বরং কোনো সাহিত্যের বই নিয়ে বসি।

টমাস বোর্জ তোমাকে যদি শুধু একজন লেখককে নির্বাচন করতে বলা হয়, কাকে করবে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সার্ভেন্তেস।

টমাস বোর্জ খুব তাড়াতাড়ি বললে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমাকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি। আমি *ডন কুইক্সোট* পাঁচ-ছয়বার পড়েছি এবং এর বিষয়বস্তু আর রচনাকৌশলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। ক্যানটিনফ্লাসের সিনেমাগুলোও ওরকম। আমি প্রতি দু-তিন বছর অন্তর তাঁর সিনেমাগুলো দেখি এবং প্রতিবারই সেগুলো আমার নতুন বলে মনে হয়। ক্যানটিনফ্লাসের সিনেমায় কোনো গল্প নেই, শুধু একজন চরিত্র নানা কাণ্ড করে যাচ্ছে। আমি বারবার সিনেমাগুলো দেখি আর তাঁর হাঁটা, কথাবলার ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে মরে যাই। তার সিনেমাগুলো অনেকটা চ্যাপলিনের মতো। যদিও চ্যাপলিন অনেক বড় মাপের অভিনেতা এবং তাঁর সিনেমায় একটা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। ক্যানটিনফ্লাসের সিনেমায় অবশ্য বিশেষ বক্তব্য নেই, কিছু আবেগঘন মেলোড্রামা আছে। কোনো গরিব মেয়েকে সে হয়তো উদ্ধার করছে কিংবা কোনো ধনী মেয়ে প্রেমে পড়েছে, এইসব। তবু ছবিগুলো আমি বারবার দেখি এবং প্রচুর হাসি।

সেভাবেই আধুনিক অনেক লেখকের রচনাকৌশল অনেক উন্নত হলেও আমি বারবার ডন কুইক্সোটের কাছে ফিরে ফিরে যাই। সার্ভেন্তেসের শুধু একটা বিষয় আমি পছন্দ করি না, সেটা হলো লেখায় আরবি গল্পগুলো ঢুকিয়ে দেয়া। কখনো কখনো এগুলো খুবই দীর্ঘ এবং একঘেয়ে। আরবি গল্পগুলোতে আটকে না গিয়ে তাঁর বইটি যদি শুধু কুইক্সোট বিষয়ে হতো, বেশি ভালো হতো। তাঁর সম্পর্কে আমার শুধু একটাই সমালোচনা, এ ছাড়া সার্ভেন্তেস অসাধারণ।

আমি শেক্সপিয়ার পড়েছি। কিন্তু অনুবাদ পড়ার মধ্যে মৌলিক বই পড়ার আনন্দ নেই। আধুনিক লেখকদের এখন নানারকম রচনারীতি জানা আছে কিন্তু তাদের যে রসদ এবং সুযোগ আছে সার্ভেন্তেসের তা ছিল না। তিনি সম্ভবত কোনো মুসলিম, যাদের তারা 'ম্যুর' বলত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। নাভপাকটসে তিনি তাঁর একটা হাত হারান। কিন্তু কী অসাধারণ প্রতিভা! *ডন কুইক্সোট* ছাড়াও আমি তাঁর *নোভালিস এজেমপ্লারেস* ও পড়েছি। [illegible] লেগেছে।

টমাস বোর্জ [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিদেল ক্যাস্ট্রো পাবলো নেরুদার কবিতা আমার ভালো লাগে। তাঁর কবিতাই আমি সবচেয়ে বেশি পড়েছি। তবে আমি নিকোলাস গুইলেনকে বেশি পছন্দ করি। নেরুদার কবিতা চমৎকার আনন্দের উৎস কিন্তু গুইলেন আমার বেশি পছন্দ, যদিও গুইলেনের কবিতায় কিছুটা জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া আছে। কিন্তু আমি তা সমর্থন করি। 'স্প্যানিশ ভাষার শ্রেষ্ঠ একশো কবিতা' বইটা আমার প্রায় মুখস্থ। মার্তি এবং রুবেন দারিওর কবিতা আমার ভালো লাগে। মার্তি যদিও কবি ছিলেন না, তবু তাঁর কবিতা আনন্দদায়ক।

টমাস বোর্জ ফিদেল, তুমি কি কখনো গান করো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমার গানের গলা খুব খারাপ। আমি গান পছন্দ করি কিন্তু গাওয়ার শক্তি আমার নেই।

টমাস বোর্জ গোসলখানাতেও গাও না?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো গোসলখানায় পানি যদি খুব ঠাণ্ডা থাকে, তাহলে আমি হিহি করে কাঁপি। কিন্তু দুর্ভাগ্য গান গাইতে পারি না। আমার একদম গানের গলা নেই। তবে গান আমি পছন্দ করি খুব। বিশেষ করে বিপ্লবী গান। আমি কিউবার গায়কদের সঙ্গে বেশি পরিচিত। গিলডিও রোদ্রিগুয়েজ, পাবলিটো মিরানেস এবং সারাহ্ গনজালেস এঁদের গান ভালো লাগে। এনরিক করোনা বলে একজন নতুন গায়ক আছেন, তাঁর একটা গান আমার মনে খুব গেঁথে আছে, 'এখনই সময় বিপ্লব বলে চিৎকার করবার, হাতে হাত মেলাও দ্বিধাহীন, আমাদের কাজই আমাদের অঙ্গীকার, এসো জেনে নিই কী অর্থ বহন করে কিউবা কথাটি।' নিকারাগুয়াকে নিয়ে লেখা পাবলিটো এবং সিলভিওর গানগুলো আমার ভালো লাগে।

টমাস বোর্জ একটা লিখেছে পাবলিটো, অন্যটা সিলভিও।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমি দুটোই শুনেছি এবং দুটোই আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এ ধরনের গান আমার ভালো লাগে। কার্লোস ফনসেকাকে নিয়ে নিকারাগুয়ান শিল্পী কার্লোস মেজিয়ার 'মৃত্যুঞ্জয়ী টায়াকান' গানটিও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। 'টায়াকান' কথাটার অর্থ আসলে কী?

টমাস বোর্জ এর অর্থ হলো বীর, সাহসী মানুষ।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো চিলির ভিক্টোরিয়া জারার গানও আমার ভালো লাগে, যাঁকে ওরা হত্যা করল। ধ্রুপদী সংগীত এবং রণসংগীতও আমার পছন্দ। যদিও আমি এসব নিয়ে যথেষ্ট সময় দিতে পারি না। তা ছাড়া প্রকৃতিও আমার প্রতি সদয় নয়, আমার গানের কান ভালো না, গানের গলাও ভালো না। আমি এমন কোনো স্কুলেও যাইনি যেখানে গান শেখানো হয়। হলে খুবই ভালো হতো। এখন আর কী করা, এজন্য আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টমাস বোর্জ জ্যোতিষীদের মতে তোমার কুচকাওয়াজ সংগীত ভালো লাগে, কারণ তোমার জন্ম ১৩ আগস্ট, যেমন আমার। তারা এও বলে সিংহ রাশির লোকেরা হাঁটে না বরং কুচকাওয়াজ করে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তোমার আর আমার জন্ম কি সত্যিই একই দিনে? তোমার গানের গলা কি ভালো?

টমাস বোর্জ মোটেও না।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। জ্যোতিষীর কিছু কথা তাহলে ঠিকই বলে দেখা যাচ্ছে।

তবে তোমাকে যা বলছিলাম, সেটা শেষ হয়নি। তুমি আমাকে আমার প্রিয় লেখকের নাম বলতে বলেছিলে, এক্ষেত্রে আমার অবশ্যই গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নাম উল্লেখ করা উচিত। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছাড়াও তাঁর লেখার আমি ভক্ত। তাঁর উপন্যাসগুলো চমৎকার।

টমাস বোর্জ তুমি কার্তাজার পড়েছ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তেমন না।

টমাস বোর্জ তাঁর লেখা তোমার পড়া উচিত।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো নিশ্চয়ই। আমার লিস্টের শীর্ষে আমি তাঁর নাম লিখে রাখব। তুমি তাঁর কোন্ বই প্রস্তাব কর?

টমাস বোর্জ তাঁর ছোটগল্পগুলো এবং তাঁর উপন্যাস *হপস্কচ*, *দি বুক অব ম্যানুয়েল*, এবং *দি অ্যাওয়ার্ড*।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমাদের নির্বাচিত লেখকদের তালিকায় অবশ্যই তাঁর নাম আছে।

টমাস বোর্জ তা ছাড়া মানুষ হিসেবেও তিনি অসাধারণ। আমি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। যেহেতু তুমি সাহিত্যপ্রেমী, কিউবান সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কারো কারো সঙ্গে, সবার সঙ্গে নয়।

টমাস বোর্জ কেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কাজের চাপে। তুমি জানো, আমি নিজহাতে সব কাজ করতে পছন্দ করি। আমাদের কৃষিকর্মসূচি বা গৃহনির্মাণ কর্মসূচি সম্পর্কে যখন আমি কিছু জানতে চাই, আমি নিজে সেখানে সরেজমিনে গিয়ে তা দেখে আসি। আমার কাজের পরিধির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মধ্যে লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আমার কম ঘটে। আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন, যাদের আমি শ্রদ্ধা করি, যাদের সঙ্গে আমি সবসময় যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কাজের চাপ এত বেশি যে, সবসময় তা সম্ভব হয় না।

টমাস বোর্জ কিউবাতে এখন নতুন নন্দনতত্ত্ব, নতুন নতুন বোধের সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, প্রচুর, সবগুলোর নাম করাও অসম্ভব।

টমাস বোর্জ আবেল প্রিয়েতোর মতো লোকের কিউবায় কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয় ?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো আবেল প্রিয়েতো এদেশের একজন সম্মানিত বুদ্ধিজীবী হিসেবেই শুধু পলিটব্যুরোর সদস্য হননি, তিনি একজন মহান বিপ্লবীও। এ ছাড়া তাঁর নেতৃত্বদানের অসাধারণ ক্ষমতাও আছে। আমি যতই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

টমাস বোর্জ পাশাপাশি তিনি একজন বিনয়ী মানুষ। একজন বিপ্লবীর যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা গুণ।

স্বপ্নজয়ের সংগ্রাম

টমাস বোর্জ কমান্ডার, তুমি আমাকে সতর্ক করে বলছিলে, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের চারপাশে যে নীরবতা ঘিরে আছে তাকে তুমি ভাঙতে চাও না। তোমার সেই সতর্কতাকে আমি সম্মান জানাব।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি আমার চিন্তাভাবনার কথা তোমাকে বলেছি, একটা মাত্র ব্যাপার যা আমি আমার নিজের কাছে রাখতে চাই, সেটা হলো আমার ব্যক্তিগত জীবন। এ ছাড়া আমার নিজের কাছে রাখার মতো তো আর কিছুই নেই। কারো ব্যক্তিগত জীবনকে জনসমক্ষে টেনে আনা, রাজনীতিতে টেনে আনাকে আমি ঘৃণা করি, যা পুঁজিবাদী বিশ্বে হরহামেশাই হয়ে থাকে। প্রত্যেকেরই জীবনযাপনের নিজস্ব ধরন আছে। এগুলোকে ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দাও।

টমাস বোর্জ তোমার এই বিশ্বাসের ব্যাপারে আমি একমত। একটা ব্যাপার, বলা হয় রাজনৈতিক নেতাদের ৬০ বছর বয়সে অবসর নেয়া উচিত। এ বিষয়ে তোমার কী ভাবনা?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সত্যি যদি তা পারা যেত, টমাস! ব্যাপারটা অবসর নেয়া নয়, অবসর নিতে পারা। দুটো ভিন্ন ব্যাপার। আমি স্বীকার করি রাজনৈতিক নেতাদের যতদূর সম্ভব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তরুণ অবস্থায় অবসর নেয়া উচিত। এমনকি, প্লেটো তাঁর *দি রিপাবলিকে* বলেছেন, ৫৫ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যাপারের দায়িত্বে থাকা উচিত না। প্লেটোর সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫০ বছরের মতো। এখন গড় আয়ু বেড়েছে, সে হিসাবে একজন মানুষের এখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নেয়া উচিত ৮০ বছর বয়সে। অবশ্য, ৮০ বছর বয়সটা একটু বেশিই হয়ে যায়।

আমি মনে করি তরুণদের বিপ্লব করা উচিত। আমি যখন মনকাডা সেনানিবাস আক্রমণ করি তখন আমার বয়স ২৬ বছর। ট্রোজিল্লোর দুঃশাসন থেকে ডোমেনিকান রিপাবলিককে মুক্ত করার সংগ্রামে আমি যখন 'কনফাইটকে' অভিযানে অংশ নিই, তখন আমার বয়স ২০/২১। ২১ বছর বয়সে আমি গাইতান-হত্যার বিরুদ্ধে বোগোটা আন্দোলনে যোগ দিই। তোমার বয়স যখন ২০, ২৫ বা ৩০ তখন তুমি যা করতে পারো ৬০ বছর বয়সে তা করতে পারো না। ৬০ বছর বয়সে আমি তো সিয়েরা মিয়েস্ত্রার গেরিলাযুদ্ধে অংশ নিতে পারি না। আমি বিপ্লবের তুঙ্গ সময়ে ৩০ বা ৩২ বছর বয়সে যেসব কাজ করেছি, এখন এই বৃদ্ধবয়সে সেসব তো করতে পারব না। ঐ ধরনের বৈপ্লবিক যুদ্ধগুলোতে তরুণদেরই প্রয়োজন।

তবে একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া প্রয়োজন। আমি যখন প্রথম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসি তখন নিতান্তই অনভিজ্ঞ ছিলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি এখন রাষ্ট্র পরিচালনার নানা দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কিন্তু সত্যিই আমার আজকের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি বিপ্লবের প্রারম্ভের সেই তারুণ্য থাকত, তাহলে কতই না ভালো হতো। আজকের এই সংকটাপন্ন সময়ে, আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছে অথচ তারুণ্যের সেই শক্তি আমার নেই। যদিও আনন্দের সঙ্গেই আমি এই পরিশ্রম করছি। তবে সবচেয়ে ভালো হতো যদি তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানো যেত।

আর তোমাকে আমি খোলাখুলিই বলি, আমি সবচেয়ে খুশি হব, কেউ যদি এখন আমার দায়িত্বটা গ্রহণ করে। আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের জন্য কাজ করছি না, কাজ করছি কর্তব্য হিসেবে। আমাদের বিপ্লবের এখনো অনেক কাজ বাকি। বিপ্লবের সেই প্রথম দিনগুলোর মতো না হলেও, যুদ্ধ করবার মতো শক্তি এখনো আমার আছে। তা ছাড়া আমার সহকর্মী বন্ধুরা এখনো আমাকে প্রয়োজনীয় মনে করছেন বলে আমি কাজ করছি; আমার নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়।

তার পরও বয়সের ব্যাপারটা আপেক্ষিক। এটা সেই ব্যক্তি এবং তার স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ অল্প বয়সেই স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর নেন, কেউ কেউ ৭০, ৭৫, ৮০ বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া এটা সেই ব্যক্তির প্রেরণার ওপরও নির্ভর করে। অন্তর্গত প্রেরণায় মানুষ অনেক কঠিন কাজও করতে পারে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বিশ্বে আমার চেয়েও বয়স্ক রাষ্ট্রনায়ক আছেন। বয়সটা আমার সমস্যা নয়। আমার সমস্যা, আমি প্রায়ই ভুলে যাই যে আমি আর ৩০ নই। আমার মনের গড়ন ৩০ বছর বয়সের মতো কিন্তু আমার বয়স এখন ৬৫ বছর। সবশেষে বলব, একথাও ঠিক, বৃদ্ধ মানুষদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয় আর সত্যি বলতে, এই প্রথম আমাকে একজন বৃদ্ধ মানুষ নামে অভিহিত করা হলো।

টমাস বোর্জ তুমি অবশ্য আমার দেখা সবচেয়ে তরুণ 'বৃদ্ধ'। যাহোক আরেকটি প্রসঙ্গ। একটা কথা প্রচলিত আছে, 'ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয় আর চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে।' এই ফাঁদ থেকে তুমি কীভাবে নিজেকে মুক্ত রাখো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো এই প্রচলিত কথাটা আমি স্বীকার করি। ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়। কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে থাকা এগুলোকে আমরা ক্ষমতা বলি। দুর্নীতির মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব, বিনয়ের অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার এসবও অন্তর্ভুক্ত। আমি এমন অনেক উদাহরণ দেখেছি। সামান্য একটু ক্ষমতা পেলেই তারা কেমন বদলে যায়। ক্ষমতা যত বাড়ে, এর ঝুঁকিও তত বাড়ে। এই ঝুঁকি সম্পর্কে অবিরাম সতর্ক থাকা, এর ওপর সবসময় লক্ষ রাখা ছাড়া এ থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই।

আমার নিজের বেলায় বলতে পারি, ক্ষমতাকে আমি কখনোই আমার নিজের বলে মনে করিনি, ক্ষমতাকে আমার কোনো উপভোগের বিষয় বলে মনে হয়নি। বরং ক্ষমতাকে আমি বিপ্লবের একটি উপকরণ হিসেবে দেখেছি। এ ছাড়া আমি সবসময় নিজেকে সাধারণ মানুষের একজন হিসেবে দেখেছি। আমি কখনো সাধারণ নারী-পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিনি। আমি বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছিলাম মাঠপর্যায়ের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে। পরে আমি যখন বিপ্লবকে সংগঠিত করি, তখন আমি হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে তাদের দলে যুক্ত করি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা হিসেবে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এবং ১০ মার্চ ১৯৫২-এর পর থেকে বিপ্লবের সংগঠক হিসেবে সবসময়, সারা জীবন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। তারপর গ্রানমা অভিযানে আমি নিজে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং ২৫ মাস তাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেছি। গত ৩০ বছর আমি এই অভ্যাস বজায় রেখেছি। বিপ্লবে প্রতিটি সাধারণ মানুষের ভূমিকাকে আমি মনে রাখি সর্বদা।

তুমি যদি সত্যিকার অর্থে সৎ হও, তুমি দুর্নীতিপরায়ণ হবে না। আমি আমার নিজের জীবনের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখি। আমি আমার প্রতিটি কাজকে বিশ্লেষণ করি। লক্ষ করি যা করেছিলাম তা ঠিক, না বেঠিক ছিল, সেখানে আমার কোনো অহমিকার পরিচয় ছিল কি-না। এইভাবে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি। 'নিজেকে জানো' এর পাশাপাশি আরো একটি আপ্তবাক্য স্মরণ রাখা উচিত, 'নিজেকে সংযত রাখো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা, যা তুমি কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলে, সে ব্যাপারেও আমি সবসময় আগের মতোই রয়ে গেছি, বদলে যাইনি। তুমি আরো বলছিলে, চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণতার জন্ম দেয়। একথাও সত্য, যদিও চূড়ান্ত ক্ষমতার কোনো অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, কারণ আমি সারাজীবন একব্যক্তির শাসনের বিরুদ্ধে।

বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আমরা গোষ্ঠী-নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত হচ্ছি। আমাদের নেতৃত্বের দুটো অংশ রয়েছে, এক অংশে তিন-সদস্যের একটা নির্বাহী দল, অন্য অংশে অনেক কমরেডদের নিয়ে গঠিত একটা নেতৃদল। এভাবেই আমরা ২৬ জুলাইয়ের আন্দোলন করেছিলাম। সেই সময় দলে আমি ছিলাম একমাত্র পেশাদার বিপ্লবী। 'পেশাদার' বলছি এজন্য যে আমি সার্বক্ষণিক বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলাম। আমার কোনো আয়-উপার্জন ছিল না, আমার খাওয়া, থাকা, কাপড়চোপড়ের যাবতীয় খরচ চালাত আমার কমরেডরা। দিনে ১৫, ১৬, ১৭ ঘণ্টা আমি বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকতাম।

বাতিস্তা আমাদের বিশেষ মূল্য দিত না। সে ভয় পেত বড় বড় দলগুলোকে যাদের অঢেল টাকা এবং অস্ত্র রয়েছে। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধাই হয়েছিল, আমরা প্রকাশ্যে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছি এবং মনকাডা সেনানিবাস আক্রমণ করতে পেরেছি। আমাদের গুপ্ত সংগঠন গড়তে হয়নি, সবকিছু ছিল প্রকাশ্য। এতে আমি বিশেষভাবে খুশি ছিলাম, কারণ আমার শরীরের গঠনটা এমন যে আমার পক্ষে আত্মগোপন করাটা ছিল দুরূহ কাজ। আমি চুলে রঙ দিই আর যা-ই করি না কেন, আমাকে ঠিকই চেনা যেত। সুতরাং আমার পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করাই সুবিধাজনক।

মনকাডা আক্রমণ, জেল ইত্যাদির পর আমি আবার গ্রানমা অভিযান সংগঠিত করি; আমি বিদেশ থেকেই এটা সংগঠিত করি। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমাকে আর আত্মগোপন করতে হয়নি।

টমাস বোর্জ   তুমি যখন মেক্সিকোতে ছিলে তখন কী অবস্থা ছিল?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো   সেখানে আমি আত্মগোপন করিনি, সতর্ক ছিলাম। আমরা চূড়ান্ত ক্ষমতার কথা আলাপ করছিলাম। আমরা শুরু থেকেই যৌথ-নেতৃত্বে চলছিলাম, যদিও আমাদের কমরেডরা আমার ওপর বিশ্বাস রেখে অনেক ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিলেন। মনকাডা আক্রমণের পর, আমরা এই আন্দোলনকে '২৬ জুলাই আন্দোলন' নামে নতুনভাবে নামকরণ করি এবং একটা জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলি। আমি যখন জেলে, জাতীয় নেতৃদলের যৌথ-নেতৃত্ব তখন স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন পরিচালিত করে। আমি যখন মেক্সিকোতে তখনো জাতীয় নেতৃত্ব তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, আমি তার অংশ ছিলাম মাত্র।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের জন্য একজন 'কমান্ডার ইন চিফ' দরকার। সুতরাং যুদ্ধ যখন শুরু হলো, আমাকে কমান্ডার ইন চিফ নিযুক্ত করা হয়। এখনো আমাকে 'কমান্ডার ইন চিফ' ডাকা হয়। আমি কোনোদিন কোনো কর্নেল, জেনারেল, মার্শাল ইত্যাদি ছিলাম না, এই ৩০ বছরে আমার কোনো পদোন্নতিও হয়নি। আমি এখনো 'কমান্ডার ইন চিফ'। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আমাকে সেনাদলের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়, যদিও তখন আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় নেতৃদল। এসময় জাতীয় নেতৃদল স্বাধীনভাবে অগণিত সিদ্ধান্ত নেয়।

২৬ জুলাই আন্দোলন যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে তখন আমরা অন্যান্য সহযোগী দলকেও নেতৃত্বে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই। যেমন তৎকালীন জনপ্রিয় সোসালিস্ট পার্টি এবং রেভুলেশনারি ডাইরেকটরেট। আমরা তাদের সমন্বয়ে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করি। আন্দোলনে আমরা মূল দল হলেও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা আমরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে গ্রহণ করি। তবে এখনো আমার নিজস্ব কাজের কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে আমার ক্ষমতা আছে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেবার। তেমনি মিউনিসিপালিটি, ফ্যাক্টরি, প্রাদেশিক নেতাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আছে। সংবিধানের চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রীয় সংসদের। কিন্তু সংসদ সারা বছর চলে না, মধ্যবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আমি অস্বীকার করি না যে, সব ক্ষেত্রেই আমার ব্যাপক অধিকার রয়েছে কিন্তু যেকোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত বিস্তৃত আলাপ-আলোচনার পরই হয়ে থাকে, কখনো এককভাবে নেয়া হয় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন অনেক সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে, যা ব্যক্তিগতভাবে আমি সমর্থন করিনি কিন্তু আমি সবসময়ই জাতীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

টমাস বোর্জ তুমি কি বলবে কিউবাতে ব্যক্তিপূজা নেই?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমরা যে প্রসঙ্গে আলাপ করছি এর সঙ্গে ব্যক্তিপূজার বিষয়টি খুব প্রাসঙ্গিক। চূড়ান্ত ক্ষমতার চর্চাই এ ধরনের প্রবণতার জন্ম দেয়। কিন্তু কিউবাতে চূড়ান্ত ক্ষমতার চর্চা দুরূহ। কিউবানরা বেসবল, কৃষি, রাজনীতি সবকিছু নিয়েই আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে।

বিপ্লবের পরপরই ব্যক্তিক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার এবং ব্যক্তিপূজার খুবই অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পরপরই প্রথম যে আইনগুলো আমরা প্রণয়ন করি তার একটা, সরকারিভাবে কারো প্রতিকৃতি রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা। বিপ্লবের ৩০ বছরেও কোথাও আমার কোনো সরকারি প্রতিকৃতি নেই। বহু বন্ধু, বিদেশি আমার প্রতিকৃতি চায় কিন্তু সরকারিভাবে আমরা তা অনুমোদন করি না। মানুষের বাড়িতে বা পোস্টারে আমার যে ছবিগুলো দেখা যায়, সেগুলো সব বিভিন্ন পত্রিকা থেকে নেয়া, একটাও অফিসিয়াল নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়া আমরা কোনো জীবিত বিপ্লবীর নামে স্কুল, প্রতিষ্ঠান, রাস্তার নামকরণ করা, কোনো জীবিত বিপ্লবীর মূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি। এসব পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি সেই ১৯৫৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্য কোথাও ব্যক্তিপূজার বিষয়টি তেমনভাবে আলোচিত নয়।

ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। এমনকি আমাদের বিদ্রোহী সেনাবাহিনীতে কমান্ডারের ওপর কোনো পদ ছিল না। আমাদের বিরাট একটা সেনাদল ছিল কিন্তু আমাদের কোনো ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল ছিল না। তবে সেনাবাহিনীর এই পদের নামকরণের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো দেশের মিল ছিল না বলে সমাজতান্ত্রিকসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষে অবশ্য আমরা আমাদের আবেগ ছেড়ে সেনাবাহিনীর প্রথাগত পদগুলো নিই, যেমন—কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল, লে. জেনারেল, জেনারেল ইত্যাদি। যদিও আমার পদটি কমান্ডার ইন চিফই থাকে—যা আইনগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হয়। তবে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় আমি সবসময় ব্যক্তি ইমেজ-সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থেকেছি।

টমাস বোর্জ ফিদেল, তুমি কি তৃপ্ত? তোমার কি মনে হয় জীবনে এমন কিছু কাজ তুমি করেছ, যা না-করলেই ভালো হতো?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো হ্যাঁ, আমি কৌশলগত কিছু ভুল করেছি। ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৬তে আলেগ্রিয়া ডি পিইওতে আমার ভুলের কারণে যে বিপর্যয় হয়েছিল সেকথা তোমাকে বলেছি। তবে বিপ্লবের সামগ্রিক পরিকল্পনায় আমার কোনো ভুল হয়নি। আমি কোনো নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিনি। ফলে এ ব্যাপারে আমার কোনো অনুতাপ নেই।

তবে আমার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি যে সম্পূর্ণ তৃপ্ত তা নই। আমার সবসময় মনে হয় আমি আরো ভালো করতে পারতাম। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি একা নই, কিউবান বিপ্লবীরা, কিউবান জনগণ এমন কিছু করেছেন, যা গুরুত্বপূর্ণ।

টমাস বোর্জ 'কিউবান সত্তা' কথাটিকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করো, যার কথা কিউবার কবি-সাহিত্যিকরা প্রায়শই বলে থাকেন?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো অতীতের যেকোনো সময়ের চাইতে এই মুহূর্তে কিউবান সত্তার ধারণাটি আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মাতৃভূমির চাইতেও সমগ্র মানবজাতিকে বড় করে দেখেছি। আমি দেশপ্রেমিক হয়েও একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। কিন্তু এখন যখন আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের বীর, মহান জনগণ একটা চরম উৎকর্ষে এসে পৌঁছেছে, আন্তর্জাতিকতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে, পাশাপাশি যখন আমাদের দেশ সাম্রাজ্যবাদের অভূতপূর্ব, তুলনাহীন বিরোধিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখোমুখি হচ্ছে, যখন আমাদের দেশ ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিরক্ষার সম্মুখ সারিতে এসে পৌছেছে, তখন কিউবান হওয়াটা আমার কাছে শুধু গৌরবের বিষয় নয়, মহান একটা সুযোগও বটে। আমার দেশপ্রেম এই মাটির জন্য ভালোবাসা নয়, এই মাটিতে বসবাসকারী মানুষের জন্য ভালোবাসা। যেমন মার্তি লিখেছেন—

"দেশপ্রেম, মাগো
এই মাটির জন্য হাস্যকর ভালোবাসা নয় শুধু
নয় আমাদের বৃক্ষের নিচের ঘাসের জন্য ভালোবাসা;
যারা আমাদের দমিয়ে রাখতে চায় এ হলো তাদের প্রতি অজেয় ঘৃণা
যারা আমাদের আক্রমণ করে, এ হলো তাদের প্রতি চিরায়ত বিদ্বেষ।"

আমার কাছে মাতৃভূমি মানে জনতা। এদেশের জনগণের প্রতি আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে, যা অবিরাম কেবলই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কারণ আমার জনগণ নিরন্তর বিকাশ লাভ করেছে। এই জনগণ যেমন বিপ্লবকে আকার দিয়েছে তেমনি বিপ্লবের প্রভাবে নিজেদেরও নির্মাণ করেছে। আমি এই জনগণকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। এই জনগণেরই একটা অংশ হতে পেরে, এই জনগণেরই সন্তান হতে পেরে আমি গর্বিত।

টমাস বোর্জ আমরা অনেকেই একটা স্বপ্নরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। তুমি কি মনে করো আজকের পৃথিবীতে মানবতার যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে তেমন একটা উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার সেই স্বপ্ন দেখাটা এখনো প্রাসঙ্গিক?

ফিদেল ক্যাস্ট্রো : আমাদের হাতে আর কোনো বিকল্প নেই। একটা উন্নত, সুস্থ পৃথিবী তৈরির স্বপ্ন আমাদের দেখে যেতেই হবে। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, স্বপ্ন একদিন বাস্তব হবে, যদি আমরা তার জন্য সংগ্রাম করি। মানবতা কখনোই স্বপ্নকে অস্বীকার করবে না। স্বপ্নরাজ্যের ভাবনা, সেই রাজ্য নির্মাণেরই একটা অংশ। মার্তি বলতেন, আজকের স্বপ্ন, আগামীর বাস্তবতা। আমাদের দেশে আমরা অতীতের অনেক স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। আমরা যেহেতু স্বপ্নের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, সুতরাং একটা উন্নত দেশে, উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন দেখার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। এ ছাড়া আমরা যা করতে পারি তা হলো যাবতীয় স্বপ্ন, সংগ্রামকে বাতিল করে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা। কিন্তু কোনো বিপ্লবী কখনো সংগ্রাম থেকে বিরত থাকেন না, যেমন তিনি বিরত থাকেন না স্বপ্ন দেখা থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষান্তরিত গল্প, প্রবন্ধের মূল লেখক এবং সাক্ষাৎকারসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গল্প

মিলান কুন্ডেরা চেকস্লোভাকিয়ার লেখক, জন্ম ১৯২৯। বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'দি লাফেবল লাভস' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

ওরহান পামুক তুরস্কের লেখক, জন্ম ১৯৫২। ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'আদার কালার রাইটিংস অন আর্টস, বুকস অ্যান্ড সিটিস' বইটি থেকে নেওয়া।

আবেলারদো কাস্তিলো : আর্জেন্টিনার লেখক, জন্ম ১৯৩৫। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'দি আদার ডোর' বইটি থেকে নেওয়া।

ওক্টাভিও পাজ ম্যাক্সিকান লেখক, জন্ম ১৯১৪। ১৯৯০ সালে নোবেল পুরস্কার পান। অনূদিত গল্পটি তাঁর 'ঈগল অর সান' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

হারুকি মুরাকামি জাপানের লেখক, জন্ম ১৯৪৯। অনূদিত গল্প দুটি তাঁর গল্পসংগ্রহ 'ব্লাইন্ড উইলো, স্লিপিং ওম্যান' বইটিতে অন্তর্ভুক্ত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ

'ভিনদেশীদের চোখে আমেরিকা' অংশের লেখাগুলো 'গ্রান্টা' পত্রিকার ২০০২ সালের ৭০ নং বিশেষ সংখ্যা থেকে নেওয়া। এই অংশের লেখক/ লেখিকারা হলেন

হানান আল-শাইখ	লেবানিজ লেখিকা, জন্ম ১৯৪৫।
অমিত চৌধুরী	ভারতীয় লেখক, জন্ম ১৯৬২। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন।
ওরহান পামুক	তুরস্কের লেখক, জন্ম ১৯৫২। ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।
ইয়ান লিয়ান	চীনা কবি, জন্ম ১৯৫৫।
করিম রাসলান	মালয়েশিয়ার লেখক, জন্ম ১৯৬৩।
রাজা শেহাদেহ	প্যালেস্টাইনি লেখক, জন্ম ১৯৫১।
আহদাফ সয়ীফ	মিশরীয় লেখিকা, জন্ম ১৯৫০।

অন্যান্য প্রবন্ধের লেখকগণ

ভিস্লাভা শিমবোর্স্কা	পোল্যান্ডের কবি। ১৯৯৬ সালের সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী। জন্ম ১৯২৩, মৃত্যু ১৯১২।
কেনজাবুরো ওয়ে	জাপানী লেখক। ১৯৯৪ সালের সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী। জন্ম ১৯৩৫।
ডেরিক জেড জ্যাকসন	আমেরিকান সাংবাদিক। জন্ম ১৯৫৫। লেখাটি বোস্টন গ্লোব পত্রিকা থেকে নেওয়া।
পাওলো কোয়েলহো	: ব্রাজিলীয় লেখক। জন্ম ১৯৪৭। লেখাটি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।
এদোয়ার্দো গালিয়ানো	উরুগুয়ের লেখক। জন্ম ১৯৪০, মৃত্যু ২০১৫। লেখাটি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।
আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি	রাশিয়ার চলচ্চিত্রকার। জন্ম ১৯৩২, মৃত্যু ১৯৮৬। ভাষান্তরিত অংশটি তাঁর ডায়েরি 'টাইম উইদিন টাইম' থেকে নেওয়া।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাওয়ার্ড জিন আমেরিকার ইতিহাসবিদ। জন্ম ১৯২২, মৃত্যু ২০১০। লেখাটি তাঁর 'পিপলস হিস্ট্রি অব ইউনাইটেড স্টেটস' বইয়ের সুত্র ধরে একটি আলোচনা।

কাজান জাকিস গ্রিক লেখক। জন্ম ১৮৮৩, মৃত্যু ১৯৫৭। এ লেখাটি তাঁর বই 'রিপোর্ট টু গ্রেকো'থেকে নেওয়া।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং সুইজারল্যান্ডের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। জন্ম ১৮৭৫, মৃত্যু ১৯৬১। লেখাটি জোসেফ ক্যাম্পবেল-এর 'পোর্টেবল ইয়ুং' বই থেকে নেওয়া।

চিনুয়া আচেবে নাইজেরিয়ান লেখক। জন্ম ১৯৩০, মৃত্যু ২০১৩। এ লেখাটি ১৯৮৫ সালে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া একটি বক্তৃতা।

আর্নস্ট লিন্ডগ্রেন চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক। জন্ম বৃটেনে ১৯১০ এবং মৃত্যু ১৯৭৩। ভাষান্তরিত লেখাটি তাঁর 'আর্ট অব ফিল্ম' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

আর্নস্ট ফিশার মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক এবং সাংবাদিক। জন্ম অস্ট্রিয়ায় ১৮৯৯ এবং মৃত্যু ১৯৭২। ভাষান্তরিত লেখা দুটি তাঁর 'নেসেসিটি অব আর্ট' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

সাক্ষাৎকার

হেনরিক ইবসেন নাট্যকার। জন্ম ১৮২৮ সালে নরওয়েতে, মৃত্যু ১৯০৬। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত 'দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ' বইয়ে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন আর এইচ শেরার্ড ১৮৯৭ সালে এবং ছাপা হয়েছিল 'দি হিউমেনিটেরিয়ান' পত্রিকায়।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানী। জন্ম ১৮৫৬ সালে অস্ট্রিয়ায়, মৃত্যু ১৯৩৯। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পাদিত 'দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ' বইয়ে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন জর্জ সিলভেস্টোর ভিয়েরেক ১৯৩০ সালে।

পাবলো পিকাসো চিত্রকর। জন্ম ১৮৮১ সালে স্পেনে। মৃত্যু ১৯৭৫। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি সংকলিত হয়েছে ক্রিস্টোফার সিলভেস্টার সম্পাদিত 'দি পেঙ্গুইন বুক অব ইন্টারভিউজ' বইয়ে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন 'নিউ মাসেস' পত্রিকার সাংবাদিক জেরোম সেকলার ১৯৪৫ সালে।

মিলান কুন্ডেরা লেখক। জন্ম ১৯২৯ সালে চেকস্লোভাকিয়ায়। বর্তমানে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। তাঁর এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন 'দি প্যারিস রিভিউ' পত্রিকার সাংবাদিক ক্রিশ্চিয়ান সালমান ১৯৮৭ সালে। এটি সংকলিত হয়েছে কুন্ডেরার 'দি আর্ট অব নভেল' গ্রন্থে।

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কি রাশিয়ার চলচ্চিত্রকার। জন্ম ১৯৩২, মৃত্যু ১৯৮৬। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন লায়লা আলেকজান্ডার এবং প্রকাশিত হয়েছিল 'সোভিয়েত ফিল্ম' পত্রিকায় ১৯৮৯ সালে।

জেমস ন্যাক্টওয়ে আলোকচিত্র শিল্পী। জন্ম ১৯৪৮ সালে আমেরিকায়। তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ডগলাস ক্রুকস্যাক। সাক্ষাৎকারটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো বিপ্লবী রাজনীতিবিদ। জন্ম ১৯৩৬ সালে কিউবায়। এখানে ক্যাস্ট্রোর দুটি সাক্ষাৎকার অনূদিত হয়েছে। প্রথম সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ফ্রেই বেত্তো ১৯৮৫ সালে। এই সাক্ষাৎকার 'ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যান্ড রিলিজিয়ন—টকস উইথ ফ্রেই বেত্তো' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন টমাজ বোর্জ ১৯৯২ সালে। এই সাক্ষাৎকার 'ফেইস-টু-ফেইস উইথ ফিদেল ক্যাস্ট্রো অ্যা কনভারসেশন উইথ টমাজ বোর্জ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। দুটি সাক্ষাৎকারেরই নির্বাচিত অংশ ভাষান্তরিত করা হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও